প্রবন্ধসমগ্র

শওকত ওসমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

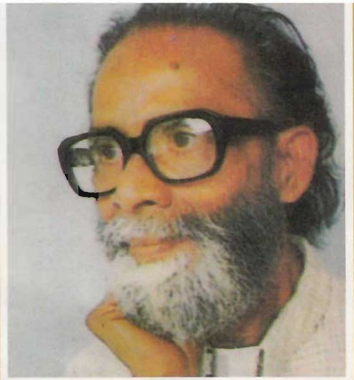

শওকত ওসমান এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা : শেখ মোহম্মদ এহিয়া, মাতা: গুল আর্জান বেগম। জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯১৭, পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে। পাড়ার নাম মেহেদি-মহল্লা।

গ্রামের মাদ্রাসার লেখা-পড়া শেষে ১০২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাস-এ আলিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস করেন। এখান থেকেই বি.এ পাস ১৯৩৯ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বাংলায় এম.এ ১৯৪১ সালে।

ছাত্র জীবনেই বিয়ে করেন হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনকে ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।

১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দেশ-বিভাগের পর অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মতো করে অপশান দিয়ে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কমার্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে দুই বাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায় তাঁর পুরো পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে চট্টগ্রামে ৩৪বি চন্দনপুরায় বসবাস করেছেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং পূর্বে মোমেনবাগে কেনা জায়গায় বাড়ি করেন এবং আমৃত্যু ৭এ মোমেনবাগে কাটিয়ে গেছেন।

য়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন ▶

১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কাটান কলকাতায়।

১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করেন, লেখায় পুরো সময় দেবেন বলে।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভীষণ মনোকষ্টে ভোগেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালে।

ভ্রমণ করেছেন নানা দেশ : পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক ও ইরান।

১৯৯৮-এর ২৯-এ মার্চ হঠাৎ সেরিব্রাল এ্যাটাকে আক্রান্ত হন। ১৪ই মে সকাল ৭-৪০ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। প্রথম কিছু দিন লেখেন কবিতা। পরে আসেন গদ্যে। নিরন্তর লিখে গেছেন, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনৈতিক লেখা, শিশুতোষ রচনা, এমন কি কাব্য রচনাও করেছেন ব্যাঙ্গ আকারে। অনুবাদও করেছেন প্রচুর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। বাংলা একাডেমী, স্বাধীনতা ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন দেশের সব পুরস্কার ও পদক। তাঁর 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'রাজসাক্ষী' ও 'জলাংগী'সহ বেশ কিছু ছোটগল্পের সংকলন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

তাঁর পরিবারের সব সদস্যই শিল্পী। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুলবন ওসমান প্রফেসর-সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী। মধ্যম পুত্র আসফাক ওসমান মৃৎশিল্প-শিল্পী। তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস্ ওসমান স্থপতি ও রাজনীতিবিদ। কনিষ্ঠ পুত্র জাঁনেসার ওসমান চলচ্চিত্র নির্মাতা।

য়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

প্র ব ন্ধ স ম গ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই–

উপন্যাস

জননী
ক্রীতদাসের হাসি
বণী আদম
জাহান্নম হইতে বিদায়
উপন্যাসসমগ্র ১
উপন্যাসসমগ্র ২
উপন্যাসসমগ্র ৩
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠগল্প
গল্পসমগ্র
পিঁজরাপোল
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী
বিগত কালের গল্প
উপলক্ষ্য

মুক্তিযুদ্ধ

কালরাত্রি খণ্ডচিত্র
১৯৭১ : স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর

স্মৃতিকথা/আত্মকথা

রাহনামা ১
রাহনামা ২
উত্তরপর্ব মুজিবনগর

কিশোরসাহিত্য

কিশোরসমগ্র ১
কিশোরসমগ্র ২

অন্যান্য

হন্তারক
প্রবন্ধসমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধসমগ্র

শওকত ওসমান

সময় প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধসমগ্র
শওকত ওসমান
© লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪

সময়

সময় ৯৩৬

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মূল্য: ৭৫০.০০ টাকা মাত্র

PROBANDHASOMOGRO a collection of easses by Shaukat Osman. First Published: February Bookfair 2014, by Farid Ahmed, Somoy Prakashan 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web: www.somoy.com E-mail: info@somoy..com

Price: Tk. 750.00 only

ISBN 978-984-90634-3-8 Code : 013

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমণ্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫
অন লাইনে পাওয়া যাবে: www.rokomari.com, www.boi-mela.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

নদীসমর্পিত ০৯-১১৬

সমুদ্র নদীসমর্পিত
উত্তমর্ণ পূর্বসূরী
নৈতিকতার সমস্যা
নিপীড়িতের বজ্রনাদ
নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ
ভাষাপ্রতীক প্রসঙ্গ
সুন্দরের অন্বেষা
অমৃতস্য পুত্রাঃ
সাহিত্যের ক্রান্তিলগ্ন
কমিশার পদাভিলাষী যোগী
বিশ্বনাগরিক ইংরেজ
একুশে ফেব্রুয়ারী
দুই লোকের যাত্রী
মানপত্রের জবাবে
বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন
সাক্ষী নীরবতা
উপন্যাসের পরিচয়
ট্র্যাজেডির নায়ক
জনতার শক্তি
বিদ্রোহী রণক্লান্ত

ভাব ভাষা ভাবনা ১০৭-১৬৮
সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই ১৬৯-২১৬
মুসলিম মানসের রূপান্তর ২১৭-২৮৪
অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ ২৮৫-৩১২
মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা ৩১৩-৩৫৪

মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা
কালের দাপট একমাত্র শিক্ষাগুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্মী মিলিটারী ভজন
মগ্‌রেবের অক্তে শোনো উষার আজান
শেখের সম্বরা

মন্তব্য মৃগয়া ৩৫৫–৪৫০
অন্বেষা ঃ কল্যাণ
উজান গাঙের নাইয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গদী বুমেরাং যদি
স্বদেশ সংস্কৃতি সঙ্গমে
জন্মদিনে দেশবাসীর উদ্দেশে
একটি ভাষণ
যীশুখ্রীষ্ট শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে
রাষ্ট্রপতি সমীপে খোলা চিঠি
তারিখ পড়ে নিয়মিত সঙ্গে

নিঃসঙ্গ নির্মাণ ৪৫১–৫১৪
সত্তার সঙ্গে সংলাপ
মঞ্চের অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে
মাস্টার মশাই : সু কু চ
স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায়
ভাতের কাহিনী, ভাষার লড়াই
অভিধায় আত্মমগ্ন ব্যঞ্জনায় শরণার্থী
স্বাধীনতার সিগ্‌ন্যাল সাংস্কৃতিক পটভূমি
প্রজ্জ্বলিত নিমেষে নির্বাপিত

ইতিহাসে বিস্তারিত ৫১৫–৫৮৪
ইসলামী নবতরঙ্গ
মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদের সমস্যা
দাসত্বের খোঁয়ারি
ঝুটা চেতনার ফাঁদ
কোম্পানি আমল :
দফা দুই
স্বপ্নচারীর অন্তর্ধনি
গণতান্ত্রিক শিকড়ের অভাব
চৌ এন লাইয়ের নিকট খোলা চিঠি
রাজনৈতিক কার্বাঙ্কল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা ৫৮৫–৬৮০
প্রাগুষা
নীরব বক্তৃতা : ফারুক ইকবালের কবরের পাশে
খণ্ড অখণ্ড পাকিস্তান
বাংলাদেশ, মুজিব এবং মহাচীন
ভোর ভয়ি
ভোর ভয়ি
সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
জাতিপুঞ্জের জাঁতিকল
উলঙ্গরূপে সাম্রাজ্যবাদ
কালের চেতনা
আরো নিঃস্ব তৃতীয় বিশ্ব
মহাত্মা গান্ধী : বর্তমান বিশ্বে
অক্টোবর বিপ্লব : তৃতীয় বিশ্বে
জিন্দানখানার বাইরে
স্মৃতি-সমুদ্র
অতঃপর মাতৃভাষা বজ্রস্বর
কাঠামোর এক অংশ
অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা
ঈদের জামাত কেন জানাজার ভিড়
মাওলানা ভাসানীর নিকট খোলা চিঠি
পূর্ণ স্বাধীনতা : চূর্ণ স্বাধীনতা
আমি সালাম বলছি, আমি বরকত বলছি
শ্রান্ত দিগভ্রান্ত, তবু পান্থ ব্রতচারী

পরিশিষ্ট
ফারুক ইকবাল : রশীদ হায়দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্র নদীসমর্পিত

প্রবন্ধসমগ্র-২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৭৩
প্রকাশনায় : নবজীবন প্রকাশনী

উৎসর্গ

শিরহৃদশস্য অগ্রজ বয়স্য নাগরিক
আব্দুর রব এরফান আহমদ

সূচিপত্র

সমুদ্র নদীসমর্পিত
উত্তমর্ণ পূর্বসূরী
নৈতিকতার সমস্যা
নিপীড়িতের বজ্রনাদ
নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ
ভাষাপ্রতীক প্রসঙ্গ
সুন্দরের অন্বেষা
অমৃতস্য পুত্রাঃ
সাহিত্যের ক্রান্তিলগ্ন
কমিশার পদাভিলাষী যোগী
বিশ্বনাগরিক ইংরেজ
একুশে ফেব্রুয়ারী
দুই লোকের যাত্রী
মানপত্রের জবাবে
বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন
সাক্ষী নীরবতা
উপন্যাসের পরিচয়
ট্র্যাজেডির নায়ক
জনতার শক্তি
বিদ্রোহী রণক্লান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের নিবেদন

ধর্মীয় মুখোস-আঁটা পাকিস্তানি জালেমশাহীর শ্বাসরোধী আবহাওয়ার মধ্যে এই বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ রচিত। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং উত্তর-কালীন কয়েকটা লেখা সন্নিবেশ করা গেল। প্রায় আড়াই দশকের ব্যাপ্তি। আমার মত অগোছালো লোকের পক্ষে লেখা জমিয়ে রাখা কঠিন। সাংবাদিক-কথাশিল্পী জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীনের উৎসাহ এবং উস্কানিতে আবার খুঁজে পেতে সংগ্রহ। কালানুক্রমিক সাজাতে পারিনি। তবে শ্রদ্ধাস্পদ নজরুলের উপর রচনাটি স্বেচ্ছাকৃত শেষে দেওয়া। কারণ, বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বাঙালি মুসলমান সমাজে তিনিই একমাত্র রবি-শস্য এবং হেন ক্ষেত্রে শেষ কথা। অনেকেই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারীর উদারতায় এই বইয়ের সৌষ্ঠব অনেকখানি বেড়েছে। তাঁর প্রেসবিভাগের প্রধান জনাব আব্দুল হাই সেনাপতিদের মত 'ডবল' রাখেন। তাঁরা দুইজন এবং তাঁদের সহকর্মী কুল-জনাব আব্দুল হাফিজ ও আব্দুল হাকিম আমার বহু উৎপাত হাসিমুখে সময়ে-অসময়ে সহ্য করেছেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। বুক প্রমোশন প্রেসের লাইনোবিভাগের প্রধান দরদী স্পর্শক জনাব আব্দুর রশিদ হাওলাদার আরো দরদের সঙ্গে গোটা বইয়ের উপর মেহনৎ করেছেন। তাঁকে আমার অশেষ স্নেহাশিস। বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে ঋণে বেঁধেছেন জনাব লতিফুর রহমান।

সর্বজনাব বদিউজ্জামান চৌধুরী এবং আয়নুল হক আমার ধন্যবাদের উর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান বিধায় আর ও-পথে এগোইনি। হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ এবং বানান-প্রমাদ থেকে গেছে। যেমন ঔপন্যাসিক হয়েছে উপন্যাসিক। সেই জন্যে পাঠকদের কাছে আমি প্রভূত লজ্জাসহ ক্ষমাপ্রার্থী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্র নদীসমর্পিত

১

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে; তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোর সাগরদাঁড়ী করতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে— জননী জাহ্নবী।

এই সমাধিলিপিটুকু মাইকেলের কবিমানসকে বোঝার জন্য যথেষ্ট। ডান্টে ডিভাইন কমেডি মহাকাব্যে তাঁর গুরু ব্রুনেত্তো লাতিনীর প্রশস্তি গেয়েছেন। কারণ, তিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে জীবনকে অমরত্বের মর্যাদা দিতে হয়। প্রায় মৃত্যুশয্যা এবং দারিদ্রের নিপীড়ন-জাত হতাশার মধ্যে রচিত ওই কয়েকটি পংক্তি। কিন্তু নতি-সুর নেই কোথাও পুরুষকারের কণ্ঠে। মাইকেলের কাব্যের ধ্বন্যাঢ্য প্রাঞ্জল প্রবহমানতা ও ধ্রুপদী গাম্ভীর্য্য এখানেও অটুট, যদিও গীতিময়তার অন্তর্ফল্গু একই সঙ্গে বর্তমান। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কি সদম্ভ উচ্চারণ, মৃত্যুর সম্মুখে।

যুগের রথচক্রধ্বনি অবিশ্যি তার আবহ তৈরি করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

ইয়ং বেঙ্গল।

প্রতি যুগের জন্য তার নিজস্ব প্রতীক প্রয়োজন হয়। ইয়ং বেঙ্গল। মাত্র দু'টি শব্দ। অথচ কত সহজে তা উনিশ শতকের স্পিরিট বা মর্মশক্তির মুখোমুখি টেনে আনতে পারে। পলাশীর যুদ্ধের পর মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের জীবনযাপন এবং ভাবধারার মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটল যা দুই হাজার বছরে আর দেখা দেয়নি। নতুন প্রভু ইংরেজ শাসক-হিসেবেও নতুন। আর সকলকে শেষ পর্যন্ত এই দেশের মাটিই শুষে নিত। কিন্তু এই শাসকদের পলিমাটি আর গ্রাস করতে পারল না। কারণ তারা উন্নততর সভ্যতার অধিকারী। এই অভিঘাতে দেশের সনাতন ভিত্তিভূমি স্বতই ধ্বসে পড়ল। তার প্রথম চাক্ষুষ ছায়া দেখা যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। পূর্বে বাংলাদেশ ছিল রপ্তানীকারক দেশ। ইংরেজ আগমনের পর হোয়ে পড়ল আমদানীকারক এলাকা। প্রাচীন পণ্য-মুদ্রা-পণ্য অর্থনীতির জায়গায় দেখা দিল, মুদ্রা-পণ্য-মুদ্রা অর্থনীতি। পঞ্চাশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এই ব্যবস্থার সর্প-ফাঁস এমন ছড়িয়ে পড়ল যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই সংবাদপত্রে গহনা-সহ পলাতক স্ত্রীর খোঁজে এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দেন: কেউ যদি অলঙ্কারগুলোর খোঁজ দিতে পারে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। পলাতক স্ত্রী সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল ছিল না। নিছক ঘটনা নয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক সমাজে মুদ্রার ব্যবহার মানুষে মানুষে এমন বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজ-চালিত নতুন ব্যবস্থার ধাক্কায় মানবিক সম্পর্কের ছেদ সহজে ঘটতে থাকে। জীবনযাপনের ধারা যখন বদলায়, তখন চেতনার পক্ষে আর অনড় থাকা অসম্ভব। ভাবধারাও বিষম নাড়া খায়। সনাতন ধর্ম এখানে হিন্দু ধর্ম, আর সনাতন থাকতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন আদর্শ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা-জাত নৈতিকতার প্রশ্নের জবাব দিতেও অক্ষম আর নতুন কালের জিজ্ঞাসাও বড় নির্মম। যথা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এদেশে জীবনযাপনের মান উন্নয়ন কঠিন। ওই পথে কিছু ব্যভিচার আস্কারা পায়। কারণ, জন্মনিরোধ ঔষধ বেশ যৌন-স্বাধীনতা এনে দেয়। সমস্যা সহজ নয়। জীবনকে সোজা রেখায় সরলভাবে দেখার প্রবণতা যাদের আছে, তারা বোঝেই না, মানুষ এবং গোটা সমাজকে তলিয়ে দেখা ছাড়া সুস্থ জীবন গঠন অসম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর অস্থির সমাজে তেমনই নানা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সবই তার মানব-বাসভূমি থেকে ছিটকে পড়ার ফল। এমন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখ দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। পূর্বোক্ত অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে নতুন শ্রেণীরও অভ্যুদয় ঘটে। হুতোমের ভাষায়, কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগল। তবু নতুন মধ্যবিত্ত দেখা দিল, যাদের ধ্যান-ধারণা আলাদা। এমন ক্ষেত্রে দুই স্রোতই পাশাপাশি বহমান থাকে। ঐতিহ্যের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো অন্ধ আসক্তি, অন্যদিকে ঐতিহ্যের উচ্ছেদ। দুই-ই জীবনের পক্ষে মারাত্মক। কারণ জীবনচ্যুত। তাই শিকড়হীন। তবু এই দ্বন্দ্বের পীড়ন সহজে প্রশমিত হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতের ফলে যেমন মধ্যবিত্ত তেমনই ইন্‌ডিভিজুয়ালিজম বা ব্যক্তিতান্ত্রিকতার জন্ম। চারুশিল্পে রোমান্টিসিজমের সমান্তরাল এই চেতনার রূপ নির্ণয় করা হয়। সেখানে অনুভূতির পশ্চাদ্ধাবনই জীবনের পরাকাষ্ঠা। "যা প্রচলিত, তার বিপরীত পথে চলাই সঠিকতার হদিস।" রুশোর এমিলের প্রতিধ্বনি এদেশেও শোনা যায়। ব্যক্তিতান্ত্রিক সংবেদনের অখণ্ড প্রভুত্বে বিশ্বাসী। সনাতন সমাজের গোড়ায় তখন টান পড়তে বাধ্য। সতীদাহ প্রথারোধ, বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার পূর্বোক্ত স্পিরিটের পরিণতি। আর রামমোহন ত ধর্মীয় সদগুণের সঙ্গে অর্থনৈতিক সদগুণের গাঁটছড়া বাঁধেন, নিজে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মকে অঙ্গে বিষ-ব্রণ বলে উড়িয়ে দিলেও, তা নতুন ধর্ম, তদানীন্তন কালের উপযোগিতায় বিকশিত একথা অনস্বীকার্য। সবই কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিকতার অবদান। আর যেহেতু রোমান্টিক আবেগকেই গুরুরূপে গণ্য করে, প্রাথমিক যুগে নানা বাধার সম্মুখীন হওয়ার ফলে, যা কিছু ভয়ঙ্কর, ভীষণ, চঞ্চল— তারি মধ্যে তাদের অনুভূতিগত নিরাপত্তা নিহিত, এমন বোধ হয়। এই সঙ্গে স্মরণীয়, বিদেশী ভাবধারার স্পর্শ। সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার বিকাশের ক্ষেত্র কোথায় বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে? নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ প্রবণতা তাই বিভিন্ন দিকেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রাচীনের জের অত সহজে যায় না। ইংরেজ আমলে মোগল-পাঠান আমলের বহু পুরাতন বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা ক্রমশঃ হোয়ে পড়ল কেন্দ্রীভূত। জেলের জড়ানো জাল যখন ভাঙার দিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হোতে থাকে তখন মাছের যে-দশা হয়— কিলবিলানি, গুঁতোগুঁতি, প্রাণরক্ষী দৌড়— এখানে তাই ঘটল। এই প্রক্রিয়ায় ধ্বংস-উন্মুখ গ্রামীণ সমাজের সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। পূর্বে মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যের পটভূমি ছিল বৃহত্তর জনজীবন। লৌকিক গান ইত্যাদির পরিধি তেমনই। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা নগরমুখী। তাই একদিন দেখা যায়, আপন বাসভূমি-পরিত্যাগে বাধ্য, পেশাচ্যুত কামার-কুমোরের মত সংস্কৃতিও শহরের দিকে ধাওয়া করে। তখন কলকাতাই ছিল বাংলার একমাত্র প্রধান নগর। তাই এই শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘিরে হাফ-আখড়াই ঠাটে গান, ভাঁড়নাচ ইত্যাদি গেঁজে ওঠে। যেহেতু প্রাণকেন্দ্রচ্যুত তার মধ্যে আর সুস্থতা থাকে না। অনেক সময় সাহিত্য-চারুকলা, আর সংবেদনকে এগিয়ে দেয় না, নতুন জীবনকে গ্রহণের প্রেরণা যোগায় না। বরং অবনতি ঘটে মানসিক শক্তির। তেমনই দেখা যায়, ঐকালে গ্রাম্য মধ্যবিত্তরচিত দোভাষী পুঁথিগুলো। হয়ত দু-একজন ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু এই সাহিত্য আর নবযুগের দোসর নয়, বরং অতীতমুখী; মৃত্যুবোধ উদ্দীপনার উৎকৃষ্ট সালসা। বিংশ শতাব্দীতে মিয়া আর বাবু সম্প্রদায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সাহিত্যের দরদী হোয়ে পড়েন, তার হেতু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেম নয়। জাতীয়তার প্রসারণের ক্ষেত্রের সর্বত্র তা-ই ঘটে : বাছ-বিচারহীন অতীতের তপস্যা। আর জনশক্তির সাহায্য ছাড়া কারো পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। তাই ছলনা হোক, ভণ্ডামি হোক, যে-কোন উপায়ে তার আবহ তৈরী করতে হয়। অথচ সেই সময়কার নিছক লোক-সাহিত্য তখনও অত পচন-দুষ্ট নয়। কারণ, তার ভিত্তিভূমি গ্রাম অর্থনৈতিকভাবে ভাঙলেও, প্রাণশক্তির দিক একেবারে ধ্বংস হয়নি। লালন এবং অন্যান্য বাউলেরা যার উজ্জ্বল নজীর। প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েও কী মানবিকতায় না তাঁরা ভাস্বর।

এই সঙ্গে এদেশে ইংরেজদের দ্বৈতভূমিকাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শেলীর কালবৈশাখীর মত ইংরেজ একই সময়ে ধ্বংস এবং সৃষ্টির হোতা। পুরাতন সভ্যতার বনিয়াদ উৎপাটন করছিল বিদেশী শাসক। যুগপৎ তারা সৃষ্টি করছিল নতুন সমাজব্যবস্থা এবং শ্রেণী—যারা তাদেরই একদিন উচ্ছেদ করবে। দ্বৈতাদ্বৈত মজার সমাজ-বিবর্তন। ফলে কিছুই সেখানে স্বাভাবিক ধারায় চলে না। যুগপৎ অগ্রগতি এবং পিছুটান দু'ই এখানে সত্য। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সমাপ্ত। কিন্তু এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা ইংরেজরা নতুন এজেন্ট সৃষ্টি করল যেন শিল্পের দিকে তাদের নজর না যায়, বরং জমিদার অভিজাত সেজে বসে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতার আশীর্বাদ ততটুকুই এদেশে পৌঁছায়, যতটুকু শাসক হিসেবে ইংরেজদের অনুকূল। তাই দেখা যায়, উপনিবেশে পশ্চাৎপদতার ধারক ও বাহক প্রতিষ্ঠান-রক্ষণে ইংরেজ সমান উৎসাহী। রাণী ভিক্টোরিয়ার সনদ উদারতার ভান মাত্র। সার্বজনীন আদর্শের আড়ালেও স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব। মহামতি ব্লেক স্মরণীয় :

.. A truth that is told
With bad intent
Beats all the lies
You can invent

উপনিবেশের নাগরিকদের ভূমিকায়ও দ্বৈততা স্পষ্ট। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোয় সে যতখানি উদ্দীপ্ত, তার মুখ আবার ততখানি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। কারণ, পরাধীনতার ফলে স্বদেশে প্রবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা শাসকদের আশীর্বাদও কিছু পেতে পারে জীবিকা মারফত কি অন্য অর্থনৈতিক সুযোগ দ্বারা। এমন পেন্ডুলামের মধ্যে স্থিতির আশা নিরর্থক। অগ্রগতির মধ্যে পশ্চাৎপদতা, পশ্চাৎপদতার মধ্যে অগ্রগতি। জটিল এক সমাজবন্ধন। এমন মানসকূটের কাছে প্রায় গোটা উনবিংশ শতাব্দী বন্ধক ছিল।

৩

মধুসূদনের কালের এই সংক্ষিপ্ত হদিসটুকু মনে রাখলে, তাঁর মানস-আকৃতি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি-কৃতি বোঝার পক্ষে কিছু সহজ হোতে পারে।

বৃটিশ আমলে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত আবার বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। ঐতিহাসিক কারণেই এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিছু অগ্রগামী ভূমিকা নিহিত ছিল। ব্যক্তিতান্ত্রিকতার অভ্যুদয় একদম বৃথা যায়নি। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে শুধু সমাজ-কাঠামো ধ্বংস হয় না, তার মানসিক সৌধও চুরমার হোয়ে যায়, ভিৎ নড়তে বাধ্য। তখন প্রয়োজন হয় চেতনার নব প্রকরণ, নতুন আধার। যদিও ইংরেজ শাসনের মধ্যে, তবু এই নয়া শ্রেণী এক দিকে বিপ্লবী। ব্যক্তিতান্ত্রিক সে। রুশোর মানসপুত্রের মত তাদের চীৎকার শোনা যায় : L' homme est ne libre, et partout il est dans les fers. Man is born free and everywhere he is in chains.

মানুষ জন্মে স্বাধীন কিন্তু সর্বত্র নিগড়ে বাঁধা।

মাইকেল মধুসূদন তাদেরই কণ্ঠস্বর। প্রথম সফল কণ্ঠস্বর। মেঘনাবধ গ্রন্থে যে স্বর্গ-মর্ত-নরক আলোড়নের চিত্র মেলে তা পূর্বোক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তহীন প্রসারণ-কামী দিব্য-দৃষ্টির কাব্যিক প্রকাশ, যেমন চিন্তায় তেমনই আঙ্গিকে অভিনব। মাইকেলের পূর্বে বিদ্যাসাগর গণতান্ত্রিক কথ্য ভাষার চাল প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর বিতর্কমূলক রচনা এবং সংক্ষিপ্ত আত্মচরিতে এমন গদ্যের সাক্ষাৎ মেলে। মধুসূদন কাব্যের ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করলেন একই পন্থায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কথ্য ভাষার চালেরই কাব্যিক অনুসরণ যেখানে কবি কণ্ঠযতি এবং ছন্দযতির সমতা রক্ষার দায়মুক্ত ব্যক্তিতান্ত্রিক অনুভূতির উচ্ছলতার তপস্যা-মত্ত। তার ছন্দও ভাবের অনুগামী। এইরূপে নতুন সমাজ তার টেকনিক প্রবর্তন করে। মধুসূদন যেন অসম্ভবের কারিগর। বিশেষ্যের ক্রিয়ারূপ, বিশেষণকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার, কোথাও মিলের জন্যে শব্দের ঈষৎ অদলবদল— অনেকের কাছে ভূত নৃত্য মনে হোয়েছিল। আসলে জাগ্রত ওই শ্রেণীর সম্মুখে তখন বিশাল জগতের হাতছানি ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে চিরাচরিতকে এই উপহাস তাদের কবির পক্ষেই শোভা পায়। এই শ্রেণী ডিসপেপসিয়া রোগীর কুস্তিগীর হওয়ার খোয়াব দেখে না, স্বয়ং বীরধর্ম পালন করে সমাজ-রঙ্গমঞ্চে। মেঘনাদবধে তাই বীর রসের প্রচেষ্টা দেখা যায়। মধুসূদনের মতেও বীররস রস-কুলপতি। দৃষ্টিভঙ্গীর তোড়ে কাব্যের উপাদান পর্যন্ত আর এক নবতর মাত্রা পায়। নতুন শ্রেণী নিজের ইমেজে, ঈশ্বরের মতই, জগৎ গঠনের প্রয়াসী। সরস্বতী দেবীকে কবি জিজ্ঞাসা করেন—

. . . . কি কাজে মাটির দেহ, তবে
সনাতনে?

আর মিল্টন যেমন অজানিতে শয়তানের দলে ভিড়ে যান, মধুসূদনও রাবণের হাতে হাত মেলান। এমন কী কুলোর মত নখ প্রাবাদিক শূর্পণখা পর্যন্ত সুন্দরী হোয়ে ওঠে আর পত্র লেখে লক্ষ্মণ-ভজনায়। মিল্টন ডান্টের প্রতি মাইকেলের ভক্তি কাব্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাবে যা-ই হোক আরো বেশী মানসিক একাত্মতায়। ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের পরাজয় ঘটে। আবার ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ সিংহাসন দখল করে। মানবপ্রেমিক তপস্বী মিল্টনকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পিউরিটান বিপ্লব পরাজিত, কিন্তু মহত্বে রঞ্জিত। 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যে বিদ্রোহী শয়তানও পর্যুদস্ত, কিন্তু মহান চরিত্র। মাইকেলের রাবণ পরাজিত হোয়েও মহত্বের ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান। ডান্টে সারা জীবন নির্বাসিত ছিলেন দেশ থেকে রাজনৈতিক অপরাধে। মধুসূদন স্বদেশে প্রবাসী যেহেতু পরাধীন। ইউরোপীয় ব্যক্তিতান্ত্রিকের দুর্মর বিপ্লবী রূপ উপনিবেশে সম্ভব নয়। মাইকেলের এখানে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই রেশে এপিক হয় তাঁরই ভাষায় 'এপিকলিং'। মহাকাব্যের গঠনের অন্তরালে গীতিময়তা শেষে প্রাধান্য লাভ করে। চরিত্রগত দ্বন্দ্ব খুবই স্বল্প; নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারেই ঈষৎ অনুসরণ-হীন ঝলকে সমাপ্ত।

পূর্বেই উল্লেখিত এই স্ববিরোধের কারণ সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। ব্যক্তিতান্ত্রিকের চৈতন্যপীড়াও স্বাভাবিক। বেদ্যমানতা বা সেন্সিবিলিটিকে সর্বেশ্বর মানলে তা বুমেরাং হোয়ে পড়ে। ব্যক্তিতান্ত্রিক তাই তার আরাধ্যকে হনন করে। ইউরোপে দেখা যায় 'লেসে ফেয়ার' বা অবাধ বাণিজ্য-নীতি শেষে একচেটিয়া মনোপলিতে পরিণত হয়। স্বদেশপ্রেম রূপ পায় সাম্রাজ্যবাদে, অপরের দেশ লুণ্ঠনে। সামাজিক স্ববিরোধিতা মধুসূদনকেও দ্বৈততার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। মেঘনাদবধ কাব্য ব্যক্তির মুক্তিকাহিনী। কিন্তু একই সঙ্গে এক দেশের শোক-দুঃখ পরাধীনতার উপাখ্যান। সীতার মুক্তিকাহিনী, লঙ্কার পরাধীনতার কাহিনী, একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কারণ, মধুসূদনের জগতেও সেই স্ববিরোধ বিদ্যমান। যে ইউরোপ তাঁকে মানসিক মুক্তি দিচ্ছে সেই ইউরোপই আবার তাকে গোলাম রূপে শিকল দিয়ে বাঁধছে। এই অসংগতির নিরাকরণ অচেতনভাবেই হয়ত মাইকেল অপ্রাকৃতের উপর সোপর্দ্দ করতে চেয়েছেন। তাই বার বার শোনা যায়: "প্রাক্তনের গতি কে রোধিতে পারে?"

ট্র্যাজিক পরিস্থিতি কবির পক্ষে।

তাই বিচিত্র কিছু নয়, তিনিই এদেশে সংস্কৃত নাটকের আওতামুক্ত আমাদের প্রথম ট্র্যাজিক নাট্যকার।

পরিবেশের এমন নিষ্ঠুর দাপট সত্বেও মাইকেলের সাধনার স্রোত কত দূরগামী হয়, আজও তা সহজে অনুভব করা যায়। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন পাশ্চাত্যের সংস্পর্শেই শুরু হোয়েছিল। কিন্তু তার সার্থক কাব্যিক প্রকাশের কারিগরও মাইকল মধুসূদন। বহু কথিত, তবু বলতে হয়, এদেশে মাতা কন্যা ভগ্নী পত্নী এমনকি উপপত্নী হিসাবে নারীর সম্মান ছিল। কিন্তু ব্যক্তিরূপে নয়। এই স্বাধিকারের বাণীদাতা মাইকেল। কুলীনদের বহু বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচারের পাশাপাশি মেয়েদের মর্যাদাহানি উনিশ শতকে কী পরিমাণে ঘটেছিল, তা একবার কালীঘাটের পটের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বিরাট জংঘা, বিপুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তন— মূর্তিমতী শৃঙ্গার ব্যতীত নারীর যেন আর কোন ভূমিকা নেই। সেই জায়গায় মাইকেল আপ্ত-রমণীদের খাড়া করেন স্বরূপে, বিবাহের বাইরেও যাদের প্রেম স্বীকৃতি পায়। বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্র অবিশ্যি পৌরাণিক। কিন্তু ধর্মের আবরণের তলায় কি পার্থিব চরিত্র লুকানো, কাব্যপিপাসুদের তা উপলব্ধি করতে বিলম্ব ঘটে না। এই সঙ্গে লক্ষণীয়, এমন নারী চরিত্র বিকাশের জড়ীয় ভিত্তি বা ম্যাটেরিয়াল বেসিস পূর্বে এদেশে থাকার কথা নয়। এক কালে ক্রুশেডের যুদ্ধের ফলে প্রাচ্যের সংস্পর্শে ইউরোপ তোয়ালে এবং সাবানের ব্যবহার শেখে। কালচক্রে প্রাচ্য আবার পরিচ্ছন্নতা ও উন্নততর সভ্যতার জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ। নিছক বেড-রুম ইউরোপ থেকেই আসে। দরিদ্র দেশে ড্রইংরুম, বেড-রুমের ফারাকের বিলাস থাকেত পারে না। উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থা, জড়সামগ্রীর প্রাচুর্য এবং শ্রমবিভাগের ফলে জীবনযাপনের ধারায় তার ছাপ পড়ে। শ্রমবিভাগের সঙ্গে প্রেমের প্রক্রিয়ায়ও বিভাগ দেখা যায়। আধুনিককালে বেড-রুমই বাগান-বাড়ী হোয়ে ওঠে। ব্যক্তিতান্ত্রিক দেহের সঙ্গে আবেগের তীব্র অনুপাত যোগ করে। প্রেমের রূপান্তর ঘটে। প্রেম আর 'কামগন্ধ নাহি তায়' নয়। মাইকেল আহারে-বিহারে ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। পশ্চাত্যের সংস্পর্শে এদেশেও নতুন শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ে বেড-রুমের জড়ীয় ভিত্তি তৈরী হয়। মাইকেলের পক্ষে তাই সম্ভব হোয়েছিল অমন নারী-চরিত্রের উপস্থাপনা। প্রমীলা এই যুগের মেয়ে যদিও পৌরাণিক ভস্ম-আচ্ছাদিত। আর তার পাশাপাশি নায়ক ইন্দ্রজিৎ ব্যক্তিতান্ত্রিকের মানসপুত্র, দেবতার ষড়যন্ত্রের সম্মুখেও যে বরাভয়। ইউরোপ রেনেসাঁর কাল থেকে স্বর্গকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। তার প্রচেষ্টা নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও এদেশে শুরু হয়। মাইকেল মাসিক তিন হাজার টাকা বরাদ্দ ব্যয়ের ঘোষণা খামখা করেননি। খামখা লেখেননি :

'অধর অমৃত পাশে ভুলিল অমৃত।'

এই পর্যায়ে দেবতা অথবা দেবতার অবতার-রূপী নর রাম লক্ষ্মণ ইত্যাদি মেঘনাদবধ কাব্যে এত ম্লান—কোথাও কোথাও হীনচরিত্র ষড়যন্ত্রকারী বিশেষ। জাগ্রত মর্মশক্তি মানুষের কাছে অপ্রকৃত এমনই মার খায়। ইংরেজ কবি পোপ সমান দ্যোতনায় আকাশকে চাঁদোয়া এবং পৃথিবীকে তাঁর পা-দানি বানিয়ে তোলেন। আর বহু পরের কথা তবু একই বীরধর্মের অন্য জয়গাথা, নজরুল আরশ ছেদনের আস্পর্ধা দেখান।

এত দম্ভ! বাধা-উল্লঙ্ঘনে এত বিক্রম এবং আস্পর্ধা। ভীষণের সঙ্গে কোলাকুলির জন্য অস্থির ব্যক্তিতান্ত্রিক। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান-প্রধান চিত্রকল্প লক্ষণীয়। প্রচণ্ড জলপ্রপাত, যোজনবিস্তৃত দাবাগ্নি, তুমুল ঝঞ্ঝা, অকূল সমুদ্র, উপত্যকা-পথে ধাবমান ধূসর ঐরাবত-যূথ ইত্যাদি। সবই বিক্রম ও অস্থিরতার প্রতীক। ফ্রয়েডের ভাষায় বলা যায় বাধাবন্ধহারা 'ইড'। আশ্রয় সন্ধান তৎপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকের জাগরণ-বন্যার হোতাগণ নিজেদের ইমেজেই তাদের কাব্যের ইমেজ খোঁজেন। সমাজমঞ্চে প্রধান অভিনেতা তারা। মাইকেলের কবিতায় যে নাটকীয়তা পাওয়া যায়— তার হদিসও এইখানে নিহিত।

কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিকের চৈতন্য তাও উপনিবেশের ব্যক্তিতান্ত্রিক, আবার আশাহত যন্ত্রণায় পীড়িত না হোয়ে পারে না। মেঘনাদবধে করুণ রসের এত বিস্তার অস্বাভাবিক কিছু নয়। সীতা-সরমা পর্ব বাদ দিলেও রাবণের মত বীরও পুত্র শোকে অতিমাত্রায় মুহ্যমান। মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' তাঁর ব্যক্তিগত রোগ-দারিদ্র-জাত চিত্তের উচ্চারণ নয়, তা সীমাবদ্ধতা-সচেতন এক যুগের আর্তনাদ—

নিশার স্বপন সুখে যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।

রবীন্দ্রনাথ যে যৌবনে মেঘনাদবধের কড়া সমালোচনা করেছিলেন, তা অযৌক্তিক নয়। এই বাদানুবাদ, শিয়া-সুন্নীর মত একই ধর্মের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ। উভয়েই ব্যক্তিতান্ত্রিক। কিন্তু কালের ব্যবধানে ভিন্ন রং। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মেঘনাদবধের প্রকাশ একই বৎসরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। বিকাশের যুগে মর্মশক্তি বা স্পিরিটের যে আস্পর্ধামুখর প্রচণ্ডতা থাকে পরবর্তী যুগে তা স্বতঃই ক্ষীণ হোয়ে আসে। বিদ্যাসাগরের পরেই বিবেকানন্দের জন্ম হয়। একজন বিপ্লবী সংস্কারক, অন্য জন তারই রেশ-রক্ষী মাত্র। তাই মাইকেল বীর-রস আর রবীন্দ্রনাথ শান্ত রসের কবি। (নবীন সেন 'কুরুক্ষেত্র' দিয়ে শুরু আর 'অমিতাভ' দিয়ে শেষ করেন)। আর ইংরেজের সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা বহুদিন অটুট ছিল। অধিক বয়সেও তিনি মনে করেছেন, ছোট লোক ইংরেজ দিয়ে দেশ শাসিত, তাই দেশের অমন দুর্গতি। বহুদিন তিনি এই প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি পাননি। এই সভ্যতার সঙ্কট এবং নগ্নরূপ দেখে মৃত্যুর পূর্বে তীব্র ঘৃণা ও অভিশাপ হেনে যান। বৃহত্তর সমাজজীবনে চেতনার প্রসারণ না ঘটলে, চারুশিল্পের সার্থকতা কোথায়? অস্তিত্বের যন্ত্রণা সকল কবিকেই ভোগ করতে হয়। ব্যক্তিতান্ত্রিককে চৈতন্য-পীড়া তাই আরো স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-চিত্তের ভ্রমণ-পঞ্জীর সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন চৈতন্যপীড়ার হাত থেকে মুক্তির জন্য এই মহাপুরুষ কত দিগ্বিদিগ না ছুটে বেড়িয়েছেন। তাঁর আত্মার অভিযান-কাহিনী হীনচেতা কারো পক্ষে হৃদয়ঙ্গম অসম্ভব। মধুসূদনের অকাল-মৃত্যু তাঁকে নিস্কৃতি দিয়েছিল। অনেকের ধারণা, অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই কবি-জীবনের আশু পরিসমাপ্তি। তারা জানে না, মর্মশক্তির আঘাত দেহে মনে কী দাবদাহ সৃষ্টি করে। এক যুগের শ্রেষ্ঠ চেতন-কারিগরের জীবন যদি মর্মান্তিক কিছু হয়, তা বিচিত্র কিছু নয়।

স্ববিরোধ প্রতিভার সঙ্গেই শোভা পায়। কারণ, জীবনের অনেকান্ত আকর্ষণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার অদম্য বাসনা। মধুসূদনের যুগ নানা স্ববিরোধে জড়িত, যুগকে তিনি সব সময় এড়িয়ে যেতে পারেননি। রাবণের প্রতি মাইকেলের পক্ষপাত সর্বজনবিদিত। সনেটের প্রবর্তক, কিন্তু সীতা-নামক সনেটে রাবণ আবার মূঢ় রাক্ষস। যিনি ধ্রুপদী কবি, লোকজ চেতনার নব রূপায়ণের মূলেও তাঁর আশ্চর্য উপস্থিতি। আবার জাতীয়তার ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক নন—

আমরা, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে—
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে?
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে?

বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরে কে কবে আমারে?

এখানে মাইকেল ঈশ্বর গুপ্ত নন, বরং সার্বজনীন মানবতার কণ্ঠস্বর— যেখানে বিদেশে ঠাকুর আছে আবার স্বদেশেও কুকুর থাকিতে পারে। মধুসূদনের যুগল প্রহসন মানবিকতা এবং কল্যাণবাসনার নিদর্শন। তাই উগ্র নব্য এবং চরম প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তিনি সমান শ্লেষ নিক্ষেপ করেন। অন্ধস্বাদেশিকতা মাইকেলে অনুপস্থিত। একই নিঃশ্বাসে তিনি আন্তর্জাতিকতার সুধাপিয়াসী, আবার স্বাজাত্যের স্মৃতিচর। ডান্টে মিল্টন ভিক্টর হ্যুগোর পাশাপাশি কবি কঙ্কন কৃত্তিবাস জয়দেব কালিদাসের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। বাল্মিকী ত কবিগুরু। মাইকেল নিজেই ছিলেন কবিগুরু। এই স্বয়ং-প্রস্তাব, অটোসাজেশন, বোধ হয়, স্বতঃই উচ্চারিত। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ এবং বিদ্বান হিসেবেও তিনি কাব্য-সাধনার আদর্শ। কালিদাসের মূর্খতার প্রাবাদিক কাহিনীর অন্ততঃ (উষ্ট্র উট্রের পাশে পৃথিবী পৃথিবীর এতদিন দফন হওয়া উচিত)। নাগরিক সভ্যতার প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন। কিন্তু সর্বত্র দেশপ্রেমিকের কি অনুরাগসিক্ত দৃষ্টি। গ্রাম বাদ যায় না। নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষ তলে শিব মন্দির, বটবৃক্ষ, বাল্যকালের লীলানন্দ কবতাক্ষ, বউ কথা কউ পাখী— প্রকৃতি, ভাবরাজ্য সর্বত্র তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর কবি-মানসের ব্যাপ্তি স্বাদেশিকতায় এমন আচ্ছন্ন বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ তিনিই আবার হালেচালে সাহেব। নিরাভরণ ডিয়ার ভিডের পাশাপাশি কন্টিনেন্টাল জেন্টেলম্যান। সাহেব না-হওয়ার আরো দুঃখ মাইকেলের ছিল।

৪

প্যারিস শহর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়।

সন্ধ্যা বিগত। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সীয়েন নদীর পাড় বয়ে এক ব্যক্তি সন্তর্পণে হাঁটছেন। দাড়ী-শোভিত কৃষ্ণমূর্তি দেখলেই বোঝা যায়, বিদেশী প্রাচ্যবাসী। মুখে ত্রস্ততার ছায়া।

ফরাসী পুলিসের চোখে পড়ল। কয়েক দিন ধরে এই ব্যক্তি অন্ধকারে গা-ঢাকা, এমন ভাবেই হাঁটেন। গতিবিধি সন্দেহজনক।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নানা সাহেব পলাতক। গুজব তিনি ইউরোপ চলে গেছেন। তাই হাদিসের জন্য ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ।

ফরাসী পুলিশ বিদেশীর এমন সন্তর্পিত গতিবিধি দেখে একদিন নদীর ধার থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসাবাদ।

পুলিস অফিসার প্রশ্ন করে, "আপনি কি নানা সাহেব?"

বিদেশী হেসে উঠলেন। মাথা দোলান। হাঁ-না বোঝা যায় না!

পুলিসের সন্দেহ আরো জেঁকে বসে। তাই আবার জিজ্ঞাসা, "আপনি কি নানা সাহেব?"

এবার বিদেশী জবাব দিলেন, "আমি একজন দরিদ্র বাঙালী কবি মাত্র : দেনার দায়ে দিনের বেলা রাস্তায় বেরুতে পারিনে। আপনারা কাকে চান? বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক নানা সাহেবকে?"

পুলিস অফিসারের জবাব, "হ্যাঁ।"

পুনরুক্তিসহ মাইকেল জবাব দেন "না, সেই সাহেব হওয়ার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি।"

AMARBOI.COM

উত্তমর্ণ পূর্বসূরী

হেগেল তাঁর দর্শনরাজ্যে কাব্য এবং পরাবিদ্যার মাঝামাঝি ধর্মের ঠাঁই নির্দেশ করেছিলেন। একই উৎপত্তি-স্থল, কিন্তু বহির্প্রকাশে স্বতন্ত্র— ওই ত্রয়ী প্রত্যয় একক লক্ষ্যে এ্যাব্‌সল্যুট বা পরমের প্রতিভাস। তাই ভাস্কর্য্য সঙ্গীত এবং কাব্যের মধ্যে কাব্য শ্রেষ্ঠ শিরোপা পেলেও হেগেল সঙ্গে সঙ্গে এই নান্দনিক সুষমার অন্তকৃত্যের ব্যবস্থা করেন। নিজস্ব দর্শন-বিন্যাসের সম্মান-রক্ষার্থে কাব্যের ব্যাপারে হেগেলের এই জল্লাদ-লীলা অবধারিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যাকাশে ধর্মের আসন বহুব্যাপ্ত। কিন্ত হেগেল এবং বৈষ্ণব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিদের তিনি উল্টে নিয়েছিলেন, যেখানে কাব্য সাধন এবং ধর্ম বাহন মাত্র। সাযূজ্যলোভী বৈহাসিকতার পথ রবীন্দ্রনাথকে কোনদিন আকর্ষণ করতে পারেনি :

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় ভক্তিগীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ।

ধর্ম এবং কাব্য উভয়ই অধ্যাসের জগত। কিন্তু তা জড়-ভিত্তিহীন নয়। বস্তুবিশ্বের আপাতত এবং অদৃশ্য তরঙ্গোচ্ছলতার সমাহারে না সমাজজগত গড়ে ওঠে। কাব্য বা ধর্ম উভয় জগতে মানস-বুদ্বুদ প্রতীকপ্রতিবিম্বের আকারে বিচ্ছুরিত হয়। হয়ত তা কোথাও ইচ্ছার ছদ্মবেশ, কোথাও মগ্ন যৌথচৈতন্য। অবিশ্যি কবির অধ্যাস স্নায়ুরোগীর অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-অনুষঙ্গ নয়। তার ভিত্তি বস্তুবিশ্বের স্তরায়িত ছড়ে ছড়ে বিকীর্ণ সুরজালের মত ইতঃক্ষিপ্ত। সমগ্র মানবেতিহাস প্লেটের ধ্রুপদী গুহা-ছায়ার কায়দায় ছাপ ফেলে ফেলে এগোয় প্রয়োজন-শেষ গুহাপ্রাচীর ধ্বংসের পর্যায়ক্রমে।

মাঝে মাঝে সাময়িক আচ্ছন্নতা সত্ত্বেও অমন ধ্বংসাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের খুব বিলম্ব ঘটেনি। কারণ, বাস্তবের প্রচ্ছন্ন প্রতিমূর্তি সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টি। কবিগুরুর কোন কোন সমালোচক জীবন-দেবতার মধ্যে নানা আধি-দৈবিক ধূম্রজাল আবিষ্কার করেন। খামখা।

প্রতীচ্য চিত্ত এবং বিত্তাগ্ন কর্তৃক গ্রামজ সভ্যতার দাহনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর জন্মের পূর্বেই এদেশে ইউরোপীয় ইতিহাসের সমান্তরাল-প্রচ্ছায় রিফর্মেশনের ধ্বস নেমেছিল। সাহিত্যের কারিগর আপন ভূমিকা-ধর্মেই মনুষ্যত্বেরও মুখোস-অভিনেতা। ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ডমুর-বাদ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়জ পরিবর্তন সংবেদনের ক্ষেত্রে বৃথা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবি-চিত্তে বিচিত্র ধারায় তার প্রবাহ সঙ্গলাভ করে।

একই সময়ে নবজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের স্ববিরোধ সম্পর্কেও তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। কারণ, কোন এক ব্যক্তিকে নিয়েই ত জগৎ নয়। আরো ব্যক্তি আছে, যাদের সমষ্টিগত ফলই সমাজ। তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের লজিকাল পরিণাম : একের বিকাশ অপরের বিনষ্টি। সচেতন শিল্পীর মত রবীন্দ্রনাথ এই মানস-দ্বৈরথে সৈনিক সাজেন। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' কাব্য থেকে আমৃত্যু তাঁর রচনায় এই সাক্ষ্য মেলে। রোমান্টিসিজম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের অন্যতম মুখ। তার প্রকাশ তরবেতর। কোথাও নারীত্রাণ, কোথাও পল্লীসংস্কার ধর্মসংস্কার, কখনও আশ্রম-গঠন অথবা থরো-ওয়ালডেনের মত প্রকৃতির বুকে পলায়ন। জাতীয়তাবাদে এই মানসিকতার চরম পরিপুষ্ট রূপে চোখে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোতে অবগাহন-নির্মল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা সর্বদাই স্ববিরোধের দিকে সজাগ দৃষ্টি। তাই বিশেষ কোন মানস-আবর্তে তাঁর সাধনার নৌকাডুবি ঘটেনি। অবিশ্যি হালের সাহায্যে টাল সামলাতে হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীর মত তিনি উপজ্ঞা ইনস্‌টিংক্‌ট এবং আবেগের স্বাধীনতা খুঁজেছেন এক যুগে। দেশবাসির কাছে অশ্লীলতাবাদী কবি হিসেবে নিন্দাবাদ কুড়িয়েছেন। 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশের কালে। সেই সময়েও তিনি আবার চুম্বন-মদিরায় অতিষ্ঠ, যেখানে কুসুম-কারাগারের বায়ু পর্য্যন্ত শ্বাসরোধী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের আবেগ-নৈরাজ্যে নিমর্জিত কবিমাত্রেই অন্যান্য উপজ্ঞাসহ প্রেমের দ্বৈত-তিক্ত মরুরাজ্যে আর্তনাদ ছড়িয়েছে। তার একাধিক নজীর আছে। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস সহজভাবেই স্পষ্টবাদী :

মৃত্যুময় এ জীবন সহিতে না পারি
রমণী আমার শত্রু আমি শত্রু তারি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী আত্মপরিক্রমণের স্ববিরোধিতায় তাই আবার অধ্যাসে মীমাংসা খোঁজে। দৈনন্দিনতার কাছে সে আমল পায় না বিখণ্ডিত হওয়া ব্যতিরেকে। যেহেতু নায়িকা তারই মত ব্যক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মবৈরিতা একজিসটেনসিয়ালিষ্ট বা অস্তিত্ববাদী দর্শনের নবাবিষ্কার নয়, পুরাতন শরাবের বোতলিক নব আধেয়ন মাত্র। এই গতির লজিকেই চিত্রা-কাব্যে উপজ্ঞা-সর্বস্বতার নির্বাসন এবং স্বয়ম্ভু সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। এখানেও গোবিন্দদাস অন্যান্য কবি অপেক্ষা ঢের বেশী সোচ্চার :

কেবল পবিত্রতম তার সে-বিরহ মম
যজ্ঞীয় অনল সম প্রাণদাহকারী।
পুড়য়া হইতে ছাই আদরে নিয়েছি তাই
হেন প্রেম-উপহার ভুলিতে কি পারি?

অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীর নিকট দেহবিবর্জিত বিরহের অধ্যাসই প্রেমের পূর্ণতা। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের নায়িকার নহ-মতা-নহ-কন্যা-গোত্রীয় উর্বশীত্ব লাভ একই মানস-ব্রজনার পরিণতি। স্বরূপ-দর্শনের পর ডক্টর হাইডের আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকে না। যেহেতু সে আবার ডক্টর জেকিলও বটে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী আপন-সৃষ্ট বিরোধিতার ধাঁধায় নিঃসঙ্গ নাবিক। আহারের মত আত্মরূপী মবী ডিকের পশ্চাদ্ধাবন বর্জনে নিতান্তই অক্ষম, অসহায়।

অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথ কখনও মানস-কূটের শীকার ছিলেন না। কালের পরিধি-জ্ঞান তাঁর কাছে যেন অনায়াস-লভ্য, সহজাত ব্যাপার। যুগ্ম-অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্য-স্বীকারের পর সময়-ব্যাপ্তির ওজনে তার পরিমাপ— বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মহত্তম আবিষ্কার ত কাল-সচেতনতারই পরিচয়। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীর মানস-কূট-বিদার রবীন্দ্রনাথের আর এক অদ্রি-প্রাংশু মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, তখন তিনি যেন আত্মজালছিন্ন রক্ত-করবীর রাজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহর্নিশ চঞ্চল বস্তুবিশ্ব অধ্যাসের জন্মদাতা। কিন্তু নব অধ্যাসের জায়গায় হয়ত অতীত ছায়া জড়ের মত মনের উপর চেপে বসে থাকে। তাই ল্যাগ-থিয়োরীবাদীরা মনে করেন, তখন সমাজের মত শিল্পেরও মৃত্যু শুরু হয় অজ্ঞানতার ঝুটা জৌলুষে বা ক্লিশের প্রাদুর্ভাবে। মূঢ়ের গর্বে এই জাতীয় জিনিস। রবীন্দ্রনাথের কাল-চেতনতা মনের ক্ষেত্রে অপূর্ব বিস্ময়। নিজেই বলেছেন, "সংসারের ধর্ম হচ্ছে সে সরে যায়। অথচ একটা বয়সের পর যাদের মন আর কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, সংসারের ব্যবহার থেকে তাদের সরে থাকা উচিত— যেমন দূরে আছে ইলোরার গুহা, খণ্ডগিরির মূর্তি। যদি তারা পূর্ণতা দিয়ে থাকে তাদের মূল্য আছে, কিন্তু সে মূল্য আদর্শের মূল্য। আদর্শ স্থিরত্বে ঠেকেছে বলে তাকে দিয়ে পরিমাপের কাজ করি। জলের মধ্যে যদি কোথাও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বন্যার উচ্ছৃঙ্খলতা কতদূর উঠলো সেই পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সে পাহাড়ের কারবার নেই। তেমনই মানুষের কীর্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন প্রচলিত জীবনযাত্রার সঙ্গে অসংসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা অন্য কাজে না-হোক আদর্শ রচনার কাজে লাগে। এই আদর্শ নকল করায় না, শক্তির সঙ্গে বেগ সঞ্চার করে। মহামানব নিজেকেই বহুগুণিত করবার জন্যে নয়, প্রত্যেক মানুষকে তার আপন শক্তি-স্বাতন্ত্রের চরমতার দিকে অগ্রসর করবার জন্যে। পুরাতন কালের বৃদ্ধ যদি নিজেকে চিরকাল পুনরাবর্তিত করবে বলে পণ করে, তবে সে আবর্জনা সৃষ্টি করবে। অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ চিন্তার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়। ফলের বা ফুলের যখন মেয়াদ ফুরোয় তখন শাখার রসধারা তা-কে বর্জন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু যদি সে বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে তবে সেটা নিছক লোকসান।"

এই উপলব্ধি কখনও মহাকবির কাছ-ছাড়া হয়নি। দেখা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের স্ববিরোধ কণ্টকিত কল্প-সমাধান জীবন-দেবতা পরবর্তীকালে আর রবীন্দ্রনাথের কল্কি পায় না। জাতি-দেবতার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু নৈবেদ্য-কাব্যের জাতিদেবতা অল্পকালের মধ্যে নৈবেদ্য-বঞ্চিত হয়। বিদেশী শাসক-পীড়িত কবিচিত্ত বিশ্বদেবতার মধ্যে চেতনাপ্রসারের স্পর্শ পায়। এ যেন পরাধীনতার মাথুরে বৃন্দাবণী সারঙের পঞ্চম ঘোষণা। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে পরিণত হওয়ার মধ্যে পঞ্চলতার বন্দনা-বন্দী উপনিষদ-ভক্ত কবিমনের সদাজাগর পরিচয় মেলে। কবিকল্পিত নটরাজের দুই চরণে বিষয়-বিষয়ীর একাত্মতা যেন তাঁর নিজেরই প্রতিভাস।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কবি জেনেছিলেন, বৈশ্যযুগে পণ্যাঙ্গণই তীর্থাঙ্গন, যেখানে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ হয় কড়ির ওজনে। অথচ কৌতুকের ব্যাপার, ধনবিজ্ঞানে মূল্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে মানবিক আবেগের অনুপ্রবেশ এবং সমীকরণ ঘটেছিল বহু পূর্বে অর্থনীতিবিদ মার্শালের যুগে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে আবেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুষ্ক এবং ব্যক্তিত্ব গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায় প্রতিযোগিতা ও শোষণের অনেকান্ত আকর্ষণে। মুদ্রার মত ব্যক্তিমানব তখন সংখ্যা অথবা স্নায়ুসমষ্টি। আপাতত দৃশ্যমানতার নীচে আজীবন সত্তা- খনক— রিয়ালিটি ডিগার— রবীন্দ্রনাথের তা চোখ এড়ায়নি। উত্তর তিরিশ সনে রচিত তাঁর খাগছাড়া গল্পসল্প প্রভৃতি গ্রন্থের অদ্ভুত ভাষা এবং রস রসবেত্তাদের কাছে মনে হয়েছে প্রতিভার ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল। আসল হদিস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীর কাছে ব্যক্তিত্বের চূর্ণায়িত দশমিকতা সত্যিই করুণ ব্যাপার। ব্যক্তি তখন সহজাত উপজ্ঞার প্রাঙ্গণে মগ্নচৈতন্যের শীকার। স্বাভাবিক মানুষের ভাষা যেন সে হারিয়ে ফেলে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মানুষ আর মানুষ নয়, সমাজ-জগদ্দলের চাপে চূর্ণায়িত আবেগ-পরমাণু। হেন যুগে ব্যবহৃত শব্দ, প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায়, বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে এবং ব্যাঙ্গার্থ তখন অনুষঙ্গে অনুষঙ্গে যাযাবর-বৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু করতে অপারগ— যেন স্যুররিয়ালিষ্ট পেন্টিংয়ের চিত্রকল্প। র‍্যাঁবের বিখ্যাত উক্তি "আই হ্যাভ কাম টু হোল্ড্ দি ডিস্অর্ডার অফ মাইন্ড্ সেকরেড্" যেন তখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। একই সময় দেখা যায়, অর্থনীতির ক্ষেত্রে পণ্যান্তর বিকল্প তত্ত্ব বা 'থিয়োরী অফ ডিস্প্লেস্ড অল্টারনেটিভ'-এর আমদানী। পণ্য-মূল্য কীভাবে নিরূপিত হয়? একটি পণ্য-বস্তুতে ব্যবহৃত উপাদান দ্বারা অন্যান্য সম্ভাব্য যত প্রকার পণ্য তৈরী সম্ভব— তারি সঙ্গে তুলনায়। এ যেন আর্ট-ফর-আর্টস সেকিষ্টদের অর্থনৈতিক প্রতিধ্বনি। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় একই উপাদানাবলীর সাহায্যে তৈরী সম্ভব হাজারো অবাধ অনুষঙ্গ-সৃষ্টি। মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের একটা ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি ফ্রি এ্যাসোশিয়েশন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন তার নিদান-প্রয়োগ ঘটে আঙ্গিকের সাহায্যে। অভিনব গুপ্তের প্রতিধ্বনি করা ছাড়া উপায় থাকে না, রবীন্দ্রনাথ সেই অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা— যাঁর রহস্য-বিদার মানসিক কাঠামোয় বাস্তবলোকন ছিল সহজাত, স্বভাবজ ব্যাপার। বাস্তবের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের ফলে আঙ্গিকের যথোপযুক্ত আবিষ্কার বিরাট প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

পূর্বোক্ত মানসিক পর্যায়ে অতিক্রমে রবীন্দ্রনাথের বেশী বিলম্ব ঘটে না। অহর্নিশ মনুষ্যত্ব-সন্ধানী, ধূলিতলেলীন অমারাত্রির ভগ্ন তোরণে কবি পরিব্রাজক চৈতন্যসাগর-তীর্থে সহসা নব দ্বীপ-পান্থশালা আবিষ্কার করেন। মারণাস্ত্রের সম্মুখে একদা জুঁই ফুলের সঙ্গীত-পরিবেশনে পক্ষপাতী কবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবিশ্ব কুরুক্ষেত্রে রথরজ্জু ধারণের আহ্বান জানান এবং মহামানব-অভ্যুদয়ের পদধ্বনি শোনেন। তাঁর কাব্যলোক তখন লিরিকের দেহ অতিক্রান্ত মহাকাব্যের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে যায়—যা বৈদিক মন্ত্রের যত প্রজ্ঞা এবং যৌথ জীবনোৎসবের আনন্দরননে সর্বস্বরা।

কীর্তির সঙ্গে মানুষ নিজকেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে। কবিগুরুর সুদীর্ঘ কালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনার পারম্পর্য্য জীবন-শিল্পেরও এক অবিনশ্বর অধ্যায়। শ্রেয়বোধের পুনরুজ্জীবনে এবং মানবিক ঐশ্বর্য্যে রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের শেষ মহৎ ঝিলিক।

* জন্মশতবার্ষিকীতে নিবেদিত।

নৈতিকতার সমস্যা

A life unexamined is not worth living
-Socrates.

সংঘবদ্ধ সমাজ-জীবনে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন-অপরিহার্য। মানুষে মানুষে মুখ্য বা গৌণ পারস্পরিক সম্পর্ক থাকার ফলে নৈতিক বিচার এবং অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত— হয়ত একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যকতা এড়িয়ে যাওয়ার কঠিন। তাই সরল রেখায় বিবেক ও রিপুর মাপকাঠি হালে পানি পায় না। এমন কি নৈতিকতার স্বরূপ নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিস জিজ্ঞেস করেছিলেন, "একটা কাজ সঠিক বলেই কী ঈশ্বর তা ইচ্ছা করেন,— না, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই তা সঠিক?" প্রথম ক্ষেত্রে ঈশ্বর আর সর্বশক্তিমান থাকেন না, ঈশ্বরত্ব ক্ষুণ্ন হয়। যেহেতু নৈতিকতা উর্ধ্বে শির পোড়ো সেজে বসে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নৈতিকতা লোপ পেয়ে যায়। ঈশ্বরের হুকুম বলেই কোন নৈতিক নিয়ম পালন করলে তা হোয়ে পড়ে বিচক্ষণতা বা বুদ্ধিমানের কাজ। স্বর্গের লোভ কি নরকের অগ্নি এড়াতে যে প্রার্থনা করে, সে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সাধু নয়। নৈতিকতার সঙ্গে এইসব প্রশ্ন স্বতঃই জড়ানো। প্রাচীন দার্শনিকের উপমা অনুসরণে বলা যায়, নৈতিকতা যেন সৈন্যদের কিট্‌ব্যাগ বা পিঠে বওয়া রসদের থলি, যা রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়া চলে না, আবার কুচকাওয়াজের পক্ষে খুব সুখকরও নয়। অনেক সময় যুদ্ধের হারজিৎ নির্ভর করে হাতিয়ার আর এই রসদের থলির উপর।

অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের আধুনিক প্রতিষ্ঠাতা ফ্রান্সিস বেকন সক্রেটিসের প্রথম মোকাবিলার চেষ্টা পান। তাঁর মতে, ঐশী শক্তির উপর নির্ভর করলে পাপ সম্পর্কে অতি সচেতনতা বাড়ে। কর্তব্যের পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে অক্ষম এই জাতীয় চিন্তা। উচ্চতর নৈতিক আদর্শের স্বরূপ অস্পষ্টই থেকে যায়। টমাস হব্‌স এই পথে আরো এক ধাপ অগ্রসর হন। তাঁর ধারণা জড় ব্যাপারের মত নৈতিক জগতও কার্যকারণের নিয়ম মেনে চলে। ফলে নৈতিকতার ব্যাখ্যায় ঐশী শক্তির আর প্রয়োজন কোথায়? যা কাম্য তাই কল্যাণ। যা অকাম্য তা অকল্যাণ। একদম চরম কল্যাণ-অকল্যাণ কিছু নেই। সবই আপেক্ষিক দেশকালপাত্রের উপর নির্ভরশীল। যা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর তা-ই কল্যাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যথায় অকল্যাণ। ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আত্মরক্ষাই মানুষের প্রধান জীববৃত্তি। প্রাকৃত নৈরাজ্য থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। যেহেতু আত্মরক্ষাপ্রয়াসী সকল মানুষই নিরাপত্তা চায়। তার আশ্বাস রাষ্ট্রের আইন ছাড়া আর কোথায় মিলবে? মানুষ জন্মগতভাবে নৈতিক জীব। কিন্তু তা চালু রাখতে গেলে রাষ্ট্র প্রয়োজন। হব্‌সের অনেক সমসাময়িকগণ মনে করতেন সামাজিক আইনই নৈতিকতার বুনিয়াদ। ন্যায় অর্থ সমাজের অনুমোদনপ্রাপ্ত। অন্যায় তার বিপরীত। নৈতিকতা এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক শাস্তি এবং আপ্ত-শাসন দ্বারাই তা চালু থাকে। রেওয়াজ, প্রথা ইত্যাদির উপর এই চিন্তানায়কগণ জোর দিয়েছিলেন। আদিম সমাজে গোষ্ঠীপতি বা ট্রাইব্যাল চীফ্-দের হুকুমই ছিল বাধ্যতামূলক নৈতিক আইন— এই দৃষ্টান্ত দিতে তাঁরা ভোলেননি।

পূর্বোক্ত মতামত থেকে সোজা লক্ষণীয়, নৈতিকতা বাইরে থেকে চাপানো সামগ্রী। সাধু ভাষায়, বহিরারোপণ। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার উপর বনিয়াদ গড়লে নৈতিকতা আর কোথায় দাঁড়ায়? ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিক বিচারের অপরিহার্য শর্ত। এখানে সেই স্বাধীনতাই ক্ষুণ্ন। ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার পর খুঁড়িয়ে হাঁটার জন্য কাউকে উপহাস করা চলে, দায়ী করা যায় না। নৈতিকতার প্রথম শর্ত, মানুষের জিজ্ঞাসার অধিকার থাকবে, "কেন আমি সদাচারী হব? কেন এই নৈতিক আইন মানব; অন্য বা বিপরীত আইন নয়?" নচেৎ নৈতিকতা পূর্বোক্ত খঞ্জ পায়ের ব্যাপার হোয়ে পড়ে। অন্য পক্ষে, সামাজিক রাজনৈতিক আইন ও উপায় কোন আদর্শ বা লক্ষ্য নয়। মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশই সেখানে বড় কথা। সুতরাং তা-ই কি নৈতিকতার আদর্শ হওয়া উচিত নয়? বহু যুগের চাপে চাপে বহু নৈতিক আদর্শ অনড় মানুষের মনে চেপে বসে, তখন আর কেউ কোন প্রশ্নই তোলে না তার যাথার্থ্য নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন তোলা উচিত।

অধিকন্তু, সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন কালের তাগিদেই বদলায়। নৈতিক আদর্শের এমন চঞ্চল প্রতিমূর্তি সমাজের পক্ষে সুখকর নয়। দরজীর ফিতা কখনও ষোল কখনও আঠার ইঞ্চি মাপে ফুট ধরলে জামা সেলাই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। সামাজিক-রাজনৈতিক আইন যেহেতু উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়, তা পালনের জন্য কোন নৈতিক-বাধ্যতাবোধ মোরাল অবলিগেশন থাকতে পারে না। এমনকি গোষ্ঠীপতিদের আইনও আদিম সমাজ চিরদিন মেনে নিয়েছে, এমন নজীর নেই ইতিহাসে। মানুষের স্বাধীন মর্মশক্তি বা স্পিরিট কি তার মোকাবিলা করেনি? নজীর অজস্র। বরং সামাজিক-রাজনৈতিক আইন স্বতঃই নৈতিক বিচারের সামগ্রী। তার মধ্যে কিছু নৈতিক কিছু অনৈতিক থাকতে পারে। রাষ্ট্রের বনিয়াদ নৈতিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। নচেৎ সামাজিক দুর্দশার অবসান ঘটবে না। হব্‌সের সমালোচনায় বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছে : . . . .

"The tendency of every Government towards tyranny can not be kepet

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

in check unless governments have fear of rebellion-Government would be worse than they are if Hobbes's submissive attitude were universally adopted by subjects. This is true in the political sphere, where government will try, if they can, to make themselves personally irremovable, it is true in economic sphere, where they will try to enrich themselves and their friends at the public expense; it is true in intellectual sphere, where they will suppress every new discovery or doctrine that Seems to menace their power."

(History of western philosophy : 1946 edition page 578).

অর্থাৎ , রাজনৈতিক আইন কোন নৈতিকতার বনিয়াদ হোতে পারে না, কারণ তা নিজেই নৈতিকতার কাঠগড়ায় আসামী। শাস্তির ভয় দেখিয়ে নৈতিকতা চালু করতে গেলে তা হোয়ে দাঁড়ায় বিচক্ষণতার নামান্তর। তাছাড়া বাইরে থেকে চাপানো নৈতিক আদর্শ বাহ্যিক কিছু কাজের উপর খবরদারী করতে পারে, সব কাজের উপর নয়। মানসিক জগৎ প্রায় অস্পৃষ্ট থেকে যায়। অথচ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কল্পনা-বাসনার সঙ্গেই নৈতিক বাধ্যতাবোধের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাইরে থেকে চাপানো আদর্শ ফলে ভ্রষ্ট।

নৈতিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ থাকার ফলে আর এক প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ধরা যাক, মানব কল্যাণই নৈতিক আদর্শ। সমস্ত কাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই আদর্শে পৌঁছানো। তখন প্রশ্ন উঠবে— সমস্ত সমাজের কল্যাণ, না , ব্যক্তিবিশেষের ভোগকৃত কল্যাণের সমষ্টি ফল? এবং এই কল্যাণ কি গোটা সমাজের প্রাপ্য— কোন অংশ বিশেষের নয়? দার্শনিকের উপমা-অনুকরণে ব্যাপারটা খোলাসা করা যাক। দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ভোগ-সুখের সম্পর্ক জড়িত। কিন্তু তবু কেউ মনে করে না 'হাত সুখ পাচ্ছে।' বলা হয়, 'মানুষটা সুখ পাচ্ছে।' নাকে ভাল খোশবু এলো। কেউ বলবে না, 'নাক মজা পাচ্ছে।' মজা ব্যক্তির উপর ফেলে তবে নিস্তার। অনেক চিন্তাবিদ তা-ই মনে করেন, কল্যাণের ক্ষেত্রে গোটা সমাজের পাওনার দিকে জোর দেওয়া উচিত, অংশের দিকে নয়। সমষ্টিগতভাবে সমাজের কল্যাণই শ্রেয়। ব্যক্তির দিকে দৃষ্টির অত প্রয়োজন নেই। হেগেলের মত অধিবিদ্যাবিদ বলবেন যে সমস্ত গুণ ত আসলে পরম সত্তার গুণ। উদাহরণত, রাষ্ট্রের উপর অনেক গুণ বর্তায়। বলা যায়, রাষ্ট্র জনাকীর্ণ, বিস্তীর্ণ হোতে পারে না। নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাই সমষ্টির দিকেই লক্ষ্য থাকা দরকার। এই সমষ্টি-ব্যষ্টির দ্বন্দ্ব তাই বিশেষ জটিল সমস্যা। মানুষ নিয়েই নীতিবিজ্ঞানের, এথিক্‌সের কারবার। মানুষ রাষ্ট্রের অধিবাসী। এখন জোর কোন দিকে দেবেন, আদর্শও তার উপর নির্ভরশীল। এক দলের চাপ সমষ্টির দিকে অন্যদের ব্যষ্টির উপর। কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, রাষ্ট্র যখন স্বৈরাচারী হয়, তখন সার্বভৌমতার জিগীর ওঠে। সুস্থ সমাজে ব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে। তা মত মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সমস্যা দূরীভূত হয় না।

উনিশ শতকের সুখবাদী হিডোনিস্ট এবং উপযোগবাদীগণ, য়ুটিলিটেরিয়ান মতবাদীরা ব্যক্তির সুবিধা ও কামনার পরিতৃপ্তির উপর নৈতিকতার সৌধ গড়ার চেষ্টা পান। এখানে একটা খুঁৎ স্পষ্ট। তাঁদের দৃষ্টির কাছে প্রথম ব্যক্তি ধরা দেয়, গোটা সমাজ নয়। এমন ক্ষেত্রে সহজেই বহু পরিস্থিতি দেখা দেবে, যেখানে নৈতিকতা পালনের চেয়ে অবহেলার মধ্যেই সুখ-সুবিধা ও পরিতোষ অধিক। ব্যক্তি যখন মাপকাঠি তখন এই পরিস্থিতি দেখা দিতে বাধ্য। তাছাড়া নৈতিকতার যদি একমাত্র ভিত্তি হয় পরিতৃপ্তি-লাভ তখন কীভাবে মানুষকে বোঝাবেন যে নৈতিকতার জন্য, অপরের পরিতৃপ্তির জন্য, তার নিজের পরিতৃপ্তি বিসর্জন দেওয়া উচিত। আর সেই সময়ে বহু লোকই সমাজে থাকবে যারা অপর ব্যক্তির পরিতৃপ্তির জন্য নিজেদের পরিতৃপ্তি বিসর্জন দিতে সর্বদা পরান্মুখ। জেরেমী বেন্থাম স্বীয় তত্ত্বের এই ছিদ্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেই হেতু তিনি ওকালতি করেন এমন আইন-প্রণয়নের যেন অসৎ লোকেরা নিজেদের কাম্য না পায়। বেথাম বলেছেন, মানুষকে ভয় প্রদর্শন বা ধমক-দান ছাড়া নৈতিক করে তোলা যায় না। সুতরাং ব্যাপারটা আবার বাইরের আরোপিত জিনিস হোয়ে দাঁড়ায়।

বহিরারোপিত নৈতিকতার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল ছিলেন যুক্তি-বিচারবাদী দার্শনিকগণ। কান্ট ঘোষণা করেন, নৈতিকতা বিশ্বজনীন। নৈতিকতার শর্ত অন্তরের তাগিদ—বহিরারোপিত কিছু নয়। অন্যদিকে সুখবাদের উপর খড়্গ হেনে তিনি নৈতিকতার উপাদান—বাসনা-কামনা ঝেড়ে ফেলে আর এক চরম প্রান্তে দাঁড়ান। বিচারশক্তি সব সৎ জীবনে পৌঁছানোর জন্যে প্রয়োজন। জ্ঞানের সাহায্যে ধাপে ধাপে জীব-বৃত্তির বিনাশ সাধনই নৈতিকতার শিখরে পৌঁছানোর পথ। একদিকে সংবেদনশীলতা অন্যদিকে অনুভূতি। এই দ্বৈততা কান্ট মেলাতে পারেননি। তাঁর মতে ব্যবহারিক বিচার-শক্তিই বিবেক। অন্তরের তাগিদেই মানুষ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করবে, বাইরের চাপে নয়। অন্যথায় নৈতিকতা বিকার-তত্ত্ব, কান্টের ভাষায় প্যাথলজিক্যাল হোয়ে পড়ে। 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' এই হওয়া উচিত নৈতিকতার শ্লোগান। নৈতিক নিয়ম স্বজ্ঞার সাহায্যে পাওয়া যায়। কাজের ঔচিত্য-অনৌচিত্য নির্ভর করে এই নিয়মের সঙ্গে সংগতি রাখা, না-রাখার উপর। নৈতিক আইন বিশ্বজনীন। পরিস্থিতি অনুযায়ী তার পরিবর্তন ঘটে না। তা নিজেই লক্ষ্য, উপায় নয়—বরং 'শর্তহীন আদেশ'। সম্পাদনের খাতিরেই পালিতব্য। গীতার নিষ্কাম কর্মের সেই প্রতিধ্বনি :

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মনি॥

কান্ট শর্তহীন আদেশের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলছেন, এমনভাবে কাজ করো যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা চিরন্তন হোয়ে ওঠে। এমনভাবে কাজ করো যেন অনুরূপ পরিস্থিতিতে সকলের তা-ই করা উচিত।

মূলত কান্ট ছিলেন ইনট্যুইশনিস্ট। বিচার-বুদ্ধির উপর জোর দিয়েও তিনি শেষে মরমী। অস্পষ্টতার মধ্যে আশ্রয় খোঁজেন। অথচ নৈতিক নিয়ম তারাই পালনের অধিকারী যারা বুদ্ধির অধিকারী। অন্যপক্ষে, নৈতিক নিয়মকে 'শর্তহীন আদেশ' বলার জন্য তা একটা বাধ্যতায় পরিণত হয়। যার ফল বহিরারোপিত নৈতিকতার অনুরূপ এবং বহিরারোপিত নৈতিকতার সব অপকর্ষ এখানে ভিড় জমায়। কান্টের নৈতিক আদর্শও শেষ পর্যন্ত ওই কলঙ্ক এড়াতে পারেনি।

হার্বার্ট স্পেন্সারেও এই ছোঁয়াচ স্পষ্ট। তাঁর মতে, জীববিজ্ঞান বা বায়োলজির নিয়মাবলী নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জীব বা অর্গানিজম পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন, এ্যাডপ্টেশন দ্বারা বিকাশ লাভ করে। নৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র এই অভিযোজন বা সংগিত-স্থাপন। লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধায়ক কাজই আচরণ। অভিযোজনের মাত্রা অনুযায়ী একটা কাজ ভাল কি মন্দ বিচার্য। ভাল কাজ সুখের আকর, মন্দ কাজ দুঃখের। সুখ জীবনী-শক্তির সহায়, দুঃখ অন্তরায়। এইজন্য সুদীর্ঘ আয়ুর সাধনাও লক্ষ্য হওয়া উচিত। "জীবনের চরম উদ্দেশ্য সুখ। তবে নিকটতম লক্ষ্য : জীবনের বিস্তার ও বৈচিত্র্য।" কিন্তু নৈতিক চেতনার উৎপত্তি-বিশ্লেষণে স্পেন্সার মনে করেন, ব্যক্তি এবং জাতীয় জীবনের সংরক্ষণকল্পে বাইরের চাপ একান্তই প্রয়োজন। এই প্রেষণ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। আভ্যন্তরীণ অনুশাসনের স্যাংকশনের উল্লেখও স্পেন্সারে আছে। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অভিযোজন প্রয়োজন। আদর্শ রাজ্যে এই অভিযোজন পূর্ণতা লাভ করবে। সোজা বোঝা যায়, স্পেন্সার নৈতিক বাধ্যতাবোধের কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যাদানে অপারগ। বাইরের চাপ ত নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে না।

নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণতাবাদী পারফেক্‌শনিষ্ট কল্যাণবাদীরা বহিরারোপণের খপ্পর-মুক্ত হোতে ঘোষণা করলেন, বিবেকই মানুষের সমগ্র সত্তা। অন্য দিকে, বাসনা-কামনার জগৎ আংশিক সত্তা। নৈতিক নিয়ম মানুষের সত্তা-উদ্ভূত। নৈতিক বাধ্যতাবোধের উৎস হচ্ছে অন্তর। নৈতিক জগতে মানুষ সার্বভৌম। সেখানে জাগতিক কর্তৃপক্ষ নিতান্তই তুচ্ছ। কারো চোখ-রাঙানির ধার বিবেক ধারে না। আত্মোপলব্ধিই চরম আদর্শ। মানুষের মধ্যে বহু গুপ্ত ও সুপ্ত শক্তি আছে। তাদের সংগতিময় বিকাশই চরম কল্যাণ। পূর্ণতাবাদীদের অন্যতম সারথী ব্র্যাড্‌লের মতে, দেহের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা যেমন গোটা দেহের কল্যাণে স্ব স্ব কর্তব্য সমাধা করে, তেমন মানুষের নিজ নিজ অবস্থান-অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেই সমাজ-কল্যাণ নিহিত। গীতায় আছে :

স্বে স্বে কর্মন্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃনু॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মে রত এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ করে।

আত্মোপলব্ধির পথেই মানুষের অসীম সত্তা আপন ব্যক্তিগণ্ডী, সমাজগণ্ডী ছাড়িয়ে অসীম সত্তা অভিমুখে অগ্রসর হোতে সক্ষম। এই চিন্তা অতীতে এ্যারিস্টটল থেকে বর্তমান যুগে ম্যুরহেড পর্যন্ত দার্শনিকের সমর্থন পেয়েছে। পার্থক্য থাকলেও তাঁরা একবিন্দুতে স্থির—যার মর্মবাণী : নিজেকে জানো। আত্মানং বিদ্ধি।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তির বিরোধ, বহিরারোপণ দ্বারা নৈতিকতার মর্যাদা খর্ব—ইত্যাদি সমস্যা এইসব মতবাদে অনেকটা মীমাংসিত। কিন্তু এখানে বড় প্রশ্ন, আত্মোপলব্ধির স্বরূপ কী? তা এত ছায়াময়, অস্পষ্ট যে, আদর্শ হিসাবে দাঁড় করনো কঠিন। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মকে জানার মত নেতি-নেতি পন্থায় একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা পেয়েছেন :

কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এই টুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। . .
. .   . .
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। . .   . .   . .
. .   . .   . . মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়।— . . . . .

প্রাচীন বিশিষ্ট ধর্মসমূহ আত্মোপলব্ধির ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে কী, একই ধর্মের সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ে কলহ এবং যার পরিণতি—রক্তপাত, হত্যাজাতীয় সর্বপ্রকার বর্বরতা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়—নৈতিক আদর্শ ধোঁয়াটে রাখা চলে না। খোদ গ্যেটে একবার য়েকারম্যানকে বলেছিলেন যে, 'নিজেকে জানো' সক্রেটীয় এই আদর্শ বেশী দূর মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। এই 'জানো-পন্থীরা' নিজেদের আত্মা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, তাদের চোখের সামনে সমাজ ধ্বংস হোক, মানুষ জন্তুতে পরিণত হোক, অত্যাচার-অনাচার বেড়ে যাক— কিছু আসে যায় না। কেবল আত্মা ঠিক থাকলেই হোলো। তা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে তারা উপদেশ ঝাড়ে। য়ুরোপ থেকে গ্যেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন : আদর্শের অস্পষ্টতা মানুষকে কর্ম-বিমুখ, কলহপরায়ণ করে তোলে; কূর্মবৃত্তির বিলাস যোগায়। আর তা সমাজ পরিবর্তনের কোন সাহায্য করে না। পূর্ণতাবাদীদের তাই ব্যর্থ নমস্কারে ফেরাতে হয়, যদিও বহু ক্ষেত্রে তাঁরা নমস্য।

নৈতিক বিচারও কম মাথাব্যথা নয়। প্রাত্যহিকতায় জটিল জট, মানুষে-মানুষে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ে জীবিকার ময়দানে এত দ্বন্দ্ব সম্পর্কের টানাপোড়েনে এমন ঘূর্ণিপাক যে দিশেহারা হওয়ার অবকাশ যথেষ্ট। উদাহরণত মিতব্যয়িতা এবং বদান্যতা উভয়ই সমাজে সদগুণ বা ভার্চ্যু। অন্য দিকে, অমিতব্যয়িতা ও নীচতা সংকীর্ণতা কদাচার। যদি দানবীর হোতে চান, অমিতব্যয়ী না হোয়ে পারা যায় না। আবার মিতব্যয়ীতার সঙ্গে নীচতা সহজেই এসে জুটবে। আরো একটি উদাহরণ। কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য এবং অপরের প্রতি বিবেচনা—(কারো মনে কষ্ট না দেওয়া, কারো কোনো অসুবিধা না করা)—উভয়ই সমাজে সদগুণ রূপে অভিহিত। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক যখন কোন মানুষের অস্তিত্ব ধরে টান দেয়, তার মা-বোনের ইজ্জৎ কাড়ে, দিনের পর দিন তার বিবেকের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রাখে—তখন সে কী করবে? আনুগত্য বজায় রাখবে, না অপরের প্রতি বিবেচনা দেখাবে? লক্ষ্য করা দরকার এখানে সংঘাত কোন আদর্শের সঙ্গে অনাদর্শের নয়। সংঘাত আদর্শের সঙ্গে আদর্শের। জীবনের ঘূর্ণিপাক এমনই ক্ষিপ্ত ও দ্বন্দ্বাকীর্ণ যে সৎ হওয়ার চেষ্টা করলেও সৎ হওয়া যায় না। স্বতঃই বিচারবুদ্ধি হাবুডুবু খায়।

এইসব সমস্যার নিরাকরণ অবিশ্যি কর্তব্য। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমস্যার উৎস খুঁজে বের করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ সৎ আদর্শ মানুষকে মানুষের কাছে এগিয়ে দেয়। এখানে চারুকলা ও নীতিশাস্ত্র বৈশিষ্ট্য এক। আবার অসৎ আদর্শ মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে সরায়, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় এ্যালিয়েনেশান বা পরকৃতি। অপর মানুষ যখন একজনের কাছে বস্তু মাত্র। সামাজিক সম্পর্কে সে-ও অপরের কাছে বস্তু অর্থাৎ পরকৃত। বস্তুজগতে ত মনুষ্য-জগতের আদর্শ রূপায়িত হোতে পারে না।

আদর্শের সার্বিকতায় পৌঁছতে গেলে এসব চিন্তার খেই নতুন করে পাকড়ানো প্রয়োজন। চিরাচরিত বিশ্বাস সেখানে খুব বেশী সাহায্য করতে পারে কী? গান্ধীজী প্রার্থনা-সভায় যে রামধনু গাইতেন তার শেষ দুই পংক্তি :

ঈশ্বর আল্লা তেরি নাম
সব্‌কো সুমতি দে ভগবান।

আত্মোপলব্ধির বাসনায় ভগবানের কাছে সুমতি প্রার্থনার তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্রষ্টার উপর কতখানি নির্ভর করা চলে? তিনি যে সকলকে সুমতি দেন না, তার প্রমাণ গান্ধীজী নিজেই হয়ত উপলব্ধি করেছিলেন বুলেট-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপ্তির সময়। নাথুরাম গড্‌সে যে স্রষ্টার আশীর্বাদ-প্রাপ্ত নয়, তা আজ সকলের জানা। নৈতিক আদর্শে স্পষ্টতা, সার্বিকতা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। কবি জেরার্ড হপ্‌কীন্‌সের দ্বন্দ্ব উন্মথিত হৃদয় জিজ্ঞাসার বজ্র হেনে যায় :

"Thou art just indeed, Lord, if I contend
With thee; but Sir, so what I plead is just.
Why do sinners' ways prosper? and why must
Disappointment all I endeavour end?
Wert thou my enemy, O thou my friend,
How wouldst thou worse, I wonder, than thou dost
defeat, thwart me? Oh, the sot and thralls of lust
Do in spare hours more thrive than I that spend
Sir, life upon they cause ...."

তাই হয়ত ধর্ম থেকে ধর্মশাস্ত্রে—চিন্তা থেকে পন্থার দিকে মানুষ ছুটে যায়। তার ফল : হিন্দুর নিকট গোমাংস নিষিদ্ধ। মুসলমানের কাছে মদ্য ও শুয়োরের গোস্ত হারাম। একজন খ্রিস্টান তাবৎ এই তিন পদ মাল পেটে ঢোকায়, অথচ তার ধর্ম-নিষ্ঠা বেমালুম আস্ত থাকে।

AMARBOI.COM

নিপীড়িতের বজ্রনাদ

"How marvellous is man!
How proud the word rings—Man!"

"কি বিস্ময়কর সৃষ্টি এই মানবগোষ্ঠী,
গর্বমুখর কী রণন ওই শব্দ—মানুষ!"

গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ' নাটকের একটি চরিত্রের উক্তি। এই মানব-বন্দনায় নতুন কি ছিল?

রেনেসাঁসের কাল থেকে ইউরোপে মানব-বন্দনার জিগীর ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কখনও নিখাদ ভূমিকায় পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়নি। অপার্থিবতার কিছু লেজুড় লেগেই থাকত। রেনেসাঁসের পর কালক্রমে ব্যাঙাচির লেজের মতো ক্রমশ আধি-দৈবিকতা খসা শুরু হয়। চার শতাব্দী ইউরোপ মানব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দনার পাদ-পীঠ। দেকার্তের অহং-চিহ্নিত মাভৈঃ বাণী, বিজ্ঞান মারফত প্রকৃতি বিজয়ের দাপট—সবই ইতিহাসের অন্তর্গত। তার জয়যাত্রা আর থামেনি। উত্থান-পতনের স্বাভাবিকতা হয়ত আজও আছে। দেখা গেল, মানব-বন্দনার ফল-স্বরূপ মুষ্টিমেয় মানুষের প্রতিষ্ঠা ঘটল, কিন্তু অগণন মানুষের জন্য ঘটল বঞ্চনা, অবমাননা, অকাল এবং অপমৃত্যু। সংস্কৃতি সৃষ্টি হলো। কিন্তু তার ফল সকলের কাছে পৌঁছল না। প্রকৃতি-বিজয়ের সড়ক ধরে ইউরোপ একদিন বিশ্বজয়ে বেরিয়ে এলো। সেই পরাক্রমের মুখে মানব-বন্দনার মর্মশক্তি বা স্পিরিট দ্বিধা-বিভক্ত হোয়ে গেল। ফলে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি দুমুখো সাপের মত মানব-বন্দনার মন্ত্র এক মুখ দিয়ে উদগার করলেও অন্য মুখে তা বমির মতই উদরসাৎ করতে থাকল। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ইউরোপের এই মুখোশ আরো নগ্ন খুলে পড়ে। মেট্রোপলিটান ইউরোপের জন্য মানবিকতা বা হ্যুমানিজমের এক মাপকাঠি, উপনিবেশের জন্য আর এক। অবিশ্যি ইউরোপের সৃষ্টিশীল ভূমিকা কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে সংকুচিত পৃথিবীর সীমানায় মানব-নৈকট্যের এক বিরাট সুযোগ উপস্থিত, একথাও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু প্রদীপের তলস্থিত অন্ধকার একই সঙ্গে বিবেচ্য। তাই মানব-বন্দনার জিগীর শেষে মানব-নিধন, মানব-বঞ্চনার মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত—দুঃখ-বিলাসের নাকিকান্না অথবা ছেঁদো স্তোকবাক্য, ভাবালুতা-চোলাই দু'ফোঁটা করুণার পানি। এই মেরুদণ্ডহীন ভাবপ্রবণতা এবং মানব-অবমাননার বিরুদ্ধে চিন্তাবিদগণের ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জোর শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই। কিন্তু ফাইন আর্টস বা চারুশিল্পের ক্ষেত্রে তখনও কোন সার্থক নজীর দেখা দেয়নি। উনিশ শতকের একদম শেষ পাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তিন বৎসর তার জন্যে পৃথিবীকে অপেক্ষা করতে হয়।

"A man should be respected, not pitied—pity is degrading. মানুষ শ্রদ্ধার সামগ্রী, করুণার পাত্র নয়। করুণা অবমাননাকর।" আত্ম-অন্বেষায় অগ্নিগিরি রাশিয়ার বুক চিরে প্রতিধ্বনিতে হোলো এই নব্য মানবতার বাণী : মানুষ করুণার পাত্র নয়। পুণ্য-সঞ্চয়ের বাহন নয়। মানুষ শ্রদ্ধার বিগ্রহ। শিল্পের ক্ষেত্রে গোর্কি এই শিলালিপির প্রথম ভাস্কর। বঙ্গভাষী আর এক ব্যক্তি গোর্কির মাত্র পঁচিশ-তিরিশ বৎসর আগে এই জাতীয় কথা বলেন : "জীবই শিব। মানুষকে দয়া দেখানোর কথা বলে, কার এমন আস্পর্ধা?" তিনি শিল্পী বা সমাজ-সংস্কারক নন। ঋষি। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। আধিদৈবিকতা মুক্ত নয় এই বাণী। কিন্তু গোর্কির বাণীতে চিরাচরিত মানবিকতার সঙ্গে একটা ছেদ স্পষ্ট। বিশ্বের ইতিহাসে গোর্কির মত শিল্পীর এমন পথিকৃৎ, সদম্ভমূর্তি কেউ কোনদিন আর দেখেনি। সুবিশাল নিজের ব্যক্তিত্বের জ্যোতিঃ-অভিঘাতে যিনি পৃথিবীকে ডাক দিলেন, "আমার আবির্ভাব অবলোকন কর। আমি সমগ্র বিশ্বের বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর। শৃন্বন্তু, শোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

. . . . ।"

গোর্কির পূর্বে মহৎ শিল্পী মাত্রেই মানবতার জয়গানে উন্মুখর ছিলেন। কিন্তু কেউ পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি এই চৌহদ্দির মধ্যে। সংস্কৃতির বিকাশে বাধা থাকে। কালক্রমে তা হোয়ে পড়ে ভণ্ডামির মুখোশ। সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পদলেহী সংস্কৃতিসেবীদের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ইউরোপের অধিকাংশ শিল্পী চিন্তাবিদ উপনিবেশের পশ্চাৎপদতা-রক্ষণে সায় দিয়ে এসেছে। পূর্বেও তা-ই ঘটত। কারণ, এইসব সংস্কৃতি দু-মুখো ভূমিকা ছাড়া টেকে না। প্রচারে এবং প্রয়োগে তার দ্বিত্ব ঘটে। মৃত্যুঞ্জয় শেক্সপীয়ার মানব-বন্দার স্বাক্ষর রেখে গেছেন :

What a piece of work is man! how noble in reason! how infinite in faculty! in from, in moving how express and admirable! in action like an angel! in apprehension how like a God! the beauty of the world! the paragon of animals!

কিন্তু সম-পর্যায়ে তিনিই উচ্চারণ করেন : . . . . What is this quintessence of dust? man delights not me; no, nor woman neither.

মানুষের অপূর্ণতার দিকে তিনি অমর কটাক্ষ রেখে যান। গোর্কি কিন্তু জানতেন, সমাজে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব মানুষ ও সাংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে বিরাট অন্তরায়। প্রগতির বাহন সংস্কৃতি তাই শেষ পর্যন্ত হোয়ে পড়ে শৃঙ্খল। তখন মিথ্যার, প্রয়োজন হয় আদর্শের মুখোসে। কা'দের মিথ্যার প্রয়োজন হয়? গোর্কির নাটকের চরিত্র উত্তরে জানায় : Only those who are faint-hearted or live at other people's expense have need of lies. Some people are supported by lies, others hide behind them.

কিন্তু—

But the person who is his own boss—the person who is independent and does not suck other people's blood—Waht need has he of lies? Lies are the religion of slaves and bosses. Truth is the God of the free man.

শিল্পী হিসেবে শুধু নব্য-মানবতার নকীব নন গোর্কি। আনাতোল ফ্রাঁসের ভাষায়, 'হুম উই নো বাই দেয়ার ক্রাইম্স' সেই সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধানদাতাও তিনি। এই দিকে গোর্কি পুরোহিত। কিন্তু নাস্তিক। শিল্পীর এমন নাস্তিক-পুরোহিত মূর্তি পৃথিবী আর কোনদিন দেখেনি। সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদে কুঠার আঘাতের জন্য উপনিবেশের সমস্ত মানুষ, শ্রেণী-নির্বিশেষে, গোর্কির নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে আত্মক্ষয়ী যুদ্ধ এবং তার বিবেকের কাছে অপরাধের ভারে মুহ্যমান না হোলে কী এশিয়া-আফ্রিকার এত দেশ স্বাধীনতা পেত? গোর্কি সাম্রাজ্যবাদীদের বিবেকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে কীলক ঢুকিয়ে প্রদর্শন করেন তাদের কুষ্ঠরূপ। 'ক্লিম স্যাম্‌গীন' উপন্যাস এক অন্তঃসার-শূন্য নৈতিকতা-বিবর্জিত সভ্যতার আলেখ্য। ক্লিম স্যাম্‌গীন চরিত্র ডন্‌কুইক্‌সোট, হ্যামলেটের মতই সৃষ্ট এক কালজয়ী ইমেজ, যদিও অবক্ষয়জাত। পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে গোর্কি বিশ্বের নতুন বিবেক। তাঁর ষষ্টিতম জন্মদিবসে টমাস মান্‌ যখন প্রেরিত বাণীতে বলেন, ... "The work of Gorky has a wider significance; he is bearer of a moral principle, an organ of social conscience;" তা অত্যুক্তি কিছু নয়।

গোর্কির পাশাপাশি ইউরোপের অধিকাংশ শিল্পী বুদ্ধিজীবী, (ব্যতিক্রম ত আছেই) শূকরের বেশী আমাদের কাছে মর্যাদা পেতে অক্ষম। এদের বেশীর ভাগ দ্বীপ-মনা। বোধ হয়, ডুবে-মরার ভয়ে ভূমধ্যসাগর পার হয় না। যেগুলো ওই সাগর পাড়ি দেয়, তারা দেশে ফিরে আবার শূকর ব'নে যায়। কিপলিং এবং ইদানীংকালে মৃত তাঁর কিছু বংশধর হয়ত নিজেদের কবরে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন এই মন্তব্যে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য। এদের পাশাপাশি গোর্কির মূর্তি যেন পুরুষোত্তম সাধুর বিগ্রহ। জীবিত থাকলে এই শিরোপার জন্য তিনি আমার উপর উষ্মা প্রকাশ করতেন। কারণ, তিনি ছিলেন অতি-প্রাকৃতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার ঘোর-বিরোধী। গোর্কি বিশ্বাস করতেন, ক্রমবর্ধমান। আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান দ্বারা জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলাই, হওয়া উচিত, মানুষের মুখ্য লক্ষ্য। অতি-প্রাকৃতে গোর্কির কোন আস্থা ছিল না।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দ। গোর্কির বয়স তখন মাত্র চৌত্রিশ বৎসর। কিন্তু এত কম বয়সেও তিনি আর রাশিয়ার সীমানায় আটক থাকলেন না। দেশে দেশে মানব-প্রেমিক এবং বঞ্চিত মানুষ যেন এই শিল্পীর জন্যে কান পেতে ছিল। টলস্টয়কে সমুদ্রের ধারে ভাবাবিষ্ট দেখে গোর্কি যে-কথা উচ্চারণ করেছিলেন, বিশ্বের শূদ্র-জনতা সেই কথাই বক্তাকে ফিরিয়ে দিলে, "I am not an orphan on the earth so long as this man lives on it."

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি

(রবীন্দ্রনাথ)

অন্যান্য দেশের অনুরূপ অনেকান্ত স্রোতে গোর্কির ব্যক্তিত্বের ছায়া বাংলা সাহিত্যের উপরও এসে পড়ে। পরাধীন দেশে অবিশ্যি প্রথমে অশেষ বাধা ছিল। ইংরেজ শাসকগণ গোর্কিকে নিশ্চয় সদয় চোখে দেখেনি। ইংরেজ কেন সব দেশের শাসকগোষ্ঠী একই চোখে তাঁকে দেখেছে। তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, গোর্কি নোবেল প্রাইজ পাননি। অথচ ক্লুট হ্যামসুনের মত লেখকের যে, অমর কবি ব্লেকের ভাষায় ". . . . . 'make a heaven out of our misery' কপালে এই সিকা ছেঁড়ে অনায়াসে। পচা মাংসস্থিত পোকার কারবারী আঁদ্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীদের মত লেখকও নোবেল প্রাইজ পায়। এমন কী আলবেয়ার ক্যামু—পশ্চিমী সভ্যতার শ্মশানে বিদ্রোহের মুখোসে সেই সভ্যতা-রক্ষার পাহারাওয়ালা এবং যে বলতে পারে, " .... "There is only one philosophic problem which is truly serious, and that is suicide"

আত্মহত্যাবোধ জাগরণের সেই কাপালিকের হাতেও নোবেল প্রাইজ পৌঁছায়। কিন্তু গোর্কি বাদ যান। জনমতের চাপে পড়েই প্রাইজদাতারা বানার্ডশ', আনাতোল ফ্রাঁসকে পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়। এক কথায় নোবেল প্রাইজও আন্তর্জাতিক রাজনীতির শিকার। থাক, সে-কথা। বাংলাদেশে গোর্কির উপস্থিতি অনুভূত হয় দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে। তৃতীয় দশকের সামান্য আগেই গোর্কির ট্র্যাম্পস্ বা ভবঘুরেদের ছায়া আমাদের সাহিত্যে দেখা গেল। বাংলা সাহিত্যের উপর গোর্কি ও রুশ-সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে প্রচুর উপাদান পড়ে আছে। ডক্টরেট-কামী যে কোন ছাত্রের জন্য এখনও তা খোলা প্রাঙ্গণ। মোদ্দা কথা, গোর্কির ভবঘুরের দল এদেশেও এসে পড়ে। কল্লোল-যুগের তথাকথিত বিদ্রোহীরা সেই আল্‌খেল্লার মধ্যে সহজে নিজেদের গলিয়ে দিলে। পুস্তকের নামে পর্যন্ত তার রণন। 'যাযাবর', 'বেদে'। নজরুলের 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'। অবিশ্যি এই যুগের একমাত্র নজরুল এবং কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ব্যতীত আর কেউ ভবঘুরেদের খপ্পরমুক্ত হোতে পারেনি। গোর্কির যে আরো রূপ ছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো নানা ভূমিকা— তা আর কল্লোল-যুগের নাবালকদের চোখে পড়েনি। কারণ, তাদের আর নাবালকত্ব ঘোচেনি। এমন এক লেখক-পুরুষ অজ্ঞতার ঘোরে আচ্ছন্ন, পরম-পুরুষ সন্ধানে ব্যস্ত। আর একদা যিনি ইতরের মেথরের কবিরূপে নিজেকে জাহির করেছিলেন, তিনি এখন ঘাঁটি বদলান। অবিশ্বাস্য কিছু নয়। 'গ্রোথ্ অব দি সয়েলের মত উপন্যাসের লেখক ক্লুট হ্যাম্‌সুন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সশরীরে ফ্যাসিষ্ট নাৎসী-সৈন্যদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

স্পর্শকাতর ভাবালুতার মধ্যে একজন জনপ্রিয় সৎ সাহিত্যিক হিসেবে গোর্কি-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। তাঁর নায়ক-মূর্তি আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু তিনি মানব-বন্দনা প্রতিষ্ঠার পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাঁর আত্মচরিত-রাজিতে (যেগুলোর শিল্পমূল্য তাঁর উপন্যাসের চেয়ে কম নয়) আবার গোর্কির বজ্র উচ্চারণও শোনা যায় : " ...., ... "Man becomes man only through his resistance to his environment."

সুন্দরের পাশাপাশি এই কল্যাণ মাত্র আরো বহু শতাব্দী শিল্পীদের আদর্শ পাথেয় রূপে গণ্য হবে। রবীন্দ্রনাথেও এই সহ-অবস্থান দেখতে পাই। কিন্তু ভিন্ন রূপে। গোর্কি যখন শীতক্লিষ্ট পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে দাবদাহ, রবীন্দ্রনাথ সেখানে গগন-বিহারী ঘন-জলধর—অথচ মর্ত-পিয়াসী, গোটা পৃথিবী শস্য-শ্যাম রূপ দ্বারা আচ্ছাদনকামী। নজরুল ত গোর্কির আধ্যাত্মিক সহযাত্রী। মহান শিল্পীগণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কল্যাণের আদর্শ-ভ্রষ্ট হোতে পারে না। গোর্কির যাযাবর বৃত্তি তাই শেষ হয় বিরাট মানবগোষ্ঠীর গৃহসংস্থায়, চৈনিক লাও-সের মত যাঁর আদর্শ : একটি পরিবার একটি আকাশের নীচে। এই শিল্পের তত্ত্বও তিনি যোগান। তত্ত্ব ছাড়া কর্মের গতিপথ কি দিয়ে নির্ধারিত হবে? নানা দেশে নানা মহলে সেই তত্ত্বেও উপর দিয়ে অসংখ্য তফ্‌সীর, টীকার ঝড় বয়ে গেছে। তার নির্ণয়ের যোগ্যতা আমার নেই। গোর্কির মুখেই তার সংজ্ঞা শুনা যাক : "Socialist realism proclaims that life is action, creativity whose aim is the unfettered development of man's most valuable individual abilities for his victory over the forces of nature, for his health and longivity, for the great happiness of living on earth, which he, in conformity, with the constant growth of his requirements, wishes to cultivate as a magnificent habitation of a mankind united in one family." নেচারেলিজম, রিয়ালিজম, ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম প্রভৃতি তত্ত্বের উপর গোর্কি নতুন মাপকাঠি উপহান দান করেন : সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। পূর্বোক্ত সংজ্ঞা থেকে লক্ষ্য করা যায়, কল্যাণের প্রতি তাঁর ঝোঁক কতটুকু। তাছাড়া মানবিকতার প্রতি গোর্কির কি দুদ্দর্ম আস্থা। অথচ তিনি স্বাদেশিকতার শীকার নন। কিপ্‌লিং দানুৎসিও প্রভৃতির মত স্বদেশে সীমাবদ্ধ নন। যদিও কেউ বলবে না, গোর্কির স্বদেশ প্রেম কিছু কম ছিল। তাঁর ভিলেনরাই দেখা যায়, দেশ-প্রেমের টুইটুম্বর রস-সিক্ত। অন্যের কা কথা। 'ক্লিম স্যামগীনের চরিত্র, অবশ্য দুশ্চরিত্র, লিয়ুতোভ পর্যন্ত বলে ওঠে. ". . . . . . . "Suicides singing a dirge over our own bodies! who is capable of this? only Russia!"

মহান লেখক নিজেই ডায়েরীর এক জায়গায় লিখেছেন :

Even the fools in Russia are peculiarly foolish, foolish in a way of their Own.

আর উদাহরণ অনাবশ্যক। গোটা মানবগোষ্ঠী গোর্কির আদর্শের চত্বর। মানব প্রেমের এই তাগিদ তাঁকে শিরোপা দিয়েছে প্রথম সোভিয়েট লেখক সংঘের স্রষ্টা হিসেবে। উক্ত সংস্থা গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন, "If these aims are directed towards only the professional welfare of literary workers, then the game has hardly been worth the candle. It seems to me that the union must set before itself not only the professional interest of writers, but the interest of literature as a whole. To a certain extent the union must assume leadership over the host of beginners, organize them, distribute their forces on different jobs and teach them how to work on material both of the past and the present."

বিশ্বের ইতিহাসে চারুশিল্পের প্রসারে এমন সংগঠন ও উদ্দেশ্য তুলনা-রহিত। গোর্কির শুভঙ্কর হস্তের ছাপ এখানে স্পষ্ট। সেই সময় অভিভাষণে তিনি লেখকদের সৃজনী-শক্তির এক সংজ্ঞা দান করেন। গোর্কির প্রজ্ঞার কাছে পেশাদার মনস্তাত্ত্বিকও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জায় মাথা হেঁট করবে। তিনি বলেন, “ . . . . Creativity is the degree of intensity in the work of the memory at which the rapidity of its operation produces from its store of knowledge and impressions the most outstanding and charateristic facts, pictures and details, and put them into the most precise and vivid words that all can understand.”

টীকা নিষ্প্রয়োজন। লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বজন বোধগম্য এবং চমৎকার মানসচিত্র-সংগঠনকারী শব্দ-রচনার সম্রাট। এই দিক থেকে তিনি যুগ যুগ মহৎ লেখকদের আদর্শ-স্থানীয় হোয়ে থাকবেন, আকারবাদী ফর্মালিস্টরা যা-ই বলুক।

জীবনের ক্ষেত্রেও গোর্কি ফর্মালিস্ট ছিলেন না। তিনি তত্ত্ব জানতেন। কিন্তু পেশাদার দার্শনিক ছিলেন না। ছিলেন মানব-প্রেমিক, লেখক। তত্ত্বের জালে মানুষ না হারিয়ে যায় সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। ধর্মতন্ত্রের অত্যাচারে ধর্ম উড়ে যায়, অনেকের সেদিকে খেয়াল থাকে না। লিওনিড আন্দ্রিয়েভের স্মৃতিকথায় গোর্কি লিখেছেন, “ . . . . . Difference of outlook ought not to affect symphathies, and I never gave theories and opinions a decisive role in my relations to the people.”

মানুষ ও মানুষে-মানুষে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছিল গোর্কির জীবনাদর্শের মূল কথা। আর আদর্শ অর্থ কর্মে ও চিন্তায় আত্মীয়তা স্থাপন। সেখানে ফাঁক মানেই ভণ্ডামি। তাই সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের তিনি উপহাস করেন, “এরা বৈশ্য সমাজের দেহের নোংরা ন্যাকড়ার উপর বসানো রঙীন তালি।”

২২শে জানুয়ারী, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। “রক্তাপ্লুত রবিবার।” এই শব্দ উচ্চারণে আজো রুশ জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণার হল্কা বয়ে যায়। সেদিন জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আদেশে পেট্রোগ্রাডের রাস্তায় শত শত নিরস্ত্র মানুষ হত্যাকাণ্ডের বলি হয়। নিজেদের দাবী-দাওয়া জানাতে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করেছিল জনসাধারণ। তারই শাস্তি। ক্ষোভে অস্থির গোর্কি জারতন্ত্র ধ্বংসের জন্য আবেদন প্রচার করেন। এই অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশে দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মহান ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস তখন টেলিগ্রাম পাঠান প্রতিবাদ জানিয়ে : “ . . . . The czarist government has no right to arrest Gorky. He does not belong to Russia only, he belongs to the whole world.”

মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা যতই বিস্তার লাভ করবে, আনাতোল ফ্রাঁসের তারবার্তা আরো তারস্বরে ততই প্রতিধ্বনি তুলবে, “ . . . . . গোর্কি কেবল রাশিয়ার নয়, গোর্কি সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

"Art is man added to nature"
- Bacon

বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্ক দার্শনিকদের চিরন্তন শিরঃপীড়া।

"Give me extension and motion and I will constrcuct the universe."

এই সদম্ভ ঘোষণা সত্ত্বেও দেকার্তীয় দ্বৈতবাদ কয়েক শতাব্দীব্যাপী, এমন কি আজও পেন্ডুলামের মত অস্থিরতায় নাচার। মন ও পদার্থের যোগাযোগহীন অবস্থান-স্বীকৃতির পরিণতি এক দিকে জড়বাদ; দেকার্তের শিষ্যরাই, যার ফলে, আধিদৈবিক ও অলৌকিক জগতের নিকুচি সাধন করে। অন্যদিকে মনের সর্বস্বতায় বিশ্বাসীদের কাছে জড়-পদার্থের প্রয়োজন ফুরিযে যায়। কিন্তু জড়বাদীদের অস্বোয়াস্তি মেটে না। বিশ্বজগৎ যদিও মনহীন, মানুষ তবু চিন্তা করে। মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ অনুভবের শিকার। সুতরাং মনের অস্তিত্ব ফুৎকারে ওড়ানো অসম্ভব। এই অস্বোয়াস্তি মেটানোর জন্যে দুই পথ খোলা থাকে। এক, আবার দেকার্তীয় দ্বৈতবাদে পুনর্মুষিক—যেখানে মন এবং জড় যোগাযোগহীন; একমাত্র অলৌকিকতার মাধ্যমেই সেখানে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। দুই, বর্তমান আশ্রয় দার্শনিক পরিভাষায় সাইকো-ফিজিক্যাল প্যারালেলিজম বা মন্‌কায়া-সমান্তরালবাদে—যেখানে মস্তিষ্কে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা অবিশ্যি উক্ত মতবাদে অনুপস্থিত। মোদ্দা কথা, ভাববাদী পর্যায়ে পড়পদার্থ সোজাসুজি নাকচ, তা মনের প্রক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। দুই বিপরীতের সাদৃশ্য আবিষ্কার দর্শনে এক জটিল প্রচেষ্টা। কান্টের অবদান এই ক্ষেত্রে অপরিসীম। জ্ঞান মনের উপর নিষ্ক্রিয় সংবেদন-ছাপ নয়। মনেরও সক্রিয় গুণাবলী আছে, ক্যাটিগরী নামে খ্যাত। জ্ঞান নির্ভর করে মানুষের অন্বিষ্টের উপর, দ্রষ্টার স্বার্থ ও মানসিক ঐশ্বর্যের উপর, যুগ-রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িত। জ্ঞান তাই আপেক্ষিক অসম্পূর্ণ। কিন্তু একদম গোচর-বহির্ভূত নয়। প্রপঞ্চ জানা যায়। কিন্তু বস্তু-স্বরূপ থিং-ইন-ইট্‌সেলফ সর্বদা জানার বাইরে মাথা খোঁড়ে। দেকার্তীয় দ্বৈতবাদের জায়গায় কান্ট আর এক দ্বৈতবাদ খাড়া করেন। হেগেলের চিন্তায় তার একটা উত্তরণ ঘটে। বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই। কারণ উভয়ই পরম সত্তার প্রতিচ্ছায়া হিসাবে এক অখণ্ডতায় বিধৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের মধ্যে প্রতীতী, পারসেপ্ট এবং প্রত্যয়ের (কন্‌সেপ্ট) বিরোধিতা আর থাকে না। হেগেলের মতে জ্ঞান, শিল্প এবং ধর্ম পরমের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্তর মাত্র। জ্ঞানের শেষ অমরাবর্তী দর্শনেই মেলা সম্ভব।

ভূমিকার এই আঁচড়টুকু প্রয়োজন ছিল। কারণ, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরই প্রয়োগ ঘটে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায়। যথা, ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব তাঁর নব্যভাববাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করতেন, মনের ক্রিয়াকলাপের দুই স্তর—বোধি ইনট্যুশান এবং প্রত্যয়, যারা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মনের ক্রিয়াকলাপের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য প্রয়োজন বোধি থেকে প্রত্যয়ে পৌঁছানো। ইন্ট্যুইশনে কেবল চিত্রকল্প বা ইমেজ সরবরাহ করে, যদিও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দান সম্পর্কে নীরব। পূর্ণ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন প্রত্যয়। প্রত্যয় বৈশিষ্ট্যে মূর্ত সামান্য বা কংক্রিট ইউনিভারসেল এবং নিজেই নিজের প্রকাশ-কলাপ। শিল্পীর কর্তব্য বোধির রূপদান। এই প্রকাশই তার কর্তব্য। শিল্প বোধিমূলক জ্ঞান, এক নির্বিকল্প ধ্যানের প্রকাশ। কল্যাণ ও সত্যের দায়িত্ব শিল্পীর নয়। যা শোপেন-হাওয়ারের মতে, শিল্প বিষয় ও বিষয়ীর উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দেয়। আস্বাদের ফলে এক ধ্যানময় চৈতন্যময়তা—যেন সাংখ্যের অসঙ্গ পুরুষ। এই চিন্তা তাঁর দার্শনিক সূত্রজালেরই ঈষৎ অদল-বদল প্রয়োগ।

রবীন্দ্রনাথ পেশাদার দার্শনিক ছিলেন না। "পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার"। নিজের বাণীর মূর্ত প্রতিরূপ তিনি। তাঁর নবী-তুল্য দৃষ্টি অনেকান্ত বিস্ময়কর ধারায় প্রবাহিত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রয়েডের বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর। তিনি সাধারণ চিকিৎসক মাত্র। অস্ট্রিয়ার ভেতরে বা বাইরে কোথাও তাঁর চিন্তার আলোড়ন নেই। সাহিত্যের আলোচনায় অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তখনই অবহিত। বিখ্যাত "ছেলেভুলানো ছড়া।" প্রবন্ধের প্রথমাংশ যেন মনোসমীক্ষণবাদীর রচনা। অস্তিত্ববাদী দর্শন গেঁজিয়ে উঠল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরাজয়ের গ্লানি-হত ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তার দু' দশক আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দুঃখের তীব্র উপলব্ধি আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক. . দুখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপ্সা থাকতে দেয় না।" অস্তিত্ববাদীদের আংষ্ট বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথে ধ্বনিত। অস্মিতা শব্দটি পর্যন্ত লক্ষণীয়। এমনই দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়। পূর্বেই কথিত, তিনি পেশাদারী অর্থে দার্শনিক ছিলেন না। বিনয়সহকারে তিনি বলেছেন, সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর বিচার "অন্তরের উপলব্ধি থেকে, বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়।" কিন্তু প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা অকুতোভয়। সারগ্রাহিতার পথে তিনি কোথাও এগোননি। শৈল্পিক অনুভূতিই কবিগুরুর চিন্তার সারথী। এই জন্য তাঁর বিপুল রচনা-সম্ভার নানারূপ সাক্ষী হিসেবে বর্তমান, যদিও তত্ত্বের ময়দানে কত বার না তিনি হাজিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন।

আমার চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূর্বে-পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হ'ল সে।

বার্কলের মতো চরম ভাববাদ যেন রবীন্দ্রনাথে। বিষয়ী প্রাধান্য এখানে স্পষ্ট। কিন্তু কবিগুরুর মানস-পরিচয়ে এহ বাহ্য। "জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পেছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।" পূর্বোক্ত কবিতার চিন্তা-রাজ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন। 'আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অন্তরে নিজের মধ্যেই একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোন বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব। সেই জন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।"

অর্থাৎ কবিগুরুর মতে সাহিত্যশিল্প নিমিত্ত মাত্র। সত্তার সঙ্গে মানুষের একাত্মতা সাধারণ জীবনে ঘটে না। কবি নিজে রেলের বগী এবং প্যাসেঞ্জারের উপমা টেনে অন্যত্র বলেছেন যে, রেলারোহীর কাছে তখনকার মত বগীটা সত্য, কিন্তু বাইরে ধরিত্রী তার জন্যে অপেক্ষার্থী। প্রাত্যহিকতার শত পাকে মানুষ সত্তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। শিল্পের সাহায্যে এই ভেদ ঘোচে। কবির সাফাই : "আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে.. তখন তার মধ্যে জানে আপনাকেও...। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোন বাণী নেই যা অস্পষ্ট ভাষায় বলছে, আমি আছি।.. আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ।" শিল্প ব্যক্তিচেতনা ও বিশ্বচেতনার সেতুবন্ধ নয় শুধু তাদের গভীরতর করার বাহন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির আর এক ভাষণ : "সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ। . . কবির কাজ সেই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা।"

রস চিত্ত-বৃত্তির আস্বাদ, অলৌকিকের সঙ্গে তার যোগাযোগ। অভিনব গুপ্ত বা আনন্দবর্ধনের সঙ্গে কবির মত-সাদৃশ্য যথেষ্ট। প্রাচীন রসবাদীগণ শিল্পের বিচার করেছেন পাঠকের দিক থেকে, শিল্পীর দিক থেকে নয়। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সেই পথানুসারী। এই ক্ষেত্রে কবি, এমন কী হেগেলও, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর প্রতিধ্বনির হেরফের। অতীতের জের রবীন্দ্রনাথ আরো একভাবে টেনেছেন। যেহেতু রস অলৌকিক বস্তু-জগতের নিয়ম সেখানে প্রযোজ্য নয়। শিল্পজাত দুঃখ তাই দুঃসহনীয় নয়। বরং আবেগ-মোক্ষণ, চিত্ত-প্রশান্তির সহায়—অভিনব গুপ্তের ভাষায় বিশ্রান্তি। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম নিজের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধির জন্য আপন লীলায় বিকাশমান, মানুষও আনন্দস্বরূপ আস্বাদনে নিজেকে নানাভাবে প্রকাশরত। আনন্দই শিল্প। কবিগুরু সাক্ষ্য দেন, "সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে কেবল আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে।"

আর এক দিকে শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ছিল রেনোসাসের আদর্শ-অনুরূপ—শিল্প অবসরের ফল। সৌন্দর্য প্রয়োজনের স্পর্শহীন। কবিগুরু প্রয়োজনের উপর বহু জায়গায় তূষ্ণী মনোভাব দেখিয়েছেন, "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা, তাকে খেলা না ব'লে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি, প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়।" অন্যত্র—"ব্যবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজন-সাধনে এর মূল্য নয়. .।" অর্থাৎ শিল্প-সৃষ্টির অধিকারী তারাই যাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটে গেছে এবং মূলত যারা অবসর-পুষ্ট সমাজের সর্বস্তরে শিল্পসংস্কৃতি মিছরীর সুতোর মতো (উপমা কবিগুরুর) অদৃশ্য চালিয়ে দিতে না পারলে সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব নয়। কবি বহু জায়গায় এই মতের সোচ্চার শাহী ট্যাড়াদার ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনকে এমন অমর্যাদা দিলে সর্বগামী সংস্কৃতির সম্ভাবনা কোথায়? অন্যদিকে কারু ও চারু শিল্পের মধ্যে এক বিরাট পরিখা হাঁ করে থাকছে। এই বিভেদ কবিগুরুর কাছে দুঃসহ ছিল। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি, জীবনযাপনকে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায়। বিশ্বাস কঠিন, কেন প্রয়োজনের উপর তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন বিরূপ মত পোষণ করতেন? সৌন্দর্যের বাহন সামগ্রী, যা প্রয়োজনীয়তার সীমানাবাসী। আনন্দবর্ধনের প্রতিধ্বনি তোলা যায়, আলোকার্থী দীপের প্রতি কিভাবে অবহেলা দেখাতে পারে?

রেনেসান্সী আদর্শে রবীন্দ্রনাথের এই আচ্ছন্নতা কিন্তু তাঁর মানসস্বরূপ নয়। সাহিত্য শব্দের ধাতুগত অর্থের কথা কতবার না বলেছেন : "সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন। পূর্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্ত যোগ নাই। কেবল পূর্বাপর প্রচলিত জড়প্রথা-বন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয়, তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্বপরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনো রক্ষিত হইতে পারে না।" শিল্পের এই কম্যুনিকেশান যা সঞ্চারবাদী তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের সমগোত্রীয়। অভিনব গুপ্তের ভাষায় এমন 'সন্তানবৃত্তির অধিকারী বলেই শিল্প যুগযুগান্তর উত্তীর্ণ গতিতে মানুষের মনে ধাক্কা দেয়। মুছে যায় দেশকালপাত্রের জুলুম।

রবীন্দ্র-মানস কিন্তু কোন বিশেষের দাস নয়। ক্রোচের মতো অভিব্যক্তিবাদীদের প্রাঙ্গণেও তার স্বচ্ছন্দ বিহার। কবির জবানে, '.. সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে, তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র।" শিল্প আপন অনন্যতায় ভাস্কর। বোধির রূপায়ণ শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব। "সমাজ সংসার মিছে সব।" ক্রোচে নিজের চোখের সামনে ফ্যাসিজমের বর্বর দোর্দণ্ডতা বাড়তে দেখে নিজের মত বদলেছিলেন কি না জানা যায়নি। চারুকলা-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্বাচন-ত্যাগ-পরিত্যাগ অপরিহার্য—তা বুদ্ধির ব্যাপার। শুধুমাত্র বোধি বা ইন্ট্যুইশনের দোহাই পেড়ে এই অপরিহার্যতা কি করে এড়ানো যায়? ক্রোচে তদ্বিষয়ে কি ভাবতেন জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অভিব্যক্তিবাদীদের ছলনা-মুক্ত। হাঁক-ফুকার বলেছেন, 'সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম;—সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা।" কয়েক পংক্তি পূর্বে উদ্ধৃতির সঙ্গে এই ঘোষণার স্ববিরোধ স্পষ্ট। কিন্তু কবিগুরু কোথাও সীমাবদ্ধ হওয়ার দুর্বলতার সঙ্গে আপোষ করেন না।

ইন্ট্যুইশনিস্টদের জের রেখেই কবি মন্তব্য করেন, "লোক যদি সাহিত্য হতে শিক্ষা পেতে চেষ্টা করে তবে পেতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য কোন চিন্তাই করে না। কোন দেশে সাহিত্য ইস্কুলমাস্টারির ভার নেয়নি।" অথচ কবির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট, সত্য আনন্দরূপ প্রকাশ। মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের বাঁধা গাঁটছড়া খুলতে রবীন্দ্রনাথের অনীহা অত্যধিক। উপমার সম্রাট তিনি, উপমাত্মক (এ্যানালজি) যুক্তিরও রাজচক্রবর্তী। কবির ঘোষণা, 'এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে, যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয়; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়।" কবির মতে এইভাবে সত্য ও আনন্দে সখ্য। বন্ধু আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ মঙ্গলেচ্ছু। এই ভাবে সত্য শিব সুন্দরের ভাব-সম্মিলন ঘটে। উপমাত্মক যুক্তির যথার্থ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক মহলে কেউ আর জোরে-শোরে তা উচ্চারণ করেন না। বরং সমর্থন মেলে :

" .... If the metaphysical nature of the world should be that of the relation of finite existents to an absolute existent, the absolute existent would be sui generis and in principle could only be described analogically."

(Nature of Metaphysical Thinking – D. Emmet)

প্রমাণস্বরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। বেদ, উপনিষদ। ডান্টের ডিভাইন কমেডি তো স্কোলাস্টিক দর্শনের কাব্য-ভাষ্য। বর্তমান যুগে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে ধারণার প্রশস্ত ক্ষেত্র তাদের উপন্যাস, নাটক।

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে প্রদত্ত। নদী ও বর্ষা রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য রচনায় অজস্র ছড়ানো। অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার অধিকারী তাঁর সদা-জাগর প্রবাহ-উচ্ছল আত্মা যেন এই দুই প্রতীকের স্বপ্নানুষঙ্গ। কবিগুরুর মানস-পরিচয়দান অনেক সাধনা এবং গবেষণাসাপেক্ষ। বর্তমান লেখক সম্পূর্ণ অবহিত, সূর্যের মধ্যে বাল্‌ব জ্বালানোর পিকাসোচিত দৃষ্টান্ত-দুঃসাহসাই এই প্রচেষ্টা।

ভাষাপ্রতীক প্রসঙ্গ

প্রতীক-গঠনের ক্ষমতার ফলে মানুষ স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা অক্লেশে পেরিয়ে গেছে। মানব সভ্যতার বিচিত্র অগ্রগতির মূলে এই একটি উপাদানের ভূমিকা সত্যি বিস্ময়কর। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থে আছে মানুষ স্রষ্টার রূপাভাস বা ইমেজে তৈরি। ইমেজ প্রতীকের আর এক চরিত্র, যেমন ভাষা প্রতীকের এক শক্তিশালী প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে, লেখন-পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে মানুষ নিজের সীমানা আরো সহজে অতিক্রম করল। জ্ঞান আর কোন এক যুগ বা দেশের সম্পত্তি হোয়ে থাকল না, বরং অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে দৃঢ় সেতুরূপে পরিগণিত হোলো, যেখানে স্থান-কাল গৌণ। প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পেল নির্যাসের রূপ। মানুষ সাড়া দিতে শিখল প্রতীকের কাছে। এ যেন নিজের ভয়-ভাবনা নিয়ে শিশুর পুতুল খেলা। একটা নিশান ত শুধু নিশান নয়, বরং বহু চিন্তা-ভাবনা এবং স্বপ্নের জাগৃতি। সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে প্রতীকের সংখ্যা বেড়েছে। যেখানে প্রতীক সীমাবদ্ধ মানুষও সেখানে সীমাবদ্ধ। চেতনা বিচিত্রমুখী হয় প্রতীক সৃষ্টি দ্বারা অথবা প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণে। এই বিচিত্র ইতিহাস আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ধর্মের আচার উপচারে, বিবাহে ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপে প্রতীকের ভূমিকা সহজে চোখে পড়বে। সমাজকে সংহতিদানের এমন কার্যকরী ক্ষমতা আর কিছুর আছে বলে আমার জানা নেই। এই সংহতি সম্ভব হল প্রতীকের সেই দ্যোতনা-ধর্মের সাহায্যে যা অতীত বর্তমানকে, নিজ ও পরকে এক পংক্তিতে টেনে আনে। ভাষা প্রতীকের সবচেয়ে শক্তিশালী সন্তান। চেতনার বিস্তীর্ণ পরিধি জুড়ে তার জায়গা।

চেতনার বিস্তীর্ণ পরিধি জুড়ে তার জায়গা বলেই ইতিহাসে ভাষার ক্ষেত্রে নানা কোন্দল সমস্যা দেখা দেয়। সংস্কৃত এক কালে ছিল দেবভাষা। শূদ্রের কোন অধিকার ছিল না সেখানে। তার জের মধ্যযুগের বাংলায়। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় শাস্ত্র রচনা বা আলোচনার শাস্তি ছিল চতুর্দশ পুরুষ নরক-বাস। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের পর দেশী ভাষার প্রসার ঘটে। কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস আখ্যা পান 'সর্বনেশে'। অপরাধ সাধারণ বাংলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত রচনা।

এই জাতীয় বিরোধের হেতু আরো গভীরে খুঁজতে হয়। ইউরোপে এমন ব্যাপার ঘটেছিল ল্যাটিন ভাষাকে কেন্দ্র করে। ইউরোপে যখন জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের বন্যা দেখা দিল, তখন চার্চের আধিপত্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। দেশে দেশে স্থানীয় ভাষার প্রসার শুরু হলো। জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা জাঁকিয়ে বসতে লাগল আর ল্যাটিন হটে যেতে লাগল। চার্চ থেকে তখন এমনই ধর্মের জিগীর উঠেছিল। কারণ, ভাষার সঙ্গে সামাজিক আধিপত্যও চলে যায়। ল্যাটিন তা-ই পবিত্র দেবভাষা। কিন্তু সামাজিক জোয়ারের কাছে চার্চের পরাজয় যেমন অবধারিত ছিল, ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। এক এক জাতিকে কেন্দ্র করে ইউরোপে কত ভাষাই না দেখা দিল।

আসল কথা, সামাজিক আধিপত্যের প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণী নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন জায়গা দিতে নারাজ ছিল। ভাষার আদল সাধারণ বাংলা ভাষা চালু হোলে মানুষের চোখ ফুটবে। সুতরাং মাতৃভাষা চর্চায় চৌদ্দ পুরুষ রৌরব নরক অবধারিত। এই ফতোয়া দিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ব্রাহ্মণরা যারা নিজেরাই শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর দোসর। পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার চর্চার প্রসার ঘটে মোগল-পাঠান নবাবদের আমলে। হোসেন শা'র রাজত্বকালে তার উজ্জ্বলতম বিকাশ। কিন্তু এই শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার প্রেমে বা বিদ্যার রূপে আকৃষ্ট, হেন মহৎ কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলে দীনেশ সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা ভাবে গদগদ হোয়ে ওঠেন; আসল ঘটনা তাঁরা তলিয়ে দেখেননি। পরবর্তী শাসক শ্রেণীর কেউ বাংলা জানতেন বা শিখতেন এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। তবে অন্য সাক্ষ্য আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য। পূর্বতন ব্রাহ্মণ শাসক-গোষ্ঠীকে জসনাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছিল পরবর্তী মোগল-পাঠান শাসকদের প্রতি বিশেষ প্রয়োজন নিজেদের গরজে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রক্ষার্থে। নচেৎ তাঁরা টিকতেন না। তাই ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের শ্লোগানের পাশাপাশি শুরু হোলো জনসাধারণের ভাষার প্রতিও কৃপা-আনুকূল্য। পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠী ও সংস্কৃত ভাষা ত প্রায় সমার্থবাচক। সুতরাং ধ্বংস হোক সংস্কৃত ভাষা। ইতিহাসের গতি আজ বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত বিষয়। ইতিহাসের জের এই ভাবেই চলে। ইংরেজরা আবার সেই একই কায়দায় রাষ্ট্রভাষা ফারসী উচ্ছেদ সাধন করল।

অধুনা উনিশ শতকে পরাধীনতার জটাজালের মধ্যে, ইংরেজী শিক্ষা মারফৎ বিশ্বের চেতনার প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াতে পারত এই দেশ। কিন্তু তখন প্রাচীন চেতনায় বুঁদ, নবাবী ঢেকুর-মাখা জিগীর উঠল : দারুল হরবে (বিধর্মীর ঠাঁইয়ে) ইংরেজী শিক্ষা কাফেরী। মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্তমান পশ্চাৎপদতার বহু হেতুর সঙ্গে এই হেতু সম্পর্কে আজ কোন দ্বিমত নেই। চেতনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লে সমাজ আর কি দিয়ে এগোয়? স্যার সৈয়দ আহমদের স্বল্পকালীন বিপ্লবী ভূমিকা এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি কাফেরী ইংরেজী ভাষা প্রসারের অপরাধে দুবার গুণ্ডার ছোরার সম্মুখীন হন এবং সৌভাগ্যবশত বেঁচে যান। ঠিক একশ' বৎসর পরে, পটভূমি অনুযায়ী আজ ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক জানালা খুলে রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ছাড়া (সেখানে ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি ভাষার সমান দাবী) যখন জাতীয় জীবনের সবখান থেকে মুছে যাওয়া উচিত, তখন আবার ধূয়া উঠেছে : "ইংরেজী ভাষা ছাড়লে আমরা মূর্খ হোয়ে থাকব।" এই কিসিমের পণ্ডিতেরা ইংরেজদের সেই জারজদের বংশধর—সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ টিকিয়ে রাখতে একদা যারা ইংরেজী হালচালকে পরম তপঃ ব'লে গণ্য করত, ইংরেজের খেতাবকে ঠাওরাত স্বর্গসুখ প্রাপ্তিরূপে। ইতিহাস তথা বাস্তব পটভূমি চোখে না থাকার জন্য নিজস্ব ভাব-লোকে এই জীবেরা বিচরণ করে। যদিও দেখা যায়, দেড় শ' বছরের সংস্পর্শের পরও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক (এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষার প্রধানগণ) উড়িষ্যাবাসীর মত ইংরেজী উচ্চারণ করেন, তথৈবচ স্বরণে ইনটোনেশনে আর যা লেখেন, তা নিয়ে কোন ইংরেজ সাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয় গর্ববোধ করবে না; খুব জোর এ্যাংলো-পাকিস্তানী সাহিত্য শিরোনামায় ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের শেষে ফুটনোটের কায়দায় এক-দু' পাতা দিতে পারে। যারা জাত বেচে, তারা ইজ্জত বিক্রী করে। এই গণ্ড পণ্ডিতেরা কী বোঝেন না? হয়ত বোঝেন, ইতিহাসের অটোমেটন, ক্রীড়নকদের আক্কেলের পর্যায় যতদূর।

ভাষার সমস্যা তাই শেষ পর্যন্ত সামাজিক সমস্যা হোয়ে দাঁড়ায়। প্রতীকের এই বলিষ্ঠ সন্তান সমাজ-সংহতির এক বিরাট স্তম্ভ, পূর্বে উল্লেখিত ভবিষ্যতের সঙ্গে কালের সম্মুখ-পশ্চাতের সংযোজন এখানে এমনভাবে সাধিত হয়, তখন বর্তমান যোগায় বাঁচার প্রেরণা। প্রতীকের ধর্ম এমনই। সংগীতও কিছু শব্দের মারফৎ গড়ে ওঠে। অন্যান্য চরুকলা অপেক্ষা সংগীত এত আদিম এবং নির্বস্তুক (এ্যাবস্ট্রাক্ট) যে সেখানে প্রতীকের স্থান-কাল অতিক্রমনতার (ট্র্যানসেনডিং) রূপ খুব সহজে চোখে ধরা যায়। কীর্তন গানের ইতিহাস এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এই সংগীতের প্রেরণা বৈষ্ণব ধর্ম। কিন্তু বাংলাভাষী সংগীতপিপাসু মুসলমানের কাছেও তা অপূর্ব সম্পদ। নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কীর্তন গানের কথা এখানে স্মর্তব্য। নিজ ধর্মের গণ্ডী তিনি পার হোয়ে যান অক্লেশে। কারণ, দেশজ চেতনার মূল যেভাবে গড়ে ওঠে, তা অস্বীকার জীবনের বৈচিত্র্য বা অগ্রগতির সহায়ক নয়। তিনি জানতেন, প্রতীক ঐতিহ্য-পরম্পরার অনুরাগন। যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা প্রতীকের এই রূপের সংবাদ রাখেন। অবিশ্যি যারা কবি, অথচ চেতন-স্যাকরা নয়, বরং গতানুগতিকতার বৈশ্য-ব্যাপারী, তাদের কথা আলাদা। ইরানের শাহান শাহ যখন রাজ্যাভিষেককালে আরিয়ামেহের অর্থাৎ আর্যমিহির এই অগ্নিপূজক পারসীক উপাধি গ্রহণ করেন, তা ইসলাম-অধ্যুষিত ইরানের পক্ষে আদৌ লজ্জাকর ঠেকে না। জাহেলিয়া বা প্রাক-ইসলামিক যুগের কবিতা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মানুষকে মানবীকরণের পথেই দেবত্বের আভাস আসে। তাঁর মত বিপ্লবী সমাজ-সংগঠকের কাছে একথা নিশ্চয় অবিদিত ছিল না। এতিহ্যকে কেবল মূর্খেই অস্বীকার করে।

অবিশ্যি ঐতিহ্যবাহী প্রতীকের উৎপত্তি মন্ময় বা সাবজেক্টিভ। তার দরুন কেউ যেন মনে না করে প্রতীক নেহায়েৎ ক্ষতিকর কল্পনা বা অবাস্তব। বরং সমাজ-জীবনের মাটির উপর তাদের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ভাষার প্রতি অবহেলা তাই জীবনের প্রতি অবহেলা। যথাযথ চেতনার প্রকাশ ব্যতিরেকে কোন সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না।

সুষ্ঠু ভাষাহীন সমাজ বোবার রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষার লাঞ্ছনা, মানুষের অপমান, মনুষ্যত্বের অবমাননা—একই শিকলে বিধৃত। প্রতীক, ভাষা, মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে একাত্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরের অন্বেষা

গৃহিণীর রান্না সুন্দর। ক্রিকেটের মাঠে বাউন্ডারি মার সুন্দর। সুহৃদের সাহচর্য্য সুন্দর। তন্বী যুবতীর হাসি সুন্দর। সুন্দর-শব্দের আটপৌরে এমন প্রয়োগ ধাঁধা লাগায়। একমাত্র সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা মারফৎ ওই আলো-আঁধারির নিরসন হতে পারে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক অনুকারবাদীদের হদিস থেকে বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার সেমান্‌টিস্ট বা শব্দার্থ-বিজ্ঞানীদের ফরমান পর্যন্ত সেই অন্ধকার ছায়া আরো ঘনীভূত করে তোলে।

এদেশী প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সৌন্দর্য্যকে লোকোত্তর কোন ব্যঞ্জনা ঠাউরাতেন। পণ্ডিত জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধর-গ্রন্থে বলছেন, রমণীয়তা বা সৌন্দর্য্য লোকোত্তর-হলাদজনকজ্ঞানগোচরতা। তাঁরা ব্যঞ্জনার নাম দিয়েছিলেন ধ্বনি। সাহিত্যদর্শনকার বিশ্বনাথ লিখছেন :

সত্ত্বোদ্রেকখণ্ডপ্রকাশানন্দচিন্ময়
বেদান্তরস্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

বাংলা তর্জমায়—সত্ত্বগুণের উদ্রেকে অখণ্ড স্বপ্রকাশ আনন্দচিন্ময়গলিত বেদ্যান্তরস সম্পর্ক যে-রস পূরিত হয়ে ওঠে তা ব্রহ্মাস্বাদের অনুরূপ।

প্রাচীন শাস্ত্রীবৃন্দ সৌন্দর্য্যকে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা মনে করতেন। তাঁদের মতে, শিল্পী এবং বিশ্বস্রষ্টার সম্বন্ধ অতি নিকট। সৌন্দর্য্যের মূলপ্রাণ সেই অজানার আস্বাদন। হিন্দু শাস্ত্রে ভগবানের অন্যতম নাম কবি।

এখন প্রশ্ন, ওই লোকোত্তর ব্যঞ্জনার স্বরূপ কী? ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রীদের কাছে তার জবাব এত সহজ ছিল, সেই ব্যাপারে কোন বচসা তাঁরা মনে করতেন পণ্ডশ্রম। কোন অর্বাচীন ভগবানে বিশ্বাস করবে না?

কিন্তু যারা স্রষ্টা বা ভগবানে বিশ্বাসী নয়, তাদের পক্ষে সৌন্দর্য্য উপভোগ বা সৃষ্টি কী তবে সম্ভব নয়? প্রাচীন পণ্ডিতদের মনে এই প্রশ্ন কোনদিন জাগেনি। কারণ, ধর্মকে তাঁরা আবহমান কাল থেকে বর্তমান এক ঐতিহাসিক ব্যাপার রূপে ধরে নিয়েছিলেন। প্রাচীন যূথচারী আদিম মানবের কাছে প্রচলিত অর্থে কোন ধর্ম ছিল না। ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল এবং তৎকেন্দ্রিক বিশ্বাসই ছিল তাদের সম্বল। সেই দলচারী মানুষের আঁকা বনবৃষ, হরিণ ইত্যাদি আজও সৌন্দর্য্যপিয়াসীর তৃষ্ণা মেটায়। তারা কিসের ব্যঞ্জনা ফুটিয়েছিল? আধ্যাত্মবাদী নন্দনশাস্ত্রীদের তত্ত্ব তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিচারে সায়যোগ্য নয়। তাঁদের মতানুযায়ী নাস্তিকের পক্ষে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অসম্ভব। তাহলে গোর্কির অমর উপন্যাস, নাটক, কিংবা পিকাসোর ছবি রচনার ব্যাখ্যা কোথায়? নাস্তিকতার পুরুতপ্রধান নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'র কী দশা হবে?

গ্রীক অনুকারবাদীরা অমন ঝামেলার মধ্যে ছিলেন না। গ্রীক মনীষীদের মতে, প্রকৃতির অনুকরণই সৌন্দর্য্যের মূলকথা। এ্যারিস্টটল লিখছেন, "ইনস্টিংক্ট বা উপজ্ঞা হিসেবে অনুকরণ আনন্দের অনিঃশেষ উৎস।" চিত্রণমূলক শিল্পের ব্যাখ্যা কতকটা এইভাবে সম্ভব। কিন্তু শিল্পী ত শুধু প্রকৃতির অনুকরণ করেন না। প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায়, তাঁরা মনের মাধুরীও মেশায়। আলঙ্কারিক মম্মটের ভাষায় :

নিয়তিকৃতনিয়তিরহিতাং হ্লাদকময়ীমনন্যাপরতন্ত্রাম
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কর্বেজয়তি॥

পদের ভাবার্থ : শিল্পীর বাক্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁর রচনা প্রাকৃতিক সৃষ্টি-নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়। তার বাক্য নবরসরুচি-পরিবৃত। তাঁর স্বচ্ছন্দ স্বকীয় আনন্দ সৃষ্টির ব্যতীত অন্য কোন নিয়মের অধীন নয়।

অনুকারবাদীদের মতে, ফলে মূল্যচ্যুত, যদিও শিল্পী সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুকরণ করে থাকেন। লক্ষণকে হেতু ঠাউরানো ভুল। পণ্ডিত আনন্দবর্দ্ধন লিখেছেন, "অপার কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি।" অনন্ত কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র স্রষ্টা। অনুকরণ তাদের একমাত্র সম্বল নয়।

আধুনিক ইনট্যুশানিস্ট বা অপরোক্ষানুভূতিবাদীদের মুখে প্রাচীনদের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। কারণ, প্রথমোক্ত পণ্ডিতদের ধারণা ইন্দ্রিয়জ সমস্ত রূপাদিবোধ অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। সৌন্দর্য্যের কোন বহির্সত্তা নেই। সৌন্দর্য্যবোধই সৌন্দর্য্য। সুন্দর বাড়ী। কথাটা স্ববিরোধী। কারণ, বাড়ী কখনও সুন্দর হোতে পারে না, যেহেতু তা বাইরের বস্তু। ক্রোচের জবানী : "Because the beautiful is not a physical fact, is does not belong to the thing but to the activity of man, to spiritual energy.

অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বস্তুজ ব্যাপার নয়, বরং মানুষের ক্রিয়াকর্ম, আধ্যাত্মিক তেজবল। ইনট্যুশনিস্টরা আরো মনে করেন, প্রকাশভঙ্গীই সৌন্দর্য্যের প্রাণ, বিষয়বস্তু গৌণ। ক্রোচীয় ভাষ্যে,

"It is true that the content is that which is convertible into from, but it has no determinable qualities until the transformation takes place. We Know nothing of its nature. It does not become aesthetic content at once, but where effectively transformed.

তাই সৌন্দর্য্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ভাল-মন্দ–সমস্ত নৈতিকতার উর্ধ্বে। কারণ, শিল্পের জগৎ প্রতিভাসিক কল্পনায় মাত্র নিবদ্ধ। শিল্পী ধ্যানদৃষ্টিযোগে সেই সৌন্দর্য্যলোকে আমাদের উন্নীত করেন। বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গৌণ ব্যাপার। অবিশ্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশে বহু ভগবদভক্তিমূলক কবিতার পাশাপাশি কার্দ্দুসীর শয়তান" কবিতা পড়লে, অমন ধারণা ভিত্তিহীন বলা চলে না।

কিন্তু ইনট্যুশান বা অপরোক্ষানুভূতি কী? এদিকে আদৌ সুষ্ঠু পরিষ্কার নন ইনট্যুশানিস্টরা। তারা বলেন, সাধারণ মানুষ যে-ভাবে জ্ঞান লাভ করে, ইনট্যুশান তেমন জ্ঞান নয়। তা স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বে উল্লেখিত লোকোত্তর ব্যঞ্জনাবাদীদের প্রায় অনুরূপ। সেমান্টিষ্টরা শুধু শব্দ-সজ্জার উপর সৌন্দর্য্যের সৌধ গড়ার পক্ষপাতী।

শিল্পের ক্ষেত্রে আবেগের রাজসিকতার কথা আধুনিককালে প্রথম উল্লেখ করেন রুশো। জার্মান মনীষী আর্নস্ট ক্যাসিরের তাই লিখেছেন, সৌন্দর্য্য তত্ত্বের আলোচনা ক্রমশ ধন্যাকতা থেকে অন্তর্ভাবকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। We had only exchanged an onomatopetic theory of art for an interjectional theory. (An Esay on man. page-181).

অবিশ্যি ব্যতিক্রম আছে বৈকি। কেবল উপযোগিতার সাহায্যেই অনেকে সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন। শেলী, টলস্টয়ের মত প্রতিভাধর শিল্পীবৃন্দ এই গোত্রভুক্ত। টলস্টয় হাঁক ফুকার ঘোষণা করেছেন, "Art is not as metaphysician says, the manifestation of some mysterious idea of beauty or God..... it is not the production of pleasing object and above all it is not pleasure. But it is a means of union among men joining them together in the same feling and indispensable for life and progress towards well-being of individual and humanity." (What is Art).

রুশ ঔপন্যাসিক বলছেন, শিল্পের সাহায্যে যে ভাবমণ্ডল গড়ে ওঠে, তারই ফলে মানুষে মানুষে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নিঃস্বার্থ আনন্দময় মিলনের সৌন্দর্য্য রচনা করে সৌন্দর্য্য। উপযোগিতা সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী নয়। শিল্পের উৎকৃষ্টতার বিচার মাপকাঠি হিসেবে তিনি ঐক্য-সূত্রের উপর জোর দিয়েছেন। মানুষকে সহানুভূতি এবং প্রেমে একত্রিত করতে পারে যে শিল্প যতখানি, তার উৎকর্ষও সেই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ওই মাপকাঠির সহযোগে টলস্টয় আর এক চরম প্রান্তে উপনীত। বিশ্ব-বিশ্রুত সঙ্গীতকার বিটাফেন, ভাগ্‌নার তাঁর কাছে নাকচ। আর শেক্সপীয়ার? টলস্টয় লিখেছেন, রোমিও জুলিয়েট পড়ে কোন সুপবিত্র চিন্তা মনে আসে? কামোদ্দীপক চিত্র ছাড়া শেক্সপিয়ারের অধিকাংশ নাটক আর কী? এসব অবিশ্যি প্রতিভার লড়াই। এমন বৃষযুদ্ধের ময়দানে দর্শক সাজাই যুক্তিযুক্ত!

ইংরেজ কবি শেলীও ছিলেন আর্টের ক্ষেত্রে হিতবাদী। তাঁর মতে, শিল্প মানুষের কল্পনার প্রকাশ। মানুষ ঠিক বীণা-যন্ত্রের মত। তার উপর বাইরের দৈনন্দিনতার ঘাত-প্রতিঘাত সব সময় তরঙ্গ তুলছে। কিন্তু শিল্পীর সেই শক্তি আছে যদ্বারা তিনি ঐ তরঙ্গকে এমনভাবে সাজান যে তার ফলে এক আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটে উঠে। এই সামঞ্জস্য শিল্পের প্রাণ।

শেষ পর্যন্ত হিতবাদেও ব্রহ্মস্বাদবাদীদের গন্ধ থেকে যায়। আর শিল্প যদি ব্রহ্মস্বাদ তাহলে নতুন শিল্পসৃষ্টির আর প্রয়োজন কোথায়? প্রাচীন কোন এক শিল্পীর সৃষ্টিই ত যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া, বিভিন্ন শিল্পরীতি আর্টফর্ম যথা, গাথা মহাকাব্য গীতিকবিতা নভেল ছায়াচিত্র, দৃশ্যনাট্য, বর্তমানে রেডিও-মারফৎ সৃষ্ট শ্রবনাট্য ইত্যাদির জাতকের ব্যাখ্যা কোথায়? আধ্যাত্মবাদীরা ফলে, হালে জল খুইয়ে বসেন।

আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন লিখেছেন :

অপরা কাব্যসংসারে কবিরের প্রজাপতি।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ত্ততে।
শৃঙ্গারী যৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ
স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ॥

অর্থাৎ, কবির চিত্ত যখন শৃঙ্খলার রসে প্লুত, তখন তাঁর রচিত বিশ্ব সেই রসময় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই অলৌকিকতার হেতু কী? তাছাড়া, অতীতের সার্থক সৃষ্টি আজও আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়বস্তু কেন? কি গুণে শিল্প এমন কালজয়ী হয়? লোকোত্তরতা যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাহলে কালোত্তরতার হদিস মেলে না। বিদ্যাপতির দুই পংক্তি :

চীরে চন্দন উরে হার না দেলা
সো আব গিরি নদী আঁতর ভেলা

হে প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির ভয়ে আমি বসনে চন্দন দিইনি, বুকে হার পরিনি। তাই কি আজ তোমার আমার মধ্যে এত গিরি নদীর ব্যবধান?

বিদ্যাপতির রাধার ব্যাকুলতা আজও মনে দাগ কাটে। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা আরো বলেছেন, সংস্কারের মূলে আঘাতজনিত রসের উদ্রেকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংস্কার ত বদ্‌লায়। বিদ্যাপতির যুগের সংস্কার বিগত। তবু তাঁর প্রেমের কবিতার সুষমা আজও হৃদয় লুঠ করে নিয়ে যায় কেন?

জড়বাদী দর্শন মারফৎ তার কিছুটা জবাব পাওয়া যায়। সেখানে নানা স্কুল আছে। শুধু সমাজের পটভূমি সামনে রেখে যারা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিচার করেন, তাদেরই কিছু আভাষ এখানে প্রদত্ত। মার্কস্‌বাদ এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার।

সমাজবাদীরা পূর্বসূরীদের ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কারণ, সৌন্দর্য্যের বহু লক্ষণ আবিষ্কার তাঁদের মহৎ কীর্তি। কিন্তু তাঁরা লক্ষণকে উৎপত্তিস্থল বা হেতু মনে করেছেন। সৌন্দর্য্য অবিশ্যি অলৌকিকতার ছাপ-মাখা। কিন্তু তা আদৌ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকোত্তর কিছু নয়, বরং মৃত্তিকাসঞ্জাত। এই মৃত্তিকার অপর নাম সমাজ। অন্যান্য জীবন-লীলার মত শিল্পও সামাজিক বিকাশ। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা সমীচীন। কাব্যে সংগীতে ব্যঞ্জনার দেখা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের যোগাযোগ নেই। প্রাচীন মনীষীরা ঠিক হদিস না পেয়ে এই লক্ষণকে অলৌকিক ধরে নিয়েছেন। শ্রোতার কাছে বক্তা যখন তার কথা উপস্থাপন করে, তার ঢং সচরাচর কথা বলার ভঙ্গী নয়। সেখানে কণ্ঠস্বরেও সঙ্গীত বা কাব্যের আমেজ এসে পড়ে। এখানে বক্তার উদ্দেশ্য তার বক্তব্যের সঙ্গে সকলের সাধারণীকৃতি। প্রাচীন সূরীগণ লক্ষণ ঠিকই ধরেছিলেন। জড়বাদী নন্দনশাস্ত্রীদের মতে তার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। এই প্রতীয়মান লোকোত্তরতা মানুষ এবং প্রকৃতির সম্বন্ধ-জাত। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। কিন্তু কিছুটা ধৃষ্ট সন্তান। নজরুলের কথায়—

আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল।

প্রকৃতির সন্তান, তবু মানুষ ওই জননীর নিপীড়ন সহ্য করতে প্রস্তুত নয়; স্তনদাত্রী মাতার অবাধ্য পুত্রের মত সব সময় নিগড়-কাটার প্রয়াসী। আবার প্রকৃতি স্তনদাত্রী হলেও সহজে তা দান করে না। তাই মানুষ পরিবেশের বিরুদ্ধে চিরদিন বিদ্রোহী। আদিম যূথচারী মানব প্রকৃতিকে প্রথমে বশ করতে শেখেনি। সে তার ইচ্ছা আরোপ করত পরিবেশের উপর। এই আরোপিত ইচ্ছা থেকে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের জন্ম। বাঁচার জন্যে তার ভাল ফসল দরকার। বর্তমানকালের মানুষের মত তার হাতে লাঙল কী ট্র্যাক্টর কল্পনা করা স্রেফ অর্বাচীনতা। আদিম মানবের সম্বল দুই হাত (পা-ও) কিছু কাঠ বা পাথরের অপরিণত হাতিয়ার। তারই সাহায্যে প্রকৃতি বিজয়ের স্বপ্ন দেখা। উপকরণের অভাবে ইচ্ছা বা উইলই সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বীজ ছড়ানোর আগে বাতাস-দোদুল বা শিহরণ-চঞ্চল ফসলের মত যূথবদ্ধ নাচ। এই নৃত্য লাঙলের মত কার্যকরী নয়। কিন্তু তা আদিম মানবকে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা যোগাত, আধুনিক ভাষায় : অন্তপ্রেরণা। সম্ভাব্য বাস্তবকে কল্পনায় এঁকে, সেই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে অগ্রসর হোত আদিম মানব। প্রাচীন শিল্প তাই 'মিমেটিক' বা অনুকরণ-প্রবৃত্তিজাত। এ্যারিস্টটল ও গ্রীক অনুকারবাদীদের হদিস এখানে স্পষ্ট। শিল্পের জগৎ কল্পনাময় কিন্তু অলৌকিক নয়।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়ায়ে মানুষ একদিন কল্পনাজগতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আজ তার রকম বদলেছে সমাজের বহু সহস্র বৎসরব্যাপী বিচিত্র বিবর্তনে। কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়নি। কারণ, প্রকৃতি সেই কুহকিনী, লড়ায়ে পরাজিত হলেও বিজিত এলাকায় আবার তার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই দ্বন্দ্বের ইতি ঘটেনি কোনদিন। বহু শতাব্দী বিবর্তনের সিঁড়ি পার হয়ে এলেও আদিম যুগের শত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত আঁচ এখনও শিল্প-সাহিত্যের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ায় জপতপ, তুক্‌তাক অগয়রহ্‌ কাব্য এবং সঙ্গীতে অনুপ্রবিষ্ট। মন্ত্র সুর করে পড়া হয়। সারী কি ছাদপেটা প্রভৃতি গানে সেই আদিম যুগের আঁচড় চেনা যায়। একটা সহজ উদাহরণের আশ্রয় গ্রহণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নদীর ধারে গাছের বড় বড় গুঁড়ি-সরানোর কায়দা অনেকে দেখে থাকবেন। কাছি দিয়ে গুঁড়িটা বেঁধে মজুরেরা জায়গা-মত দাঁড়ায়। তারপর সর্দার সুর করে গান ধরে বা কিছু বলে। তখন সকলে টান মারে একযোগে হাঁকসহ : হেলোসা হেঁইয়ো, হে হে... হেঁইয়ো। হেঁচকা টানের সঙ্গে চলে যৌথ দোহারি। এখানে গাছের গুঁড়ি যেন প্রকৃতির প্রতীক। জমায়েৎ লোকজন গুঁড়িটা সরিয়ে লরী, নৌকা বা আর কোথায় তুলবে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তারা বদ্ধপরিকর। উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সকলে সুরের দ্বারস্থ। এই সুর তাদের শ্রম-লাঘবের প্রেরণা এবং একই সময়ে একযোগে টান পড়ার ফলে—পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা। শিল্পের অবদান আর জাতকের কথা এইখানে কোন ধাঁধা রাখে না। সৌন্দর্য্যের মূল কথা সহমর্মিতা। টলস্টয় প্রমুখ অনেকে এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেননি। প্রকৃতিজয়ের স্বপ্নই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিস্থল। প্রকৃতি অর্থ শুধু গাছপালা নদনদী নয়, গোটা সমাজও তার অঙ্গীভূত। প্রাচীন শাস্ত্রীরা সৌন্দর্য্যকে শিল্পীর অনুপ্রেরণা, ধ্যানদৃষ্টি প্রভৃতি বলে স্থির থেকেছেন। অনুপ্রেরণা শব্দটি লক্ষ্যণীয়। গ্রীক এন্‌থিয়স (যা থেকে ইংরেজী এন্‌থিউজিয়াজম) শব্দের অর্থ গড-ইন-মি অর্থাৎ দেবতা আমার উপর ভর করেছে, ফসল নেই, অথচ পূর্বেই ফসলের মত নাচ। আদিম মানুষের উপর তা ঐ জাতীয় ভর বৈকি। তার ব্যাখ্যা এখন স্পষ্ট। বার বার অলৌকিকতার দরজায় ধর্ণার প্রয়োজন কোথায়? শেক্সপীয়ার কবি প্রেমিক এবং পাগলদের ঠিকই সমীকরণ ঘটিয়েছিলেন :

The lunatic the lover and the poet
Are of imagination all compact :
One sees more devil than the vast hell can hold
That is the mad man; the lover all as frantic
Sees Helen's beauty in a brow of Egypt.
The poet's eye, in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth
And from earth to heaven.
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and name.

আদিম যুগ অতীত। মানবেতিহাসের বিচিত্র যাত্রা-লয়ে নানা দিকশূলের স্বাক্ষর আজও খাড়া। পরিবেশের নিপীড়ন-নিগড় ভাঙার সাথে সাথে মানুষ বিচিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পরীতিরও জন্মদাতা। সৌন্দর্য্য সম্পর্কে অতীত ঐতিহ্যের অনুরণন আজও প্রযোজ্য। পরিবেশ এবং উপজ্ঞা এন্‌ভায়ারনমেন্ট এ্যান্ড ইন্সটিংক্ট—উভয়ের মধ্যে শিল্প জাগায় নব্যতর সংগতি। ফলে, বাঁচা অনেক সহজ ও সুন্দর হয়। প্রকৃতির দাস বা অসহায় পড়ে না মানুষ কোথাও। অতীতের সার্থক সৃষ্টি আজও আনন্দের আধার। কারণ, তার জন্ম প্রকৃতির নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তিপ্রচেষ্টার মধ্যে। বিজ্ঞান প্রকৃতির বহির্দিক জানার সুযোগ বিধায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও দান করে। শিল্প যোগায় অন্তর্জগতের সংগতি, প্রকৃতির মুখোমুখি মোকাবিলার প্রেরণা। সৌন্দর্য্যের জন্ম সেইখানে। পূর্বসূরীদের মতে সৌন্দর্য্য মানুষের বৃহত্তম মিলনক্ষেত্র। আদিম মানবের শিল্পসৃষ্টিতেও সেই লীলা দেখা যায়। প্রকৃতি এবং পরিবেশের সংগ্রামে জীবনে-জীবন যোগ করার শিল্পগত সাধনাই সৌন্দর্য্যের উৎস। সমাজতত্ত্বাশ্রয়ী নন্দনশাস্ত্রীদের সিদ্ধান্তে এই প্রতিধ্বনি নানাভাবেই তাঁদের চিন্তারাজ্যে ধ্বনিত।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

AMARBOI.COM

উপনিবেশ, সদ্য-স্বাধীন বা অনুন্নত দেশের পক্ষে লেনিনের গুণগ্রাহিতার জন্য কোন রাজনৈতিক উর্দির প্রয়োজন হয় না।

বিংশ শতাব্দীর মানচিত্রের দিকে চোখ ফেরালেই দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী অজগরের পেট ফুঁড়ে ফুঁড়ে এক এক ভূখণ্ড বেরিয়ে আসছে নিজের পতাকা উড়িয়ে, নিজস্ব রঙমাখা। ব্রিটিশ রাজত্বেও সূর্য অস্ত গেছে। ম্যাপে তার লাল রঙ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের সেই দশা।

কি করে তা সম্ভব হোলো?

এমন পরিণতির ক্ষেত্রে উপনিবেশ দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন অবিশ্যি বিশেষ উপাদান। কিন্তু সুষ্ঠু দুর্মর ইচ্ছা, আন্তরিকতা কি ইতিহাসে সব কিছু? ইতিহাসের নিজস্ব গতি আছে। পরিবেশের সামগ্রিকতা সহজে ঠেলে ফেলে দেওয়া দুঃসাধ্য। শুধু স্বাধীনতার সংগ্রাম কোথাও স্বাধীনতা কি মানবতার মুক্তি এনে দেয়নি? এ্যাংগোলায় এখনও কি আফ্রিকার দেশপ্রেমিকরা লড়ছেন না? স্পেনে পশ্চিমা সভ্যতার মহিমা-কীর্তনের মধ্যে বহাল-তবিয়ৎ টিকে আছে ফ্রাঙ্কো এবং সালাজার। ইউরোপের দেশ-সমুদ্রে ওই বর্বর দুই দ্বীপ নাক জাগিয়ে দিব্যি নিঃশ্বাস ফেলছে। তবে একথা সত্যি, বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ আর তেমন নখরদন্ত সমন্বিত শ্বাপদ নয়। তাগদে অনেক বেশি কম-জোর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যবাদের এই দুর্বলতাই উপনিবেশের জিঞ্জির ছেঁড়ার প্রধান শর্ত। মানচিত্রে অন্যতম ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশের লাল-রঙ মুছে যেতে লাগল। কারণ, আর এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে সেই রঙের অভ্যুদয়। দ্বান্দ্বিকতার আশ্চর্য নমুনা। একশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতি রঞ্জিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী (সাব লাল হো যায়েগা) আর এক দেশে আত্মস্থ হোলো উন্নততর পর্যায়ে। কুকুর কুকুর ভক্ষণ করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মধ্যেই তেমনই আত্মক্ষয়ী প্রথম মহাযুদ্ধের পট-ভূমিকায় রুশ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়। তার ধাক্কা সাম্রাজ্যবাদীদের পাঁজর আর আস্ত রাখেনি। উপনিবেশ দেশে দেশেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকার কতগুলো শাসন-সংস্কার করতে বাধ্য হয়, টিকে থাকার কৌশল হিসেবে। মর্লে-মিন্টো রিফর্ম ইত্যাদি তার যথার্থ উদাহরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আরো দুর্বল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ! তার তিন বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা পেল এই উপমহাদেশ—বর্তমানে যা ভারত এবং পাকিস্তান নামে খ্যাত। কারণ, মাজা-ভাঙা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আর জাতীয় আন্দোলন দমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। তদানীন্তন লাট-বাহাদুর লর্ড ওয়াভেলের সামরিক প্রধান জেনারেল ইসমে যে জবাব দিয়েছিলেন তার নির্গলিথ অর্থ : "ভারতে আমাদের খেলা খতম।" সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাণ্ডার জোর থাকলে শুধু স্বাধীনতার জন্য আকুলতা কি আত্মত্যাগ স্বাধীনতার শিরোপা-ঝুপ মাথায় বসিয়ে দিত না। সেখানে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক শক্তির যোগ-বিয়োগের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে একথা আরো সত্য।

AMARBOI.COM

আজ এদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে কেউ ইতিহাসের এই পদক্ষেপের কথা বিস্মৃত হোতে পারে না। এক অন্ধ ছাড়া কে অস্বীকার করবে পাক-ভারতের স্বাধীনতায় রুশ বিপ্লবের পরোক্ষ দান?

আর তখনই স্মৃতির প্রাঙ্গণে খাড়া হয় রুশ বিপ্লবের মহান ভাস্কর ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভের মূর্তি। নিতান্ত অনুষঙ্গ মাত্র। কিন্তু তা থেকে কোন সৎ মানুষের রেহাই নেই। পরাধীনতার বেড়ির দাগ যাদের পা থেকে এখনও মুছে যায়নি, তাদের পক্ষে এমন নেমকহারামী অসম্ভব।

একদিক থেকে রুশ-বিপ্লবই আন্তর্জাতিকতার প্রথম সফল বাণী আর লেনিন তার প্রথম উদাত্ত-কণ্ঠ নকীব। বিশ্ব মানবতার বহু বাণী শেষ পর্যন্ত চোরা-বালুতে আটকে গেছে, যেমন যীশুর বাণী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লেনিন প্রথমে এই সংকীর্ণতার নিগড় চূর্ণ করেন। অনুন্নত দেশের মুক্তির মধ্যে তিনি রুশ রাষ্ট্রের শক্তির সন্ধান বহু আগেই পান। অনুন্নত দেশের দিকে তাঁর দৃষ্টি কিরূপ নিবদ্ধ ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, মধ্য এশিয়ার জার-শাসিত উপনিবেশগুলোকে (সমরকন্দ, বুখারা ইত্যাদি) স্বাধীনতা দানের মধ্যে আজ স্পষ্ট। রুশ বিপ্লবের পরই তিনি ঘোষণা করলেন সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তারই ন্যায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণতি : জার-শাসিত মধ্য এশিয়ার জনগণের মুক্তি। এমন কি ফিনল্যাণ্ডের মত শক্র দেশ পর্যন্ত বাদ গেল না। শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণ ঘোষণা নয়, সেই অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব তার রূপায়ন পদ্ধতির কারিগরও লেনিন। একাধারে চিন্তানায়ক এবং কর্মী-যোদ্ধা—এমন দ্বৈত সম্মেলনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। এমন মানুষেই বলতে পারেন, "ইতিহাস লেখার চেয়ে ইতিহাসে শরীক হওয়া ঢের বেশী রোমাঞ্চকর।" কথা ও কর্মে নিগূঢ় আত্মীয়তা-স্থাপনের নজীররূপে তিনি অনুন্নত দেশ কেন, সকল কালের মানুষের আদর্শ।

মনুষ্যত্বে অগাধ বিশ্বাস থাকার ফলে লেনিনের দৃষ্টি সজাগ প্রহরীর মত বিশ্বের দিকে দিকে নিবদ্ধ ছিল। উপনিবেশ, অনুন্নত দেশ সেই পরকালের বাইরে থাকতে পারেনি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে লেনিনের ব্যক্তিত্বের অভিঘাত কত বেশী প্রকট সেই সব এলাকায়। প্রেম ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাই হোক, মানবতার ক্ষেত্রে বৃথা যায় না। বর্তমানে ধর্মভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রবাদী—সব রকম রাষ্ট্রের চোখে পড়ে পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ঘটা। প্রকৃতির মতো অর্থনৈতিক শক্তি অনিয়ন্ত্রিত থাকলে সমাজজীবনে তা ব্যাপক মহামারী হোতে পারে, দৈহিক এবং মানষিক উভয় ক্ষেত্রে। তার প্রতিরোধে লেনিন প্রবর্তিত কর্মপন্থা বহু দেশই গ্রহণ করেছে। তার জন্যে কারো সমাজতন্ত্রবাদী হওয়া প্রয়োজন নেই। যা জীবন-ভিত্তিক, তা এইভাবে অজানিতেই মানুষ আত্মসাৎ করে। তাই প্রারম্ভেই বলেছি, লেনিনের গুণাবলী উপলব্ধির জন্যে কোন রাজনৈতিক উর্দি অবান্তর। কারণ যা জীবনাশ্রয়ী, তা সর্বমানবের। সংকীর্ণতার সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে না। এতৎপ্রসঙ্গে গ্যেটের প্রতিধ্বনি-লেনিনের একটি উদ্ধৃতি সর্বদা স্মরণীয় : বন্ধু, তত্ত্ব সবসময় কালচে। কিন্তু জীবনের বৃক্ষ চিরন্তন সদা-সবুজ।"

এমন বাণীর তাৎপর্য এবং সার্থকতা কে অস্বীকার করতে পারে? তার জন্যে কোন রাজনৈতিক লেবাস প্রয়োজন হয় না। জীবন-বোধের সবুজ হাতছানি চোখে না পড়া আর জাতিগতভাবে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাওয়া একই কথা। ইতিহাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার সত্যতা লেনিন নিজের কার্যাবলী দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। তত্ত্ব তার কাছে ছিল কর্মপন্থার নির্দেশক ছাড়া আর কিছু না। তাই ক্রান্তি কালে তাঁর নীতির সহসা সচকিত বিপরীত ধারা অনেকের চোখে ঝলসে দিত। কিন্তু জীবনতপস্বী সত্যের এই গতি প্রকৃতি সম্পর্কে নিঃসন্দিহান ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি কখনও ব্যর্থ হননি। ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়কে বোঝা এবং তার গতি প্রকৃতির হদিস অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ—যে কোনো দেশে, যেকোন সমাজসংস্কারের আদর্শ। লেনিন যখন বলেন, যে ফিউডাল রুশ রাষ্ট্রে তাঁর জন্ম, পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্যে তাঁর কৈশোর যৌবন লালিত এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে তাঁর জীবনের সিদ্ধি ঘটেছে—তখন কোন অহংকারের গন্ধ থাকে না এমন উক্তির মধ্যে। বরং সঠিক পন্থায় কাল উত্তরণ যে সম্ভব, তারই নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাজ্জল্যমান হয়। এমন ত্রিকাল-মুখর ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবে তিনিই পৃথিবীতে বোধহয় একক এবং একমাত্র নজীর।

রাজনীতিবিদ রূপেই অবিশ্যি লেনিনের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সকল বিকাশের দিকে তাঁর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সৌন্দর্যবোধ কেবল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নয়, জীবন উপভোগেও পরম নিমিত্ত। লেনিনের শিল্প সাহিত্য বিষয়ক মতামত অনেককেই চমৎকৃত করে। যদিও পেশাধারী অর্থে তিনি নন্দনতত্ত্ববিদ ছিলেন না। কর্মীরা প্রায় এদিকে নীরব থাকেন। কিন্তু লেনিনের দৃষ্টি এইদিকে ছিল আশ্চর্যরূপেই সজাগ। তাই বোধহয় দেখা যায়, বিপ্লবের অধিনায়ক জঙ্গলে শিকার ক্ষেত্রে হরিণের চোখ দেখে আর গুলী ছুঁড়তে পারেন না।

এমন ব্যক্তির আদর্শই বিশ্বে তাঁর মত মানুষের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনার পথ সৃষ্টি করে যায়। এমন অতুল সম্পদ নিখিল মানবতার উত্তরাধিকার।

সাহিত্যে ক্রান্তিলগ্ন

AMARBOI.COM

সাহিত্য কেন, সব চারুকলার সঙ্গে সংকটের যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, কোন না কোন টেনশান বা কঠিন টান সেখানে পশ্চাৎভূমি রচনা করে। কখনও তা নিতান্ত মন্ময়, কখনও পরিবেশগত। এই অনিবার্যতার হাত থেকে কোন শিল্পের রেহাই নেই। যেহেতু, মানব অস্তিত্বের বিকাশের প্রথম শর্ত : প্রকৃতির সঙ্গে বুঝাপড়া। এখানে মানুষের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তা আবার আর এক শর্ত সাপেক্ষ : প্রকৃতির রহস্যোদ্ধার যার মূল কথা। এই প্রক্রিয়ায় চেতনার যে উত্তরণ প্রয়োজন হয়, তারই ফলে পরিবেশের মধ্যে থেকেও পরিবেশকে অস্বীকারের সুযোগ লাভ করা যায়। এই মানবিক স্বাধীনতা সেই জন্য আসলে অনিবার্যতার শিং পাকড়ানো ব্যাপার। সাহিত্য বা চারুকলার জন্মেতিহাস, বোধহয় পরিবেশ থেকে মুক্তির কাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায়। জীবতত্ত্বে তার সাফাই মেলে। বাঁচার তাগিদ কল্পনার সমিধ সংগ্রহ করে। অন্য কথায়, কল্পনা পরিবেশের সঙ্গে লড়ায়ে সহজপ্রবৃত্তি বা ইনস্টিংকটের সমন্বয়-সাধন। চৈতন্য এখানে সদা যুযুধমান। কারণ, বহির্জগতের অনর্হিশ চঞ্চল অভিঘাত সব সময় কোন না কোন সামঞ্জস্য-সাধনের দাবীদার। কখনও তা নিতান্ত প্রকৃতির মুখোমুখি কখনও সোজা মানবিক সম্পর্কে, কখনও নিজের গড়া সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে। এই টেনশান মানব অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। এমন-কী স্বপ্নের মধ্যেও তা থেকে রেহাই নেই। বাঁচার এই দাম সকলকে দিতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে তা বড় চড়া পড়ে যায়। যেহেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামঞ্জস্য সাধনের মন্ত্র সব সময় রেডিমেড পাওয়া দুষ্কর। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর ইতিহাসের পাতায় তার বহু নজীর আছে।

কিন্তু তাই বলে সোজা সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে সাহিত্য এবং সমাজের ক্রান্তিকালে এক গাঁঠছড়ায় বাঁধা। কারণ, মানুষ এবং প্রকৃতির দ্বৈরথে এককভাবে জয় কারো হয় না। হারজিৎ সেখানে সর্পিল মিথুনে বাঁধা। দু'য়ে অমিল যেমন প্রচুর, মিলও তদ্রূপ। মানব-সভ্যতায় প্রগতির রূপ তাই সরল রেখায় আঁকা যায় না। সেখানে লাভ লোকসান পাল্লা দিয়ে চলে। এই সংগ্রামে অনেক অতীত সম্পদ হারিয়ে যায় এবং নতুন ঐশ্চর্য্যের সঙ্গে অনেক অলক্ষিত ধ্বংসবীজ এসে জোটে। এই দ্বৈতাদ্বৈত রূপের জন্য কোথাও সমাজ ও সাহিত্য একে অপরের মুখাপেক্ষী চরমভাবে নয়। তাই উনিশ শতকের রাশিয়ায় নানা সমস্যা-কণ্টকিত অবক্ষয়ের বুকে টলষ্টয় এবং ডষ্টয়ভস্কির মত শিল্পী-দানবের আবির্ভাব, সহজ ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে। অবিশ্যি সমাজসংকটের ছায়া সাহিত্যের উপর তমসা ঘনিয়ে তোলে বৈকি। তখন শিল্পের শাখাপ্রশাখায় তেমন বিস্তার ঘটে না, নানা সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। কিন্তু বাঁধভাঙার মিহি ফাটল আবার চারুশিল্পের পথ ধরেই আসে। কারণ চৈতন্যের ধর্ম চঞ্চলতা, একঘেয়েমির অবসাদ থেকে মুক্তি। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই যাত্রাপথ তৈরী হয়। সাহিত্য তাই মূলতঃ অধ্যাসের কারবারী। সব যুগের শিল্পকলায় এই পর্য্যায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দের অনুভূতি সেখানে প্রধান ব্যাপার নয়। সুখানন্দ আরো গভীর উপলব্ধির জন্যে যেমন অধ্যাস সৃষ্টি হয়, তেমনই দুঃখের খর্পর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে। চল্লিশের বাঙালী সমাজ অধঃপতনের হাজার বলীরেখাঙ্কিত। সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক দুর্দশা। যুগযুগান্তের বিশ্বাস-শ্রেয়বোধ ভগ্নমূর্তি বা অনাচারে অবলুপ্ত। জীবনানন্দ দাশ অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন বর্তমানের মুখোমুখি হওয়ার জন্যেই, অনেকের ভ্রান্ত ধারণার কাছে যা স্রেফ এসকেপিজম বা পলায়নবাদিতা। ছেঁড়াখোঁড়া জীবনে আবার যৌথ আহ্বান আসুক :

গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন ভাঁড় বেঁধেছিল ছড়া
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য-জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে নেব তার শীতলতা
ডেকে নেব আইবুড়ো মেয়েদের সব
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।
হাতে হাত ধরে-ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে
কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে
ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙ তার—স্বাদে তার ভরে যাবে সকলের দেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
—অবসরের গান

সমাজসংকট সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অনেকখানি আভাস দিতে পারে। কিন্তু তা একান্তভাবে পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত বলা বিধেয় নয়। এখানে ব্যক্তিতান্ত্রিকের ঘোষণাকে শিরোপা দিতে হয়। প্রত্যেক কবি-ব্যক্তি তার ধ্যানধারণা, উপলব্ধির গভীরতা দিয়ে নিজস্ব কাব্যপ্রতিমা গড়েন। তাদের ভেতরে গোঁজা খড় একই। কিন্তু মূর্তি ভিন্ন হতে পারে। যেহেতু কবি বা সাহিত্যকর্মী মাত্রেই নাগরিক এবং তার ধ্যানধারণা শেষ পর্যন্ত গোটা সমাজের ছায়ায় লালিত তাই সমাজসংকট কারো চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। সাহিত্যের ক্রান্তিলগ্ন তার সঙ্গে জড়িত এমন মন্তব্য অবিশ্যি অসমীচিন। আনাতোল ফ্রাঁস লুই তৃতীয় নেপোলিয়নের মিলিটারী ডিকটেটরশীপের দানবরূপ দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামগন্ধ নেই কোথাও। সত্য কোন কিছু প্রকাশ অসম্ভব। গভীর হতাশায় কিছু দিন কাটিয়ে তিনি কালের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ফ্রাঁস লিখেছেন, আত্মধিক্কার কাপুরুষের নাকীকান্না। শিল্পীর সড়ক-রোধ রাজশক্তির এখতিয়ার বহির্ভূত। আনাতোল ফ্রাঁসের মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা সমাজসংকট থেকেই। তাঁর রচনায় সংকটের ছাপ স্পষ্ট। তিনি রূপক এবং ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অবদান শিল্পের মাপকাঠিতে কোথাও বেকদর নয়।

সাহিত্য অনাবিল চেতনা-মণ্ডল গঠনের দায়িত্ব থাকে বলেই কোন চারু-কারিগরের দৃষ্টি প্রেয়বোধ-শ্রেয়বোধ থেকে বেশী দূরে সরে থাকতে পারে না। ক্রান্তিকালে এসবের দুর্দশা চোখে নির্মমভাবে ধরা পড়ে। তাছাড়া, আপেক্ষিক-ভাব তুলনায় তৌলদণ্ড সবসময় হাতে রাখতে হয়। নচেৎ চেতনার উন্নয়ন বা বিস্তার কোন মাপকাঠি দিয়ে মাপা সম্ভব? সেখানে সাহিত্যের শিল্পগত টেকনিক যেমন জানান দেয়, তেমনই সমাজ। এই টেনশান থেকে কোন সাহিত্যকর্মীর রেহাই নেই। ক্যাথারসিসের সন্ধান ভবিষ্যৎ জগতের চাবিকাঠি। কিন্তু সেখানে পৌঁছেও ক্ষান্তি মেলে না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন, "এই ক্ষেত্রে পথ গন্তব্য এবং গন্তব্য পথ।" উত্তরণের জন্য শিল্পীর অস্থিরতা তখন স্বাভাবিক। এখানেই এসে পড়ে অধ্যাস, যা কল্পনার সহচর। কিন্তু কল্পনা ত শুধু ধোঁয়া নয়, জীবন-যাত্রার ধারা নির্দেশক। সংস্কৃতি অনেকের কাছে কিছু চারুশিল্পের ব্যাপার। কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই আবার শ্রীনিকেতনের পত্তন করেন। চারু এবং কারুশিল্পের এই সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী ওয়াকিবহাল মহল তাই শেষ পর্যন্ত সাহিত্য ও সমাজকে পৃথকভাবে দেখতে অনভ্যস্ত। যখনই দুয়ে ফাঁক থেকে যায়, তখনই সংকটের পর্যায় শুরু হয়। অনাবিল চেতনা দিয়ে জীবনকে ঢেকে দেওয়ার জন্যে তাই সম্যক দৃষ্টির প্রয়োজন। ব্যক্তিতান্ত্রিক ইউরোপের উপনিবেশ রূপে, পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসির আওতায় এদেশী অসংলগ্নতাপৃক্ত দরকাঁচা জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব চোখে পড়ে না। অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। দারিদ্র্য লাঞ্ছিত আঞ্চলিকতার মধ্যে আভিজাত্যের এক ধরনের তৈরী মাপকাঠি থাকার ফলে সেই দৈন্যদশা বহু দিন থেকেই কায়েমী। সমাজের এক কোণে বসে গোটা দেশের খবরদারী কুলুঙ্গি-রক্ষিত দেবতার অনড় মূর্তির কাছে আশীর্বাদ চাওয়ার মত হাস্যকর। অবিশ্যি অজ্ঞতা এক ধরনের শান্তি, সাহিত্যকর্মীর পক্ষে যা কোনদিন কাম্য নয়। ক্রান্তিলগ্নের সঙ্গে পেশাগতভাবে যাদের সহজাত পরিচয়, তাদের পক্ষে এসব সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। ঢেউয়ের আলিঙ্গনভীত সমুদ্র-সাঁতারু, অতলে না গেলে আর কোন গন্তব্যে মাথা কুটবে? ফর্মালিস্ট বা আকারবাদীদের আশ্রয়ে যারা শান্তি পায়, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

অবিশ্যি আঙ্গিকের সংকট আদৌ অবহেলার ব্যাপার নয়। নদীজলের প্রবহমানতা দুই তীরের নকশা, আকাশ গাছপালা ইত্যাদির সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে রূপ পায়। কিন্তু চেতনার প্রবহমানতাকে আকার দিতে হয়, অস্বাভাবিক উপায়ে। অস্বাভাবিক কারণ, পেছনে সচেতন সক্রিয় কারিগরী লাগে। তা চারুকর্মীর কাছে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরোদের বর্তমান চেহারা প্রবর্তন করেন সুরসম্রাট আলাউদ্দীন খাঁ। আত্মপ্রকাশের তাগিদেই এই অমর শিল্পী পুরাতন যন্ত্রের রদবদল করেন। সাহিত্যে একই সমস্যা এবং তা সংকট বৈকি। কিন্তু ফর্মালিস্টদের একতরফা সমাধান কোন কালে আঁচড় কাটতে পারে না। নন্দনতাত্ত্বিক কল্ডওয়েলের প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায়, আকারবাদীরা সাহিত্য শিল্পকে শেষ পর্যন্ত নির্বিকার সামগ্রীতে পরিণত করে। এই তত্ত্বের প্রচেষ্টায় দেখা যায়, শিল্প থাকে কিন্তু শিল্পী থাকে না। কেবল মাত্র শিল্পের আঙ্গিকগত কয়েকটি প্রত্যয়ের সাহায্যে তাদের দর্শন-সৌধ গড়ে ওঠে। তাদের ধারণা শিল্পে নির্বস্তুক গুণগুলো শিল্পীকে বাদ দিয়ে ছেঁকে তুলে নিলেই কেবল টেকনিকের সাহায্যে নন্দনতত্ত্ব খাড়া করা যায়। এই চিন্তা দর্শনে যান্ত্রিক জড়বাদের সহোদর। শেষ যর্পন্ত এই তাত্ত্বিকদের কাছে প্রত্যয়, ভাব, পরিকল্পনা এবং কিছু অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম পড়ে থাকে। অন্যদিকে ভাববাদী দর্শনে শিল্পীর উপর এত জোর দেয়া হয় যে তা নিছক অনুভূতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর তার ফলে, আকারবাদীদের অনেককেই বলতে শোনা যায়, সুন্দরের অনুভূতি আসলে কিছু নার্ভের উদ্দীপনা। উদ্ভট জড়বাদে সমাপ্তি ঘটে অমন তাত্ত্বিকতার।

অবিশ্যি কেউ যেন না মনে জায়গা দেন, ব্যাপক সামাজিক সংকট চারুশিল্পের বিকাশে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হলে মনের উপর ছাপ কী এড়ানো যায়? একজন সাহিত্যকর্মী তেমনই সামাজিক আচ্ছন্নতা থেকে গা বাঁচিয়ে দূরে যেতে পারে না। কারণ শেষ পর্যন্ত, জীবন যাপনের ধারা সহজ না হলে শিল্পসৃষ্টি এবং উপভোগ দুই-ই ব্যাহত হয়। সামাজিক ব্যাধি আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে বড় শত্রু। রাষ্ট্রের চাবুক যাদের হাতে থাকে তারা প্রথমেই সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঘাত হানে। বহুজন বুটের ভেতরকার গর্তে আশ্রিত অক্ষত দেহ থাকলেও স্বৈরশাহীর দাপটে থেৎলানো বুকের জখম বাংলাদেশে এখনও শুকায়নি। এই অভিজ্ঞতা এত জলদি বাসি হতে পারে না।

সাহিত্য ক্রান্তিলগ্ন এক দিক থেকে অহর্নিশ ব্যাপার। কখনও প্রকৃতি, কখনও মানবিক সম্পর্ক কখনও সমাজ-কাঠামোর সংস্পর্শে তা অনির্বাণ থাকে বৈকি। অস্তিত্বের যন্ত্রণাই বা কী কম? চারু-কারিগরের কাছে এসব ঝুঁকি নতুন নয়। অলৌকিক আনন্দের অধিকারীদের বুকে সেই আগুন অহর্নিশ জ্বলে। তার মহৎ সাক্ষ্য রেখে গেছেন স্বয়ং কবি-সম্রাট তাঁর আশি বছরের বহু সংকট-দগ্ধ জীবনের সড়কে। মৃত্যুলগ্নেও তিনি সন্ন্যাসীশোভন ঔদাসীন্যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসের সে যে
করে তারে সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটীল হোক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যের সে পায়
আপন আলোক ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে সে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিশার পদাভিলাষী যোগী

"And how much human nature loves the knowledge of its existence, and how it shrinks from being deceived, will be sufficiently understood from the very fact that every man prefers to grieve in sane mind, rather than to be glad in madness."

- Saint Augustine : "City of God."

"Do you know why my coffin must be big and so heavy? I shall place therein all at one time my love and sufferings."

—Heine.

WWW.AMARBOI.COM

হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ এই উপমহাদেশ বিভাগের প্রাক্কালে। কোন মানুষের সঙ্গেই তাঁর আর সাক্ষাৎ ঘটবে না।

কিন্তু মৃত্যু সব সময়ে বিজয়ী হয় না। ইতিহাসে তার পরাজয়ের নজীর অনেক। এই ক্ষেত্রে তেমনই দৃষ্টান্তের পরিচয় মেলে। এমন কী যিনি তাঁর নশ্বর কাঠামো ভবিতব্যের কাছে সোপর্দ দিয়েছেন, তিনিও পূর্বেই জানতেন–

মনে হয় এ ভুবনে মৃত্যু আছে, ব্যথা আছে, জানি,
জানি আছে ভয়
তবু চিত্তে আশা জাগে, বাজে শুধু শেষহীন বাণী
প্রেমের বিজয়।
(স্বপ্নসাধ : সমাধি)

এমন বৈচিত্র্যময় উপাদানে গঠিত প্রকৃতির সঙ্গে কদাচিৎ সাক্ষাৎ ঘটে। হুমায়ুন কবির একাধারে ছিলেন, অধ্যাপক কবি দার্শনিক সমালোচক প্রবন্ধকার ঔপন্যাসিক—অনেকান্ত প্রতিভার অধিকারী। তিনি আরো বিশেষভাবে ছিলেন রাজনীতিবিদ। সে বিচার করুক ইতিহাস। তা নিয়ে আমার কোন শিরঃপীড়া নেই। দুই দশক পরে, প্রায় বিস্মৃতির পর্যায় থেকে, আমার প্রচেষ্টা মানুষ এবং চিন্তানায়ক হিসাবে তাঁর স্মৃতির পুনরুদ্ধার।

'বাংলার কাব্য', এই একটি মাত্র পুস্তক বাংলা সাহিত্যে হুমায়ুন কবিরের অমরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই গ্রন্থে সাহিত্য-সমালোচনার এক দিকশূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি স্থাপন করেন। যুক্তিবিচারবাদ যেন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে অনুপস্থিত—বিশেষত সমালোচনার ক্ষেত্রে। দার্শনিক অর্থে, ভাববাদী পর্যায়ে কিছু কিচিরমিচির এখনও এদেশে সমালোচনা নামে খ্যাত। তা তিনি মোহিত মজুমদার, প্রমথ বিশী কি আর কেউ, যে-ই হন না কেন। সাহিত্য-সমালোচনায় ঐতিহাসিক জড়বাদের প্রয়োগে হুমায়ুন কবির সফল পথিকৃৎ। 'বাংলার কাব্য' সাহিত্যিক গ্রাম্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ-মুখর পয়লা সাইরেন। পেচক-নীড়ে উজ্জ্বল রশ্মিপাতের জন্য হুমায়ুন কবির কিছু চক্ষুপীড়ার কারণ ছিল। কিন্তু বহুজনই তাঁর এই দুঃসাহসের কাছে ঋণী থাকবে। বাংলা সাহিত্যের কোন সুষ্ঠু ইতিহাস রচনায় 'বাংলার কাব্য,' এক বিশেষ দিকশূলের মত চিরদিন প্রতিভাত হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জীবনের প্রতি এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই হুমায়ুন কবিরের মানস পরিচয়ের আভাস মেলে। সর্বগ্রাসী এবং গ্রাহী তাঁর মানসিক দর্পণ চিরদিন অমলিন রাখার প্রয়াস পেতেন তিনি, যেন কোন চিত্রকল্পই অপ্রতিবিম্বিত সরে না যায়। স্বাধীনতার সৈনিক হোলেও মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। 'বাংলার কাব্য' তেমনই অনেকান্ত মনের ফসল।

কিন্তু বাংলার 'কাব্য' তার গ্রন্থকারের মতই অসমাপ্ত শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি বা মাষ্টারপিস।

এই মন্তব্য স্ববিরোধী শোনাতে পারে। কিন্তু যারা জানেন, কি জড়জ এবং মানসিক আবেষ্টনীর মধ্যে হুমায়ুন কবিরের আত্মার অভিযান, তারা উচ্চবাচ্য করবেন না। মূলতঃ তিনি ছিলেন জ্ঞান-বৈরাগী। কিন্তু রাজনীতি সমুদ্রের সাঁতারুরূপেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত। তিনি অনুভব করেছিলেন, স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ এবং সত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। উপনিবেশ-দেশ নিরক্ষরতা এবং কুসংস্কারের জলমণ্ডলীঘেরা দ্বীপ বিশেষ। জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই একমাত্র সেখানে শিক্ষিত এবং সংবদেনশীল গোষ্ঠী। এই জন্যে তারাই অনুন্নত দেশে যে কোন সামাজিক আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে পড়ে। পরিবেশ জ্ঞানপীঠ ছেড়ে সড়কে নামতে হুমায়ুনকে বাধ্য করেছিল। টেনসান বা বিবর্তির হেতু এখানে স্পষ্ট। ইংরেজ-কবি শেলীর উপর লেখা কবিরের একটি সুন্দর সনেট আছে। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ ওয়ার্ডসওয়ার্থের আকাশ এবং নীড়ের প্রতি সমান অনুরাগী ভরদ্বাজের দিকেও কম ছিল না। প্রথম পছন্দ, হৃদয়গত। দ্বিতীয় বাছাই, বাধ্যকতাপ্রসূত। কবিরের এই আত্মদ্বৈততা আর কোন দিন এক ঘাটে মিলিত হয়নি। হুমায়ুনের সাফল্য এবং সফল প্রচেষ্টার উৎসভূমি সংলগ্ন ট্র্যাজেডির ইতিহাস এইখানে নিহিত।

সত্তার দ্বৈরথ তাঁকে আর কোনদিন স্থির হোতে দেয়নি। চিন্তানায়কের দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী তিনি। কিন্তু কর্মপ্রবাহের সড়কের আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। তৃতীয় দশকের সময় তিনি সম্রাট আকবরকে এইভাবে সম্বোধন জানান :

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্বার আসুক ফিরিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মাঝে,
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে!
কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
ঘুরি দিশাহারা,
আমাদের দেশ তাই হতাদরে অপমানে লাজে
আমাদের কারা!
দেশের মহৎ স্বার্থ আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি
দিনু বিসর্জন,
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব মাঝে রহিয়াছে জাগি
অনন্ত মরণ!
ধর্মের কলহগানে আমরা ধর্মের করি গ্লানি
নাহি জানি পথ,
অন্ধকার মায়াজাল মুখরি উঠুক তব বাণী
মঙ্গল শাশ্বত।

(স্বপ্নসাধ : আকবর)

আবাহনের পর যোগীর আর কিছু করার থাকে না। সে করুণাময়ের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু হুমায়ুন কবিরের নিকট ঈমানই যথেষ্ট নয়। তিনি তার বাস্তব রূপায়নের জন্য বেসবুর। সুতরাং কর্ম-প্রবাহের প্রয়োজন। কবিরের কর্ম-প্রবাহের পথপ্রদর্শক কিন্তু ঈমান নয়, বরং জাগতিক জ্ঞানবিন্যাসসিদ্ধ চিন্তাধারা। কথিত হয় যে রোমান্টিকগণ অহং-এর সন্ধানে বেরিয়ে অহংকে ধ্বংস করেছিল। বিপ্লবের জন্য তারা পরম বা আর্কিটাইপ্যাল নায়কের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু যখন দেখেন যে কেবল মাত্র আদর্শের বাস্তব রূপায়নের জন্য দল বাঁধতে হয় আর একক থাকা যায় না, তখন তারা পিছু হটে আসেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হুমায়ুন কবির ছিলেন রোমান্টিক কবি। এই মানসিক কাঠামো তাঁকে বাধ্য করেছিল পূর্বোক্ত সঙ্কটের মুখোমুখি হোতে, অন্যান্য যে কোন রোমান্টিকের মত। কিন্তু তিনি তাদের অধিকাংশের অনুরূপ ছিলেন না। শেলীর মত তিনি এগিয়ে এলেন স্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে সংলাপ শুরু করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অতি ভুল-বোঝাবুঝির মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। বিচিত্র কিছু নয় যে, মৌলানা আজাদ যিনি তাঁর 'তর্জমান-উল-কুরান' গ্রন্থে লিখেছেন, "অতীতের উপর বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত নির্ভরতার গণ্ডী আমাকে বাঁধতে পারেনি," তিনিই হুমায়ুন কবিরের মধ্যে তাঁর শেষ জীবনের সঙ্গী খুঁজে পান। নির্জন পর্বত-শিখর আর এক চূড়ার সান্নিধ্য-প্রার্থী, যা নিজেই কম নিঃসঙ্গ নয়।

হুমায়ুন কবিরের দ্বিখণ্ডিত সত্তার গন্তব্য কিন্তু পাঁকে সমাপ্ত হয়নি। এক এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খণ্ডের নিজস্ব ফসল-সম্ভার প্রচুর। কবিতা ছাড়া হুমায়ুন কবির নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও যথেষ্ট। সম্রাট এবং শালগম দুই-ই তিনি নির্বিবাদে স্পর্শ করতে পারতেন। সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবির এক মহৎ আসনের দাবীদার। 'কালি কলম,' 'কল্লোল' 'পরিচয়' বাংলা সাহিত্যে পত্রিকা হিসাবে ধারাবাহিকভাবে উজ্জ্বল নিদর্শন। হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' এমনই আসনের অধিকারী। আভিজাত্য সামাজিকভাবে ঘৃণ্য। কিন্তু বুদ্ধির জগতে তা বিশেষ কাম্য। চতুরঙ্গ পত্রিকার সুশোভন আভিজাত্য গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন মন্তব্য বৃদ্ধি নিস্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য যারা ভালবাসেন, তাদের সকলেই সে সবের সঙ্গে পরিচিত। বহুমুখী ক্ষমতার অধিকারী কবিরের এই আর এক পরিচয়, আপন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যেও তিনি সাহিত্যের এমন লাইট হাউস গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন।

যৌবনে যখন ছাত্র এবং কালা-পাহাড় তখন চতুরঙ্গ পত্রিকায় আমার প্রবেশাধিকার ঘটে। বয়োজ্যেষ্ঠ কবির সাহেব। কিন্তু তারুণ্যের নষ্টামির প্রশ্রয় দিতে একটুকু সঙ্কোচ দেখাননি। এই জন্যে কিছু বন্ধু-বান্ধবের তিনি বিরাগভাজন হন। তখন তিনি আমাকে যে উৎসাহ প্রেরণা দিয়েছিলেন, আজ তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সেই সময় কবিরকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হোয়েছিল। অতি উজ্জ্বল চোখ, নাতিদীর্ঘ সুগঠিত অবয়ব, এমনকি দৈহিকভাবে দেখা যেত তাঁর সদা অস্থিরতা। কবিরের ডান হাত যেন বিশ্রামই জানত না। এই অঙ্গভঙ্গী প্রায় ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। কণ্ঠস্বর গমগমে, কিন্তু জোর দিয়ে কথা বলতেন বলে কিছুটা চাঁচা-ছোলা মনে হোত। হুমায়ুন কবিরের চেহারায় তাঁর অন্যান্য খ্যাতিমান বন্ধু যথা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণুদের মত অসাধারণ কোন ছাপ ছিল না। কাপড়-চোপড়ে তাঁকে আরো আটপৌরে দেখাত। অধিকাংশ সময় আমি তাঁকে খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবী পরতে দেখেছি। পাৎলুন পরলে সঙ্গে থাকত হাওয়াই শার্ট অথবা হাফ-শার্ট। কিন্তু খুব সাধারণ কাপড়ে তৈরী। পশ্চিমী লেবাস তিনি মাঝে মাঝে ধারণ করতেন। মনীষা-ধ্যানের প্রতি আসক্ত, তিনি বোধ হয় প্রাচ্য ঐতিহ্যের শেষ গুরু। আজকাল হামেহাল কতো দর্জি-নির্মিত অধ্যাপক চোখে পড়ে।

বুদ্ধি এবং বোধির জগতে হুমায়ুন কবির হ্যামলেটের ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন, তাঁর জীবন-চর্চার ক্ষেত্রে কোন ফাঁক ছিল। নিজের কর্মলীলা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বাংলার কাব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মন্তব্যে তিনি লিখছেন, "বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির এই পার্থক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্কিমের প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর ও হৃদয়াবেগের যে পার্থক্য, তার কারণও এইখানে। কৃষ্ণচরিত্রে অথবা বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্কিম মুক্তবুদ্ধি এবং কুসংস্কার লেশহীন। তাই সেখানে তাঁর হৃদয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔদার্য ও বুদ্ধির দীপ্তি আজো আমাদিগকে বিস্মিত করে। অথচ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সম্প্রদায়িক আত্মম্ভরিতা যে অহিন্দু মাত্রকেই পীড়া দেয়, সেকথা, কি তাঁর অন্ধতম ভক্তও অস্বীকার করতে পারে? বুদ্ধি ও আবেগের পার্থক্যই এ বৈষম্যের কারণ, একথা বললে অন্যায় হবে না।" (বাংলার কাব্য ২য় সংস্করণ ২৬ পৃষ্ঠা)

আবার অন্যত্র—"রাজনৈতিক সাফল্যের একটা মোহ আছে। তাই রাষ্ট্রনেতা যত সহজে এবং যত সত্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন, চিন্তাজগতের অধিনায়কের ভাগ্যে তা ঘটে না।" (বাংলার কাব্য : ঐ সংস্করণ ৫১ পৃষ্ঠা।)

আরো, মৌলানা আজাদের মূল্যায়নের এক প্রবন্ধে হুমায়ুন কবির মন্তব্য করেছেন, 'মনীষী জীবনের চিরন্তন মূল্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন ঠিক রাজনীতিবিদের অনুরূপ। তাদের কাজ প্রতিদিনের ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামানো।"

এমন বহু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে হুমায়ুন কবিরের আত্মসচেতন ভূমিকার। তিনি শুধু সচেতন নন অতি সচেতন ছিলেন। দোলাচলের মধ্যেই তাঁর জীবনে কিন্তু ঐসব ফারাক ঘটে যেত। দার্শনিকেরই নৃপতি হওয়া উচিত। প্লেটোর এই আদর্শ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আদৌ থ' পায় না। কবির আসলে ধ্যানযোগী, কিন্তু কর্মবীর হওয়ার প্রেরণা তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। কান্‌সীয় বস্তু-স্বরূপ থিং-ইন-ইটসেল্‌ফ—আবেগের দিক থেকে রোমান্টিক এবং সিম্বলিস্টদের আদর্শের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কান্টের উপর কবির বই এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। রোমান্টিক কবি হিসাবে তা তাঁর কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি আবার মার্কসবাদী। অবিশ্যি এই মার্কসবাদ আবার হুমায়ুনী ধরনের। তিনি মার্কসীয় অর্থনীতিতে ঘোর আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে অভিযোগ বহু, আস্থা ত দূরের কথা। ধ্যানী এবং কর্মীর এই পাঞ্জা-লড়ায়ের যেন বিরাম ছিল না। মঞ্চবক্তা হিসাবে হুমায়ুন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। এমন বাগ্মিতায় প্রয়োজন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন এবং অগ্নি অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে ধূম্রজাল সৃষ্টি। এসব কৌশল কবিরের বেশ রপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি যে ভাষা ব্যবহার করতেন তা একদম সাহিত্যের পত্র-ভুক্ত। রাজনীতিবিদ তার অপর সত্তাকে এখানেও ফাঁকি দিতে অসমর্থ।

বিদ্যান্বেষী হিসাবে ঔপনিবেশিক আন্দোলনে কবিরের অবদান একদম অকিঞ্চিৎকর নয়। শাসকশ্রেণী সর্বদা প্রজাদের মধ্যে হীনমন্যতা ছড়িয়ে রাখার কৌশল গ্রহণ করে। শোষকশ্রেণীকে নৈতিক-বলহীন করাও যে কোন মুক্তি আন্দোলনে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধি। তৃতীয় দশকে অক্সফোর্ডে কবির মডার্ণ গ্রেটস-এ ডবল ফার্স্ট ক্লাশ পান। এই ঘটনা হুমায়ুনের কর্মমুখর জীবনে খুবই নগণ্য ব্যাপার। কিন্তু তদানীন্তন দাস-জাতির পক্ষে তা আদৌ অকিঞ্চিৎকর ছিল না। বর্তমান স্বাধীন আবহাওয়ায় সেই প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম আজ রীতিমত কঠিন।

হুমায়ুন কবির বাংলাদেশের সন্তান। এই দেশ আজন্ম-কৌশোর-যৌবন তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নান্দনিক মেজাজ-গঠনের স্থপতি কবি এবং ঔপন্যাসিক (নদী ও নারী) রূপে চিত্রকল্পের সন্ধানে তার প্রেতায়িত সম্মোহনী তিনি কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই দেশের সবুজ শ্যামলিমা, নদ-নদী তাঁর রচনায় নানা রূপে উপস্থিত। চার্লস কিংসলীর বিখ্যাত গাথা "ও মেরী গো এ্যান্ড, কল্ দি ক্যাটল হোম" বাংলায় কবির এমন রূপান্তরিত করেছেন যে আজও কিশোর-কিশোরীদের ঠোঁটে সেই জের বর্তমান। কিন্তু ডী নদীর বালুতট এখানে পদ্মার চরে পরিণত। আর মেরী ত দুঃখিনী কিষাণ-বালিকা আমিনা। মনীষী এবং লেখক হিসাবে কবির নিজকে এই দেশের ঐতিহ্যভুক্ত করেছেন। কে না তা নিয়ে গর্ব বোধ করবে?

নজরুল ইসলামের মত তিনিও আমাদের সম্পদ।

হুমায়ুন কবির আগামীকালের উত্তরাধিকার।*

**রচনাকাল আগস্ট, ১৯৬৯। মৃত্যুর এক হপ্তার মধ্যে।*

বিশ্বনাগরিক ইংরেজ

AMARBOI.COM

১৯৬৪-৬৫ ইংলন্ডের প্রবাস-জীবনে তিনজনের সঙ্গে সাক্ষাতের আমার বড় ইচ্ছা ছিল। টি, এস, এলিয়ট, ই, এম, ফস্টার, জে ডি বার্নাল। বার্ট্রান্ড রাসেলও তালিকাভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ভিয়েৎনাম দিবস উপলক্ষে পার্লামেন্ট হাউসের সামনে প্রতিবাদ-রত এই মনীষীকে দেখার পর, তাঁকে বাদ দিই। বহু-ব্যস্ত মানুষ। বৃদ্ধ বয়স। তাঁর সময় কতো অমূল্য। তা' নষ্ট করা পাপের চেয়ে কম গর্হিত নয়। এলিয়ট মহৎ কবি, বিষ্ণুদের ভাষায়, যদিও করুণ রাজনীতির সমর্থক। তিনি ছিলেন প্রায় আমার প্রতিবেশী। আমার বাসস্থানের একশ' গজের মধ্যে ছিল প্রকাশক 'ফেরার এন্ড ফেবারের' আপিস। কবি এখানে রোজই একবার আসতেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদ বার্নাল ওই একশ' গজের মধ্যে পড়েন। বার্বেক কলেজ আরো নিকটে। ফস্টারের সঙ্গে সাক্ষাতে কেম্ব্রিজ অথবা সারে-এলাকায় যেতে হয়। এখানেই ঈষৎ নড়চড় ব্যাপার ছিল।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কারো সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। চার মাসের মধ্যে এলিয়ট হঠাৎ লোকান্তরিত হন। নিজের ব্যস্ততার চাপ এবং সংকোচের ফলে আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। এই জন্যে আমার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল, আজও আছে। আত্মিক যোগাযোগের পর চাক্ষুষ সম্পর্কের কোন দরকার আছে কী? নেই। কিন্তু মন সব সময় যুক্তি-পরিচালিত দ্রব্যের সামিল হোতে অপারগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার উপরোক্ত সংকোচ এবং গড়িমসিকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

ই, এম, ফস্টারের মৃত্যু-সংবাদ তাই আচমকা আরো ধাক্কা দিয়ে গেল। পরিণত, একানব্বই বছর বয়সে মৃত্যু। তবু তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

মাত্র পাঁচটি উপন্যাসের রচয়িতা ফস্টার।

১। হয়ার এঞ্জেল্‌স ফিয়ার টু ট্রিড (১৯০৫)

২। দি লংগেস্ট জার্নি (১৯০৭)

৩। এ রুম উইথ এ ভিউ (১৯০৮)

৪। হাউয়ার্ডস্‌ এন্ড ১৯১০

আর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেরোয় ফষ্টারের পঞ্চম এবং শেষ উপন্যাস : "এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া" তারপর তিনি আর কোন উপন্যাস লেখেননি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি যেন অগস্ত্য-যাত্রায় ছিলেন। এমন লেখকের মৃত্যু কেন কাউকে ধাক্কা দেবে?

কিন্তু লেখক হিসেবে ফস্টার পৃথিবীর সেই বিরল শিল্পীদের অন্যতম যার তুলনা তিনি স্বয়ং। ঔপন্যাসিকরূপে কুশীলবদের অঙ্কন-ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব রীতি ছিল। কথকতার মধ্যে কখনও ঘটনার সাহায্যে, কখনও সংলাপের মাধ্যমে তিনি আশ্চর্য ফাঁক সৃষ্টি করতেন। সেখানেই কিন্তু নানা মাত্রা বা ডাইমেনশানের উঁকি-ঝুঁকি। চিত্রশিল্পীর এই কায়দা ফস্টার রপ্ত করেছিলেন। আবার কল্পনার বেলাভূমিতেই তিনি জীবন-তরঙ্গ বার বার আছড়ে ফেলতে এমন সিদ্ধহস্ত, যার জুড়ি মেলা দায়। ফস্টারের উপন্যাসের বয়ন-বিন্যাস আর কোন লেখকে দেখিনি। তাঁকে অনুকরণ প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ফস্টারের রচনার সুরে কোন উচ্চগ্রাম নেই। গোর্কি মহান বজ্রস্বরের মত ফেটে পড়েন। কিন্তু ফস্টার বিষণ্ণ বৈকালের রাগিণী। অথচ দুই লেখকে আশ্চর্য মিল আছে। উভয়েই গভীরভাবে মানবপ্রেমিক এবং মানবতাবাদী; সত্তার আবিষ্কারে যে-যার নিজস্ব কায়দায় অগ্রসর হন।

এডোয়র্ডীয় ইংলন্ডে ফস্টারের জন্ম ভিক্টোরীয় আমলের জের তখনও চলছে। সেই যুগেও জীবনের মুখোমুখি প্রশ্নের জবাব ছিল বৈকি। কিন্তু তার জন্য রঙীন চশমার প্রয়োজন হোত। যেমন, ডিকেন্স। রোমান্টিক ভাবালুতার মধ্যে তিনি জীবনের বিশ্লেষণে কঠোর বাস্তবের উপর মাত্র ভাসা-ভাসা আঁচড় টানেন। কিন্তু ফস্টার নানা মাত্রায় বাস্তবের সম্মুখীন হন। এইদিক থেকে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের এক বিশেষ পুরোধা। হাউয়ার্ডস্‌ এন্ড্‌ উপন্যাসের সংস্কৃতি-অভিলাষী, দারিদ্র্য-জাত অধঃপতনের সীমান্তে উপনীত কেরানী লিওনার্ড বাষ্ট এক নতুন ধরনের চরিত্র। ভিক্টোরীয় যুগের চাকচিক্যের অন্তরালে কতো অন্ধকার সঞ্চিত, আপন শিল্পের আলোকে ফস্টার তা' প্রতিভাত করেন। মানবতার মৌল সমস্যা ফষ্টারকে আজীবন আলোড়িত রেখেছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পর তিনি আর কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস লেখেননি। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি কখনও গা-আড়াল দিয়েছেন, কেউ তা' বলবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁর অমূল্য লেখনী ধারণ করেন। আত্মার এমন অভিসার অবিশ্যি গোড়া থেকেই ফস্টারের বর্তমান ছিল। সেই প্রবাহ আর কখনও বিরতি জানেনি। সাম্রাজ্যবাদী দাপটের মধ্যে তিনি 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' রচনা করেন। এই বহুখ্যাত এবং নাট্যাকারে বহু অভিনীত উপন্যাসের পাঠক মাত্রেই জানেন, এক পরাধীন দেশ সম্পর্কে ফস্টারের কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এবং তার সমস্যা উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি নবিশীর ধর্ম পালন করেননি। শিল্পী হিসাবে অবিশ্যি ফস্টার নিজের মতামত খোলাখুলি বলেননি কোথাও। কিন্তু ফল্গুধারার মত উপন্যাসের সকল চরিত্রের যিনি সৃষ্টিকর্তা. তাঁর মানসিক প্রবাহ কার না চোখে পড়বে? "হাউয়ার্ড এন্ড" উপন্যাসের এক জায়গা আছে :

The imperialist is not what he thinks or seems. He is a destroyer. He prepares the way for Cosmpoloitanism, and though his ambitions may be fulfilled, the earth that he inherits will be grey. (Howards End. Page 131, Penguin edition.

বিশ্বের চৌহদ্দির দিকে ফস্টারের দৃস্টি কতো সজাগ ছিল, এই ঘৃণ্য-ক্ষোভমণ্ডিত মন্তব্য তার প্রমাণ। ফস্টারের দেখা ভারত (বর্তমানে পাক-ভারত) কোন সৌখীন ট্যুরিস্টের দেশ-পরিক্রমা নয়। তিনি স্বজাতির অহমিকা-জাত নির্বুদ্ধিতার পাশাপাশি উপলব্ধি করেছিলেন এক দেশের আন্তরাত্মার আর্তিমুখর ভাষণ। 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' গ্রন্থের শেষ অঙ্কে ইংরেজ ফিল্ডিংয়ের একদা-ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর আজিজ বলছেন,

AMARBOI.COM

"If I do not make young, Ahmed will, Karim will......... if it is fifty five hundred years we shall get ride of you; yes, we shall drive every blasted Englishman into the sea, and then and then you and I shall be friend."

প্রায় ব্রাউনিঙের 'লাস্ট রাইড টুগেদারের' মত এই দৃশ্য। কথোপকথন-রত ফিল্ডিং এবং ডক্টর আজিজের ঘোড়া পাশাপাশি ছুটছিল। পরে দুই পশু দই দিকে ছিটকে পড়ল—যেন স্বতন্ত্র দেশের জীবন-ধারা। নিজ জন্মভূমির মল্লিনাথ রূপে যাত্রা আরম্ভ করলেও বিশ্বের চত্বরে ফস্টারের গন্তব্য শেষ হয়। গোত্র, কৌম, জাতি— বিবর্তনের এই ধারায় আর পৃথিবীর সমস্যা-সমাধান সম্ভব নয়। আন্ত র্জাতিকতার পাদপীঠে শেষ হোক মানবতার যাত্রা। ফস্টারের রচনায় এই সুর স্পষ্ট। শিল্পীর ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সর্বমানবের সমস্যার গোড়ায় পৌছান যেন।

"People lost their humanity and took values as arbitrary as those in a pack of playing cards."

শ্রেয়বোধ প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনা ফস্টারের শিল্পসম্ভারের অন্যতম অন্তর্নিহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারা। হাউয়ার্ডস এন্ড' উপন্যাসের শ্লিগেল পরিবারের কথোপকথন :

"The very soul of the world is economic and that lowest abyss is not the absence of love, but the absence of coin."

আবার—

"The poor cannot always reach those whom they want to love, they can hardly escape from those whom they love no longer."

এখানে বৈশ্য-সভ্যতার এক অতি দুর্বল জায়গায় ফস্টার তাঁর নির্মম আঙ্গুল ঢুকিয়ে ছাড়েন। কিন্তু তিনি সিনিক বা অসূয়ক ব্যক্তি নন। তাঁর প্রেমিক দৃষ্টি এখানেও স্পষ্ট প্রতিভাত। মানুষের কাছেই ফস্টার ফিরে আসেন :

While the Gods are powerful, we learn little about them. It is only in the days of their decadence that strong light beats into heaven.

অন্যত্র এক প্রবন্ধে তিনি আরো পরিষ্কার—

"My law-givers are Erasmus and Montaigne not Moses and Saint Paul."

ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক আবহাওয়ায় লালিত ফস্টার নিজের সীমারেখা সহজে অতিক্রম করেন। সহজ মানবতা-বোধই তাঁর পথের দিশারী। তাই বিজ্ঞানের উপর প্রচুর আস্থা রেখেও ফস্টার বলেন,

" . . . owing to the political needs of the moment, the scientist occupies an abnormal position which he tends to forget. He is subsidised by the terrified Governments who need his aid, pampered and sheltered as long as he is obedient, and prosecuted under official Secrets Acts when he has been naughty. All this separates him from ordinary men and women and makes him unfit to enter into their feeling. It is high time, he came out of his ivory laboratory. We want him to plan our bodies. We do not want him to plan for minds."

ফস্টারের এই নৈতিক চিত্ত কোনদিন ঘুমিয়ে পড়েনি। উপায় এবং উদ্দেশ্যের ফারাক সম্পর্কে তিনি সদা-সচেতন। উপায় উপায় মাত্র। এমন কি সামাজিক ন্যায়পরতা, শান্তি পর্যন্ত তা থেকে বাদ পড়ে না। মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য : সৌন্দর্য্য-উপভোগ, প্রেম, বন্ধুত্ব, নৈতিক সাহস এবং বুদ্ধিগত সততার সাধনা। তাই ফস্টার ডাক দিয়েছেন, 'কনেক্ট দাইশেলফ্' । রবীন্দ্রনাথের 'জীবনে-জীবন-যোগ করার এক ভাষ্য। ব্যক্তিমানবের মহিমায় বিশ্বাসী ফস্টারই বলতে পারেন,

"Death destroys a man but the idea of death saves him মৃত্যু মানুষকে ধ্বংস করে। কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে তার ধারণা তাকে বাঁচিয়ে দেয়।"

মহৎ শিল্পীর বাণী।

ফস্টার মানুষ হিসেবেও মহৎ ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এমন বিশ্বনাগরিকের বিয়োগ-ব্যথা কোন শিল্পানুরাগীকে না বিচলিত করবে?

একুশে ফেব্রুয়ারী

"Why do you not listen to the people's wish and wisdom? It sounds in the ear like the voices of saints, of archangels, and of God."

– Joan of Arc, before death.

ভাষার অধিকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম খামখা ঘটে না। উপরে-উপরে হয়ত ভাষা, অক্ষর, সাহিত্য বা এই জাতীয় বিতণ্ডার বুদ্বুদ ভেসে ওঠে। কিন্তু আরো তলায় সেঁধোতে না পারলে সেখানে সব জিনিসের হদিস ঠিক চোখে পড়বে না। উপরকার শিকড়ের বিস্তার কিন্তু আরো নিচে। আইস্‌বার্গের উপরে ভাসমান সাদা খণ্ডটুকু তার আসল পরিচয় নয়। নীচে বরফের জমাট স্তূপ আছে। একথা জানলেই সেখানে অন্যান্য তথ্যের হদিস ধরা দেবে।

অনেক সময় দেখা যায়, ওই উপরের অংশ দিয়ে এমন বাকবিতণ্ডা মাতামাতি চলে যে আসল হদিসের দিকে কারো চোখই পড়ে না। এই ভাবে প্রায়ই অযথা শক্তিক্ষয় হয়। কোন কোন সময় স্রেফ চালাকি দ্বারাও অনেক-কে ওই ভাসমান আইস্‌বার্গের ঠাণ্ডা চত্বরে স্বচ্ছন্দে আটকে রাখা যায়। একটা উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বৃটিশ আমলের এক বড়ো সাহেব হঠাৎ বাংলা বর্ণমালার উন্নতি-সাধনায় মেতে উঠলেন। এ ইচ্ছা সাধু। উপর থেকে তা-ই মনে হবে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে অন্য সিদ্ধান্ত তেড়ে আসে। শিক্ষার প্রসারে সেদিন অপরিহার্য্য ছিল বৃটিশের শোষণ বন্ধ করা, অর্থাৎ অপরিহার্য্য ছিল স্বাধীনতা। কিন্তু বড়ো সাহেবের চিকিৎসা দেখে মনে হবে। যেন বাংলা বর্ণমালার জন্যেই গোটা দেশের শিক্ষা এগোতে পারছে না। তিনি যদি সত্যিই সর্বান্তকরণে দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করতেন বা সে-বিষয়ে আগ্রহী হোতেন, তা হোলে আর যা-ই হোক, আর বড়ো সাহেব থাকা চলত না—বরং যোগ দিতে হোতো স্বাধীনতার আন্দোলনে। আসল হেতু থেকে দেশবাসির চোখ অন্য তুচ্ছ দিকে নিবদ্ধ রেখে বরং অজানিতে তিনি শোষক বৃটিশেরই সাহায্য করেছেন। তাদের নেমকের অমর্য্যাদা তিনি করতে পারেননি। ভালমানুষিয়ানারাও স্তর আছে। খণ্ড পরিবেশে যিনি সাধু অখণ্ড পরিবেশে তিনি হয়ত অসাধু। সত্যিকার ভাল মানুষ হওয়া কোন কালেই সহজসাধ্য নয়। আক্কেল এবং আন্তরিকতা দুই-ই প্রয়োজন হয়।

ইতিহাসে কোথাও দেখা যায়নি, কায়েমী স্বার্থ শিক্ষার প্রসারকল্পে এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে। জনসাধারণ যত অশিক্ষিত থাকে তাদের রাজগী তত নির্বিবাদ হয়। মধ্যযুগ ছিল সেদিক থেকে একদম তোফা। তখন ছাপাখানা চালু হয়নি। হাতে লেখা বই, ক'জনের হাতে আর পৌঁছাত। ছাপাখানার প্রচলনের ফলে সেই আবহাওয়া আর থাকল না। অবিশ্যি ইউরোপেই মুদ্রণ যন্ত্রের এই আবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু তখন ইউরোপে প্রাদেশিক'ভাষার কোন মর্য্যাদা ছিল না। বই ছাপা হোত ল্যাটিন ভাষায়। কতোগুলো ঐতিহাসিক কারণে এই প্রতিবন্ধকতা বেশী দিন টিকতে পারে নি। জাতীয়তাবাদের উন্মেষই সেখানে প্রধান উপাদান। ছাপাখানা জাতীয়তাবাদ এবং কতগুলো সামাজিক বিপ্লবের জয়-স্রোতে গোটা-ইউরোপের চিন্তায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়।

মধ্যযুগের ইংলন্ডের ইতিহাস এখানে বিশেষ সহায় হোতে পারে, ভাষা-সংক্রান্ত ঘটনার যথাযথ হদিস বোঝার জন্যে।

চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংলন্ডের রাজভাষা ছিল ফরাসী। কারণ, রাজা ফরাসী। পঞ্চদশ শতকে পাশা উল্টে গেল। কারণ এবার রাজা ইংরেজ। সুতরাং ইংরেজী ভাষা রাজভাষা। অবিশ্যি তখনও ইংরেজী ভাষা পূর্ণ কলেবরে ফুটে ওঠেনি।

ইংলন্ডে ১৪৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়াম ক্যাকস্টন। ইংরেজী ভাষা তখনও আঞ্চলিকতা-দোষে দুষ্ট। ক্যাকস্টন তার উপর বড় ক্ষুব্ধ ছিলেন। তখন ইংরেজী শব্দের বানানও ছিল ভিন্নরূপ। ক্যাকস্টন লিখেছেন যে কেন্ট্ শহরে একদল ভ্রাম্যমান সওদাগর

asged after eggys (in modern English : asked for eggs)

কিন্তু গৃহকর্ত্রী জবাব দিলে,

could speke no frensche.

তখন একজন লিখে জানালে, তারা কী চায়। ক্যাক্সটন মন্তব্য করেছেন—

"Low, what shoulds a man thyse dayes now wryte."

দেখো মানুষ যা বিক্রী করে তা লিখে জানাতে হয়।"

ইংলন্ডে ছাপাখানা চালু হওয়ার ফলে ধর্মগ্রন্থ বহুল সংখ্যায় ছাপা শুরু হোলো। কিন্তু চার্চ তা সুনজরে দেখল না। প্রশ্ন উঠতে পারে চার্চ ত ধর্মের বিস্তার চায়। জনসাধারণের কাছে বাইবেল বা ঐ জাতীয় গ্রন্থন পৌঁছাবে, তা আনন্দের কথা। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় বস্তুত তা ঘটে না। কারণ, কায়েমী স্বার্থী ও চার্চের স্বার্থ প্রায় এক দড়িতে বাঁধা থাকে। সাধারণ মানুষের কাছে বাণী সোজাসুজি পৌঁছালে তার ব্যাখ্যা আর পাদ্রীদের ইচ্ছামত হবে না, বরং আরো নানা রকম ব্যাখ্যা উঠবে—যা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হোতে পারে। ভয় সেইখানে। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চের তাঁবে প্রচুর ধন-সম্পত্তি জমি-জায়গা থাকত। জনসাধারণ সাম্যের দোহাই দিয়ে সেখানেও ভাগ বসাতে পারে। মৃত্যুর পর সুখভোগের আশ্বাসে তাদের বিশ্বাস নাও থাকতে পারে। আসল ভীতি এই জায়গায়। তদানীন্তন এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব-প্রেমিক তাই লিখেছেন :

"And when will our spirituality (clergy) say Hoo (hold) and forbid them to give more lands? "Never untill they have all."

আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার যোগসাজস নেই, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তা স্পষ্ট দেখা গেল, যখন চার্চ বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ আদৌ পছন্দ করল না। ধ্বংসোন্মুখ সমাজের প্রতিষ্ঠান বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে না। তার ষোল আনা নির্ভর তখন ভীতি। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তখন তাদের সিদ্ধান্ত আসে। চার্চ তাই সিদ্ধান্ত নিল, ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ শুধু নিষিদ্ধ নয়, বরং অনুবাদ করলে তার শাস্তি : প্রাণদণ্ড। আজ অনেকের কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হোতে পারে, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে একথা আদৌ অজানা নয়।

এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম টিন্ডেলের নাম আজও প্রাতঃস্মরণীয়। চার্চের খাঁড়া মাথার উপর ঝুলছে। তবু তিনি বাইবেল-অনুবাদে এগিয়ে এলেন। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌সে এই মহাপ্রণা জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত তিনি ল্যাটিন থেকে বাইবেল তর্জমা করেননি। তাঁর অনুবাদ মূল হিব্রু ও গ্রীক থেকে। ইংলন্ডে কাজ শুরু করেন টিন্ডেল। কিন্তু নিপীড়ন তাঁকে রেহাই দিল না। তিনি জার্মানে পালিয়ে গেলেন। সেখানেও শহর থেকে শহরান্তরে যাযাবর জীবন। শেষে ওয়ার্স নগরে কিছু স্বস্তি পান কাজ করার জন্যে। তাঁর অনূদিত বাইবেল ইংলন্ডে পাচার হোয়ে আসে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ধর্ম আর শাসকগোষ্ঠীর একচেটে সম্পত্তি থাকল না। চার্চ প্রমাদ গনল। শুরু হোলো অনুবাদ বাইবেল পোড়ানো। এই নিয়ে মাঝে মাঝে মজার ব্যাপার ঘটত। একবার ছাপার খরচ তোলার জন্যে টিন্ডেল বাইবেলের কিছু পুরাতন ষ্টক বিক্রি করেন। কিন্তু সব বাইবেল কিনেছিল লন্ডনের বিশপের এক এজেন্ট। তাদের উদ্দেশ্য বাইবেল কিনে পুড়িয়ে ফেলা। টিন্ডেল তা কি করে জানবেন। পরে এ্যান্টোয়ার্প শহরে চার্চের এক গোয়েন্দা বন্ধু সেজে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক টিন্ডেলকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়। ঐ শহরের কাছে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়, তার পূর্বে দড়িযোগে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে। বাকরোধে হওয়ার আগে টিন্ডেল চীৎকার দিয়ে বলেছিলেন :

"প্রভু ইংলন্ডের শাসকদের তুমি দৃষ্টি দান করো।"

এক সদাশয় মহাপ্রাণ ব্যক্তির এইভাবে জীবনাবসান ঘটে ধর্মেরই যূপকাঠে।

টিন্ডেলের এই জীবনকাহিনীই ভাষা-আন্দোলনের মূল হদিস্‌ বোঝার জন্যে যথেষ্ট। উপরে ভাষা, সাহিত্য, বর্ণমালার সমস্যা হয়ত ভেসে ওঠে। কিন্তু তলায় থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত। বুদ্বুদ ত বুদ্বুদ নয়। পানীর ভেতরকার আলোড়নের বিন্দু-রূপ।

মধ্যযুগে রাজনীতি ধর্মের লেবাসেই বিকশিত হোতো। মহামতি টিন্ডেল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে যেতে পারেননি। কিন্তু মানবতার প্রতি দরদ, গণতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা—যেখানে সাধারণ অখ্যাত রাখাল বালক পর্যন্ত অবহেলার বস্তু নয়—টিন্ডেলের এক বাণীতে আজও প্রতিধ্বনিত। এক পাদ্রীকে তিনি বলেছিলেন,

If God spare my life ere many years. I will cause the boy that driveth the plough shall know more of scriptures than thou doest.

ঈশ্বর যদি আমাকে আয়ু দেন, বহু বছর, একজন বালক যে লাঙ্গল চালায় সেও যেন তোমার চেয়ে ভাল শাস্ত্র জানে—তেমন কাজেই আমার জীবন আমি নিয়োজিত করব।"

একুশে ফেব্রুয়ারী তেমনই গণতান্ত্রিকতার রক্তাক্ত পদক্ষেপ।

দুই লোকের যাত্রী

"এখানে শস্যের চেয়ে টুপি বেশী।"

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ফরাসী এবং ইংরেজী দুই ভাষায় অনূদিত তাঁর "লাল সালু" উপন্যাসে নোয়াখালি জেলার এক এলাকা বর্ণনাকালে, উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই একটি পংক্তি মারফৎ তাঁর এক যুগের মানস-আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

AMARBOI.COM

পাক-ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় প্যান-ইসলামের ঘোর আজও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের মুসলমানেরা ঠেকে শিখেছে। তাই মনে প্রাণে বাঙালী হওয়ার জন্যে হাতে হাতিয়ার তুলে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা ক্রমশ প্রকট। অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রথম পর্যায়ে বলা হোতো মুক্তিফৌজ। এখন তারা মুক্তিবাহিনী। অনেকের কাছে ফৌজ শব্দই অরুচিকর। কারণ উর্দু-ফার্সি ঘেঁষা। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত চরম প্রান্তে পৌঁছতে হয়। নচেৎ ইতিহাসে হয়ত কল্কে পাওয়া যায় না।

বাঙালী মুসলমানের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা-নির্মাণের দায়িত্ব যারা দিয়েছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁদের অন্যতম মহৎ কারিগর।

প্রথমেই যে-পংক্তি উদ্ধৃত, তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। মধ্যযুগীয় পারলৌকিকতার পেছনে লেখকের বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট। তাই শস্যের উপর জোর বেশী। টুপি মধ্যযুগীর মানসিকতার প্রতীক। একদা কামাল আতাতুর্ক ফেজ টুপির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। অবিশ্যি সেইকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মন্তব্যও স্মরণীয় : "মাথার ভেতর কী আছে, তার বিরুদ্ধেই লড়া উচিত;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে কী আছে, তা নিয়ে নয়।" কিন্তু সমাজ বিবর্তনে এমন দু'একটি সামগ্রী-প্রতীক নিয়েই দ্বন্দ্ব চলে যদিও বিরোধের ডালপালা আরো জটিলতায় বিস্তৃত এবং গোটা ব্যাপারটা সমানভাবে বাইরের ও ভেতরের।

আজ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ওয়ালীউল্লাহর "লাল সালু" উপন্যাস ১৯৪৫-১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। মধ্যযুগীয়তা-বিরোধী ঐতিহ্যের শক্তিশালী পথিকৃৎ নজরুল এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু তা প্রধানত কাব্যে সীমাবদ্ধ। কথাশিল্পে উক্ত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে আরো পরে, তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে। এই ধারাবাহিকতা প্রথম দিকে বেশ জোরদার ছিল। কারণ, ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তখন তেমন বড় ফাটল ধরেনি বা প্রতিপক্ষ দল তেমন শক্তিশালী হয়নি। দেশাত্মবোধ মাটির কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। জসিমউদ্দীনের পল্লী এলাকা তখন জাঁক করে বসেছিল কাব্যের পাতায় যেমন বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালি" গদ্যের ক্ষেত্রে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর "লাল সালু"র পটভূমিও পূর্বসূরীদের মত রোমান্টিক রঙে রঞ্জিত। মুসলমান সমাজের এক অন্ধ কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন 'লাল সালু'র আসল কাহিনী। সেদিক থেকে বিষয়বস্তু বাস্তব। কিন্তু লেখকের ভাষা স্বপ্নিল আচ্ছন্নতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই প্রবণতা সর্বতোভাবে রোমান্টিক। অবিশ্যি রোমান্টিকরা প্রশান্তি খুঁজতে প্রকৃতির দ্বারস্থ হতেন। ওয়ালীউল্লাহর নিসর্গবন্দনা কিন্তু উপন্যাসের পটভূমি রচনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বরং তা উপন্যাসের অলঙ্কার বিশেষ। কথকতার বিরতি না দিয়ে যেন পাঠকের দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু—উপন্যাসে নয়, গল্পে—নিসর্গ কথকতার মোটিভ বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধৃত। ওয়ালীউল্লাহর একটি প্রসিদ্ধ গল্পের নাম : পাগড়ী। খান বাহাদুরের তৃতীয় পক্ষের শাদী। বিবাহ-শেষে বউ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তুমুল ঝড়বৃষ্টি নামল। খান বাহাদুরের কাপড়-চোপড় সব ভিজে সপ্‌সপে। কেবল পাগড়ীটা তিনি ভিজতে দেননি। তা আস্ত রয়েছে, পূর্ববৎ। আবার তা কাজে লাগাতে পারে। এমন ব্যঞ্জনায় এই গল্পটি লেখক শেষ করেছেন অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের টানে। ওয়ালীউল্লাহর শিল্পী মনের এই এক বৈশিষ্ট্য। ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনার উপর তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল।

ওয়ালীউল্লাহ গদ্যে রোমান্টিক ঐতিহ্যের অধিকারী, কিন্তু উচ্ছ্বাস-বর্জিত। বাস্তব জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ায়ের জন্য তাঁর তাগদ সবসময় মুখিয়ে থাকত। তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গল্প : একটি তুলসী গাছের কাহিনী। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের চেহারা ছিল ফিউডাল। তাদের জোর সমর্থক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মোল্লা-মৌলবী ইত্যাদি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই অরাজকতার মধ্যে কয়েকজন কেরানী এক হিন্দু ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত দালান দখল করে বসল। তারপর কালনেমির লঙ্কাভাগ। কীভাবে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালানের কামরাগুলো ভাগ করা যায়—তার এলোপাতাড়ি হিসেব এতদিন ফ্যামিলিসহ শহর-বাস নসীবে জোটেনি, এবার শয্যাসুখও পাকিস্তানের ব-দৌলত মুঠোর ভেতর। তখন সরকারী অপিস এবং তার চেয়ে জরুরী অফিসারদের কোয়ার্টার দুষ্প্রাপ্য ছিল। হঠাৎ একদিন রিকুইজিশন নোটিশ এলো : বাড়ি ছাড়ো। ওয়ালীউল্লাহ গল্প শেষ করেছেন : এবার ত জানালায় রঙীন পর্দা ঝুলবে।

১৯৪৮ সালে লেখা এই গল্প যেন পাকিস্তানের গোটা ভবিষ্যতের ইশারা। কয়েকটি আঁচড়ে মাত্র গল্পকথক তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই গল্পের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে মানবিকতা-বোধ। হিন্দু বাড়ি। উঠানে তুলসী গাছ। কেরানীদের অনেকের কাছে উষ্মার ব্যাপার। উপড়ে ফেলার তাগিদে অনেকে ঘোর মুসলমান কিন্তু শেষে দেখা যায় যিনি পাক্কা নমাজী এবং ছুৎমার্গ ব্যাধিগ্রস্ত, তিনিও তুলসী গাছের গোড়ায় জল দেন প্রকৃতির শোভা হিসেবে গাছটা বাঁচিয়ে তুলতে এবং ভাবেন, মালিকেরা এখন কোথায়? কাঁকিনাড়া, লিলুয়া না অন্য কোন অঞ্চলে? শেষ পর্যন্ত ধর্মান্ধতা মানবিকতার কাছে পরাস্ত। অপূর্ব এই কাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন যেন ওয়ালীউল্লাহ্ই সকলের পূর্বে মানসচক্ষে দেখেছিলেন।

সমাজ-কম্পর্কে এই তীক্ষ্ণ চেতনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে আর কোনদিন পরিত্যাগ করেনি। মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে তিনি প্রচুরভাবে খড়গহস্ত ছিলেন, যদিও এমন চৈতন্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের উত্থান-পতন অদ্ভুতভাবে সংগতিহীন। বরং ভুল হবে না, যদি মন্তব্য করা যায় বেঢপ। নব্য মুসলমানেরা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ সেকালে কম উপভোগ্য ছিল না। পর্দাপ্রথা, দাড়ি প্রভৃতি বিরোধিতা। 'শিখা-গোষ্ঠী' নামে খ্যাত ঢাকায় তৃতীয় দশকের কিছু পূর্বে মরহুম আবুল হোসেন কাজী আব্দুল ওদুদ, কবি আব্দুল কাদির প্রমুখ যথেষ্ট বদনামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন তাঁদের পূর্বোক্ত লড়ায়ের জন্য। কিন্তু দেখা গেল দু'একজন মানুষ ছাড়া অনেকে রণে ভঙ্গ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের আকৃতি অন্যদিকে বদলে গেল। সমাজ-জীবনে যাঁরা ছিলেন মোল্লা বিরোধী, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাঁরাই মোল্লারূপে প্রবেশ করলেন। এক কথায়, মুসলিম-লীগের সমর্থকরূপে। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ধ্যানাদর্শ ত মধ্যযুগীয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা হয়ত আছে, কিন্তু তার সরলীকরণ অত সহজ নয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে এমন অসঙ্গতি ওয়ালীউল্লাহকে কোনদিন পেয়ে বসেনি। তাঁর "তুলসী গাছের কাহিনী" সবসময়ই সরব ছিল।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেব ছিলেন অতি মার্জিতরুচি এবং অতিমাত্রায় খুঁতখুতে। যদিও পঁচিশ বছর তাঁর সাহিত্য সাধনার ব্যাপ্তিকাল, কিন্তু পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তিনখানা উপন্যাস, পঁচিশ কি তিরিশটা গল্প এবং খানতিনেক নাটক কুল্লে সম্বল। কিন্তু গুণগত দিকে কিছুই ম্লান নয়। এদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসী মেজাজে প্রবর্তক হিসেবে স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী খ্যাত। বহুকাল প্যারিস প্রবাসের ফলে, সৈয়দের রচনায় কন্টিনেন্টাল নানা তরঙ্গের অভিঘাত পাওয়া যায়। ফরাসী অস্তিত্ব-বাদীদের প্রভাব আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপর বেশ কিছুদিন আচ্ছন্নতা বজায় রেখেছিল। কিন্তু তার ফলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তের অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে। ওয়ালীউল্লাহর অন্যতম উপন্যাস "চাঁদের অমাবস্যা" নিতান্তই অন্তর-পরিব্রজনা; ব্যক্তির আইডেনটিটি বা সত্তা-চিহ্নের প্রশ্নে আকীর্ণ। কিন্তু আঙ্গিকে যা-ই হোক, ওই উপন্যাস নানাদিক থেকে মূল্যবান। "চাঁদের অমাবস্যা"র কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। এক স্কুল মাস্টারের সামনে একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত। সব বৃত্তান্ত তার জানা। কিন্তু ভদ্রলোকের সাহসের অভাব মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। বরং নিজেকেই হত্যাকারী ঠাউরায়। এমন ব্যক্তির অন্তর আকাশের চিত্র পৌনে দুশ" পাতার উপন্যাস। ১৯৬৩ সালে লিখিত এই উপন্যাস সম্পর্কে এক সমালোচক লিখেছিলেন যে, বহুদিন প্রবাস জীবনযাপনের ফলে, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন লেখক এবং তারই ফল এমন উদ্ভট উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে এই গোপাল ঠাকুর চিনতে পারেননি। এই উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক ছিল : ব্যক্তি গোটা দেশের জনসমাজের প্রতীক। সমালোচকের তা চোখে পড়েনি। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অধীনে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমানরা অন্যায়-অবিচারের সম্মুখে বোবা, ভীরু এবং কাপুরুষ ছাড়া আর কী? আঙ্গিকের নতুনত্ব অনেকের বোধ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। এমন কী বইয়ের নামেও অনেক পাঠক বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'কাপুরুষের কাহিনী' নাম দিলে হয়ত সমালোচকের বিভ্রান্তি ঘটত না। এই উপন্যাসের আসল বৈশিষ্ট্য, কেবল নায়কের মানসরঙ দিয়ে সমগ্র পরিমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টা। সৈয়দ নিজে ছিলেন শৌখিন চিত্রশিল্পী। বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা চ্যাটো এন্ড উইন্ডাস কর্তৃক প্রকাশিত ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু'র ইংরেজী অনুবাদ ট্রি উইদাউট রুটস' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট তাঁর নিজেরই আঁকা। বাংলা উপন্যাসে নির্বস্তুক চিত্রশিল্পের ধারায় কথকতার প্রবর্তন আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কনের পদ্ধতিতেই সাধারণত বাঙলা উপন্যাস লেখার রেওয়াজ চালু। কল্লোল যুগে মানস-পরিব্রাজনা শুরু হয়। কিন্তু তা ডালপালা মেলার খুব সুযোগ পায়নি। ওয়ালীউল্লাহ সেদিক থেকে এক প্রত্যন্ত সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

অবিশ্যি "লাল সালু"র যুগেই সৈয়দের মধ্যে এই প্রবণতার বীজ উপ্ত ছিল। পূর্বেই উল্লেখিত স্বপ্নিল আচ্ছন্নতার দিকে আকর্ষী সৈয়দের ভাষা। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি কড়া পাহারার মধ্যে। ওয়ালীউল্লাহর তিনটি নাটকের মধ্যে 'তরঙ্গ-ভঙ্গ' বিশেষ মূল্যবান। যিনি আসামী তিনিই বিচারক সেজে আছেন। আইয়ুব খানের শক্তি দখলের অব্যবহতি পরেই ওয়ালীউল্লাহ এই নাটক লেখেন। কর্মস্থল প্যারিস প্রবাস-জীবন। কিন্তু মনের দিক থেকে দেশের অতি কাছাকাছি না থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমন অনুভব অসম্ভব। 'লাল সালু'র জগৎ সৈয়দ অতিক্রম করেছিলেন আরো গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়ে।

অতি অসহজ-পাঠ্য ওয়ালীউল্লাহর "কাঁদো, নদী কাঁদো" তিন শ' পাতার উপন্যাস। এখানে সব চরিত্র ছায়াভাষ। কখনও যে-যার মনের, কখনও ঘটনার, কিন্তু তাদের রচিত পরিমণ্ডল বা জীবন-বেদ পাঠে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। সোজাসুজি গল্পপাঠের রুচি বাঙালী সমাজে এমন চালু যে কঠিন পরিশ্রমে পাঠকের ঘোর অনীহা। এই ক্ষেত্রে লেখকের অপরাধ হয়ত আছে। মূল্যবান আস্বাদের জন্য প্রচুর মেহনৎ প্রয়োজন—লেখকের পক্ষে এমন দুঃসাহস দেখানো প্রায়ই বিরল। ওয়ালীউল্লাহ সীরিয়াস পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে কোনদিনই পেছপা হননি।

পাকিস্তানী জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রের দাপটে বাংলা বইয়ের আমদানী দুই বঙ্গের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এখানে প্রায় অপরিচিত, যদিও তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়ন-চারা' এই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সনে। প্রকাশক : পূর্বাশা সম্পাদক স্বর্গীয় কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। রসিক ব্যক্তি তখনই এই উদীয়মান কথাশিল্পীকে চিনে ফেলেছিলেন। ওয়ালীউল্লাহর 'কাঁদো, নদী কাঁদো" উপন্যাস সমঝদারদের পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামমুখর পটভূমি বুঝতে তাদের বিলম্ব হবে না। 'কাঁদো, নদী কাঁদো" উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র খতিব মুনশী পৌঢ় বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, তিনি তাঁর আজন্ম-অধ্যুষিত কুমারডাঙার অধিবাসী। এ যেন বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আত্মজিজ্ঞাসার অগ্নি-পরীক্ষায় আবিষ্কৃত বাংলাদেশ। আরব দেশের মরুভূমি, উট, খোর্মাবৃক্ষের প্রেমে দশ-দশা বাঙালী মুসলমান স্বদেশের নদ-নদী নিসর্গ বাহার শত শত বছরেও দেখতে শেখেনি। স্বৈরতন্ত্রের বেইজ্জতির হাটে তাই বেচা-কেনা গরু-ছাগলের দশা ছিল তার। নদীমাতৃক বাংলাদেশ। তার সত্যিকার লেখক-সন্তান উপন্যাসের শেষ পংক্তিতে সখেদে বিলাপ রেখে যান, "কাঁদো, নদী কাঁদো"।

নদী আর ক্রন্দনমুখরা নয়। শত প্রহরণ-ধারিণী, উচ্ছল মাভৈঃ মন্ত্রের তরঙ্গ-প্রসবিনী। বাংলাদেশ মুক্তির পথে। পরম দুঃখ, আন্তর্জাতিক মনের অধিকারী, ওয়ালীউল্লাহ যে-দেশের প্রতি এত অগাধ প্রেম পোষণ করতেন তাকে ছিন্নশৃঙ্খল দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর সব সম্ভাবনার বিকাশ নেপথ্যে থেকে গেল।

* স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ১০ই অক্টোবর, ১৯৭১ সনে হঠাৎ হৃদরোগে ওয়ালীউল্লাহর প্যারিসে তিরোধান ঘটে। কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আহূত স্মৃতিসভায় পঠিত ও পরে দেশ-পত্রিকায় প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানপত্রের জবাবে

আমার গোটা জীবনের পাথেয়—কথা, আপনারা কেড়ে নিয়েছেন, অভিভূত মন এবং এই সভার ষড়যন্ত্রে। লেখক-কে এমনভাবে দেউলিয়া বানানোর জন্যে আপনাদের বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতে পারব না। আমরা তো যৌথ জীবনের টুকরা, একে অপরের বিকাশের সহায়ক। মানুষের বিচিত্র লীলাগার গড়ে উঠেছে এই সহযোগিতার উপর। তাই সামাজিক স্বীকৃতি দ্বারা কেবল একজনকে চিহ্নিত করা, হয়ত সামাজিক আদর্শের কোন প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু আমার কাছে তা প্রাবাদিক কৃষ্ণ মেষের কাহিনী। অর্জিত যে কোন সম্মান-শিরোপায় সকলের শরীকানা সমান। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাল যেহেতু কল্পনার তাঁবেদার, অতীত বর্তমান—সমগ্র বিশ্বের ঐতিহ্য ত অগোচরে আমাদের পেছনে সহজে এসে দাঁড়ায়। সুতরাং একজনকে আলাদা করে দেখার মধ্যে হয়ত কতগুলো সামাজিক সুবিধা নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু সামাজিক সত্যের ব্যাখ্যা হয় না। চর্য্যাপদ থেকে চয়নিকা—এই মুহূর্ত পর্যন্ত কত জনের কাছে না আমাদের ঋণ। শুধু ভাষা-শিল্পীদের নয়, স্বদেশ, না, গোটা পৃথিবীর কাছে অধমর্ণতা অস্বীকার অর্থ ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। সভ্যতা-গঠনের তামাম উপাদানই অলক্ষিতে ব্যক্তি-মানুষকে গড়ে তোলে। এই দেনা স্বীকার এবং পরিশোধ এতই দুরূহ ও বর্ণনা-দুঃসাধ্য যে নীরবেই তা মেনে নিতে হয়। কারণ, সমগ্র পৃথিবীর দানে আমরা সমৃদ্ধ। তার উল্লেখ এতই নিষ্প্রয়োজন যে যৌথ অস্তিত্বের অনুভব দিয়েই এই খাতকতা স্বীকার রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। এ্যাভন-তীরের অমর চারণ, রবীন্দ্রনাথ রোলাঁ কি গ্যেটে, টলস্টয় গোর্কি ফক্‌নার—কোন এক বিশেষ দেশের সম্পদ নন। ভূগোলের পৌত্তলিকতা তাই এখানে অচল, যতই তার ব্যক্তিগত আলাদা রং থাক। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঋণ নিজের সমসাময়িক সতীর্থ নয় শুধু, দেশ কাল ছাড়িয়ে দূর বিস্তৃত। কেবল শিল্প-কর্মী নয়, সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনের বুনিয়াদে প্রত্যেকের অপরোক্ষ সাহায্য অনুভব না করা অকৃতজ্ঞতার নামান্তর। বিজ্ঞানের কৃতী সন্তানেরা কী আমাদের চেতনা প্রসারণে সাহায্য করেন নি? এমন কি যারা প্রতিদিনের ছোটখাট অভাব-টুকু মেটায়, খুব নগণ্য ব্যক্তি হোলেও, তাদের ঋণ স্বীকার করতে হয়। নচেৎ মানব-সভ্যতা বিপুল বিস্ময়ের এমন ভাণ্ডারে পরিণত হোত না। এই জন্যে একক-ভাবে চিহ্নিত হওয়া আমার কাছে অস্বোয়াস্তিকর, হাততালিরত দর্শকের সামনে নৃত্যমান সচেতন ভাঁড়ের দায়গ্রস্তির মত। আমন্ত্রণ গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের হৃদয়ের কাছে নতি জানানো মাত্র। নতুনা কবেই তা প্রত্যাখ্যান করতাম।

অবিশ্যি ব্যক্তিকে অস্বীকার আমার মতবাদ নয়। বরং তার বিকাশ যৌথের মধ্য দিয়েই সুচারু সম্ভব, পোনা যেমন পানিতে। ব্যক্তির স্বাধীনতা, সম্প্রসার দশের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে না পারলে, তা উন্মাদের লম্পঝম্প এবং অবাধ-বিচরণতা ছাড়া আর কিছু হয় না। ব্যক্তির বিকাশই প্রকৃত সামাজিক আদর্শ।

ইংরেজের হাতিয়ার-শালে তৈরী পরাধীনতার বেড়ি হাতে পায়ে নিয়েই সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেছিলাম। দেখেছি, আবেষ্টনীর জগদ্দলে ব্যক্তি থেত্‌লে দলা মাংস কি নার্ভে পরিণত, আদর্শ-বোধ-শূন্য মূক মুখ—যেদিকে বিদেশী শাসক চোখ দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনেই করত না, উপরন্তু অজ্ঞ অনুন্নত (ওদের কাছে এদেশের মানুষও আন্ডারডিভোলাপ্‌ড) পদবী জুড়ে বেইজ্জতির কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিত। ব্যক্তির প্রসারণ আমার কাছে আজো পরম জিজ্ঞাসা এবং পক্ষান্তরে রুদ্ধস্রোত চেতনা বিভীষিকা—ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই যা দেখা দিতে পারে। শিল্পের কারিগর হিসেবে চেতনার যথাযথ বর্ণনা যেমন আমার কাছে কৌতূহল, তার বহমানতার উপায় এবং উদ্দেশ্য তেমনই চিত্তাকর্ষক। একই সঙ্গে নাট্যকার অভিনেতা দর্শক এই তিন ভূমিকা যুগপৎ পালনের মহান দায়িত্ব লেখকের উপর বর্তায় বিধায় মানস-শক্তির উত্থান-পতন নিরীক্ষা রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের চেয়ে কম উদ্দীপনা সমন্বিত নয়।

দুঃসাহসিক অভিযান এই আত্মিক এ্যাডভেনচার, কত দুঃসহ আনন্দ এবং বেদনার সমাহার, তা সতীর্থ হিসেবে আপনাদের বলার প্রয়োজন নেই। অহর্নিশ নব-দিগন্ত প্রয়াসী সদাজাগর চিত্ত মাথা খোঁড়ে জীবনের অজস্রতার দেওয়ালে, কোথাও তার ঈষৎ ব্যাখ্যার ইশারা এবং সৌন্দর্যের নকশা খুঁজে পাওয়ার জন্যে। যদিও সুন্দরের পিপাসা যে কোন লেখকের কাছে মুখ্য, তবু সত্যকে বাদ দিয়ে তা জীইয়ে রাখা অসম্ভব। সৌন্দর্য্য সত্যের অন্তর্নিহিত ঝিলিক মাত্র। শিল্পী সেই ছটা আরো নকশা বা প্যাটার্ণে বাঁধেন যেন সত্যের প্রতিভাস সহজে হৃদয়ের উপর প্রতিচ্ছায়া ফেলতে পারে। এই ব্রত দুরূহ। পারদ-পিছল সত্য আবেস্টনীর ঈষৎ অদল-বদলে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে। তার গতিও অনেক সময় এত দ্রুত যে মন পেছনে পড়ে যায়। যে-বস্তু আয়নায় প্রতিচ্ছবি ফেলেছিল, তা হয়ত সরে গেছে। অথচ আয়নার বর্তমান প্রতিফলনকে পূর্বতন বস্তুর আদল ঠাউরে বসে আছি। এমন মরীচিকা মন ও শিল্প উভয়ের সর্বনাশ করে। মতিচ্ছন্নতা এইভাবেই হাজির হয়। জাগরিত চিত্ত এবং বুদ্ধি ছাড়া জীবনের প্রতিভাসকে ঠিকমত ধরা কঠিন। বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়া শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। প্রতিচ্ছায়াগ্রাসী নির্মল ফলকের সাধনা মনের পক্ষে আদৌ সহজ নয়।

আদর্শ এবং কর্মময়তা তাই এখানে অচ্ছেদ্য। শিল্পের কারিগরী দিকও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। শুধু অনুভবই যথেষ্ট নয়। তার যথাযথ প্রকাশের জন্য কাঠামোর খোঁজ একই সঙ্গে অপরিহার্য্য। থিয়োরী প্র্যাকটিসের সমন্বয় আর কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন থাক বা নেই থাক, শিল্পের বেলা বিশিষ্ট কর্তব্য। ফাঁকির পথ ফলে অবরুদ্ধ।

দুর্গম বন্ধুর পথ-যাত্রার এই সাধনা। নিঃস্তব্ধতার ভিড়ে কাজ করা অভ্যাস। অশেষ প্রত্যাশায় হয়ত আপনারা আমাকে এইখানে খাড়া করেছেন, আমার অস্বোয়াস্তি বাড়াতে। বিশেষ আশ্বাস আমার পক্ষে দেয়া অসংগত। তবে আমার তরফে এইটুকু বলার আছে নিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনদিন পরিশ্রম-বিমুখ হব না। সতীর্থদের প্রত্যাশা পল্লবিত করার প্রচেষ্টা বন্ধু হৃদয়ের ধর্ম। আমি সেই ধর্মভ্রষ্ট হব না, ব্রত চ্যুত হব না কোনদিন। গন্তব্য-তীর্থের ব্রজনায় আপনাদের আতিথেয়তার ঐক্যতান এই বিশ্রান্ত মাধুর্য্য, চিরদিন আমি স্মরণ রাখব। কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার অন্তর্হিত। তাই ধন্যবান, আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাদের।

চোখের পানিতে আটক-দৃষ্টি, পথ স্পষ্ট চলার ব্যাকুলতায় যখন অশ্রু মুছে তাকাই, তখন দেখতে পাই, পূর্বসূরীদের মহান সৃষ্টি, আমার স্বদেশ এবং তার অগণন মানুষকে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যন্ত্রশালে যারা কাজ করে। সাহিত্য, শিল্প যুগপৎ আমার পথ এবং পাথেয়।

AMARBOI.COM

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। দেখা গেছে রাজনৈতিক কিছু মুনাফা আদায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আবার শেষোক্ত আলোড়ন উপরি উপরি যাই হোক, তার দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনৈতিক। বাংলাদেশে এখনকার প্রবণতার হেতু সন্ধানের জন্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমি-সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

অনেকে তো পাকিস্তানের জন্মলগ্ন নিজের নাড়ীতে অনুভব করেছেন। তাঁদের জন্যে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অনেকের জ্ঞান কেবল ইতিহাস মারফৎ। তাই অতীতের কবর আবার নতুন করে খুঁড়ে দেখতে হয়।

পাকিস্তান গঠিত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর। মুসলমানরা এক জাতি, যেহেতু তাদের ধর্ম এক। মোদ্দা কথা এইখানে এসে দাঁড়ায়। ধর্মকেই জাতীয়তা গঠনের একমাত্র উপাদান-রূপে তখনই মুসলিম লীগ প্রচার করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের হালে এই তত্ত্ব পানি না পেলেও রাজনৈতিক চাপে তা সহজে টিকে গেল না শুধু, দেশই দ্বি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খণ্ডিত করে ছাড়ল। এই সাফল্যের কারণ-সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণ আছে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের উপর অনেকে দোষ চাপিয়েছে। কারো মতে মুসলিম লীগ দায়ী। কেউ কেউ তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের কারসাজি বলে প্রচার করেছেন। অতি-সরলীকরণের প্রবণতায় এমন সব কথা আজো শুনতে হয়। কিন্তু যা তত্ত্ব হিসেবে টেকে না তা রাজনৈতিক সত্য হিসেবে কি করে জানান দিল? মনস্তাত্ত্বিকেরা যুক্তিবিচারহীন আবেগ-জগতের দিকে ইশারা দেন। দশ কোটি মুসলমান নচেৎ কীভাবে একটা অযৌক্তিক সমাধানের দিকে ছুটে গেল। দুই দশক পরে ঐ গড্ডলিকা-প্রবাহের পরিণাম অতি স্পষ্ট। বাংলাদেশের জন্মই নচেৎ হোত না। কিন্তু এক যুগে দশ কোটি মানুষ মোহগ্রস্ত হোয়েছিল। নিজের মঙ্গলামঙ্গল দেখেনি। সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানদের পাকিস্তানের জন্য কোন মাথাব্যথা থাকা উচিত ছিল না। কিন্তু তারাও সেদিন চোখ বুজে নিয়েছিল, যুক্তির ধার ধারেনি। আধুনিক শিল্পসমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন : পাকিস্তান। কিন্তু তার ভাবধারা মধ্যযুগীয় ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবিশ্যি এখানে ইসলাম ধর্ম বলতে বোঝায় লীগ নেতারা যা বুঝতেন। কারণ, এই ইসলামের স্বরূপ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁদের কোন চেষ্টা ছিল না। এই স্বরূপ যত ঘোলাটে থাকে, ততই মঙ্গল। রাজনৈতিক মুনাফা-অনুযায়ী তার অদলবদল চলত। জিন্নাহ সাহেব ভুলেও সহজে পশ্চিম মুখে আছাড় খেয়ে পড়তেন না, তিনি হোলেন মুসলমানদের ইমাম। আর বিশ্বে কোরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বা তফসীর-কারক মৌলানা আজাদ হোলেন 'শো-বয়'। এমন বহু স্ববিরোধের ছবি তখন পাওয়া যায়। একদিকে ভাবধারা মধ্যযুগীয়, কিন্তু উদ্দেশ্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে চিন্তা আবার অত্যাধুনিক। অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের কোন যুক্তিযুক্ত বনিয়াদ ছিল না। কিন্তু তবু একটা নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠল। এই স্ববিরোধ তখন স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র চালু হোল এবং কালে কালে তার সমস্যাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তখন আভ্যন্তরীণ বিরোধের কেলাসন ঘটতে লাগল। বেশ দ্রুতই বলতে হয়। আর স্ববিরোধ কি একটা? কতো রকমের। দেশ ভাগের পূর্বে বিভাগই সকল জাতির উন্নতি। কিন্তু দেশবিভাগের পর তারাই পাকিস্তানকে এক ইউনিট বানিয়ে ফেললে এবং ঘোষণা করলে, অমন অখণ্ডতার মধ্যেই জাতীয় উন্নতির পথ নিহিত। দু'মুখো সাপের বিষ নাকি নামে না। কথাটা প্রবাদ হোলেও এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্যি। ১৯৬৫-৭১ এই ছ' বছরে যে ঘুর্ণীপাকে পাকিস্তান উপনীত তা ইতিহাসের তুষারঝটিকা বলা চলে। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পূর্বোক্ত স্ববিরোধ ধ্বংসের শঙ্খনাদ।

এই সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের মানস পটভূমির সঙ্গে কিছু পরিচয় দরকার। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের চরিত্রও কিছু আলোচনার দাবী রাখে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যার রূপ স্বতন্ত্র আলাদা। বর্তমান স্ববিরোধের প্রকাশ একদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে অতীত-বীজের পরিণতি মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ-নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে উদ্ভূত। এরা সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আপ্লুত থাকলেও বাংলাদেশে পাশ্চাত্য চিন্তার অভিঘাতও ঢের বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব পুরোমাত্রায় সামন্ত্রতান্ত্রিক। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান কি উত্তর সীমান্ত প্রদেশে তার একই চেহারা। সকলেই বিরাট ভূখণ্ডের মালিক। মধ্যবিত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলই না। সামাজিক কাঠামোর পার্থক্য পরবর্তীকালে রাজনীতিতেও প্রতিফলিত। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্যে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গড়াও সম্ভব ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে তার বিক্রয়-বণ্টন ব্যবস্থা। স্বতই জড়িত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্বিভাব তখন ঘটতে বাধ্য। পরবর্তীকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নিখিল-পাকিস্তান চরিত্র কিছু কিছু ফুটে ওঠে কিন্তু তেমন স্পষ্ট নয়। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে যখন মোজাফ্‌ফার আহম্মদ পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখা শেখ মুজিবকে পূর্ণ সমর্থন দেয়, তখন পশ্চিম পাকিস্তান শাখা চুপচাপ থাকে। ওয়ালী খান যিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন, তাঁর গল্পে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আলোচনা পর্যন্ত হয়নি বলে খেদোক্তি করেন। এইসব স্ববিরোধ কিন্তু পরিবেশ ও নেতৃত্বের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল দুই মুণ্ডু-বিশিষ্ট পাকিস্তানে এক রব শোনার সম্ভাবনা কম। জোড় মগজের প্রতিক্রিয়া স্থানকালের প্রতিসাম্য নাও রাখতে পারে।

অপর পক্ষে বাঙালী মুসলমানের মানস-অবাহ প্রায় স্বতন্ত্র। ব্রিটিশের প্রথম পদপাত বাংলাদেশেই। দেড় শ' বছর সেখানে সংখ্যায় প্রচুর না হোলেও মধ্যবিত্ত মুসলমান গড়ে উঠেছিল। বাংলার নানা সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবও তাদের উপর ক্রিয়াশীল ছিল। দুই অঞ্চলের দুই কবির তুলনায় এই পার্থক্য ধরা পড়ে। ইকবালের কাছে ধর্মবিশ্বাস প্রগতির একমাত্র সহায়। নজরুল বিশ্বাসের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ইকবাল শেষ পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন, নজরুল প্যান-ইসলামিক আচ্ছন্নতার প্রতি বিদ্রূপ হানেন : প্যান-ইসলাম, চুরুট ইসলাম। পশ্চিম পাকিস্তানে এখনও ট্রাইব্যাল দাঙ্গা প্রায় অনুষ্ঠিত হয়। শিয়া-সুন্নীর বিরোধও বিশেষভাবে প্রকট। তার কারণ, মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকড় সেখানে উৎপাটিত নয়। তেমন কোন সামাজিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়নি যা এসব ঝেঁটিয়া বিদায় দিতে পারে। খ্রীস্টান ধর্মের অনুরূপ ইসলামে রিফর্মেশন-জাতীয় কোন সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি। যেটুকু ঘটেছে তা নেহাৎ পরিবেশের চাপে। তার পেছনে কোন জোরদার যুক্তিবাদী আন্দোলন বা প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মেলে না। ফলে, সামন্ততান্ত্রিক পশ্চিম পাকিস্তানের মানস-আবহ মধ্যযুগের চৌকাটে আবদ্ধ। ছিটোফোঁটা যেটুকু গণ্ডীভাঙা আয়াস চোখে পড়ে তা সীমাবদ্ধ কিছু ব্যক্তির মধ্যেই। বর্তমান জীবনযাপনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারার স্রোত উত্থিত আধুনিক চেতনা পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন সোচ্চার কোথায়? তবে একটি ব্যাপার বেশ দেখা যায়, যা ম্যাক্স ওয়েবার অনেক আগেই বলে গেছেন। সমাজে শ্রেণীস্তর ভেঙ্গে ধর্মের চেহারা প্রকট হয়। উপরের তলায় তা-ই ধর্ম যা তাদের আর্থিক সুবিধা আরাম-আয়েশ, জীবনোপভোগকে অব্যাহত রাখে। শাস্ত্রীয় অনুমোদন সেখানে তুচ্ছ। ইসলামে পর্দাপ্রথার উপর কত কড়াকড়ি আরোপ করা আছে। উচ্চশ্রেণী তার কোন তোয়াক্কা রাখে না। এই খাদে ইসলামকে নামিয়ে আনতে পারে অভিজাতশ্রেণী, কারণ নচেৎ আয়েসে বিঘ্ন ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কনসেশান ভোগ করা যায়। সুদের উপর কী কঠিন ছিলেন মধ্যযুগের সমস্ত পয়গম্বরগণ। অথচ 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামের ধারক ও বাহক পাকিস্তান-শাসকশ্রেণী বিবেকে কোন খোঁচা অনুভব করেনি। কে না জানে ব্যাঙ্ক সুদেরই অন্যতম কায়িক প্রতিবিম্ব। এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রাক্ত সমাজে প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজের ধর্ম কতখানি চালু বা অচল থাকতে পারে, তা নিয়ে কোন মানসিক দ্বৈরথ পাকিস্তানে কেউ দেখবে না। মাঝে মাঝে কিছু মগজী কসরৎ জমে ওঠে, তা স্বল্প-শিক্ষিত পাণ্ডিত্যাভিমানী আলেম কি ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নীচু তলায় অবিশ্যি ধর্ম আবেগের স্তরে থাকে। যুক্তিবিচার সেখানে অনুপস্থিত। ম্যাক্স ওয়েবার আরো বলেছেন যে অন্ধ আবেগের ভেতরে তখন ধর্মের প্রকাশ বিধায় শাসকশ্রেণী সহজে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বিশেষত চিরন্তনত্বের দোহাই দেওয়া ঐ ক্ষেত্রে খুবই সহজ। মসুলিম লীগের নেতা বা সমর্থকদের মধ্যে বুদ্ধিচর্চায় ব্রতী অনুশীলিত একজন মানুষও দেখা যায়নি। আবেগের স্তরে ধর্মের এই উপস্থিতি পাকিস্তান আন্দোলনকে আসল সাহায্য দিয়েছিল। যুক্তিবিচারহীন এক ভাবধারা যে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হোল, তার অন্যতম বিশিষ্ট কারণ বোধহয় এইখানে নিহিত। অবিশ্যি আর্থিক সামাজিক বা অন্যান্য উপাদানকে খাটো করে দেখাও উচিত নয়। আবেগ মানুষকে কি পরিমাণ অন্ধ করে দিতে পারে, তার প্রমাণ তো বাংলাদেশের মুসলমানদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হোয়েও বাঙালী মুসলমানেরা কেন পাকিস্তান-মরীচিকার পেছনে পেছনে হন্য হয়ে দৌড় মেরেছিল? আজ তারা ধনেপ্রাণে যে-বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন, জাতি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় মরীয়া এবং যুধ্যমান, তা তাদের অতীতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর কি বলা চলে?

এইখানে বাঙালী মুসলমানের মানসিক আবহের এক দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক ধরনের হীনমন্যতা যেন তাদের মজ্জাগত। দেশে দেশে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্থানের লোক নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোয়ে ওঠে। উদাহরণত, ইরানীরা আরবদের শুধু হানাদার মনে করে না, একটা ঘৃণ্য ভেতরে পুষে রাখে। কারণ, আরবদের অধীনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাধীনতা তাদের কম ভোগায়নি। জাতীয়তাবাদ আন্দোলন-প্রসূত এই দৃষ্টিভঙ্গী আজ তাদের হাজার ক্রিয়াকলাপে স্পষ্ট। বর্তমান শাহান শা' অভিষেক কালে উপাধি গ্রহণ করেন আরিয়া মেহের অর্থাৎ প্রাচীন আর্যমিহির। তুরস্কে একই অবস্থা। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের দেহ যেখানেই পড়ে থাক, তার আত্মা আরবের মরুপ্রান্তরে কুদোকুদি করার জন্যে সর্বদা অস্থির। আরব দূর-আস্ত্‌। এবং যাতায়াত ব্যয়সাপেক্ষ। বাঙালী মুসলমানের আত্মা তাই শেষ পর্যন্ত বাঙলার বাইরে অবিভক্ত ভারতের কোন প্রদেশে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করত। নামের শেষে নিজের শহর বা গ্রাম জুড়ে দেওয়ার অবাঙালী রীতি, কত বাঙালী মুসলমানকে না একদা পেয়ে বসেছিল। বোকাই নগরী নামে এক মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসলমান যখন পীরের সন্ধানী তখন আর কোন কিছুতেই আর অত সন্তুষ্ট হয় না, যদি অবাঙালী মুর্শেদ পাওয়া যায়। একান্ত মাদানী (মদিনাবাসী) গাদানী না মেলে, ছাই, একটা জোনপুরী শাহরনপুরী পেলেও খুশীর চোটে সে অষ্টখণ্ড। চাটগাঁর জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন মদিনাবাসী। সুদূর সীমান্তবাসী পীর পর্যন্ত বাংলাদেশে বিচরণ করে এবং বেশ সোনাদানা হাতিয়ে নিয়ে যায় বছর বছর। পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশ শোষণ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য গত নয়, আধ্যাত্মিকও।

বাঙালীর এই বহির্মানসিকতার উৎস কোথায়? সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, বাঙালী মুসলমানের নেতৃত্ব পূর্বে জমি-নির্ভর শ্রেণী থেকে আগত অধিকাংশই বহিরাগত, তাদের দৃষ্টি বাংলার বাইরেই পড়ে থাকত। কানপুর, জৌনপুর, দিল্লী, দেওবন্দ, ইরান, তুরান ছিল তাদের মানসিক অনুপ্রেরণার উৎস। সাধারণ মুসলমান দৈনন্দিন জীবনের প্রতিঘাতে হয়তো পুরোপুরি আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ত না কিন্তু নেতৃত্বের খোঁজে এবং ঝাঁকে এক ধরনের হীনমন্যতা মনে পুষে রাখতে বাধ্য হোত। সাধারণ মুসলমান যে পুরোপুরি কুক্ষিগত হোয়ে পড়ত না, তার প্রমাণ বাংলাদেশেরই নানা আন্দোলন। বাউলদের মধ্যে ইরান তুরানের ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায়, তা নিতান্ত ধর্মীয় উৎসাহজাত, নচেৎ লৌকিকপ্রবণতার স্বাক্ষরই সেখানে বেশী। স্বীকার না করে উপায় নেই, বাঙালী মুসলমানের হীনমন্যতা যেন মুসলিম লীগ আন্দোলনেও স্পষ্ট। বাঙালী মুসলমান নেতারা অমেরুদণ্ডী জীবের মতই লীগ ওয়াকিং কমিটির শোভা বর্ধন করত। ফজলুল হকের মত মানুষ মাথা চাড়া দিয়েও শেষ রক্ষায় অসমর্থ হন। বাঙালী মুসলমান বর্তমানে পূর্বে পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণে তৎপর। বাংলাদেশ যেন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হবে, —তার মানস-বীজ বাঙালীর মধ্যে নিহিত ছিল। অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য ধারায় পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষতঃ পাঞ্জাবের অধিবাসীরা নিজেদের হেরেন্‌ভক বা উচ্চস্ত রের ব্যক্তি ঠাউরে এসেছে। তদুপরি অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা অবিভক্ত ভারতে অগ্রসর ছিল। অবিশ্যি উৎসভূমি কোন গৌরবময় ব্যাপার নয়। ইংরেজদের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতনভুক্ত সৈন্যসংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি ছিল পাঞ্জাব। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রসাদ এখানে একটু বেশী পরিমাণেই চুঁইয়ে পড়ত। ফলে, অর্থনৈতিক উন্নতি। সৈন্য রিক্রুটের সহায়ক বিরাট ভূ-খণ্ডের মালিকরা এখানে সাম্রাজ্যবাদের দোসর। প্রভুতের কল্যাণে এবং অনুকরণে তারা আধুনিক হালচাল রপ্ত করত। লেবাসে ফিট্‌ফাট, তাজা-তন্দুরস্ত এই মুসলমানদের বাঙালী মুসলমানরা বড় সমীহার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। কারণ বহির্মানসিকতা তো তার মধ্যেই বহু শত বছর থেকে চালু ছিল। ইসলামের বন্ধন আধ্যাত্মিকভাবে তা-কে কি করেছিল পাঞ্জাবী মুসলমানের সামনে বিচার করা কঠিন, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে কেঁচো বানিয়েছিল। সুদীর্ঘ তেইশ বছর লেগে গেল সেইটুকু উপলব্ধি করতে। নেজাম-এ ইসলাম, জমাতে ইসলামী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এখনও অবিশ্যি যে টিকে আছে, রাজনৈতিক ধার ভোঁতা হোয়ে গেলেও, তার কারণ, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু, কিন্তু সামাজিক শক্তি হিসেবে তার জের পশ্চিম পাকিস্তানে এখনও বেশ প্রবল। পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তার উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখতে খুবই তৎপর। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই, আর এক বৈশিষ্ট্য। স্থানকাল-বহির্ভূত এক ধরনের বায়বীয়তা শাসকগোষ্ঠী-কর্তৃক সব সময়ই জীইয়ে রাখার অপচেষ্টা।

—

২

দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হোল পশ্চিম পাকিস্তানে করাচী শহরে। তার জন্যে তখন যুক্তি খুঁজে বের করতে হয়নি। নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী। যে কোন জায়গায় হোতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা নিজেদের কোলে ঝোল মাখবেন, তা আর বিচিত্র কী। বাঙালীদের তরফ থেকে কোন উচ্চবাচ্যই ওঠেনি, কিন্তু উঠতে পারত। তখন নিস্তব্ধতার কারণ বাঙালীর মানস-আবহেই জমা ছিল। অবিশ্যি অনেক পরে বাঙালী তার ভুল বুঝতে পারে। বর্তমানে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে উঠছে, প্রায় সমাপ্তির পথে। তা নিতান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল। কিন্তু সুখসুবিধা যা গুছিয়ে নেওয়ার তা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আগেই আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। ইসলামাবাদে বর্তমান রাজধানী গড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী করাচী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে তুঘলকী পুরাণকে ম্লান করে দিল। ষোল শ' কোটি টঙ্কার শহর বর্তমান ইসলামাবাদ। একদম পাকিস্তানকে পাঞ্জাবের পকেটের ভেতর ঢোকাতে না পারলে স্বস্তি কোথায়? তৎসঙ্গে ষোল শ' কোটি টাকা ব্যয়-জাত ঝোল-ঝালের স্বাদ তো আছেই।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হঠাৎ রাজধানীর কথা উত্থাপন অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হোতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থায় তেমন হেলা-দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যায়। গোড়া থেকে বাঙালী মুসলমান সেই দিকে নজর দিলে হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাস স্বতন্ত্র কিছু হোত। বারো শ' মাইল দূরে রাজধানী! এমন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য সুখ-সুবিধা আদায়ের ব্যাপারে যারা নিকটে থাকে তারাই উপকৃত হয়। পাক-রাষ্ট্র কতগুলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দেয়। কিন্তু ছিটেফোঁটা মাত্র বাংলাদেশের কপালে জোটে। আর যা জোটে তা নেহায়েৎ শাসন বিভাগের মর্জির উপর নির্ভরশীল। সমাজে সাংস্কৃতিক বিকাশের এই দিক কারো নজর এড়ানো উচিত নয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা যখন আছে, তখন তা থেকে বঞ্চিত হওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার—যেহেতু নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা যায়—এমন মনে করা সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় আর্থিক আনুকূল্য একদম তুচ্ছতার সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? দূরত্ব হেতু বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ধর্ণা দেওয়া ছিল কঠিন। লালফিতার দৌরাত্ম্য থেকে প্রশাসন মুক্ত, এমন বলা যায় না। বাঙালীর পক্ষে তাই তৃষিত চাতকের মত চেয়েই থাকতে হোত। সাংস্কৃতিক বিকাশে বাইরের এই পরিবেশগত চাপটুকুও লক্ষণীয়। শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতা অনেক সময় বোঝা দায় হোত। আক্রোশ যেত প্রশাসন-ব্যবস্থার উপর। প্রজাদের নায়েবের উর আক্রোশ এবং জমিদারের উপর আক্রোশ—দু'য়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। বাঙালীর চোখে বাস্তবের ছোঁওয়া লাগতে তাই অনেক দিন লেগে গেছে। এসব বাহ্যিক দিক, তবু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির হদিসে তার অভিঘাত একদম উপেক্ষা করা চলে না।

AMARBOI.COM

৩

দ্বিজাতিতত্ত্বের নোঙরে বাঁধা পাকিস্তান রাষ্ট্র। তা থেকে এদিক ওদিক করা অমন ধর্মপীঠের সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে অবিশ্যি রাষ্ট্রনায়কেরা কিছু কিছু বেফাস কথা বলে ফেললে তা খণ্ডন করতে বেশী বিলম্ব করেনি। স্বয়ং জিন্না সাহেবের কথা ধরা যাক। শাসনতন্ত্র পরিষদে ঠিক দেশবিভাগের পরই তিনি ঘোষণা করলেন, যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না, সকলেই হবে পাকিস্তানী। কিন্তু যখনই রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্ন উঠল তিনিই হেঁকে উঠলেন, "উর্দু এবং একামত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" বিভিন্ন ভাষাকে স্বীকার করলে বিভিন্ন জাতির কথা স্বীকার করে নিতে হয়। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার তত্ত্ববিশারদ কীভাবে আর সে ফাঁদে ঢোকেন? কেউ কেউ অলঙ্কারের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে সব ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা পান। এক নেতা বলেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অঞ্চল দুই চোখের মত। কিন্তু তার মুখ তো আর দুটো হোতে পারে না। সুতরাং উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই দিকে কিন্তু ঠিকই রাস্তা ধরেছিল। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে তারা জানত, কোন রকমে যদি ভাষার দিক থেকে বাঙালীদের পঙ্গু করে দেওয়া যায়, তাদের মেরুদণ্ড ভাঙতে বেশী দেরী হবে না। সমাজজীবনে সংহতির এই হাতিয়ার ধরে তাই তারা প্রথমেই টানাটানি শুরু করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচ বছর ভাষার প্রশ্ন বাঙালীদের বেশ আলোড়িত করে তুলেছিল। তদানীন্তন সভাসমিতির রিপোর্টে পত্র-পত্রিকায় তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অবিশ্যি সব বাঙালীই একমত ছিলেন, এমন বলা যায় না। শাসকপুষ্ট দালালও ছিল প্রচুর। তবে মোদ্দা কথা, পাকিস্তানের মোহ তখনও সাধারণ মানুষের চোখ থেকে মুছে যায়নি। নিরপেক্ষ দর্শকের সংখ্যাও ছিল অনেক। কিন্তু ক্রমশ বাঙালী তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল। ভাষা আন্দোলন নিমিত্ত মাত্র। এই সময়ও দ্বিজাতিতত্ত্বের যতো রকম অর্বাচীন প্রয়োগ হোতে পারে শাসকশ্রেণী তা বেশ তাগিদের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রচারণা কালে বলা হোত, বাংলা কাফেরদের ভাষা। (যেন আরবী মুসলমানদের ভাষা ছিল ইসলাম প্রবর্তনার পূর্বে?) বাংলা সাহিত্যে প্রচুর দেবদেবীর উল্লেখ থাকার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাব ক্ষুণ্ন হয়। সুতরাং পরিত্যাজ্য। এবংবিধ অযৌক্তিক কোথাও কোথাও অশালীন মন্তব্যের চোটে একদা কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম ছিল। জনমত একদম উপেক্ষা করা চলে না। পাকিস্তান সরকার তখন আরো এক চাল চেলেছিল। বাংলাভাষা থাকুক, কিন্তু অক্ষর বদলে ফেলে আরবী অথবা রোমান করো। শুধু ঘোষণা নয়—এই বাবদ পশ্চাশ ষাট লাখ তখন খরচ করা হয়। উপরি উপরি এইসব হিতৈষণা আসলে জাতীয়তাবাদ খর্ব করার মতলব ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভবী অত সহজে ভোলে না। বাঙালী জনসাধারণ যখন সোচ্চার এগিয়ে এলো তখন শাসকগোষ্ঠী গুলি চালিয়ে একবার মোকাবিলা করে দেখে নিলে পর্যন্ত। মহান একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালী জাতীয় জীবনে এক বিশেষ স্মারকস্তম্ভ হোয়ে রইল। পিছু হটতে বাধ্য হোল শাসকগোষ্ঠী। বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করল। অবিশ্যি ঐ ঘোষণা পর্যন্তই। কারণ, আজও সরকারী কাজকর্ম ইংরেজিতে চালু আছে। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ডামাডোলের তলায় বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কথা চাপা পড়ে গেছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আইয়ুবী সামরিক স্বৈরতন্ত্র চালু হওয়ার পর সেই প্রশ্ন আর বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা বাংলাভাষাকে হত্যার নানা ফন্দীফিকির গ্রহণ করে। তা পাকিস্তানের জন্মাবধি অব্যাহত। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে যখন খারিজ করা গেল না, অন্য পাঁয়তারা শুরু হোল। পাঠ্য পুস্তকে প্রচুর আরবী-ফার্সী ঢোকাও। যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্র হাতের মুঠোয়, শিক্ষাবিভাগের কর্তারা তেমন হুকুম পালনে তৎপর রইলেন। এমন কি বানান পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হোল। নামাজ বর্গীয়-জ না অন্তস্থ-য হবে তা একদম বিধিবদ্ধ। পরীক্ষার্থীরা নাচার। পরীক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের জন্য এসব গলাধঃকরণে বাধ্য। কাজী নজরুলের নাম পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে অন্তস্থ-য দিয়ে লেখা হোতে লাগল। কারণ, বাংলাকে যতদূর সম্ভব আরবী-ফার্সী উচ্চারণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে ইসলামী জোস (তেজ) বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উদ্দীপিত হোলে দুই পাকিস্তান এক অঙ্গের মত নড়াচড়া করবে।

এমন জুলুম আদৌ ছোটখাট ব্যাপার নয়। বিভ্রান্তি মারফৎ একটা জাতিকে কি ভাবে মেরুদণ্ডহীন করা যায়, পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী সেই পথই নিয়েছিল। যখন তা আর সম্ভব হোল না, তখন মৃত্যুকামড় সহ নিজেদের বর্বরতা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করল। বাংলাদেশে বর্তমানে অনুষ্ঠিত গণহত্যা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা। তাই অত নির্দয়, তাই সভ্যতার মাপকাঠি বিবর্জিত।

কিন্তু শুধু জোরজবরদস্তি নয়, পাকিস্তান সরকারের আর এক সূক্ষ্ম চাল লক্ষণীয়। উপরে থেকে সংস্কৃতির মরুব্বী সেজে নিজের নখ-দন্ত কৌশলে চাপা রাখার চেষ্টা। রাইটার্স গিল্ড এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। সরকার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় মারফৎ সাহিত্যের বিকাশের নানা দিক প্রশস্ত করল। আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য, সব বিকাশের ধারা সরকারী কুক্ষিগত রাখা। অথবা যদি কোন বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়, সরকার যেন আগেই তার খবর পায় এবং সেই মত বিনষ্টি-নীতি প্রয়োগ করতে পারে। রাইটার্স গিল্ডের ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা সফলতা লাভ করে বৈকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেকেনি। কারণ, অধিকাংশ সময়ে দেখা গেছে, একটু প্রগতি-মনা পরিচালক যখন কর্ণধার, বহু লেখা সরকার-বিরোধী, যথারীতি প্রচারিত হোয়েছে। অথচ সরকার কিছু উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায়নি, পাছে রাইটার্স গিল্ড ভেঙে যায় এবং সরকারী দূরভিসন্ধি প্রকাশ পায়। অনেক সরকার বিরোধী বই পর্যন্ত পুরস্কৃত হোয়ে যাওয়ার পর টনক নড়েছে। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমের ফারাকের জের স্পষ্ট ছিল। সরকার গড়ে রাইটার্স গিল্ডের পেছনে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা খরচ করত। পূর্ব পাকিস্তানে হিস্যায় কখনও চল্লিশ হাজারও আসত না। তাছাড়া, হেড অফিস করাচীতে অবস্থিত। ফলে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের সুযোগ পশ্চিমেই। পূর্ববঙ্গ স্বভাবতই বঞ্চিত হোত। ম্যালেরিয়া হয় বাংলাদেশে। কিন্তু ম্যালেরিয়া গবেষণাকেন্দ্র রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত। এই নমুনা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীদের মনোবৃত্তি যাচাই করা যায়।

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ব্যুরো অফ-ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (সংক্ষেপে বিয়েনার) ঠিক ঐ কিসিমের আর এক প্রতিষ্ঠান; অবিশ্যি কর্মক্ষেত্রে আরো প্রসারিত এবং উদ্দেশ্য আরো মারাত্মক। এই সংগঠন মারফৎ সরকার বুদ্ধিজীবীদের মানসিক প্রবণতার উপর লক্ষ্য রাখত। এখানেও উৎকোচের ব্যবস্থা ছিল মজার। দুঃস্থ লেখকদের পাণ্ডুলিপি বাজার দূরের চেয়ে ঢের বেশী চড়া মূল্যে কিনে নাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে, লেখক প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রথমে কৃতজ্ঞ এবং পরে মুখাপেক্ষী, এমন কী সমর্থক সেজে বসে থাকতে বাধ্য। এইভাবে বহু তরুণ লেখক মগজ বিকিয়ে দিয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠিত লেখক মাথা চাড়া না মারে, তারও ব্যবস্থা রাখো। সংবাদপত্র-সেবীদের মুখ বন্ধ করে রাখার বন্দোবস্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠান মারফৎ। বহু চরিত্রহীন ব্যক্তি এইভাবে গোপনে বিয়েনারের সমর্থক হোয়ে পড়ত অথবা তার সমাজ-বিরোধী কাজের ক্ষেত্রে চুপচাপ থাকত। নগদ নারায়ণ অবিশ্যি আভ্যন্তরীণ যোগসেতু। দেখা গেছে, বহু অনভিজ্ঞ তরুণ পরিচালকের স্রেফ খেয়ালখুশীর উপর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হোয়ে পড়েছে। সাধারণ সরকারী অডিট ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য নয়। এখন ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার। বিয়েনারের পরিচালকই সামরিক জান্টা-কর্তৃক প্রবর্তমান শিক্ষা-কমিশনের সদস্য সচিব। অবিশ্যি ঐ ভদ্রলোক আইয়ুব খানের আমল থেকেই বহালতবিয়ৎ ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ, বিয়েনারকে এক কথায় বলা যায়, সরকারের সাংস্কৃতিক গোয়েন্দা বিভাগ। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চেয়ে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আরো জটিল। আবেগের বেসাতি সরকার বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রথম থেকে চালু রেখেছিল।

হিন্দুস্থানীরা ঠিকই বলে, "দুম্ মে থেড়া কসুর রহ্ গয়া" অর্থাৎ লেজের দিকে কিছু খুঁৎ রয়ে গেছে বা কিছুটা খাটো। সরকারী অর্থব্যয়ে বাংলাদেশী সংস্কৃতি-নাশকতায় যে কতো ব্যয় হয়েছে তার পরিমাপ দেওয়া আজ সম্ভব নয়। শুধু বিয়েনারের বাজেট বছরে তেত্রিশ লক্ষ টাকা। দরিদ্র দেশে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় সম্ভব হোত, কারণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্বৈরতন্ত্রেই এজাতীয় ব্যাপার ঘটে। কিন্তু এত নাগপাশও বাঙালী জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারেনি। কারণ, পরিবেশ-গত দুর্দশার প্রতিকার—আসল জায়গা থেকে, সরকার সব সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই লাখ লাখ টাকার শ্রাদ্ধ কিছু সাময়িক বিভ্রান্তি হয়ত সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আসল লক্ষ্য থেকে বাঙালীদের দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি। সরকারী নীতির পাশাপাশি প্রথমে ঝিরিঝিরি, পরে স্রোতের আকারেই জাতীয়তাবাদের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে লাগল। জাতীয়তার বিকাশের প্রথম যুগে মানুষ সুদূর অতীত থেকে প্রেরণা প্রয়াসী হোয়ে ওঠে। দেখা গেল, জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' ফিল্মের বক্স-মূল্য আশাতীত। মনে রাখা দরকার, চাঁদসদাগর-বেহুলা কাহিনী এই বাংলাদেশের নদীমাতৃক দেশের প্রতিচ্ছায়া হোয়ে ওঠে। তাই ভেলায় ভেসে চলে বেহুলা সুন্দরী। বাঙালী মনের কাছে এর আবেদন সম্প্রদায়ের গণ্ডীভুক্ত নয়। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলেই অতীতের এই কাহিনীর মধ্যে নিজেদের স্বরূপ খুঁজে পায়। তাছাড়া নিছক মানবিক দিক থেকেও কাহিনী বিশেষভাবে চিত্তপ্লাবী। তাই ফিল্মের জগতে অমন প্রতিষ্ঠিত হোয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকারের অবিশ্যি এসব জানার কথা নয়। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোকুলে এইভাবেই হত্যাকারীর বয়স বাড়ে। এক কথায় বাঙালীর মনে নিজের স্বাজাত্যে ফুটতে লাগল। তাছাড়া নিজের অস্তিত্ব জীয়োনো কঠিন। তাই পদ্মপুরাণের কাহিনী মুসলমান পরিচালক এবং দর্শকদের ঐভাবে আকর্ষণ করে। পয়লা-বৈশাখের উৎসবের ক্রমোত্তর জাঁকজমক ঘটা এবং অজস্র দর্শক-সংখ্যার বৃদ্ধির দিকে যাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন, তাঁদের কাছে আর বিশদ বলার কিছু প্রয়োজন নেই। বৎসরের প্রথম দিন বাঙালী মুসলমান তার নিজের করে নিলে। কুখ্যাত মোনেম খাঁর শাসনও আর সেদিকে জোরজবরদস্তি খাটাতে সাহস পায়নি। একদিন বাংলাদেশে গাড়ির নম্বর পর্যন্ত বাংলা হোয়ে গেল। স্বৈরতন্ত্র এখানেও চুপ রইল। কারণ, তাদের জানা ছিল, বাধা দিলে তা টিকবে না। নতুন পল্লীর নামকরণ একই খাতে বইতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সরকার নিজস্ব ইমারৎ এবং পল্লীর নাম রাখলে আরবী বা ফার্সী যথা, গুলফেশান, কাহকেশান ইত্যাদি। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর নাম বদলাতে লাগল। এই সরকার প্রজাদের ভাষা বোঝে না। তাই বোধ হয়, প্রবণতা লক্ষ্য করেনি। তেমন ঘটলে বাধা বৃষ্টি হোত। অবিশ্যি বাধা টিকত কিনা সন্দেহ। এবার সরকারী ইমারতের নাম শুনুন : সাগরিকা, অরুণিমা, নীহারিকা আর নতুন পল্লী একদম বাঙালী মনের প্রতিধ্বনি : বারিধারা, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি। এইসব প্রবণতার দিকে বাঙালীদের ঠেলে দেওয়ার মূলে ছিল, সরকারী দূরদৃষ্টির অভাব। অবিশ্যি রাষ্ট্রের বনিয়াদের গোড়ায় ডিনামাইট স্থাপন তাদের পক্ষে অসম্ভব। বহু জাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তান, একথা মনে নিলে আর পাকিস্তান থাকে না অথবা তার রূপ অসাম্প্রদায়িক হোতে বাধ্য। শাসকদের পক্ষে এমন 'হারাকিরি' অসম্ভব। মিথ্যের আওতায় শোষণের সাপ নির্বিবাদে বাস করে। পাকিস্তানী শাসকসম্প্রদায়ের চেয়ে ভালভাবে কে আর তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে? আজও সেই জিগীর অব্যাহত আছে : ইসলাম, অখণ্ড পাকিস্তান, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি।

তাই বাঙালী মুসলমান ক্রমশঃই স্বাজাত্যবোধের দিকে ঝুঁকতে লাগল। রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার এদিকে কিছু আলোকপাতে সক্ষম। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ অর্থ বাংলা সাহিত্য—একথা বললে কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। ঐক্যের প্রবণতা সাহিত্যে সংগীতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে পড়া বিচিত্র নয়। শাসকশ্রেণী প্রমাদ গণল প্রথম থেকেই। সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথকে নাকচ করা যায় না। সুতরাং ভারত-বিদ্বেষ তথা পশ্চিম বঙ্গ বিদ্বেষের আড়ালে ঘোষণা করা হোল : পাকিস্তানী সাহিত্যের আলাদা স্বাতন্ত্র্য আছে। এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিই সত্যিকার সাহিত্যিকের জাতীয় কর্তব্য। এখানেও ইসলামের মত কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা নির্দেশ থাকে না—কী স্বরূপে পাকিস্তানী সাহিত্যিককে চেনা যাবে? অর্থাৎ ধূয়া যত ধোঁয়াটে করে রাখা যায়, ততই প্রতিপক্ষের উপর জুলুম সহজ হয়। পাকিস্তানের শুরু থেকেই ভারত-বিদ্বেষ আর সরকার ছাড়তে পারেনি। আইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারফৎ পশ্চিম বঙ্গ থেকে বই, রেকর্ড (বিশেষত রবীন্দ্রনাথ) বন্ধ করে দেওয়া হোলো। তখন ইংলন্ড, আমেরিকা ঘুরে বই বা রেকর্ড আসতে লাগল। এবার আইন মোক্ষম : যে-কোন দেশ থেকেই হোক ভারতীয় বই ও রেকর্ড আমদানি নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক আইন-অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে এক ডজন রেকর্ড সঙ্গে আনা যায়। পাকিস্তান সরকার তা-ও ভঙ্গ করলে। পশ্চিম বঙ্গে বা ভারতে ছাপা বইয়ের পুনর্মুদ্রণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হোল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা প্রযোজ্য নয়। সেদিকে ব্যবসা অব্যাহত রইল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পশ্চিম বঙ্গেই লিখিত। পাঠ্য বই ছাড়া ছাত্রদের কীভাবে চলবে, পাক-সরকার এতটুকু ভেবে দেখেনি। সাহিত্য জাতীয়তার উৎস। তার রসসিঞ্চন-পথ যত দিকে আছে বন্ধ করো। কিন্তু লেজের দিকে খুঁৎ রয়ে গেল। জাতীয় প্রবণতা এই চাপের মুখে আরো জোরদার হোল, ভেতরে এবং বাইরে। শামসুর রাহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আল্‌মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান এবং শহীদ কাদ্‌রীর উনিশ শ' পঁয়ষট্টি-উত্তর কবিতা পড়লে দেখা যায়, ফল্গুধারা ক্রমশ ঘূর্ণীমুখর এবং দারুণ মানসিক লাভা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিভাবে গেঁজে উঠছে নিষ্কাশন-পথের সন্ধানে। গণতান্ত্রিক ভিত্তি না থাকার ফলে দেখা যায়, মাত্র কুড়ি পঁচিশটা লোক পাকিস্তানের বারো কোটি লোকের ভাগ্য-নিয়ন্তা হোয়ে বসেছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষা সাধনা করুণা-উদ্রেকের ব্যাপার। জিন্নাহ তবু ছিল ম্যাট্রিকুলেট, অবিশ্যি ব্যারিস্টার। খাজা শাহাবউদ্দীনের মত এক-চোখা (একটি চোখ সত্যি খারাপ) নন-ম্যাট্রিকুলেট পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে কম ভূমিকা পালন করেনি। অবিশ্যি এমন মূর্খের দল অনেক সময় জনসাধারণের চক্ষু-উন্মীলনের বড় সাহায্য দেয়। সূক্ষ্ম চাল তাদের অজ্ঞাত। তাই হঠাৎই খাজা সাহেব রবীন্দ্রসংগীত রেডিও পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে। তার প্রতিবাদে তুমুল ঝড় উঠল। শাসকগোষ্ঠী শেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন হেয় হয় যে, পাকিস্তানী দূতাবাসগুলো পর্যন্ত সরকারকে অমন কাজ থেকে নিরস্ত হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়।

পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ রাষ্ট্রীয় কারণে যতটুকু, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বানচাল বা বিকৃত করার জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশী। পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গের যোগসূত্র শাসকদের আরো হন্যে করে তুলেছিল। কিন্তু প্রবণতার ঐক্য অত সহজে ধ্বংস করা যায় না। কীর্তন গানের আবেদন একজন পাঞ্জাবীর কাছে কতটুকু? বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের তা বাঁচার সম্পদ। কেবল ধর্মের দোহাই মেরে যদি মানুষের ঐতিহ্য ধ্বংস করা যেত তা হোলে খোদ মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশে এত জাতির স্বাতন্ত্র্য থাকত না। আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনগুলোর পুরোপুরি ফল কিছু সাময়িক বিভ্রান্তি মাত্র। তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে সিদ্ধি হয় না, তার প্রমাণ মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্বিরোধ। রাজতন্ত্রী ইরানের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী ইরাকের কী হৃদ্যতা থাকবে? এক সুদানের মধ্যে কাফ্রি এবং আরবী মুসলমানদের কলহ অত সহজে মিটল কই? বহু বছর আরবী মুসলমানেরা, ইসলামের স্বর্ণযুগে বিশেষত কাফ্রিদের গোলামের বেশী মর্যাদা দেয়নি। ইতিহাসের জের এত সহজে কাটে কি? মনের বিরুদ্ধে লড়াই যারা অহরহ চালিয়ে যেতে চায়, তাদের ইতিহাস-জ্ঞান আদৌ থাকে না। পাকিস্তান সরকার তার প্রকৃষ্ট নজীর।

বাংলাদেশের ভূমিষ্টি-আগার তো তাদের সকল নাশকতামূলক কার্যের প্রতিবাদ। সাম্প্রদায়িকতার জিগীরের পেছনে এত অর্থ ব্যয় এত উদ্যোগের অপচয়, কিন্তু একুন ফল ঠিক বিপরীত। হেগেলীয় নিগেশন অফ নিগেশনের (নেতির নেতি) জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র। সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর জন্ম, কিন্তু উত্তরকালে অতি জোরদার অসাম্প্রদায়িকতার বুনিয়াদ সেখানেই প্রতিষ্ঠিত।

পরিবেশ-অনুযায়ী এই ইতিহাসে পরিণতি অবধারিত ছিল। *

* রচনাকাল : কলকাতা আগষ্ট, ১৯৭১

AMARBOI.COM

সাক্ষী নীরবতা

"Patroclus dead, Achiles hates to live"

ব্যক্তি অনন্ত নয়, কিন্তু আবার শূন্য-ও নয়। মানসিক বিকাশের জন্যে যতটুকু সে পরিবেশকে অনুকূল করে গড়ে নিতে পারে ততটুকুই তার মহত্ত্ব। এই কর্তব্যের মধ্যেই আবার তার সীমাবদ্ধতা নিহিত। পরিবেশকে মানুষ যতখানি পোষ মানায়, পরিবেশের শাসনও তা-কে ততখানি মানতে হয়। দ্য ভিঞ্চির ভাষায় আনুগত্য ও রাজগী একই সঙ্গে চলে। মহত্ত্বের প্রতিভা অনেক সময় আবেষ্টনীর প্রাচীরে মাথা কুটে শেষ হয়ে যায়, যেহেতু পূর্বোক্ত পোষ মানানোর কায়দা জনা সত্ত্বেও স্থানকালবিধৃত পরিবেশ তার অনুকূলে থাকে না।

দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য যাই হোক, মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী নিজের গণ্ডীসীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে ছিলেন। পরিবেশের জুলুম সম্পর্কে তাঁর সচেতন মন তাই মাঝে মাঝে কবিতা কিংবা গান রচনার মধ্যে এক রকমের শান্তি খুঁজত—যদিও আসলে তিনি চিন্তা-নায়ক, গদ্য-লেখক। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বন্ধু মহলে 'কবি সাহেব' নামেই পরিচিত ছিলেন।

বিংশ শতকের প্রথমাংশে চৌধুরী সাহেবের জন্ম। এই সময় বাঙালী মুসলমান ধীরে ধীরে বিশ্বের রঙ্গ-মঞ্চে পা বাড়াচ্ছে, অবিশ্যি সূত্রপাত স্যার সৈয়দের আমল থেকে। মোতাহার হোসেন সাহেবের কৈশোর কেটেছিল লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ছায়ায়। সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ সেদিন বহু প্যাক্টের প্রেরণা যুগিয়েছিল। তা নিছক রাজনীতির কথা। সমাজ জীবনেও কম আলোড়ন দেখা দেয়নি। দ্বিতীয় দশকে রচিত মৌলানা আকরম খাঁর 'সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থ তো নব্য মুসলমানদের পাশপোর্ট হয়ে দাঁড়ায়। নব্য মুসলমান ইন্ডাষ্ট্রি গড়বে ব্যাঙ্ক চালাবে, অতএব হারামী সুদের হালালীকরণ প্রয়োজন। সমাধান পাওয়া গেল। নব্য মুসলমান গান গাইবে, তারও অনুমোদন পাওয়া গেল। শুধু পাওয়া গেল নয়, একজন মৌলানার জবান থেকে পাওয়া গেল। একমাত্র আধুনিক জগতের অন্যতম পানীয় শরাব ছাড়া ঐ পুস্তকে নতুন জগতে ঢোকার পাক্কা বন্দোবস্ত ছিল। সেই জন্যে আগেই বলেছি পাশপোর্ট। মধ্যযুগে 'মোল্লা' শব্দ পাণ্ডিত্য এবং শ্রদ্ধার প্রতীক বললেই চলে। ইরানের শাহানশারা মোল্লা নস্‌রুদ্দীনের নামে পাগড়ী খুলে ফেলতেন। সেই শব্দের কি বেইজ্জতি না ঘটতে লাগল এই নব্য মুসলমানদের কাছে। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার ফলে, নয়া মুসলমানেরা এমন সব অঘটন ঘটাতে লাগল। ১৯২৬ সনে কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার আরবী ও ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা যখন পরস্পরে দাঙ্গা লড়ে, তা ইতিহাসেরই খেলা। হষ্টেলের ছেলে রোজার দিনে 'ফুডচার্জ' দিয়েও কেন খাবার পাবে না—তার জন্যে কোর্টের শরণাপন্ন হয়, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য গুরুত্বপূর্ণ।

মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী এমন ডামাডোল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কৈশোর ও যৌবন কাটিয়েছিলেন, তাই হিসাব দরকার হয় চৌধুরী সাহেবের চরিত্র নিরূপণে। তিরিশ বছর আগেকার মাসিক 'মোহাম্মদী' 'সওগাত' পত্রিকা ত সমাজতত্ত্ববিদের কাছে অমূল্য দলীল সেই যুগকে বুঝবার জন্যে। "পর্দা অথবা বেপর্দা"—এই প্রশ্ন আজ, এত অবান্তর ঠেকতে পারে, কিন্তু সেদিন এই সমস্যা রীতিমত আলোড়নের ব্যাপার। তখন যুক্তির চেয়ে হাতিয়ার ছিল প্রধানত আবেগ। ঠিক যুক্তি ও বুদ্ধিগত ভিত্তির উপর লড়াই শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী : মরহুম আবুদল হোসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ, কবি আবদুল কাদির, আবুল ফজল প্রমুখ। এঁদের মুখপত্র 'শিখা'। এঁরা শিখাগোষ্ঠী নামে অভিহিত হতেন। মোতাহার চৌধুরী এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি কবি হিসেবেই পরিচিত। এই সময় ছিল তাঁর মানস গঠনের যুগ। তাঁর অমূল্য প্রবন্ধরাজি আরো সাধনাপুষ্ট মনের ফসল। এই গোষ্ঠীর শ্লোগান ছিল : 'চিন্তা যেখানে সীমাবদ্ধ, জ্ঞান যেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দা, বেকার সমস্যা, সমাজ-জীবনে হতাশা, রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিশ্চয়তা প্রভৃতি কারণে স্বল্পায়ু শিখা আর দাবানলের সঙ্গ পায়নি। স্বল্পায়ু, তবু এই আন্দোলনের মূল্য সমাজ জীবনের ইতিহাসে অপরিসীম। কারণ, তারপর আর বেগবান চিন্তা-আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি। বরং শুরু হোলো অন্ধ আবেগের যুগ। বুক দিয়ে হাঁটে সরীসৃপ—সমাজে তেমন সরীসৃপের আমদানী হোলো, যারা চিন্তা ও বুদ্ধির উপর খড়গহস্ত যার রাজনৈতিক মুখোস মুসলিম লীগ। রাজনৈতিক সততা বজায় রাখতে শুরু হোলে ইন্টেলেকচুয়াল মুনাফেকি বা অসততা।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী কিন্তু 'শিখা' গোষ্ঠীর অনির্বাণ দীপ। সমাজ জীবনের গতি হয়তো কখন ঢিমা কখন দ্রুত, কিন্তু ছন্দ ঠিকই থাকে। মোতাহার হোসেন সেই অন্ধকার যুগেও নিজের ঘাঁটি থেকে পশ্চাদপসরণ করেননি। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কথা'য় তার প্রচুর প্রমাণ আছে। অবিশ্যি সে-যুগের দু-একজন এখনও আছেন, যাঁরা নেহায়েৎ পুরাতন অভ্যাসের গুণে রোমন্থন-রত। কিন্তু যুগের গতির সাথে চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন কিছু পরিবেশন করতে অপরাগ। মোতাহার হোসেন সাহেব ঐতিহ্যের প্রবহমানতাকে স্বীকার করতেন, নিজে তাই ঐতিহ্যের সড়ক থেকে বিচ্যুত হননি। "হেথা নয় অন্য কোনখানে"—সজীবতার মূলমন্ত্র তিনি কান পেতেই শুনেছিলেন।

য়ুরোপের যুক্তিবাদীরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। শুধু যুক্তির সাহায্যে পরিবেশকে বোঝা চলে না, যেহেতু পরিবেশ গতি মুখর। তাই পরবর্তী যুগে থিয়োরি ও প্র্যাকটিসের সমন্বয় যোগ করা হয়। মোতাহার হোসেন সাহেবও ১৯৪১/৪২ সনের পর নিছক যুক্তিবাদে আস্থা হারান কিন্তু বয়সের অজুহাতে বড় দুঃখ পেতেন। শেষ সাত আট বছর, রোলাঁর মতই বিশ্বচারী মন, রোলাঁর "আই উইল নট রেষ্ট" গ্রন্থখানা তাঁর সঙ্গে থাকত। হেসে বলতেন, "এটা আমার বাইবেল। . . . . . রবীন্দ্রনাথ মহৎ কিন্তু বড় স্নিগ্ধ। রোলাঁর মধ্যে জ্বালা আছে, অবিশ্যি মহত্ত্ব খর্ব করা জ্বালা নয়।... রবীন্দ্রনাথে কেন এমন জ্বালা থাকল না? ঐশী অগ্নিতে জ্বলাই মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনা।" অবিশ্যি কবি সাহেব নিজেও কম জ্বলেননি। সামাজিক হৃদয়হীনতা তাঁকে অস্থির করে তুলত। কলকাতা জাকারিয়া স্ট্রীটে বিশিষ্ট দোকানে চপ খেয়ে বেরিয়ে আসার সময় একদল নোংরা রুগ্ন ভিখিরী তাঁকে ছেঁকে ধরে। রাস্তার উপরই তিনি বমি করে ফেললেন। দাওয়াৎ দিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম বলে, আমাদের ক্ষমা করেননি অন্তত এক সপ্তাহ। আর ব্যক্তিগত জীবনে? পাগল স্ত্রীর জন্য বারো বছর অপেক্ষা করেছেন, আর বিয়ে করেননি, যদি ভাল হয়ে উঠেন—কাহিনী আমাদের জানা আছে। কিন্তু এমন একনিষ্ঠ হৃদয়ের সাক্ষাৎ কোথায় বা বেশী পাওয়া যায়? স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁর শোকবিধুর মূর্তি যারা দেখেছে তারা জানে সেই প্রাণের মহিমা। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছেন, "আমি কি তা-কে শুধু পাগল মনে করতাম?" সামাজিক শ্রেয়বোধ যখন নিম্নপর্যায়ে, আর আবেগের দেউলেপনাকে যখন প্রতিদিন সস্তা মৌজ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জৌলুষপরায়ণ করে তুলতে হয়—তখন লোকান্তরিত মোতাহার হোসেনকে স্মরণ করব বৈকি?

য়ুরোপে হিউম্যানিজমের বিবর্তন পরিবর্তন ঘটে। নিষ্ক্রিয় মানবতাবাদকে তিনি দুঃখবিল্যাস মনে করতেন। শরীর ও বয়স তাঁকে কাজে বাধা দিয়েছে, নচেৎ তাঁর মন কখনও কাফেলা থেকে দূরে থাকেনি। বিগত ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভে চাঁটগাঁয় যে প্রচার পুস্তিকা বিলি করা হয়, তার সমস্ত মুসাবিদা চৌধুরী সাহেবের। সরকারী কর্মচারী, আজ তাঁর নাম সমস্ত ভ্রূকুটির ঊর্ধ্বে চলে গেছে, তাই উল্লেখ করলাম। মানুষের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। অনেকেই জানেন না, নজরুলের কুমিল্লা প্রবাসের সময় যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে মোতাহার সাহেব ছিলেন প্রধান দোসর। সৌন্দর্য্যপিপাসু, শালীনতা লোভী রবীন্দ্রঐতিহ্যের অনুসারী মেজাজ ত মানুষকে পরিত্যাগ করতে পারে না। দেশ পাটিশনের পর তিনি চাটগাঁয় বদলী হন। দেখলাম ইন্টারক্লাসের রাহা খরচ বা টি, এ, বিল তুলছেন। বললাম, আপনি তো সেকেন্ড ক্লাস পেতে পারেন। হেসে জবাব দিলেন আমি ইন্টার ক্লাস-এ এসেছি।" আরো কয়েকজন চেনাশোনা বন্ধু মানুষ আসছিল চাটগাঁ ইন্টারক্লাসে। সুতরাং মানুষের বন্ধু মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেননি। আর ইন্টার ক্লাসে সফর করে সেকেন্ড ক্লাসের বিল তা আর যে-হোক মোতাহার হোসেনের পক্ষে সম্ভব নয়।

হাজার কুৎসিত পরিবেশেও নিজের মহত্ত্ব গৌরবকে তিনি ম্লান হতে দিতেন না। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের খুব প্রশংসা করতেন। কিন্তু কোনদিন ঈষৎতম নোংরা কথা মুখ দিয়ে বেরোত না। তদানীন্তন এক গোলাম-নামধারী লাট সাহেব সবেমাত্র স্বর্গীয় হোয়েছেন, বেতার মারফত খবর এসেছে। এক বাড়ীতে তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। এখানে প্রায় সকলেই লাট সাহবেকে ঘেন্না করত কাজেই চিরাচরিত আবহাওয়া : মরেছে ত, কি হয়েছে? মোতাহার সাহেব বেশ চুপচাপ। তখন সকলে মৃত লোকটাকে ছেড়ে জ্যান্ত চৌধুরীকে ঘিরে ধরলেন, "আপনার কি মত?"

তিনি ম্লান কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আফটার অল্ এ ম্যান ইজ ডেড।"

উপন্যাসের পরিচয়

ইউরোপ উপন্যাসের আঁতুর ঘর।

বর্তমান বৈশ্য-সভ্যতার সূত্রপাত সাথে এই অভিনব আর্ট-ফর্ম বা শিল্পরীতির আবির্ভাব। তার উত্থান-পতনের সমান্তরাল উপন্যাস-ও বিচিত্র রূপ নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও মহাকাব্যের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার সহ মানুষের অন্তর্জগতের চিত্র উদঘাটনে নিযুক্ত; কোথাও গীতি-কবিতার রূপে, কোথাও সামাজিক পটভূমির ফ্রেমে জীবন-লীলার বৈচিত্র্য গাথায় ভরপুর, কোথাও অবচেতন মনোরাজ্যের গহনে প্রবিষ্ট। দুই প্রত্যন্তিক সীমানার মধ্যে নানা কাঠামো আর রঙে উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে। উপন্যাস শুধু কাহিনী নয়, কাহিনীর মাধ্যমে আরো জীবন-ব্যঞ্জনা। গোটা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে দেখার এই শিল্পরীতি বণিক-সভ্যতার অন্যতম অমর অবদান। অন্তরের গুপ্ত ও সুপ্ত জগতকে এমনভাবে প্রকাশ্যমান করার সামর্থ্য অন্য শিল্পী-রীতির মাধ্যমে কোনদিন সম্ভব হয়নি। এড্‌মন্ড উইলসন ফিল্ডিং-রচিত "টম, জোন্সের" ভূমিকার প্রতিধ্বনি করে তাই ঠিক-ই বলেছেন, উপন্যাস আধুনিক যুগের এপিক। মধ্যযুগের শিল্পরীতির বিশিষ্ট দান মহাকাব্যে সমাজ ও মানুষের প্রতিফলন অনেকখানি দেখা সম্ভব ছিল। কিন্তু উপন্যাসের ব্যক্তিস্বরূপ ঢের বেশী গভীর ও ব্যাপক।

সামাজিক তাগিদেই শিল্পরীতির পরিবর্তন ঘটে। অহর্নিশ পরিবর্তনশীল বস্তু-বিশ্বে তা স্থির থাকতে পারে না। রুচিবদলের হদিস এখানে পাওয়া যায়। নচেৎ বিদ্যাপতি কি শেক্সপীয়ারের পর আর রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন থাকত না। যুগ তার গতির তাগিদেই নব শিল্প সৃষ্টির দাবী জানায়।

ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানের পর নতুন বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। ব্যবসা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ সফর—ফলে বিভিন্ন জায়গা ও তার নর-নারীর প্রতি কৌতূহল-জাগা স্বাভাবিক। সাথে সাথে আসে কাহিনী। ভ্রাম্যমাণ সওদাগর শ্রেণীই উপন্যাসের বীজ বপন করে। উক্ত শ্রেণীর জাঁক-বৃদ্ধির সঙ্গে এই শিল্পরীতির শৈশবত্ব ঘুচতে থাকে। মহাকাব্যে সামাজিক পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তি সেখানে অনেকখানি গৌণ। উপন্যাসে ব্যক্তি তেমন নয়, বরং শাল-প্রাংশু নায়ক। সার্ভান্টিজ বণিক শ্রেণীর প্রথম সফল উপন্যাসিক-নকীব।। 'ডন কুইক সোট' সমস্ত মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণীর কেয়ামত-কাহিনী। সওদাগর-শ্রেণী তখন আপন পরিবেশের নিয়ন্তা। জমি-নির্ভর সামন্ত প্রভুরা ক্রমশ হটে যাচ্ছে। তাই মানুষ—ব্যক্তি-মানুষ এমন শিরোপা পায় উপন্যাসে। বণিক শ্রেণির সম্মুখে অনন্ত জগত ও কর্মচাঞ্চল্য। খ্রীষ্টোফার মার্লোর ভাষায়—

Perform what desperate enterprise I will?
I will have them fly to India for gold,
Ransack the oceans for oriental pearl,
And search for all corner of the new-found world,
For pleasant fruits and princely delicates.

অন্যত্র

Make men to live eternally
Or, being dead, raise them to life again.

মার্লোর ডাঃ ফাউষ্টের এই সদম্ভ উক্তি বণিক শ্রেণীর মানসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিধ্বনি—মৃত্যুর নিকট পরাজয় স্বীকারে পর্য্যন্ত যার অশেষ কুণ্ঠা। জাগ্রত শ্রেণী এমনই পরিবেশের নিপীড়ন অগ্রাহ্য করে। উপন্যাসের ব্যক্তি তাই সংগ্রামশীল, সে প্রাণ-বীর বা হিরো। পরিবেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অভিযান-ই ত উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বণিক শ্রেণীর সম্মুখে তখন অনন্ত সম্ভাবনার ইশারা। নতুন শিল্পরীতিরও আবির্ভাব ঘটে। চিত্রকলায় পারস্‌পেক্টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার এক সময়ের কাহিনী। বণিক শ্রেণী কর্ম্মচাঞ্চল্যের ঝড়ে শতধা ফেটে পড়ার স্বপ্নও দেখেছিল সেদিন।

মহাকাব্যের নায়কের কাছে সমাজ তার বৈরী নয়। সে আবার প্রকৃতির দাস বা প্রভুও নয়। কিন্তু বণিক শ্রেণী প্রকৃতির প্রভু হোয়ে উঠছে। অন্য পক্ষে সমাজের সঙ্গে তার ভারসাম্য ঘুচে যাচ্ছে। যেখানে মানুষ ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য অন্তর্হিত, মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মত্ত—সেখানেই উপন্যাসের জন্ম। সার্ভান্টিনজ তাই চক্ষু বুজে নব্য সভ্যতাকে গ্রহণ করেননি।

বণিক-শ্রেণীর উত্থান-পতনের সমান্তরাল উপন্যাসের কাঠামো, বিষয়-বস্তু বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ইংলন্ডে স্যামুয়েল পেপির স্মারকলিপি থেকে হার্ডি, জেমস্ জয়েস পর্যন্ত কত না রূপান্তর। সুদীর্ঘ চারশ বছর। উপন্যাসের যাত্রা-কাহিনী তেমন-ই সুদীর্ঘ। বর্তমান শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সওদাগর-জাদাগণের বংশধর। কত না রূপান্তর। আঠার উনিশ শতকে শ্বেতাঙ্গ জল-দস্যুদের উপনিবেশ লুণ্ঠনের প্রয়োজন হয়। উপন্যাসের নতুন রূপ দেখা যায় তখন। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী—যার কাব্যিক পুরোধা কিপলিং। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রগতিশীলতাও জড়িয়ে ছিল। তখন কনান ডয়েলের মত সার্থক শিল্পীরও আবির্ভাব ঘটে এই ক্ষেত্রে। আজ ফিকে হোয়ে গেছে সেই কাহিনী—তার রচয়িতা ভ্যান ডাইন-ই হন বা ডরোথি সেয়ারই হন। ডিটেকটিভ উপন্যাস এখনও জীবিত, কারণ সাম্রাজ্যবাদ জীবিত; আফ্রিকা উগান্ডা ইন্দোচীন, মরোক্কো তিউনিসে যার শ্বাপদ বর্বর নখদন্তের ধ্বংস-লীলা আজও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

বৈশ্য-সভ্যতা মানুষে মানুষে নানা বিরোধিতার জন্মদাতা। সমাধানের পথ অনেকের জানা থাকে না, যদিও বহু উপন্যাসিক বর্ত্তমানকে মেনে নিতে পারেননি। এমন ক্ষেত্রে রহস্যবাদী, মিষ্টিক কাল্পনিক ধোঁয়ায় আপাতত বুঁদ হোয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। টমাস হার্ডি বণিক সভ্যতার শেষ মহৎ উপন্যাসিক। লন্ডন-কারখানার আর্তনাদ ওয়েসেক্স পল্লী এলাকার নরনারীর সহজ সম্বন্ধ ও হৃদয়-বৃত্তির উপর অনুসরণ তুলেছিল। সংবেদন-মর্মী শিল্পী তা সহ্য করতে পারেননি। কিন্তু হার্ডির মতে মানুষ শেষ পর্যন্ত অমোঘ প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নক মাত্র। 'মেয়র অব ক্যাষ্টরব্রিজ' রচনা সমাপ্তির দু দিন পরে ডায়েরীতে তিনি লিখছেন—

"The business of the poet and novelist is to show the sorriest

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

underlying the grandest thing, and the grandeur underlying the sorriest thing."

গ্রীক-ট্র্যাজেডিয়ানদের মত বিশ্ব-উজাড় দৃষ্টি-সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দুঃখবাদে এক মহৎ সাহিত্য-সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। সার্ভান্টিজ, ফিল্ডিং, ডিফোর পাশাপাশি হার্ডির চরিত্র কত রুগ্ন। বণিকসভ্যতার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস থেকে হিরো বা প্রাণ-বীর অন্তর্হিত। তিনশ' বছরে এই সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ, পরিবেশের দাস মাত্র—আর সৃষ্টিশীল নয়। বণিক-সভ্যতার চাপে মানুষ দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত উপন্যাসে তাই আর প্রাণ বীরের প্রয়োজন কোথায়? ডাঃ ফাউষ্টকে ষোড়শ-শতকে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রতীক সেনানী মনে করা হোতো প্রকৃতিকে সে পোষ-মানানোর সাহস ও বীর্য্য রাখে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে মহাকবি গ্যেটের কাছে সেই ফাউষ্ট অজানার প্রতি তৃষ্ণা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সমাধান-হীন বিরোদের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—রোমান্টিসিজমের বনিয়াদ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আরো দুর্দ্দশা। উপন্যাসের প্লট, যেমন ইমারতের বনিয়াদ। বৈশ্য সভ্যতার ধ্বংসোন্মুখ নড়বড়ে ভিত, প্লটকে অস্বীকার করা পর্য্যন্ত ফ্যাসনে এসে পৌঁছল। এমন এক স্কুলই গড়ে উঠল প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ডে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাস : টু দি লাইট হাউস। একটি পরিবার রোজ মনে করত, তারা দূর বাতি-ঘরে যাবে, একদিন সত্যিই তারা গেল। এ-ই হচ্ছে সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠার এক উপন্যাস কাহিনী। বাইরে ছড়ানোর ক্ষমতা যতদিন ছিল, বণিক-সভ্যতার মুখপাত্রদের এমন কূর্ম্মবৃত্তির প্রয়োজন হয়নি। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ যখন আত্মহত্যায় জীবনাবসান ঘটায়—তা যেন এক সভ্যতারই আত্ম-বিনাশন। এই যুগের শ্বাসরোধী বর্বরতা বহু সংবেদনশীল মনে বেদনার ঝঙ্কার তোলে। তখন বাইরের পথ জানা না থাকলে আত্ম-নিপীড়নের বিলাসই উপাদেয় ঠেকে। তা ডিকেন্সীয় ভাবালুতা, ডি, এচ, লরেন্সের উপজ্ঞাচারী দেহ-সর্ব্বস্ততা-ই হোক, কি জেমস্ জয়েসের মত নৈরাজ্যবাদী অবচেতনের পশ্চাৎভ্রমণ-ই হোক।

উপন্যাসের কাঠামো গোটা সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ছাপাখানার জন্য এই শিল্প-অবদান জনপ্রিয় হোয়ে ওঠে, তা বলা বাহুল্য। তা-ছাড়া দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা, প্রকাশনী-প্রতিষ্ঠান, বিক্রী ব্যবস্থা—আরো উচ্চ পর্যায়ে লেখকের স্বাধীনতা কতটুকু—সব এর মধ্যে গণ্য করতে হয়। কোন লেখক সেদিকে চোখ না ফিরিয়ে পারেন না।

বাংলা উপন্যাসও ইউরোপীয় সভ্যতার দান। সিপীহ বিদ্রোহের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষ্টিল ফ্রেম প্যাকা-পোক্ত হয়। তার সাত বছর পরই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকাশ। বৃটিশ আওতায় একশ' বছরে বহুদূর প্রসারিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় আত্মকেন্দ্রিকতার আদর্শে আত্মহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক আবির্ভাব তখনই। উপনিবেশের মধ্যবিত্ত উকীল ডেপুটি মুৎসুদ্দি কেরাণী দোকানদার ছোট ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যবাদীদের খানার টেবিল থেকে ছুঁড়ে দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাড়গোড়ে তার উদর পূর্তি। সেখানে অপরিচ্ছন্নতা ও এ্যানেমিয়া রোগ স্বাভাবিক। তার জাতীয়তাবাদ শেষ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়। কারণ মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টির জন্য প্রতিবেশী ছাড়া আর কিছু দেখে না। কেরাণী, প্রফেসার কি এই জাতীয় জীব তার প্রতিবেশী কেরাণী কি অধ্যাপকের উন্নতিতে হিংসা-পরায়ণ। তাই বাইরে সে বড়-জোর বড় বাবু কি অধ্যক্ষ-কে দেখে। তার বাইরে নৈব নৈব চ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মত নিঃসন্দেহে প্রতিভা-ও কত অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। তাঁর জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়।

মানুষের ইতিহাস আছে। বাংলা সাহিত্যে বিবর্ত্তনের এই দৃষ্টিভঙ্গী আমদানী বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ কীর্ত্তি। কিন্তু তার কোন চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। তদানীন্তন ফিরিঙ্গী বণিক-সম্প্রদায়ের দোসর একত্রে জমিদার ও ব্যবসায়ী—যথা প্রিন্স দ্বারকানাথ টাগোর—এমন উচ্চ মধ্যবিত্তের উপর মধ্যযুগীয় পরিবেশ-মাখা রঙের তুলি বুলিয়ে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, অন্তরে যারা য়ুরোপীয় ধ্যানাদর্শের সন্তান। তাদের মূল্যবোধ যাচাই হয় ওগুস্তে কঁৎ কি ষ্টুয়ার্ট মিলের উদারনৈতিকতার মাপকাঠির সাহায্যে। একই খাতে প্রবাহিত মীর মোশাররফ হোসেনের রচনা। তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধুর মধ্যে ঐতিহাসিক এজিদ নেই, আছে য়ুরোপীয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতায় মোহাচ্ছন্ন নব্য এজিদ ধ্বংসোন্মুখ সমাজের কণ্ঠে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-সঙ্গীতের চেয়ে অতীত কৃতিত্ব-কাহিনীর মর্সিয়াই বেশী শোনা যায়, যদিও অজ্ঞাতসারে দুঃসহ বন্ধ্যা বর্ত্তমান উপরে চেপে বসে। ইতিহাসের গতি-মুখর কম্বল এমন-ই, প্রয়াস থাকলেও সহজে ছাড়ানো দায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদিক দুই প্রতিভাবান লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেও তাঁদেরও সুষ্ঠু ইতিহাস-বোধ ছিল না। তাই তাঁরা পিছু টান ছাড়তে পারেননি। ফলে, য়ুরোপীয় ধ্যানাদর্শ আর পুরোপুরি হজম হয়নি। বিবাহের বাইরে প্রেম গর্হিত। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার প্রেম শেষ পর্য্যন্ত ছদ্মবেশী নায়ক-স্বামী প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। লুৎফন্নিসা আসলে পদ্মাবতী। দেবী চৌধুরানী ও ব্রজেশ্বরের প্রেম প্রফুল্লও স্বামী ব্রজেশ্বরের আশনাই।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন-ই দু-মুখো। প্রবন্ধ সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র বৈজ্ঞানিক চেতনা সম্পন্ন মনিষী। উপন্যাসে তিনি ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিত যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। অবশ্য মধ্যবিত্তের পূর্ণ বিকাশ-ক্ষণে উপন্যাসের নায়ক কত শৌর্য্য দীপ্ত। পরবর্তী ক্ষয়ের যুগে নায়ক ভাবালুতাচারী মেরুদণ্ডহীন জীব। শরৎচন্দ্রের নায়করা ত দশম-দশায় মূর্চ্ছিত বৈষ্ণব। বেশীরভাগ আত্মহত্যা-প্রবণ জীব। তিনিও ধর্ষিতা নারীর প্রেম সমর্থন করেন, কিন্তু সার্থক করার পথ দেখেন না। অবশ্য এইসব সদাশয়, জনপ্রিয় লেখাদের কৃতিত্ব অসীম। নিজ নিজ যুগের গণ্ডীজাত সংকীর্ণতা তাদের ছিল, এটুকু আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে না যাই।

উপন্যাসে তাই বাস্তবতার সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে বাস্তবতার ধারণা হস্তামলকবৎ সহজ হোয়ে পড়েছে। বাস্তব অর্থ যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে, উপন্যাসে তা-ই চিত্রণ। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তব এমন সংকীর্ণ নয়। শরৎচন্দ্র নিজে বাস্তবতাবাদী বা রিয়্যালিষ্ট—কারণ, "গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্ব্বতকে পাহাড়-পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জল-কে জল ছাড়া আর ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—এক গাছি চুলের সন্ধানও খুঁজিয়া পাই না।" বলা বাহুল্য, 'শ্রীকান্ত' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে শরৎচন্দ্রের সদম্ভ উক্তির উদ্ধৃতি। সাধারণত এই ধারণা যে তিনি বাস্তবতাবাদী উপন্যাসিক। কারণ, সমাজে যা ঘটে, তার-ই চিত্রণ ত বাস্তবতা। 'শ্রীকান্ত' ঐ খণ্ডের আঠারো পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্র নদী ও রাত্রির বর্ণনা দিচ্ছেন, "সেকথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশ-হীন নিষ্কম্প নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালী মূর্তি! নিবিড় কালো চুল দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে এবং সে সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্টা রেখার ন্যায় দিগন্ত বিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসি বিচ্ছুরিত হইতেছে।" নিজে স্ববিরোধে জড়িয়ে গেলেন, শরৎচন্দ্র তা লক্ষ্য করেননি। কারণ তিনি যে শ্রেণীভূত তাদের ব্যবহারিক জীবনেও এই স্ববিরোধ বর্ত্তমান। তাই একদা হাওড়া-জেলা কংগেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র পশ্চিমদেশী দরওয়ানকে অবজ্ঞাচ্ছলে 'ভোজনপুরী' পশ্চিমা-টা বলে আখ্যাত করেন। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর জাতীয়তা এমন-ই সংকীর্ণ। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে গোড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই আবার বিহারী পাঞ্জাবী প্রভৃতি অবাঙালী মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে বিষোদগারে মত্ত। সুষ্ঠু সামাজিক জ্ঞানের অভাবে বহু ঈমানদারের পক্ষেও এই ভুল স্বাভাবিক। কারণ তাদের মতে যা ঘটে, তাই সাহিত্যের বাস্তব।

এই জন্য উপন্যাসে বাস্তবতার সমস্যা সামাজিক তত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। সমাজের সংগঠন ও কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সংঘাত; ঐ সংগঠনের দুর্বলতা তার ভবিষ্যৎ—অর্থাৎ ইতিহাসের গতি যে সমস্ত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল,—সেই সামগ্রিকতার বোধ-ই শিল্পের বাস্তবতা। জাতীয় জীবনের গভীরেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বাংলা এপিক "গোরা" আজও উপন্যাসিকের জন্য নব্য পথের হদিস।

উপন্যাসের বাস্তবের সমস্যা তাই একই সঙ্গে জাতীয়তার সমস্যা। কিপলিং মার্কা উগ্র স্বাদেশিকতা নয়, বরং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ভাণ্ডারে দান-বৃদ্ধির জন্য স্ব স্ব জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশ-সাধন। সুস্থ জাতীয়তার অন্য কোন সংজ্ঞা নেই। জাতীয় আন্দোলন যেমন জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব, জাতীয় শিল্পকলাও তেমন সাধারণ মানুষের ভাষা ও চরিত্র ছাড়া ফলবতী হোতে পারে না। উদ্ভিদবিদগণ বলেন, গাছের শিকড় নীচে যতদূর যায়, তার ডালপালা ঠিক ততদূর উপরে ওঠে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা আরো সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাসিক ফিল্ডিং 'টম' জোনস'-এর ভূমিকায় তাঁর দীক্ষা গুরু হোমার ও মিল্টন সম্পর্কে লিখেছেন যে তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ যুগের জ্ঞানের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারী ছিলেন। সেইজন্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে সার্বিক হওয়ার ক্ষমতা উভয়ে পেয়েছিলেন। সেই উপদেশ আজও শিরোধার্য্য।

ঐ ভূমিকা ফিল্ডিং আরো বলেছেন, যে-সব জ্ঞান লেখকের মনোরাজ্যে জড়ো হয়, তাদের পার্থক্যটা ধরার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও থাকা উচিত। সত্য এবং নৈতিকতার প্রশ্ন আলাদা নয় লেখকের কাছে। নীতিশাস্ত্রের যুপকাঠে কলা-দেবীকে বলি দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ফিল্ডিং বলছেন, "This I think can rarely exist without the concomitancy of judgment, for how can we be said to have discovered the true essence of two things, without discovering their difference seem to me hard to conceive."

অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যশিব সুন্দরের সমাহার অবিচ্ছেদ্য এবং একক। ভাগ্যের জবরদস্তি সেখানে অচল।

নব-নব চেতনার সন্ধান, অনুভূতির রূপায়ণ, পাঠকের অনুভূতি আরো ব্যাপকতা ও গভীরে নিয়ে যাওয়াই উপন্যাসিকের সাধনা।"

* রচনাকাল, ১৯৫৪

AMARBOI.COM

ট্র্যাজেডির নায়ক

স্বর্গীয় শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার নাম আমি রেখেছিলাম : অনন্যা। আজও দুহিতা সেই নামে পরিচিত। পিতার কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল। যে অনন্য-জাত তার আর কী নাম হতে পারে?

সেদিন মৎপ্রদত্ত বিশেষণে কোনো উৎপ্রেক্ষা ছিল না। তিরিশ বছর আগে যাঁরা শান্তিরঞ্জনকে দেখেছেন, তাঁরাই আমার পক্ষে সায় দেবেন।

বাইশ বছরের জোয়ান শান্তিরঞ্জন। সুদর্শন। গৌর তনুর সঙ্গে বিপরীতে জেল্লা দিতে মাথায় গোছাগোছা কালো চুল। নায়কোচিত সৌম্য মূর্তি। প্রাণদ হাসি হাতের মুদ্রায় ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধোদেবোচিত ক্ষমা বা মাভৈঃ ভঙ্গী। যেন ত্রাণকারী সুলভ আদল।

কিন্তু অধমাঙ্গ বিপরীত। বুদ্ধদেব পরে আছেন খাকি পাতলুন। তা-ও অর্ধেক। অর্থাৎ হাফপ্যান্ট। পায়ে আফগানি চপ্পল। পুরোপুরি সৈনিক মূর্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শান্তিরঞ্জন ওই পেশা গ্রহণ করেছিল। নিজে ছাড়েনি। পেশা তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমুল উত্তেজনাময় ভারতবর্ষের চতুর্থ দশক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

জাপানী বোমাতঙ্ক

নেতাজী সুভাষের উধাও-ইন্দ্রজাল।

এই উপমহাদেশের মুসলমানদের গণ-আত্মহত্যার প্রাথমিক প্রস্তুতি-স্বরূপ মুসলিম লীগ কর্তৃক মধ্যযুগীয় রিপুসর্পের লাঙ্গুল-কন্ডুয়ন।

মহাত্মা গান্ধীর "করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা" শব্দিত আমুদ্র হিমাচল।

এক কথায়, গোটা দেশ নড়ছিল।

তখন অস্থিরতা যার সহজাত সে কী করে নিশ্চল, নিশ্চুপ থাকবে? শান্তিরঞ্জন গিয়েছিল লড়তে। কিন্তু নড়তে শুরু করলে স্বভাব-ধর্মে। সেনানী শিবিরেও দেশপ্রেমের তরঙ্গ আছড়ে পড়ছিল। জব্বলপুরের ভারতীয় সৈন্যরা আর ইউনিয়ন জ্যাক নয়, অবাধ্যতার পতাকার নীচে জমায়েৎ। শান্তিরঞ্জন কবি। নজরুলের ঐতিহ্য তখন আরো টাটকা, 'শির দেগা নেহি দেগা আমামা।" শান্তিরঞ্জনের বেয়াদব হালচাল কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখল না। তাদের গোটা ইউনিট ডিসব্যান্ড করে দিলে।

ব্রাহ্মণসন্তান ক্ষত্রিয় হতে গিয়েছিল। ইংরেজরা কোনকালে জাত-মারার পক্ষপাতী ছিল না। বহুকাল সাম্রাজ্য-সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার অমন পুঁজি এবং হাতিয়ার তারা কী করে খোয়াবে?

শান্তিরঞ্জন নৌকরী ছাড়লে। কিন্তু লেবাস ছাড়লে না। হাবিলদার সাহেব (নজরুল) শোনা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধ-ফেরৎ নাকি সৈনিক লেবাসেই ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে গান গাইতেন। বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল শান্তি রঞ্জন। পরবর্তীকালে নানা মানসিক বিপর্যয় তাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু অগ্নিগিরি কোনোদিন নির্বাপন স্বীকার করেনি।

আমার আজও আফশোষ অসুস্থতা নিবন্ধন শান্তিরঞ্জনের বিয়ের সভায় উপস্থিত থাকতে পারিনি। এই পর্ব কোনো সামাজিক পরিণয় নয়। ব্রাহ্মণের বৈদ্য পাত্রী। দুই পক্ষে সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা। সুতরাং ব্যাপারটা অসামাজিক। তাই বরযাত্রী সর্ব সম্প্রদায়-সম্মেলন। কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ জলী কাউল, নুরুল হুদা, কাদের বখ্শ (বর্তমানে বাংলাদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—মুজাফ্ফর গ্রুপের নেতা)—এবম্বিধ বিচিত্র সমাবেশ। এহেন শান্তিরঞ্জন। অসোয়াস্তি সৃষ্টি সমাজদ্রোহীদের কিছুটা করতেই হয়। শ্বশুরকুলের বৈদ্যমুরুব্বীদের প্রণাম-পর্বে ব্রাহ্মণ শান্তিরঞ্জন কম বিপদে ফেলেনি। বাসরঘর উত্তর কলকাতার এক হোটেলে কক্ষ। পুত্রের বিবাহে ক্ষুব্ধ পিতা ছ-মাস পরেই নিজেই পুত্রবধূকে বাড়ি নিয়ে যেতে হোটেলে হাজির হয়েছিলেন পিতৃহৃদয়ের চিরাচরিত গৌরবময় পরাজয়। অবিশ্যি শান্তির পিতৃদেবও ছিলেন আদর্শবাদী পুরুষ। জন্মসূত্রেই বংশধর অনেক গুণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(এখানো আগুন) অধিকারী হয়েছিল।

শান্তিরঞ্জনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার পত্তন সাহিত্যসূত্রে তখন হাওড়া ময়দান এলাকায় থাকতাম। 'অভিবাদন' পত্রিকা প্রকাশ স্থির হয়। শান্তি তার সর্বাধিক ধকল বহন করত। খুরুট রোডে এক ছোট্ট প্রেসে ঐ পত্রিকাটি ছাপা হত। শান্তিরঞ্জনই একা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর। আরো দেবতা ছিলেন পাশে। শ্রীব্রজেন ভট্টচার্য (শর্টে : বেজা) বর্তমানে 'স্টেটসম্যান, পত্রিকার সিনিয়র সাব এডিটর। তখন আমি রসিকতা করে বলতাম, "বেজায় শান্তিতে আছি।" এক পরম মাতাল দিন গেছে সেই সময়। রসিকতা এমন অনড় ভবিষ্যৎ হতে পারে অবিশ্বাস্য। মনে পড়ে আর এক সাহিত্য-প্রাণ বন্ধুর কথা। শ্রীশ্যামল মিত্র। দু-বছর পূর্বে লোকান্তরিত, হৃদরোগের শিকার ছিলেন।

জীবিকার তাগিদেই একদিন আমরা ছিটকে পড়েছিলাম। 'অভিবাদন' শেষে বন্ধ হয়ে যায়। আমি হাওড়া-বাস তুলে দিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম। শান্তিরঞ্জন 'সওগাত'-পত্রিকায় যোগ দিলে।

অতীতের কথা। তাই পত্রিকাটির কিছু পরিচয় দান দরকার। মুসলমান সমাজে প্রগতিশীল ভাবলোক রচনায় 'সওগাত'-এর দান অপরিসীম। মধ্যযুগীয়তার খোন্দল থেকে বাঙালী মুসলমানদের তুলে আনার ব্যাপারে সব রকম অভিযান এখান থেকেই শুরু হয়। শ্রদ্ধেয় নজরুল এই কাগজের আপিসে বহুদিন কাটিয়েছেন। লেখার ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল বলা বাহুল্য। সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ প্রমুখ সাহিত্যেব্রতীদের যোগাযোগ ছিল 'সওগাত'- এর সঙ্গে। পত্রিকার সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দীন আহমেদ আজও জীবিত। আশির উর্ধ্বে বয়স।

AMARBOI.COM

যেন ইতিহাসের ডাকেই শান্তি 'সওগাত'-পত্রিকার আস্তানায় হাজির হয়েছিল। তখনও সে সৈনিক বেশ ছাড়েনি। তবে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম পাজামা পরত। ঢিলেঢালা ধুতির প্রতি লড্ডুয়ে ব্যক্তিমাত্রের নাক সিটকায়। শান্তিরঞ্জন 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক ছিল বললে খোদ সম্পাদকও আজ আপত্তি করবেন না। কারণ লেখা বাছা-ছাড়াই থেকে প্রুফ-দেখা পর্যন্ত সে বিশ হস্ত দশানন। ওই স্তূপ থেকেই সে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথাশিল্পী আলাউদ্দীন আল-আজাদকে আবিষ্কার করেছিল। আজাদ আজ সে কথা স্মরণ করে অতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই। তখন তালতলা এলাকায় আমি থাকতাম। পাঁচ মিনিটের বেশী লাগত না 'সওগাত'-আপিসের পথে। সুতরাং সঙ্গজীবীর স্বর্গে পৌঁছেছিলাম।

কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে কলকাতা তখন বারুদ। কেবল স্ফুলিঙ্গের অভাব। মুসলমি লীগ ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাক্শান শুরু করলে। মধ্যযুগের অঙ্কশয্যা থেকে নারকীয় সরীসৃপের দল বেরিয়ে এলো পৈশাচিক হুহুঙ্কার অট্টোল্লাস মুখে। কলকাতা মহানগরীর বুকে বাঙালীর বহুযুগের আরাধ্য শ্রেয়বোধের মূর্ছিত দেহের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল সদর্পে ধর্মান্ধতার জন্তু-জানোয়ারবৃন্দ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শস্ত্রপানি সবুট ইংরেজ সৈনিক। তিন দিনে ষোল হাজার প্রাণের বলি সমাপ্ত হল সাম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্ঠে।

কলকাতা শহর 'নেড়ে' এবং 'হিন্দু' পাড়ায় বিভক্ত হয়ে গেল। বাঙালীরা যেন গায়ে নতুন লেবেল মারলে তাদের কুষ্ঠব্যাধি চাপা দিতে।

কিন্তু কিছু কিছু দ্বীপ তবু রয়ে গেল। একদম নিরপেক্ষ এলাকা। যেমন ব্যক্তি মানুষের বেলা, তেমনই মহানগরের ক্ষেত্রে, যেখানে মেলামেশা চলাফেরায় তেমন বিপদ ছিল না। "মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারানো পাপ" এই শহরের অধিবাসীই উচ্চারণ করেছিলেন। আজ মনে পড়ে, অমন জান্তব পরিবেশে ১৮ই আগস্ট (১৯৪৬) শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় হৃদয়াবেগ এবং মূর্খ-সুলভ দুঃসাহসের উপর নির্ভর করে উত্তর কলকাতা থেকে পার্ক সার্কাস এসেছিলেন মুসলমান বন্ধুদের খোঁজ নিতে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এবং ছাড়াছাড়া দৃষ্টান্ত একদম অসম্ভব ছিল না তখনও। মানুষ এবং এলাকার পবিত্রতা সেদিন অনেককে পরাজয়বাদী হতে দেয়নি।

জীবিকার জন্যে অমন এলাকার বড় প্রয়োজন ছিল। অনেককে তা উপোস ও বেকারত্ব থেকে বাঁচিয়ে দেয়। শান্তিরঞ্জনের চাকরি তখন 'সওগাত' অফিসে। একদম 'নেড়ে' এলাকা। প্রায় তখনই পাকিস্তান। আর কোনো জীবিকার সুরাহা ছিল না শান্তির। ইস্তাফা দিয়ে বেকার হওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তখন অন্যতম নিরপেক্ষ সীমান্ত ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা এবং ওয়েলেসলি স্ট্রীটের। (বর্তমানে যথাক্রমে লেনিন সরণী, রফি আহমদ কিদওয়াই রোড) সংযোগস্থল। তাই শান্তিরঞ্জনের চাকরি রক্ষার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সে হাওড়া থেকে এসে ওই মানব-সঙ্গম-তীর্থে পৌঁছবে। আর আমি তাকে মুসলমান পাড়ায় নিয়ে যাব। অফিস বেলা দশটায়। পৌনে দশটার দিকে এসে সে পৌঁছাত। দু-পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক হলে সাঙ্গুভ্যালি রেস্তোরাঁয় প্রতীক্ষা। এখনও সাক্ষী সেই চা-ত্রিবেণীতীর্থ বহাল আছে। যথাস্থানে। অর্থাৎ, শান্তিরঞ্জনের বডিগার্ড বনে গেলাম। আমি টিঙটিঙে কৃশকায়। পাশে উদ্ধত যৌবনের দূত—সুঠাম স্বাস্থ্যের সুলতান। তারই দেহরক্ষী সাজা মানায়। কিন্তু অবস্থার গতিকে বিপরীত। সৈনিকের হাফপ্যান্ট তখন ঝুলে ফুল-পাৎলুনে পরিণত হয়েছিল।

আবার দিন শেষে নিরপেক্ষ এলাকায় আমি সঙ্গীকে পৌঁছে দিতাম। আজ আত্মশ্লাঘা অনুভব করি, শান্তিরঞ্জনের কোনো কাজে আসতে পেরেছিলাম। আরো অনুভব করি যে-মানস-ভূমির উপর এসে আজ আমি দাঁড়িয়েছি, তার মূলে ছিল শান্তির মতো সুহৃদ। প্রায় সেই সময় হেদুয়ার কাছে সাংবাদিক শ্রীশচীন মিত্র উন্মত্ত জনতার হাতে শহীদ হন এক মুসলমান ফেরীওয়লাকে বাঁচাতে গিয়ে। আজও এমন কয়েকটি আত্মা আমার পাশে পাশে হাঁটে। তাই তো রক্ষা পেয়ে গেছি আবহ-কুক্কুট সাজার গ্লানি থেকে এই জন্যে। অমন ঋণ অপরিশোধ্য। শান্তিরঞ্জনের অতি সামান্য কাজে লাগাও তাই আমার কাছে অতি গৌরবময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের সমাধি ঘটে। কবর খুঁড়ে ভয়ঙ্কর, আরো ভয়ঙ্কর দানবের মতো তার আবির্ভাব ঘটে মিলিটারি ডিক্টেটরশিপের লেবাসে। গোরস্থান থেকে একদম আর না উঠতে পারে, তার জন্য গোটা দেশকে আরো সতর বছর অপেক্ষা করতে হয়। ৫৫ সালের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক বসন্ত-মৌসুমে সাহিত্য সম্মেলন করা সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বশ্রী মনোজ বসু, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তখন সম্মেলনে যোগদান করেন। শান্তিরঞ্জনও এসেছিলেন। পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি। একদম বেশান্তর। বেশ মুটিয়ে গিয়েছিল, দেখলাম, প্রাণবন্তা পূর্বের মতোই। গোটা বসুন্ধরা কুটুম্ব।

৭১ সনে বাংলাদেশের জন্মলগ্নে আবার কলকাতায় ছিটকে পড়লাম। শান্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। শ্রীগৌর প্রায় শ্রীকৃষ্ণে পরিণত। তার শরীর খারাপ খোঁজ রাখতাম। কিন্তু এমন পর্যায়ে, কখনও কল্পনা করিনি। সর্বভুকের আহারে নানা নিষেধের বেড়ি। প্রথম দিন তার সঙ্গে দুপুরের আহার বাবদ এক রেস্তোরাঁয় তিন চার ঘণ্টা কাটল। তখনই বুঝতে পারলাম, শান্তিরঞ্জন নীলকণ্ঠ হতে শেখেনি। মানসিক হলাহল শরীরেও জারিয়ে গেছে। যৌবনে নিজের আততায়ী ছিল সে নিজে। তাকে আর বশ করতে পারেনি। নতুন সমাজের স্বপ্ন বাইরের গ্লানিদীর্ণ বালুচড়া শুষে নিয়েছে। গোলাকার বিশ্বে চৌকো গোঁজ আর খাপ খায়নি। শান্তিরঞ্জনের অন্যতম গল্পগ্রন্থ 'সুসমাচার' এর ভায়োলেন্ট রচনাগুলো থেকে আন্দাজ করা যায়, স্বীয় মানসপটের কারিগর হিসেবে তার দ্বৈরথ-দ্বন্দ্ব কী যন্ত্রণাময় ছিল। 'অভিবাদন' পত্রিকার ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর দেবতাদের কাছ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আশেপাশে আস্থা-স্থাপনের কোনো কিছু না থাকলে মানবিকতায় বিশ্বাসীদের দিন গুজরান কঠিন। ভিত্তি-শিথিল বিশ্বাসের কঙ্কাল আঁকড়ে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা চিরদিন অসহজ। ইউটোপিয়ান শান্তিরঞ্জনের নিজের সৃষ্ট অধ্যাসের কাছে পরাজয় মানতে প্রস্তুত ছিল না কোনদিন। দোটানায় আবর্তিত জীবন। স্বাস্থ্যও তাকে রেহাই দেয়নি, ভেঙে চুরমার করে দিলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময় এক গল্পগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে শান্তির উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম :

"বহু পূর্বজন্মে বন্ধু রেখেছি বিশ্বাস
যখনই লেগেছে বুকে তোমার নিঃশ্বাস"।

শান্তিরঞ্জনের জন্যেই পুনর্জন্মে আবার নতুন করে আস্থা রাখলাম।
নচেৎ তার বিচ্ছেদ-ব্যথায় আর কোথায় সান্ত্বনা?

* শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৯২০, মৃত্যু জুলাই, ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনতার শক্তি

"জনতা উচ্ছৃঙ্খল।"

'জনতা পশু।"

"জনতা নিরক্ষর, বর্বর।" বহু পণ্ডিত, শিক্ষাভিমানী গণ্য-মান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে আজকাল অহরহ এই উক্তি শোনা যায়।

কিন্তু সত্যই কী জনতা উচ্ছৃঙ্খল, পশু এবং বর্বর?

জনতার বিপরীত দিকে কারা বাস করেন? কারা খাড়া থাকেন? শরীফ অভিজাত পুরুৎপাণ্ডা, আলেম-ফাজেল অয়গয়রহ—সমাজের যারা মুকুটমণি। তারা হয়ত জনতার মত ভিড় বা জট্‌লা পাকান না।

কিন্তু হাজার হাজার বছর ইতিহাসে তাদের ভূমিকার কী ছবি পাওয়া যায়?

মানুষকে তারা মানুষ রূপে গণ্য করেছে– তা ইতিহসে কোথাও লেখে না। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিভাগ এখনও চালু আছে। এ্যারিষ্টটলের মত মহান দার্শনিক পর্যন্ত মনে করতেন, দাস-প্রথা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আরব দেশে দাস মুসলমান—যাদের বলা হোত মাউলা—তাদের কী দশা ছিল? এগার শতকের মিশরী ঐতিহাসিক ইব্‌নুল আসীর তৎকালীন এক আরবী প্রবাদ তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন : "তুমি তোমার নামাজ ছেড়ে উঠে পড়তে পারো, যদি তিনটি জিনিষ তোমার সামনে দিয়ে চলে যায় : কুকুর, গাধা এবং মাউলা।" মাউলা অর্থাৎ ঐ দাস-মুসলমান। বহু আমিরুল মুমেনীনের রেকর্ড তার চেয়ে কিছু উন্নততর নয়। আব্বাসীয় খলিফা হারুনর রশীদের নাম তার গড়া শহর বাগদাদের মত বিখ্যাত। তার রাজত্বকালে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘটে। তাদের বলা হতো জাংগী—অর্থাৎ তা জাংগী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। তখন বড় বড় জমিদারেরা শহরে আরাম-আয়েশে ডুবে থাকত। কিন্তু তাদের রসদ যোগাতে হোত গ্রাম থেকে চাষী মজুর প্রজাদের। খাজ্‌না এবং নিপীড়নের অস্থিরমরীয়া প্রজাদের তাই অভ্যুত্থান ঘটে। এরা হারুনর রশীদকে মুসলমানই বলত না। বিদ্রোহীদের দলে ছিলেন বহু ধার্মিক ইমাম, বোজর্গ ব্যক্তি। বারো বৎসর এই বিদ্রোহ টিকে ছিল। পরে খলিফার বিপুল বাহিনীর কাছে তারা নাস্তানাবুদ হোয়ে যায়।

কে এখানে উচ্ছৃঙ্খল এবং বর্বর?

নিজের অধিকার-সচেতন এবং প্রার্থী জনতা না তাদের শাসক-বৃন্দ?

জাগতিক কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক। ধর্মের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? শাসকদের প্রচলিত পদ্ধতি-মাফিক উপাসনা করা পর্যন্ত চলত না। শাসক যদি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তখন প্রজার নানা বিপদ। শাফেয়ী, হাম্বালী, মালেকী সম্প্রদায়ের প্রার্থনা-বিধি আলাদা। ভিন্ন মতাবলম্বী শাসকের কাছে তাদের কম নিপীড়ন সহ্য করতে হয়নি। শিয়া-সুন্নীর বিভেদের কথাই স্মরণ করা যাক। তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও কাঁটার মতই প্রত্যেক সৎ মানুষের বুকে বিঁধবে। এমন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উস্কানিদাতা কী জনতা, না শিক্ষিত শাসক-গোষ্ঠী এবং তাদের তাঁবেদার আলেম-ফাজেলবৃন্দ? এক সম্প্রদায়ের মুসলমান আর এক সম্প্রদায়ে মুসলমানের গলা কাটছে ধর্মের নামে। ধর্মের কি প্রহসনীয় পরিণতি!

ছিল কী অতীতে–বর্তমানেও যতটুকু বিদ্যমান—এতটুকু ধর্মের প্রতি সহনশীলতা? উত্তেজনা কারা যুগিয়ে রাখে। তারা আর যে-ই হোক নিরক্ষর জনতা নয়। সুলতান মাহমুদ তার বাহিনীতে মঙ্গোল এবং পারশী সৈন্য রাখতেন। পারশীরা শিয়া। মঙ্গোলরা অন্য সম্প্রদায়-ভুক্ত, সুন্নী বা আর কিছু। এক দল বিদ্রোহ করলে আর দলকে দিয়ে শায়েস্তা করা ছিল সুলতানের উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হুবহু ফলে যেতো। এই খুন খারাবীর জন্যে অপরাধী জনতা নয়, বরং শাসক সম্প্রদায়, যারা তাহ্‌জীবতমদ্দুনের মুখপাত্র। জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভ বিধি প্রচারিত থাকার ফলে, খলিফা হোত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা। সিংহাসনের ভাবী দাবীদার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চোখ কত ক্ষেত্রে না উৎপাটিত হয়েছে। কুফা, বসরার শহর-দরজায় এমন অভিজাত-অন্ধের বহু কাহিনী ইতিহাসে আছে। এমন বর্বরতা কী জনতার কাজ? সম্রাট আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যার পর নিরঙ্কুশ অনুভব করলেন না। দারাশিকোর পুত্রকে আগ্রা দুর্গে আমৃত্যু বন্দী করে রাখলেন। অবিশ্যি বিনা বিচারে। বিচারক ত তিনি নিজেই। ছিল কী সে যুগে আইন, বিচার এবং প্রশাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র—ন্যায় বিচার সুষ্ঠু করার জন্যে? বহু যুগ পরে তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন জনতা এগিয়ে এসেছে তাদের কড়া-পড়া কঠিন হাত নিয়ে। এই ভাবেই দূর হয়েছে বহু যুগের স্তূপীকৃত আবর্জনা। স্বৈরাচারী হিসাবে ত প্রাচ্যের নৃপতিদের সুনাম জগত-বিদিত। উন্মায়েদ খলিফাদের অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষই আব্বাসীয় যুগের প্রতিষ্ঠা জোরদার করেছে আবু মুসলিমের নেতৃত্বে। জনতার শক্তি এমনই জনতা উচ্ছৃঙ্খল বা পশু নয়। দাস প্রথা পৃথিবী থেকে কে দূর করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলো এখানে পরাজিত। কিন্তু দাস-বিদ্রোহই মানবেতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায় দূর করে দিয়েছে। বর্তমান যুগে একই শহরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সহনশীলতা দেখা যায়, তা কী অতীতে বা মধ্যযুগে বর্তমান ছিল? এই সহিষ্ণুতা আধুনিক যুগেরই দান। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠাতা কারা? এক হাঁকে বা ডাকে বলা যায় : জনশক্তি। জনতা উচ্ছৃঙ্খল বা বর্বর নয়।

এদেশে ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষার সম্মান কে বাঁচিয়েছিল? কোন আদমজী প্রাইজধারী সাহিত্যিক, কবি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক নয়। যখনই জনতা এগিয়ে এসেছে, সভ্যতার মুখোশ-আঁটা বরকন্দাজরা হটে গেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গন আজ গুণ্ডা-সংকুল ত্রাসের রাজত্ব নয় কেন? কোন যাদুর ফুৎকার হাওয়া এমন ফিরিয়ে দিল? ভীতির দাপটে জ্ঞানপীঠের তলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতো অন্ধকার জমেছিল কে ফিরিয়ে দিলে আবার আলোর অনির্বাণ মশাল? জনতার মেহনত-কঠিন হস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরদিনই এমনই কঠিন-তর।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই বাংলাদেশে ছেলেমেয়ে গরু-ছাগলের মত বিক্রী হোত। তা দূর করতে উপর-তলার মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। সিপাহী বিদ্রোহ শুধু ইংরেজ রাজত্বের ভিত্ কাঁপায়নি, সমাজের বহু অনাচারের বনিয়াদ ধ্বংস করে দিয়েছিল জনশক্তির জাগ্রত চেতনার কুঠার আঘাতে।

আজো দেখা যায় না, শ্রেণীগত-ভাবে উপর-তলার মানুষ সামাজিক অবিচার দূরীকরণে সংঘবদ্ধভাবে হাত তুলেছে। ইসলামের জিগীর পঞ্চাশ বৎসর ধরে ক্রমশ বোলন্দ হোয়েছে মাত্রায় মাত্রায়। পূর্ববঙ্গে আজো শহরে শত শত বালক-ভৃত্য যাদের বয়স আট থেকে পনর ষোল চব্বিশ ঘণ্টা গোলামের মত খাটে—যখন তাদের স্কুলে থাকা উচিত ছিল। অথচ কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি বা প্রতিকারে কেউ এগিয়ে আসেনি। এখন ইউরোপে আঠার বৎসরের কম কাউকে কাজে লাগানো আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপার। রীতিমত দণ্ডনীয়। অথচ সেখানেও কিশোরদের জন্য এমন ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। ইয়ার্কশায়ারের পশমের কলে দুই বছর বয়সের শিশুরা পর্যন্ত খাটত। কারখানায় কাঁধে করে বয়ে দিতে আসত তাদের জনক বা জননী। এলিজাবেথ ব্রাউনিঙের কবিতায় এখনও এই বালকদের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। কে দূর করল শোষণজাত এই বর্বরতা? বর্বরতা কোথায়? শাসকদের মধ্যে না জনতার মধ্যে? সেই পাশব অত্যাচার দূর হোলো যখন মেহনতী জনতার হাত প্রতিবাদে আকাশ ছেয়ে ফেললো। চার্টিষ্ট আন্দোলনের জনতাদের দূর থেকে আজো সালাম জানাতে হয়। অথচ ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সভ্যতা-সংস্কৃতি তাহ্‌জীব তমদ্দুনের পাণ্ডারা কখনও আঙ্গুল পর্যন্ত তোলেনি। এমন কী ইংলন্ডের চার্চের পাদ্রীরা নিচে আড়ালে শোষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ধর্মের মর্মশক্তির অধঃপতন এমনই যুগে যুগে দেখা যায়। জালেমের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখন তার অস্তিত্ব বাঁচানোর কাজে লাগে চোলাই ধর্মের মন্ত্র। জনতা বর্বর নয়। বরং বর্বরতার শত্রু।

পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামাঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেসব প্রচণ্ডতার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, তা অসহনীয় মরীয়া মানুষের আত্মরক্ষার অভিযান মাত্র। যখন সামাজিক ভাবে বিচারের পথ রুদ্ধ, তখন মানুষকে নিজের হাতে তা তুলে নিতে হয়। কিন্তু এমন ঘটে, মাত্র চরমপর্যায়ে। তা মোটেই দৈনন্দিন বা হামেহাল ব্যাপার নয়। গরুচোর, চোর কী ডাকাতদের নামে অভিযোগ করলে দেখা গেছে তাদের কিছুই হয়নি। উল্টা অভিযোগকারীর জন্যে নাজেহাল বরাদ্দ। ঘুষের বদৌলতে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা রেহাই পেয়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে অসহায় মানুষের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক মেজাজ হারিয়ে ফেলা বিচিত্র কিছু নয়। অধঃপতনের যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাদের অনুষ্ঠান-ক্ষমতা বা ফাংশান হারিয়ে ফেলে, দেহে ক্যান্সার ঢুকলে যা হয়। আর ক্যান্সারের মতই সেখানে শরীরের সুস্থ কোষগুলোকে পরভোজী দুষ্ট কোষগুলো খেয়ে ফেলে। সমাজজীবনে ঠিক তা-ই ঘটে।

জনতার আক্রোশ, গোস্বা, প্রচণ্ডতা সাময়িক কিছু প্রাণহানির কারণ ঘটে। কিন্তু তার সংখ্যা আর কত? চাক্ষুস মৃত্যু আমরা দেখতে পাই। কিন্তু অদৃশ্য মৃত্যু প্রতিদিন দেশের বুকে কতো ছড়িয়ে আছে তা চোখে দেখতে পাই না। কেন একজন বাঙালী গড়ে মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বাঁচে, যেখানে একজন নিউজিল্যান্ডবাসী খুব সহজে আটাত্তর বৎসরে পৌঁছায়? অর্থাৎ শেষোক্ত ব্যক্তির বয়সের তিন ভাগের এক ভাগ। ইউরোপে সব দেশেই আয়ুর হার গড়ে ষাট বৎসরের উর্ধ্বে। কেন কেন আমরা এত অল্প বয়সে মরি? ভাত কাপড়ের অভাব, শিক্ষার অভাব, রোগে চিকিৎসার অভাব, নিরাপত্তার অভাব। এই অভাবজাত অদৃশ্য মৃত্যু যারা প্রতিদিন অবহরহ পথে ঘাটে জননীর দেহে শিশুর শরীরে, মজুরের গতরে ছড়িয়ে রেখেছে—এমন মৃত্যুর সওদাগরদের বর্বরতার তুলনায়, সাধারণ জনতার প্রচণ্ডতা একটা মাছির কামড়ের বেশী কিছু নয়। কারা ছড়িয়ে রাখে ওই মৃত্যুবীজ? তারা কী জনতা?

জনতা অন্ধ বা বর্বর—কে বলবে?

তাদেরি সহযোগিতায় দুনিয়ার বহু অন্যায়-অবিচার দূর হোয়েছে, আমির উমরাদের করুণা বদান্যতায় নয়। সব আদর্শ এবং শ্রেয়বোধ—দুনিয়ার যা কিছু ভাল—সবেরই উদগাতা জনতার শক্তি।

যারা অন্ধ, তারাই বলে জনতা অন্ধ।

যারা নিজেরা বর্বর তারাই হাঁকে : জনতা বর্বর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে এদের চিনেছিলেন। তাইত অমর প্রশস্তি রেখে যান—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।।*

*রচনাকাল ১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহী রণক্লান্ত

ফিউডাল মোহাবিষ্ট বাঙালী মুসলমান সমাজ সব সময়ই পরিবর্তনের লেজ পাকড়েছে যুগের দাপটে, নিছক দৈনন্দিনতার তাগিদে। সেখানেও সর্বদা হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের সংলাপের অনুপস্থিতি প্রকট। শুধু বাঙালী মুসলমান কেন গোটা উপমহাদেশের উক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। এমন স্ববিরোধের ফলে কোথাও সুস্থ বা সুষ্ঠুভাবে কোন জীবন-ধর্মী ভাবধারা ব্যাপক হয়নি। দেখা গেছে, চিন্তার ক্ষেত্রে যারা একদা—প্রগতিশীল তারাই পরে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাবাহক। বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পটভূমির যথাযথ অবস্থান নির্ণয় কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই দোটানায় অশ্ব নয়, মেলে অশ্বেতর। উমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুসলমান সমাজের ভূমিকায় তার ভুরিভুরি নজীর দেওয়া যায়। তাই চব্বিশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মুসলমানকে দু'বার স্বাধীন হতে হয়। পৃথিবীতে এমন হাস্যাস্পদ রেকর্ড দ্বিতীয় আর নেই।

ইতিহাসের রায় সামনে রেখেই সেই সব ব্যক্তিদের দিকে তাকানো চলে, যারা ছিলেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। হয়ত তাদের সাময়িক পরাজয় ঘটেছিল। তবু প্রাচীন পুনরুক্তি-ঘৃষ্ট প্রজ্ঞাবাণীর সুরে বলা যায়, বিচারবুদ্ধির জয় অপ্রতিরোধ্য, যদিও সাময়িক প্রতিবন্ধকতা স্বাভাবিক।

AMARBOI.COM

স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে নজরুলের সম্যগ পরিচয় দান আজ অনেকটা সহজ। তিনিও ছিলেন সেই ব্যতিক্রমদের অন্যতম, ভাবধারার ক্ষেত্রে নিজের শালপ্রাংশু মূর্তির যিনি অমর ভাস্কর।

বৃটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদের উত্তাল তুমুল কালে নজরুলের অভ্যুত্থান। এই সময় স্বাধীনতা সংগ্রাম এক বিশেষ সুস্থ পর্যায়ে কুক্ষিগত ছিল। চিরাচরিত সাম্প্রদায়িকতার সাপ যেন মন্ত্রবশীভূত। লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ প্রমুখের উদার নেতৃত্ব খেলাফৎ আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী অন্তর্সত্তার প্রাধান্য, যদিও বহিরঙ্গে প্যান্-ইসলামী—গোটা উপমহাদেশের নবজন্মের জন্যে এক অভাবনীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিল। সদ্য প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরৎ হাবিলদার নজরুল সেই তরঙ্গশীর্ষে সাঁতারুর মত পৌঁছান, ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত যিনি সদম্ভ ঘোষণা করতে পারতেন :

"I moisten the very root of life.
জীবনের মূলে রস-সিঞ্চন আমার ব্রত।"

তখন মধ্যবিত্তের গণ্ডী থেকে জাতীয়তাবাদের বন্যা আরো প্রসারিত-বাহু, গণদেবতার করমর্দনে ব্যগ্র। যেন সেই সংলাপের বাণীদাতারূপে উপস্থিত হন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল। বর্তমান ঘটনার অভিঘাত-প্রসূত চাঞ্চল্য অনেকের কাছে অশিল্পীজনোচিত উৎসাহ। কিন্তু চারুকলার ক্ষেত্রেও লজিকের মত আরোহী এবং অবরোহী দুই পন্থাই স্বাভাবিক। সার্ভান্টিজ কিংবা শেক্সপীয়ার, গোর্কি কিংবা রবীন্দ্রনাথের পথ স্বতন্ত্র, যদিও একই গন্তব্যের স্মারক। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের রথী টলষ্টয়, চেকোভ প্রমুখের অবদানের সঙ্গে পরিচয়ে যে ঐতিহ্য তৈরী ছিল, তা আরো বেগবান হয়ে পড়ল রুশ বিপ্লবের সঙ্গে। মোজাফ্‌ফর আহমদ, সত্যপাল ডাঙ্গে ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন ঘটে। এম্নিতে জাতীয়তাবাদ সূত্রপাতে সার্বজনীনতার কণ্ঠস্বর হয়েই ফুটে ওঠে। তদুপরি নানা দেশী-বিদেশী ভাবধারার সঙ্গম। এমন নির্মল ধারাস্নাত নজরুল স্বদেশের সকল ঐতিহ্যের সঙ্গে কোলাকুলি-মত্ত হন অতি সহজে। শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা কবি নজরুল ধর্মীয় অনুশাসনের মাপকাঠিতে খারিজ হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু মানবিকতার মহৎ ধর্ম তিনি পালন করেছিলেন লা-পরোয়া। জন্মভূমির প্রতি বেঈমানী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার পন্থা হোতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ নয়। একদা লেটোর দলভুক্ত কিশোরের মানস-পটভূমি যেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্যেই তৈরী হয়েছিল। আপামর জনসাধারণের কাছাকাছি যেতে নজরুলের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কোথায়? সুস্থ জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিকতার সড়ক ধরেই প্রসারিত হতে পারে। দ্বিতীয় দশকে তাই, নজরুলেরই ভাষায়, শূদ্র-দেবতার রুদ্র রূপ সহজে প্রতিভাত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পটভূমি, বিশেষত রুশবিপ্লব এবং ইউরোপের দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি—এই উপমহাদেশেও গণতান্ত্রিকতার সহায়ক হয়ে ওঠে। তা আর মধ্যবিত্তের সীমায় আটক থাকে না, যদিও অন্তর্স্রোতে নানা বিপরীত টান স্বাভাবিক। লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ তখন শিল্পের দিক থেকে অবধারিত হয়ে ওঠে। রাজনীতির এমন পরিপূরক অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবহেলিত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সুর কি ঝুমুর, কি ভাটিয়ালী গানের প্রসারতা তখন সহজে দৃষ্ট হয়। সুরকার নজরুল সব টেনে আনেন সংগীতের আসরে। বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত সীমা বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম জেলা। চুরুলিয়া গ্রামের অধিবাসী কবির সঙ্গে এলাকার যোগাযোগ আজন্ম। পরবর্তীকালে আঞ্চলিক সংগীত সহজে তাঁর কাছে ধরা দেয়। পলাতক কিশোরের এক পর্যায়ে কাটে পূর্ববঙ্গে। জারী, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান প্রতিভার দোসর হওয়া স্বাভাবিক। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-প্রবণতা প্রবহমান ছিল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রবেশ বিচিত্র কিছু নয়। নজরুলের সামাজিক রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা গানে লোকজ সংস্কৃতির ছাপ অতি স্পষ্ট। কীর্তন গান বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত সীমায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। সেখানে নজরুলের কৃতিত্ব যেন সহজাত। কারণ, পটভূমি তৈরী ছিল। শ্যামা সঙ্গীত বাদ যায় না। যেহেতু তা-ও বাংলার সম্পদ। জাতীয়তাবাদের স্রোত স্বতঃই এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে, দেশজ সীমানায় আটক থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সৈনিকরূপে নজরুলের পরিচয়। উক্ত অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনে একজন বাঙালী জাতীয়তাবাদীর একাত্মতা-অনুভব স্বাভাবিক। কারণ, আবিশ্ব কুরুক্ষেত্রে সেও অংশীদার। জগলুল পাশা, রীফ নেতা আব্দুল করিম, আনোয়ার পাশা, কামাল আতাতুর্ক নজরুলের কাব্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হন স্বাভাবিক নিয়মে। বাংলার জল-ভরণী বধূর দেহাবয়বের রণনে ফুটে ওঠে মোতাকারিব ছন্দ, বৃক্ষঝরা শুষ্কপত্রের নূপুরে আরবী লোক-সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হয়। স্বতঃই এসে পড়ে বাংলার গানে গজলের প্রেমসিক্ত মূর্ছনা এবং গীতি-ঢং। এই বহুমাত্রিকতার পেছনে ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অবিশ্যি তার কাঠামো সর্বভারতীয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনই সেখানে সবচেয়ে কার্য্যকর গতিদায়ক শক্তি।

এমন কাল-পটভূমির সঙ্গে সমাজসংস্কার আপনা-আপনি জড়িয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদের স্রোতগতি এক খাতে চলে না। সামন্ততান্ত্রিক মোহভঙ্গ-ব্রত জাতীয়তাবাদীদের নিতেই হয়। স্বাধীনতার উদ্‌গাতা রূপেই নজরুল বিদ্রোহী আখ্যা পান। সমাজের ক্ষেত্রেও তাঁর অকুতোভয় অগ্নিগিরিসদৃশ তেজোদীপ্ত মূর্তি তুলনা-বিরল।

প্রাচীন সমাজের ধারক ও বাহকেরা নিজেরাই ধর্মবিশ্বাসে আস্থা খুইয়ে বসে। পদে পদে স্ববিরোধ দেখা দেয় তাদের বচনে এবং আচরণে। কালের দাপট বাঁকা ঘাড় আরো সিধা করে ছাড়ে। সামাজিক ক্ষেত্রে নজরুলের বিদ্রোহ অত সহজে শিকড় মেলার সুযোগ পায়নি। একদা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মৌলানা আকরম খাঁ নব্য-মুসলমানদের আধুনিক শিল্প-জগতে প্রবেশের ধর্ম-অনুমোদিত পাশপোর্ট দিতে পারেন। ব্যাঙ্ক, বীমা বা ইনসিওরেন্সে সুদের গন্ধ থাকলেও প্রবেশ হারাম নয়। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে হেন মৌলানাই নজরুল-বিরোধী এবং অতি কুৎসিত ভাষায়। নজির আহমদ নামধারী আর এক মৌলবী সাংবাদিক তখন নজরুলকে 'শয়তান' আখ্যা দেন। ফিউডালিজম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বর্তমান কালে মৃত। কিন্তু সামাজিক শক্তিরূপে তার দেহক্ষয় অত সহজে ঘটে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক নজরুল বরেণ্য। কিন্তু সমাজবিদ্রোহী হিসেবে অপাংক্তেয়, ঘৃণ্য। তাই মৌলানা আকরম খাঁর ক্ষেত্রেও অমন স্ববিরোধ দৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ বাঙালী মুসলমানদের জন্যে যে ভবিষ্যৎ কবর গড়ে তোলে তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং অজস্র ধন-সম্পদ দাফনের উদ্দেশ্যে, তার ভিৎ তৈরী হয় অমন সামন্ততান্ত্রিক উপাদানাবলীর সাহায্যে এবং স্বয়ং মৌলানা আকরম খাঁ পালের গোদা-নেতৃত্ব দেন। নজরুলকে পাকিস্তানে জাতীয় কবি-রূপে গ্রহণ, স্ববিরোধিতার আর এক চরম নজীর। আজীবন পাকিস্তান-বিরোধী এবং ভারতীয় নাগরিক—অদ্যাবধি তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদের কাছে পূজ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে। একদা-স্ববিরোধিতায় যে-দ্বিজাতিত্বের প্রারম্ভ, স্ববিরোধেই তার পরিসমাপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে। ইতিহাসের স্রাব পাকিস্তানেই এমন প্রহসন অভিনীত হতে পারে। নজরুল নিজের জোরে মুসলমান সমাজে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তাঁকে জায়গা দেওয়া হয়নি।

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি কোরান ও হাদিস চষে।

· এমন বিদ্রূপ-হানা সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় কবি মহৎ চারণের রূপে প্রমূর্ত। জনতার কণ্ঠস্বর তিনি। রবীন্দ্র-বলয় থেকে প্রক্ষিপ্ত আর এক গ্রহের মত তার বিকাশ-দীপ্তি। সেখানে তিনি অতুলনীয়, আশ্চর্য্য পেশলতায় অনন্য। অথচ তাঁর শৈল্পিক উপাদান অতি সাধারণ। নিরাভরণ শব্দের সাহায্যে ধ্বন্যাত্মক মন্ত্রের অনুরণন গড়ে তোলার কারিগর তিনি। মানব-প্রেমিক কবি যেন মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্যে নিজস্ব শৈলী আবিষ্কার করেন।

কিন্তু অনুন্নত দেশের জাতীয়তাবাদ নানা অসংগতির জটাজাল। গোষ্ঠী, কৌম প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক লেজুড় বিদ্যমানতার ফলে পিছুটানও তার এক চারিত্র। বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম ছিল এদেশের অন্যতম মূল গতিদায়ক শক্তি। এই বিদেশী পার্টির প্ররোচনা, কারসাজির সঙ্গে জড়িত। তদুপরি, উপনিবেশের বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থসিক্ত অন্তরবিরোধ জাতীয়তাদের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষে কোথাও চরম সন্ত্রাসবাদে তার অপমৃত্যু ঘটে, কোথাও বিদেশী শাসকের নয়া দোসর-রূপে, কোথাও মধ্যযুগীয় ভাবধারা-ভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তনে। কবি-শিল্পীর পক্ষে তা মর্মান্তিক। নজরুল পূর্বোক্ত দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বৈকি। তদানীন্তন কিছু রাজনৈতিক স্যাটায়ারে তা স্পষ্ট। সদাবহির্মুখী কবি ক্রমশঃ অন্তমুর্খিতার দিকে অগ্রসর হন। শেষে মূলত সঙ্গীতের জগতে ফিরে যান। আদিম মানব যখন প্রকৃতি থেকে নিজকে স্বতন্ত্র কিছু ভাবতে শিখছিল, সঙ্গীতই সেই সত্তাকে প্রকাশের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির মুখোমুখি সে যেন যৌথগোষ্ঠিরই একজন। খ্রিষ্টোফার কড্ওয়েলের ভাষায়, সঙ্গীতের জগতে গোষ্ঠিমানব এক চিরন্তন প্রকৃতি অথবা স্থির জগতের সামনে দাঁড়ায়। বহুমুখী প্রতিভা নজরুলের পক্ষে বাহন বদল বিচিত্র কিছু নয়। এই যুগে তাঁর অবরেসবরে রচিত কাব্যে মিষ্টিক বা মরমী চেতনার ব্যাখ্যা সহজে পাওয়া যায়। যেন সৈনিক এবার গৃহাগত-প্রাণ। সামাজিক আবহ অনুযায়ী কবি-শিল্পীর পট বদলে যায়। মধ্যযুগের অনিশ্চিত, বিঘ্ননিরাপত্তা মাৎস্যন্যায় প্রধান সমাজের ভীষণা মা কালী কালপ্রক্ষেপে রামপ্রসাদের নিকট বাঙালী স্নেহময়ী জননী বনে যায়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের শেষ সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগটুকু ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর এক বছর কয়েক মাস নজরুল সুস্থ ছিলেন। দেশের বাকী ট্র্যাজেডি দেখার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। ব্যাধির নির্মম গুহা-অন্ধকারে বন্দী, বৈশ্বানর-সমর্পিত গন্ধবিধুর ধূপ, এক কালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিপুরুষ অজানিতে, হয়ত অধস্তনদের মুখাপেক্ষী, অপূর্ণ পরিত্যাগ করেন নিজের শপথ-অঙ্গীকার :

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাব ভাষা ভাবনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৪
প্রকাশক : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মান্ধতার শিকার ভাষাতত্ত্বে উচ্চ ডিগ্রীধারী
শহীদ মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
ভ্রাতৃযুগলের মহৎ স্মৃতির উদ্দেশে ভাষা-কৌতূহলী এক আনাড়ীর শোকবিধূর দীন
হৃদয়ার্ঘ্য

নিবেদন

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা।

বই-পত্রিকার সম্পাদক এবং ঔপন্যাসিক সরদার জয়েন উদ্‌দীন বছর সাতেক আগে একবার লেখা দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। অনুরোধ রক্ষা শেষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। নিস্তার মেলেনি। ধারাবাহিকভাবে বই-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধরাজিই বর্তমান পুস্তক। কেবল শেষ পরিচ্ছেদে নয়া সংযোজন।

ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কৌতূহল তাহা আনাড়ীর এবং একজন লেখকের। তার বেশি কিছু না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ভুক্ত যোগ্য বহু কৌতূহলীর আবির্ভাব ঘটুক, এই সদিচ্ছা পেছনে থাকার ফলেই পুস্তক প্রকাশনায় স্নেহাস্পদ সরদারের বহুদিন-কার দোসরা অনুরোধ আমি ঠেলে রাখতে সক্ষম হইনি। পাঠকের কাছে তা জানাতে আমি নিতান্তভাবেই নিঃসঙ্কোচ।

পাকিস্তান আমলে লেখা বই। পরাধীনতাপ্রসূত বুটের লাথির দাগের মত কিছু উপমা রয়ে গেল। তা আর বদলাইনি। ইতিহাস কী মুছে ফেলা যায়?

স্নেহভাজন কবি হাবীবুর রহমান স্বতঃপ্রণোদিত হৃদ্যতার মুদ্রণ সংক্রান্ত ঝামেলা ঘাড় পেতে নিয়েছিলেন। এক কথায়, প্রকাশনার ক্ষেত্রে তিনিই মেল-নার্স। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে পারলাম না।

বর্তমানে জাপান-প্রবাসী বলে নয়, ঠিক একই কারণে, পুস্তক-প্রকাশের অন্যতম উদ্যোগী শুভাকাঙ্ক্ষী কবি কায়সুল হকও বাদ রয়ে গেলেন।

শ. ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বস্বর

বইয়ের বনিয়াদ কী?

প্রশ্নটা অনেকের কাছে ধাঁধা ঠেকাতে পারে। সভ্য জগতের এই বিশিষ্ট জ্ঞান-ইমারত সম্পর্কে এমন সওয়াল উত্থাপন অসমীচীন কিছু নয়। জবাবের পূর্বে অবিশ্যি বনিয়াদ কথাটার ফয়সালা হওয়া উচিত।

সাধারণত : কিছু উপাদানের সাহায্যেই বনিয়াদ গড়ে ওঠে। কিন্তু সব উপাদান সেখানে গোটা নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য নয়। বনিয়াদের সঙ্গে উপাদানের সম্পর্কও লক্ষণীয়। ইমারত তৈরি করতে অনেক কিছু লাগে। কিন্তু ইট, কংক্রিট, (একদা চুন, সুড়কি) লোহা ছাড়া দালান চিন্তা করা যায় না। মোজেক হয় বাড়িতে, কিন্তু তা অপরিহার্য উপাদান নয় ইমারতের জন্য।

এই সঙ্গে আরো লক্ষণীয়, বনিয়াদের উপাদান এবং ইমারতে সম্পর্ক নিগূঢ়। গোটা দালানের রূপ নির্ভর করে উপাদানের উপর, বনিয়াদের উপর। একটা উদাহরণ অনুসরণ করা যেতে পারে। হালফিল দালানের চেহ্‌রা বদলে যাচ্ছে। কারণ, স্থপতি ইচ্ছামত দেওয়াল নিয়ে খেলা করতে পারেন। অনেক বাড়িতে দেখা যায়, দেওয়াল আর জানালায় কোন তফাৎ নেই। গোটা দেওয়ালই জানালা। তার ফলে, প্রচুর আলো-বাতাসের আমদানি তো আছেই বাড়ির চেহারাই স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করছে। এক শ' বছর আগে কোন সৌধ-শাস্ত্রীর পক্ষে এই ব্যাপার ছিল অসম্ভব। কারণ, ছাদের ভার বহন করে দেওয়াল। জানালার জন্যে দেওয়াল কিছুটা ফাঁকা রাখা যেত। কিন্তু খুব বেশি নয়। বেশি এগোলে ছাদ হুড়মুড় ধসে পড়বে। কিন্তু কংক্রিট আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যা আর থাকল না। বর্তমান পিলার বা থাম সেই ভার সহ্য করে। ফলে, দেওয়াল স্বাধীন। সাবেককালে যৌথ পরিবারে দাদার উপর সংসারের ভার চাপিয়ে অনুজেরা গায়ে হাওয়া লাগাত। এই দেওয়ালের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটছে। পিলার যেন অগ্রজ। গৃহবাসীদের গায়েও অনেক বেশি হাওয়া লাগছে। অবিশ্যি এয়ারকন্ডিশনারের আগমনের ফলে বাড়ির চেহারার আবার নতুন সমস্যার পলেস্তারা দেখা দিচ্ছে।

মোট কথা, উপাদানের সঙ্গে বনিয়াদ এবং গোটা নির্মাণের সম্পর্ক এমনই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। কংক্রিট আবিষ্কারের ফলে স্থাপত্যে শুরু হলো রোমান্টিক আন্দোলন। হালফিলের বাড়ি আর সাবেক দালান তুলনা করলে তা বেশ বোঝা যায়। পুরাতন বাড়ি যেন ক্লাসিকস বা ধ্রুপদ। মোটা দেওয়াল, মোটা থাম। মাটিতে পোঁতা আঁটসাট গুরুগম্ভীর দাঁড়িয়ে আছে যেন বৃদ্ধা পিতামহীবসনে ঘোমটায় ভারাক্রান্ত। আর আধুনিক বাড়ি উড়ুউড়ু ভাব, মাটিতে অবস্থান আছে বা নেই। যেন কলেজে-পড়া ব্যক্তিত্বগর্বী হালফ্যাশনের অষ্টাদশী। সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলন অবিশ্যি উনিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ পাদের ব্যাপার। এই হাওয়া স্থাপত্যকে স্পর্শ করে আরো পরে। চারুশিল্পে এই আদান-প্রদান স্বাভাবিক। সিনেমা বর্তমানে কাব্য এবং উপন্যাসের উপর ছায়া ফেলছে। সমাজের একটা আবয়বিক ঐক্য বা organic unity আছে। যারা এই দৃষ্টিমুখর চোখের অধিকারী তাদের কাছে অধিক ইশারা নিষ্প্রয়োজন।

বইয়ের বনিয়াদের প্রশ্নে এত কথা বলতে হলো। কারণ, এই পটভূমি জানা ব্যতিরেকে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়।

আবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি : বইয়ের বনিয়াদ কী? পুস্তক যখন আছে, বনিয়াদ থাকবে বৈকি। ভুঁই ছাড়া বাজি হয় না।

সমাজের মতো বইয়ের উপাদান দুই প্রকার। আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। অবিশ্যি দেওয়ালের যেমন এক পিঠ হোতে পারে না, এই ক্ষেত্রেও তা-ই। উভয় প্রকার উপাদান সংযোগেই বইয়ের বিকাশ। নচেৎ তার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হতো না।

AMARBOI.COM

পুস্তকের বনিয়াদের জন্য অপরিহার্য উপাদান :

১। সংগঠিত মনুষ্য-সমাজ,

২। যেখানে চালু : ভাবের আদান-প্রদান,

৩। ভাব,

৪। উপযোগী ভাষা।

এই চার প্রকার আভ্যন্তরীণ উপাদান। বাহ্যিক উপাদান মোটামুটি দু' প্রকার :

১। ভাষার লিখন-পদ্ধতি

২। কাগজ, কাগজের বিকল্প, ছাপাখানা এবং প্রকাশনা-সংক্রান্ত নানা উপাদান।

উপাদান-নিচয়ের পূর্ণ ফিরিস্তিদান বিশেষজ্ঞের ব্যাপার। আমার মতো অনাড়ি এই ক্ষেত্রে বেশি দূর এগোতে পারে না।

এখানে আরো সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। পূর্বে উল্লেখিত দেওয়ালের দুই পিঠ দরকার। সে কথা ভুললে পটভূমি আর চোখে পড়বে না। পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া বিচার, বাতাসের গ্রন্থী-বন্ধন একই কথা।

পুরাকালে কোন এক সময় ভাষার লিখন-পদ্ধতি মানুষ শিখেছিল। কিন্তু তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান যুগের মলাটবাঁধা বইয়ের কথা কেউ ভাবতে পারত না। কারণ, কাগজ ছিল না। লিখতে হোত মাটি, পাথর, গাছের বাকল, পাতা ইত্যাদির উপর। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বইয়ের রূপ, সাজসজ্জা নির্ভর করে, সমাজ-সভ্যতা কোন্ স্তরে আছে তার উপর। শেক্সপীয়র যখন বলেন, books in running brooks বা স্রোতগ তড়াগে তৌরীৎ- তা এক যুগে সত্য ছিল বৈকি। ভাব আছে, ভাষা আছে। কিন্তু সমাজে লিখন-পদ্ধতি নেই। তখন প্রকৃতির সমতলই ছিল মানুষের কাগজ বা শ্লেট। পাথরে শোনা যেত ফতোয়া। শুধু তাই নয়, সভ্যতার আত্মার হদিস পাওয়া যায় বইয়ের উপাদানের সাহায্যে। প্রাচীনকালে কাগজ ছিল দুষ্প্রাপ্য। তার উপর সেই সময় মানুষ কথাকে ইন্দ্রজাল বা অলৌকিক মনে করত। মন্ত্রের উপর এখনও বহুজনের বিশ্বাস আছে। এক যুগে কথা ছিল মন্ত্র। এই কথা বা মন্ত্র লেখা হয় কাগজের উপর। সুতরাং কাগজ পবিত্র দ্রব্য। মানুষের মন ছিল এমন আধিদৈবিকতা বা অপ্রাকৃত দ্বারা রঞ্জিত। আমার বালক কালে গ্রামে পত্র লিখতে কাগজের উপর 'জুতা'- শব্দ লেখা ছিল অপরাধ। তার পরিবর্তে লিখত 'বিনামা'। কারণ কাগজ পবিত্র ছিল। সুতরাং তার উপর ধুলিকাদাহারী ঘৃণ্য জুতা কিভাবে রাখা যেতে পারে? আজ আর তেমন বাড়াবাড়ি নেই। কারণ, মানুষের মন তো অচল নয়। বহু রহস্যজাল যুগের তাগিদে সে পেরিয়েছে। সে যুগে মেয়েরা স্বামীর নাম করত না। কারণ, পতি দেবতা। যুগের ছাপ এইভাবে মানুষের দেহে ও দ্রব্যে প্রতিভাত হয়।

আবার গোড়ায় আসা যাক। বইয়ের বনিয়াদ কী? তার জবাবে প্রথমে দেখতে হবে সমাজ বিবর্তনের কোন্ স্তরে আছে। এই ফিরিস্তি অতি দীর্ঘ। কারণ, গোটা মানব সভ্যতার ইতিহাসের জের টানতে হয়। বরং এক লাফে হালফিল দু-তিন হাজার বছরের মধ্যে আসা যাক। যন্ত্র-শিল্পের পূর্বে বই ছিল হস্তলিখিত বই। তারপরে আসা ছাপা বই। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে আরো এক ধাপ এগিয়েছে। মাইক্রোফিল্মের কথা স্মরণ করুন। বর্তমানের মোটা মোটা বই গোটা ফিল্ম করে নেওয়া যায়, তারপর যন্ত্রের সাহায্যে আলোকপাত দ্বারা তার পাঠ চলে। এ একদম অতি অত্যাধুনিক ব্যাপার। এই যান্ত্রিক সাহায্যে আজ সমগ্র পৃথিবীর বইয়ের লাইব্রেরী পড়া যায়। কারণ, ফিল্মে জায়গা লাগে কম। বই সংরক্ষণ তো একটা সমস্যা। অনেক জায়গা, আলমারি, আবহাওয়া কীটের উৎপাত সম্বন্ধে সতর্কতা এত দিক সামলাতে হয়। কিন্তু মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরিতে এত খবরদারি লাগে না, হাঙ্গামা অল্প। একটা মোটা অভিধান ফিল্ম করতে লাগে ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের এক পাতা।

এত কথার অবতারণা, যেহেতু বইয়ের বনিয়াদের সঙ্গে নানা সমস্যা জড়িত।

এবার এক এক করে বিভিন্ন উপাদানের আলোচনা সম্ভব। বইয়ের ষড় উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাব এবং ভাষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুস্মর

১

গোড়ার পাঠকের নিকটে বিশেষ অনুরোধ : ভাষা ছাড়া অর্থাৎ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে একটা কিছু ভাবার চেষ্টা করুন। সফল হবেন কী? জবাবটা আপাতত আপনার নিকট জমা থাক।

ভাষা ভাবের প্রকাশ। এই অতি-প্রচলিত সংজ্ঞা সহজে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ভাষা ভাবকে বোঝায়। কিন্তু কি বোঝায়? তা-ও জানা দরকার। কারণ, সমস্ত বোঝাবুঝি তো সেখানে নির্ভর করছে। এক কথায় অর্থ না বুঝলে তো কিছুই বোঝা হোল না। এখানেই যত সমস্যা। ভাষা, ভাব, অর্থ-এই তিনের সম্পর্ক কী? আর অর্থ বলতে আমরা কি বুঝি? পেটের নাড়ি-নক্ষত্র না জানলেও হজমের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যাপার। কিন্তু সাধারণের জানতে দোষ নেই। নাগরিকের স্বাস্থ্য এমন জ্ঞানের উপর উন্নততর হোতে পারে।

অর্থের স্বরূপ নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক দার্শনিক বা লিংগুইষ্ট ফিলজফারদের মধ্যে নানা বিতর্ক বিদ্যমান।

প্লেটো থেকে সকল দার্শনিক উপলব্ধি করেছেন, শব্দের অর্থ নিতান্ত সামাজিক রেওয়াজের ব্যাপার। বাংলা টক, বুক, গান আর ইংরেজি Talk, book, gun-এর মধ্যে আকাশ-বাতাস ফারাক। শেষ শব্দ প্রাণান্তকর অস্ত্র, যদিও বাংলায় প্রাণদাত্রী। তার জন্যে দুই দেশের সমাজ দায়ী। বাংলা প্রবাদের ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করা যায়, যখন কানে পড়ে, "এক দেশের বুলি, অপর দেশের গালি।"

পণ্ডিতগণ আরো একমত যে ভাষা তখনই অর্থ সমন্বিত হয় যখন তা আর কিছুর প্রতিনিধি। আরো সোজা কথায় : আর কিছুর প্রতীক। যথা, 'গরু' একটা শব্দ। কিন্তু তার অর্থ ওই শব্দের মধ্যে নিহিত নেই। যতক্ষণ না এক বিশেষ ধরনের চতুষ্পদ জন্তু চোখের সামনে খাড়া হয়, ততক্ষণ শব্দ শব্দই থেকে যায়। সুতরাং ধারণা প্রত্যয় (Concept), বাগ্বিধি, ভাষা-জ প্রকাশ ইত্যাদি যখন কোন কিছুর প্রতীক, তখনই তার অর্থ থাকে। আর যার জন্যে তা প্রতীক, তা-ই হচ্ছে অর্থ। কিন্তু শব্দ কিসের প্রতিভু? এখানেই যত দার্শনিক বচসা। তখন বলা যায়, শব্দ ভাবের প্রতীক। কোন প্রকাশ ছাড়াই ভাব বর্তমান থাকে। অনাদিকাল থেকে তা চলে আসছে। প্লেটো থেকে হেগেল এবং আধুনিক ভাববাদী বা আইডিয়ালিস্ট দার্শনিকগণ এই মত পোষণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ভাবের আসন কেবল মানুষের "মনে।" এই সব মানসিক সামগ্রী যার প্রতীক হচ্ছে শব্দ-কোথায় কী অবস্থায় আছে বা কীরূপে গঠিত হয়, তা নিতান্ত জটিল ব্যাপার। ভাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা কোন কিছুর সম্বন্ধ-ভাব। সুতরাং শব্দ বা ভাবের প্রতীক, তা নিশ্চয় ওই কোন কিছুর সম্বন্ধের প্রতিনিধি। বহু দার্শনিক এই জটিলতা অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, ভাব তার নিজের জগৎ গড়ে। ভাবের জগৎ স্বয়ম্ভু। ঠিক তাদের বিপরীতে জড়বাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, বস্তুর নামকরণই যথেষ্ট। কারণ, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুধু বস্তু আসে না, তার নানা গুণাবলী জড়িত থাকে। এই সব নামের মিশ্রণের সাহায্যে নানারূপে চিন্তার প্রকাশ ঘটে। পূর্বোক্ত গরু শব্দ শুধু শব্দ নয়। চতুষ্পদ, গৃহপালিত তৃণভোজী ইত্যাদি গুণাবলীও সঙ্গে বিধৃত। বাক্য গঠিত হয় নানা শব্দ-যোগে। শব্দ নামকরণের ফল। সুতরাং বাক্য বা চিন্তা ওই নামকরণের মিশ্রণ।

পূর্বোক্ত মতবাদের নানা দল-উপদল আছে, নেপথ্যে বলে রাখা যাক।

শব্দ, ভাব, অর্থের সম্পর্ক নির্ণয়ে আবার আমরা ফিরে আসব এই আলোচনার শেষ প্রান্তে। আপাতত কাঠামোটুকু দেওয়া হলো মাত্র।

তার পূর্বে ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত একান্তভাবে প্রয়োজন।

২

ভাষা ভাব আদান-প্রদানের সামাজিক বাহন। এই বহু-ঘর্ষিত সংজ্ঞার আবার পুনরাবৃত্তি করতে হোলো। কারণ সামাজিক প্রবহমানতার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিগূঢ়। সমাজের সমান্তরাল ভাষা ও নিষ্প্রভ, হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ল্যাটিন, সংস্কৃতের নজির চোখের সামনে রয়েছে। কিন্তু যুগযুগান্তের ইতিহাস ভাষা শত রূপান্তর সত্ত্বেও বহন করে বেড়ায়। তাই ভাষা সামাজিক সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও আবেগ-জাত সত্তা হারিয়ে ফেলে না। নিজের আকৃতি, প্রকৃতির মধ্যে সাবেক দাগ রেখে দেয়। বাচ্যের প্রশ্ন ধরা যাক। 'বইটা হারিয়ে গেছে.' 'ছেলেটা হারিয়ে গেছে' দুই বাক্যের একই বাচ্য। অথচ ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী তা হওয়া উচিত নয়। একটি প্রাণীবাচক, অপরটি অপ্রাণীবাচক। কিন্তু বাচ্যের সাহায্যে সুদূর ইতিহাস উন্মোচিত হচ্ছে। লজিকের হেরফের এখন বোঝা যায়। আদিম মানুষ সব কিছুর উপর নরত্ব-আরোপ (Personification) করত। তাই পা না থাকা সত্ত্বেও বই বালকের মতো হারিয়ে যায়। সব বস্তুর উপর নরত্ব আরোপ আদিম মানবগোষ্ঠীর একটি মানসিক পর্যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে আজও সেই ধারা বহমান। প্রকৃতির মানসিক পর্যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে আজও সেই ধারা বহমান। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম আদিম মানবের পক্ষে ওই মানস ছিল স্বাভাবিক। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রকৃতির সঙ্গে। কাব্য, অন্যান্য চারুকলার মারফৎ সেই একাত্মতার সন্ধান আজও বিদ্যমান। রোমান্টিক কবিরা তার পরম পরাকাষ্ঠা। সাহিত্যে আদি-মানস কলাকৌশল হিসাবে আজও বিশিষ্ট স্বাক্ষর।

আর একটি উদাহরণ : মানুষের ডাক নাম থাকে কেন? আদিম মানব প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রতীকিত (Symbolized) বস্তুর মধ্যে পূর্বোক্ত মানস অনুযায়ী কোন ফারাক দেখত না। তাই নামই যেন মানুষ। নাম বদলে দিলে মানুষটা বদলে যায়, এই ছিল ধারণা। আদিম সমাজে ভূতপ্রেত, তুক্‌তাক থেকে রক্ষার ওই এক কৌশল। কারণ, নাম ছাড়া তো কেউ তুকতাক করতে পারে না। মন্ত্রপাঠের সঙ্গে নাম প্রয়োজন। তাই মৃত-বৎসা জননী আজও ছেলের নাম রাখে 'আল্লা-রাখা', 'পচা।' কারণ, পচা জিনিস কেউ স্পর্শ করে না, যম আজরাইলও করবে না। প্রতীক আর প্রতীকিত বস্তুর সমর্থতা এখনও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। বর্ষীয়ান কোন লোক ভুলেও লেখা বা ছাপা কাগজ পায়ে মাড়াবে না। কারণ, লেখা যা প্রতীক-তা পবিত্র। ভাষার মধ্যে এমনই দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে অতীত ইতিহাস হাজার রূপে ইতঃক্ষিপ্ত। আদিম মনের পরিচয় পাওয়া যায় নানা পন্থায়।

ভাষার যেমন সামাজিক রূপ আছে, তার আবেগমুখর আর এক দিক তেমনি লক্ষণীয়। গোস্বায়, আনন্দে এবং অন্যান্য ভাব প্রকাশে প্রচলিত ভাষার আইন তাই লঙ্ঘিত হয়। গলার স্বর, অঙ্গভঙ্গী, গলার স্বরের তারতম্য ভাবপ্রকাশের সহায়ক।" কাছে এসো" এই কথা শুধু গলার স্বরে আদর অথবা শাস্তির আহ্বান হোতে পারে। ভাব-প্রকাশে ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাই এই জাতীয় ভাষার নাম দিয়েছেন : Presymbolic অর্থাৎ প্রাক্-প্রতীক। ভাষা তো ভাবের প্রতীক। তা সত্য যুগের ব্যাপার। আদিম অবস্থায় মানুষ কি করত? অঙ্গভঙ্গী, চীৎকার ইত্যাদি সহযোগেই মনের ভাব প্রকাশ করত। এখনও তার জের আছে। আর থাকা উচিত।

কারণ, সমাজ-সংহতির জন্যে বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিছক আড্‌ডার কথা ধরা যাক। অনেকে বলেন, আড্‌ডায় হাতামাথা হয় কী? স্রেফ গুলতানি, স্রেফ উদ্যম-ব্যয়, স্রেফ বাক্য ব্যয়। হয়ত মাঝে মাঝে বচসা, কলহ। কিন্তু সামাজিক সংঘবদ্ধতার জন্য আড্‌ডার প্রয়োজন আছে। ভাষা যদিও তথ্য যোগায়, আড্‌ডায় তথ্যের জন্য কেউ আসে না। আড্ডা যোগায় সখ্য। ভাষার সঙ্গে প্রাক-প্রতীকী যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট। সখ্যের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। উপাসনালয়ের কথা ধরা যাক। সেখানে যে-মন্ত্র পাঠ হয়, তা বহু প্রার্থনাকারীই বোঝে না। তা দেখে অনেকে মন্তব্য করতে পারে : কতগুলো আহম্মকের কাণ্ড দ্যাখো, কেন যায় ওখানে? অনেকে মন্ত্র বোঝেই না। হাঁচা কথা। কিন্তু সামাজিক সংঘবদ্ধতার একটা বিরাট শর্ত এখানে পালিত হচ্ছে। তা দেখা উচিত। সংঘবদ্ধতা ছাড়া সমাজ কি টিক্‌বে? শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষায় প্রতীকী এবং প্রাক-প্রতীকী রূপ প্রায় ধরা পড়ে না। কারণ, পণ্ডিতন্মান্যতা। এমন মূর্খ ব্যক্তিরাই আড্‌ডার প্রতি বীতস্পৃহ। আড্‌ডায় সত্যি কিছু কিছু উদ্যমক্ষয় হয়। বাক্য-ব্যয় হয় ঢের বেশি। কোন গভীর কি সিরিয়াস চিন্তাও সেখানে কেউ করে না। কিন্তু তবু প্রয়োজন আছে। ওই তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রতীক-পূর্ব যা প্রাক-প্রতীক ভাষার খবর রাখে না। তাই অনেক সময় রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়ঃ বেশিরভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক নাদান কিছু বোঝে না, সুতরাং গণতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, ওটা একটা বাৎ-কা-বাৎ। এই মূর্খেরা সাধারণ ভাষার মানদণ্ড প্রয়োগ করে সেই সব ঘটনার উপর যা প্রকৃতপক্ষে আংশিক অথবা পুরোপুরি প্রাক-প্রতীক ভাষার ব্যাপার।

যদিও ভাষা ভাবের বাহন। তবু আজ পর্যন্ত কোন ভাষা সৃষ্টি হয়নি যা দিয়ে মানুষ নিজকে পুরোপুরি, সোজাসুজি প্রকাশ করতে পারে। তাই তাকে ছুটতে হয় অন্য পন্থায়। মনের দ্যোতনা কতো জটিল এবং ব্যাপক। সাধারণ ভাষা যেখানে গ' পায় না। তাই নানা কৌশলের কাছে মানুষ ছুটে যায়। সাহিত্য, বিভিন্ন চারুশিল্প তারই ফল। অনেকে নসিহৎ ঝাড়ে, “মনে যা আছে আমরা যেন তাই বলি। এবং যা বলছি তাই যেন মনে করি।” বক্তব্য এবং কামনায়, কামনায় ও বক্তব্যে এমন সংগতি রক্ষা শুধু ভাষার সাহায্যে কঠিন। শুধু ‘কেজো’ বাক্য নিয়ে থাকলে গোটা সমাজ অকেজো হোয়ে পড়ত। এই জন্য অবসর বিনোদনের অন্যতম শাখা আড্ডা একদম বিশুদ্ধ বাধ্যতা বা ফরজের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

অনেক সময় কথা ভাবের ধার দিয়ে যায় না। কল্পনা করুন, আপনার পাশে আছে স্ত্রী বা কোন যুবতী সঙ্গিনী। অনুস্থল নির্জন বনানী, সবুজ ঘাসের মখমল, পায়ের নিচের শস্য হিসাবেও তোফা। এমন সময় সঙ্গিনী ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, “কি চমৎকার রাত্রি।” সে কি শুধু রাত্রির কথা বলছে? সুখানুভূতি আলিঙ্গন, চুম্বন, বা আর কিছুর প্রার্থনা নেই তার কণ্ঠে? কথা যখন এমন শব্দরূপে ফুটে উঠে, তখনই তা প্রাক-প্রতীক ভাষা। অনেক সময় ভাষার এই রূপ কত একঘেয়েমি-জাত ক্লান্তি থেকে না পরিত্রাণ দেয়। ট্রেনে বসে আছেন অচেনা আরো তিনজন যাত্রী পাশে। সবাই নির্বাক। মনে হাতড়পাতড় করছেন। হঠাৎ একজন বলে উঠল, “আখাউড়ার ট্রেন কতক্ষণ থামে?” ব্যস, শুরু হোয়ে গেল যোগসূত্র। বক্তা ট্রেন নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, তিনিও সাহচর্য্য-লোভী। এই জাতীয় বাক্য সাধারণ ভাষার পরিমাপে তুলনীয় নয়। কবিদের কলাকৌশলের আলোচনার পরে আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করব।

বহু ক্ষেত্রে মানুষ বস্তু আর প্রতীকের ফারাক ঘুলিয়ে ফেলে, নামের ক্ষেত্রে যেখানে মনে করত দুই-ই এক। এই ঘুলিয়ে ফেলার মধ্যে সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। তিক্ত মেজাজের পরিণতি অল্পের উপর দিয়ে যায়। গালিগালাজ এমনি পরিস্থিতি-উদ্ভুত। “ওরে শুয়োর ওরে গাধা” সম্বোধনে একজন চটে। কোন মানুষ শুয়োর বা গাধা হতে পারে না। গাধার প্রতীক তবু মানুষের উপর প্রযোজিত। এই ঘুলিয়ে ফেলার মধ্যে সভ্য মানুষে মানুষে মুখ পর্যন্ত বিবাদটা সীমাবদ্ধ থাকে আর হাততক্ যায় না। ভাব প্রকাশের এই পন্থা না থাকলে পৃথিবীতে বাদবিসম্বাদ ফ্যাসাদ যে দৈনন্দিন আরো কত বাড়ত লেখাজোখা মুশ্‌কিল।

কিন্তু অনেক সময় এই ঘোলাপানির এক কুৎসিত দিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালফিল থেকে উদাহরণ দিচ্ছি "হিন্দু" ও "মুসলমান"- শব্দ দু'টো বিশেষ ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। এমন দুটো শব্দই ঘৃণা, সংকীর্ণতা, বর্বরতা ইত্যাদি উদ্রেক করে পারস্পরিক সম্পর্কে। তার কারণ ঐ ঘুলিয়ে ফেলা উদভ্রান্তি। নানা সামাজিক কারণ থাকতে পারে পশ্চাতে। কিন্তু এমন ভ্রান্তি কোন সভ্য, সংস্কৃত মনের পরিচয় নয়। আরো মনে রাখা উচিত, প্রতীক বিমূর্ত সাধারণীকৃতি বা Abstract Generaization-এর ফল। হিন্দু বললে, হিন্দু১ হিন্দু২ হিন্দু৩.... এমন কয়েক কোটিতে গিয়ে থামতে হয়। তেমনি মুসলমান১ মুসলমান২ . . কয়েক কোটি। সব মুসলমান বা হিন্দু বর্বর কি অমানুষ নয়। আবার তারা সকলেই দেবদূত বা ফেরেস্তাও নয়। অথচ দুই শব্দ ঘৃণার প্রতীকে পরিণত। এই মস্তিষ্কবিকৃতি ওই প্রতীক এবং প্রতীকৃত বস্তুর ঘুলিয়ে ফেলার পরিণতি প্রাচীন প্রবৃত্তি এইভাবে মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাদের মানসবাহী ভাষার মতো। প্রাক-প্রতীক ভাষার প্রয়োজন আছে। যদিও আদিম ব্যাপার। কিন্তু বর্বরতার জন্য মানুষের অজ্ঞতা দায়ী।

সুষ্ঠু ভাষা-গঠনের ক্ষেত্রে তাই তিনটি উপাদান অপরিহার্য্য। বিমূর্তন (abstraction), নেতিকরণ (negation) সাধারণী-কৃতি (Generalization)।

এই তিন উপাদানের বিশদ দফাওয়ারী আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে।

৩

বিমূর্তন ভাষারই এক স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ। রবীন্দ্রনাথের উপমাই অনুসরণ করা যাক। 'বনে বাঘ বাস করে' এই বাক্য বোঝাতে যদি বাঘ ও বন সত্যিই সম্মুখে হাজির করতে হোত, তা কারো পক্ষে নিরাপদ, সম্ভবও ছিল না। তথ্য সাপ্লাই ভাষার মারফৎ কত সহজ। বিমূর্তনের সাহায্যে চিন্তার প্রসার ঘটেছে। কারণ চিন্তিত বস্তু সাক্ষাৎভাবে কোথাও নাড়াচাড়া করতে হয় না। তাছাড়া অনেক বস্তুও কায়াহীন। 'ভাল', 'মন্দ' নিয়ে নীতিশাস্ত্রবিদগণ আলোচনা করেন। কিন্তু তা তো বস্তু নয়। তবে আলোচনা চলে কিভাবে? বিমূর্ততা এখানে বিশেষ সহায়।

এই পদ্ধতির আরো সুবিধা, সব বস্তু যেমন চোখের সামনে খাড়া করতে হয় না, সকল বস্তুর প্রকারগত পার্থক্যও বাদ দেওয়া চলে। কুকুরের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ আছে। এমন কি একই শ্রেণীর কুকুরের মধ্যে আবার অবয়বগত পার্থক্য থাকে। সব এ্যালসেশিয়ান দেখতে এক রকম নয়। তবু কুকুর শব্দ দ্বারা এই শ্রেণী বোঝানো সম্ভব হয় কেবল বিমূর্তন (abstraction) ক্ষমতার সাহায্যে।

অবিশ্যি বিমুর্তনের নানা স্তর আছে। নামকরণ বোধ হয় সবচেয়ে নিম্ন স্তরের। ক্রমশ উর্ধ্বে পৌঁছানো যায় বিষয়বস্তুর খেই পাকড়ে, উদ্দেশ্য অনুযায়ী। একটা উদাহরণ :

১। ময়মনসিংহ নিবাসী জয়নুল আবেদীন তৈল ও জল-রঙে ছবি আঁকেন।

২। জয়নুল আবেদীন বাঙালী চিত্রশিল্পী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩। জয়নুল আবেদীন প্রাচ্য মনের অধিকারী যদিও রেখা-সৌষ্ঠবে তিনি মোদিল্লিয়ানীর বস্ত্রহীনাদের চোখের সামনে রাখেন।

৪। জয়নুল আবেদীন অঙ্কনে প্রতীচ্য; মননে প্রাচ্য ধারার অনুসারী।

ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী বিমূর্তনের একটা উদাহরণ দিলাম। যদিও দার্শনিকদের বিমূর্তন আরো জটিল। কারণ, তাঁরা বিমূর্তনের আবার বিমূর্তন ঘটান।

এই পদ্ধতি ছাড়া মানব-সমাজের বিস্ময়কর অগ্রগতি কোন কালেই সম্ভব ছিল না। গণিতের অপর নাম গ্রামাঞ্চলে আঁক্। আঁক্ কষে দেখলাম, অর্থাৎ অঙ্ক কষে দেখলাম। আঁক অঙ্কনের অপভ্রংশ। অথচ বর্তমানে অঙ্ক এবং অঙ্কনের ফারাক কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। অঙ্ক এবং অঙ্কন এক যুগে ছিল একই পদ্ধতিভুক্ত। ছেলেবেলায় আমার গ্রামে এক কলু আসত। বেঁটে, বেশ মাংসল কালো চেহারা। নাম শশী। সে পাড়ায় পাড়ায় তেল ফেরি করত। কখনও নগদ, কখনও ধারে। খাতকদের জন্য সে ব্যবহার করত ছোট শ্লেট। তার উপর সে আঁক (দাগ) কেটে রাখত। মাসের শেষে হিসেব। শশী লেখাপড়া জানত না। অথচ হিসেব এইভাবেই চালিয়ে যেত। এখানে দাগ তেলের পরিমাপের বিমূর্তন। প্রতীক বাইরের জগতের সংবাদ সরবরাহ করছে। গণিতের X, Y আবার সংখ্যা বিমূর্তন। অর্থাৎ বিমূর্তনের বিমূর্তন। আরো এক ধাপ উঁচু।

চিন্তার নানা সৌকর্য্য এই বিমূর্তনের খেলায় সত্যি চমক লাগায়। 'মুখ'-এর বিমূর্তনের কত কী ঘটে, দেখা যাক : ১। রজব ব্যারিস্টার হবে কিন্তু মুখ নেই। ২। ফোঁড়াটা মুখ নিয়েছে। ৩। অসৎকে মুখ দিতে নাই। ৪। হাত থাকতে আর মুখ কেন। ৫। তাঁর গৌরবে দেশের মুখ উজ্জ্বল। ৬। মুখে মুখে কথা হোলো অথচ এখন স্বীকার যাচ্ছে না। ৭। বাড়িটা পশ্চিম মুখে। ৮। অসতী হোয়ে কি মুখ নিয়ে আমি স্বামীর সামনে দাঁড়াব? ৯। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ১০। সলিম মাদবর গাঁয়ের মুখ। ১১। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা, মুখ খারাপ করছ কেন? ১২। মুখে মধু হাতে ছুরি। ১৩। নদীর মুখে নৌকাডুবি হলো। ১৪। যাওয়ার মুখে টিকটিকে ডাকল। ১৫। শত্রুমুখে ছাই পড়ুক। ১৬। গোস্বায় আমার মুখ ছুটল। ১৭। কথার মুখেই বলে বসল "হবে না।" ১৮। অনুনয় করলাম মুখ রক্ষা হল না। ১৯। বড় ফখরদালালি করত এখন লজ্জায় মুখ চুন। ২০। প্রিয়তমে, মুখভার করো না। ২১। প্রভু, মুখ তুলে চাও। ২২। মীর জাফর মুসলমানদের মুখে চুন কালি মেখে দিয়ে গেছে। ২৩। মুখ সামলা নচেৎ হাডিড আস্ত থাকবে না। ২৪। কারো মুখ চেয়ে আমি কথা বলি না। ২৫। অপরের মুখ চেয়ে কিছু হয় না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো।

এইভাবে বিমূর্তনের ম্যাজিক অগ্রসর হয়। স্মৃতি থেকে কয়েকটি উদাহরণ মাত্র পরিবেশিত।

বিমূর্তনের এই প্রতিক্রিয়া মানুষের আদিম সমাজের প্রতিচ্ছায়া। সেই যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষঙ্গ বা association ছিল চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ ধাঁচ। তাই আজও গ্রাম এলাকার কোথাও কোথাও সাঁতার শেখার জন্যে ছোট পিপড়ে ভক্ষণ রেওয়াজ আছে। কারণ, পিপীলিকা পানিতে সহজে ডোবে না। তেমনি প্রথম দাঁত ভাঙলে ইঁদুরের গর্তে দাও। মূষিকদন্তের পরিপাটী ও ধারালো রূপই এই সিদ্ধান্তের পেছনে কার্যকর। তাই মুখ চুন হয় লজ্জায়। ফ্যাকাসে মুখের রং তো সাদা। তেমনই, মুখ ছোটে।

এখানে নরত্ব আরোপের লক্ষণও কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। মুখ আবার দৌড় মারে নাকি। চরিত্র সন্ধানে এগোলে এমনি অতীতের নানা উঁকিঝুঁকি এসে পড়তে বাধ্য।

কিন্তু বিমূর্তনের বিভ্রান্তি থেকে নানা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মজার ব্যাপার সেখানে আদিম এবং বর্তমান সভ্য মানুষের কোন তফাৎ নেই। বাংলা প্রবাদ :

দরবারে হেরে
ঘরে এসে বৌকে মারে।

আহা, বেচারা বৌ! নিরপরাধ অথচ শাস্তি যাচ্ছে তার উপর দিয়ে। চৌকি বা চেয়ারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে মারলাম এক লাথি। এই পরিস্থিতিকে বলা হয় বিমূর্তনের উদ্‌ভ্রান্তি।

দরবারে ভদ্রলোক অসম্মানিত। তাঁর মাথার মধ্যে দরবারের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা ঘুরছে। বাড়ী এলে, বৌ সামনে পড়ল। দিলেন তাকে পিটিয়ে, যে বেচারা নিরপরাধ। এখানে ভদ্রলোক মাথার মধ্যে যে বিমূর্তন চলছে তাকে ঘুলিয়ে ফেলছে বাইরের বিমূর্তনের সঙ্গে। মাথার মধ্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রোশ চলছে। কিন্তু শাস্তি দিচ্ছে একজনকে যে শত্রু নয়ই বরং পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই উদ্‌ভ্রান্তি থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তিনি বলছেন, বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ আদিম মানুষ ভয় এবং উদ্বেগে মুহ্যমান। এই ভয় এবং উদ্বেগকে জগতের উপর প্রক্ষেপ করে আদিম মানুষ তার উপর আবার নরম আরোপ (Personalize) করত। তখন রুদ্র, অমঙ্গলের দেবতা সেই প্রাকৃতিক সব বিপর্যয়। তারপর শুরু হয়, তাদের প্রসন্নতা-লাভের আশায় উদ্দেশ্যে বলি, অর্ঘ্য ইত্যাদি। নিজেদের বিমূর্তনকে আদিম মানুষ মনে করত বাস্তব। ঘুলিয়ে ফেললে তখন এমনই পরিস্থিতি দেখা যায়।

গুজবের কথা ধরা যাক। এই ক্ষেত্রে বিমূর্তনের ক্রমশ উচ্চস্তরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে পরে কিন্তু সব ঘুলিয়ে যায়। প্রাবাদিক কাহিনী স্মরণ করুন ঃ

১। রাণী একটা কালো ছেলে বিইয়েছে।
২। রাণী ছেলে বিইয়েছে কাকের মতো কালো
৩। রাণী একটা কাউয়া (কাক) বিইয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। রাণীর পেট থেকে ফরফর শব্দে শুধু কাউয়া বেরুচ্ছে।

এখানে লক্ষণীয়, বক্তা বিমূর্তনের পথে স্তর ঘুলিয়ে ফেলেছে। অবিশ্যি উৎপ্রেক্ষার মানসিকতা পেছনে কিছুটা আছে বৈকি। জনসাধারণ অনেক সময় শাসকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা এইভাবে প্রকাশ করতে যায়। কানাকানি বা হুইস্‌প্যারিং ক্যাম্পেন এ যুগেও একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার।

ফল যা-ই হোক বিমূর্তন ভাষায় একটা বিশেষ ক্রিয়াকলাপ। কুসংস্কার সৃষ্টি হয় এই বিমূর্তনের হেরফেরে। মাফ করবেন, যাদের বাড়ি চাটগাঁ বা নোয়াখালী। জেলাওয়ারী বিদ্বেষ পোষণ নিতান্ত আদিম, ট্রাইব্যাল বা গোষ্ঠিক মনের পরিচয়। এমন গন্ধ আমার ত্রিসীমানায় পৌঁছায় না। উক্ত দু'জেলার অধিবাসীদের মধ্যে একটা রেষারেষি ভাব আছে। কোন জেলার নাম শুনামাত্র শ্রোতার মনে কতগুলো ছবি ভেসে ওঠে-যা আদৌ মনোমুগ্ধকর নয়। শুধু নোয়াখালী বা চাটগাঁ-এই শব্দ শোনা মাত্র ওই প্রতিক্রিয়া। সমাজ তত্ত্ববিদেরা বলেন, আদিম মানুষ এই পদ্ধতিতেই বিচার করত। এই হচ্ছে আদিম ন্যায়শাস্ত্র বা Primitive logic। শব্দের মধ্যেই যেন সব সন্নিবিষ্ট। শব্দের এমনই যাদুগুণ আছে। ইংরেজি grammarian বা বৈয়াকরণিক শব্দ এসেছে gramerye শব্দ থেকে। গ্রামেরি মানে ইন্দ্রজাল বা Magic শব্দের উপর এমন পবিত্রতা আরোপ ছিল আদিম মানুষের কাছে সহজাত ব্যাপার। পূর্বে তাই অসুখ ব্যাধি সারত মন্ত্রের জোরে। এখনও মফস্বল এলাকায় সর্প দংশনের প্রতিষেধক, সাপুড়ে মন্ত্র। মন্ত্র তো কথা। সুতরাং কথা পবিত্র। কবিরা পূর্বে মন্ত্র রচনা করতেন। তাই কবিরা সব রোগ-নিরাময়ে সক্ষম। সুতরাং যে 'গ্রামেরি' সেই গ্রামেরিয়ান বা বৈয়াকরণিক। এ দেশের দিকেও লক্ষ্য করুন। কবিরাজ অর্থ প্রাচীনকালের ডাক্তার। তাই না? কবিরাজ বড়ি দেন রোগ সারান। কিন্তু কবিরাজ শব্দটা সমাস করুন। ব্যাসবাক্য-কবিদের মধ্যে যিনি রাজা। এক কালে যিনি কবি ছিলেন তিনিই কবিরাজ ছিলেন। আজ আর তা হয় না। সভ্যতার সিঁড়ি শ্রমবিভাগের (division of labour) পথে সব প্রাচীন সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে। কবি এবং কবিরাজ (বর্তমানে ডাক্তার) দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু ভাষার মধ্যে প্রাচীন সম্পর্ক চমৎকার আত্মোগোপন করে রয়েছে। নজরুল কবিরাজ হোলে, ব্যাধিগ্রস্ত তাঁর জীবনের উপর দিয়ে কি এমন অভিশাপ বয়ে যেত?

এবার আসল কথায় আসা যাক। নোয়াখালী, চাটগাঁ। ওই শব্দে দুই জেলার লোক পারস্পরিক মেজাজ হারায়। কারণ ওই শব্দের সঙ্গে তাদের মানস জগৎ জড়িত। আদিমভাবেই জড়িত। বিচারশক্তির ক্রমশ লোপ। নোয়াখালী কি চাটগাঁর কোন লোক প্রচুর দান খয়রাত করল। বিরুদ্ধ জেলা বলবে, "ব্যাটা দেশের কলঙ্ক ঘুচোচ্ছে।" যদি কোন ছেলে পরীক্ষায় ভাল করে তখন বলবে, "ব্যাটা টুকেছে।" অর্থাৎ প্রতিপক্ষ জেলার ভাল কিছু থাকতে পারে তা তাদের ধারণার বাইরে। সোজা কথা, বিচার-শক্তি আর ঠিক থাকে না। বিমূর্তনের ধারা সম্পর্কে তাই সতর্কতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলম্বন বিশেষ জরুরি। কয়েকটা শব্দ-শ্লোগান হঠাৎ এক এক যুগকে পেয়ে বসে। তা আবার দূর হয়ে যায় ইতিহাসের তাগিদে। তা অনেকে খেয়াল করতে পারে না। অবিশ্যি বলে রাখা ভালো, কৃষিপ্রধান দেশে ওই জাতীয় মানসিকতা খুব স্বাভাবিক। একই গ্রামে, 'উত্তর পাড়া-দক্ষিণ পাড়ায়' খুনোখুনি হোয়ে যায় না? তা ওই আদিম মানসিকতার জের। আমাদের সভ্য মানুষ হোতে এখনও ঢের দেরি আছে। তথাকথিত বহু ডিগ্রিধারী সে সম্পর্কে সচেতন নয়। শব্দ তো প্রতীক। কিসের প্রতীক সেদিকে লক্ষ্য নেই। অথচ শব্দ নিয়ে মাতামাতি-হাতাহাতি শুরু হোয়ে গেল। আদিম মানসিকতার আর কি পরিচয় আছে? এক ভাষাতত্ত্ববিদ তাই এই জাতীয় মানুষদের শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন, "এরা মানচিত্রকে মনে করে দেশ। দেশের কোন খোঁজ রাখে না।"

ভুল বোঝাবুঝির কতো দিক আছে। নিজের চিন্তা সম্পর্কে বহু মানুষ অবহিত নয়। বিমূর্তন সম্পর্কে তাই অনেক কথা বলতে হোলো। অনুন্নত দেশে বিমূর্তনের স্তরও অনুন্নত থাকে। জ্ঞান বিমূর্তনের ধাপে ধাপে এগোয়। এই সোজা কথা অনেকে ভুলে যায়। "বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর" এই ধুয়ার কবলগ্রস্ত প্রায় অনুন্নত দেশ। স্বভাবতই জ্ঞান বিমুখতা সেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিমূর্তনের ক্ষমতা অনুশীলনের অভাবে লোপ পায় অথবা কোন অপ্রাকৃত বিশ্বাসের অন্তরালে লুকায়। বর্তমানে অবিশ্যি জাতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি-নানা ধুয়া কানে এসে পড়ে। কেতাব পর্যন্ত লেখা হয়। কিন্তু সেই রচনা বিমূর্তনের একটা সাধারণ বেড়া পর্যন্ত ডিঙোতে পারে না। স্বকপোলকল্পিত চিন্তারাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর নৌকা বটে। এই জাতীয় লেখকেরা বাঁধা সৃষ্টি করে। জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতা ছড়ায় বেশি। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার দৈন্য এই জন্য প্রকট। কারণ বহুকালের জ্ঞানবিমুখতার জের। ফলে, আঁচ করে করে চলা অভ্যাস। যাচাইয়ের খসলৎ এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি।

বিমূর্তনের মতো নেতিকরণের (negation) প্রয়োজন আছে। ভাষার ক্ষেত্রে। নঙর্থক, সদর্থক (positive) চিন্তা কেই রুপেয়ার এ পিঠ-ও পিঠ। আলো-অন্ধকার যমজ ভগিনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে। একটা উদাহরণ। 'দেবদেবী আকাশে বাস করে।' এই বাক্যে দেবদেবী বিমূর্তিত শব্দ। তারা নিরাকার। এই গুণ নেতিকরণের ফলে। অর্থাৎ দেহ নেই। এই নেতিকরণের ক্ষমতা না থাকলে ওই বাক্য সৃষ্টি হোত না। সাধারণীকৃতি (generalization) বিমূর্তন আরো উর্ধ্বস্তর। গোটা বাক্য কেবল একটা শব্দের বিমূর্তন নয়। বরং অন্য শব্দ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিমূর্ত নয়। শুধু শব্দের ক্ষেত্রে নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ত্রয়ী প্রক্রিয়া নিতান্ত বাধ্যতামূলক। বিমূর্তনের শক্তির অধিকারী মানুষ প্রতীক, সিম্বল গড়ে তোলে। ভাষা নিজেই প্রতীক, তা আর দ্বিরুক্তি করে লাভ নেই। প্রতীক সম্পর্কেও তাই কিছু আলোচনার দরকার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

একটু পেছন ফিরে তাকাতে হয়।

একটা হাজার টাকার নোট। সামান্য কাগজ আর তার ওজনই বা কতো। কিন্তু লাল রঙের এই কাগজটুকুর ব-দৌলত হালফিল-বাজার দরে কতো কী না কেনা যায়। বিশ-পঁচিশ মণ চাউল, তিনটে ভাল স্যুট, একটা সাদা লুঙ্গি, বিশ জোড়া দামি জুতো-এমন নানা দ্রব্য আপনার তাঁবে এসে পড়ে ওই সামান্য কাগজের ব-দৌলতে। কিভাবে তা সম্ভব হচ্ছে?

স্টেট ব্যাঙ্কের লাট সাহেব মহ্‌বুব রশ্‌শীদের সই করা একটা কাগজ। তার এত দাপট! এমন কী হাজার টাকায় যত জিনিস কেনা যায়, তারই ওজন লাট সাহেবের ওজনের বহু গুণ। অথচ কাগজটার ওজনই নেই। জোর কয়েক রতি। আর কাগজের দামও নেই বললে চলে।

এই অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে, তার কারণ, আমরা সকলে মেনে নিয়েছি, ওই কাগজের দাম পাঁচশ রূপার টাকার সমান। এই সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলে, নোটখানা চোথা কাগজ হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে এই নোট কেউ এক পেনি দিয়েও কিনবে না।

সামাজিক স্বীকৃতির সাহায্যে যখন কোন জিনিসকে অন্য বহু জিনিসের পরিবর্তে খাড়া করা হয়, তখন তাকেই বলা হয় সিম্বল বা প্রতীক। পূর্বোক্ত উদাহরণে পাঁচশ' টাকার নোটখানা, পাঁচশ রৌপ্য মুদ্রার প্রতীক। মুদ্রা অবিশ্যি ক্রয়শক্তির প্রতীক। তাই নানা জিনিস ওই প্রতীকরূপী নোট দিয়ে কেনা চলে।

এখানে প্রতীকের আর এক স্তর লক্ষ্য করা গেল। রূপার টাকা ক্রয়-শক্তির প্রতীক। আর নোট রূপার টাকার প্রতীক। অর্থাৎ প্রতীকের প্রতীক। প্রতীকের নানা স্তর আছে। বহু প্রতীকের আবার এক প্রতীক থাকতে পারে। যেমন ১, ২, ৩ . . . ইত্যাদি সংখ্যা তো নিজেই প্রতীক। কিন্তু বীজগণিতে কি হয়, তখন ক, খ . . .এক্স, ওয়াই দিয়ে পুনরায় সংখ্যাগুলোর প্রতীকীকরণ ঘটে।

আবার লাট সাহেবের সই করা নোটের কথা ধরা যেতে পারে। লাখ লাখ প্রতিটি নোটে লাট সাহেবের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সই দেওয়া অসম্ভব তখন তার সইয়ের প্রতিলিপি অন্য নোটে ব্যবহার করতে হয়। পরবর্তী সই তখন আসল সইয়ের প্রতীক-যদিও মানে ঈষৎ খাটো। প্রতীকের প্রতিলিপি। তেমন আবার নাকি প্রতীকের প্রতীক আছে। একদম তৃতীয় স্তর। গণিত শাস্ত্রে এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে, বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনেছি।

মোদ্দা কথা, প্রতীক ছাড়া সমাজ-জীবন অসম্ভব। সাধারণ সুবিধার দিক আছে না? লাখপতিদের যদি ব্যবসা-উপলক্ষে লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হোতো, তাহলে তারা নিশ্চয় গাধা হওয়ার প্রার্থনা জানাত। কারণ লাখ টাকা মাথায় চাপালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাড় নিশ্চয় ভাঙত। প্রতীক তাই নেহায়ৎ গরজেও প্রয়োজন।

প্রতীকের আরো চেহ্‌রা আছে। কাপড়-চোপড় পর্যন্ত সিম্বলের দোসর। কাপড়-চোপড় থেকে মানুষের সামাজিক স্থান নির্ণয় কঠিন কিছু নয়। দু-এক জায়গায় যে ব্যতিক্রম ঘটে, তা আইনকে বলবৎ করে। লেবাস, সুরৎ দেখে বলা যায়, লোকটা কুলী, না মিয়া, কি সাহেব, এমন কী কোন ধর্মপন্থি নির্ণয় সহজ। হ্যাট কোট পাৎলুন-খ্রিস্টান। অবিশ্যি বর্তমান ওই লেবাস আন্তর্জাতিক হওয়ার ফলে কিছু অসুবিধা ঘটছে। পঞ্চাশ বছর আগে এই হাঙ্গামা ছিল না। আচকান পাজামা ইসলাম ধর্মী। মাড়োয়ারি আচকানের তলায় ধুতি পরে। চেহারা লেবাস আর, শ্রেণী, ধর্ম ইত্যাদির প্রতীকে পরিণত। আরো সহজ ধূমপানের ক্ষেত্রে। বিড়ি, বগ সিগারেট, ক্যাপস্টান, থ্রি কাসল প্লেয়ার্সের প্যাকেট-বান্ডিল হাতে দেখে বোঝা যায়, কোন শ্রেণীর লোক। অবিশ্যি ব্যতিক্রম থাকে। কোম্পানির কোন সাহেবকে জানতাম যে বগলা সিগারেট খেত। বিড়ি, বগ, আপামর জনসাধারণ। ক্যাপস্টান মধ্যবিত্ত নিম্ন বা মাঝারি আয়ের লোক। দামি সিগারেট প্রশাসক অথবা আরো উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতীক।

প্রতীকের প্রভাব এমনই সর্বাগ্রাসী। শুধু তা-ই নয়, মানুষের আবেগ যেন তার মধ্যে জমাট রূপ পায়। কবিকুল কথার সাহায্যে দেশময় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কারণ তারা জানেন প্রতীকের সেই ব্যবহার যা মনকে অমন দুলিয়ে দিতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে একটা পতাকা নিয়ে কম রক্তক্ষয় হয় না। অথবা নিশান তো একগজ কি দু'গজ কাপড় মাত্র! কিন্তু আবেগ সেখানেই যেন বাসা বেঁধেছে। তাছাড়া শান্তি নেই মনে।

এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হোলেও একটা কথা বলা দরকার। আবেগ প্রতীকের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কিন্তু প্রতীক তো সামাজিক স্বীকৃতির সাহায্যে তৈরি-কতগুলো সুখ-সুবিধা কি ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্য। কালে কালে কিন্তু দেখা যায়, যে উদ্দেশ্যে ওই প্রতীক-সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্যের প্রয়োজন মিটে গেছে। কিন্তু প্রতীক অনড় বসে আছে। তখন বরং জীবনের মোকাবিলার জন্য ওই প্রতীক বদলানো উচিত। কিন্তু কাজের বেলা অত সহজে তা ঘটে না। প্রতীক মানসলোকে তখন এমন চেপ্টে বসে থাকে ঠিক জোঁকের মতো যে তা আর নড়ানো কঠিন। তখন এই কাজে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন সকলের তেমন মনের জোর থাকে না। আর পরিবেশও হয়ত তেমন মন গঠনের অনুকূল নয়। এই ক্ষেত্রে তখন যদি কেউ ওই প্রতীকের উপর হাত দেয়, যে কোন ব্যক্তি হিংস্র হন্যে হয়ে পড়ে। অনেক সামাজিক গোলযোগের কারণ এইখানে নিহিত। রক্ষণশীলতা এবং প্রগতিশীলতা আর কিছু নয়-সামাজিক সচলতার ইতিহাস। অচল মনপুরাতনকে আঁকড়ে থাকে, সচল মন নতুনকে গ্রহণ করে। কিন্তু এসব ঘটে আরো বৃহত্তর সামাজিক কারণে পূর্বেই বলেছি। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া প্রতীক-গঠন অসম্ভব। সমাজ থাকে সব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুর অন্তরালে। অনেক ক্ষেত্রে এক জাতের প্রতীক কিছু লোককে পারলৌকিক সুখ ছাড়াও ইহজাগতিক সুখ কম দেয় না। হয়ত আবার অনেকে দুই সুখ থেকেই বঞ্চিত। এমন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব না বেধে পারে না। যদিও উপরে দেখা যায় প্রতীকের লড়াই, আসলে তা বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রাম। অর্থাৎ ফোঁড়ার মুখ ছোট, কিন্তু মূল ঢের লম্বা।

চলতি কথায় যাকে বলা হয়, গোঁড়ামি, তার হদিস সামান্য তলিয়ে দেখলে প্রতীক-জাত সমস্যা বোঝা কিছু সহজ হোতে পারে। নিজের চিন্তাকে পটভূমি বাদ দিয়ে সর্বৈব মানাই হচ্ছে গোঁড়ামি। কেন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায়? ব্যাপারটা অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক। অনেকে এক ধরনের প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কোন সন্দেহ প্রশ্ন নেই তার মনে। বালক কাল, কৈশোরে যৌবনে সে এমনই দেখে আসছে। ফলে, তার মনের একটা প্যাটার্ন বা নক্‌শা গড়ে যায়। যখনই বিপরীত বা অন্য প্রতীকের মুখোমুখি সে আসে যা তার প্রতীককে সন্দেহশ্লিষ্ট বা হীনপ্রভ করে তুলবে, তখনই সে অসহিষ্ণু হোয়ে পড়বে। আর সহ্য করতে পারবে না। হন্যে তো দূরের কথা, জীব-জন্তুর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বর্বরতার ক্ষেত্রে। কেন এমন হয়? তার কারণ, ওই বাছ-বিচারহীন জমাট আবেগ। মানুষের দুই রকম সম্পদ প্রয়োজন অস্তিত্বের জন্যে। প্রথম, জাগতিক। বাড়িঘর, জমি-জিরেত ইত্যাদি। দ্বিতীয়, মানসিক। ধ্যান ধারণা, ভাবনা, বিশেষ অনুভূতি ইত্যাদি। উভয়ের প্রতিই তার লালন-পালন-সিক্ত দরদ আছে। বাড়ি থেকে তাকে কেউ উচ্ছেদ করতে গেলে যেমন সে মরিয়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলবে, তেমনই মানসিক সম্পদের ক্ষেত্রে। এই জন্যে ইতিহাসে বড় মজার ঘটনা ঘটে। রোমের দাস-বিপ্লবী স্পার্টাকাস যখন-বিদ্রোহের পতাকা মেলে ধরল শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশে, তখন বহু ক্রীতদাস আবার স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল, তাদের গোলামির জিঞ্জির অটুট রাখতে। দাসপ্রথার উচ্ছেদে তাদের সমূহ সুবিধা, তবু দাসপ্রথা রক্ষায় তারা মনিবদের পক্ষে লড়ল কেন? তার কারণ, যুগ যুগ ছেলেবেলা থেকে যে মানসিক সম্পদ তারা পেয়েছে রোমের শাসকদের কল্যাণে-তা অত সহজে তারা হারানোর পক্ষপাতী নয়। তা থেকে তাদের নড়াতে গেলে তারা হন্যে হোয়ে পড়বে বৈকি। স্পার্টাকাস তো তাদের মানসিক সম্পদ লুটে নিচ্ছে। সুতরাং সে শত্রু। তাই স্পার্টাকাস পরাজিত হয়। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, নানা চক্রের এক শ্রেণীর লোক Conditioned বা পরিবেশয়াতি হোয়ে পড়ে। তখন তারা সমাজ ব্যবস্থার জড়-সম্পদে পরিণত হয়। সেই ব্যবস্থা তাদের লাভ বা অনিষ্ট সাধন করছে, তা তারা ভাবতে পারে না। প্রতীকের সাহায্যে আবেগের এমন জমাট রূপ দেওয়া যায়। আবেগ সজীব। কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্ধ। তখন অন্ধের যে দশা ঘটে, তাই ঘটতে থাকে। ইতিহাসে এমন বহু নজির আছে।

নাটক-সিনেমা ইত্যাদি প্রতীকের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ নাটক কি সিনেমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার সময় এই প্রশ্ন কারো মনে পড়ে না। মঞ্চের রাজা হয়ত পাড়ার ছোড়া গরিব, বিড়ি ফোঁকে। প্রতীকের কথা মেনে না নিলে সব ভেস্তে যায়। এখানে বিস্মরণ যেন আশীর্বাদ। গাঁটের পয়সা খরচ করে সিনেমা হলে বিয়োগান্ত করুণ কোন ছবি দেখে নচেৎ কেউ কাঁদতে কি বিষণ্ন হোতে যেত নাকি?

প্রতীকের প্রভাব আরো সর্বগ্রাসী। অনেক সময় এই মোহ আবেগকে অন্ধ করে দেয়। তখন মনুষ্যত্ব সহজে হারিয়ে ফেলা সম্ভব। মানুষ কীভাবে কৃপণ হয়? সমাজে সে দেখে টাকা ছাড়া মানমর্যাদা, আরাম-আয়েশ কিছুই মেলে না। অর্থাৎ মুদ্রা তখন ঐ সবের প্রতীক। তাই সে টাকা উপার্জনে মন দেয়। তার রোজগারের আসল উদ্দেশ্য : মান-মর্যাদা, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি। কিন্তু উপার্জনকালে তার লক্ষ্য থাকে কেবল টাকার ওপর। অর্থ সঞ্চয়ে প্রথমে সে কৃচ্ছতা সাধন শুরু করে। ভাল কাপড় পরে না, ভাল খায় না; কারণ, মুদ্রা-সংগ্রহ-যে মুদ্রা তাকে পরে আরাম আয়েশ ইত্যাদি এনে দেবে। কিন্তু দেখা যায়, উত্তরোত্তর মানসিক অভ্যাসের ফলে, কৃচ্ছতাসাধনই তার কাছে সর্বস্ব হোয়ে ওঠে। তখন প্রতীক (এখানে মুদ্রা) তাকে গিলে ফেলছে। পরিবেশ আর তার দাস নয়-যা সজ্ঞান মানুষের কাম্য। সে তখন পরিবেশের গোলাম। অর্থাৎ মনুষ্যরূপী যন্ত্র। মানমর্যাদা, আরাম-আয়েশের দিকে আর তার লক্ষ্য নেই। টাকাই সব কিছু। অর্থাৎ প্রতীকই সর্বস্ব। একরোখা আবেগ মানুষকে এমনই মানসিক ব্যাধির গর্তে ঠেলে দেয়। গোঁড়া ব্যক্তিও এই পর্যায়ে পড়ে। তবে তার রোগ আসে প্রতীকের অন্য সড়ক ধরে।

প্রতীকের বিশদ বয়ান নয়। কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা গেল মাত্র। কারণ ভাষা তো প্রতীক, যেমন বর্ণলিপি আবার শব্দের প্রতীক। অবিশ্যি সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। ইংরেজের কাছে বাংলা অক্ষর হিজিবিজি, কাকের ঠ্যাং। সামাজিক স্বীকৃতি মেনে নিয়েই সে বাংলা ভাষা শিখতে পারে। নচেৎ নয়।

ভাষায় বনিয়াদ শেষ পর্যন্ত সমাজ। কিন্তু সে ঐতিহাসিক যুগের কথা। আদিম সমাজে ভাষার সূত্রপাত কোথা থেকে? কোথা থেকে এলো এই প্রতীক-সন্তান-মানুষের ওপর যার এত অপরিসীম প্রভাব?

বইয়ের বনিয়াদ খুঁজতে গিয়ে একে একে নানা সমস্যা এসে হাজির হলো। অনেক পাঠক অধৈর্য হোয়ে উঠতে পারেন। আরো কী কিছু আছে? আছে বৈকি। কারণ গোড়ার দিকেই বলছি, বই শুধু কয়েকটা ছাপা কাগজের সমষ্টি নয়। বরং গোটা মনুষ্যসমাজ, মনুষ্যজীবন। এই পর্যায়ে ভাষাতো বাদ দেওয়া যায় না। এমন প্রশ্ন ভাষা এলো কোথা থেকে?

ডারুইনের পর থেকেই গত এক শ' বছর মানুষ সব-কিছুর বিবর্তনের একটা হদিস ধরার চেষ্টা পেয়েছে। সেখানে যেমন এসেছে সমাজ, ইতিহাস, কোন ভাবাদর্শ-তেমনই হাজির হোয়েছে ভাষা। এই উৎপত্তিস্থলের সন্ধান ইউরোপে নানাভাবে চলেছে, এখনও চলছে। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে, প্রথম চেষ্টা চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন অবলুপ্ত ভাষার পাঠোদ্ধার। যেমন, মিশরের ভাষা। কিন্তু তা ভাষার উৎপত্তির প্রশ্ন নয়; কিন্তু এই পথেই তার ঠিকুজীব খোঁজে অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে। মহেঞ্জোদাড়োর ভাষার পাঠোদ্ধারে কম চেষ্টা হয়নি। তার পাঠোদ্ধার ঘটলে ইতিহসের এক বিরাট অন্ধকার দিক যেমন আলোকিত হোয়ে উঠত, তেমনি ঘটত ভাষার ক্ষেত্রে।

৫

ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কয়েকটা মতবাদ বর্তমানে জড়ো হোয়েছে। অবশ্যি সব ক্ষেত্রেই সত্যের আভাস আছে। কিন্তু পুরো হদিস বের করা কঠিন।

এমন ক্ষেত্রে অনেকেই অতীত মানব সমাজের গোড়ায় ধর্ণা দিয়েছেন। কারণ, সেখানে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। আদিম হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির যে সন্ধান পাওয়া যায়, তা থেকে প্রাচীন প্রস্তর-যুগ এবং নব্য প্রস্তর-যুগে পৌঁছতে প্রায় পাঁচ লাখ বছর কেটে যায়। পণ্ডিতরা সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তাঁরা আরো বলেন, কিন্তু মানুষের উন্নততর সভ্যতায় পৌঁছতে মানুষের এত দিন যায়নি। ক্রমশ সব যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়েছে। নব্য প্রস্তর-যুগ থেকে ব্রোঞ্জ যুগে পৌঁছানোর কাল পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ হাজার বছরের বেশি নয়। মাত্র এক হাজার বছরে মানুষ লৌহ যুগের সীমানা ছুঁয়ে ফেলেছে। তারপর ক্রমোন্নতির গতি এত দ্রুত যে চোখ ঝলসে যাওয়ার কথা। ভাষার উন্নতি কি তেমনই ভাবে ঘটেছে? তার একটা জবাব দিতে পারলেও অতীতের অন্ধকার হ্রাস পায় না। কারণ, লিখিত ভাষার প্রবর্তনের আগে কয়েক লাখ বছর কেটে গেছে। তখন কী ছিল অবস্থা? নব্য প্রস্তর যুগের আগেই গুহার মধ্যে চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়, তারা হয়ত লিখতে শেখেনি, কিন্তু সামাজিক যোগাযোগের জন্য একটা ভাষা নিশ্চয় ব্যবহার করত। কী ছিল তার রূপ? এখানে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের পদ্ধতি তাই বিশেষ বিশেষ ধারা পাকড়ে এগিয়েছে। কেউ বলেছেন, বর্তমানে যেসব আদিম সমাজ আছে, (যথা এ দেশে ত্রিপুরা, হাজং ইত্যাদি) তাদের ভাষার কাঠামো বিশ্লেষণ করলে একটা সুরাহা ঘটতে পারে। কিন্তু যদিও আদিম, তবু এইসব মানুষেরা আমাদের সমসাময়িক। উন্নততর সভ্যতার ঢেউ তাদের গায়েও কম লাগেনি। এই ক্ষেত্রে রহস্য ভেদ অত সহজ নয়। অনেকে এই পর্যায়ে তাই শিশুদের ভাষা আয়ত্ত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে কতগুলো সিদ্ধান্তে আসেন। সেই সিদ্ধান্ত পরে তারা আদিম মানবসমাজের উপর প্রক্ষেপ করেন। কিন্তু আধুনিক যুগের এক শিশুর সঙ্গে আদিম মানুষের কী মিল আছে? সব দেশেই শিশুরা একটি স্বরবর্ণের পাশে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিশিয়ে প্রথম শব্দ উচারণ করে। বা, মা, ইত্যাদি। শুধু ও-ও-ও শব্দও করতে পারে। তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় না, আদিম মানবের ভাষার উৎপত্তি কয়েকটা এই জাতীয় শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে শুরু হয়েছিল।

পর্যায়ের রকম ফের, কিন্তু পদ্ধতি প্রায় একইঃ অনেক ভাষাবিদ, জীবজন্তুর গতিবিধি, অভিপ্রায় প্রকাশভঙ্গীর দিকে নজর দিয়েছেন। তার সাহায্যে ভাষার আদিম রূপের কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বিপদ আশঙ্কায় হঠাৎ পাখি বা পশুর চীৎকার শোনা যায়। আবেগ প্রকাশেরও রীতি আছে জীবজন্তুর জগতে। কিন্তু তা কী ভাষা? ভাষার একটা উপাদান মাত্র, তা-ও নেহায়েৎ অপরোক্ষ।

এই জাতীয় মতবাদ প্রাণীতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডারুইনের প্রভাবতো আছেই। কিন্তু উক্ত পণ্ডিতদের মতো একটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ভাবভঙ্গীর প্রকাশ সোজা বাক্য উচ্চারণের সদর দরজায় নিয়ে যায়। কিন্তু ভাষার কাঠামো বিশ্লেষণ করলে সোজা চোখে পড়ে, আবেগের ভাষা এবং বিবৃতির ভাষা এক নয়। জন্তুর (ভাবভঙ্গী, শব্দ) ভাষা সর্বৈব মন্ময় বা সাবজেক্টিভ; তা কোন জিনিসকে বর্ণনা করে না বা তার নাম দেয় না; অনুভূতি প্রকাশ করে মাত্র। ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই যে মানুষের ভাষা তার আদিম কালেও কেবল আবেগ ও ভাবভঙ্গীর পর্যায়ে থেকে গেছে। (Empericism) অভিজ্ঞতাবাদের উপর জোর দিলে, অনুমানের গায়ে ঠেস রাখা সাজে না।

ভাষা তাহলে কোথা থেকে এলো?

আরো মতবাদ আছে।

কেউ কেউ মনে করেন, সঙ্গীত থেকেই ভাষার উৎপত্তি। বিখ্যাত ডেনিশ ভাষাতত্ত্ববিদ অটো জেস্‌ পার্সন এই দলের প্রবক্তা। তিনি আদিম ভাষায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখেছেন। লম্বা লম্বা শব্দ, দাঁতভাঙ্গা স্বর এবং তারি মধ্যে মধ্যে সুরেলা কম্পন। তাই তিনি মনে করেন, আদিম ভাষার সূত্রপাত সঙ্গীত-জাতীয় উচ্চারণ থেকে তখন ভাষা ছিল প্রকাশময়। কিন্তু তা যোগাযোগের জন্য তেমন কার্যকরী ছিল না। কাব্যময় সেই উচ্চারণ। সাধারণত প্রেমের ক্ষেত্রেই তার বিকাশ ঘটেছিল মনে হয়। মানুষের এই আবেগও অতি আদিম। সেই যুগেই হয়ত ভাষার উৎপত্তি। জেসপার্সন মন্তব্য করেছেন, "আদিম ভাষা ছিল, নিশাচর বিড়াল-বিড়ালনী এবং বুলবুলির প্রেমগীতির মাঝামাঝি কিছু একটা উচ্চারণ।" আবেগের ভিত্তির উপর তিনি ভাষার ঠিকুজী খাড়া করার চেষ্টা পান। সঙ্গীত ও ভাষার যোগসূত্র ছিল সাধারণ এক বৈশিষ্ট্যের উপর। সবাই জানে, পদ্যের বহু পরে গদ্যের জন্ম।

জেস্‌পার্সনের সমালোচকগণ কিন্তু এই মতবাদে আস্থা রাখতে পারেন না। তারা বলেন, ব্রোঞ্জযুগের পরবর্তীকালে হয়ত সকল ভাষার ক্রম-বিকাশের একটা ধারা পাওয়া যায়। কিন্তু কি ছিল তার আগে? সুতরাং বর্তমান ক্রমবিকাশের তথ্যের উপর নির্ভর করে, একদম গোড়ায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য। অপর দিকে দুনিয়ার কটা ভাষাই বা আমাদের জানা আছে। চলতি ভাষার সংখ্যা দু' হাজারের অধিক। তা ছাড়া আরো বহু অবলুপ্ত ভাষা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং যে-তিমিরে সেই তিমিরে।

পরিবেশকে অস্বীকার মানব-অস্তিত্বের জন্য এক দিকে যেমন শর্ত, স্রেফ স্বীকার অন্যদিকে তেমন অনর্থ। পরিবেশের আইন-কানুন জানার মধ্যে দিয়েই মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যথায়, সে পরিবেশের দাস।

ভাষার ঠিকুজির সন্ধানে এই কথাগুলো মনে রাখা দরকার। আদিম মানবের পক্ষে পরিবেশের নিপীড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দলবদ্ধ না হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নচেৎ জীবজন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তার মুক্তি কোথায়? এক দিক থেকে দেখতে গেলে প্রকৃতি বিজয়ই মানব-সভ্যতার আসল কথা। কিন্তু প্রকৃতিকে সে কি দিয়ে জয় করবে? জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। এই লড়াইয়ে হাতিয়ার ছাড়াও চলে না। আদিম মানবের জ্ঞানের জগত এবং হাতিয়ারের জগৎ পরস্পরের পরিপূরক। সংঘবদ্ধতা তো সংগঠন। অস্তিত্বের তাগিদেই এসব এসেছে। তা আজ আর কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু সংঘবৃদ্ধতার যোগাযোগ সেতু কোথায়? তখনই আসে ভাষার কথা।

হোক অঙ্গভঙ্গী, কোন রকমের ইশারা, কিন্তু সংঘবদ্ধতা টিকিয়ে রাখতে, মানুষকে ভাব প্রকাশ করতে হোয়েছে। নৃতত্ত্ববিদগণ আদিম মানবের করোটি থেকে তার নানা হদিস বের করেছেন। জীবন-ধারণের সহযোগিতা নচেৎ সম্ভব ছিল না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাই প্রয়োজন হয়েছে ভাব প্রকাশের। নানা মেহনতের সূত্র ধরে আজ তা বোঝা যায়। এদেশে সংস্কৃত ধাতুগুলো এই প্রমাণের প্রকৃষ্ট সহায়। সমাজ ইতিহাসবিদগণের রচনা সাক্ষ্য দেয়, সামাজিক শ্রমই-ভাষার জন্মদাতা। সংস্কৃত মৃ ধাতুর অর্থ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা, পিষে ফেলা। তা থেকে উৎপন্ন শব্দ মৃত্তিকা (যেহেতু গুঁড়ো গুঁড়ো করা যায়, মৃগ থেৎলে থেৎলে হত্যা করা হয়)। তেমনই মর্দন, নৃত্য শব্দ ইত্যাদি। এক আদিম জগতের ছবি গড়ে তোলা যায় শুধু ঐ নৃ-ধাতুর সাহায্যে। তেমনই হৃ ধাতু থেকে হৃদয়, হরিৎ হরিণ প্রভৃতি শব্দ; এমন কী হল্লা। এখানে আদিম মানুষের শিকারের ছবি সহজে ভেসে ওঠে।

আধুনিক সঙ্গীতবিদগণও মনে করেন গানের সূত্রপাত সেই একই জায়গা থেকে : সম্মিলিত শ্রম। এখনও কোন ভারী জিনিস সরিয়ে ফেলতে মজুরেরা যখন হাঁক তোলে হেঁইয়ো ... হেঁইয়ো, তখন আদিম মানুষের যৌথ-জীবন আন্দাজ করা যায়। এই সম্মিলিত কণ্ঠ শুধু প্রেরণা যোগায় না, মানুষকে দেয় শ্রমলাঘবের এক উদ্দীপনা, যার ফলে সে কাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। পণ্ডিতরা মনে করেন সমস্ত চারু শিল্পের ভূমিকা এমনই মায়াময় জগত-রচনা, যার আকর্ষণে মানুষ পরিবেশের বিরুদ্ধে সহজে পাঞ্জা লড়ার উৎসাহ পায় আজও ছাদ পেটার সময় এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তখন তালে তালে পেটায়ের কাজ শুধু যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাই নয়, মজুরদের ক্লান্তি আর অত পেয়ে বসে না। আজও গ্রামাঞ্চলে ভূতের ভয়-কাতুরে মানুষ রাতে অন্ধকারে একা মাঠ পেরোতে গিয়ে হঠাৎ গান ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে। যদিও নিঃসঙ্গ তবু গানের সাহায্যে সে বহু মানুষের সান্নিধ্য পাচ্ছে-যেখানে ভূতের প্রশ্ন ওঠে না। ভাষার ভূমিকা কী তেমনি কিছু ছিল? তার জবাবে আবার হালফিল জগতে ফিরে আসতে হয়। কারণ, সেখানে নানা পরিত্যক্ত ছিটোফোঁটা দিয়েই প্রাচীন ভাষার জন্মবৃত্তান্ত রচনা করা যেতে পারে।

৬

ভাষার ঠিকুজী নিয়ে যেমন আছে জল্পনা-কল্পনা, তেমনি আছে নানা মতবাদ।

সঙ্গীতের সূত্র ধরে ভাষার জন্মকথা বলার চেষ্টা। একটু আগে আলোচিত। প্রায় তার কাছাকাছি যায় আর এক মতবাদ। এই পন্থী মনে করেন, অঙ্গভঙ্গী থেকেই ভাষার সূত্রপাত। একথা ঠিক, বর্তমান সভ্য সমাজেও ইশারা-ইঙ্গিতের রেশ বর্তমান। হাত-পা নেড়ে গলার স্বরের নানা বিকৃতির ভেতর দিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়। আনন্দের চোটে দাঁত অনেকখানি বেরিয়ে আসে ঠোঁটের আগল ছেড়ে। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ করা যায় না, অঙ্গভঙ্গী থেকে ভাষা বেরিয়ে এসেছে।

এই মতবাদীদের যুক্তিতর্ক শোনা যেতে পারে। তারা বলেন, প্রাচীন ভাষার মূল কয়েকটা ধাতুর দিকে চোখ রাখলে স্পষ্ট হয়ে পড়ে অঙ্গভঙ্গীই ভাষার জনক। যেমন "খাও"। এই অনুরোধ বা আদেশের সময় অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করো, দেখবে, আহারকালে মুখের ভঙ্গী ওই অবস্থায় আসে। ছোট ছেলেরা কোন মজার খাবার খেলে আনন্দে সমস্বরে বলে উঠে। "চাকুম চাকুম"। এই শব্দের কিন্তু খাওয়ার ভঙ্গীর সঙ্গে মেলে। আবার যখন আদেশ বা কাউকে অনুরোধ করা হয়, "চলো" তখন ঠোঁটের ভঙ্গী লক্ষ্য করো, দেখবে, ঠোঁট এগিয়ে গেছে। যেন আগে থেকেই রাস্তা দেখাচ্ছে। এই পণ্ডিতদের আরো যুক্তি যা তারা খুব জোর দিয়ে বলেন, তা আরো মজার। এই যুক্তির ভিত্তি অবিশ্যি মানুষের কর্মকালীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী। ছোট ছেলেরা প্রথম প্রথম যখন লিখতে শেখে তখন তাদের জিভ আশ্চর্যভাবে বিকৃত হয়। হাতের সঙ্গে জিভের সম্পর্ক অবিশ্যি শরীরতত্ত্বের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ। মগজের একই প্রদেশ থেকে তার নিয়ন্ত্রণ চলে। ভঙ্গীবাদী ভাষাতাত্ত্বিকরা তাই মনে করেন, দৈহিক সঞ্চালনের নানা কৌশলই ভাষার জন্মদাতা। কিন্তু কথাতো জিভের ব্যাপার। এক অঙ্গেই তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারত। এই যুক্তির খণ্ডনে অঙ্গবাদীরা বলেন, বন্য স্তর থেকে মানুষ যখন হাতিয়ার তৈরির স্তরে এসেছে তখন আর তার পক্ষে হাত নাড়া সম্ভব নয়। কারণ কাজের সাহায্যের জন্যই কথা বলার প্রয়োজন। অথচ হাতে রয়েছে হাতিয়ার। ফলে জিভকে ক্রমশ সক্রিয় করতে হয়েছে। তারই ক্রমপরিণতি ভাষা বা কথা।

এই মতবাদ আদিম জীবনের ছবির সঙ্গে মেলে। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী এবং ভাষা কতখানি আলাদা ছিল, বোঝা মুশকিল। জীবজন্তু বিপদকালে অঙ্গভঙ্গী এবং চীৎকার দুই করে। কাজেই কোন অঙ্গভঙ্গীর উপর জোর দেওয়া কী সমীচীন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একদল ভাষাতাত্ত্বিক তেমনই জোর দেন আদিম মানুষের সম্মিলিত চীৎকার; কণ্ঠের অন্যান্য ধ্বনির উপর। আদিম মানুষ অরণ্যচারী। একশ্রেণীর উন্নত স্তরের জন্তু বিশেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু বাঁচার সংগ্রামে দলবদ্ধ। তখন বিপদে-আপদে শিকারে তাদের চীৎকার দিতে হতো। অবিশ্যি সবই যৌথ শ্রম-উদ্ভূত। এই চীৎকার বা সম্মিলিত ধ্বনি থেকেই ভাষার উৎপত্তি। আজও সভ্য সমাজে কুলীমজুর যখন কোন ভারী জিনিস সরায় বা ঐ জাতীয় কাজ করে তখন হে-লো বা হেঁইয়া-হেঁইয়া" বা ঐ রকম কোরাস তোলে। সহযোগিতামূলক সমবায় শ্রম ভাষার মূল কথা। এই তত্ত্বের যুক্তিনিষ্ট রূপ অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কিভাবে ভাষা এলো তার পুরো হদিস দান কষ্টকর। কারণ আদিম অতীতের ইতিহাস এখন সম্যক জানা কঠিন। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না, সম্মিলিত যৌথ জীবনের জন্যই ভাষার প্রয়োজন ঘটেছে। ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন না থাকলে ভাষার প্রয়োজনটা কোথায়?

আরো একটা মতের কথা বলা যায়। তারাও ধ্বনিবাদী, নন্দন-শাস্ত্র অনুযায়ী নয়, ভাষাতত্ত্ব মোতাবেক। কিন্তু এঁদের ধ্বনি কোন মানুষের নয়। বরং প্রাকৃতিক শব্দ এবং জীব-জন্তুর স্বাভাবিক স্বর। এদেশী সংগীতের সারেগামা অর্থাৎ স্বরগ্রামের উৎপত্তি নিয়ে এক কাহিনী চালু আছে যথা, সা ষাঁড়ের ডাক থেকে উদ্ভূত। তেমনই রে ময়ূরের ডাক থেকে। এই ভাবে নি পর্যন্ত। নি নাকি বৃংহতি বা হস্তীর ডাকের অনুসরণ। বুনিয়াবাদী মতে এই সব জীবজন্তুর ডাক এবং প্রাকৃতিক শব্দ যথা বৃষ্টি, জলপ্রপাত থেকে ভাষার উৎপত্তি। প্রমাণ স্বরূপ তারা, সব ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ খাড়া করেন। খচ্ খচ্ ফচ্‌ফচ্ ঝুপ্‌ঝুপ্ কটকট গট্‌গট্ ইত্যাদি প্রায় প্রাকৃতিক বা কোন স্বভাবজ শব্দের অনুকরণ। প্রশ্ন থেকে যার স্বরের একটা ব্যাখ্যা হয়ত এই ভাবে দেওয়া চলে। কিন্তু ভাষার কাঠামো কোথা থেকে এলো? ভাষা তো প্রতীক। জন্তু কি এই প্রতীক গঠন করতে পারে? সুতরাং সমস্যা মেটে না।

তবে মানুষের যৌথ শ্রম-জীবন এবং বাঁচার সংগ্রামে তৈরি হাতিয়ার যে ভাষার জনক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সুষ্ঠু কি ধারায় তার বিকাশ, তার নিখুঁত ইতিহাস গঠন এখন অসম্ভব। কারণ, হাজার হাজার বছরের কালের ব্যবধানে যে সব চিহ্ন বা আলামতের সাহায্যে প্রাচীন যুগের সমাজ পণ্ডিতরা গঠন করতে পারতেন, তার অনেক খানি মুছে গেছে। কাজেই ঈষৎ অনুমানের আশ্রয় নিতে হয় বৈকি। বিভিন্ন তথ্য-সমবায় অবিশ্যি অনুমানের বহর ক্রমশ সঙ্কীর্ণ করে আনছে। ভাষার সঠিক ঠিকুজী নির্ভর করছে আরো জ্ঞানের বিস্তৃতির উপর।

ভাষাতাত্ত্বিকদের একদল মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর ভাষার উৎপত্তি সন্ধান করেন। তার মোদ্দা কথা, মানসিক চাহিদা পূরণের জন্যই ভাষার প্রয়োজন। ভাবের আদান-প্রদানের সূত্রপাত সেইখানে। সুতরাং ভাষার উৎপত্তি ওই মানসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন্দু থেকে। সমাজেই ভাষার দরকার হয়। কিন্তু এই পণ্ডিতেরা মনের উপর জোর দিতে গিয়ে পরিবেশকে প্রায় উপেক্ষা করেন। তার ফলে, সে কোন উপজ্ঞা বা instinct এর উপরই জোর দেওয়া যায়।

তবে কোন সন্দেহ থাকে না, ভাষার ঠিকুজী শেষ পর্যন্ত ভাবের আদান-প্রদানের তাগিদ থেকেই শুরু। কিন্তু তখন পরিবেশের দিক উপেক্ষা করা যায় না। এই পরিবেশ সমাজ তা যতই হোক আদিম।

এখন সমস্যা, ভাষা এবং ভাবের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে ক্রমশ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়? কি তার রূপ? কিসে তার রূপান্তর?

৭

মেহনতের সঙ্গে ভাষার বিকাশের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্কে আজ কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং উৎপত্তির সূত্র সেখানে পাওয়া যেতে পারে এই সম্ভাবনা নানা দিক থেকে বিচার্য্য।

মানুষের সঙ্গে জন্তুর আসল তফাৎ কোথায়? বুদ্ধিশুদ্ধি জানোয়ারের একদম নেই কেউ বলবে না। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ। আদিম মানুষ এক ধরনের জানোয়ারই বৈকি। কিন্তু তার জ্ঞান-জগতের ক্রমশ এত বিস্তার ঘটল কোথা থেকে?

সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন, মানুষ হাতিয়ার তৈরির কারিগর; এখানেই তার শ্রেষ্ঠতা। আর এই ক্ষমতার বলেই সে জগতের সর্বেসর্বা হোয়ে দাঁড়িয়ে তার আদিম জন্তুত্ব-কে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। যেই মুহূর্তে লাকড়ী কি পাথরকে হাতিয়াররূপে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনে লাগাতে পেরেছে তখনই শুরু হোয়েছে সভ্যতার বিকাশের যাত্রা-গতি, যার প্রবাহ অব্যাহত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আদিম মানুষের তৈরি অমার্জিত অপরিণত, কলা-কৌশলহীন একটা পাথরের ছুরি, কুঠার (বর্তমানে সোনার পাথরবটির মতো স্ববিরোধী শোনাতে পারে) বা ঐ জাতীয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে মানব সভ্যতার বিকাশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আপাতদৃষ্টে্য এমন জিজ্ঞাসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে রহস্য-কুয়াশা ফর্সা হোয়ে যায়।

অমন হাতিয়ার সেই মাত্র তৈরি হোলো তখনই গড়ে উঠল মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি-জগতের সম্পর্ক। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হোলে, তার একটা প্রক্রিয়া-পথ আছে। অর্থাৎ কার্যের হেতু আছে। এই কার্য-কারণের সম্পর্ক সম্বন্ধে হাতিয়ার তাকে একটা সচেতনতা এনে দিলে। তখন মানুষের মানব-জগতের দরজা সশব্দে খুলে গেলে আরো বৃহত্তর বিশাল জগতে তাকে পৌঁছে দিতে। মানুষের পৃথিবী আর ইতঃক্ষিপ্ত ছড়ানো জগতে অসংলগ্ন বস্তু বা ঘটনার স্তূপ নয়। সেখানে নকশা আছে। মানুষকে অগ্র পশ্চাত দেখতে হয়। সে জানে, বিশেষ কাজের দ্বারা বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল পাওয়া যায়। হাতিয়ার তার চেতনার এই পর্যায় গড়ে তুলল। অর্থাৎ, শুরু হোলো মানুষের যুক্তিবিচার (Reasoning) প্রয়োগ। সেই যুক্তিবিচার আধুনিক মানুষের মতো জোরালো, বহুমুখী হয়ত ছিল না। কিন্তু সভ্যতার বীজের তখনই সূত্রপাত। এ্যারিষ্টটল যখন মানুষের সংজ্ঞা দিতে বলেন, যুক্তিবিচার-সম্মত প্রাণী, তখন আসল জায়গায় ঘা মারেন। এই জায়গায় না পৌঁছলে মানুষ প্রাণীই থেকে যেত। সে জগতেও বিচারবুদ্ধি আছে। কিন্তু তা সহজাত উপজ্ঞা। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অচেতন সচেতন বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভব হোয়েছে। কারণ বাঁচার সংগ্রামে হাতিয়ার তাকে জগতের মুখোমুখি এনে খাড়া করেছে। এই মোকাবিলাই তো মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি। শুধু তা-ই নয়, প্রকৃতি-মানুষ এই সম্পর্কে সড়ক ধরে বিচিত্র সম্ভাবনা এবং বিকাশের দিগন্ত উন্মোচিত হোলো। জগৎ আর বিশৃঙ্খল বস্তুর সমাহার নয়, বরং নানা সম্পর্কের জিঞ্জিরে বাঁধা-অখণ্ডতার এক ঐরাবত।

হাতিয়ার গঠনের সড়ক ধরে মানুষ প্রকৃতিকে দেখতে শিখলে। অর্থাৎ, বহির্জগৎ সম্পর্কে সচেতন হোয়ে উঠল। দার্শনিকদের ভাষায় বিষয়ীকরণ বা objectification। এই দৃষ্টি তখন মানুষ নিজের উপরও প্রয়োগ করতে শিখলে। মানুষ আপন মানব-মুকুরে নিজেকে এবার দেখতে পায়। বস্তুর সংস্পর্শে গিয়ে মানুষ তার মনকে বস্তুর মতো দেখতে শিখলে। সেখানেও কার্যকারণ অঙ্গীভূত। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের এই টানা-পোড়েনে মানুষকে তার প্রাণীদের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অনন্ত সম্ভাবনা তার সম্মুখে। কারণ, জীবন প্রবাহে মানুষ তো স্থির থাকতে পারে না। স্থিরতা অর্থ মৃত্যু। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওই স্রোতের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন ছাড়া অস্তিত্ব টেঁকে না। সমাজের উত্থান-পতনের হদিস এখান থেকে কতকটা আঁচ করা যায়। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে মেলানোর মধ্যে মানুষের বাঁচার সার্থকতা। সভ্যতা সংস্কৃতি মহিমান্বিত হয় তেমন সামঞ্জস্য বিধানের সুষ্ঠুতার উপর। যেখানে তার ঘাটতি পড়ে, সেখানে শুরু হয় অবক্ষয়। শেষ পর্যন্ত ক্ষয়। হাতিয়ার প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করতে গিয়ে মানুষের প্রয়োজন হোলো মনোযোগের একাগ্রতার। তা-কে গভীরভাবে ভাবতে হয়। তার মানস জগতের আদান-প্রদান চলে। তা-ছাড়া যুক্তি বিচারের কোন উন্নতি-ই ঘটত না। এইভাবে বহির্জগৎকে ও আত্মজগৎকে আলাদা করে দেখার শক্তি আরো বাড়ল। পণ্ডিতরা মনে করেন, মানুষের ওই বিষয়ীকরণের (objectification) শক্তি থেকেই কথার জন্ম। বিপদ-আপদে জীব-জন্তুদের চীৎকারে একটা অর্থ ছিল বৈকি। নচেৎ সতর্কতা কোথা থেকে আসত : তবে আদান প্রদানের মূল্যে অমন যৌথ জীবন থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা থেকেই নানা জটিল অর্থের সমাগম। আর যে মুহূর্তে আদিম সমাজে দেখা দিয়েছে কথা, তখনই যুক্তি বিচার পেয়েছে একটা নতুন স্থায়িত্ব। কিন্তু কথার বিকাশ কাজের সঙ্গে জড়িত। এক কথায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিম সমাজ ওই হাতিয়ার তৈরির সঙ্গে জড়িত। দুনিয়ার জটিল অসংলগ্ন প্রবাহকে শায়েস্তা করার জন্যে কথাই-ই হোয়ে উঠল মানুষের শক্তির প্রতীক। তাই তো আদিম মানুষ কথাকে মনে করত মন্ত্র-যার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। প্রাচীন যুগে সব ব্যাধি নিরাময়ের অস্ত্র ছিল কথারূপী মন্ত্র। আজও পাড়াগাঁয়ে ওঝারা সর্পদংশন থেকে অন্যান্য কত রোগ না সরায় ফুঁক ও মন্ত্রের সাহায্যে। কলেরা বসন্ত পর্যন্ত তাড়ায় ওইভাবে। কথার উপর অলৌকিকত্ব আরোপের আসল কারণ কথার সাহায্যে আদান-প্রদান সহজ, তথা কাজ সুচারুসম্পন্ন হয়, জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হাতিয়ারের উন্নতি সাধনের জন্য আরো নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সহযোগিতার জন্য ভাবের আদান-প্রদান আরো অপরিহার্য শর্ত। তাই স্বাচ্ছন্দ্যে বলা যায়, কাজ তথা হাতিয়ার ভাষার জন্মদাতা যুক্তিবিচারের জনক। যৌথ-মেহনতের তাগিদ ছাড়া তা সম্ভব হোত না। জীব-জন্তুদের কণ্ঠস্বরে নানা শব্দ ধ্বনিত হয় ভাবের আদান-প্রদানে। কিন্তু তা ভাষা হোতে পারেনি। কারণ, জগতের সঙ্গে মোকাবিলার পশুপক্ষীর হাতিয়ার প্রয়োজন কোথায়?

৮

ভাষার ঠিকুজী খুঁজতে গিয়ে তার রূপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ হয় না। সমাজ জীবনে ভাষার ভূমিকার স্বরূপ তার চেয়ে কম জটিল নয়। এক এক করে তার হদিস চষে দেখা যাক।

ভাষা রিপোর্টের মত কিছু জানায়। গাছ শব্দ উচ্চারণ করলে তার সঙ্গে একটা ছবি ভেসে ওঠে। অথবা, এই ছবি অচেতন মনের ঘটে থাকে বৈকি। যে গাছ দেখেনি বা গাছ সম্পর্কে কিছু জানে না, তার পক্ষে শুধু ঐ শব্দ নিরর্থক। পূর্বেই নির্বস্তুকরণের ব্যাখ্যার সময় তা আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু ভাষা শুধু রিপোর্ট নয়। সেখানে অনুভূতির প্রশ্ন আছে। দৈনন্দিন আটপৌরে কথাবার্তায় হয়ত রিপোর্টের কথাই থাক। 'ভাত দাও, ঘর ঝাঁট দে'। এসব কথায় অনুভূতি প্রকাশের জন্যই ভাষার প্রয়োজন হয়। অনুভূতির রঙ নিয়েই তখন তা প্রকাশ পায়। নিম্নের বাক্য কটি লক্ষ্য করা যাক :

১। তুমি যে কাজ করো, তা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

২। তুমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করো না।

৩। তুমি যেভাবে কাজ করো, তা নির্বোধের পর্যায়ে পড়ে।

৪। তুমি একটা আহম্মক, আর কাজও সেইভাবে করো।

অবশ্যি এই ক্ষেত্রে উদাহরণের সংখ্যা আরো বাড়ান যায়। সময় ও জায়গার অভাবে অতদূর এগোইনি। এখন পূর্বোক্ত চতুর্বাক্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম বাক্যে, বোঝা যায় : বক্তা নিজের বিরক্তি সৌজন্য মাখিয়ে পরিবেশন করছেন। দুই জনে সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের নয়। হয়ত প্রাচীন বন্ধু বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করছেন। দ্বিতীয় বাক্য, রক্তচাপ আর এক ধাপ চড়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে, সৌজন্য আছে, তবে তার মাত্রা স্বল্প। চতুর্থ বাক্যে বক্তা আর কোন মুখোশ পরেননি। অনুভূতির রঙ পেয়েছে ভাষা। তাই পেয়ে থাকে। ভাষার এই অনুভূতি-বাহী সঞ্চারী দিকের কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন, আটপৌরে দৈনন্দিনতার ভাষায় অনুভূতি অনুপস্থিত থাকে। মোটেই না। এখানে সমস্যা প্রাধান্যর কথা। দার্শনিকদের পরিভাষায় বলা যায়, কোথায় বিষয়ী বিষয়ের উপর নিজেকে জোরেসোরে চাপিয়ে দেয় আর কোথায় বিষয়ই প্রধান থাকে। এইখানে সোজা বলা যায়, দৈনন্দিনতার ভাষায় সংবাদ থাকে, কিন্তু জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে তা কিছু জানায় না। বাঁচার রঙ এবং আস্বাদ কেমন, তার জন্যে ধর্ণা দিতে হয় ভাষার সঞ্চারী দিকের কাছে; সাহিত্যের ভাণ্ডারের ভেতর সেই জন্যে ঢোকা উচিত। কতো রকমের কলা-কৌশল না কবি সাহিত্যিকরা যুগে যুগে ফেঁদে বসেছেন। অনুপ্রাস, ছন্দ যমক প্রভৃতি ব্যবহার খামাখা আসেনি। ছাত্র-জীবনে শ্লোগান দিতে গিয়ে দেখা গেছে, উচ্চকণ্ঠও সেখানে সাহায্যকারী। আর কোন একজন শ্লোগান-দাতা যদি কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কোরাসের নেতা হোতে পারে, তা-হোলে দাওয়াই একদম অব্যর্থ। ভাষার সঞ্চারী দিক অনেক আওয়াজেও বসবাস করে। জননেতারা কেউ বাসর-ঘরের কায়দায় ফিসফাস কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে পারেন না। মৃদুকণ্ঠ শিক্ষকের ক্লাস অনেক সময় ফিকে ঠেকে-তাঁর বাচন-ভঙ্গী যতই সুন্দর, কি বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক হোক। অবিশ্যি এসব কথা মাঠের-ঘাটের। কিন্তু সেখানেও নানা বৈচিত্র্য আছে-যা কবি-সাহিত্যিকরা অনুসরণ করেন। শ্লোগানের ভাষা ব্যাকরণ সম্মত হয় না, প্রায়ই জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

উদাহরণত : -

“আমরা চাই-গণতন্ত্র”।

“আমরা চাই-প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার”।

এই দুই শ্লোগান ব্যাকরণ সম্মত নয়। “আমরা গণতন্ত্র চাই” হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শ্লোগান দাতারা তো শুধু কথা বলতে চায় না, তারা কথা প্রত্যেকের হাড়ে জানিয়ে দিতে কোমর বাঁধে। তাই ব্যাকরণ চুলোর ভেতরে ঢোকায়। কোন বৈয়াকরণিকের কাছে মনে হবে ব্যাপারটা পাশবিকতা। কিন্তু যদি ভাষার ওই সঞ্চারীদিকের কথা জানেন, তিনি খুশী হবেন। আধুনিক কবিরা যে অনেক সময় ব্যাকরণ সিকে তোলেন কি শব্দের কিম্ভূত তকিমাকার গড়েন, যুক্তির ধারা না রক্ষা করেন, তা অক্ষমতাপ্রসূত নয়। তারা স্বধর্ম পালন করেন। ভাষার সঞ্চারী দিকের তাঁরাই তো সবচেয়ে শক্তিশালী নিশানবাহী ট্যাঁড়াদার। তাদের কাণ্ডকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখুন, ভাষার স্বরূপ বোঝা সহজতর হোয়ে উঠবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিকুল মেয়েদের চেয়েও অলঙ্কার-ভক্ত। এ কথা সকলের জানা। কিন্তু কেন তারা এই কৌশলের কাছে ধরা দেন? যুক্তির বালাই সেখানে বড় কথা নয়। ভাষার ও ভাবের সঞ্চারী দিকেই কবিদের লক্ষ্য থাকে। আবেগের অভিঘাত চুটিয়ে অপর মনে প্রবেশ করুক-এই উদ্দেশ্য কোন কবি-ই এড়িয়ে যেতে পারে না। এমন কি বাক্যের বিকৃতি সেখানে তুচ্ছ কথা। শুধু তা-ই নয়, এমন কী উপমা দিতে অজীব ও জীবের বাছ-বিচারও অবান্তর। বরং এই ভেদই মানা হয় না। তাই সহজে মৃদুমলয়ের হাত গজায় আর তার বীজন-স্পর্শে পথিকের ক্লান্তি মিটে যায়। রবীন্দ্রনাথের একটি উপমা-

রাজশক্তির বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হায় হোক লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ।
- শাজাহান

এখানে একাদিক ইমেজ কোলাকুলি-রত। রাজশক্তির সঙ্গে সন্ধারক্ত রাগের কোন সাদৃশ্য, কেবল ক্ষণস্থায়ীত্ব ছাড়া, আর কিছু যে, পাওয়া যাবে না। জাগতিক আর ঔপসর্গিক দুই ফিনমেনা Phenomena কিন্তু এই লাইনে খাড়া করা হয়েছে। আবার দীর্ঘশ্বাস পর্যাপ্ত মানুষের মতো প্রাণ-প্রাপ্ত। তাই সহজে উচ্ছ্বসিত হওয়ার অধিকার রাখে। লজিকের এমন ব্যত্যয় ঘটে ভাষার সঞ্চারী ক্ষেত্রে। অর্থাৎ অনুভূতির প্রকাশই এখানে বড় কথা। ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাই মনে করেন, কবিতা এবং খিস্তি একই মানসিক ধারায় আবর্তিত হয়। একটা উদাহরণ :

তোর মা-রে খাড়াইতে ক' আমি আহি।

(তোর মাকে অপেক্ষা করতে বল্ আমি আস্‌ছি)। খুব সহজ কথা। জঘন্যতার কোন আঁশ পর্যন্ত চোখে পড়বে না। অথচ এর চেয়ে জঘন্য গাল খুব বেশি নেই। বক্তা এখানে কবিদের মতো বেশিরভাগ উহ্য রেখে দিয়েছে, তার বিরক্তির ব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে। সেই সঙ্গে একটা নাটকীয়তা আসছে। সংগীতের তাল-ফাঁক কতটা এই জাতীয় জিনিস। বিটোফেন একবার মন্তব্য করেছিলেন, স্তব্ধতাই সর্বোত্তম সঙ্গীত। ব্যঞ্জনার তার চেয়ে আর ভালো ব্যাখ্যা নেই।

দৈনন্দিন জীবনে নানা ভাব-প্রকাশে কবিদের রীতি কম অনুসৃত হয় না। উপমা, সমাসোক্তি কত রকমে না চালু আছে।

"আমাকে ক্লাস নিতে হবে।" অধ্যাপকের এই উক্তি কিন্তু লজিকে অচল। গ্রহণের সঙ্গে নানা অঙ্গের কসরৎ আছে। হাত লাগে। বোঝা নিতে মাথার প্রয়োজন। ইঞ্জেকশন নিতে ফুলশার্টের হাতা উপরে তুলতে হয়। সুতরাং ক্লাস-গ্রহণ এই সব পর্যায়ে কী ভাবে ফেলা যায়? কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণের তালিকা থেকেই ওই বাক্য আগত। আসলে উপমা এবং কথা বাঁধুনি এসেছে সাদৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে। অবিশ্যি ভাব-প্রকাশের বাহন নিখুঁত নয়। তা-তে কী আসে যায়? অত খুঁৎ খুঁৎ করলে জীবন দুর্বিসহ হোয়ে উঠত।

সমাজে যা অশিষ্ট, ইতর বুলি নামে পরিচিত, তার ঠিকুজী কবিতা গঠনের ধারায় লিখিত। কাঁচা-খোলা, লেজে গোবরে, তালুই-পুত, ঘাটু-পোলা ইত্যাদি (ভদ্রসমাজে চালু আছে অথচ পুস্তকে নেই- বহুৎ শব্দ পরে আলোচ্য) শব্দ সম্ভার কিন্তু ভাব প্রকাশের তাগিদ থেকেই এসেছে। উপমা, সমাসোক্তির ব্যবহার হরদম করতে হয়, কবিদের যা বিশেষ হাতিয়ার-অথচ অনেকে সচেতন নন। কেউ কেউ সাহিত্যে ইতর বুলি দেখলে অগ্নিশর্মা হোয়ে ওঠেন, অথচ তিনিই হয়ত কবিতার ভাল সমঝদার। কিন্তু একই শিকড় থেকে জন্ম তা তিনি জানেন না।

৯

বিশেষজ্ঞদের মতে, খিস্তী এবং কবিতার প্রক্রিয়া একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবেগ প্রকাশই সেখানে আসল কথা। কীভাবে হচ্ছে, সেদিকে অত খেয়াল থাকে না। ব্যাকরণ পর্যন্ত সিকেয় ওঠে। অথচ এই অযৌক্তিক পদ্ধতি কিন্তু সমাজে সংহতি এবং যোগাযোগ রক্ষার বেশ বড় রকমের অস্ত্র।

রূপক অলঙ্কার অনেক সময় দৈনন্দিন জীবনে এমন মিশে যায় যে কারো খেয়াল থাকে না, তার কথায় কাব্যিক ছাঁচ আছে। অথচ আটপৌরে কথাবার্তায় কেউ কাব্য করতে যায় না। তেমন ব্যাপার ঘটলে বরং রসিকতা মনে হবে। গরমের দিনে খুব তেষ্টা লাগলে, যদি কেউ বলে “গলা শুকিয়ে কাঠ” কেউ মনে করবে না, লোকটা কবিত্ব করছে। অথচ কবিত্ব আছে তার বর্ণনায়। এইভাবে জীবনের সঙ্গে বহু কবিত্ব মিশে যায়, যার খেয়াল এক সচেতন বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারো মনে রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, এমন কলাকৌশল মানব-সমাজে এসেছে আবেগের সঞ্চারী দিকের জন্যই। এতটুকু না থাকলে বর্তমান বিপুল এবং জটিল মনুষ্য-সমাজ গড়ে উঠত না। পরস্পরে ভাব-বিনিময় একাত্মতার জন্যে বাধ্যতামূলক প্রয়োজন। সংহতি গড়ে উঠে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দেখা যায়, একই ভাষা-ভাষীর মধ্যে জাতীয়তা গড়ে তোলা যত সহজ বহু ভাষা-ভাষীর মধ্যে জাতীয়তা গড়ে তোলা তত সহজ নয়। হয়ত তেমন ঘটে, আরও অন্যান্য কারণে। একই রাষ্ট্রে বহু ন্যাশনালিটি বা জাতি যেখানে দেখা যায়, বুঝতে হবে, হয়ত এই পার্থক্যের একটা বিশেষ কারণ : ভাষা। অবশ্যি অন্যান্য বিভেদও থাকতে পারে। সামাজিক সংহতির বিরাট হাতিয়ার ভাষা। ভাবের ঐক্য প্রবণতার ঐক্যে নিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, জাতীয়তা প্রবণতার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য নয়।

ভাষার সঞ্চারী দিকের কথা বলতে গিয়ে একটু প্রসঙ্গান্তর ঘটল। কিন্তু বিষয় বিশদ করার জন্য তা না করে উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কবিদের দ্বারস্থ হতে হয়।

অনেক সময় কবিকুল এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করেন, যাকে বলা যায় : পরোক্ষ উল্লেখ। অস্পষ্ট কিন্তু তার অভিঘাত অনেক বেশি, যা স্পষ্ট করলে জোর কমে যেত। তা-ছাড়া অল্প সময়ে অল্প কথায় যা প্রকাশ করা যায়, তা বলতে যদি কোন মহাভারত ফাঁদে, তাকে কেউ কৌশলী শিল্পী বলবেন না। বরং বাচালতা-দোষে দুষ্ট রায় দিয়ে খারিজ করবেন।

নজরুলের কবিতা থেকে দু'টি আহৃতি দেওয়া যাক-

আমি রুষে উঠি যবে মহাকাশ ছাপিয়া
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে যায় কাঁপিয়া
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।

অথবা-

আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি
আমি ধূমকেতু জ্বালা বিষধর কাল-ফণী।
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী।
আমি জাহান্নামে বসিয়া পুষ্পের হাসি হাসি।।

উপরোক্ত দুই স্তবকে নানা অস্পষ্ট উল্লেখ আছে : হাবিয়া দোযখ, চণ্ডী, শনি ইত্যাদি। এই সমস্ত পরোক্ষ উল্লেখ ছাড়া কবিতার সঞ্চারী দিক ধ্বংস হোয়ে যায়। কবি হিন্দু-মুসলমানের নানা পৌরাণিক সম্ভার টেনে এনেছেন। উদ্দেশ্য আবেগের সেই স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা, নিজের মধ্যে তিনি যা অনুভব করেছেন। এই পন্থায় তিনি কতটা শরীয়ৎ 'তরক' করেছেন, তা ভাবার প্রয়োজন হয়নি তার। সমগ্র দেশের মাটির সঙ্গে আবহমান কাল থেকে ওই সব কাহিনী চালু আছে। তা গোটা জাতির মানবিক সম্পদ। কবি স্বচ্ছন্দে সেই রত্ন-সাগরে ডুব দিয়েছেন। নচেৎ তার বর্তমান আবেগকে পরিপূর্ণ ভাবে জানানো সম্ভব হয় না। অথচ কে না জানে, 'বিদ্রোহী' হয়ত ত্রুটি-মুক্ত নয়, কিন্তু নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

অস্পষ্ট উল্লেখ বা ইংরেজি ভাষায় এ্যালিউশানের প্রয়োজন পূর্বোক্ত উদাহরণে স্পষ্ট।

আধুনিক কবিকুল ওই কৌশলের আরো এক উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। অবিশ্যি যুগভেদে যেমন যান-বাহনের টেকনিক বদলায় (গো-শকট, মটোর, জেট) কবিতার কৌশল তেমন বদলানো উচিত। নচেৎ যুগের অনুভূতিকে ধরা সহজ হয় না। বহু কবির তা বোধগম্যের বাইরে থেকে যায়।

অস্পষ্ট বা পরোক্ষ উল্লেখের নতুন রূপ-দাতা অবিশ্যি কবি টি. এস. এলিয়ট। কিন্তু বিভিন্ন দেশে আধুনিক কবি-বৃন্দ তার টেক্‌নিক গ্রহণে আদৌ জাত্যাভিমান দেখায়নি। এমন কূপমণ্ডূকতা অবিশ্যি আত্মহত্যাকর।

কবি শামসুর রহমান ওই টেক্‌নিকের একজন সাধু এবং সফল কারিগর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদাহরণ-

(১) তোমার প্রস্তর মূর্তি রাজপথে পাখীর পুরীষে
কলঙ্কিত নয় ভেবে নানা প্রবচনে সমর্থন
সানন্দে যোগায় প্রৌঢ়জন, সংস্কৃতির মুখ চেয়ে
সেবকেরা সভাঘরে ঘুরঘুর করে বিলক্ষণ
(পোড়ো বাড়ী : নজরুলকে)

(২) জানি এ বয়সে প্রাণ খুলে
হাসাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ঘরে শত্রু নিয়ে মুখে
হাসির নানা কথা : শুনি তুমি নাকি মৃত, তুমি
সার্সির সবুজ চুলে বাঁধা পড়ে আছো, বলে কেউ।
কূলে একা বসে থাকি, কোথায় ভরসা? ঘুরে ঘুরে
প্রতিদিন ফিরে আসি বাড়ির সীমানায়;

কয়েকটি পংক্তি লক্ষ্যণীয়। (১) কবিতার মাইকেল মধুসূদনের এবং (২) কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি আছে। এই কৌশল অনুকরণের জন্য নয়। বরং আবেগের মাত্রা আরো ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পংক্তিগুলোর সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তারা স্বাদ পরিপূর্ণ পাবেন না।

AMARBOI.COM

১০

পরোক্ষ উল্লেখের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বহু কবিতা বোঝা দায় হোয়ে পড়ে। এই জন্যে অনেকে মনে করে, আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য। আসলে নানা টেকনিকের সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে এই অপবাদ। কিন্তু মনে রাখা উচিত, যেহেতু কবি কাব্যের সঞ্চারী দিকের উপর বেশি জোর দেয়, বর্তমান কালে নিছক সারল্য আর হালে পানি পায় না। আর জীবনের ধারা বদলানোর সঙ্গে চেতনা ঠিকরে ঠিকরে কোথায় যায়, সাধারণের পক্ষে ধরা মুশকিল। কবিরা কিন্তু এখানে পথিকৃৎ। সেই জন্যে নতুন কবিদের মাথায় প্রথম জয়ের মুকুট অত সহজে ধরা দেয় না। কারণ, তাদের সমঝ্দার গড়ে উঠতে দেরী হয়।

পরোক্ষ উল্লেখের আলোচনায় এসব কথা বলতে হোলো। কারণ, ভাষার সঞ্চারী দিক নানাভাবে রূপ পরিগ্রহণ করে এই জন্য বালক ও কিশোরদের গোড়া থেকে দেশের ইতিহাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। কারণ, তাছাড়া ভাবের আদান-প্রদান কখনও সুষ্ঠু হোতে পারে না। সমাজ-সংহতির এই এক মূল স্তম্ভ। যেখানে এই যোগাযোগ অনুপস্থিত সেখানে বিশৃঙ্খলা স্বতঃই আসতে বাধ্য। কারণ, একজন যখন পশ্চিমে যায় আর অন্যজন পূর্বদিকে-তখন মিলের বিন্দু কোথায় মিলবে? সাহিত্য বা ইতিহাস ছেলেদের পড়ানো হয়, সমাজে ওঠাবসায় লায়েক হওয়ার জন্যে, খুব জোর চাকারির ক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরক্কীর জন্যে। করিৎ-কর্মা। ব্যক্তিদের তা-ই ধারণা। আসলে, তারা বৃহত্তর সমাজের ভালমন্দ কিছুই চোখের সামনে রাখেন না। জীবনে জীবন যোগ হয়, ভাবের আদান-প্রদান মারফৎ। সেখানে গিরিখাদ দেখে দিলে সমাজই তখন বিরাট গর্তে পরিণত হয়। তখন পতন এবং মৃত্যুই অনিবার্য হোয়ে পড়ে।

কিন্তু ভাষার সঞ্চারী দিক কোথা থেকে এলো কাব্যের মধ্যে যা জারি হয়? এইখানে মনোসমীক্ষণবাদী বা সাইকোএ্যানালিষ্টদের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মনের বিপুল অপরিজ্ঞাত রাজ্যের বহু সংবাদ বর্তমান মনস্তত্ত্ববিদগণ পরিবেশন করেছেন। সমীহার সঙ্গেই তাদের বাণী শুনতে হয়। ফ্রয়েড তাঁর A general introduction to psychoanalysis গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, "Words and magic were in the beginning one and the same thing. Even today words retain much of magical Power." অর্থাৎ, "গোড়ার দিকে শব্দ এবং ইন্দ্রজাল একই ছিল। এমন কী আজও শব্দের সেই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বজায় আছে।"

এখানে ইন্দ্রজাল শব্দের সামান্য ব্যাখ্যা দরকার। মানুষ সব সময় প্রকৃতির নিপীড়ন থেকে রেহাইয়ের চেষ্টা পেয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্প ছাড়া তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের পটভূমিও অল্প নয়। দুঃসহ পরিবেশক থেকে মুক্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু চাইলে তা হয় না। আদিম মানুষের কাছে এই ক্ষেত্রে কী উপায় ছিল? পরিবেশ-জাত কল্পনাই তার সম্বল। এখনও গ্রামাঞ্চলে এই মানসিক ধারার সাক্ষাৎ যথেষ্ট পাওয়া যায়। সর্পদংশনের প্রতিষেধক কী? মন্ত্র। মন্ত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। আদিম মানুষ ভাবত, শব্দের মধ্যেই এমন গুণ আছে যা তা-কে বিষ-জাত যন্ত্রণা বা মৃত্যু থেকে রেহাই দেবে। অথবা-আরো একটা উদাহরণ চোখের সামনে রাখা যাক। পাড়াগাঁয়ে বহু তুক্‌তাক আছে। সাঁতার শেখার জন্য তুকের কথা উল্লেখ করছি। ভাল সাঁতার শিখতে গেলে, আগে একটা লাল ছোট পিঁপড়ে খেয়ে নাও। অর্থাৎ পিপীলিকা ভক্ষণ সন্তরণ-বিদ্যা আয়ত্ত করার উপায়। এই ধারণা কোথা থেকে এলো? প্রাচীনকালের মানুষ দেখেছে হাজার বন্যার তোড়ে পিপীলিকা দল বেঁধে বেঁচে যায়। তার সন্তরণপটুত্ব অপরিসীম। সুতরাং পিঁপড়ে খেলে মানুষের মধ্যেও এই ক্ষমতা জারিত হবে। ঠিক আদিম যুগে কোন কালে এই ধারণার উৎপত্তি তা আর আজ আমাদের জানার উপায় নেই। কিন্তু এখনও সামাজিক হালচাল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এককালে এই ইন্দ্রজাল চালু ছিল। কিন্তু পিঁপড়ে খেলে কী সন্তরণ-পটু হওয়া যায়? আজ সকলেই জানে এমন সম্ভাবনা কম। বরং তার জন্যে জলে নেমে কসরৎ করতে হবে। পিঁপড়ে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তেমনই প্রথম দাঁত-ভাঙলে ইঁদুরের গর্তে বা পুকুরের ফেলে দাও। উদ্দেশ্য ইঁদুরের দাঁতের মতো ধারাল বা রুই মাছের দাঁতের মত পরিপাটী দাঁত গজাবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জানা, পরিপাটী এবং ধারাল দাঁতের জন্য প্রয়োজন ভাল স্বাস্থ্যরক্ষা, আহার এবং বিজ্ঞান সম্মত দন্ত-চিকিৎসার সাহায্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই অনুযায়ী নিয়ম-পালন। এইখানে আদিম ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাক স্পষ্ট। আদিম মানবও চাইত, তাদের দাঁত ভাল থাক। কিন্তু সুষ্ঠু উপায় তাদের জানা ছিল না। সে পরিবেশকে আয়ত্ত্বে আনতে চাইত ইন্দ্রজালের সাহায্যে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপায় ছিল অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এক দিক থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য মিল আছে। তা হচ্ছে, পরিবেশকে বশে আনা। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে আজও কবিতার শব্দে সঞ্চারী দিকের প্রাধান্য বেশি। সেদিকেই জোর দেওয়া হয়, সত্যিকার কবিমাত্রেই তা জানে। কারণ, মনের এইদিক মানুষকে পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে। আদিম মানব দুঃসহ বর্তমান থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত। কবিদের কাছ থেকে তেমনই আশ্বাস পাওয়া যায় বৈকি, যদিও তা তখনও মানসিক স্তর-জাত এবং আদর্শায়িত ব্যাপার। কিন্তু এই আদর্শের প্রয়োজন আছে।

সরলীকরণের দোষে দুষ্ট হোলেও একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। নজরুলের সুরকর্তা এবং কবি হিসাবে খ্যাতি কিসের জন্য? তাঁর বিরাট জনিপ্রয়তা স্বাধীনতা আন্দোলনের চারণ হিসেবেই সমধিক। কিন্তু তিনি যখন কবিতা বা গান রচনা করেছিলেন তখন কী আমরা স্বাধীন হোয়ে গিয়েছিলাম? আদৌ না। যখন স্বাধীন হোলাম, তখন সবই তাঁর জানার বাইরে চলে গেছে দূরন্ত ব্যাধির কল্যাণে। স্বাধীন হইনি, কিন্তু স্বাধীন হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহী কবি নাম সার্থক। লক্ষ্য করা উচিত কাব্যের মধ্যে এমনই আদর্শায়িত ব্যাপার থাকে। এখানে কবিতা আর ইন্দ্রজাল সমপদ-বাচ্য। ফ্রয়েডের কথা স্মরণীয় : "গোড়ার দিকে শব্দ এবং ইন্দ্রজাল ছিল একই।" ইন্দ্রজালের মধ্যেও সেই আদর্শায়িত রূপের সন্ধান মেলে। কাব্যের সঞ্চারী দিকের উপর তাই কবিদের এত নজর। তারা যখন ব্যাকরণ ভাঙেন, কি প্রচলিত শব্দ-রূপ দুম্‌ড়ে দাম্‌ড়ে আর কিছু করেন মাইকেল মধুসূদনের মত (যিনি এ দেশের প্রথম সিগারেট-পায়ী পর্যন্ত) তখন কারো-আঁৎকে ওঠা উচিত নয়। কারণ, কবিদের জগৎ-রচনার আসল উদ্দেশ্য আবেগকে যথাযথ জালে আবদ্ধ করা। অর্থাৎ তাদের জোর সঞ্চারী দিকের উপর।

কবিকুলের কৌশল সম্পর্কে অনেকে আর কোন কৌতূহল রাখে না, তার জন্যও পাঠকের সঙ্গে কাব্য-রচয়িতার যোগাযোগ ব্যাহত হয়। প্রখ্যাত মনীষী আবু সায়ীদ আইয়ুব একবার কোন পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন, ভোক্তা হিসেবে কারো আম পছন্দ কারো আমসত্ত্ব। কিন্তু বর্তমান যুগে আম এবং আমসত্ত্ব উভয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকা উচিত, নচেৎ স্বাদ গ্রহণ অপূর্ণ থেকে যায়।

কবিদের সঞ্চারী-কৌশলের প্রতি অমনোযোগের কারণ হয়ত আর এক বাংলা প্রবাদ ঃ

দিন যায়
কথা থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুজনের ধারণা, সময় অতীতে বিলীন হোয়ে গেলেও তার কাহিনী লয় পায় না। কথাটা এক দিকে সত্য, আবার এক পাশে ভুল। কারণ, কাহিনী হয়ত পরবর্তী যুগের মানুষ লাভ করে, কিন্তু সেই সব ঘটনার ব্যঞ্জনা আর পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। মীরজাফরের দুস্কর্ম বর্তমানে বেশ ঘৃণার সঞ্চার করে। কিন্তু সেই কালের যথাযথ রূপ-রস গন্ধ কী ধরা দেয়? পূর্বে কথা-র অর্থ আমরা কাহিনী বা ঘটনা ধরে নিয়েছি। কিন্তু সাধারণত কথা তো শব্দের সমষ্টি। অর্থাৎ শব্দকেই আমরা কথার ব্যষ্টি বা ইউনিট বলে ধরে নিচ্ছি। কিন্তু কথা কী ঠিক যথাযথ থাকে?

একটু তলিয়ে দেখা যায়। 'প্রেম' শব্দ পূর্বে ছিল, আজো আছে। শব্দ ঠিক আছে। সত্যি কী তা-ই? চণ্ডীদাস প্রেম বলতে যে অনুভব পেতেন, আমাদের কাছে কি তেমনই ছাপ হুবহু ফিরে আসে? তা আসে না। কারণ, হাতের কাছেই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।

এমন প্রেমে কী কেউ বর্তমান যুগে বিশ্বাসী? মধ্যযুগে প্রিয়ার দেহের প্রতি লোভ ছিল না, জোর দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু প্রেমের আদর্শ ছিল দেহ বিবর্জিত। ধ্রুপদী যে সব প্রেমোপকথা চালু আছে তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই মজনুর আর শাদী হয় না। প্রবাদ, তা নাকি স্বর্গে অনুষ্ঠিত হবে। শিরী-ফরহাদের হাল একই রকম। মিলনের বাইরেই এই প্রেমের ট্র্যাজেডি, করুণ সমাপ্তি। হীর-রঞ্জা, শোনী-মহিয়াল জয়চাঁদ-চন্দ্রাবতী প্রাচীন বিখ্যাত প্রেমোপখ্যানের নায়ক-নায়িকাদের আর দৈহিক মিলন ঘটে না। কারণ, প্রেম স্বর্গীয়। 'কাম-গন্ধ নাহি তায়।' অথচ পাঁচ শ' বছর পরে একই ভাষায় কবি বেশ বগল বাজিয়ে লিখতে পারেন : "তোমাকে ভালবাসি সখি অস্থিমাংস দেহে।" পংক্তির রচয়িতা স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস। তিনিও প্রেমের কবিতা লিখছেন। কিন্তু দুই দাসের দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাক আকাশ-পাতাল। কালের ব্যবধানতো আছেই। সুতরাং দিন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথারও বিদায় ঘটছে। কিন্তু ভাষার কাঠামোর রাতারাতি বদলায় না। দুই কবি প্রেম শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু দু'জনের অনুভব-অনুভূতি এক নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ যুগের যথাযথ অনুভূতি অত সহজে প্রকাশ করা যায় না, চিরাচরিত ভাষার সাহায্যে। কিন্তু বিপদ ভাষাকে ইচ্ছামত বদলানোও অত সহজ কাজ নয়। বুড়িগঙ্গা নদী এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্রতম অংশেই বদলে যাচ্ছে। কারণ, তার বহমান পানি ছাড়াও অন্যান্য বস্তু পরিবেশ। অথচ শত শত বৎসর ধরে বুড়িগঙ্গা নাম চলে আসছে, কেউ বদলাতে যায়নি। কারণ সে কর্মে এগোলে তো সেকেন্ডে সেকেন্ডে নাম বদলাতে হবে। এখানে যেমন আমরা নিরূপায়, বেটী বুড়িকেই চির-নতুন কুমারী বলে বাধ্য হোয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছি ভাষার ক্ষেত্রেও সেই পন্থা। প্রেমের অত ব্যাখ্যা দিতে গেলে তো আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজে থাকা চলে না। তফসীর বিদ্যালয়ে চলতে পারে। কিন্তু আট-পৌরে জীবনে? কাজেই ভেতরের ব্যঞ্জনা যাই হোক, প্রেম-শব্দ অভিধানে আছে, যদিও সমাজের চৌহদ্দির মধ্যেই তার আসল স্বরূপ যাচাই সম্ভব।

পূর্বোক্ত সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, চারুশিল্পের মারফৎ। কবিকুলই যুগের স্পন্দন তুলে ধরতে পারেন; বহু ক্ষেত্রে পুরাতন মাল-মশলার সাহায্যে। এই জন্য এক যুগের কবিতা আর এক যুগে পুরাতন বা বাসি হয় না। পরবর্তী যুগেও তার রণন থাকে। কারণ, তার গায়ে লেগে থাকে আর এক যুগের গন্ধ। সাহিত্য শিল্প যে কালজয়ী, তা কেবল এই অর্থেই। যুগের তাগিদেই আবার শব্দের অর্থ পর্যন্ত বদলে যায়। এই অভিঘাতের দিকে চোখ না রাখলে ভাষা বা সাহিত্যের প্রবাহ সম্পর্কে যথাযথ পরিচয় দান অসম্ভব।

চণ্ডীদাসের পূর্বোক্ত পংক্তি; 'কাম-গন্ধ নাহি তার। কাম অর্থ সেই যুগে ছিল সব রকমের কামনা, এষণা ইত্যাদি। বর্তমান বাংলা ভাষায় কাম অর্থ যৌন-বাসনা। এখানে নিদারুণভাবে অর্থ-সঙ্কোচ ঘটেছে। শব্দের এমন অস্থিরতার ফলে কবি এবং পাঠককুল উভয়ে সংকটে পড়েন, কিন্তু জীবনের ছাপবন্দীর খেলায় কবি অত সহজে হার মানেন না। আর মোকাবিলাতো সহজ নয়। অর্থ-সঙ্কোচের ঠেলা বর্তমানে অবিশ্যি ইতিহাসের ভেতরকার স্বরূপের মুখোমুখি করে দেয়। সংস্কৃত মিষ্ট এবং ইংরেজি meat একই অর্থ ছিল আদি যুগে। মিষ্ট মানে ভেড়ার মাংস। কিন্তু বর্তমানে আর কোন যোগাযোগ নেই। এখন মিষ্টি খেতে বসে কেউ ভাবি না ভেড়ার গোস্ত খাচ্ছি। অথচ ইংরেজিতে meat বহাল তবিয়তে আছে। বরং ঐ ভাষায় মিষ্টি বোঝাতে গিয়ে তার আগে এসে, বসেছে sweet। গোটা শব্দ sweet meat অর্থাৎ মিষ্টি। এমন রূপান্তর আর সংকোচ তা বাইরের দিক। কবিদের কাজ অন্দরের। অথচ সদরের এই শব্দযোগে। সুতরাং তাদের দায়িত্ব কত গুরুভার, ভেবে দেখা দরকার।

শব্দের রূপ ধরেই যুগযুগান্তের কতো ইতিহাস না খুলে যায়।

১১

কবিদের সঞ্চারী-কৌশলের হদিস দিতে গিয়ে শব্দের অনেক ঠিকুজী এসে পড়ল। কেন কবিদের ভাব-প্রকাশে নানাভাবে অস্থির হোতে হয়, তার ধারণা পাঠক মাত্রেই কিছু করতে পারবেন, আশা রাখি।

বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। যুগের মতো শব্দও কম অস্থির নয়। এক কালে দেবতাকেই অসুর বলা হোত। কারণ অসুদাতা বা প্রাণদাতা। পরে এদের অধঃপতন ঘটে। নিশ্চয় পরবর্তী যুগে এদের জারিজুরীতে অবিশ্বাস জন্মেছিল। সংস্কৃত দেব মানে দেবতা। কিন্তু ফারসী দেও অর্থ দানব। অথচ দু'য়ের অর্থ এককালে একই ছিল। রাজা রাজ্য হারালে পরবর্তী কালের ক্ষমতা-দখলকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয় তার আর সম্মান রাখে না। ইতিহাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে শব্দার্থের তেমন উত্থান-পতন ঘটে। ইসলামের আবির্ভাবের আগে কত দেবতা ছিল, পরে সেগুলো হোয়ে পড়ল পাথরের মূর্তি মাত্র। ভেঙে ফেললেও আর ভয় নেই বা দোষ নেই। পরবর্তীকালে কাহিনী একদম বদলে গেল। সত্যিই বেচারা দেবতার দল।

মোদ্দা-কথা যুগের অভিঘাতে যেমন কবি-বৃন্দ চঞ্চল তেমনই বেচারা ভাষা। বহু ব্যবহারের ভাষায় অন্তর্নিহিত জোর পর্যন্ত কমে যায়। পাহাড়ের পাদদেশ কি নদীর মুখ বা বাঁক-এখন সাধারণ কথায় পরিণত। তার অন্তর্নিহিত অলঙ্কার আর তেমন ঝিলিক মারে না। কিন্তু প্রথমে যখন এই অলঙ্কার চালু হয়েছিল, তখন বক্তা বা শ্রোতার কাছে তা ছিল বিস্ময়কর, হয়ত রোমাঞ্চকর। কিন্তু কালে কালে হাতের রগড়ানি খাওয়া চালু পয়সার মতো আর জৌলুস থাকে না।

মনের সঙ্গে বা সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রায় এই জাতীয় বাক্যালঙ্কার নানা বেশে হাজির হয়। গ্রামাঞ্চলে রাত্রে কেউ সাপ শব্দ উচ্চারণ করত না। হয়ত সাপ দেখলেই বলত লতা, দড়ি ইত্যাদি। গল্প করতে করতে সাপের প্রসঙ্গ এলে তখন ঐ জাতীয় শব্দে তা পূরণ করা হোত। অনেককাল আগের কথা বলছি বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি থেকে। যেমন, রাত্রে বাঘ হোত বড় মামা। প্রাচীন গ্রাম্য ধারণা, নাম করলে সেই বস্তু বা জীব হাজির হোতে পারে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এইভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় ভাষায়। তাই "মৃত্যু" কতো রকম অলঙ্কারে ঢুকে পড়ে। মানব-লীলা, সংবরণ, পরলোক গমন, ইহলোক ত্যাগ ইত্যাদি। বিশেষত সমাজে নিষিদ্ধ বা ভদ্রতা-সম্মত নয়-এমন শব্দ অলঙ্কারে গা ঢেকে তবে বের হয়। যৌন-জাতীয় সামগ্রী বা ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখলে তা বোঝা সহজ। একটা প্রাচীন প্রেমের গানের কথা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক-

তোর তরী খানা
বাইতে দে'না
বাইতে দিলে থাকবে ভাল
শ্যাওলা ধরবে না।

এই সঙ্গীত নিশ্চয় তরী বিষয়ক নয়। প্রতীকী-করণের রীতি জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে আসে। অশোভন উক্তি ঢাকা দেওয়ার ব্যাপার তার অন্যতম। শব্দের তেমনই অর্থ-বিপর্যয় ঘটে। পূর্বে রণ্ডিকা শব্দের মানে ছিল বিধবা রমণী। এই রণ্ডিকা থেকেই এসেছে বাংলা রাঁড় শব্দ। কিন্তু বর্তমানে একদম অন্য অর্থঃ বেশ্যা বা উপপত্নী। আবার যখন কোন বাড়ীতে গিয়ে কেউ গোসলখানা বা বাথ-রুম খোঁজে, সে প্রায়ই নিশ্চয় তা গোসলের জন্য তালাশ করে না। উদ্দেশ্য, জলত্যাগ বা মলত্যাগ। কিন্তু কিছুটা অশোভন আবহাওয়া সৃষ্টিকারী বলে কেউ আর সোজা পথে যায় না। এমন কি জলত্যাগ শব্দের উদয় সেই পরিবেশের চাপে। ইংরেজরা আরো বহু ধাপ এগিয়ে যায়। কুকুর ঝোপে জলত্যাগ করতে গেলে বলবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

saluting the bush অর্থাৎ ঝোপে সালাম দিতে গেছে। এককালে ভিক্টোরিয়ান যুগে কোন ভদ্র ইংরেজ মেয়েদের সামনে leg পা উচ্চারণ করত না। কারণ, তা রুচিসম্মত তো নয়ই বরং অশ্লীল। অবিশ্যি বর্তমানে ইংরেজ মেয়ে ঠ্যাং না দেখিয়ে ফ্রক পরে না। সামাজিক চাপ, অশোভনতা, বিপদের আশঙ্কা ইত্যাদি থেকে রেহাই পাওয়ার মানসিকতার বলে ভাষা এই জাতীয় রূপ পায়। অবশ্য কালে কালে তা বদলায়। ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে যখন গৃহস্থ জবাব দেয়, "মাফ করো ঘরে চা'ল বাড়ন্ত।" এখানে বাড়ন্ত ঠিক বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ঘরে চাউল নেই। কিন্তু তেমন কথা মুখে আনা উচিত নয়, অকল্যাণ হয়। তাই বিপরীত শব্দ উচ্চারণ করে গৃহস্বামী ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠককে আর একদিকে দৃষ্টি ফেরাতে অনুরোধ করব। নিছক সামাজিক চাপ কীভাবে নতুন শব্দের জনক হোয়ে বসে, তার নমুনা বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু আছে। মনে রাখতে হবে, সামাজিক চাপই এখানে নতুন ব্যবহার বা প্রচলনের জন্য দায়ী। সাম্রাজ্যবাদীরা আঠার উনিশ শতক থেকে দুনিয়া লুট-পাট করে বেড়াচ্ছিল। তাদের দম্ভ অমানুষিকতা বর্বরতা ভাষার ভেতর জানান দিতে কসুর করত না। তাই আসে শব্দ : colony বা উপনিবেশ। আর উপনিবেশের মানুষেরা তো মানুষ নয় নেটিভ Native। আর তাদের ভাষা ঃ ভার্ণাকুলার Vernacular যার অর্থ Language of the slaves বা গোলামের ভাষা। আর সেই যুগে উপনিবেশের অসহায় মানুষ অস্ত্র-সজ্জিত বর্বরদের এই কথন মেনে নিত। কিন্তু সময়ের ফেরে এশিয়া আফ্রিকার জনতা যখন পাল্টা দিতে দিতে সভ্য বর্বরদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। পাল্টা দিতে লাগল লাথির বদলে লাথি, গুলির বিনিময়ে গুলি-তখন সুর বদলে গেল। ইংরেজ বলে, জার্মান, ফরাসী কি মার্কিন বলো-সব সভ্য জন্তুদের বেশ পাল্টে গেল না, তারা পাল্টাতে বাধ্য হোলো। এশিয়া আফ্রিকার বহু দেশ আজ স্বাধীন। আপন আত্ম-সম্মান সম্পর্কে সচেতন। তাদের সঙ্গে আর আগের মতো ব্যবহার চলবে না, ওরা বুঝলে। নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষার্থেই তাই এক যুগের বর্বরদের বংশধরেরা নতুন মুখোশ পরলে, মনুষ্যত্বের ভোল পাল্টালে। উপনিবেশ বা Colony আর কলোনী থাকল না। হোলো : Under-developed country বা অনুন্নত দেশ। এই শব্দের মধ্যেও কিছুটা হেয়-বোধের ব্যাপার আছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত ভেঙে গেলেও তাদের অন্যান্য দাঁত এখনও আছে। যেদিন লাথি মেরে তথাকথিত অনুন্নত দেশের মানুষ তা থুবড়ে দিতে পারবে, সে দিন ঐ সব সভ্যতা গর্বী বর্বরদের মধ্যে আবার নতুন শব্দ আমদানি হবে, তা বাজি রেখে বলা যায়।

১২

সাহিত্যের অন্যান্য জগতের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা বিরূপতা নেই। নিবন্ধ রচনাকালে অনেকখানি স্বতস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করতে হয় বৈকি। তখন কবিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা সহসা মনে এসেছে, তাই তাদের নিয়ে টানাটানি আরম্ভ। অন্য কোন কারণে নয়। মনে রাখা উচিত, হয়ত বৈশিষ্ট ঈষৎ ফারাক থাকতে পারে, নচেৎ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার যেখান থেকে উদ্ভব, কাব্যের উৎপত্তিও সেইখানে প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

কিন্তু স্বপ্নের ভুবন কেবল কবিদের একচেটে ব্যাপার নয়। উপন্যাস নাটক, গল্প সাহিত্যের আরো আরো শাখা এই স্বপ্নের উপাদান ছাড়া নয়। আর তা গড়তে হয় শব্দের ভুবন দিয়ে। কারণ, ভাব, ভাষার গোড়ায় যাই হোক, শব্দ ছাড়া তা নির্মাণের আর কোন উপাদান নেই। অবিশ্যি মানুষের সমাজে এই বাধ্যকতা অপরিহার্য্য। অন্য ক্ষেত্রে আর কিছু হোতে পারে।

তাই অন্য আলোচনার মধ্যে প্রবেশের পূর্বে সাহিত্যের জগৎটুকু ঈষৎ দেখে নিতে হয়। কারণ, ভাব ও ভাষার উপর এই রচনার সূচনা। সাহিত্যের মোটামুটি ভূমিকাটুকু জানা থাকলে পরবর্তী স্তরে বোঝার অনেক সুবিধা হবে।

সংক্ষেপে আলোচনা করব।

বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিত্যের উৎপত্তি, মানুষের অভীপ্সা এবং পরিবেশের অভিঘাত-জাত টেনশান বা বিততি থেকে। সহজ ধরনে বলা যায় : সকলেই প্রার্থনা করে, জগৎ তার কামনা অনুযায়ী গড়ে উঠুক। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। পরিবেশের নিজস্ব ঘূর্ণী স্রোত আছে, সেখানে ব্যক্তিমন হাবুডুবু খায়। অবিশ্যি তা পাল্টা বুঝে ওটার অধিকারী-কিন্তু অনিশ্চয়তার। কারণ, এখানে পরিবেশের রূপ এত জটিল যে ব্যক্তিমনের বিজয় অবধারিত কিছু নয়। অবিশ্যি আরো পথ খোলা আছে। প্রথম, ব্যক্তি-মানুষ তার আশা-আকাঙ্খার অভিযোজন ঘটায় পরিবেশের সঙ্গে। অর্থাৎ সে পরিবেশকে স্বীকার করে নেয়। আবার আবেষ্টনীকে বদলেও নিতে পারে সে কামনার চাহিদা-অনুযায়ী। প্রথম, ধর্মের পথ। দ্বিতীয়, পথ, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান সংস্কার বা এই জাতীয় হদিসের অন্তর্গত। মোদ্দা কথা, পরিবেশ অনুযায়ী ব্যক্তিমনের সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়োজন আছে। সাহিত্য পরিবেশ-উত্তরণের অন্যতম হাতিয়ার। এমন কী দুঃসহ যন্ত্রণার ক্ষেত্রেও সাহিত্য প্রলেপ হোতে পারে। কারণ, সত্যিই স্বপ্নের এমন ভুবন নির্মাণ আর কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। এ্যারিষ্টটল যে আবেগ মোক্ষণের কথা বলেছিলেন, তা এই ক্ষেত্রে অতীব সত্য। জীবন-বোধের অন্যতম হাতিয়ার রূপে তাই চারুকলা সাহিত্য সব মহলেই আদৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলা-কৈবল্য বাদীরা পর্যন্ত এখানে আপত্তি তুলবে না। অবিশ্যি মতভেদ যেটুকু বচসার রূপ নেয়, তা হচ্ছে পরিবেশের প্রকৃতি নিয়ে অথবা শিল্প প্রকাশে পন্থা নিয়ে। এই সঙ্গে অবিশ্যি মনে রাখা দরকার, পরিবেশ অর্থ মানুষের সকল রকম আবেষ্টনী-নৈসর্গিক, সামাজিক, মানসিক-অর্থাৎ যে-সব উপাদান তা কে রচনা করে তোলে নাগরিক হিসেবে আপন-আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী।

পূর্বে উল্লেখিত, সাহিত্য, চারুকলা মানুষের জন্য পরিবেশ-উত্তরণের হাতিয়ার। সুতরাং অনুভূতি, ভাব এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তা বলা বাহুল্য। তার শরীর রূপ ধারণ করে ভাষার সাহায্যে। ব্যক্তিমানুষ কোন কবি, লেখক এখানে মুখপাত্র সাজেন। কিন্তু তার কাজ বারোয়ারী। ভাষা, শব্দের তেমন যৌথ সামাজিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। কিন্তু শব্দ তো এমনিতে গলার আওয়াজ ছাড়া কিছু নয়। সমাজের স্বাক্ষরে তা অর্থবান হয়। এই অর্থের সঙ্গে শব্দের কী সম্পর্ক। ভাবের সঙ্গে ভাষার যোগাযোগ কোথায়? শব্দ তো প্রতীক। কিন্তু কিসের প্রতীক? মন্ত্রপূত মাদুলী, পানির সাহায্যে এক কালে ব্যাধি নিরাময় হোত, এখনও হয় কোথাও কোথাও। মা-শা-আল্লাহ্। মন্ত্র তো শব্দ। কখনও কখনও অর্থহীন। কী যোগাযোগ ছিল এইসব শব্দের সঙ্গে মানুষের মনের? এখানেও কি বিবর্তন ঘটেছে? গোটা ইতিহাস ধাক্কা দিতে থাকে। ঐসব জিজ্ঞাসার জবাব পণ্ডিতেরা দেওয়ার চেষ্টা পেয়েছেন। তাদের অনুসরণ করে দেখা যাক, মন্ত্রপুত পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

১৩

ভাষার আসল বনিয়াদ তো ভাব-প্রকাশে। আর আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তার অর্থ থাকে। এখন এই অর্থের স্বরূপ কী? ভাবের সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়? কীভাবে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়? 'কুকুর' শব্দ উচ্চারণ করলে 'মুর্গী' বোঝায় না কেন? কোন কিছু বোঝাতে বাক্য ব্যবহার করা হয়। তা কতগুলো শব্দের সমষ্টি। গোটা বাক্য যে অর্থ প্রকাশ করে, তার স্বরূপ কীভাবে অনুভূত হয়? বাক্য দ্বারা যা প্রকাশ করা যায়, তা সত্য না মিথ্যা কিভাবে বুঝি? বাস্তবের সঙ্গে বাক্যার্থের কী সম্পর্ক।

ভাষা এবং ভাবের এসব হচ্ছে অন্তরঙ্গ দিক যা বলা যায়, অন্তর্স্বরূপ। তা উদঘাটনের ব্রত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকের। আমার মত আনাড়ীর কাম্য নয়। কিন্তু মাঝ-পথে পিঠ-টান দেওয়া অশোভন দেখায়। তাই সাহস করে এই দুঃসাহসের ভেলায় চড়ে বসা নিজে কোন জিনিস বুঝা যায়। কিন্তু অপরকে বুঝানোর দায়িত্ব অশেষ কঠিন। সাহস এটুকু এই তত্ত্বের রাজ্যে আমি মুসাফির মাত্র। কৌতূহলবশত কিছু দেখা আমার কাজ। ভৌগোলিকের দায়িত্ব আমার নয়। সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখার চুল-চেরা হিসাব আমার কাছে কেউ চেয়ে বসবেন না। তবে আশা, আর কোন সত্যিকার বিদ্বান এই পথে এগিয়ে এসে আমাদের মুর্খতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুচাবেন।

ভাষা ও ভাবের অন্তর্স্বরূপ মূলত দার্শনিকরা আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে Logical positivist বা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ এই দিক থেকে সব অগ্রণী বলা যায়। তাঁরা প্রায় বাক্যের গঠন-পদ্ধতির বিশেষণের মাধ্যমে দর্শনের এক বিরাট সৌধ গড়ে তুলেছেন। এই জন্যে তাঁদের মতবাদ থেকেই অন্যান্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ, এই সড়ক ধরে চলতে গেলে নানা সমস্যা উঠবে। তার সাহায্যে অন্যান্য এলাকা চোখে পড়বে বৈকি।

এখন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের বক্তব্য শোনা যাক।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে ভিয়েনায় এই দার্শনিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মরীসশ্লিক, ইউটগেনস্টাইন রুডলক কার্ণাপ, অটো নিউরাথ প্রভৃতি দার্শনিক এই চক্রের প্রধান হোতা ছিলেন। পরে বিভিন্ন দেশে এই ধারার সম্প্রসারণ শুরু হয়। এক দিক থেকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা সাবেক অভিজ্ঞাতাবাদের বা Empiricism শাখা বলা চলে। তবে ফারাক এই যে, প্রাচীন অভিজ্ঞতাবাদীগণ তাঁদের তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর, কিন্তু বর্তমান যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের ষোল আনা জোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ logical analysis- এর উপর। আর অধিবিদ্যা বা metaphysics- কে এরা প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। অধিবিদ্যার উপর গোস্বা এই জন্য নয় যে, তা প্রমাণ করা যায় না। এই ক্ষেত্রে তাদের রায় হলো : অধিবিদ্যাগত ভাষায় লজিক্যাল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সমস্ত অধিবিদ্যার বিবৃতি (Proposition) আসলে অর্থহীন। সুতরাং নাকচ।

এই সিদ্ধান্তে কীভাবে তারা পৌঁছলেন, তার জন্যে উক্ত দার্শনিকদের ভাষার সংজ্ঞা কী জানা দরকার। লুড়ইগ উইটগেনস্টাইনের সংজ্ঞাই এখানে গ্রহণ করা যাক। কারণ, এই খাঁড়ার সাহয্যেই তাঁরা অনেক কচু-কাটা করেছেন। উইটগেনস্টাইনের মতে, ভাষা হচ্ছে অভিজ্ঞতা-লব্ধ ব্যাপারে প্রতীকী[২] কল্পমূর্তি। ভাষাকে কতগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণায়[৩] ভাগ করা যায়। এই ঘোষণাগুলোকে বলা হয়ঃ বিবৃতি।[৪] এসইব বিবৃতি আবার আরও প্রাথমিক বিবৃতির সমষ্টি। উইটগেনস্টাইন বলেছেন, এই প্রাথমিক বিবৃতি আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ব্যাপারে অতি ক্ষুদ্র ছবি। সমস্ত পৃথিবী এমন ছবি দ্বারা পূর্ণ। সুতরাং গোটা পৃথিবীকে তাদের মধ্যে বিশ্লেষিত দেখা যেতে পারে। আর যেহেতু বিবৃতি সম্পর্কের কল্পমূর্তি[৫] সেইহেতু যে-ব্যাপার এইসব সম্পর্ককে সত্য করে তোলে, তার সঙ্গে নিশ্চয় বাস্তব জগতের সম্পর্ক আছে। "লাট সাহেব একটা গাধা ছিল।" এই বিবৃতি তখনই সত্য হোতে পারে যখন দেখা যাবে যে লোকটার মধ্যে সত্যি

১ Facts. ২ Symbolic. ৩ Assertion. ৪ Proposition. ৫ Representation

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাসভত্ব পুরোপুরি বর্তমান, দেহে এবং পশুজ মনে। এইভাবে অভিজ্ঞতার যৌক্তিক বিশ্লেষণ আমাদের জগতের কাছাকাছি নিয়ে যায়। সুতরাং বিবৃতির মূল উদ্দেশ্য বা উল্লেখ হচ্ছে অভিজ্ঞতার ব্যাপার। যদি কোন বিবৃতি আমাদের এমন অবস্থার সম্মুখীন না করতে পারে তা নিতান্ত অর্থহীন। তার উদ্দেশ্য তখন ব্যর্থ। একটা বিবৃতি অর্থ বলতে কী বুঝায়? বিবৃতির অর্থ হচ্ছে তার উপাদানের[৬] পদ্ধতি প্রণালী[৭]। উইটগেনস্টাইনের মতের দিক থেকে এখানে কোন ধাঁধা নেই। বিবৃতি হচ্ছে অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপারের চিত্ররূপ কল্পমূর্তি[৮]। একটি বিবৃতির যথার্থ নির্ণয় করতে হোলে জানতে হবে কীভাবে ব্যাপারটা সত্য। অর্থাৎ যদি বিবৃতি সত্য হয় তা হোলে তা কোন ঘটনা বোঝাচ্ছে। প্রত্যাশা করা যায় এমন ঘটনা আবেক্ষণযোগ্য[৯] এবং উপলব্ধি সম্ভব। বিবৃতির উপাদান প্রণালীতেও তা-ই ঘটে। সুতরাং যে অভিজ্ঞতা একটা বিবৃতিকে উপ-পাদন করতে পারে, তা-ই তার অর্থ সৃষ্টি করে।

এই যুক্তির সাহায্যে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ অধিবিদ্যার জগৎ উড়িয়ে দেন। কোনো কোনো অধিবিদ্যাবিদ মনে করেন, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাগম্য জগৎ প্রকৃত সৎ পদার্থের অবভাস[১০] মাত্র। এই বিবৃতিতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সামর্থ্য অস্বীকৃত। কাজেই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সাহায্যে উক্তরূপ বিবৃতির উপাদান হোতে পারে না। সুতরাং বিবৃতিটি সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না। তা অর্থহীন।"

এই পন্থায় অধিবিদ্যা কেন মানুষের ইতিহাস-লব্ধ জ্ঞান বা বর্তমানে নির্বস্তুক[১১] আকারে গ্রথিত তা-ও নাকচ হোয়ে যেতে বাধ্য। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ ফলে সমালোচনার সম্মুখীন হন।

এই বিতণ্ডা বিভিন্ন দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছে। সব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে মোদ্দা কথার কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার উপাদানের নীতি বা Principle of verification. এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই নীতি কী কোন অভিজ্ঞতা লব্ধ সাধারণীকৃতি[১]? না। তা শব্দান্তর পুরুক্তি[২] মাত্র প্রথমেই এই বিষয়ের সিদ্ধান্তে আসা উচিত। কারণ, তা-ছাড়া ঐ প্রত্যক্ষ বাদীদের বক্তব্য থেকে অগ্রসর হওয়া অর্থহীন।

আরো একটা দিকে লক্ষ্য রাখলে উপ-পাদনের নীতি সম্পর্কে অনেক খটকা এসে জড়ো হয়।

সাধারণত : হামেহাল আটপৌরে কথাবার্তায় আমাদের পন্থা কী? আমরা শব্দের অথবা বাক্যের অর্থ সম্পর্কে তদারক চালাই। বিবৃতি বা proposition হচ্ছে

৬ Verification ৭ Method ৮ Pictorial representation ৯ Observable
১০ Appearence ১১ Abstract ১ Generalization ২ Tautology

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বাক্যের (Sentence) যা অর্থ তা-ই। যার অর্থ আছে, তা-ই বিবৃতি নয়। অন্যপক্ষে আমরা কিসের উপপাদন করি? নিশ্চয়ই বিবৃতির। জানতে চাই বিবৃতিটা সত্য না মিথ্যে। ফলে সমস্যা, উপপাদন এবং অর্থ যে এক-তা কীভাবে সিদ্ধান্তে আনা যায়?

আরো সমস্যা

উপপাদন শব্দটাই দ্ব্যর্থবোধক। তার এক অর্থ হচ্ছে, প্রমাণ করা। অন্য অর্থ সত্য যাচাই করা।" যেমন একটি বাক্য "পৃথিবী গোলাকার"

এই বিবৃতি নেওয়া যাক। এখানে পৃথিবী যে গোল তা আপনি প্রমাণে অগ্রসর হোতে পারেন। আবার, পৃথিবী গোল কিনা তা যাচাইয়েও এগোতে পারেন। একই বাক্য থেকে দুই রকমের যাত্রা। প্রথম ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণে আপনি ব্রতী, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা নির্ধারণে। উপপাদনে দুই ধরনের কর্ম জড়িত। এখন প্রশ্ন আপনি কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর, তার উপর সব নির্ভর করছে।

এখন সমস্যা, বিবৃতির অর্থ কোন বনিয়াদের উপর খাড়া? আমরা কী তাহলে বলব, যে-বিবৃতির সত্য প্রমাণ-সফল তারই অর্থ আছে। অথবা যাচায়ের দিকে জোর দেব, যার ফলে বিবৃতি অর্থবান?

শুধু তাহলেই সমস্যা মেটে না। আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই প্রমাণ বা যাচাই-পন্থা বিবৃতির অর্থের সঙ্গে অভিন্ন।

তার চেয়ে আরো সহজ খটকা চোখের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সময় বিবৃতির উপ-পাদন সম্ভব নয়। তারি নানা কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের সেই বহু পরিচিত উপমাই দেওয়া যাক না কেন। 'বাঘ হিংস্র জন্তু' এমন বিবৃতির উপপাদন খুব সহজ নয়। হঠাৎ মোটা বীমাধারী প্রাণও কেউ সহজে খোয়াতে রাজী হবে, এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে আর ক'জন? তাছাড়া অসুবিধার আরো স্তর আছে। প্রথমত উপপাদনের কথা তৎমুহূর্তে মনে নাও আসতে পারে। দ্বিতীয় অসুবিধা, বাঘের মুখে কে যেতে রাজী? তৃতীয় অসুবিধা, কেবল ন্যায়িক বা লজিক্যাল কারণেও তা অসম্ভব হোতে পারে। এখন সমস্যা কোন জাতের উপপাদন-হীনতার সঙ্গে অর্থ-হীনতা জড়িয়ে আছে?

এই সঙ্গে আরো ভাবতে হয়, উপপাদনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত উপপাদক (verifier) জড়িত। কারণ, উপপাদনের কর্তা তো প্রয়োজন। এখন কর্তা-মশাই ত বিবৃতি নন্ আর যদি বিবৃতির অর্থ তার উপপাদনের মধ্যে নিহিত থাকে, তা হোলে কর্তার স্বরুপ কী? আর উপপাদনের উপপাদন তার আবার উপপাদন-এইভাবে অনন্তকাল চলা যেতে পারে। বেচারা বিবৃতির অর্থ তখন কোন ঘাটে পানি খাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে কথাবার্তা হামেহাল বলতে হয়। কিন্তু তখন কেউ ভাবে না, মনের ভাব প্রকাশ করতে যেসব-শব্দ বা বাক্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তার সঙ্গে অর্থের কী সম্পর্ক। দার্শনিকরা কিন্তু সহজে তৃপ্তি পান না। নানা কার্য-কারণ এবং সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জগতের বিচিত্র ঘটনা, লীলায় অভ্যুদয়, সেসবের তাৎপর্য কোথায় নিহিত? এমনই অনুসিদ্ধৎসার সড়ক বয়ে দর্শন এবং বিজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু একই স্কুলের দার্শনিকদের মধ্যে আবার নানা মতবেদ আছে। তারও কিছু হদিস দিতে হয়।

এই সঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। সাধারণ চলতি ব্যাপারে উপপাদনের রীতি কিভাবে প্রযোজিত হয়? ধরা যাক এই বাক্যের কথা "বুড়িগঙ্গা সাত ক্রোশ লম্বা।" বাক্য সত্য কিনা তখন হেঁটে মেপে দেখে নিলেই কাজ চুকে যায়। মাপে যদি সাত ক্রোশ না হয়, তখন বোঝা গেল, বিবৃতিটি ভুল। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যাপারটা যাচাই হয়। সাধারণত বিজ্ঞানের রীতিও তা-ই। কিন্তু সব সময় উপপাদনের এমন সহজ সুযোগ না-ও থাকতে পারে। সম্রাট আকবরের মাথায় কত চুল ছিল? এই প্রশ্নের জবাব কোন কালে কেউ দিতে পারবে না। কারণ, অতীতের ব্যাপার, আর মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের কোন পন্থা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু অনেক প্রশ্নের জবাব এক যুগে অসম্ভব ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা সম্ভবপর হোয়েছে নানা কারণে। চাঁদের পশ্চাতে কী আছে? এই প্রশ্নের জবাব বর্তমান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে আজ আর অজানা নয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ শেষোক্ত উদাহরণের উপর নির্ভর না করে পারেন না। কাজেই দেখা যায়, উপপাদন শেষ পর্যন্ত মানবিক অনুষ্ঠান বৈকি। শেষ পর্যন্ত গোটা সমাজের যোগ আছে তার সঙ্গে। কিন্তু যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের পথ আলাদা। তাঁরা এই ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় উপাত্তের (sense-data) উপর বেশি জোর দেন। আর যা উপপাদনের আওতায় পড়ে না, এমন চিন্তা তাঁরা স্রেফ বাগাড়ম্বর বলে উড়িয়ে দেন। আকবরের মাথায় চুলের সংখ্যা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

পূর্বেই কথিত, উপপাদন নীতি অনুযায়ী বিবৃতির অর্থ উপপাদনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত। যে কোন বিবৃতি গ্রহণ করুন। কিভাবে তা উপপাদিত হবে? এক ধরনের অজ্ঞিতা অথবা অভিজ্ঞতা প্রবাহ দ্বারা। যদি আপনার জানা থাকে কোন অভিজ্ঞতা দ্বারা তা উপ-পাদিত হবে, তা হোলে সেই অভিজ্ঞতা আপনি কল্পনায় ডেকে আনতে পারেন, আর তখন বুঝতে পারেন একটি বিবৃতির অর্থ কী। যদি তা না করতে পারেন, তাহলে আপনি জানতে পারেন না, বিবৃতি কী বোঝাতে চায়। অর্থের ব্যাখ্যার জন্যে তাহলে আপনার প্রয়োজন, কোন্ অভিজ্ঞতা একটি বিবৃতিকে উপপাদন করবে, তারই বিশদ বিবরণ। অর্থ তাহলে নির্ভর করছে অভিজ্ঞতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপপাদনের রীতির উপর। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের এক পুরোধা তা-ই লিখেছেন। "The statement of the conditions under which a proposition is true is the same as the statement of its meaning."

১৫

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অন্যান্য পুরোধাদের বক্তব্য কিছু শোনা যেতে পারে।

এ কথা সত্য, ভাষা শেষ পর্যন্ত নির্দেশক চিহ্ন বা sign বিশেষ। মার্কিন দার্শনিক চার্লস ডব্ল্যুমোরীস এই নির্দেশক চিহ্নের এক তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তাঁর মতে, নির্দেশক চিহ্নের ভূমিকা তিন রকম সম্পর্কে বিবৃত। প্রথম, যে-সব লোক এই চিহ্ন ব্যবহার করেছে তাদের সঙ্গে। দ্বিতীয়, এই চিহ্ন যা নির্দেশ করছে তার সঙ্গে। তৃতীয় সম্পর্ক হচ্ছে অন্যান্য চিহ্নের সঙ্গে।

এই তিন সম্পর্কের সঙ্গে তিন রকম ভূমিকা স্পষ্টত আলাদা আলাদা উল্লেখ করা যায়। প্রথম সম্পর্ক Pragmatice বা প্রয়োগবাদী। দ্বিতীয় সম্পর্কে, Semantic বা পদপ্রাকরণিক।

ভাষা মূলত নির্দেশক চিহ্নের ব্যাপার। সুতরাং ভাষার বিশ্লেষণে শুধু পদপ্রাকরণিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখলেই চলবে না, অন্যান্য দুই সম্পর্কের দিকেও দৃষ্টি অপরিহার্য। অর্থাৎ অর্থতাত্ত্বিক এবং প্রয়োগবাদী ভূমিকার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। শব্দের অর্থ বিবৃতি এবং একজন মানুষ কীভাবে তা ব্যবহার করছেন- এই তিন সমাহার আশু কর্তব্য। সুতরাং ভাষার বিশ্লেষণে তিন রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার দরকার।

অন্যতম যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী রুডল্‌ফ কার্ণাপ তাই মনে করেন, ভাষার কাঠামোগত বিশ্লেষণ ছাড়া তার নির্দেশক ভূমিকার বিশ্লেষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ ভাষার অর্থ এবং ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে দরকার। শব্দার্থ বিজ্ঞানের এই হচ্ছে সাধারণত তত্ত্ব। কার্ণাপ তাই লেখেন, শব্দার্থবিজ্ঞান শুধু নির্দেশনা তত্ত্ব নয়, বরং তা সত্য এবং ন্যায়িক অবরোহণার (duction) তত্ত্বও বটে। তিনি শব্দার্থবিজ্ঞানকে আবার দুই ভাগ করেছেন। বিশুদ্ধ এবং বর্ণনামূলক শব্দার্থ বিজ্ঞান বা Pure and descriptive semantics। শেষোক্ত তত্ত্বের কাজ হচ্ছে, ঐতিহাসিক এক পর্যায়ে ভাষা কীভাবে গঠিত, আর তৎভাষী মানুষের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে কীভাবে বিভিন্ন নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই দিক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ মূলক বিচার বা Emperical study এবং প্রয়োগবাদী তত্ত্বের অন্তর্গত। কোন ভাষায় ব্যবহারকারীগণ কীভাবে, কি উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার করে, তার বর্ণনাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিশুদ্ধ শব্দার্থবিজ্ঞান (Semantics) শব্দার্থের বিন্যাসের গঠন এবং বিশ্লেষণের তত্ত্ব। অর্থাৎ অর্থ-আরোপের সংজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মের গঠন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণের দিক। তখন অর্থের সত্যতা ও অসত্যতার প্রশ্ন স্বতঃই জড়িয়ে আসে। আবার ঐ সব নিয়ম এবং সংজ্ঞার বিশ্লেষণজাত সমস্যা তো আছেই। এখানে বিশেষ কোন ভাষার উপর যৌক্তিকবাদীগণ কিন্তু আদৌ জোর দেন না। তার ভাষাকে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ সার্বজনীন অর্থেই গ্রহণ করেন।

কর্ণাপের মতে শব্দার্থবিজ্ঞানের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, ভাষার রূপ-গঠন এবং রূপান্তরণের (transformation) নিয়মে। প্রথমোক্ত নিয়ম থেকে জানা যায় কীভাবে বিভিন্ন নির্দেশক চিহ্নের যোগ-সাজশে বাক্য গঠন করা সম্ভব। আর দ্বিতীয় নিয়ম জানায়, কীভাবে বিভিন্ন বাক্য সংযোগ করা যায় এবং বাক্য থেকে আর এক বাক্যের উৎপত্তি ঘটে। এই নিয়ম লজিকের deductive inference বা অবরোহী অনুমিতি।

১৬

আপাতত বিভিন্ন শব্দার্থবিজ্ঞানী বা সেমানটিষ্টদের নানা বাকবিতণ্ডা নেপথ্যে থাকল।

আমরা আবার এই আলোচনায় পরে ফিরে আসব। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের বিশেষ বিশেষ পুরোধা যথা উইগেনেস্টাইন, এ্যায়ার এবং অন্যান্যদের যুক্তিধারা অনুসরণে চেষ্টা করব অন্যত্র।

AMARBOI.COM

এখানে শব্দার্থবিজ্ঞান সামাজিক প্রশ্নের জবাবে কীভাবে এগিয়েছে তা-ই আলোচ্য। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের প্রয়োগ সমাজবিজ্ঞানেও দেখা যায়। পাঠকের দৃষ্টি আগে সেদিকে আকর্ষণ করতে চাই। তার ফলে, মূল আলোচনা কিছু মজার হবে, আমার বিশ্বাস।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক প্রয়োগ প্রথমে মার্কিন দেশেই দেখা যায়। এদের বিশুদ্ধ শব্দার্থবিজ্ঞানী বলাই উচিত। দার্শনিক স্পর্শ তাদের আলোচনায় খুব নিবিড় নয়।

এই জাতীয় লেখকদের মধ্যে দুই জন খুবই বিখ্যাত। ষ্টুয়ার্ট চেস্ এবং কাউন্ট কজিভস্কি। ষ্টুয়ার্ড চেসের কুখ্যাত বা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম The Tyranny or words ক বা 'শব্দের অত্যাচার।'

ষ্টুয়ার্ট চেস্ বলেছেন, বর্তমান পৃথিবী নানা সমস্যাপীড়িত। শোরগোল খুন-খারাবীর অন্ত নেই কোথাও। তার একমাত্র কারণ, ভাষার অপব্যবহার। মানুষ যদি শব্দার্থের নিয়ম কানুন জানত তাহলে বিশ্বের বহু সামাজিক অনাচার থেকে মানুষ রেহাই পেতো। মানুষ শুধু অর্থহীন আজে-বাজে কথা বলে না, বরং আবেগের সুতোয় এমন জড়িয়ে পড়ে যে শেষে হাতাহাতির দিকে এগিয়ে যায়। যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত তো সেইখানে। শব্দের যথাযথ অর্থ যদি লোকে জানত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন কথাই বলত যার অর্থ তাদের কাছে পরিষ্কার তা হোলে গোঁড়ামি দূর হোয়ে যেত। তখন বিসম্বাদের আর প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং শব্দার্থবিজ্ঞানের সাহায্যেই দুনিয়াকে শান্তিময় স্বর্গে পরিণত করা যায়। খারাপ এবং অর্থহীন ভাষার ফলে মানুষ একে অপরকে বোঝে না। সমঝোতার অভাবেই দুনিয়া দোজখ। দুনিয়ার সর্ব-সংস্কারে চেস্ সাহেবের শব্দার্থ-বিজ্ঞানের প্রথম নীতি কী?

"The name is not the thing" অর্থাৎ "নাম সেই বস্তু নয়।" ষ্টুয়ার্ট চেস্ বলেছেন, মানুষের বাইরের জগৎ থেকে সংকেত (sign) পায়। এই ইশারা যে বস্তুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কালক্রমে মানুষ তার নামকরণ ঘটায়। কিন্তু নামটা সেই জিনিস নয়। সেই বস্তু আসলে নামহীন এবং অশাব্দিক বা nonverbat।" অবিশ্যি সাধারণীকৃতির বা generalization, নানা পর্যায় আছে। তার কিছু আলোচনা গোড়ার দিকে আমি করেছি। মোদ্দা কথা, বস্তুর একটা নামকরণ ঘটে।

চেস্ সাহেবের ধারণা সাধারণীকৃতি একটা জটিল ব্যাপার। অনেকেই তা বোঝে না। দুনিয়ার ঝামেলার মূল এইখানে নিহিত। লোকের ধারণায় আসে না, "নাম সেই বস্তু নয়।" বরং নাম এবং বস্তুকে তারা এক করে বা ঘুলিয়ে ফেলে। নির্বস্তুক (abstract) শব্দকে তারা বস্তু মনে করে, তখন শুরু হয় বাকবিতণ্ডা-পরে মুখ থেকে হাতে তথা অস্ত্রে পৌঁছায়। মানুষ শব্দার্থবিজ্ঞানের সূত্র পালন করলে এমন দুর্বিপাক ঘটত না পৃথিবীতে। উদাহরণত চেস্ সাহেব "ইহুদী" শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। এ দেশের কোন শব্দার্থবিজ্ঞানী হোলে হয়ত লিখতেন, হিন্দু বা মুসলমান। চেস্ সাহেবের মতে ইহুদীদের ভ্রাম্যমাণ দুর্দশার আসল কারণ ওই শব্দর্থিক বিভ্রান্তি।

AMARBOI.COM

আজব মতবাদ নয় কি?

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বা জাতিকে জাতিতে হিংসা-বৈরীতার নানা হেতু সমাজবিজ্ঞানীরা বের করার চেষ্টা পেয়েছেন। কিন্তু চেস্ সাহেব সব এক ফুয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন এবং বেশ জোর গলায়। মানুষ নিজের অত্যাচারে নিজে পীড়িত। আর সে জুলুম শব্দ-জাত। 'নাম সেই বস্তু নয়।" এ-কথা না বোঝার দরুন তাদের নিগ্রহের শেষ নেই। সমাজ সংস্কার ইত্যাদি মিছে কথা। আসলে সকলের মন দেওয়া উচিত ভাষা সংস্কারে আর শব্দার্থবিজ্ঞানের ওই নীতি-শিক্ষায়।

সুতরাং মানুষের কর্তব্য কী? চেস্ সাহেব এক বাক্য সেরেছেন Find the referent "শংসা খুঁজে বের করো" । নাম এবং বস্তুর মূল সম্পর্কে ছুটে যাও? না, অত দূর নয়। সাধারণীকৃতির প্রাথমিক স্তরে যাও। চেস সাহেবের মতে, যখন একটা বস্তু-জাত ইলেকট্রন আমাদের ইন্দ্রিয়ে এসে যা দেয় তখনই শুরু হয় সাধারণীকৃতির প্রথম স্তর। তারপর ধাপে ধাপে নাম পর্যন্ত। তা পূর্বে আলোচিত। তাই আর খোলাসা করা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সাধারণীকৃতির প্রথম স্তরে যাও। আর তা করতে পারলেই সকল মুশ্‌কিল আসান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেস্ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান, তিনি বাস্তব জগতে আর ফিরে যেতে রাজী নন। বরং সাধারণীকৃতির হাওয়াই কেল্লায় সকলকে চড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ, মনের রাজ্যেই সব সামাজিক বিপত্তির সমাধান হোতে পারে।

মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘাত লাগে তাদের বাস্তব জীবনের চলার পথে। সুতরাং সেখানেই সমাধান খোঁজা উচিত। চেস্ সাহেব সেখানে হাঁটতে ঘোর নারাজ। তিনি লিখেছেন তিনিও নাকি এক কালে তেমন সংস্কারপন্থী ছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। কারণ, মানুষ তার ভাব বোঝে না। আর এমন দুর্বিপাকের হেতু শব্দার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের অপরিচয়।

চেস্ সাহেব বলেছেন, আদিম মানব শব্দের মধ্যে (Magic) ইন্দ্রজালের আস্বাদ পেত, যেমন, সাপের মন্ত্রের বিষহরণের আশ্বাস। কার্যকরণের বিভ্রান্তি থেকে এমন ধারণার অভ্যুদয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চেস্ সাহেব নিজে সেই আদিমতার উর্ধ্বে যেতে পারেন নি। তা-ই যদি না হবে, তিনি কী করে বলেন, "ইহুদী" শব্দ থেকেই বেচারা একটা সম্প্রদায়ের উপর কতো অত্যাচারের চাকা যুগ যুগ চলে গেছে।" অবিশ্যি শব্দের সামাজিক ভূমিকা আছে বৈকি। তখন ভূমিকার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই পন্থায় দেখা যাবে, বহু উপাদান এসে পড়েছে। যেমন এদেশে বর্তমানে "হিন্দু মুসলমান" দুই শব্দ পরস্পর সাম্প্রদায়িক ঘৃণার প্রতীকে পরিণত। চিরদিন কী তাই ছিল? পঞ্চাশ বছর আগে, কি একশ' বৎসর আগে কেন এমন হয়নি? কেন গৃহদাহ, নরনারী শিশুহত্যা এবং অন্যান্য জঘন্য পাশবিকতা এমন বিপুল আকারে দেখা দেয়নি? ষ্টুয়ার্ট চেসের মতো বহু মানুষ এখনও এদেশে আছে যারা সংস্কার-আচ্ছন্ন অমন শব্দেই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারা সমাজ-বাস্তবের শক্ত প্রাঙ্গণে পা ফেলতে চায় না। জন্তুর মতো আপন উপজ্ঞা (instinet) সৃষ্ট চত্বরে হন্যে ঘুরে বেড়ায়।

১৭

ষ্টুয়ার্ড চেস আসলে সমাজ-জীবনের সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে নারাজ। বেশ বোঝা যায়, যদি শব্দের ভুল বুঝাবুঝির জন্যে যত পৃথিবীর গণ্ডগোল হানাহানি, তা-হলে লাইব্রেরীতে গিয়ে মোটা মোটা অভিধান, শব্দকোষ কিনে এনে বাড়িতে রাখলেই সব ফ্যাসাদ মিটে যেত। কারণ তখন তো আর শব্দার্থ কোন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারত না। আসলে এই চেস সাহেব হচ্ছেন সেই সব গণ্ড পণ্ডিতদের তল্পিবাহক যারা বড় বড় বুলির আড়ালে সমাজের যথাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্যকারী। আর মূলত তিনি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের পোষ্যপুত্র। তফাৎ ঐ প্রত্যক্ষ বাদীরা শব্দ নিয়ে টানাটানি করেছেন, আর চেস সাহেব সামাজিক প্রকল্প বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রোগ্রাম নিয়ে। এই জাতীয় চিন্তাবিদগণ শেষ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক। রক্ষণশীলতা যখন ক্রান্তিকালে পৌঁছায় তখন টিকে থাকার জন্যে এমন লেবাস গ্রহণ করে। মনে রাখা উচিত, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পরে, ইউরোপের সামাজিক জীবন যখন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তখন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অভ্যুদয়।

শব্দার্থবিজ্ঞানীদের চিন্তা আসলে কোন কর্ম-প্রেরণা যোগাতে পারে না। মানুষ যদি নিজের বর্তমান পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সন্দিহান হয়, তখন সে কোন কাজে এগোবে? এমন অবস্থায় অসহায় জড়তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। চিন্তার ক্ষেত্রে তারই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ত রোধ করা যেত। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে দার্শনিকদের ওই জড়তা হিটলার মুসোলিনীকে কম সাহায্য করেনি। প্রত্যেক দেশে অবিশ্যি সমাজ-সঙ্কটের মোকাবিলায় ঐ জাতীয় চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে, যারা আসলে কায়েমী স্বার্থের আধ্যাত্মিক পাহারাদার।

ইংল্যান্ডে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের গোদা আলফ্রেড আইয়ারের তৃতীয় দশকের গতিবিধি নাড়াচাড়া করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নীতিশাস্ত্রের উপর পণ্ডিতরা কম হামলা চালাননি।

একটু গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কারণ, ব্যাপারটা এথিক্‌স বা নীতিশাস্ত্রের। সেই জন্যে।

নীতিশাস্ত্রের প্রধান বিষয়বস্তু ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য নিয়ে কোন কোন পরিস্থিতির সম্মুখী হোয়ে মানুষকে জবাব দিতে হয়, এই ক্ষেত্রে তার কর্তব্য কী? কোন পথ সঠিক কোন পথ ভুল। কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়। এমন উচিত অনুচিত সঠিক, ভুল কর্তব্য অকর্তব্য-ইত্যাদি প্রশ্ন সমানে খাড়া হয় বৈকি। তখন প্রয়োজন হয় মূল্য বিচারের। তখন আর সোজা বিবৃতির মধ্যে বক্তব্য পর্য্যবসতি থাকে না। যেমন পাকিস্তানের শতকরা নব্বই জন অধিবাসীর আয়ু গড়ে সাতাশ বছরের বেশি নয়, যেখানে নরওয়ে সুইডেনের অধিবাসীর গড় আয়ুর হার বিরাশীর অধিক। এটি বিবৃতি মাত্র। কিন্তু যদি বলা যায় পাকিস্তানের অধিবাসীদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য তাদের জীবন-যাপনের মান আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, তখন তা মূল্য-বিচারের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নীতিশাস্ত্রের এই মূল্য বিচারকে মনে করা হোল পদ-প্রকরণের (Syntax) বিপর্যয় মাত্র। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা এই অবদান বা অপদানের আবিষ্কার কর্তা। পূর্বেকার যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ মনে করতেন, সব বিবৃতি মোটামুটি দুই শ্রেণীভুক্ত। ১। অর্থযুক্ত ২। অর্থহীন। অর্থযুক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে বিধেয় (Predicate) বিষয়ের (Subject) সংজ্ঞা মাত্র। যেমন, চার ঋজু রেখা বিশিষ্ট সমতল জমিনকে আয়ত ক্ষেত্র বলা হয়। এখানে বিষয় বিধেয় সমার্থক বাচক। সুতরাং এখানে সংশয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর এক শ্রেণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবৃতি অর্থযুক্ত ধরা হয়, যা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষিত। যেমন, ন্যাশনাল বুক সেন্টার বা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই বিবৃতি সত্য, কারণ যাচাই মারফৎ জানা যায়।

কিন্তু সব বিবৃতি এইভাবে যাচাই করা চলে না। পূর্বে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের উপ-পাদন নীতির সমালোচনায় তা উল্লেখিত।

নৈতিক প্রশ্নের যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা কিন্তু তেমনই উপ-পাদনের পক্ষপাতী। যদি নৈতিক প্রশ্নে মতভেদ দেখা যায়, তখন আইয়ার সাহেব মনে করেন, এখানে স্ববিরোধিতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, কেউই অর্থযুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করছে না।

আরো খোলাসা করে বলা যাক। ধরুন, সেই জনে তর্ক বেধেছে, এক মুসলমান রাষ্ট্রে অমুসলমানদের নাগরিক অধিকার নিয়ে। একজন বললেন অমুসলমানরা পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকারী। অন্যজন প্রতিবাদীঃ না, মুসলমান রাষ্ট্রে অমুসলমান পূর্ণ নাগরিকত্বের দাবীদার হোতে পারে না।

এখানে প্রশ্নটা নৈতিক।

কিন্তু বৃটিশ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আলফ্রেড আইয়ার হাঁক পাড়বেন "এখানে কে সঠিক, কে ভুল তা বলা যায় না। কারণ, দুই বিবৃতি উপ-পাদ যোগ্য বিবৃতি নয়।" আয়ার সাহেবের মতে শুধু মাত্র (Tautological) বা সমার্থবাচক এবং বাস্তব তথ্যমূলক বিবৃতি একমাত্র অর্থযুক্ত বিবৃতির পর্যায়ে পড়ে। আর সব স্রেফ ভুয়া।

এইভাবে নৈতিকতার সমস্যা নাকচ হোয়ে যায়। ভিয়েৎনামে মাইলাই গ্রামে সভ্যতার ধ্বজাধারী মার্কিন সৈন্যগণ যখন বর্বরতাকে লজ্জা দেয় অসহায় নরনারী শিশু হত্যা মারফৎ, তখন কোন নৈতিক মূল্য-বিচার পণ্ড শ্রম মাত্র। কারণ আইয়ার সাহেবের দর্শনে তা যুক্তিসিদ্ধ নয়। ন্যায়-অন্যায়ত উপ-পাদনমূলক বিবৃতির আওতায় বাইরে।

সাম্রাজ্যবাদ জন্তুর আকারেই বিশ্বের অনুন্নত দেশে দেখা দেয়। ধ্বংস, লুণ্ঠন, হত্যার পেছনে মানসিক সমর্থন থাকার দরকার বৈকি। সেখানে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আইয়ার এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা হাজির হবে। তা বিচিত্র কিছু নয়।

সভ্য ইউরোপ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দর্শন আজ এই পর্যায়ে উপস্থিত। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা শেষ পর্যন্ত এমনই পচা মগজের ব্যবসাদার হোয়ে দাঁড়ায়।

১৮

প্রত্যক্ষ প্রয়োগবাদীদের হামলা শুধু সমাজে নয়, অন্যান্য দিকেও নানাভাবে প্রকট। কারণ, সামাজিক চিন্তাকে বিবৃত করার জন্যে চিন্তার বনিয়াদ লজিক বা ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তি ধরেও টান দেওয়া উচিত। গোড়া কাটলেই ডালপালা ধ্বংস করা আরো সহজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে পূর্বোক্ত স্টুয়ার্ট চেস খাড়া। তিনি অবিশ্যি প্রত্যক্ষ প্রয়োগবাদীদের অন্যতম চাঁই কাউন্ট Korzybsky কর্জিভস্কির নিকট ঋণী দুই জনে লজিকের উপর হামলা চালান। সে কথাই আলোচ্য। তারা বলছেন, এ্যারিস্টটলের লজিক এযুগে অচল, যদিও এ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আসল পত্তনকারী।

কজিভস্কি বলছেন, মানুষের চিন্তার সব ভুলের হেতু ন্যায়শাস্ত্রের অভিন্নতাবিধি বা Law of identity। এই বিধির ঈষৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রত্যয় বা concept একই অর্থে ব্যবহার করতে হবে। লজিকে এইভাবে লেখা হয় : ক < এবং কক। অর্থাৎ “ক” হয় “ক”, “ক” ক-য়ের সমান। অভিন্নতাবিধির আরো সরল ব্যাখ্যায় বলা যায় : যে জিনিস যা সে জিনিস ঠিক তা-ই। চিন্তার ক্ষেত্রে এই অভিন্নতাবিধি বিশেষভাবে অপরিহার্য। কারণ চিন্তার প্রক্রিয়ায় যদি কুকুর পরে ‘বিড়াল’ হয়ে যায়, তাহলে আর চিন্তাই চলতে পারে না। আর চললেও তা সুষ্ঠু হবে না। প্রকৃতিতে বস্তুর নানা পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু অবরোহ যুক্তিপদ্ধতিতে আমরা যে সব উপাত্ত নিয়ে যুক্তি বিচারে অগ্রসর হই, সেই সব উপাত্ত অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকতে হবে। উদাহরণত পূর্বোক্ত ‘কুকুর’ এবং ‘বিড়ালের’ কথা স্মরণীয়।

কাউন্ট কজিভস্কি বলছেন যে পৃথিবীর চারদিকের অহরহ পরিবর্তন এবং ধ্বংস প্রবহমান। কোন চিন্তাবিদ তা অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং অভিন্নতাবিধির প্রয়োগ নিরর্থক। কারণ, সেখানে উপাত্ত অপরিবর্তিত থাকে। অভিন্নতা-বিধি অনুযায়ী উপাত্তের নিষিদ্ধ। সুষ্ঠু চিন্তা ওই ভাবে হোতে পারে না। তা বাস্তবের বিকৃতি মাত্র।

আপাতদৃষ্টে মনে হয়; কর্জিতস্কি যেন অমূল্য এক বাণী পরিবেশন করে বসেছেন। কিন্তু অভিন্নতাবিধির উপর যে অর্থ কর্জিতস্কি প্রয়োগ করছেন তা আজ সে-অর্থে গৃহীত নয়। এমন কি এ্যারিস্টটলও তেমন সংজ্ঞা দেননি। কোন যুক্তিবিচারে পদ এবং বিবৃতির উপর যে অর্থ প্রয়োগ করা হবে, তা আর পরিবর্তন চলবে না। অভিন্নতাবিধির এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। সাধারণ জ্ঞানেই তা বোঝা যায়। অন্যথায় চিন্তা হবে ঘোলাটে একটা কিছু। চিন্তাই করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাকবি ছিলেন- এই বাক্যে প্রতিটি পদের অর্থ একই থাকতে হবে যতক্ষণ আমরা তাঁকে নিয়ে আলোচনা করব। যদি ঠাকুর অর্থ পাচক এবং কবি অর্থ কবিরাজ ধরি এক মিনিট পরেই তা হোয়ে পরে সব চিন্তা বা আলোচনা ভণ্ডুল। কারণ, আশ্রয়বাক্যে (Premise) এক কথা বলবেন বা এক অর্থ প্রয়োগ করবেন, সিদ্ধান্তে অন্য- তা' হলে তা আর যাই হোক সুষ্ঠু চিন্তা হবে না। বারো ইঞ্চি ফুট যদি মিনিটে মিনিটে আট্‌ দশ ষোল আঠারো হতে থাকে তা হলে কাপড় বেচার-কেনা খরিদ্দার ও দোকানদার উভয়ের পক্ষে অসম্ভব হোয়ে পড়তে বাধ্য।

আমাদের চারপাশে যে জগৎ রয়েছে তার সঙ্গে এমন নায়িক প্রয়োজন কী যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামঞ্জস্য-বিধায়ক বা মানান-সই? নিশ্চয় এ সম্পর্কে এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদের কথাগুলো প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলছেন যদি তা না হয়, তা হোলে জগৎ এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের বিবৃতির যোগাযোগ কীভাবে ঘটবে? জগতে সব কিছু অহর্নিশ পরিবর্তিত হচ্ছে। একথা সত্য। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর পরিবর্তন বিশেষ প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি এবং ইতিহাস আছে। প্রত্যেকটা জিনিস যা তা ঠিক তা-ই- অন্য কিছু নয়। অভিন্নতাবিধির এই হচ্ছে আসল মানে।

সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্যে কর্জিত ভক্সিদের মত শব্দার্থ বৈজ্ঞানিক নাকচ করে দেওয়াই সমীচীন।

অন্য স্বর

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে গেছে।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন।

বইয়ের আলোচনায় সূত্রপাত। এখন সামনে চিন্তার জটিল-কুটিল গালি। আমি আর এগোতে অক্ষম। কারণ, বিশেষজ্ঞ নই। যাঁরা এগোবেন, তাঁদের উপর ভরসা রেখেই মাত্রা ক্ষ্যান্ত দিয়েছি।

AMARBOI.COM

বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, 'কেন এটা-ওটা বিশ্বাস করি?- জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যা সেখানে নয়। বরং কেন এটা-ওটায় আমার বিশ্বাস করা উচিত?- সেখানেই যত সমস্যা। ঔচিত্যের ধাক্কা এইভাবে ঠেলে ঠেলে নানা পথে নিয়ে যায়।

মুসাফিরের দু'পাশের দৃশ্য দেখেই সুখ। তার ভূতাত্ত্বিক হওয়ার দরকার পড়ে না। অমন সমস্যার মুখোমুখি হলে যাত্রা বন্ধ করাই ভাল।

তাই মহাজন-পন্থার, আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর এই পুস্তকের ইতি।

চৈনিক ঋষি কনফ্যুসিয়াস সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। কোন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার হাতে যদি সমস্ত দেশের শাসনভার দেওয়া হয়, তখন প্রথমেই আপনি কী করতে চাইবেন?"

কনফ্যুনিয়াস জবাবে বলেছিলেন, "আমার প্রথম কাজ হবে, ভাষা সংশোধন করা।"

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখা ভাল, চৈনিক ঋষির বহু উপলব্ধির প্রতিধ্বনি আজও যে-কোন সৎ হৃদয়ে রণন তুলবে। অনেক বাণী আজকের হানাহানি-মত্ত স্বার্থান্ধ যুগে প্রায় শাশ্বত ঘোষণা। যেমন, তিনি সত্যিকার দেশ-শাসকের গুণাবলী বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যিনি সত্যিকার দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকর্তা, তিনি দেশের সমস্ত বাসিন্দা দুঃখিত হওয়ার পূর্বেই প্রথমে দুঃখিত হবেন। কারণ, তিনি সকলের আগেই জানবেন, আগামী ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে। আবার সমস্ত দেশের মানুষ সুখমত্ত উৎসব পালন শেষ করলে, সবশেষে আনন্দিত হবেন তিনি। কারণ, সকলের মুখে হাসি ফোটানোর দায়িত্ব তাঁর।"

এমন উপলব্ধি কী কোন স্থান বা কালে সীমাবদ্ধ?

আবার আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

কনফ্যুসিয়াসের জবাব শুনে শিষ্যমণ্ডলী মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। অর্থাৎ কথা হদিস মিলছে না।

চৈনিক ঋষি তখন বললেন, 'ভাষা সংশোধন করতে চাই, কেন জানো? যদি ভাষায় ভুল থাকে, তাহলে কী বলা হোলো এবং কী অর্থে বলা হোলো- এই দুয়ের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। তার ফল কী? যদি বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য মিল না থাকে, তাহলে যা করা উচিত- তা আর সম্পন্ন হবে না। ... আর যদি তেমন ঘটে অর্থাৎ কর্ত্তব্য সাধিত না হয়, দেশে নৈতিকতা ও চারুশিল্প-আর্ট- দুয়ের অবনতি ঘটে। তারও ফল স্পষ্ট। নৈতিকতা আর চারুশিল্পের অবনিত ঘটলে, বিচার বিপথে যাবে। বিচার বিপথগামী হলে দেশের মানুষ অসহায় অবস্থা ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। সুতরাং যা বলা হয় অর্থাৎ বক্তব্যের মধ্যে কোন দ্বার্থতা রাখা চলবে না...।"

কনফ্যুসিয়াস ঠিকই ধরেছিলেন।

ঘোষণা এবং এষণার মধ্যে গোঁজামিল থাকলে রাজনীতির ক্ষেত্রে নরাকার জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটে—একথা কে না জানে?

ভাব, ভাষা, ভাবনার স্বরূপ-সন্ধান সুস্থ সমাজ গঠনে অপরিহার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই

AMARBOI.COM

প্রবন্ধসমগ্র—১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৫
প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
প্রচ্ছদ : জিলানী ওসমান

উৎসর্গ-পত্র

ধাম রাই
কৃষ্ণ কার
বংশ পাঠান
ফল্গু-হাতে বেঁধে রাখী
সমুদ্রকে দিল ফাঁকি
(বাংগাল জন্সন)
শামসুর রহমান

পূর্বাভাষ

AMARBOI.COM

অনুজ-সতীর্থ কবি মন্জুরে মওলা, যিনি দৈবক্রমে বর্তমানে বাঙলা একাডেমীর মহাপরিচালক, আমাকে গত নভেম্বর মাসে তিন-অধিবেশনের এক বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই পুস্তক তারই সুফল বা কুফল। বক্তৃতার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আমার বহু দিনের বুঝাপড়া। মনে মনে লঙ্কাভাগের অন্ত ছিল না। কিন্তু বাইরের তাগিদ না থাকলে হয়ত বুদ্বুদ মগজেই থেকে যেত। মন্জুরে মওলা কে তাই বহুৎ-বহুৎ ধন্যবাদ। অবিশ্যি, কর্মফলের প্রশংসা-পরিবারের জন্য কেবল আমার মাথা পাতা রইল। কারণ, অনুরোধে সাঁতরাতে গিয়ে কেউ কেউ ডুবে মরে।

এই জাতীয় পুস্তকে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়ার রীতি আছে। আমি দেশী-বিদেশী বহু মনীষীর চিন্তার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মুদ্রিত ভাব-সম্পদের সঙ্গে নিয়মিত, প্রায় রুটিন-বাঁধা, আমার যোগাযোগ। তাছাড়া জ্যান্ত মানুষের পরিচয় এবং আলাপও আবহে বর্তমান। সুতরাং দুই ধরনের তালিকা-নির্মাণ, শরীরের কুলাবে না, সম্ভব নয় জেনে, আর ওই পথ মাড়াইনি। সাতিশয় লজ্জার সঙ্গে পাঠকদের এই সাফাইটুকু আমি জানিয়ে রাখলাম।

প্যাপিরাস প্রেসের কর্মী-বন্ধুদের নিকট আমার ঋণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কল্যাণ হোক তাদের সকলের।

শ. ও
১.৭.৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই

১

প্রকৃতির সন্তান মানুষ। অবিশ্যি। কিন্তু এই জননীকে তার অতিক্রমণ[১] করতে হয়, ঠিক উত্তর-কালে শিশুর মাতৃস্তন পরিত্যাগের মতো। জননীর জঠর ছেড়ে মানুষ মাটির উপর পড়ে। পরবর্তী ধাপে নীল আকাশ যেন জননীর জঠরের মতোই তার মাথার উপর চাঁদোয়া হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির ভেতরে বাস, অথচ প্রকৃতির বাইরে তাকে যেতেই হবে। মানব-গোষ্ঠীর উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত। উভয়ের সম্পর্ক এমনই দ্বন্দ্ব-খচিত। জীব-জন্তুও প্রকৃতির নিকট মুচ্‌লেকা-বদ্ধ। উপজ্ঞা বা ইনস্টিংকটের বাইরে যাওয়া অবিশ্যি তাদের দুঃসাধ্য। পশুপাখির আহার বাসস্থান প্রজনন ইত্যাদির ধরন আর বদলায় না। কিন্তু মানুষ সবই অতিক্রম করতে পারে। ইতিহাসের জটিল-কুটীল বিচিত্র ধারার সূত্র এখানে নিহিত। এই পথেই মানুষ প্রকৃতি-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত।

অতিক্রমণের দায়িত্ব-পালনের সড়কেই গড়ে ওঠে মানুষের অস্তিত্ব যাপনের নানা সম্ভার, তার প্রাণ ধারণের উপকরণ, সমাজ-জীবন এবং মানস-জগৎ। আলোচনার সুবিধার জন্যে পণ্ডিতেরা এমন তিন বিভাগের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তিন পদই অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

ইতিহাসের দিক থেকে একক মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব। দলবদ্ধ হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সমাজীকরণের[২] পন্থা ফলে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। এই ধারাবাহিকতায় মানুষ সমাজ-সম্পর্কের[৩] জটিল, জটিলতার রূপ রচনা করে বসে। দলবদ্ধ সমাজ-কাঠামোর এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের ভেতরে ইতিহাস আপন বিকাশের যথাযথ ছন্দ খুজে পায়। কিন্তু এই উন্মোচন-ধারা সহজ সরল বা একই রেখায় চলে না। প্রকৃতির নিয়ম-অনুযায়ী কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে : আবহাওয়া, জোয়ার-ভাটা ভূমিকম্প ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য, মানব-সমাজ এমন পূর্বে-নির্ধারিত নিয়মের অধীনে পড়ে না। মানুষের সামনে থাকে তদানীন্তন পরিপার্শ্বিকতার মধ্যে ঐতিহাসিক এক-এক পর্যায়ে বিশেষ-বিশেষ

১. transcend ২. socialization ৩. social relation

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের অতিক্রমণের সম্ভাবনা। সে-ই সুযোগ সার্থক অথবা ভন্ডুল দুই-ই হতে পারে। তার পূর্বে-নির্দিষ্ট কিছু নয়। মানুষের মাথার উপর এই তলওয়ার সর্বদা ঝোলানো থাকে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনই সমাজ-জীবনে। দুর্জন বা দেবতা-দুই পথই সম্মুখে উন্মুক্ত। সমাজ আকাশমুখী না পাতালমুখী হবে, তা নির্ভর করে উপস্থিত সুযোগের যুক্তি-যুক্ত সদ্ব্যবহারে উপর। প্রকৃতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় এই শর্ত জড়িত। অতুল-প্রসাদের একটি গানের কলির প্রতিধ্বনি শোনা যায় " "আমার চোখ বেঁধে বলছ হরি, আমায় ধরো" । ভগবৎ-বিশ্বাসী কবির এই ইতিহাসের গতি-পথ নির্ণায়ক দিশারীদের সমস্যা সমান।

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধু-বৈরী, দোস্ত-দুশমন সম্পর্কে বাঁধা। অন্যদিকে সে দলবদ্ধ জীব। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম তার কোনদিন বন্ধ হয় না। অতিক্রমণের নেশা মানুষের রক্তে প্রবাহিত্ তার মানস-জগৎ এই পথেই যুগের যুগে তৈরি হয়। প্রত্যেক জাতির পৌরাণিক কাহিনী, মীথে তার স্বাক্ষর থেকে যায়। এমন-কি সহজে তার হাত থেকে রেহাই মেলে না। প্রাচীন-পরিবেশ অতিক্রমণের পথ ছাড়িয়ে এলেও কাব্য জগতে তার দাগ অবশিষ্ট থাকে। সভ্য মানুষের আবেগের স্ফুরণে তা প্রয়োজন। তাই অতীত কালের শত কল্প-কাহিনী কবির রচনায় গাঁথা হয়। বার বার প্রকৃতির মোকাবিলায় তার আদিম পুরুষের ঐতিহ্য নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। প্রমিথিয়ুস, দরজাল শয়তান প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র যুগে যুগে ফিরে-ফিরে আসে। কারণ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তো শেষ হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বিজয়ের মধ্যে মানুষ আত্মপ্রত্যয় ফিরে পায়। তার মানসিক স্বাধীনতার উৎস এইখানে শুরু হয়। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, অপরিহার্যতার চেতনাই স্বাধীনতা। প্রকৃতির বিধান অমোঘ। এই বিধানের হদিস বের করতে পারলেই তখন প্রকৃতিকে বশ করা বা প্রতিকূলতা থেকে অনুকূলে আনা যায়। হাইড্রোকসের জ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন রাগী নদী শান্ত হয়ে ওঠে। এমন-কি বিদ্যুৎও তাকে প্রসব করতে হয়। রোগ, মহামারী, ঝড় ইত্যাদি বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মোকাবিলার পথেই বর্তমান কালের মানুষ নিজ আসনে অধিষ্ঠিত।

অবিশ্যি তার দুশ্‌মন শুধু প্রকৃতি নয়। দলবদ্ধ জীব সে। হাজার হাজার রকম সম্পর্কের টানা-পোড়েনে সে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে জড়িত। সেখানেও সমস্যা ঘনীভূত হয়। সমস্যার নিরসন আবশ্যক। তাই মানুষ শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে না, নিজের বিরুদ্ধেও তার হানাহানি অন্তহীন। অর্থাৎ, মানুষ মানুষের বিরুদ্ধেও লড়ে। যৌথভাবে সে প্রকৃতির মোকাবেলা করেছিল। কিন্তু সব সময় এমন জোট স্থায়ী হয় না। এক এক সময় গোষ্ঠী স্বার্থে জাতীয় স্বার্থে বা অন্যান্য স্বার্থে অন্য মানুষের বিরুদ্ধে তারা তাল-ঠুকে দাঁড়িয়ে যায়। ইতিহাসে পরিবেশ অতিক্রমণের পথ তাই মানুষের রক্তে পিচ্ছিল। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষের প্রাচীন সংজ্ঞা তখন পরিহাস বৈকি। আবেগের দাপটে বিচার-বুদ্ধি, যুক্তিবাদ থাইপায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন বুঝা যায়, যুক্তির হাতিয়ার দিয়ে সে প্রকৃতি বশ করে, কিন্তু আবেগের ক্ষেত্রে যুক্তি অচল। এই সমস্যা মানব-অস্তিত্বের পক্ষে এক করুণ এবং বিষাদময় ট্র্যাজেডি।

২

জর্মান মহামতি গেটের মহাকাব্য "ফাউন্ট" মানব-অস্তিত্বের এক রহস্যময় কাহিনী। প্রকৃতি বা জড়-জগতের উপর, জ্ঞানের সাহায্যে আধিপত্য বিস্তারের অন্বেষায় ডক্টর ফাউস্ট সফল। কিন্তু সে উপলব্ধি করল যে অস্তিত্বের আভ্যন্তরীণ জ্ঞান তখনও তার নাগালের বাইরে। সত্তার অন্বেষণা তার আয়ত্বাধীন নয়। মানুষের পক্ষে যতো অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় সম্ভব, সবই তাকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু এই অভিযানে এগিয়ে সে বুঝতে পারে, কল্পনায় তার সুযোগ অন্তহীন; কিন্তু জীবন তাকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। ফাউন্ট ভাবে জ্ঞানের অনন্ত-অনেবষাই মানুষকে মানসিক প্রশান্তি দেয় না। তখন সে মেফিস্টোফিলিস বা শয়তানের সঙ্গে বাজি ধরে। বাজির শর্ত : জীবনের সব রকমের অনুভূতি-প্রবণতা[১] ভোগের পর ডক্টর ফাউস্ট যদি পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, তাহলে সে অনন্তকাল নরক ভোগে রাজী আছে। ফাউষ্ট তখন ব্যক্তিগত জীবন থেকে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠির জগতে প্রবেশ করে। নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়-পথে সে শেষে সমুদ্র থেকে জমিন পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়। জোয়ার-ভাটাও তার আয়ত্বে থাকবে। এইভাবে ফাউস্ট মানুষের জন্যে প্রকৃতির পায়ে বেড়ি দিতে অগ্রসর। কিন্তু দেখা গেল সেখানেও অকল্যাণ, অশুভ হাজির হয়। তা হচ্ছে আবেগের ধাক্কা এবং কাজ সম্পন্ন করার পথে বাড়াবাড়ি জাত জুলুম। কাহিনী, আশা করা যায়, সকলের মনে আছে। ফাউস্টের পুনরুদ্ধারকৃত জমিনের পাশে ছিল একটি গির্জা এবং দুই দম্পতি-ফিলোমেন ও বোয়েসিশ। তারা জমি বিক্রি করতে নারাজ। উচ্ছেদ-পর্যায়ে ঘরে আগুন লেগে যায় এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধ উভয়ে পুড়ে মরে। ফাউষ্টের তার জন্য কোন আফশোষ নেই। মঙ্গল করতে এমন ঘটতে পারে। শেষে ফাউস্ট অন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য; সে শয়তান কর্তৃক প্রতারিত। অন্ধ ডক্টর ফাউস্ট প্রেতাত্মাদের হুকুম দেয় এবং সে ভাবে তার আরব্ধ কাজ এগিয়ে চলেছে। ডক্টর ফাউস্ট জানে না, প্রেতাত্মারা তার কবর খুঁড়তে ব্যস্ত।

অস্থিরতা মানুষের অতিক্রমণের পথ। আবার একই সময়ে তা অপরাধ। মানুষের অগ্রগতি তাহলে কোন পথ ধরে আসবে? গ্যেটের কাব্যে তার জবাব নেই। প্রাচীন পারসীক কবি লিখেছেন যে পৃথিবী সেই পুথি যারা গোড়ার দিকের মতো শেষের দিকের পাতা গায়েব।

এইসব ছিন্নাংশ উদ্ধার মানুষ পরিত্যাগ করতে পারে না। বর্তমানের সম্যক

১. Sensibility

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের পরিচয়ে অতীতকে তার জানতেই হয় এবং বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সচেতন বা অচেতনভাবে মেলানোর দায়িত্ব ও তার উপর বর্তায়। নচেৎ অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতির পরিচয় সে কী করে পাবে? পৃথিবীর তাবৎ সংস্কৃতি অন্যতম মন্ত্র এই উৎসগুলোকেই উচ্চারিত।

৩

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা। অথচ তার সংজ্ঞা এখনও অনুচ্চারিত। পণ্ডিতেরা এখানে অনিশ্চিত রাজ্যে বাস করে। সংজ্ঞা বস্তুটি তাই দূরে সরিয়ে রাখা। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, কোন মানবগোষ্ঠীর কারুশিল্প এবং জীবন-যাপনের প্যাটার্ণ বা বাঁচই সংস্কৃতি। কারো মতে, ব্যক্তি মানব চরিত্রের ঔৎকর্ষজাত কৃতিত্ব সংস্কৃতি-রূপে গণ্য কবি টি.এস. এলিয়টের মতে, যৌথ জনজীবনের সংহতিময় প্রকাশই সংস্কৃতি। ব্যক্তি থেকে সমাজ-জীবনে কবি ঝাঁপ দিয়েছেন। এক জর্মাণ চিন্তাবিদের মতে সংস্কৃতি প্রতীক (সিম্বল) প্রসূত নকশার জগৎ। চারুকলা সাহিত্য, কাব্য, ধর্মীয়চার-উৎসব প্রভৃতির মধ্যে তা রূপ পায়। প্রত্যেক সংজ্ঞার ভেতর সত্যের কিছু আভাষ মেলে। তাই সংস্কৃতির সংজ্ঞা দূরে রাখা। বরং চলার পথে অন্যান্য রাস্তার সঙ্গে পরিচয়-লাভের মত সংজ্ঞার অন্য প্রতিমূর্তির সাক্ষাৎ মিলতে পারে।

মোটুমটি বলা যায়, সংস্কৃতি সেই মানস-আবহ যা মিছরীর সূত্রের মতো গোটা সমাজ-জীবনকে অখন্ডতায় বেঁধে রাখে। অবিশ্যি সকল সমাজে কিছু মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠী পাওয়া যায়, যারা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরোধী। সংহতি তখন বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত। যদি দেখা যায় ক্রমে-ক্রমে বহু মানুষ সেদিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন ধরে নিতে হয়, সমাজের খোলস-ছাড়ার প্রয়োজন আশু-কর্তব্য। পুরাতন সুতো আর মিছরীর পিণ্ড বেঁধে রাখতে অক্ষম। তখন সমাজ-কাঠামোর প্রশ্ন নতুন করে ভাবা দরকার। অবিশ্যি প্রচলিত কাঠামোর ভেতর কিছু লোকের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ থাকা কল্যাণকর। যদি এমন চিন্তার মধ্যে কোন সত্য নিহিত থাকে, তার প্রসার বাঞ্ছনীয়। কারণ, সত্যের দরজায় হুঁকো দিয়ে মানুষ স্বধর্মচ্যুত হতে বাধ্য। আর ওই ধ্যান-ধারণার মধ্যে যদি সত্য কিছু না থাকে তা কেউ গ্রহণ করবে না। পাগলের প্রলাপ হাস্য-উদ্রেক করে। এমন ধ্যান-ধারণা কিছু চাঞ্চল্য তুললেও তা নিঃশেষ হতে খুব বিলম্ব ঘটে না, ঠিক ফ্যাশনের মতো।

সমাজ-কাঠামোর প্রশ্ন বার বার উথাপিত এইজন্যে যে, মিছরীর সুতো ত তারই ভেতর গোপন থাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। কারণ, ধ্যান-ধারণা নিবৃন্তক 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' হলেও তা-ই ত রূপকের লেবাসে মিছরীর সুতো। সেখানে টান পড়লে মিছরী আর মানুষ নানা সুযোগ-সুবিধা বা ফায়দা ওঠায়। যেহেতু সমাজে অস্তিত্বের জন্যে জড়-সামগ্রী প্রয়োজন, সেই সামগ্রীর ভাগ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁটোয়ারা নিয়েই তখন বিরোধ বাধে। প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত নির্বস্তুক থেকে বস্তুতে গিয়ে পৌঁছায়। কাজেই নৈতিক সমস্যা বা প্রশ্ন শূন্যে কোলে না বা নিরালম্বন কিছু নয়, বরং দৈনন্দিনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সংহতি চূর্ণকারী কোন চিন্তার স্বাধীনতা জড়সামগ্রীর সিংহাংশ-ভোগীরা দিতে পারে না; আদর্শগত-ভাবে তার কল্পনা, কি মূল্য যতই মোহনীয় হোক। ধ্যানাদর্শের সঙ্গে তারই মানুষের গোটা সমাজ-জীবন সম্পৃক্ত। গোড়ার দিকে উল্লেখিত, পরিবেশ থেকে অতিক্রমণের পথে গড়ে উঠে মানুষের জীবন-যাপনের সম্ভার, সমাজ এবং মানস-জগৎ। এখন আরো বলা যায়, এই ত্রয়ীর একুন-ফল বা যোগফল স্বতন্ত্র কিছু নয়, বরং সমগ্রতার বিধৃত। শেষ পর্যন্ত মানুষ ধ্যানাদর্শ বা আইডলজির পতাকার তলায় জমায়েৎ হয় তার সামাজিক সমস্যার সমাধানে। কিন্তু তার ভূমিক্ষেত্র একদম পার্থিব জগৎ। অর্থাৎ মানুষ লড়াই করে আইডিয়া নিয়ে, কিন্তু তার সমস্যা মাটি থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ছিল কী স্রেফ জাতীয়তাবাদের লড়াই। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সকল প্রকার মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা হটানোর তাগিদ কী কার্যকর ছিল না। আদৌ পেছনে? জবাব নিস্প্রয়োজন।

ইতিহাসে এক পর্যায়ে, ধ্বংপ্রাপ্ত বহু সভ্যতার ভেতর দেখা যায়, কেবল ধ্যানাদর্শ নিয়ে পড়ে থাকে এক শ্রেণি। আদর্শের প্রতি অনুরাগ নয়, বরং প্রচ্ছন্নভাবে ভোগ-সামগ্রীর লালসা। একদা হয়ত এই শ্রেণীর গোষ্ঠী ধন-উৎপাদনে পরিচালকের ভূমিকায় ব্যাপৃত ছিল, যা সমাজের জন্যে হিতকর। নেতৃত্ব দিলেও তারা অবসর-পুষ্ট জীব নয়, বরং সামাজিক ধন-উৎপাদনের অপরিহার্য সহায়ক। তত্ত্ব তখন প্রয়োগ-রূপে শ্রমের কাছেই ফিরে আসে। থিওরি ও প্র্যাক্টিসের সমঝোতা তখনও বর্তমান। কিন্তু কালে কালে এই পরিচালক-গোষ্ঠী হয়ে পড়ে স্রেফ অবসর-পুষ্ট ভোগী-শ্রেণি। তত্ত্ব তারা আঁকড়ে থাকে। কিন্তু প্রয়োগ দ্বারা তা আর যাচাই হয় না পূর্বের মতো। এমন গোষ্ঠী তখন পরভোজী-প্যারাসাইটে পরিণত হয়। শিল্পে, বিজ্ঞানে, অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দেয়। চীন, মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রীস-রোম প্রভৃতি সভ্যতার মধ্যে ধ্বংসের ফাটল এই ভাবেই শুরু হয়েছিল। বহু সভ্যতার নাভিশ্বাস বা 'জানকান্দানীর কাহিনী প্রায় একই রকম। হেরফের যে টুকু থাকে তা স্রেফ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য প্রসুত। অবক্ষয়ের যুগে আদর্শে পতাকার নিচে স্বার্থভোগী শ্রেণি জমায়েত হয়। অবিশ্যি যারা নিপীড়িত, নিস্পিষ্ট শ্রেণি ,তারা আবার অন্য আদর্শের পতাকা তোলে। সেখানে আর এক ধ্যানাদর্শ। পৃথিবীতে আবার দেখা যায়, একই সম্প্রদায়ের মধ্যে উপসম্প্রদায়ের সূত্রপাত ঘটে। তাও আদর্শ নিয়ে শুরু হয়। বৌদ্ধরা হীনমান, মহাযানে ভাগ হয়ে যায়। খ্রিস্টানরা ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, এ্যাংলো মেথডিষ্ট, কোয়েকার অগয়রহ শাখায়। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা বাহাত্তর 'ফেরকায়' তারা বিভক্ত। কিন্তু বর্তমানে এই বিভাগ সওয়া শ'র বেশি, যদিও শিয়া-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্নীর লড়াই প্রথমে চোখ পড়ে। সমাজে এক পরিবেশে সে আদর্শের জন্ম, কালক্রমে সেই পরিবেশ ত থাকতে পারে না। অথচ শিশুর জামা কিশোরের গায়ে লাগানোর ধ্বস্তাধ্বস্তিকসরৎ তখনও অব্যাহত থাকে। তা থেকেই নতুন সংস্কারবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। খলিফা হারুনর রশীদের সময় এক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দেয়। জঙ্গী নামে খ্যাত। তারা হারুনর রশীদকে মুসলমান বলে স্বীকার করত না। তাদের নামাজ পরিচালনার জন্যে ইমাম ছিল স্বতন্ত্র।

সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাইয়ে ধ্যানাদর্শের এই স্রোত গতি লক্ষণীয়।

৪

বিকাশ-পথে আবার সব সংস্কৃতির সম্মুখে থাকে প্রসারণের ক্ষুধা। রূপায়নের পথে তাই-ই ঘটে। "আমার যৌবন-স্বপ্নে ছেয়ে যাবে বিশ্বের আকাশ।", রবীন্দ্রনাথের নায়কের ঘোষণা তখন ধ্বনিত হয়। আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ী ক্ষুধার মধ্যে ছিল সেই অভীপ্সা। ক্ষুদ্র গ্রিসের দ্বীপযুঞ্জ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য কেন্দ্র। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য ও অন্যান্য অন্বেষার প্রতিক্ষেত্রে তাঁরা যে অবদান রেখে গেছেন, তা আজও মানব-সভ্যতার জয়-যাত্রার দিকশূল। পরবর্তী রোমক-সভ্যতার মধ্যেও প্রসারণের ক্ষুধার কাহিনী সকলের জানা। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার সমুদ্র-তীরবর্তী বহু দেশ ছিল রোমানদের উপনিবেশ। এক কালে প্রবাদ ছিল, সকল সড়ক রোম শহরে গিয়ে পৌঁছায়। তেমনই ক্ষুদ্র মরুভূমির বুক থেকে কালে কালে আবার আরবরা কতো দিকে না ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণে সুদূর ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিমে আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল, বর্তমান বল্কান প্রদেশ, একদা ফ্রান্সের সীমান্ত, ককেশাসের পাদদেশ, মধ্যএশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের বিশাল প্রান্তর। আরবরা অল্প সময়ের মধ্যে পারস্য এবং রোমক সভ্যতার বুনিয়াদ তছনছ করে ফেলে। রাজ্য-বিস্তারের নেশা-এই ছেঁদো শব্দ দিয়ে তারা ব্যাখ্যা চলে না। নানা আভ্যন্তরীণ হেতু থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে যে-প্রস্তাববাণী তখন উচ্চারিত হয়েছিল, তার প্রতিধ্বনির অভিঘাত কী প্রচণ্ড, তা-ও হিসেবে ধরা উচিত। নচেৎ জরথুস্ত্রের বিশাল প্রভাব ইরান থেকে ইসলামের ধাক্কায় একদম প্রায় মুছে গেল কী করে? অবিশ্যি এটুকু বলে রাখা ভালো, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাল (টাইম) সব সময় সুদুর বিস্তৃত। স্বল্প সময়ের পরিমাপ সেখানে পাশে সরিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

তাই আধুনিক কালের সঙ্গে প্রাচীন সাংস্কৃতিক জগতের মানচিত্র আর মিলিয়ে দেখা যায় না। অনেক হেরফের, অনেক পরিবর্তন ঘটে। ষাটের দশকে চৈনিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব-কালে রেডগার্ডদের শ্লোগান ছিল "ওয়াইপ আউট দি ওল্ড সিভিলাইজেশান। পুরাতন সভ্যতা মুছে ফেলো।" তার ফলাফল এখানে বিচার্য নয়। তবে এটুকু ঠিক, এমন চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া দায়। ঠিক ভূ-স্তরের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগতও বিভিন্ন ধাপে স্তরীভূত। উপরের ভাগ তার সঠিক পরিচয় নয়। নিচের বুনিয়াদ খুঁড়ে খুঁড়ে গেলে ঠিকুজীর বিচিত্র কাহিনী তখন মেলে। মানুষের ছয় হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসের বাইরেও অলিখিত ইতিহাস বিস্ময়কর। সেখানেও চড়াই-উৎরাই আছে। দেখা যায়, উৎরাই-পথে এক সভ্যতার কেন্দ্রীয় "পাউডার হাউস" বিদ্যুৎ উৎপাদনের (অর্থাৎ প্রেরণায়) তোড় হারিয়ে ফেলে। যদি কিছু থাকে, তা বড় কম-জোর। অর্থাৎ ভোল্টেজ, খুব নিচু। কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্র একদম নির্বাপিত তা বলা চলে না। ঐতিহাসিক নানা পরিবেশে অন্য লাইনের তারে তার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। অথবা, কম ভোল্টেজ হলেও 'পাউয়ার-হাউস' স্থানান্তরিত হয়। পৃথিবীতে এমন বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে পারে।

ভাগ্যদেবীর হাসির মতো সংস্কৃতির জগতও ভবিষ্যৎবাণীর তোয়াক্কা রাখে না। তার উৎস-মুখ কোন দিকে ধাইবে-বলা দায়। সংস্কৃতির গ্রিস থেকে রোম-অভিমুখে সফরের গতিপথ লক্ষণীয়। আবার রোম থেকে ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশে এবং পরবর্তী কালের বিস্তৃত সড়ক ধরে আবার য়ুরোপে এবং বর্তমানে অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে আর এক মহাদেশে। এসব সফর নামার নানা ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকেরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তৃপ্তিদায়ক যুক্তিযুক্ত জবাব মেলে না। অনেকে এ ব্যাপারে তাজ্জব হতে পারেন। গ্রিসের অবস্থান য়ুরোপে হলেও তার সংস্কৃতির আরবদের কল্যাণে আবার য়ুরোপে পৌঁছায়। সিরিয়ার গির্জার অধ্যক্ষরা গীক দর্শন-বিজ্ঞান অনুবাদ করে এ্যারামিক ভাষায়। এ্যারামিক থেকে এ্যারাবিক অর্থাৎ আরবি তর্জমা। উন্মায়েদ শাসন-কালে এই সব পাণ্ডুলিপি স্পেনের ভেতর দিয়ে য়ুরোপে পৌঁছায়। ভূমধ্য-সাগর পারাপারের কান্ড। আরবী থেকে পরে ল্যাটিনে।

AMARBOI.COM

চড়াই-পথে গোটা পৃথিবী অত্র অনুরাগীদের বাসভূমি হয়ে দাঁড়ায়। দেশ-বিদেশের ফারাক থাকে। সত্যের প্রদীপ যেখানেই জ্বলুক না কেন, সেখান থেকেই জ্ঞানরাজ্যের মুসাফিরগণ নিজেদের প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয়। সকল পাকস্থলীধারী ব্যক্তি সব কিছু খেয়ে হজম করে। বেশিভাগ বিচারের দরকার পড়ে না। উৎরাই-মুখী সংস্কৃতির সেবক অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ-উদরাময় রোগীর সঙ্গে অতুলনীয়। তাকে বৃহৎ না- না- নিগেটিভের আশ্রয় নিতে হয়। যত তার পাকস্থলীর পরিপাক-শক্তি দুর্বল হয়ে আসে, ততোধিক ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে ঢোকে তার পৃথিবী।

রেনেসাঁসের বায়ু আন্দোলিত, এলিজাবেথান ইংল্যান্ডের কবি জন ডান ফুক্‌রান দিতে পারেন-

Death diminishes me
Because I am involved in mankind.
So never aks for whom the bell tolls
It tolls for thee.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু আমাকে খর্ব করে
কারণ আমি জড়িত মানবতার সঙ্গে।
জিজ্ঞেস করো না, কার জন্যে মৃত্যু ঘণ্টা বাজে,
জেনো, সে তোমার জন্যে, সে তোমার জন্যে।

বিকাশ-কাল সংস্কৃতির প্রবণতা এমনই। তখন পৃথিবীকে অনুরাগীগণ আলিঙ্গনপ্রয়াসী। মুসা তারেক ৭১২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে অবতরণের পর নাকি বলেছিলেন, ইকবাল-কাব্যের ভাষায়, "এই ভুখণ্ডের মালিক আমার আল্লা। সুতরাং এখানে আমার অধিকার আছে।"

"উত্থান-কালে সংস্কৃতি জীবনের নানা দিক থেকে পৃথিবী-কে আর আলাদা কিছু করে রাখে না।

৫

অনেকে মুসা তারেকের ঘোষণার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী এষণার সাদৃশ্য খুঁজতে পারেন। কিন্তু তা ভুল। কারণ, রাজ্যজয় দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ সুচিত চড়াই উৎরাই হয় না সাম্রাজ্যবাদের হালফিল দু'শ সোয়া দু'শ বছরের ব্যাপার। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ তার সঙ্গে আজ মর্মে-মজ্জায় পরিচিত। সাম্রাজ্যবাদ একটি অর্থনৈতিক 'সিস্টেম' বা বিধান শৃঙ্খলার ব্যাপার। পূর্বে রাজ্য-বিজেতারা কালে কালে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়ত। বর্তমানে তা আর দরকার হয় না। সাম্রাজ্যবাদীরা স্বদেশে থেকেই তাদের শোষণ এবং শাসনের কল-কাঠি নাড়তে পারে। দেশী মুষ্টিমেয় এজেন্টরা তাদের আঙ্গুলের ইশারায় ফারফরমাস খেটে যায়। অবিশ্যি সাম্রাজ্যবাদেরও নানা রূপান্তর ঘটেছে। একদা এক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসেছিল। বর্তমানে বহুজাতির জোট-বিশিষ্ট বা বহু কোম্পানির জোট বিশিষ্ট কোম্পানি পৃথিবীময় দাপটের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং লালসা চরিতার্থ করে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বর্তমান ক্ষুধার সঙ্গে পূর্বকালের ধ্যান্যদর্শ প্রসারের সাথে সাথে কোনো দেশজয়, তুলনায় তেমন ধ্বংসকর কিছু ছিল না। বর্তমানে ওই অক্টোপাশের মূল্যে শুধু অর্থনীতির মধ্যে আটক নয়। অসংখ্য দৃষ্টক্ষত হয়, ব্যাঘ্র-স্পর্শের মতো সংখ্যা বহু-যা একটা গোটা জাতির শুধু আত্মা বিনষ্ট করে দেয় না, বরং আত্মহত্যাবোধের নানা সাঁড়াশি যুগপৎ চালনা মারফৎ যমের মতোই মৃত্যু-তাণ্ডবের মত্ততা দেখায়।

সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই ত কাল্পনিক জগতে হয় না। তা মানুষেরই জগতে ঘটে। সুতরাং এমন পৃথিবীর হাল-হকিকৎ জানা ছাড়া সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। আরো যোগ করা দকরার, পূর্বে অর্থনীতি ছিল বিকেন্দ্রিকত ব্যাপার। এক এক দেশ নিজের চৌহদ্দির মধ্যে মোটামুটি অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ মেটাত। এখন তা কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যবাদের চত্বরে। তৃতীয় বিশ্ব অদৃশ্য এক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা। ভাত না থাকলে জাত থাকে না, বাঙলা প্রবাদ আবার নতুন ভাবে উপলব্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কৃতির সঙ্গে ভাতের কী সম্পর্ক, অনেকে একথা ভাবতে পারেন।[১] শুধু আহারের জন্যে মানুষ অস্তিত্ব ধারণ করে না। কথাটা সত্য বৈকি। কিন্তু কতটা সত্যি? বাইবেলের বাণীর সঙ্গে আরো যোজনা উচিত।[২] কিন্তু আহার ছাড়া মানুষ বেশি দিন বাঁচে না। যীশুর কথার সঙ্গে এই অংশটুকু জুড়ে দেওয়া থাকলে পৃথিবীতে লড়াই ফ্যাসাদ অনেক আগে থেকে হ্রাস পেত। সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে ভাতে মারে, পরে জাতে মারে। জাত অর্থ মানুষের সেই আত্মসম্মানের চেতনা যা তার মানস-জগৎকে সুস্থ জীবন-বোধের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

অবিভক্ত বঙ্গের দুশ বছরের ইতিহাসে তেমন বেগবান সাংস্কৃতিক স্ফুরণ কোথায়? উনিশ শতকের শেষ পাদে যে-টুকু দেখা যায়, তা-ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বাইরে ব্রিটিশের টেবিল-নিক্ষিপ্ত হাড়গোড়ে লালনপৃষ্ট এক শ্রেণী মধ্যবিত্তের প্রচেষ্টা মাত্র। সমগ্র সমাজে সংহতি দানকারী শক্তি হিসেবে সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্যের উপর মনীষীরা জোর দেন তা অনুপস্থিত। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টারদের লিখেছেন,[১] বর্ণ হিসেবে এই বাঙালীরা কী সুন্দর না নির্দশন.... চেহারায় যেন ব্যায়াবিদ... ওদের চলাফেরা কী মনোহর..." ইত্যাদি। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর মাঠে ইংরেজদের জয়। সাতচল্লিশ বছরের ব্যবধান ১৮০৭। পর-পদানত বাঙালি। তখনও অন্তত তার অঙ্গ সেষ্ঠিব মুছে যায়নি। কিন্তু একশ' ছিয়াত্তর বছরের আজ আমরা কোথায়? বাংলা পাঁচের মতো মুখ, শীর্ণদীর্ণ। অঙ্গ-সেষ্ঠিব থাকবে কী দিয়ে, যদি খাদ্য বিশ্রাম চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতের আশা সামনে না থাকে? আজ ভাত পর্যন্ত গায়েব। এবং পশ্চাৎ দেশে লাথিও চার শ' আশি বার[২] মারফৎ বিদেশ থেকে আনা চালে-গমে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এমন কী খাদ্যভ্যাস পর্যন্ত বদলাতে হয়েছে। তাই বলা সংস্কৃতি নিরালবদ্ধ কিছু নয়। যেহেতু মানুষের জীবন-সম্পৃক্ত।, সেই জন্যে মানসিক প্রয়োজন এবং সমস্যার সঙ্গে সংস্কৃতি বিচরণ করে।

এই পথ ধরে, সংঘাতও অনিবার্য হয়ে পড়ে। দেখা যায়, ধ্যানদর্শের রূপায়ন কোনো ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কতকটা মোহ মরীচিকার মতো।[৩] তখন এক সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির মানুষের সংঘাত ঘটে। হয়ত এমন মরিচীকার মধ্যে সেই বীজ থাকে যা জাঁ পল সাত্রের ভাষায় : "অন্য লোক ত জাহান্নাম।"[৪] অর্থাৎ, সংঘার্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে। অতীতকালে পৃথিবীর এক খণ্ডের সঙ্গে অন্য এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন সুগম ছিল না। তখনও অমন সংঘাত প্রবাহ বন্ধ হয়নি। আলেকজান্ডার কী খামকা বিবাগী হয়েছিলেন? আধুনিক

১. Man does not live by bread alone. ২.. He has not lived long without it.

১.. ...What is fine specimen of race these Bengalies are. How athlatic in figure. How graceful in movement.... ২. P.L.O 480 ৩. Passion and illusion

৪. Other man is the hell

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালে বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখন গোলক-গ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ। এখন সংঘাত ত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক আধিপত্য অটুট রাখা সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য। উন্নততর মরণাস্ত্রের উপর কিন্তু তারা আর অত আস্থাশীল নয়। সাম্রাজ্যবাদের তূণে তাই নতুন বাণ সংযোজিত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য-বিস্তার অর্থনীতির ময়দানে নিশান পুঁতে তারা ক্ষ্যান্ত হয় না, সংস্কৃতির ময়দানেও নিশান পোঁতার ফন্দি অব্যাহত রাখে।

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে হলেও, আরো কিছু অতীত ও বর্তমানের অভ্যন্তরে হাঁটা আবশ্যক। কারণ, তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকরা সহজে দেখতে পায় না শত্রুর অদৃশ্য কারসাজি। আর অত্র-দুনিয়ার অধিকাংশ 'এলিট' বা 'সেরাংশ' দেখে না-দেখার ভান করে।

বিগত দেড়'শ বছরে চারটি-এক হালি দেশ ছাড়া আর সব মুসলিম রাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী হল্যান্ড এবং স্পেনের পদানত হয়। ইয়েমেন, সৌদী আরব, তুরস্ক আফগানিস্তান মাত্র স্বাধীন ছিল। ইরান, মিশর নামে মাত্র স্বাধীন। বর্তমানে জাতিপুঞ্জে মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা ছাপান্ন'র বেশি। সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। মাত্র দেড়শ' বছরের ১৭১৮ থেকে ১৯৫৬ এমন কাণ্ড ঘটেছে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডোনেশিয়া ডাচদের কুক্ষিগত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক দেশ অবিশ্যি স্বাধীনতা ফিরে পায়।

কেন পূর্বোক্ত বিপর্যয়? য়ুরোপীয়দের এই অবিশ্রান্ত অভিযান কী তাদের উন্নতর সংস্কৃতির ফল? ধর্মীয় গর্ব গরিমা অথবা য়ুরোপীয় অর্থনীতি তার পেছনে আসল চালিকা শক্তি?

উপনিবেশ-বিজয়ে বিজেতাদের দম্ভ অবিশ্যি কোথাও কম দেখা যায় না। উনিশ শতকের শেষেও অবিভক্ত ভারতে য়ুরোপীয়দের ক্লাবের ফটকে সাইনবোর্ড টানানো থাকত,[১] কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ-নিষেধ। অথবা মনে করতে পারেন, ফরাসী জেনরেল গুরোর[২] কথা। সেদিনই বলা যায়; কারণ সময় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। দামেস্ক বিজয়ের পর গুরোর প্রথম কাজ হলো, ওম্মায়েদ মসজিদের সংলগ্ন কবরস্থানের দরজায় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলা : সালাউদ্দীন, শোনো, আমার আবার ফিরে এসেছি।"[৩] সালাডীন, ক্রুসেড-বিজয়ে গাজী সালাউদ্দীন।

মন্তব্যে কালক্ষেপ বৃথা। সাম্রাজ্যবাদীদের এমন নৈতিক সমর্থনই তা এ যুগেও আবশ্যক। তা খ্রিস্টধর্মের দোহাই হোক, ক্ষতি নেই।

আরো এক দিক। পৃথিবীর সবার জানে এবং বলে য়ুরোপ নাকি চার্চ এবং স্টেট (রাষ্ট্র)-কে আলাদা করে বসে আছে। কিন্তু উপনিবেশের ক্ষেত্রে বা আধিপত্য রাখার বেলা এই গর্ব পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। খ্রিস্টান মিশনারীদের কাণ্ড-কলাপে তা

১. Dogs and Indian not allowed. ২. Gouroud
৩. Sa Ladin. listen was have returned

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্ট। এক চিন্তাবিদ মিশনারি পাদ্রীদের সাম্রাজ্যবাদীদের আধ্যাত্মিক স্কাউট রূপে আখ্যাতি করেছিলেন। সকলের জানা, স্কাউট মানে খোঁজ আনার জন্যে প্রেরিত ব্যক্তি বা গুপ্তচর। সাম্রাজ্যবাদ ধর্মীয় আবরণে এই কৌশল আঁত বিচক্ষণতার সঙ্গে আজও অনুসরণ করে আসছে। পাদ্রী মহোদররা, তাদের রসদ-সাপ্লায়ার প্রভুদের এমন অভিসন্ধি ধরতে পারে না; ওদের এমন আহম্মক ঠাওরানো ভুল। মিশনারী মারফৎ শান্তির পূজারী যীশুর বাণীর সাহায্যে উপনিবেশে খ্রিস্টান রচনার ফল তো এখন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো-ছোঁয়াই সমস্যা। মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইন সমস্যার সমান্তরাল আর এক সমস্যা লেবানন। তার ম্যারিয়ট খ্রিস্টানদের ভূমিকা তো এখন প্রতিদিন পত্রিকার শীর্ষ খবর। একদা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট উড়ে এসে জুড়ে বসা এই সম্প্রদায় এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান মদদগার। ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের হেতু, স্থানীয় দেশজ খ্রিস্টান নাগরিক। এখন বার্মা সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে কারেন খ্রিস্টানরা। আর প্রতিবেশী ভারত-রাষ্ট্রের এখন প্রতিদিনের অসহ্য মাথাব্যাথা আসাম নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা প্রভৃতির উপজাতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্কিন ব্যাপটিস্ট মিশন ওই সব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। গরিব দেশে এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা ভাতের ভেতর দিয়ে আঁতের ভেতরে ঢোকে। আঁত দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায় ক্ষুন্নিবৃত্তি অভ্যন্তরে তখন ঈশ্বরের পুত্রের ঐশী আলো (জলোয়া) ঐশ্বর্য দেখতে পায়।[১] ব্রিটেন-আমেরিকা এই প্রয়োগে একটু বিলম্ব করে না। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বে আধিপত্য রক্ষার ফন্দিফিকির অসীম ধূর্তত-প্রসূত। কতো রকম ভেক না ওরা গ্রহণ করে। ব্যক্তিগতভাবে, মানবপ্রেমিক, ধর্মপ্রাণ মহিলা মাদার তেরেসাকে এখন তাদের বিবেক-রূপে বিশ্বের নগরে নগরে ইকজিবিট করে বেড়ায়। এই অবলা রমণী ভেবে দেখেন না, ভিয়েৎনামে যুদ্ধ চলার সময় যাদের এক মাসের ব্যয় ছিল তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর এক বছরের বাজেটের সমান, তারা কেন তাঁর মানবতার এমন উৎফুল্ল অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে এবং ধন-ভাণ্ডার খুলে রাখে বদান্যতার পরিচয় দিতে? জেনে রাখা উচিত, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তরুণী বয়সে যখন মাদার তেরেসা কলকাতা শহরে এসেছিলেন, তখন গোটা ভারতবর্ষের সামনে একটা মাত্র সমস্যা ছিল প্রথম, প্রধান এবং আসল স্ববিরোধিতা, প্রতিবন্ধখাত তাদের পরস্বাধীনতা। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ভারতবর্ষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং সর্বপ্রকার পশ্চাৎপদতা অপসারণের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গোলামী হটানো। মাদার তেরেসা দুঃস্থতা পঙ্গুতা যে দারিদ্র্যপ্রসূত তা দেখলেন না। আর দারিদ্র্যের মূল কারণ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা মাদার দেখলেন না। সত্যিকার মানব প্রেমিক হলে তিনি তা করতেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতেন। দেখা গেল তিনি সাম্রাজ্যবাদের কোলবোরেটার রূপে অন্য পথ ধরলেন। দীন-দরিদ্রের কছে শ্বেতচর্ম তরুণী গেলে ইংরেজ শাসক কূলের প্রতি

১. The nearest way to poor man's heart is down their throat

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহানুভূতি কিছু তো আঁসে। এইভাবে আসল সমস্যা থেকে সৃষ্টি সরানোর কাজে লাগলেন এই ধার্মিক তরুণী। দীন-দরিদ্রের জননী তিনি হতে গেলেন। যাদের গরু তাদের জুতো বিলানোর কাজ মাংস-গ্রাসী গরু-মারা কসাইদের (অর্থাৎ ব্রিটিশের সহায়তায়) ছায়ায়। সাম্রাজ্যবাদ নানা রকম রঙের ঘুড়ি গুড়াতে জানে। তখন এক পুলিশ অফিসার হঠাৎ বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারে ঝুকলো। যেন দেশের নিরক্ষরতা বর্ণমালা সংস্কারের অভাবে ঠেকে গেছে। লোমের জন্যে শিশু মার উদর থেকে বেরুতে অক্ষম। গুরুসদয় দত্ত নামক এক সিভিলিয়ান (অবিশ্যি কৃষ্ণকায় ব্রিটিশ-পদলেহী) তখন গ্রামে ফিরে যাওয়ার স্লোগান মুখ ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেন। মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ায় এমন ফন্দি পৃথিবীতে নতুন নব। রোমান শাসকেরা শহরে শহরে অবক্ষয়ের যুগে খুব সার্কাসের তামাসা বাড়িয়ে দিত। দুঃখ হয়, মাদার তেরেসার মতো সরলা অবলা মহিলারা তা বুঝতেই পারেন না। পাপ ও অন্যায়ের পথে তারা পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং বাহ্ বা কুড়ান।

দুই সংস্কৃতিতে সংঘাত ঘটে। তৃতীয় বিশ্বে তার আরো কী কী রূপ নেয়, তা সামান্য জানা দরকার বৈকি।

৬

সাম্রাজ্যবাদী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত ক্ষাত্র-নীতির উপর নির্ভর করত। উপনিবেশ শোষণ এবং শাসন কায়েম রাখত। অর্থাৎ অস্ত্রেই সব সমস্যার সমাধান। অবিশ্যি গোড়া থেকেই নিজেদের সাধারণ সুখ-সুবিধা ভোগের পথে তারা অনুন্নত দেশে সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন শিকার হয়ত মুষ্টিমেয় দেশি এজেন্ট। কিন্তু অর্থনৈতিক বিস্তারের সমান্তরাল এলাকা এবং স্থানীয় লোকের দরকার হয় বেশি। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের এলাকাও তখন বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের একাংশ বিদেশী সাংস্কৃতিক ছায়ায় লালিল-পালিত হয়। তাদের আত্মর মধ্যে তখন বিভাজন দেখা দিতে পারে। ব্রিটিশ আমালে এ দেশের এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কথা স্মরণ করুন। তারা এদেশে জন্মেও এদেশকে গ্রহণ করতে পারত না। সেখানে মা দেশী বাবা বিদেশী অথবা মা বিদেশী বাবা দেশী। কিন্তু খাঁটি দেশীয়, কিন্তু বিদেশী সংস্কৃতির ধ্যানধারণায় পুষ্ট, তারাও স্বদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পারত না। এই লেজুড়দের স্বার্থ ও মনিবদের স্বার্থের গাঁটছড়ার সঙ্গে বাঁধা। এমন শ্রেণি গঠনে সাম্রাজ্যবাদীগণ দেশী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও হামলা চালাতে শুরু করে। নীরোতে সি চৌধুরীর মতো কালা সাহেব তারই মূর্তিমান ফসল। শাসন কেবল ডাণ্ডার সাহায্যে অব্যাহত রাখা যায় না, তার জন্যে যদি সংশ্লিষ্ট মানসিক আবহাওয়া রচনা করা না থাকে। অ্যারিস্টটলের মতো মহান চিন্তানায়ক পর্যন্ত দাসদের আপন যুগে বা- "বাক-বিশিষ্ট জানোয়ার"[১] ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। অবিশ্যি তা অস্বাভাবিক কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। নিজ যুগের নৈতিক গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে মানুষ অক্ষম। যন্ত্রযুগের পত্তন না ঘটলে দাসপ্রথা দূর হতো না। কোন প্রথম তখনই বাতিল হয়ে যার যখন সমাজের অবস্থান্তরে তা একদম নিস্প্রয়োজন। মোদ্দা কথা, কাজের পেছনে নৈতিক সমর্থন একান্তই আবশ্যক। সাম্রাজ্যবাদীদের হামলা তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুরু হয়। এই পন্থার, এক সঙ্গে দুটো ফল তারা পেয়ে যায়। প্রথম, এক শ্রেণির কোলাবোরেটরের জন্ম হয়। দ্বিতীয়, এই শ্রেণি শুধু দৈশজ মাটি থেকে আলাদা নয়, তাদের আত্মাও খণ্ডিত। এই পদক্ষেপে, প্রথমে দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি সাম্রাজ্যবাদীরা আর কোন সহানুভূতি রাখে না। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য-বর্জিত। ফলে অবহেলায় অবহেলায় রুগ্ন। পুরাতন নৈতিকতা, শ্রেয়বোধ মূল্যরোধের শিকড়গুলো সজীব থাকবে কী, শুকিয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে, খণ্ডিত আত্মার নাগরিকরা পশ্চিমী মূল্যাবোধের সঙ্গে এমনভাবে পরিচিত হতে পারে না যে তা তাদের দৈনন্দিন তার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে। কারণ, উপনিবেশে কেরাণী অফিসার কি মৃৎসুদ্দী হতে পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কৃতির আর কতটুকু বা প্রয়োজন? আর কতটুকুই বা রপ্ত হয়? ফলে, নৈতিকতার এক গোধুলি-লগ্ন চলে তখন দেশের উপর দিয়ে। সমস্ত অনুন্নত দেশ আজ সেই ব্যাধি-পীড়িত। মুষ্টিমেয় যারা পশ্চিমী সংস্কৃতির পূর্ণ স্বাদ পায়, তারা সম্পূর্ণ উম্মুল হয়ে যায়। এমন শূন্যচারী আলোক-লতা ত বৃক্ষ হতে পারে না। প্রাক্তন উপনিবেশ এবং বর্তমানে স্বাধীন দেশের শাসকগণ এখন এই সমস্যার সম্মুখীন। তাদের অধিকাংশ তাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস বা আস্থা রাখতে অনিচ্ছুক বা নিমরাজী। নেতা এবং অনুসারীদের একাত্মতা ছাড়া দেশের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঐতিহ্যের শিকড় কীভাবে বহমান সামাজিক জীবন স্রোতের সিঞ্চন পায়, তার পন্থা-নির্ধারণ এখন কঠিন সমস্যা।

অবিশ্যি সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম থেকেই দেশের মৌলিক মূল্যবোধের গোড়ায় আঘাত হানতে থাকে। বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় না ঘটিয়ে কিছু জ্ঞান-বিতরণের ব্যবস্থা হয়, বিদেশী নিয়ন্ত্রিত স্কুল কলেজ ইত্যাদি মারফৎ। এইভাবে মগজ-ধোলায়ের যে নীতি চালু হয়, তা এক শ্রেণির মানুষকে স্বদেশে বিদেশী বানিয়ে তোলে। তাদেরই লক্ষ্য করে একদা ডি. এল. রায় লিখেছিলেন-

আমরা বিলেতী ধরনে হাসি
ফরাসী ধরনে কাশি
পা-দুটো ফাঁক করে
সিগারেট খেতে বঙ ভালোবাসি।

পুরাতন উপনিবেশ এখন হাতছাড়া। তাই সাম্রাজ্যবাদ নতুন ফন্দী-ফিকিরের আশ্রয়ী। সে-আলোচনা আরো পরে। পুরাতন গোড়ার কথা আরো কিছু বলা দরকার। কারণ, খোল-নৈচা বদলে প্রায় একই ধারা অব্যাহত আছে আজও।

---

১. Talking animal

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দোনেশিয়ার কথা ধরা যাক। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই দেশ ডাচ্‌দের অধিকারে আসে। সাংস্কৃতিক হামলা তখনই শুরু হয়। মিশনারীদের দৌলতে। যার ফলে, মালাক্কা দ্বীপের খ্রিস্টানরা মনে করত, তাদের রক্ষাকারী একমাত্র খ্রিস্টান হল্যান্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়। কিন্তু মালাক্কার খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের আগুন সহজে নির্বাপিত হয়নি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ত সদম্ভ ঘোষণা করেছিলেন,"[১] ইন্দোনেশিয়া ত আমাদের কাছে আল্লার দান।" এখানেও ঈশ্বরের দোহাই। ফরাসীরাও মনে করত, উত্তর-আফ্রিকার এক-এক দেশ-বিজয় সবই গডের মহানুভবতা এবং আশীর্বাদ বৈকি। পৃথিবীকে খ্রিস্টান এবং সভ্যতামণ্ডিত করার দায়িত্ব তাদের। শুধু খ্রিস্টান হলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সংস্কৃতির বন্যাও সেখানে বইয়ে দিতে হবে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে আলজেরিয়ার অধিকার করা উচিত। কারণ, তার ফলে খ্রিস্টান জাহানের মহৎ উপকার সাধিত হবে। সেই সময় ভার্টিকানের আচরণ ছিল বড় ধার্মিকের। য়ুরোপের নয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন মহামান্য মাননীয় পোপ শুধু ফরাসী অস্ত্রশস্ত্রের নামে শপথ নিতে এতটুকু দোলাচল ভাব দেখালেন না। যখন আলজেরিয়া বিজয়ের সংবাদ রোমে পৌঁছল, তিনি ভার্টিকানের গির্জায় "টি ডিয়াম" কীর্তনের আদেশ দিলেন। এই কীর্তন ল্যাটিন ভাষায় লেখা স্তোত্র সঙ্গীত। তার প্রথম চরণ, "প্রশংসা, হে গড, তোমার জন্য।" কালী প্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় বড় দুঃখে লিখেছিলেন, "আজকাল যেখানে যে রাজমুকুট নত হয়, সেখানেই সেই ধর্ম প্রবল।" গোপগণ সকলেই অবিশ্যি আরো একটি পাপে আজও আসক্ত। বিগত তিনশ' বছরের ভার্টিকানে কোন "কালা পোপ" বসেনি। বর্ণবিদ্বেষ থেকে ওদের ধর্মপ্রাণ মানীয় গোপগণও মুক্ত নয়। যেহেতু অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্পদ শ্বেত য়ুরোপের "মনোপলি" সেইহেতু আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আড়ৎদারী মনোপলি চিরন্তন। পৃথিবীময় খ্রিস্টান মিশনারীদের লক্ষ্যে কোন পার্থক্য নেই। তফাৎ শুধু ফন্দি-ফিকিরির হেরফের। সাম্প্রতিক একটি দেশের কথা না বলে থাকা যায় না। কারণ, প্রতিদিন দেশটি যুদ্ধবিগ্রহ এবং হত্যাকাণ্ড-জাত মোক্ষণে ক্লান্ত; লেবানন এবং প্রতিবেশি সিরিয়া। ওই দুই দেশে মিশনারীরা শিক্ষা দিয়েই শুরু করেছিল। ফরাসীরা স্থানীয় ম্যারোনাইটেদের পূর্বে থেকেই সদয় চোখে দেখত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সন্ধি-বৈঠকে এই ম্যান্ডেটরি প্রথা চালু হয়। হেন নীতি সম্পর্কে রলোকনত পন্ডিত জওহর লাল নেহরুর মন্তব্য আজও এতটুকু ম্লান হয়নি :[২] কতগুলো নেকড়েকে ভেড়ার হেফাজত করার জন্যে দায়িত্ব অর্পণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসী ম্যারোনাইট খ্রিস্টানদের সংখ্যা এমন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাল যে স্বাধীনতার পর লেবাননের প্রেসিডেন্ট হবে একজন খ্রিস্টান। তা স্বীকারা করা ছাড়া উপায় ছিল না। বর্তমান লেবাননের গৃহযুদ্ধ পুরাতন বীজেরই

১. God has given us Indonasia

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মোচন মাত্র।

কদর্য নীতিভ্রষ্টতায় ইংরেজ কখনও বাঁয়ে যায় নি। সুদানের উত্তর এবং দক্ষিণ এলাকার কলহ তা মিশনারীদের ধর্মের নামে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি খ্রিস্টান বান্টুস্থান সৃষ্টির পরিণাম।

পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের ধাপ এইভাবে শুরু হয়েছিল, মাদার তেরেসার মতো যীশুখ্রিস্টে নিবেদিত ধর্মপ্রাণ অবোধ মহিলাদের অগোচরে। ঈশ্বরের পুত্র এখন সাম্রাজ্যবাদীদের পরম সহায়ক শিখণ্ডী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ থেকে লেজ গুটোতে থাকে। আফ্রিকা এশিয়ার বহু দেশ জগদ্দত, দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করে। ১৯৪৫-৬০ খ্রিস্টাব্দ-মাত্র এই পনের বছরে ৮০ কোটি লোক এবং চল্লিশটি দেশ স্বাধীন হয়। তারপর আরো বিশ বছরে আফ্রিকার বহু দেশ। সাম্রাজ্যবাদের তাই ভোল পাল্টে ফেলে। এবার হামলা সংস্কৃতির ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে। কোন দেশের মানুষের ঐতিহ্যের শিকড় উৎপাটিত করলে, কী ঘটতে পারে, তার পরিণাম পূর্বে উল্লেখিত। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দূতাবাসের সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক বিভাগও আছে, তথা-কেন্দ্র লাইব্রেরী ইত্যাদি লেজুড়সহ। দরিদ্র অনুন্নত দেশে ঠাট-বাটের ঝলক ত কম মনোলোভা নয়। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরী, দামী দামী নরম কার্পেট পায়ের তলায়, আপহলস্টার্ড চেয়ার ও অন্যান্য আসবাব সজ্জিত পরিবেশ। তদুপরি মাঝে মাঝে ফিল্ম-শো, সুরা-পিচ্ছিল পার্টি প্রভৃতি অবসর-বিনোদনী সামগ্রীর মহড়া স্বদেশের শ্রীহীন দৈনন্দিনতার আরাম-আয়েশের প্রতি লোভ-অভিমুখী মনোবৃত্তি-তৎসহ হীনমন্যতা গড়ে তুলতে যথেষ্ট। সাংস্কৃতিক হীনমন্যতা এবং স্বদেশের শ্রীহীন দৈনন্দিনতায় আরাম-আয়েশের প্রতি লোভ অভিমুখী মনোবৃত্তি-তৎসহ হীনমন্যতা- গড়ে তুলতে যথেষ্ট। সাংস্কৃতিক হীনমন্যতা এবং স্বদেশের ঐতিহ্য সন্ধানে শ্রম-বিমুখ মানসিকতা ঝলমল ঐসব জড়-সামগ্রীর ভেতর দিয়ে অজানিতে আসে। আরো টোপ আছে সঙ্গে। বেশ মোটা অঙ্কের স্কলারশিপ, সংস্কৃতিক বিনিময়ের আওতায় বিদেশে প্রমোদ-ভ্রমণ। এসবই, যথেষ্ট সচেতনা হলে অনুন্নত দেশের তরুণদের পায়ের তলা থেকে দেশের মাটি খসিয়ে নেওয়ার জন্যে মোক্ষম হাতিয়ার। এক কথায়, তরুণদের মগজ-ধোলাই খুব সহজে হতে পারে। ঝলমল ঐশ্বর্যদীপ্ত দস্যুগৃহে আগত অতিথি কী করে জানবে মেজবানের সম্পদের উৎস কোথায়? আতিথেয়তার ঝলকে সে ত বুঁদ।

আরো লক্ষণীয়, সাংস্কৃতিক অঁছিলা-সূত্রে এলিট-সেরাংশদের সঙ্গে যোগাযোগের এ-ই এক সুযোগ। বর্তমানে স্পষ্ট দেখা যায়, দেশের সেরাংশদের ভেতর থেকে উপনিবেশের প্রাক্তন প্রভুরা 'কোলাবোরেটর' এবং এজেন্ট খুজে পায়। দাসদেশের অভিজাত নাগকিরা পূর্বে রাজভাষা শিখতে বাধ্য হতো। এই

১. It is keeping wolves to look after the sheeps.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা মারফৎও পূর্বে যোগাযোগ ত থাকেই। স্বাধীনতার পরবর্তী কালেও সাংস্কৃতিক আওতায় সেই ভাষা অনুসৃত সান্নিধ্য-মারফৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার ফাঁদ পাততে তোফ। আঠাকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। অবিশ্যি মাঝে মাঝে কৌতুকবহ পরিহাসের দৃশ্যও চোখে পরে ইতিহাসে। ঈষৎ প্রসঙ্গান্তর। তবু অনেকের জানা উচিত।

প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের দেশী সেরাংশরা তো সকলেই ইংরেজি জানত। সাম্রাজ্যবাদের আবার আভ্যন্তরীণ কাইজ্যা আছে। মার্কিন এবং ব্রিটিশদের সুবাদ আবার অনুরাগ-বিরাগ-বিপরীত এবং তৎবিপরীতের তিক্ত-মিষ্ট সিরাপে ডোবানো। মধ্যপ্রাচ্য ছিল ইংরেজদের আধিপত্য ও মুনাফা-শিকারের ময়দান। তেলের গন্ধ কুকুরের মতোই ওদের নাকে পূর্বে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সতীন জুটল : মার্কিটন 'কাজিন্' তারা কুনইবাজি শুরু করলে। গুঁতোয় গুঁতোয় ব্রিটিশ আজ মধ্যপ্রাচ্যে কোথাও নেই। আর যেখানে আছে-ছোটা তরফ, জুনিয়ার পার্টনার। নানা উপাদানের মধ্যে ভাষা এখানে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। মার্কিনদের স্থানীয় মধ্যে ভাষা এখানে এক বিরাট ভমিকা পালন করেছিল। মার্কিনদের স্থানীয় আরব সেরাংশের সঙ্গে দহরম মহরম করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তারা তো ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। এমন কাণ্ডও ঘটে ইতিহসে। ভাষা মারফৎ আধিপত্য হারানো।

মোদ্দা কথা, উপনিবেশের প্রভুরা বিদায় নেয়। কিন্তু তাদের মতলবের সিংহদ্বারে শিলালিপির মতো খোদাই করা থাকে " "যাচ্ছি বটে, কিন্তু থাকার জন্যে যাচ্ছি। গোইং ইন অর্ডার টু স্টে।"

জার্মানী প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সব উপনিবেশ খুইয়েছে। কিন্তু জার্মানী ও নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট নয়। চান্সেলার কোনরাড এ্যাডেনুয়ের তো ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে একবার খোলাখুলি বলেছিলেন যে উনিবেশ ছাড়া জার্মানীর চলা দুঃসাধ্য। অবিশ্যি বিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কে আর সে গা-জুরি খাটে না। তাই ফিকির বদলে গেছে। সব রাষ্ট্রেই জার্মানদের কাল্চারাল খাটে না। ইনস্টিট্যুট কি ঐ জাতীয় সংসদ আছে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই পুরাতন উদ্দেশ্য, নতুন-স্বাধীন দেশগুলোর "দীল" (প্রাণ) একটু নরম করো যেন সেই তুলতুলে পথে পুজি নিয়োগ এবং মুনাফা অর্জনের সুবিধা মেলে। ব্রিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় অতি উন্নত জার্মান দেশে হিটলার বর্ণবিদ্বেষ পুঁজি করে ৬০ লাখ ইহুদী গ্যাস-চেম্বারে, অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক কায়দায়, ধ্বংস করেছিল এবং অন্যান্য দেশে বইয়ে দিয়েছিল গণহত্যার তাণ্ডব। সেই দেশের মানুষ আসে অনুন্নত কৃষি-প্রধান দেশে সংস্কৃতি-বিস্তারে।

সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ফারাক এখানে স্পষ্ট যদিও একে অপরের পরিপূরক। এখানে সংস্কৃতির একটা সংজ্ঞা মেলে। সংস্কৃতি সেই মানস-সম্পদ যা মানুষকে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সঙ্গে একাত্ম এবং যুগপৎ প্রকৃতি-অতিক্রমণের সহায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, যেমন গিরিপরিব্রাজকের যষ্ঠি। কিন্তু বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শৃঙ্খলের বন্ধন জাত সংকুচিত পৃথিবীতে ব্যক্তি-মানুষেরও শুধু সংকোচন ঘটেনি, বরং পাস্পরিক সম্পর্কের ব্যবধান আরো বেড়ে গেছে। তবু মনে রাখা উচিত, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদ সমান্তরাল, একে অপরের দোসর।

অনুন্নত দেশে তথা তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক নাগরিকের তাই মেকী এবং আসল সংস্কৃতি যাচাই সম্পর্কে সতর্কতা বাধ্যতামূলক। সংস্কৃতির নামে এক দেশের মানুষকে ঐতিহ্যচ্যুত বানভাসি বা উন্মুল বানিয়ে তোলা যায়।

এই ঢাকা শহরে রোমিওদের দল-বাঁধা বৈকালিক স্বাস্থ্য-ভ্রমণ চোখে পড়ে ব্লু-জীন, টি বা টেরেলিন শার্ট পরিধানে, বৈচিত্রময় কেশ-বিন্যাস সজ্জিত তরতাজা তরুণ সম্প্রদায়। তাদের সামাজিক আচরণ থেকে অনুমান করা যায়, অধিকাংশ বহু জনে জানে না, জীবনের কোন অর্থ আছে। ঐতিহ্য রক্ষার নামে তাদের বিদ্যালয়ে যে আদর্শের সবক দেওয়া হয়, তার সঙ্গে জীবন প্রবাহের কোন যোগাযোগ নেই। সুতরাং এমন পরিবেশে তরুণেরা জীবনের কোন মানে খুঁজে পায় না, নিঃসঙ্গতা ওদের সহজে পেয়ে বসে।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, ব্যক্তির বাঁচার জন্যে তিনটি উপাদান বিশেষ দরকার। সমাজ, জীবন-কাঠামো এবং জীবনের উদ্দেশ্য। সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাই প্রয়োজন সমাজবোধ। কারণ, সমাজে আছি এই চেতনায় কাছে নিঃসঙ্গতা সহজে আসতে পারে না। সমাজে অবস্থান ব্যক্তি মানুষকে স্বাজাত্য বা আডেনটিটির বোধদানে সক্ষম। যেসব প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের এমন বোধ অর্জনে সাহায্য করত, বর্তমানে সে-সব ইনস্টিটুশান আভ্যন্তরীণ মুক্তি খুঁইয়ে বসে আছি। গ্রাম এবং নগর জীবনের পার্থক্য থেকে তা অনেকে ধরতে পারবেন। গ্রামে বেলেল্লাপনা করা দায়। কিন্তু শহের ব্যক্তির স্বাধীনতা বিস্তৃত। সে এক পাড়ায় সৎ থেকে অন্য পাড়ায় অসৎ জীবন-যাপনে সক্ষম। ঢাকা শহরের কলেবর বর্দ্ধিষ্ণু, (অপরাধ) ক্রাইনের সংখ্যাও তদ্রুপ। নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু নগর জীবনে নিঃসঙ্গতার কথা বাদ দেওয়া দুষ্কর। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন জীবন-কাঠামো। যদি তা ব্যাপকভাবে মানসে বিধৃত না হয় তখন জীবন হয়ে পড়ে ছন্নছাড়া। তখন সমাজ-জীবনও ভাঙতে থাকে। বাপ-মার দায়িত্ব ছেলেপুলেদের লালন-পালন তাদের জীবনে একটা কাঠামো এবং উদ্দেশ্য সূচনা করে। এমন কাঠামো না থাকলে জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। অবিশ্যি উদাহরণের জন্যে একটা সাধাসিধা কাঠামোর কথা উল্লেখ করলাম। কিন্তু তা ক্রমশ জটিল হতে পারে বৃহত্তর সমাজ-পটভূমিকায়।

বাংলাদেশে যন্ত্রশিল্পায়নের প্রাথমিক যুগ। নগর-জীবনের সমস্যা এখানেও দেখা দিতে বসেছে। যন্ত্রজাত অবসর আশীর্বাদ, আবার অভিশাপ। অবসর বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে নিসঙ্গতা। জীবনের অর্থ সামনে না থাকলে এই নিঃসঙ্গতা সমাজ-ধ্বংসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা আত্মধ্বংসী চেতনায় পরিণত হতে পারে। বাইরের পরিবেশ-যথা পরিবার, স্কুল-কলেজ, জীবিকাস্থল রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক না থালেই জীবন আর অর্থময় হয় না। এসব নির্ভর করে, মানবগোষ্ঠীর অংশরূপে নিজেকে দেখতে শেখার মধ্যে। অন্যথায় বড় চড়া দাম দিতে হয়। ব্যক্তিত্ব তখন যেকোন উদ্দেশ্যহীন যুপ-কাঠের বলি হতে পারে।

পৃথিবীময় জীবনের অর্থহীনতা এখন নানাভাবে প্রসার লাভ করেছে। তরুণরা শিকার, তা চোখের সামনেই দেখা যায়। কারণ, প্রাচীনসহ বহু বিশ্বাস তাদের কাছে আবেগের দিক থেকে পরিতৃপ্তিময় কিছু দিতে অক্ষম। বয়স্করাও সহজে রেহাই পায় না। অর্থহীন জীবনে তারা অর্থ খুঁজে বেড়ায়। সেই জন্যে দেখা যায়, সামাজিক উপপ্লবের যুগে বহু মার্গপন্থা বা 'তরীকার' আবির্ভাব ঘটে। নিঃসঙ্গ মানুষকে এমন গ্রুপ প্রতিষ্ঠান দেয় প্রশান্তি। কারণ, অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়, সকলেই বন্ধুত্ব প্রয়াসী। এমন দলীয় সমাবেশে পাওয়া যায় হার্দিক উত্তাপ। তাছাড়া এক মার্গপন্থা-তরীকার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তার জন্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা অবিশ্যি প্রয়োজন। এসবই জীবনে একটা অর্থ বহন করে আনে। তবে জানা ভাল, এই জাতীয় মার্গপন্থীরা অন্য মার্গে সত্যের আলোক আছে-তা বিশ্বাস করে না। আবার মার্গীরাও মনে করতে পারে অন্য পক্ষ বিলকুল ঝুটা। সে-যাই হোক, সমাজ, কাঠামো, জীবনার্থ-সবই মার্গ দান করে। অবিশ্যি যুক্তি এখানে বড় কথা নয়। আত্মা অযৌক্তিকতার নিকট মুচলেকা লিখে দেয়। মার্কিন দেশের এক রিপোর্টে পড়েছিলাম, সেখানে ৩০ লাখ লোক এক হাজার নানা মার্গপন্থী। মার্কিন দেশে থেকেই শুরু হয়েছে[১] হরে কৃষ্ণ হরে তরীকা। এদেশে প্রবর্তন সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় ত অতি-সুপরিচিত। পাঞ্জাবে আহমদীয়াদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠান আছে। সামাজিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের লুপ্ত জীবনের অর্থ-অন্বেষণে হন্যে আজ আণন মানুষ। তাই নানা মর্গের অভ্যুদয়।

এত বিশদ এসব কথা বলা, কারণ, সাম্রাজ্যবাদী পরিবেশ সংস্কৃতির নামে অনুন্নত দেশে নানা বিপর্যয় ঘটায়। অর্থনৈতিক সংকট শুধু অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, নৈতিক সংকটও সৃষ্টি করে। একে অপরের পরিপূরক-তাও মনে রাখা উচিত। সচেতনভাবে সামাজিক শক্তিগুলো[২] নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে দুর্বিপাক উপস্থিত হয়।

এইখানে সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যে-মানস সম্পদের সাহায্যে মানুষ সচেতন যুক্তি দ্বারা জানে-কেন সে কোন কার্যকলাপে জড়িত তা-ই সংস্কৃতির অঙ্গ। অন্ধের মত অন্ধকারে হামাগুড়ি বা হাতড়পাতড় বিশ্বাসের[৩] কাজে লাগতে পারে, কিন্তু তা মানুষকে আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ কোন স্বাধীনতার স্বাদ দিতে অক্ষম।

১. Krishna Consciousness, ২. Social forces

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো একটি দিক লক্ষণীয়। শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশ অপসংস্কৃতির বন্যা অন্য পন্থায় বইয়ে দেয়া নয়, দিয়ে চলেছে। তার পূর্বে তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের একটি প্রশ্ন চোখের সামনে সদা-জাগর রাখা উচিত। কেন বিদেশীর এমন অপসংস্কৃতিকর শিকড় চালিয়ে দিতে সক্ষম? তার একটা জবাবে আশা করি, কেউ দ্বিমত হবনে না। অপসংস্কৃতিক তখনই জায়গা করে নেয়, যখন কোন দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের বনিয়াদে কোথাও ফাটল ধরে এবং তাদের মুল্যবোধ দুর্বল নড়বড়ে বা ঢিলে। যার ফলে, অপসংস্কৃতি সহজে প্রবেশ পথ পায়। কিন্তু বহু সৎ ব্যক্তি এই কথা মনে রাখেন না। জাতীয়তাবাদের তোড়ে তার অযথা বিদেশীদের এলোপাতাড়ি গাল দিয়ে ভাবেন, কর্তব্য সমাপ্ত। আবার মূল প্রসঙ্গে ফিলে যাওয়া যাক।

শিল্পোন্নত দেশে বিপুল-উৎপাদন সব সামগ্রী- থাকে বলা হয় ম্যাস প্রডাক্শান। সেই পথে এদেশে এসেছে ম্যাস-কালচার। অনুন্নত এলাকায় তার ঢেউ সাম্রাজ্যবাদীরা বইয়ে দিতে তৎপর। সিনেমা, কানেস্তার কৃত ফিল্ম, টেলিভিশন, রেকর্ড রেডিও, ক্যাসেট, কমিক বই ইত্যাদি মারফৎ তা অনুন্নত দেশে পৌঁছায়। ইলেকট্রনিকসের যুগে খুব সহজ এই ব্যাপার। বেশি সময় লাগে না। বিজ্ঞাপনের মহিমা প্রচণ্ড। জনিপ্রয়তা দিয়ে সংস্কৃতি টুঁ'টি টিপে ধরা সহজ। সংস্কৃতিটর লক্ষ্যে হওয়া উচিত, মানুষের মধ্যে তেমনই চেতনা-বিস্তার-যা তাকে সচেতন করে তোলে নিজের সম্পর্কে অপর মানুষের সম্পর্কে,জগতের হাল-হকিকৎ সম্পর্কে, অপর মানুষের সম্পর্কে, জগতের হাল-হকিকৎ সম্পর্কে: যে চেতনা তার নিজেকেও আরো উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যায় আরো সংগতিময়, সুন্দর পৃথিবী নির্মাণের দিকে। কিন্তু অবসর বিনোদনের নামে তো ঠিক বিপরীত ধারা প্রবাহিত করাই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ম্যাস-কাল্চারের দাপটে তাই চিন্তাবিদেরা আশঙ্কিত। অনেকের মতে, বর্তমান সংস্কৃতির নামে যা পরিবেশিত হয়, তার লক্ষ্য নয়, মানুষ নিজে নিজে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা দ্বারা কোনো বিশ্বাসে পৌঁছাক। বরং তাদের জন্যে রেডি-মেড বিশ্বাস পরিবেশন করা হয়। নিজে চিন্তা করে এবং আধ্যাত্মিক-ভাবে স্বাধীন-এমন মানুষ তো দল-গোষ্ঠীর পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়। কোন আইডলজি ধ্যানাদর্শ বা বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক মূল্য নিয়ে শোষক কর্তৃপক্ষদের কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ সকলেই জনে, মানুষের আবেগকে ভেঙেচুরে নিজে স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার এবং মানবিক সম্পর্কে সকলকে উদাসীন করে রাখার ব্যাপারে গণ-মাধ্যম 'ম্যাস-মিডিয়া' সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এবং যেহেতু হাতিয়ার উৎপাদন করে দেশের শিল্পপতিগণ, সেখানে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকামী কোনকিছু, যেন পরিবেশিত না হয়, সে বিষয়ে তারা হুশিয়ার থাকে। তার চাপ বিভিন্ন বাহনের উপর পড়ে। তা

১. Faith

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকার গল্প হতে পারে কিংবা রেডিও টেলিভিশনের প্রোগ্রাম, সংবাদপত্রের কলাম বা ঐ জাতীয় উচ্চারণ-উৎস। বিনা চিন্তা-ভাবনা স্থিতাবস্থা বা কায়েমী স্বার্থের প্রতি আনুগত্যই মূল লক্ষ্য।

অনুন্নত দেশের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকে স্বভাবতঃই অর্থনৈতিক কারণে। তার ফল এদেশে নানাভাবে প্রকট। বোধ হয়, গত বছর খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, এক বাড়িতে টার্জন-টার্জন খেলতে গিয়ে এক ছ-সাত বছরের বালক তার বালিকা এক চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। এই জাতীয় ঘটা উন্নত দেশেও ঘটে। একবার মার্কিন দেশে এক বালক টেলিভিশন থেকে শিখেছিলেন বুড়ো মানুষকে কিভাবে বিষ খাওয়াতে হয়। তার ইলেম প্রয়োগ করতে বেশি দিন দেরী হয়নি। টেলিভিশণ মারফৎ আসে বিদেশী জীবন-যাপন ধারায় দৃশ্য। অনুন্নত দেশে তার নকল শুরু হয়ে যায়। এই পথে তৃতীয় বিশ্বের উপর অচেতনাভাবে তরুণদের মধ্যে, না, সমগ্র দেশের মধ্যে আর এক মারীবীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তা হচ্ছে : পণ্যভোগী সমাজের[১] লালসা। স্বদেশের অর্থনীতির সঙ্গে তার সঙ্গত থাক না নেই থাক, মনের ভেতর ঐ উৎকৃষ্ট বাসান চেপে বসে। সাম্রাজ্রবাদীরা এইভাবে তৃতীয় বিশ্বে এক শ্রেণির এজেন্ট বা হবু এজেন্ট সৃষ্টির ফাঁদ পেতে ফেলে। ভালো খাওয়া-পরার লোভে এই শ্রেণীভুক্ত মানুষ বিদেশীদের কোলাবোরেটর বনে যায়, যাদের দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ এতটুকু থাকে না। জীবন-যাপনের মানের ভবিষ্যৎ লোভ অনুন্নত দেশে এইভাবে চুপিসারে ঢুকে পড়ে।

টেলিভিশন, সিনেমা শুধু কিছু ইমেজের সচল সরবরাহ নয়, অনেকে যা মনে করেন। ইমেজের শক্তির খবর শুধু কবিকুল জানে না, সাম্রাজ্যবাদীরা আরো বেশি ওয়াকিবহাল। এক বিদেশী সাংবাদিক লিখেছেন যে মানুষের মগজ ইমেজ-তৈরির কারখানা এবং সেখানে জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। কিছু শ্রুতি, কিছু দৃশ্য, কিছু স্পর্শ ইন্দ্রয়জাত বোধ, তার সঙ্গে সামান্য অভিজ্ঞতা-পরিবেশ সম্পর্কে সামান্য খরব; ঠিক যেন চোখের কোণ দিয়ে নীলাকাশ দর্শন। কিছু থাকে সম্পর্কে নির্ণায়ক উপাদান, যেমন, বন্ধু-শত্রু ইত্যাদি। এইসব ইমেজের ভেতর দিয়েই আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তায় স্থান ও কালের ফ্রেমে আবদ্ধ হই। পূর্বে গ্রাম-পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় বা সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্যে কটা সামগ্রীই বা ছিল। অন্য বিদেশী মানুষের কাপড়-চোপ দেখার সুযোগ কোথায়? আজও গ্রামের মানুষের ধ্যান-ধারণা ধীরে গড়ে ওঠে। অবিশ্যি তাদের ফানের জগৎ বিস্তৃত ট্যানজিস্টারের কল্যাণে। কিন্তু চোখের দৌড় বেশি নয় শহরে তিন-চার বছরের ছেলের চোখের উপর দিয়ে ইমেজের ঝড় বয়ে যায়। টেলিভিশন ছাড়াও নগরের দুদ্দাড় জীবন-যাত্রার সমান্তরাল কতো রকমের দৃশ্য তাদের চোখের উপর ছায়া ফেলে। বিকেলে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরুলে বয়স্করাই ইমেজের স্রোতে হাবুডুবু খায়। রাস্তায় ভিড়ের

১. Consumers society

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নক্‌শা কী কম বদ্‌লায়? বয়স্কদের জন্যে আরো উপাদান এসে জুটেছে। খবরের কাগজে পত্র-পত্রিকার। এ-সবই শ্রুত বা দৃশ্য ইমজের উৎস। টেলিভিশনের দৌলতে হাজার হাজার মানুষ চোখের নাগালে নানা দৃশ্য পায়। কাউকে "হীরো" বানানো এযুগে খুব সহজ। দিনের পর দিন নানা মর্ডাণ মিডিয়ায় প্রশংসা কীর্তন চালিয়ে গেলেই কেল্লা ফতে। আরো ধাক্কা আছে। নানা পত্রিকার নানা সুর-মতামত। সত্য-মিথ্যের মুখ চিনে ওঠা দায়। পুরাতন চেতনার সামনে নানা প্রশ্ন খাড়া। তাই এযুগে শত সহস্র নাগরিক তার নিজে চিন্তা করে না। সে তখন আর ব্যক্তিমানুষ[১] নয় দলা-পাকানো মানব গোষ্ঠীর পিণ্ড। এক মার্কিন সাংবাদিক দুই দশক আগে লিখেছিলেন, এদেশে মানুষ চোখে দেখলেও তার বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না তা আবার সে ছাপার হরফে দেখে। চিন্তার অবসর তো কম্‌ নগরের হৈ রৈ যায়িত বহুব্যস্ত জীবনের ধকল সামলে আবার মগজ চালু রাখা অনেকের পক্ষে কঠিন। তখন তারা ছাপা অক্ষর, বেতার ভাষণ বা টেলিভিশনে বা শোনে বা দেখে তাই সত্য বলে আঁকড়ে ধরে। নিজের বুদ্ধি অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাই মারফৎ, যেখানে[২] সত্তা সম্পর্কে চেতনা-অর্জনের সুযোগ তাদের থাকে উপন্যাসের সেই ঘটনা আজ স্মরণীয় যেখানে-গ্র্যান্ড্‌ ইন্‌কুইজিটর ধর্মদ্রোহী এক ব্যক্তির কাছে উপদেশ বর্ষণ করেছেন। বিচারের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা খুব স্পষ্ট নিজে মতামতে-

Yes, we shall set them to work, but in their leisure hours we shall make their life a child's game..... oh we shall allow them even sin, they are weak and helpless, and they will love us like children because we allow them to sin. we shall tell them that every sin will be expiated. If it is done with out permission, that we allow them to sin becuae we love them .... and they will have secretn from us..... the most powerful secrets of their conscience. all they bring to us and shall have an answer for all. Any they will be glad to belive our answer, for it will save them from great anxiety and terrib agony they endure at present in making a free decision for themseves.

শেষ পংক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইমেজের ঝটিকার মধ্যে আধুনিকই মানস গড়ে ওঠে। সবই মুহূর্তের উপর ভর দিয়ে হাঁটে। টেলিভশন বেতারে ছবি-শব্দ হুহু বয়ে যায় সবই অচেতন মনোরাজ্যে গিয়ে স্থিতি পায়ে। স্থায়ী কিছু নয়। প্রতিদিন তাই রীতিমতো হিমসিম খাওয়ার কথা। সনাতন, চিরাচিরত আদর্শ পর্যন্ত নাড়া খায়। আর যদি এই সব নৈতিকতার পেছনে বিভিন্ন মার্গপন্থা থাকে, তাহলে আর রক্ষা থাকে না। য়ুরোপে একই খ্রিস্টান ধর্মের নানা সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ের কোন্দলে দিশেহারা সাধারণ মানুষ। প্রাচীন নিস্তরঙ্গ কৃষিভিত্তিক সমাজ-জীবন হটে গেছে। তার জায়গা

১. Individual, ২. Reality

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিযোগিতা-মণ্ডিত অধীর দৈনন্দিনতা জেঁকে বসেছে দশকের পর দশক। বিভ্রান্ত না হয়ে উপায় কী?

গ্রামজীবনে নৈতিকতা, আদব-কায়দার পেছনে যে-সামাজিক চাপ, বাপ-মা-পাড়া-পড়শীর সজাগ চোখ এবং তালিম থাকে, তার বনিয়াদ শহরে শিথিল। সুতরাং মানসিক-গঠন ইমেজের ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। সত্তার[১] সঠিক রূপ আর মেলে না। জগৎ হয়ে পড়ে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত। অর্থাৎ, চিন্তা-আত্ম-সমীক্ষা বা প্রয়োজন সত্যাকার ব্যক্তির অর্জনে, তা মানুষ খুইয়ে বসে। অনেক সময় তাই বহু পরস্পর বিরোধী আদর্শ গন্ডলের মতো ভিড় করে বসে। ঈমানের সঙ্গে বাস্তব-জীবনের যোগাযোগ না ঘটলে, এমনই পরিণামে পৌঁছাতে হয়। আধুনিক উপন্যাসে বিষয়বস্তুর জগত ক্রমশ সংকুচতি। আজ আর[২] 'যুদ্ধ ও শান্তি' লেখা হয় না। বিরাট ক্যানভাস স্বতঃই পরিত্যক্ত। বাজারের প্রতিযোগিতায় লেখকের নচেৎ টেকা দায়। এই সঙ্গে ভি.ডি. ও ক্যাসেটের প্রতিযোগিতাও লক্ষণীয়। শব্দ কল্পচিত্র, দৃশ্য-কল্পচিত্র[৩] কতো ভাবে না মানুষের কাছে এসে হাজির হয়।

অনেকে ভাবতে পারেন অপসংস্কৃতির আলোচনায় বর্তমান "মাস-মিডিয়ার" উপর এত দীর্ঘ টাকার কী প্রয়োজন? তার কারণ, যদিও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এখন বস্ত্রশিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে, তবুও উন্নত দেশের প্রচার-অস্ত্র থেকে কোন রেহাই নেই। মন নিঃসাড় করে দিতে পারলে তখন তার উপর যে- কোন ভাবান চাপিয়ে দেওয়া যায়। হিটলার তার আত্মচরিত "মেন ক্যাপে" লিখেছিল যে রাজনৈতিক মিটিং বিকেলে করা উচিত, যখন মানুষ সারাদিনে কর্মক্লান্ত হয়ে থাকে এবং তখন তার ক্লান্ত মনে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ। পৃথিবীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী দাসপ্রথা চালু ছিল। রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙের সেই স্কচ-সিপায়ের মত,[১] আর টমি হুকুম তামিল করে যায়। কারণ, মানসিকতা এখানে চালু রাখার জন্য বিশেষ সহায়। তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিপত্য কায়েমী রাখার ফাঁদ রচনায় সাম্রাজ্যবাদ পলিসী অনুসরণ করে। মর্ডান মিডিয়া বা গণ-মাধ্যম সেখানে বড় হাতিয়ার। আমাদের কোন জগতে বাস, তার হদিস প্রত্যেকের জানা উচিত। "অন্ধ হলে কী প্রলয় বন্ধ থাকে?" স্বর্গীয় কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জিজ্ঞাসা এমন প্রতিদিন প্রতিধ্বনিত হওয়ার কথা, তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের কর্ণপটে।

৭

সংস্কৃতির সংঘাত এই যুগে অবশ্যম্ভাবী। কারণ, একই অর্থনৈতিক বন্ধনে পৃথিবী বাঁধা। এবং এই অর্থনীতি দুদ্দাড় প্রতিযোগিতা ছাড়া টিকতে পারে না। তখন দেশে

---

১. Reality, ২. War and peace ৩. Sound and visual image.

১. Tommy, do dis, Tommy do dat

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে বৈরিভাব শুরু হয়। জাতীয়তাবাদ চন্ড দেশপ্রেমে গিয়ে পৌঁছায়। শিল্পোন্নত দেশের প্রয়োজন কাঁচামাল, মার্কেট, পুঁজি-লগ্নির সুযোগ। এই সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তাদের। তখন বিভেদের বেড়া খাড়া করতে হয়। সবসময় সোজাসুজি বা দৃশ্যত নয়। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গা-জুরি, সিনাজুরি সম্ভব ছিল। আজ তা নেই। কারণ, পূর্বের উপনিবেশ তো স্বাধীন। তাই শিকররকে নৈতিকভাবে দুবৃল করে তোলার ফন্দি সব-সময় উন্নত দেশগুলো চালু রাখে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পনর বছর পূর্বে ওদের এক পণ্ডিত যুক্তি খাড়া করে তোলে। ইসায়া বার্লিন[১] একজন খ্যাতনামা সমাজ-চিন্তাবিদ। ভদ্রলোক রুশ। ছেলেবেলা থেকে দেশান্তরী। বর্তমানে ব্রিটিশ নাগরিক। ইংরেজিতে সব কেতাব রচিত। তিনি তাঁর[২] এক গ্রন্থে লিখেছেন, "If the liberty of myself of my class or nation depends on the misery of a number of other human beings, the system which prom, otes this is unjust and immoral. But if I curtail or loos my freedom, in order to lossson the shame of such inequality, and do not therby materially increase the individual liberty of others, and abolute loss of liberty occurs." (পৃষ্ঠা ১২৫-২৬)। এবং তিনি আরো লিখেছেন, এসব প্রশ্নের তেমন[৩] পরম কোনো মাপকাঠি নেই যা দিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিমাপ সম্ভব। এখানে লক্ষণীয়, অন্য জাতি সম্পর্কে ইসায়া বার্লিনের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাম্রাজ্যবাদীরা ত লুফে নেবে। উন্নততর সভ্যতা উন্নততর সব কিছুর ধারক-বাহক। এই ঝলকে নৈতিকতার চোখও ওদেশের পণ্ডিতরা ধাঁধিয়ে দিতে ওস্তাদ। উপনিবেশের ঢেকুর থেকে তারা মুক্ত নয় আজও।

সমাজতাত্ত্বিক মহলে অবিশ্যি সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ফারাক করে লেখানোর পন্থা চালু আছে। এই ভাগ কৃত্রিম। আলোচনার সুবিধার্থে শুধু মেনে নেওয়া হয়।

বর্তমানে জড়-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর পশ্চিমের সভ্যতা। সেই জায়গায় পশ্চাৎপদ প্রাচ্যের দেশ, প্রায় দুই শতাব্দীর বেশি পশ্চিমের পদানত ছিল।

পশ্চিমের এই অগ্রগতির হদিস কোথায়?

ম্যাক্স ওয়েবার থেকে আরো ছোটখাট সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা, য়ুরোপ তার যুক্তিবাদ বা র‍্যাশ্‌নালিজমের সাহায্যে বর্তমান অবস্থায় উপনীত। সেই জায়গায়, প্রাচ্য অদৃষ্টতাবাদী, অলৌকিকতার পাদপীঠে সব উৎসর্গ করে খাতিরজমা বসে আছে। তাই তাদের বর্তমান দুর্দশা এবং পশ্চাৎপদতা। এক ফরাসী পণ্ডিত উদাহরণস্বরূপ মুসলমান সমাজের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে মুসলমান সমাজের পত্তন শুরু হয় রাষ্ট্র হিসেবে। আর খ্রিস্টধর্মের প্রথমে সৃষ্টি চার্চ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা ছিল রাষ্ট্রের সহনশীলতা থেকে তারা বঞ্চিত হবে না। রাষ্ট্র হয়ত প্রয়োজনমতো প্রভাব বিস্তার বা নিয়ন্ত্রণ করবে কিংবা কর্তৃত্ব

১. Isaiah Berlin, ২. Four Essays on lobeity ৩. absolute

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলাবে। কিন্তু চার্চ এবং স্টেট (রাষ্ট্র) কখনও এক হয়ে যাবে না। কিন্তু মুসলমান সমাজের সূত্রপাত দুই প্রতিষ্ঠানের একাত্মা দিয়ে তা খ্রিস্টান সমাজের অনুরূপ নয়। চার্চ এবং রাষ্ট্রের পার্থক্য গোড়া থেকে না থাকার ফলেই তাদের বর্তমান পশ্চাৎপদতা।

কিন্তু য়ুরোপের বহু পণ্ডিত তা স্বীকার করেন না। তারা বলছেন, মুসলমান সমাজকে রক্ষা করা, প্রশাসন ইত্যাদি চালনা ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব। কওমের দায়িত্ব হচ্ছে নেতাদের এই কর্তব্য-পালনে সাহায্য করা। এই সমস্ত দায়িত্ব তো এক বিরাট কর্মপ্রবাহ শৃঙ্খল। তার জন্যে দরকার : ভাবনা-চিন্তা যুক্তি, দূরদৃষ্টি, জাগতিক সম্পদের লালন-পালন প্রভৃতি। এখানে অলস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, যদিও কর্তব্য ধর্মপ্রসুত। কর্মময়তা ছাড়াও তো সমাজ চলতে পারে না। 'জেহাদ' তো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'ফরজ'-অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। অলসতা মুসলমান সমাজকে ডুবিয়েছে, এমন দোষারূপ অচল। কওমের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিও শাসকের দায়িত্ব। একটি মুসলিম রাষ্ট্রের উন্নতি তার নাগরিকদের সুখ-সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যুক্তিবাদ অবহেলিত, কে বলবে?

এমন সব মন্তব্যের পর, অনেক সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে মধ্য যুগে য়ুরোপে এবং প্রাচ্যের দশা একই রকম ছিল। পশ্চিমেও যুক্তিবাদ দেখা যায় না। অলৌকিকতার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল প্রচুর। আধুনিক যুগের যুক্তিবদের প্রসার-প্রয়োগ বরং বেশি। মধ্যযুগে তা অনুপস্থিত। সুতরাং মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার হেতু শুধু মানসিকতার উপর নির্ভর করা উচিত না। য়ুরোপেই এই বাদানুবাদ প্রচুর। সাম্রাজ্যবাদীদের বেতনভুক্ত সেপাই সমাজতাত্ত্বিক কম নেই পৃথিবীতে।

আমি এক দিকের উদাহরণ দিলাম। মননের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে একই চেহারা। এমন কী ওদেশে য়ারা প্রাচ্যবিদ[১] নামে খ্যাত, তাদের গতিবিধি জানার জন্যে প্যালেস্টাইন অধ্যাপক এড্ওয়াড সয়ীদের[২] 'প্রাচ্যতত্ত্ব' বইখানা এক অমুল্য দলিল। কলাম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক সয়ীদ কিন্তু ধর্মে খ্রিস্টান, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। পি.এল. ওর.-র ভাসমান সরকারের একজন উপদেষ্টা।

তিনি তাঁর অমূল্য পুস্তকে দেখিয়েছেন, গত দু'শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী বুখারের (জ্বর) তাপমাত্রার সঙ্গে মার্কিন-য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদগণের মানসিক আবহাওয়া আবহ-কুক্কুটের মতো কিভাবে দিক বদলায়। আল্লাকে ধন্যবাদ, পৃথিবীতে আজও কিছু বিবেকবান মানুষ আছেন, যাঁদের বাস্তবের স্বরূপ তুলে ধরতে নৈতিক সাহসের অভাব হয় না। অধ্যাপক সয়ীদ সাম্রাজ্যবাদী যুগে ওদের মনোভঙ্গির রূপ দেখাতে লর্ড কার্জনের দুটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কার্জন বলছেন, "I sometime like to

১. Orientalist, ২. Orientalism

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

picture to myself this impreríal fabric [এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য] as a huge structure like some Tennysonian "palace of art" of which the foundations are in this country, where they have been taid and maintained by British hands, but of which the colonies are pillars and high above all floats the vastness of Asiatic doms. অন্যত্র .... the East is a university in which the scholars never takes his degree.

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই যুগে মধ্যপ্রাচ্যে তেল বেরুনোর পর ওদেশী প্রাচ্যবিদরা সুর বদলে ফেলেছন। তেল পেতে তারা তেল দেওয়া শুরু করেছে। সে বিস্তারিত তথ্যে আর গেলাম না। এ-ই হচ্ছে য়ুরোপ-আমেরিকার প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টদের চেহারা।

পূর্বে উল্লেখিত, সাম্রাজ্যবাদ সাংস্কৃতিক হামলার মারফত উপনিবেশের সেরাংশদের (এলিট) আত্মা থেৎলে দেয়। ফলে আইডেনটিটি ধোঁয়াটে হয়ে যায়। পূর্ণ আত্মা ফিরে পাওয়ার সাধনা তখন প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। গত দেড়শ বছর পরাধীন বুহ জাতি এই মোকাবিলায় মুখোমুখি। আজও কোথাও সাফল্য দেখা যায় না। থেৎলানো আত্মার সমস্যাও কম নয়। কারণ, তা অনুভূতির সকল শিকড় ধরে টান মারে। প্রথমেই প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কাছে ঐতিহ্য-রক্ষার প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে প্রথম যাত্রা শুরু হয় আপন অভ্যন্তরে। অনেকের ধারণা, এইভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলেই বুঝি সব মুশকিল আসান। বুহ দেশপ্রেমিক, চিন্তানায়ক তখন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এগোতে থাকে। কারণ, ব্যক্তি যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে, তাহলে তার সামগ্রিক ফল ত সামাজিক স্থবিরতা থেকে মুক্তি। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারটা সব সময় ঐতিহাসিক এবং সমষ্টিগত ব্যাপার। কেবল ব্যক্তি মানুষের উপর জোর দিলেই খপ্পর থেকে রেহাই মিলবে না। এমন সরলচিত্ত চিন্তানায়ক, সমাজ-সংস্কারগণ পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অর্থাৎ, সমাজ-বাস্তব যে প্রধানত আবেষ্টনী এবং যার ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব, তা তাঁরা ধারণায় আনতে অক্ষম। তাঁরা নানা কর্মচাঞ্চল্যে মেতে উঠতেও পারেন, পরিবেশ থেকে মুক্তির তাগিদে বহু অনুসারীও তাদের জুটতে পারে, কিন্তু তা বেশি দূর নিয়ে যায় না। সমষ্টিফল শেষ পর্যন্ত শূন্য। খাঁচার মধ্যে বন্দী কাঠবিড়ালীর অহর্নিশ অধীর ইতিউতি দৌড়ের সঙ্গে হেন আচরণ অতুলনীয়।

এই সময় অতীত ফিরে যাওয়ার প্রবণতাও প্রকট জেঁকে বা ভর করে বসে। সেখানে এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি হয়। গন্তব্য না পৌঁছেই গন্তব্যের সব পরিতৃপ্তি বরং মন জুড়ে থাক। আত্মার এমন বাস্তব-বিমুখ পরিব্রজনায় কিন্তু বর্তমানের কোনো উন্নতি সাধিত হয় না। সংকট দৈনন্দিন আরো ঘিরে ধরে। কিন্তু যেহেতু কল্পনাই সেখানে সর্বনিয়ন্তা, এসব তাদের চোখে পড়ে না। কর্মফলের হিসাব-নিকাশ, খতিয়ান সেখানে অনুপস্থিত। এমন আন্দোলনের আয়ু কম। কারণ, সবসময় আদর্শের অনুপ্রেরণায় সাহায্য মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা টিকিয়ে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়। দৈনন্দিন জীবন-ধারার মধ্যে দি আদর্শের স্পর্শ না মেলে, উৎসাহ ক্রমশ নিভে আসে। মানুষ জীবনের অর্থ হারিয়ে তখন যাত্রা শুরু করে নিজের ভেতর। এমন অবস্থায় মূল লক্ষ্য আর চোখের সামনে থাকে না। উপায় তখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যক্তি শেষে স্রোতের কাছে সমর্পণ করে এবং তারই ভেতর অর্থাৎ এই নিরুদ্দেশ ভেসে বেড়ানোর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। এমন অবস্থার ফেরে তখন একটা গোটা সংগঠন ক্রমশ নানা মতভেদে খণ্ড-বিখণ্ডিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, আত্মাও। থেৎলানো আত্মা আরো থেৎলে যায়। বহুজন ভবিষ্যতের কল্পনার ভেতর ডুব দিয়ে বুঁদ থাকে। সবই নিষ্ফল। নির্মম বর্তমানের মোকাবিলায় এমন পন্থা সমাধান দিতে অক্ষম। বরং পরিবেশ আরো বিষময় করে তোলে। এমন ক্ষেত্রে অতীত মোহন রঙে রঞ্জিত করে তুলে ধরা হয়। তা আত্মমহিমা-কীর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। বাইরের পরিবেশের স্বরূপ-উপলব্ধি এবং সেই ভাবে কর্মপন্থা স্থির না করতে পারলে আখের নিষ্ফল। সমস্যা উপলব্ধি অতি পরিষ্কার ভাবে দরকার এবং তার উৎপত্তিস্থল-অর্থাৎ প্রাণ-ভোমরা কোথায় কোন-কৌটার মধ্যে আবদ্ধ না জানলে, বর্তমানের রাক্ষসকে হত্যা অসম্ভব।

অবিশ্যি ইতিহাসের গতি তো থেমে যায় না। গত সওয়া কি দেড় শ' বছরের মধ্যে সব পরাধীন দেশেই জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছে বাইরের ধাক্কায়। তা না হয়ে পারে না। এই পথের কারিগর হয় কিন্তু থেৎলানো আত্মা সেরাংশের (এলিট) দল। তাদের নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে অন্য সমস্যার তখন সুত্রপাত ঘটে। বিদেশী শাসকের মোকাবিলায় সেরাংশদের নেতৃত্ব কার্যকর হলেও পরবর্তী কালে তারা আর বিশি দূর এগোতে সক্ষম। দেশের বিশাল জনসমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। সুতরাং দু-তরফের আত্মার সাযুজ্য আর কোথায় যে এক অখণ্ড সংহিততে সমগ্র সমাজ বাঁধা পড়বে? ফলে, শুরু হয় নানা সামাজিক শ্রেণির ক্ষমতা-ছিন্তায়ের দ্বন্দ্ব। ভণ্ডামির ছত্রছায়ার ভেতর তখন নেতৃত্ব আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ইংল্যান্ডে যে-শ্রেণি শিল্পবিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছিল, তারা কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লব সমাধা করতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লব এবং সদ্যজাত শ্রমিক শ্রেণির আতঙ্কে তারা পিছু হটে যায়। সেই ভূমিস্বামী অভিজাতদের সঙ্গে তারা আর মোকাবিলায় এগোয়নি। সদ্যস্বাধীন দেশগুলোতে ঠিক হুবহু নয়, কিন্তু একই গোত্রের সমস্যা চোখে পড়ে। থেৎলানোর-আত্মা নেতাদের অখণ্ড সত্তায় ফিরে যেতে যে-সামাজিক' পরিবর্তনটুকু প্রয়োজন, অতদূর তারা অগ্রসর হতে বিমুখ। এমনই জগাখিচুড়ি অবস্থা। পিষ্ট আত্মা আরো নিষ্পিষ্ট। অখন্ড সত্তার ফিরে যেতে না পারলেও জাতীয়তাবাদ সুষ্ঠ বিকশি হয় না। আর মধ্যযুগীয় ট্রাইব-গোষ্ঠী প্রভৃতি চেতনা থেকে রেবুতে না পারলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

মুসলিম জাহানে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ক্রমশ চাপে যে জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগরণ শুরু হয়, তার বিশ্লেষণে প্রথমেই চোখ গিয়ে পড়ে আভ্যন্তরীণ নৈতিক দূরবস্থার উপর। পরে জাতীয়তাবাদ বিকাশের সাথে শুরু হয় বিদেশী হামলায় বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আবেদন। দুই ধারা পরে একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ালেও জাতীয়তাবাদ নেতৃত্বের আসন লাভ করে। স্বাধীনতার পর রথের রশি তাদের হাতেই থাকে। তার ফলাফল পূর্বে বর্ণিত। বর্তমানে দুই ধারাকে মেলানোর দায়িত্ব সকল চিন্তানায়ক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, দেশ-প্রেমিকের উপর ন্যস্ত।

পরাধীনতার কালে বাইরে বিদেশী শত্রু থাকে বলে যে-চেতন-উদ্দীপনা কার্যকর হয়, স্বাধীনতার পর সমাজসংগঠনে তা আর তেমন কাজে লাগে না। অবস্থার পরিবর্তনে নতুন সংগতি-স্থাপনের দায়িত্ব অপরিহার্য।

সংস্কৃতি এই দিক থেকে সেই অখণ্ড সত্তার চেতনা যা মানুষকে তার পরিবেশের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করে। তখন চেতনার রঙে পান্না হয়ে ওঠে তার বাসগৃহে, বেশভূষা, আহার সমাজ, দেশ, শিল্পসাহিত্য এক কথায় অস্তিত্বের সকল উপাদান-উপকরণ।

৮

সংস্কৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও অনেকে মনে করেন, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমগ্র জীবন-ধারা- 'হোল ওয়ে অফ লাইফ'। আত্ম-চেতনার মতো সমাজের স্বরূপ-নির্ণয়ও তাই চিন্তাবিদদের একটি প্রধান কর্তব্য।

তার কারণ, প্রকৃতির অংশ হলেও অতিক্রমণের দায়িত্ব তো এড়ানো চলে না। পরিবেশ-সচেতনতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। অবিশ্যি শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের পুঁজি মানুষ হাতে পায়। তার সাহায্যেই বিবর্তনের পথে বর্তমান মানবগোষ্ঠীর সভ্যতা গঠিত। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি লিখেছেন[১] প্রকৃতির উপর রাজগীর জন্যে তার আনুগত্য-স্বীকার দরকার। কিন্তু কোনো ব্যক্তি মানুষ প্রকৃতির নিয়ম জেনে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, বলা ভুল। প্রকৃতি কোনো ব্যক্তি মানুষের হুকুম তামিল করে না। বরং সমাজে দলবদ্ধ ভাবে সংগঠিত মানবগোষ্ঠীর কাছে নতজানু হয়। প্রকৃতি কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছার ধার ধারে না। বরং, সমষ্টিগত মানুষের সংক্ষেপে যখন ঐতিহাসিক ফলাফল হয়ে আসে, তখনই প্রকৃতি আজ্ঞাবাহী হয়ে ওঠে। সুতরাং শুধু প্রকৃতির নিয়ম জানাই যথেষ্ট নয়। মানুষের জানা উচিত, নিজেদের সহযোগিতা তেমনই অপরিহার্য। এই সহযোগিতা যখন সামাজিক-ভাবে কর্মময়তার রূপ পায়, তা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক অবদান। জীবন-ধারণের তাগিদে আদিম কাল থেকে মানুষ জানে সহযোগিতার মূল্য। এবং তার ফলেই মানুষ হয় মানুষ। তাই শুধু বহির্জগৎ-বিষযক অপরিহার্যতার জ্ঞানই যথেষ্ট

১. To sway nature one must obey nature.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় প্রকৃতি-বিজয়ে। অন্য মানুষ এবং সমাজ সম্পর্কে তার জ্ঞান এক পাশে ঠেলে রাখা চলে না।

এই চেতনার অভাবে বিজ্ঞানের অভুতপূর্ব অবদান জগতে আশীর্বাদ হয়ে আসেনি। হাইড্রোজেন বোমার খাঁড়া প্রতিদিন মাথার উপর ঝোলানো। অন্য মানুষ এক সমাজ সম্পর্কে ঔদাসীনা শেষ পর্যন্ত অভিশাপ। বাঁচার তাগিতে মানুষ দলবদ্ধ হয়। সংস্কৃতি-সভ্যতার অগ্রগতি সেই সড়ক ধরেই এসেছে। কিন্তু সুষ্ঠু সামাজিক জ্ঞানের অভাবে মানুষ এখনও আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত। মানুষ আজও মানুষের শত্রু। পৃথিবীময় সভ্যতার নানা মহিমাময় বিকাশ মানব-কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু অন্য দিকে তাকালে বার্ণাড শ'র গলায় গলা মিলিয়ে বলতে হয়,[১] 'মানবসভ্যতা ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই আজও নিবন্ধ।" নচেৎ গোটের জন্মভূমি জার্মানিতে হিটলার কি শেক্সপিয়ারের দেশে উইনস্টেন চার্চিলের মত সাম্রাজ্যবাদের গ্রে হাউন্ড-যিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে অভিক্ত ভারতীয়দের[২] উপহাস করেছিলেন-ডাল কুত্তা জন্মায় কী করে? ইংল্যান্ডের অধিবাসী ম্যাথু আনেল্ডি এই জন্য বোধ হয় সংস্কৃতির অর্থ বুঝতেন ব্যক্তির পূর্ণতা অর্জন[৩]। হিটলারের বিরুদ্ধে চার্চিলের ভূমিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অনস্বীকার্য। তবু অমন 'হীরে।' তৃতীয় বিশ্বে জীবজন্তুর সামিল হয়ে দাঁড়ায় নৈতিক গুণের অভাবে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের নর্দমা থেকে য়ুরোপ-আমেরিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের আর শিক্ষণীয় কিছু নেই।

AMARBOI.COM

মুল্যবোধের প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়। ব্যক্তি বা সমাজের পূর্ণতা-অর্জন কিসের ভিত্তিতে হবে? এই সমস্যা বেশ জটিল। কারণ, মুল্যবোধের বিবর্তন ঘটে। স্রোতহীন সমাজের সঙ্গে মজা পানাপুকুর তুলনীয়। তার উপর সবুজ শেওলা বা পানা-পাতার সমারোহ থাকে। কিন্তু নিস্তরঙ্গ পানি আর পেয় নয় বরং রোগ-জীবাণুর ডিপো।

বিবর্তনের ধারার সঙ্গে তাই পরিচয় ছাড়া ইতিহাসের হদিস পাওয়া কঠিন। বদ্ধ সমাজে গতির চেতনা থাকে না। অতীতে নোঙর ফেলেই তার স্বোয়াস্তি। ভৌগলিকভাবে পৃথিবী গতিশীল, যদিও এই সত্য আবিষ্কার মাত্র চার'শ বছর আগেকার ব্যাপার। তা-ও নানা সামাজিক উপপ্লবের ভেতর দিয়ে পাওয়া। কিন্তু তবু সমাজের গতি সম্পর্কে অনেক মানুষ বিস্মিত হয়, নানা কারণে। তাই অতীতে নোঙর ফেললেও অতীতকে তারা স্বরূপে চেনে না। আধুনিক ইতিহাসবিদগণ মনে করেন, ইতিহাসের নিকট অতীত হচ্ছে সব কিছু যা এখন নেই, যা বর্তমানে নেই। কিন্তু বর্তমানে আমরা অতীতের সমীক্ষা করছি। পূর্বে অতীতকে অচেতনভাবে ভুলে ছিলাম। এখন অতীত সম্পর্কে আরো সচেতন। তখন মানুষের চেতনার উত্তরণ

১. So far civilization exists with individuals only. ২. Three hundred twenty dumb million ৩. attainment of perfection in individual

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটে। অর্থাৎ আমরা যা ছিলাম এখন আর তা নই। সুতরাং আমাদের সত্তা পরিবর্তিত। নতুনের আবির্ভাব ঘটেছে চেতনায়। তা-ই-ত ভবিষ্যৎ। কারণ, নতুনই ত ভবিষ্যৎ। প্রথমে, ব্যাপারটা ছিল স্ববিরোধী[১]। যেহেতু অথীতকে আলাদা করে রাখা বর্তমান থেকে। কিন্তু স্ববিরোধিতা আর রইল না। তাই হয়ে দাঁড়াল ভবিষ্যতের ভাবচিত্র।

সংস্কৃতির অন্যতম সংজ্ঞা এখানে মিলতে পারে। অতীতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনসহ সংস্কৃতির মুল্যবোধের অবিরাম নবীকরণ বা নবায়ণ। সংস্কৃতির জন্ম প্রয়োজনের তাগিদে, পুনরায় বাতিল হওয়ার জন্যে। সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহ তাই শপথের মতো পবিত্র এবং অসম্ভব ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-যেখানে ব্যক্তির সমগ্র বিবেক জড়িত ও নিয়োজিত। তার সঙ্গে সমাজ-জীবন এবং বাঁচার উপকরণ-অন্য কথায়, অর্থনীতি পর্যন্ত পৃথকভাবে অবস্থান করে। ইতিহাসের যাত্রাপথ মানুষ নিয়ে। তার আহার, বাসস্থান, শিক্ষাদীক্ষা-এমন অপরিহার্য কোনো উপাদান বাদ দেওয়া অসম্ভব। মানুষ ত বায়ুচারী জীব নয়। বাঁচার তাগিদে দলবদ্ধ এবং সহযোগী হতে আদিম নরনারী বাধ্য হয়েছিল। এই মূল ভিত্তি প্রাণী হিসেবে মানুষের পক্ষে পরিত্যাগ অসম্ভব। পৃথিবী যদি ধ্বংস না হয়ে যায়, সুদূর ভবিষ্যতে কী হবে কল্পনার ব্যাপার, মানুষ উপরোক্ত মূল সূত্র অনুসরণ করতে বাধ্য। বায়োলজিস্টদের মতে মানুষের দৈহিক বিবর্তন আপাততঃ আর দেখা যাচ্ছে না। যদিও বার্ণার্ড শ' চেয়েছেন, মানুষের আরো একটা বিবর্তন হওয়া দরকার একদম পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির জন্যে, যখন সে আইডিয়া বা ভাব-ধারণায় পরিবর্তিত হবে।

AMARBOI.COM

সংস্কৃতির জগতে ভুই ছাড়া বাজি হয় না। যখন তা ঘটে তখন পরিবেশ-বিস্মৃত মানুষ হয় কেবল মন্ময়তা আশ্রয়ী। তখন বুঝতে হবে অবক্ষয়ের পালা চলছে। তাই নির্বস্তুক[২] মোরে পেছনে এত দৌড়াদৌড়ি। জীবনের শেষ প্রান্তে গেটের এক উচ্চারণ প্রজ্ঞার অপূর্ব নির্দেশন ঃ[৩]

যখন কোন যুগ উৎরাই পথে নামে তার সমস্ত প্রবণতা হয়ে ওঠে। মন্ময়ী[৪]। অন্য পক্ষে যখন কোনো নতুন যুগের সম্ভাবনা মুখ নেয়, তখন সব প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়[৫] তন্ময়ী। পরবর্তীকালে বারট্রান্ড রাসেল-প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন অন্য ভাষায়। তিনি লিখেছেন, যখন কোনো সভ্যতা এগোতে থকে, তার জ্ঞানেন্দ্রিয়[১] প্রবল অবক্ষয়ের পথে অনুভূতি-প্রবণতা[২] প্রবল হয়ে দেখা দেয়। সভ্যতার তুঙ্গশীর্ষে শুধু এই দুই উপাদান একাকার মিশে যায় বা ভারসাম্য পায়। আমার মনে হয়, সংস্কৃতির চড়াই-উৎরায়ের সূত্র এখানে স্পষ্ট মেলে।

বহু সভ্যতা লোপ পেয়ে গেছে। সব দেশেই উত্থান-পতনের ধারা প্রায় এক

১. Contradictory, ২. Abstract ৩. When eras are on decline all tendecies are subjective, but on the other hand when matters are ripening for a new epoch, all tendencies are objective ৪. Subjective, ৫. Objective

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম। রোমানদের অবক্ষয় যুগের ছবি পাওয়া যায় থুসিডাইসিস, প্লুবিয়াস প্রমুখ ইতিহাসিকদের রচনায়। তখন অনুভূতি প্রবণতা কী জঘন্য চেহারা না ধারণ করে। রাজ্য-চালনার ক্ষেত্রে হত্যা, গুপ্তহত্যা, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কামেচ্ছার ক্ষেত্রে লালসা এমন সংগঠিত যে তা রীতিমতো আর্টে পরিণত হয়। সহজ-স্বাভাবিক আনন্দ মেলে না, অতএব কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করো। এক সময় পুরুষের যৌন-পরিতৃপ্তির জন্যে নারী অনোপযোগী ঠেকে। সুতরাং পুং-বেশ্যা তৈরি করো। হ্যামলেট আক্ষেপ করেছিল,[৩] আহারের ব্যাপারেও রোমনরা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে যেখানে, "আহারের জন্যেই আহার" নীতি। তা আর ক্ষুণ্নিবৃত্তির উপায় নয়। এই যুগের তাদের পান ও ভোজ- উৎসব চলত হপ্তার পর হপ্তা। কতো আর খাওয়া যায়? সুতরাং আবার আহারের জন্যে বমি করো। তার জন্যে নিকটেই থাকত ব্যবস্থা। বমির পর নান। তারপর মজলিসে বসো। বমির জায়গাকে বলা হোত ভমিটোরিয়াম। খুঁচিয়ে তোলা যৌ-লালসা পরিতৃপ্তিরও ব্যবস্থা ছিল সুচারু। অন্য দিকে, অবসর-বিনেদান এবং ফুর্তি-লুটের জন্যে আছে, সাকসি গ্ল্যাডিয়োটারদের 'এরনা- যেখানে একজনকে মরতহে হবে-এই শর্তে ডুয়েল। খ্রিস্টানদের সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে মৃত্যু-দৃশ্য দেখা ছিল অন্যতম মওজের উপাদান। রোমন সিনেটর সেনেকা বিরাট ল্যাটিফান্ডিয়ার ভুস্বামী, কযেক হাজার দাসের মালিক, যশস্বী নাট্যকার। তিনি আত্মহত্যার পূর্বে-দিনে অবসর-বিনোদনী কযেক জায়গায় ঘুরে এসে ডায়েরীতে লিখেছিলেন যে কউ এমন অপরাধ করেছিলেন তিনি যে ওই সব জায়গায় তার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সংবেদনশীল, বিরল আত্মা সব যুগে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা অসহায়। সামাজিক স্রোত উল্টে দেওয়ার মতো ক্ষমতা ধর তারা নন। তবু এমন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমই মানুষের সকল আশার উৎস হয়ে থাকে। এবং তারা প্রমাণ করে যে মানুষের মধ্যে তেমনই শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যা জীবনকে সৌন্দর্যময় ও অর্থবহ করে তুলতে সক্ষম। ফ্রয়েডীয় ভাষায়[৪] ধর্ষকাম অবক্ষয় কালে ভয় করে বসে। অপরকে নিপীড়নই তখন আনন্দ আহরণের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অবিশ্যি সংস্কৃতির উৎরাই পথে যার বার এমন পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইব্‌নে খলদুন দেখিয়েছেন যে গ্রামের নিপীড়িতরা একদিন নগর দখল করে বসে নিপীড়কের অবক্ষয়-কালে। কিন্তু কালে কালে প্রাক্তন গ্রামীণের বংশধরেরা শহরের সব খস্‌লৎ-ই রপ্ত করে বসে এবং পুনরায় আত্মধ্বংসী চেতনার শিকার হয়ে পড়ে।

বহু ঐতিহাসিক তাই প্রকৃতির উপমা টেনে বলেন যে সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সূত্রপাত, বিকাশ, বিলয়-এই ধারা চিরন্তন। কিন্তু আসল কথা, যখনই বিভিন্ন সামাজিক শক্তি (সোস্যাল ফোর্স) নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখনই অবক্ষয় শুরু

---

১. Sense, ২. Sensibility ৩. Man delights him not, women neither, ৪. Sadism

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। এই জন্যে সদা-সতর্কতার পাহারা দরকার। কিন্তু সাধারণত তা ঘটে না। সংস্কৃতি মূল্যবোধের নবায়ণ-এই কথা তখন নেপথ্যে থেকে যায়। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ উদ্ভূত দ্বন্দ্ব হানাহানি অহর্নিশ চললেও একটা ভারসাম্যের ঝোঁক তখনও থাকে। এক সময় তা-ও চলে যায়।

জীবন–ধারাকে সচেতনভাবে সঙ্গতিপূর্ণ গন্তব্য-পথে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা-তা-ই সংস্কৃতির অন্যতম সংজ্ঞা হতে পারে।

সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে মানুষের অচেতন থাকা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। এই গতিপথকে নির্দেশ করবে? কীভাবে তার হদিস স্থিরিকৃত হবে? অনেক সময় সম্পূর্ণ নীল-নকশা না থাকলেও এগোতে হয়। যেহেতু গন্তব্য জানা। যাত্রাপথে ভুলচুকের সংশোধন হতে পারে। সংস্কৃতির সঙ্গে অগ্রগতির সম্পর্ক স্বতঃই জড়িত। গন্তব্য-পানে এগিয়ে যেতে না পারলে অনর্থক মেহনৎ ত অন্ধের অন্ধকারে হাতড়পাতড়।

অগ্রগতির অপর নাম প্রগতি। তা সংস্কৃতির অঙ্গ, বলা বাহুল্য।

৯

প্রগতির আলোচনায় ঈষৎ ভূমিকা প্রয়োজন।

এই শব্দটি আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা-আগত। মধ্যযুগ কি তারও পূর্বে প্রগতি নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। কারণ, এমন চেতনা সম্পূর্ণ কাল-চেতনায়[১] উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ গ্রীস সিরিয়া ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে সময়ের ধারণা ছিল বৃত্ত-সৃদশ। চাকার মতো একই বিন্দুতে ঘুরে আসে। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ-এই ত নিয়ম। এমন অবস্থার মধ্যে প্রগতির কথা ভেবে লাভ নেই। সবই ত আবার পুনরাবৃত্ত হবে। সুতরাং মাথা থামিয়ে আর লাভ কী। পুনর্জন্মবাদের ধারণা এখান থেকেই আসা সম্ভব।

পূর্বেক্তি পুরাতন চেতনা থেকে সরে আসতে বহু শতাব্দী চলে গেছে। বর্তমান কালের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দিষ্ট অবয়ব আমাদের সামনে উপস্থিত, পূর্বে তেমন প্রয়োজন ছিল না। কৃষিপ্রধান দেশে নিরক্ষর চাষিও জানে বীজ-বোনা, নিড়েন-দান বা ফসল কাটার সময়। অভিজ্ঞতা সহায়। কিন্তু সময় অতি-নির্দিষ্ট কিছু নয়। গ্রামে এখনও শুনবেন, "সকালে নাস্তার সময় এসো" বা বাদ এশার নামাজ মাদবরের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল।" জোয়ারের সময় নাও নদীর কিনারায় রাখিস না।" এসব ক্ষেত্রে সময়ের ছোট খাট মাপ মকুব বা মুলতবী থাকে। দুশ বছর পূর্বে এদেশে ক'টাই বা সামগ্রী ছিল, তার কটাই বা কেনাবেচা বা বিনিময় হতো। প্রয়োজন ছিল না সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাপ। ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ড এসব ভাগ-বিভাগের দরকার কী? কিন্তু যন্ত্রশিল্পের যুগে বড়ো দেওয়াল ঘঁড়ি দিয়েও আর কুলায় না। রিস্টওয়াচ আর হাতের শোভা-মাত্র নয়, জরুরি সামগ্রী। শুধু প্রাচ্যে

১. Time-Conciousness

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, প্লেটো এ্যারিস্টট্‌ল প্রমুখ অনেকেই বৃত্তাকার সময়ে বিশ্বাস করতেন। এদেশে স্বয়ং ব্রহ্মাঠাকুর সৃষ্টি-বিকাশ-বিনষ্টির চাকা নিয়ে বসে ছিলেন।

সেকালে জমিই ছিল সম্পদের মূল উৎস। জমির প্রসার ত অন্তহীন এবং অপরিবর্তিত তার আবর্তন। জমিনের উপর দিয়ে এগিয়ে যতই যাও, জমিনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ ঘটে। যেন চাকার আবর্তিত বিন্দু।

আধুনিক কালে সময় সম্পর্কে ধারণা বদলে গেল। সময় এখন রেখার মতো। যদিও সুদীর্ঘ কাহিনী, সংক্ষেপে বলা যয়, এই রৈখিক কাল- চেতনা য়ুরোপের সদাগরশ্রেণী এবং অর্থনীতি উদ্ভবের ফল। য়ুরোপ থেকেই সূত্রপাত। তাই রৈখিক কালের ধারণা দেশেই আরম্ভ। অবিশ্যি প্রাচ্যে নাকি চৈনিক তাওয়িস্ট[২] দার্শনকিদের মধ্যে অমন ধারণা ছিল। পদার্থবিদ জোসেফ নীডহাম তাঁর চীনের ইতিহাসে লিখেছেন।

বৃত্তাকার এবং রৈখিক-কালের এই দুই ধারণা সামাজিক দ্বন্দ্বের সমান্তরাল বহু, শতাব্দী চালু ছিল। যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের পূর্বে মানুষ বিশ্বাস করত, সময় বৃত্তাকার। বর্তমানে রৈখিক ধারণাই বলবৎ। সময় যেন অনন্ত-বিস্তার সড়ক-এগিয়ে চলেছে ত চলেছেই। পৃথিবী ছাড়িয়ে এখন মানুষের অনুসন্ধিৎসা অন্য গ্রহের পানে ধাবমান। চাঁদের অভিযাত্রী কি শূন্যচারী নীল আর্মস্ট্রং, গ্যাগরিন, তেরেস্কোভা প্রমুখ আর জুলে ভার্নের কল্পিত নায়ক বা নায়িকা নয়।

যন্ত্রযুগের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন ছিল এই রৈখিক ধারণা। সময় যদি বৃত্তাকার হয়, ঘটনা যদি একই রেখায় না গিয়ে আবার দ্বিত্ব-রূপে ফিরে ফিরেআসে, তাহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে বিবর্তন এবং প্রগতি হয়ে দাঁড়ায় মরীচিকা। মরিচীকার পেছনে মুর্খ ছাড়া কে-ই-বা দৌড়ায়।

আরো বিশদ বক্তব্যের জন্যে এখানে স্পেস, অর্থাৎ স্থানের ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিকরা আর স্পেস টাইমকে আলাদা করে লেখেন না।

মানুষের আদিম পূর্বপুরুষের বাঁচার জন্যে উপায় ছিল স্বল্প। শিকার, পশুপালন, ফলমূল আর মাছ। একজন নিঃসঙ্গ থাকাও সম্ভব ছিল না। শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, আবহাওয়ার দুর্যোগ, 'একলজি' বাস্তব-বিদ্যার খামখেয়ালীপনা-ইত্যাদি অনিশ্চয়তার জুলুমে তদের যাযাবর-বৃত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। চরৈবেতি-চলো, চলো। উপনিষদের ঋষির বাণী যেন অতীতের প্রতিধ্বনি।

আদিম মানুষের স্বল্প স্পেসে কুলান হতো না। কারণ, একই জায়গায় সব সময় শিকার, ফলমূল বা ক্ষুণ্নিবৃত্তির অন্যান্য সামগ্রী থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। হয়ত এক শ' জনের গোষ্ঠীর জন্যে এক হাজার বর্গ মাইল প্রয়োজন হতো। কিন্তু কৃষি-সভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর মেন যাযাবরবৃত্তির প্রয়োজন কোথায়?

২. Taoist

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রসভ্যতা সূত্রপাত হওয়ার ঈষৎ প্রাক্কালেও দেখা যায়, কৃষক-পরিবার অল্প জায়গায় ঘরদোর বাঁধতে সক্ষম। আর তাদের ঘোরাফেরার জন্যে কতোটকু জায়গা বা লাগত? সবই ত পায়ে হাঁটার ব্যাপার। তার চৌহদ্দি খুব জোর পাশের গ্রাম বা আরো সামান্য দূর এলাকা। জীবনের পরিধিও কম। মহামারী, সংক্রামক ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এক ঝাপটায় বহু প্রাণ নিয়ে চলে যেত। বর্তমানে আয়ুর যে পরিধি বেড়েছে তা বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার দান। নরওয়ে সুইডেনের গড় আয়ু, নব্বই য়ুরোপে ৭০-৭৫, রাশিয়ায় ৮০। তৃতীয় বিশ্বে এবং এখনও তুলনায় দীন ঃ ৪৫-৫৫। কারণ বাংতলানো অব্যন্তর। খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং উৎফুল্ল পরিবেশের অভাব।

কৃষি-সভ্যতা স্থান সংকুচিত করে ফেলেছিল। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের কল্যাণে স্পেস্ আবার বিস্তারিত বিস্তীর্ণ। গ্রহলোক পর্যন্ত এখন মানুষের হামলার শিকার। বহু সংখ্যক মানুষ এখন জীবিকার জন্যে দেশ-দেশান্তরী। এখন উৎপাদন আর জমিনে আবদ্ধ নয়। শহরের স্কলা জায়গার মধ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা।

বাংলাদেশেও একই ধারার প্রাথমিক যুগ মাত্র শুরু। শহরে হাজার হাজার হাজার মানুষ এখন দিন্‌গুজরান করে অল্প জায়গায়। গ্রামের মধ্যে চিমনী, ইলেকট্রিক পোল এবং আকাশ-রেখার চেহারা বদলে দিচ্ছে দিন দিন। ধ্যানধারণা এ যুগে দ্রুত ধার এক দেশ থেকে আর এক দেশে। ফ্যাশন আরো দ্রুততর। তরুণদের চুলের ব্যবহার তার সাক্ষী। বুজীম পাৎলুন ত এযুগে বাঙালি যুবকদের লুঙ্গি।

এই সঙ্গে লক্ষ্যণীয়, কাঁচা মাল গ্রাম সরবরাহ করে। উৎপাদন শহরের হাতে। তাই স্পেস এবং সময়কে এক রেখায় একত্রে মেলানো দরকার। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা। কিন্তু তেজগাঁও ইনড্রাষ্ট্রিয়াল জোন্ বা শিল্পাঞ্চল। মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া। স্থাপত্য সহজেই জায়গা পাচ্ছে। জাহাজ-ঘাট, বাস-টার্মিনাল, মার্কেট-সুপারমার্কেট, আদালত সিনেমা, জেলখানা, থানা আপিস, ব্যাঙ্ক-এমনতর ডজন-ডজন বায়নাক্কার আব্‌দার রক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। লোকের আপিস যেতে হয়, তার জন্যে বাস-রুটের যথাযথ ব্যবস্থা দরকার। এক কথা স্থান-স্পেসকে আর স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেওয়া দায়। আরো আছে সময়ের সঙ্গে সংগতি-রক্ষা। যথাযথ মানুষ যেন যথা-সময়ে যথা-স্থানে পৌঁছতে পারে- তার এন্তেজাম না থাকলে তা বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে। পূর্বে পা আর হাত থাকলেই সব মাপ হয়ে যেত। এক বিঘৎ, এক বাম, এক হাত, নয় ত কয়েক পা ব্যবধান। ফুটরুল শব্দটা এখনও সাবেক কালের চিহ্নি। ফুট অর্থ চরণ। কবিতার ছন্দ-বিচারে সেই সাক্ষী বর্তমান। অনেকেই জানেন যোগচিহ্ন-প্লাস-সাইনের আদিম অবস্থায় দুটো পা পাশাপাশি আঁকা থাকত। আমরা, দেখি,. বিবর্তিত চিহ্ন। খ্রিস্টধর্মের মহিমায় ক্রশচিহ্ন বটে। দূরত্ব মাপার, জন্যে অনুমানই ছিল যথেষ্ট। "দশ মিনিটের পথ", এখনও বলার হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় দিয়ে 'স্পেস' মাপা হচ্ছে। অথবা-"যে বছর বড়মিয়ার দালান তৈরি হয় সে-বছর আমার বড় নাতি হয়েছিল।" স্থান-ঘটনা দিয়ে সময়-পরিমাপের রেওয়াজ এখন অচল, যদিও চলতি কথায় রয়ে গেছে। জীবন-ধারার চাপে এমন দৈনন্দিনতার পরিবর্তন ঘটে সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণা।

বর্তমান যুগে স্পেস এবং টাইমকে এক সঙ্গতিময় গুচ্ছে বাঁধা বাধ্যতামূলক। পূর্বে কোন রাষ্ট্রের সমিনা যথাযথ নির্দিষ্ট ছিল না। এখন তার যো নেই। সার্ভেয়ারের শিকালে সব বাঁধা। নচেৎ শুল্ক বিভাগ কীভাবে কাজ চালাবে? দেশের সীমানা একদম হুবহু ম্যাপে আঁক থাকে। এদিক ওদিক করতে পারে না কোন বিদেশী রাষ্ট্র। "নিজের সীমানায় যা খুশি করো : ট্রেঞ্চ কাটো, কাঁটাতারের বেড়া দাও কিন্তু আমার সীমানায় বিনানুমতিতে কেউ এসো না। তোমার বিমান এলে ধ্বংসী কামানোর মুখে পড়বে।" এই অলিখিত ফরমান এখন প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমান্তে লট্‌কাটানো থাকে। সমুদ্রের বারো মাইল যে রাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রের কুল-প্রবাহিত তারই এক্তিয়ারে পড়ে।

এইভাবে যুগের ধাক্কায় সময় রৈখিক ধারণা মানুষের সামনে উপস্থিত। তাই স্পেসের ধারণা তার সঙ্গ মানিয়ে চলা ছাড়া উপায় থাকে না।

সড়কের পর সড়ক প্রসারিত। ঠিক নব্বই ডিগ্রী সমকোণে তার ধারে ফুটপাথ বাদ দিয়ে বাড়ি, দোকানপাট। পুরাতন ঢাকা শহরে এমন রৈখিক সজ্জা দেখা যায় না। আঁকাবাঁকা রাস্তা, বাড়ির রেখা সোজা নয়। একটা এগিয়ে ত আর একটা পিছিয়ে গ্রামে মাটির দেওয়ালে এমন রেখা-সংস্থান নেই। কারণ, যথাযথ মাপ সেখানে দরকার গড়ে না। দেওয়ালও সমতল মসৃণ নয় প্লাস্টারিং-কৃত ইমারতের দেওয়ালের মত। আফিসের ছোট ছোট পার্টিশান করা রুমে রেখার আধিপত্য। বেডরুম, ড্রয়িংরুমের কথা নতুন বলার দরকার নেই। সময়ের উপর, স্পেসের উপর রেখার রাজত্ব এখন স্পষ্ট।

অবিশ্যি এই ধারণা ছাড়া প্রগতির ধারণা আসত না। কেন, পূর্বে উল্লেখিত। কালের ধারণা কিভাবে মানুষের পারিপার্শ্বিকতার উপর নিজস্ব স্বাক্ষর রাখছে তা সংক্ষেপে বলা গেল।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রগতির ধ্যানাদর্শ থাকা স্বাভাবিক। কিসের জন্য সংস্কৃতি? যদি বর্তমান থেকে আমাদের শ্রমিক ভবিষ্যতের দিকে পদক্ষেপ না ঘটে, তাহলে কী দিয়ে সংস্কৃতির মূল্যায়ন ঘটবে? অবিশ্যি দার্শনিকদের মধ্যে একদল আছেন, যারা বাস্তব ঘটনা থেকে শ্রেয়বোধের সূত্রপাত স্বীকার করেন না। পাঁজটিভিস্ট, ফিরোমেনালজিষ্টরা এই গোত্রে পড়েন। ওদের বিবৃতি পুরোপুরি সত্য নয়। আবার তা উড়িয়ে দেওয়াই দায়। সেখানে দরকার, ওই কালে বা দেশে প্রচলিত মুল্যবোধের বিচার। আর তার কতখানি আবেষ্টনী থেকে উদ্ভুত। খ্রিস্টান ধর্মের গোড়ার দিকে যা চেহারা ছিল, পোপের অভ্যুদ্যয় থেকে তা আর রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রোটেস্ট্যান্টরা আসার পর চেহারায় আরো অদল-বদল, হেরফের। এমনই ঘটে সাধারণত:- এক কালে দাসপ্রথা নৈতিক কিছু ছিল না। পরে তা নৈতিক অনৈকিতার মাঝামাঝি একটা জায়গা গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমানে দাসপ্রথা একদম ঘৃণ্য ব্যাপার। আবার একই ধর্মের রূপ বিভিন্ন হতে পারে বিভিন্ন দেশে স্থানীয় ঐতিহ্যজাত রেওয়াজ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির অনুযায়ী। এইসব বিভিন্নতার বিশ্লেষণ অবিশ্যি জটিল ব্যাপার। তবে দার্শনিকরা একমত যে সত্যের বুনিয়াদ বাস্তব ঘটনা এবং মুল্যবোধ বা শ্রেয়বোধ দু'য়ের উপর ভর করে গড়ে ওঠে। "১৯৫৬ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।" ঘটনা সত্য। কিন্তু একে কেউ "সত্য" আখ্যা দেবে না। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের সময় ছাত্রেরা ঘোষণা করেছিল যে ভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার; তা যারা ছিনিয়ে নিতে চায়, তাদের প্রতিরোধ করা প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। এখানে মুল্যবোধের স্পর্শ আছে বলেই ঘোষণাটি সত্য-পর্যায়ে পৌঁচেছে।

প্রগতি মূলত : পরিবর্তন-আন্দোলিত গতি। তাছাড়া জীবন অর্থ খুঁজে পায় না। ভবিষ্যতে আস্থা খুইয়ে ফেললে সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয় অথবা তা বিকৃত কোন নির্দেশিকা হয়ে পড়ে যা আর জীবন-বোধে কাউকে অনুপ্রেরণা দিতে অক্ষম বা পরাঙ্মুখ।

অবিশ্যি প্রগতি নানা দার্শনিকের নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত। কারো কাছে তা রাষ্ট্রশক্তি বা পাওয়ার, কারো কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। এমনতর আরো বহুমত প্রচলিত আছে পণ্ডিত মহলে।

AMARBOI.COM

১০

য়ুরোপে আমেরিকার চিন্তাবিদগণ অনেকেই কিন্তু প্রগতির উপর আস্থা খুইয়ে বসে আছেন। বিশেষত: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তারা পুরোধাগণের বিশ্বাসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

উনিশ শতকে বিজ্ঞানের ঝলকময় অগ্রগতি এবং সাফল্য যে আশাবাদ সঞ্চার করেছিল দেখা গেল তার ভিং পক্কা কারণ, প্রগতি তো শুরু মানস-জগতের দীপ্তিময় বিকাশ নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক বিরাট সাফল্য। য়ুরোপে জীবন-যাপনের মান তখন লাফ দিয়ে-দিয়ে এগোতে থাকে। ওদেশের দরিদ্রতম জনও তৃতীয় বিশ্বের করুণ, নির্মম দারিদ্র্য আঁচ করতে অক্ষম। গ্রীকদের সময় থেকে অবিশ্রি এই ধারণা চালু ছিল যে সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্লেটো গ্রন্থ "দি লজ" এবং 'দি স্টেট্সম্যা', শীর্ষক অধ্যায়ে তা পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন। কৃষিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা এবং অন্যান্য এই জাতীয় ইলেম, প্রগতি তথা সংস্কৃতির ভিত্তি তৈরি করে। সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। ভলটেয়ার, ক'দর্সে তো অমন ভিতরে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। দু'চার জন তখন ভাবত স্বর্ণযুগ অতীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। উনিশ শতকের চিন্তাবিদরা অবিশ্যি স্বর্ণযুগের ছবি দেখলেন ভবিষ্যতে। কারণ, প্রগতির উপর প্রচণ্ড আস্থা। প্রগতি ত সর্বাংগীন উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি সামগ্রিক ফলাফল। জড়-জগৎ মানস-জগৎ উভয়ই সেখানে সমান্তরাল বিরাজমান।

বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রগতির উপর আস্থা একদম দেউলিয়া হয়ে যায় নি। অসওয়াল্ড্ স্পেংগলারের 'কিইন অফ দি ওয়েস্ট' গ্রন্থ তার স্মারক। তিনি বায়োলজি থেকে রূপক গ্রহণ করেন। জীবের জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু আছে। সুতরাং সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অবিশ্যি তিনি লক্ষ্য করেন নি যে সভ্যতার অনেক উপাদান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপযোগিতার[১] উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সংস্কৃতি বিশ্বের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। এক সংস্কৃতির শৈল্পিক অবদান অন্য দেশ বা সংস্কৃতির শিল্পীরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে। স্পেংগলার আরো সমালোচনার সম্মুখীন হন। সমাজ ও সংস্কৃতিকে অর্গ্যানিজমের সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

প্রথম মহাযুদ্ধই য়ুরোপের সভ্যতার অন্তর্শূন্যতা মনীষীদের নাড়া দিয়েছিল্ টি. সে; এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড' এবং "হলো ম্যান" স্মরণীয়। কবি তাঁর চতুর্দিকে অবক্ষয়, শূন্যতা, নোঙরামি দেখেছেন। তা শুধু বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকেও নুলো বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। ডব্ল্যু বি.ইয়েটসের[২] কবিতা ত বহু-উদ্ধৃত :

Things fall apart; Centre cannot hold
The best lack all convictions while the worst
Are full of passionate intensity.

অথবা "ফোর কোয়ার্টেট্স" থেকে এলিয়ট স্মরণীয় :

Our only health is the disease
If we obey the dying nurse
Whose constant care is not to please
But to remind of our and Adam's curse.
And that to be restered, our sickness must grow worse.

চিন্তারাজ্যে প্রলয়-চিহ্নের এই সব আঁচড় এখন বিরাট দগ্দগে ঘা। জীবন-যাপনের মান, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধি কিন্তু এখন ভয়ের উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্পোন্নত দেশে। মনীষীরা মনে করেন যে যদি এইসব অর্থনৈতিক উন্নয়ন থামানো না যায়, এই গ্রহ ধ্বংসের সম্মুখীন। বিশেষতঃ খনিজ পদার্থ এবং ইন্ধন-ইংরেজি ভাষায় ফুয়েল-যদি বর্তমান হারে খরচ হতে থাকে, তাহলে সমগ্র মানব-সভ্যতা টিকে থাকার আর যে-কোন পথ রুদ্ধ। তার জন্যে প্রথম দরকার, আণবিক শক্তির অপচয় এখনই বন্ধ করা। অর্থনীতিবিদগণের মতে, যদি কোন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেগে ত্বরান্বিত করার জন্যে কেবল প্রযুক্তিবিদ্যার নবায়ন

১. Utility, ২. Second Coming

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তা ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। এক মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিশান[১] তাঁর বইয়ে[২] সুস্থ জীবনের কী মাপকাঠি বা বিচারনীতি প্রয়োজন তার তালিকা দিয়েছেন। মানুষের প্রয়োজন : আহার, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা, পরিবার, ধর্মীয় বা নৈতিক বিশ্বাস, রেওয়াজ এবং ঐতিহ্য। তাছাড়া প্রয়োজন : নৈতিকতা বা নীতির একটা সুস্থিত দৃঢ়তা-যা মানুষের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে একান্ত দরকার। নচেৎ, ভালবাসা বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সাহায্যে বা এই জাতীয় মানসিকতা মানুষ কোথায় পাবে? তিনি দেখিয়েছেন অবিরাম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালাতে গিয়ে অন্যান্য দিক চরমভাবে অবহেলিত। দু'শ বছর ধরে পশ্চিমের অর্থনৈতিকতা প্রচেষ্টা মানুষকে নৈতিকতার শূন্যে ঠেলে দিয়েছে। অন্য এক মনীষী লিখেছেন যে, যে-পুঁজিবাদ তাদের সভ্যতার বুনিয়াদ, তার মূল স্তম্ভ হচ্ছে : ব্যক্তির আত্মস্বার্থ এবং "মার্কেট" যার অভিব্যক্তি। পর্যটন থেকে প্রতিভা, বেশ্যা থেকে বৈকুণ্ঠ-সবই বাজার-দরে যাচাই হয়। আডাম স্মিথের "ইকনমিক ম্যান" তবু গোড়ায় বাধ্য পেত "অর্থনৈতিক-নয়" এমন দিক থেকে। কিন্তু বিবর্তনের পথে তা আর রইল না। ফলে, অর্থনৈতিকতার শূন্য ময়দানে এমন মানুষ বিচরণ করে। এবং যদি বিবেকের তাড়নায় কোন সাধু ব্রতে লিপ্ত হয়, তা হয়ে পড়ে ভণ্ডামি অথবা অর্থনৈতিক বিধানের মূলসূত্রের দিকে কারো দৃষ্টি না যায়, তেমন চাতুর্বমর ব্যবস্থার ফলে মাদার তেরেসার মত সরল পুণ্যবান মহিলাদের চোখে ধুলে দেওয়া খুব সহজ হয়।

বিশ্বের বহু খনিজ এবং ধাতব পদার্থ আছে, যা আর সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ তার প্রকৃতির দান। গাছ কাটার পর আবার চারা লাগনো চলে। উত্তর-কালে আবার বৃক্ষ পাওয়া যাবে। কিন্তু বহু খনিজ পদার্থের বেলা তা আর খাটে না। সুতরাং প্রবৃদ্ধির নামে যে-ভাবে বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থ খরচ হচ্ছে, তার ফল ভয়াবহ।

পশ্চিমের অর্থনীতিবিদরা ভেবেছিলেন, তৃতীয় বিশ্বে এসব ঢেউ লাগবে না। ফলে, পৃথিবীতে তখনও বহু নবায়ন-অসম্ভব বিরল পদার্থ অবিশিষ্ট থাকবে।

কিন্তু সেখানে জাতীয়তাবাদী জাগরণের ভাল তৃতীয় বিশ্ব আর পুরাতন অনড় জগদ্দল নয়। তাই পশ্চিমের মনীষীদের টনক নড়েছে। এখন জোড়াতালি দেওয়ার জন্যে তাদের শিরাপীড়ার অন্ত নেই। বিশেষজ্ঞ জনের নানা প্রতিষেধ ব্যবস্থার সুপারিশ করছেন। সব শৃগালের রব এক। ওদের সকলের জোর শুধু মূল্যবোধের দিকে। ওরাও 'ওয়াজ' করে। মূল বক্তব্য : যদি বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলেমিশে কাজ করে তাহলে আর কোন গন্ডগোল থাকবে না। কিন্তু কীভাবে এমন মেলামেশা বাস্তব করা যাবে? তখন তারা চোখ কচলান এবং একই সুরে আবার কোরাস ধরেন। পনর-ষোল বছর পূর্বে এক পণ্ডিতের বই পড়ছিলাম[১]। গ্রন্থকার[২] 'হ্যাভ এন্ড হ্যাভ-

---

১. A. g. Mishan, ২. The Economic Growth Debate

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নট নেশান চোখে দেখেছেন অর্থাৎ তার চোখে পড়েছে। তাঁর সুপারিশ, মুল্যবোধের অবিরাম বারিবর্ষণ। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ এই মহাশয়ের চোখে পড়েনি বিশ্বের বাজারে পুঁজিবাদের ভূমিকা কী? কেন তাদের আণবিক মারণাস্ত্রবাহী জাহাজগুলো তৃতীয় বিশ্বের দিয়াগো গার্সিয়া কী অন্যান্য সমুদ্র-উপকূল বিহার করে বেড়াচ্ছে, তার কোন উল্লেখ নেই। অর্থনৈতিক আধিপত্য রাখতে যে এমন-সব ব্যবস্থা ভদ্রলোকের[৩] বিশ্ববিধানে তার এতটুকু গন্ধ মেলে না। তিনি ধার্মিকদের মত মনে করেন, কিছু মূল্যবোধ তথা সুবচন রোজ ছড়াতে পারলেই দুনিয়ার চেহারা, বলা বাহুল্য, তৃতীয় দুনিয়ারও চেহারা বদলে যাবে। এদের সারগর্ভ নীতিকথা শুনতে ভালোই লাগে। কারো করো আবার বিশেষ দিকের উপর জোর থাকে। এক অর্থনীতিবিদের মাথায় ঢুকেছিল, তৃতীয় বিশ্বের লোকগুলো শিক্ষিত হয়ে উঠলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। অতএব, শিক্ষার প্রসার করো।

একদিকে এইসব প্রজ্ঞা-বরিষণ। অন্যদিকে দেখা যায়, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশের পুঁজি তৃতীয় বিশ্বে শুধু বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে আর তৎসঙ্গে মুনাফার হার।

ওদেশী পন্ডিতদের কাজ হচ্ছে বারবার তারস্বরে ঘোষণা যে, অনুন্নত দেশের উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মডেল হচ্ছে পশ্চিমের শিল্পোন্নত সমাজ এবং দেশ। কিন্তু বাস্তব ঘটনা কী?

পশ্চিমের দেশগুলো তাদের শিল্পায়নের যুগে তৃতীয় বিশ্ব লুণ্ঠন দ্বারা পুঁজির পত্তন করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বতো আজ উল্টো অবস্থার মধ্যে। দাস-ব্যবসার মুনাফা, চীনদেশে আফিম-বিক্রী, আমেরিকায়[৪] জমিন আবাদ, আদিম-অধিবাসীদের উচ্ছেদ মারফৎ জমি দখল, এবং এই জাতীয় লুটপাট পশ্চিম দেশের পুঁজি-গড়ার সহায়ক ছিল। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের পুঁজি কোথা থেকে আসবে? সে-প্রশ্নে ঐ ধুরন্ধর পণ্ডিতদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। অথচ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো হবে সভ্যতা-সংস্কৃতির মডেল!

আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয় যে আজও তৃতীয় বিশ্বে বিদেশী পুঁজির সহায়ক দেশী সেরাংশ (এলিট) এবং কমজোর পুঁজিপতি।

এককালে মনে করা হোত, ব্যক্তির স্বার্থ সব রকম প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ভূমিকা পালন করবে। বিদেশী পণ্ডিতেরা জেগে ঘুমান। তারা দেখেও দেখেন না যে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব-বাজারে[৫] যে-কাঠামো গড়ে রেখেছে, দেশী সেরাংশ কী পুঁজিপতিদের সে-বড়ো টপকানো দায় নয়, দুঃসাধ্য। ফলে আর্থিক উন্নয়ন অপেক্ষা বিদেশীদের মুখোপেক্ষী হয়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের 'ছোটা-তরফ' রূপে টিকে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' বাংলা প্রবাদ

১. Socialogical theory and modern sociaty, ২. Talcott Persons ৩. World order, ৪. Plantation ৬. World market,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের মুখস্থ বৈকি। তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের দশা দেখলে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু মার্কিন বা য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞরা আসল জায়গায় হাত দিতে নারাজ। উন্নয়নের সব প্রতিবন্ধকতা তো গৌণ অপরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ। এখানে পণ্ডিতেরা চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা খেলেন।

পূর্বে উল্লেখিত গ্রীক আমল থেকেই জাগতিক সম্পদের উপর মনীষীদের চোখ পড়েছিল। বাতাসের উপর তো বনিয়াদ গড়ে ওঠে না। সংস্কৃতিক শুধু মানস-সম্পদ নয়, বরং গোটা মানব-জীবনের সব রকম ভিৎ-পত্তন এবং তার পরিবর্ধন। গতি সেখানে ধর্ম। যেখানে তা অনুপস্থিত, সেখানে সংস্কৃতিও মৃত। অবিশ্যি সংস্কৃতি দিশাহীন গতির সন্ধান দেয় না। মানুষ যখন সচেতনভাবে তার আরদ্ধ কর্তব্য-সম্পাদনে অগ্রসর হয়, তখনই সংস্কৃতির স্পন্দন ধরা পড়ে। প্রাকৃতিক শক্তিকে যেমন তারা বশে আনে তেমনি সামাজিক শক্তিকে। আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ মানুষ তখন যে-মানসিক শক্তির সন্ধান পায়, তা-ই তার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। স্বাধীনতা এমনই অপরিহার্যতার চেতনা।[১] এই জন্যে পরিবেশ সম্পর্কে বিস্মৃত হওয়া পাপ বা অন্যায়।

বর্তমান তৃতীয় বিশ্বে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পুঙ্খবদ্ধতা দেখা যায়, তার কারণ ঃ ভবিষ্যতের চাবিকাঠি এখনও তারা হাতে পায়নি। উৎরাই পথে নামা সর্বদা সহজ। সহজ আবেগের পরিতৃপ্তি তখন সহজে শয়তানের মতো কুমন্ত্রণা দিতে পারে। চড়াই-পথ সর্বদা দুর্গম।

প্রগতির উপর আস্থা রেখে তিন শ' বছরের শিল্পোন্নত দুনিয়া বহু দূর এগিয়ে এসেছে। তৃতীয় বিশ্ব তার চাপে যতই থেৎলে যাক না কেন, তবু মনে রাখতে হবে য়ুরোপ-আমেরিকাই আবার গোটা বিশ্বকে একসূত্রে বাঁধার একটা পথও তৈরি করেছে। তা অর্থনৈতিক বন্ধন এবং উৎপাদনের বিস্ময়কর প্রযুক্তিবিদ্যা। বিজ্ঞানের ঝলকানি-নয় উপস্থিতি এক দেশের মানুষকে আর এক দেশের মানুষের কাছে এনে দিতে এবং বিশ্ব সংস্কৃতির বনিয়াদ-পত্তনে পশ্চিমী সভ্যতার অবদান অস্বীকার আত্মহত্যার সামিল। আর্থিক বন্ধন যখন হয়েছে আত্মিক বন্ধন একদিন না একদিন হবেই। নানা বিভেদের বেড়া মানুষের চতুর্দিকে। কখনও বর্ণ, কখনও সম্পদ। মানুষ তার প্রচণ্ড দাম দেয় ধনে-প্রাণে-মানে আত্মার দারিদ্র্যে। রাশিয়ার প্রথম জার নিকোলাস স্বদেশে "প্রগ্রেস-প্রগতি" শব্দটা ব্যান করেছিল। প্রগতির প্রতি আস্থা শিল্পোন্নত দেশে ক্ষীণ, তৃতীয় বিশ্বে প্রগতি-প্রভাতের ব্রাহ্মমুহূর্ত আরম্ভ মাত্র। পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথেই মানুষ মানুষ্যত্ব অর্জন করে। চড়াই-পথে সংস্কৃতি তার মন্ত্র যোগায়। উৎরাই-পথে কোন রাস্তা ধরব, না ছাড়ব-এমন বিধি-নিষেধই প্রধান হয়ে দাঁড়াও। সংস্কৃতি তখন এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনা যোগাতে অক্ষম। অর্থাৎ যাত্রার অনুপ্রেরণা তখন গৌণ হয়ে যায়, অনেকে তা লক্ষ্য করে না।

১. Consciousness of necessity

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো বলে রাখা দরকার : সংস্কৃতি কোন ভুগোল মানে না। এক জাতি বা এক ভুখণ্ডে হয়ত কোন ধ্যানদর্শ বা জ্ঞানের সূত্রপাত। কালে কালে তা বিশ্বের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। আরবরা[১] আলোক-বিদ্যার উপর যে কাজ করেছিল, তা জ্যেতির্বিদ্যায় পরে দেখা দিল য়ুরোপে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির পথেই গ্যালিলিও গ্যালিলির আবির্ভাব। পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা বদলে গেল। ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষ ভেবেছিল শুধু রাজনৈতিক শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণ মারফৎ সুঠান-সুসংহত সমাজ গঠন হতে পারে। কিন্তু কার্যত তা ঘটল না। আরো প্রায় সওয়া শতাব্দী কাল মানুষকে অপেক্ষা করতে হলো। রুশ-বিপ্লবের পর প্রতিভাত হলো, অর্থনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক নয় শুধু বাধ্যতামুলক। নচেৎ কোন উন্নত সমাজ গড়া সম্ভব নয়। অবিশ্যি, সমস্যা আজও মেটেনি। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিবেশ বিরোধী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানবগোষ্ঠী অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তা বিশ্বের উত্তরাধিকার হয়ে পড়ে, যদিও সুত্রপাত অন্য কোন ভূখন্ডে। আবেষ্টনীর বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে, গতিবিধি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অর্জন বিপুল বিস্তৃত। তা এখানেই থেমে থাকবে না, বলা যায়। তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে তাই সব রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব। আর এই সংগ্রাম-পথই মানুষের পথ। অনেক সময় একটা যন্ত্রের আবিষ্কার পরে সমাজের উপর বিরাট ছায়া না ফেলে। এমন নজীর এখন বহু।

এই যুগে একটি যন্ত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা যেতে পারে। যন্ত্রটি কম্পিউটার। ইলেকট্রনিকস্ যুগের এক অভাবনীয় আবিষ্কার। যদিও মেশিনটির এখন শিশুকাল। কিন্তু তার উন্নতি ঘটছে এবং আরো ঘটবে- এ আশা করা যায়। শিল্প-বিপ্লবের পর দেখা গেল, লেখাপড়া জানা দরকার। নচেৎ মেশিন চালানো যাবে না। শিক্ষার চাহিদা বাড়ল। তাই বলে নিরক্ষতাকে কেউ নির্বুদ্ধিতা বলে ধরে নেবেন না। আজও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তৃতীয় বিশ্বে চাষাবাদ করে খায় এবং লেখাপড়া জানে না। কিন্তু তারা আহম্মক-এমন অভিযোগ আমরা শুনিনি। কারণ, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য-সম্পদ মুরুব্বীদের কাছে থেকে শুনে-শুনেই তারা জীবন-যাপনের প্রবাহ অব্যাহত রেখেছেন। এখন কম্পিউটার নির্দেশ দেয়, কী করতে হবে। এমন কী পরবর্তী পদক্ষেপের কথাও বলে দিতে পারে ওই যন্ত্র। অনেক সময় বৈমানিক ভুল করলেও কম্পিউটার তা শুধরে দেয়। তাই বিমান দূর্ঘটনার সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। অবিশ্যি কম্পিউটার মেরামত করতে হয়। কিন্তু তা বলে কম্পিউটার ভূত, প্রেত, ইন্দ্রজাল বা অশরীরী আত্মাধারী কিছু নয়। এমন নয়া পরিবেশে মানসিক আবহাওয়া অনেকখানি বদলে যাবে। লোকের মানসিক শক্তি[১] অনেকগুণ বেড়ে যাবে- যেমন মেশিন বাড়িয়ে দিয়েছে মানুষের[২]

১. Optics

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেশী-শক্তি। বিরাট বিরাট রেলওয়ে ইঞ্জিন-বগী বা আরো ভারী কোন যন্ত্র যখন য়ুরোপের বা আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছায়, সময়ও বেশি লাগে না, তা পেশী শক্তির উন্নয়ন ছাড়া আর কী? শিশুরা যেন বল লুফালুফি করছে এক হাত থেকে আর এক হাতে। আমাদের বলটি ভারী শত শত টন এবং এক হাত বোষ্টনের তা অন্য হাত বোম্বাইয়ে কি ব্লাডিভস্টকে। একটা রোটারী ছাপাযন্ত্রের ওজন কত আমার জানা নেই। কিন্তু ঢাকা শহরে তার ডজন-ডজন চেহারা দেখলে, মালপত্র নিয়ে পৃথিবী জুড়ে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বল লুফালুফি চলছে ছাড়া আর তাকে কী বলা যায়? মেশিন যেমন মানুষের পেশী শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে শত শত গুণ, কম্পিউটার তেমনই মানসিক শক্তি অদ্ভুত পর্যায়ে নিয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে বলা যায়। জগৎ এবং আমাদের অহম (ইগো) সম্পর্কে আরো গভীর নিরীক্ষণের ফলে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বলা বাহুল্য। আরো একটা কথা। বর্তমানে আমাদের চিন্তা প্রায় দুটো উপাদানে ঘুরে বেড়ায় : কার্য, কারণ। কিন্তু আরো গতিময় উপাদান যদি জড়ো হয়, চার-পাঁচ কি আরো বেশি, তা আর মনের স্বল্প ক্ষমতায় কুলায় না। বিদেশী ভাষায় এগুলোকে বলা হয় 'ভেরিয়েবল'। বাংলায় বলা যায় : বিষম। পাঁচ-সাতটা 'ভেরিয়েবল' নিষে কাজ করা আর এক হাতে চার-পাঁচটি চ্যাং মাছ ধরার সমান। অনেক সময় একই বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত কী কৌতুক না উদ্রেক করে। "এদেশের মানুষ এত নিরক্ষর কেন?" "অক্ষরের সংখ্যা অনেক। ওগুলো কমিয়ে ফেলো। জবাব দিলেন বর্ণলিপি-সংস্কারবাদী। 'নিরক্ষরতার কারণ দারিদ্র্য" বললেন অর্থনীতিবিদ। হাঁক দিয়ে ওঠেন রাজনীতিবিদ, "আসলে শিক্ষাখাতে বাজেটে বরাদ্দ বড় কম। তার জন্যে সরকার দায়ী।" সমাজ-সংস্কারক নৈতিকতাবাদী চেঁচিয়ে উঠলেন, "আসলে সমাজে পাপ ঢুকেছে। ছাত্রদের পিতারই চরিত্র ঠিক নেই। প্রতি বছর মাঝপথে খসে পড়া (ড্রাপ-আউট) ছাত্রের সংখ্যা দেখে বুঝছেন না? ছাত্র এবং ওদের পিতাদের চরিত্র এক সঙ্গে এক সময়ে সংশোধনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।" তার জন্যে দরকার অমুক-তমুক ইত্যাদি।

এমনতর নানা ঢাকের আওয়াজ একই সময় শোনা যায়। এক এক মহলের এক এক মত। সকলেই আপন ঢাক নিয়ে ব্যস্ত। সমস্যা যে বিভিন্ন স্রোতের যৌথ ঘূর্ণী, তা একই সময়ে কেউ চোখে দেখেন না। কারণ, মন জায়গা দিতে অক্ষম। কিন্তু বিশ্লেষণ হওয়া উচিত আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় Mutual dependence analysis বা পরস্পরিক নির্ভরতা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ। বাস্তবে তা হয় না।

কম্পিউটার একদিন এই সমস্যা সমাধান সহজ করে দেবে। কারণ, নানা 'ভেরিয়েবল' নিয়ে নাড়াচাড়া এক কম্পিউটারেই সম্ভব।

ফুটবল খেলার টেকনিক পর্যন্ত এযুগে বদলে গেছে। পূর্বে খেলোয়াড়েরা যে-

১. Mental power ২. Muscle power

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার পজিশনে খেলত। বর্তমানে দশজনেই এক সঙ্গে আক্রমণ অথবা এক সঙ্গে ডিফেন্স, প্রতিরক্ষা চালায়। সমাজ-সমস্যার মোকাবিলায় কম্পিউটার একদিন মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে-যদিও পর্যায় আজ অত উন্নত নয়।

এসবই কিন্তু মানুষের মানসিক-শক্তির তথ্য বিচার-শক্তির গতির নমুনা। শিল্প-বিপ্লব দিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শৈশবকাল শুরু। মেশিন তৈরির মেশিন যখন প্রস্তুত হতে আরম্ভ, তা আর এক যুগের সম্ভাবনা এবং সূচনা। মানুষের ক্ষেত্রে তা-ই যেন ঘটেছে। এখন বর্তমানে "জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান"-এর হাতিয়ার মানুষের হাতে। তিন শ' বছর পূর্বে য়ুরোপে রেনে দেকার্তে মানুষের এই অদ্ভুত অবস্থান দেখেছিলেন। মানুষ শুধু চিন্তাকরে না, সে নিজের সম্পর্কেও চিন্তা করে। সে যুগপৎ নিরীক্ষক এবং নিরীক্ষা। দর্শনের ভাষায় বিষয় ও বিষয়ী : সাবজেক্ট ও অবজেক্ট। সেই সড়ক আরো প্রসারিত। হেগেল, মার্কস উভয়ের চিন্তায় দেখা যায়, জগৎ প্রকৃতির বিধান-অনুযায়ী শৃঙ্খলিত। মানুষ এতকাল নিজের সমাজ-সম্পর্কে এত সচেতন ছিল না। এখন সে সচেতন। এবং মানুষই ইতিহাসকে বদলায় নিজের কর্ম-লীলার সাহায্যে। হেগেল যা-কে বলেছিলেন[১] "কামনার কামনা" তা-ই যেন "জ্ঞানের সম্পর্কে জ্ঞান" রূপে এযুগে উপস্থিত। মানুষ জানে, সে তার আবেষ্টনীর আদল বদ্‌লায় এবং এই পথে নিজেও পরিবর্তিত হয়। আবেষ্টনীর আদল বদলায় এবং এই পথে নিজেও পরিবর্তিত হয়। বেকার সমস্যা আর্থিক মন্দা ইত্যাদি মানুষের তৈরি, অন্য কারো নয়। অর্থনীতিবিদগণের কল্যাণে এখন 'অবাধ অর্থনীতি'র জায়গা নিয়েছে পরিকল্পিত অর্থনীতি[২]। অর্থনীতির[৩] বিষয়াত্মক বিধানে আর কারো বিশ্বাস নেই। মানুষ এখন বিশ্বাস করে যে আপন কর্মলীলা[৪], অর্থনীতির মনিব। আর গোলাম নয়। অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ-নীতির সম্পর্ক নিবিড়। একে অপরের ভেতর স্থিতি পায়। জনংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এখন তৃতীয় বিশ্বেও সরকারি রুটিন। অথচ কয়েক দশক পূর্বে এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। বিচারশক্তির প্রয়োগ শুধু অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের রূপান্তর ঘটানোই তার গন্তব্যস্থল। ফ্রয়েডের কল্যাণে জানা গেছে, মানুষের আচরণ সবসময় 'মোটিভ'-প্রসূত নয়। নিজ্ঞনি[৫] চেতনা শিকড়ের সন্ধান তিনি আমাদের দিয়েছেন। ফলে, মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। কিন্তু ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক তিনি দেখেছেন সাপ-বেজীর সম্পর্কের মত। মানুষের পারিপার্শ্বিকতা তিনি ধরে নিয়েছেন শাশ্বত, স্থির। কিন্তু তা যে মানুষের গড়া এবং সর্বদা রূপান্তরমুখী, তা ফ্রয়েডের চোখে পড়েনি। সে যাই হোক, মানুষের আত্ম-চেতনার আর এক দিগন্ত উম্মোচিত, একথা সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সংস্কৃতির সঙ্গে মিছরীর সুতোর মৎ-প্রদত্ত রূপক গোড়ার দিকে উল্লেখিত।

---

১. Desire of desire, ২. Planned economy ৩. Objestive Law . ৪. action

৫. Unconscious

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির আর এক সংজ্ঞা এখানে পাওয়া যায়। সংস্কৃতির যুগপৎ আত্মচেতনা এবং আবেষ্টনী সম্পর্কে চেতনার দ্বৈতাদ্বৈত রূপ।

তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের কাছে তা আরো গুরুতর-রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। কারণ, পূর্বোক্ত পথেই সংস্কৃতির চড়াই-পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদ-কুক্ষিগত আজ গোটা তৃতীয় বিশ্ব। এই ক্রান্তি-উত্তরণের পথ কোথায়? তা শুধু অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা নয়, সেই পথের হদিস নির্ণয় বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

উন্নত দেশ এবং অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে ব্যবধান। ক্রমশই বেড়ে চলেছে। অনুন্নত দেশের দারিদ্র্য এক ট্রাজিক বাস্তব। এমন পশ্চাৎপদতা কিন্তু পৃথিবীর আর্থিক উন্নয়নেরও অন্তরায়। তার সঙ্গে আছে ক্রমশ বর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানা বিধি-নিষেধ। এবং অনিশ্চিত মুদ্রা-বাজার[১]। এসব মিলে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুর্দশা-মুখী।

এখন স্পষ্ট যে এইসব সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শক্তিপ্রয়োগ বা প্রভুত্ব বিস্তারের নীতি চিরতলের পরিত্যাজ্য। পৃথিবীর সকল দেশের যেন উন্নয়নের সমান এবং স্বাধীন সুযোগ থাকে-এই নীতি বলবৎ করার জন্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান[২] থাকা অতি আবশ্যক। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক বদলের প্রয়োজনও আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন আর্থ রাজনৈতিক নীতির বুনিয়াদ তৈরি তাই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন নীতি এখনও দানা বেঁধে উঠতে পারছে না গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বিপুলায়তনে পূর্বোক্ত সমস্যা কোন এক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জোট দিয়ে সমাধান করা একদম সম্ভব নয়। এখানে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমযোগ্য। সেখানে মুখ্য নীতি হবে : প্রত্যেক সার্বভৌম রাষ্ট্র আপন জাতীয় সম্পদের পূর্ণ অধিকারী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ষোল আনা এক্তিয়ারও তার হাতে।

তৃতীয় বিশ্বে খাদ্যাভাব এখন সুবিদিত। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মানুষের মত রোজ আহার পায় না। "নেই ভাত, অমার্জিত জাত।[৩] কথাটা বার্ণাড শ'র। যে-কোন অনুশীলনহীনতা সংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে বাস করে। জাতিপুঞ্জের বিশেজ্ঞরা দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে বহু জমিন এখনও অনাবাদী পড়ে আছে। তার যথাযথ সদ্ব্যবহার হলে পৃথিবীতে পুষ্টির অন্ততঃ অভাব হবে না। এখন শিল্পোন্নত দেশের নৈতিক দায়িত্ব রয়ে গেছে। তাদের এগিয়ে আসা উচিত। কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব অনুন্নত দেশে তাদেরই কর্তব্য। তাদের সম্পদ নিয়োজিত হতে পারে পারস্পরিক সহযোগিতা সমঝোতার ভিত্তির উপর। অন্য দিকে বিশ্বে বাজার-

১. Unstable money market, ২. Institution ৩. A nation without food is bound to be crude.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও থাকা একান্ত দরকার। ফট্‌কা বাজির[১] ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের তেজীমন্দী সমস্ত দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ অনিশ্চয়তা এনে দেয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন।

যেমন সমস্যা, তার যথাযথ সমাধানও দরকার। এসব নির্ভর করছে যেহেতু ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক, তা আন্তর্জাতিক নীতিবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে যে-তিমিরে সে-তিমিরে। অন্ধকারে হাতড়পাতড়।

আনবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতার কথা আর না তুললেও চলে। বারুদের উপর উপবিষ্ট বর্তমানে বিশ্বের মানবগোষ্ঠী। উন্নত পর্যায়ে বিজ্ঞান-প্রসূত মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রযুক্তিবিদ্যার, উদ্যম কীভাবে আত্মহত্যার সড়ক তৈরি করতে পারে প্রতিদিন, তা মনে করলে, "মানুষ-কুত্তা-কুত্তা", সিনিক দার্শনিকদের মত চীৎকার দিয়ে উঠতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা জীবনের উচ্চারণ নয়, মৃত্যুর আর্তনাদ।

সর্বপ্রকার মানবিক উন্নয়ন বর্তমানে নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর। এই মানসিকতা সহজে প্রত্যাশা করা যায় না শিল্পোন্নত দেশ থেকে। তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের তাই আরো সংগ্রামশীল মানসিকতা প্রয়োজন। মানবতার দুশমন সাম্রাজ্যবাদ যেন চোখের সামনে ঝাপ্সা না হয়ে যায়।

অনেকে ভাবতে পারেন, সংস্কৃতির আলোচনায় কেন এই ইতঃক্ষিপ্ত দৌড়? টেবিলের ভোজ্য খেয়ে অনেকে উদ্‌গার তোলেন, 'কিচেনের' খবর তাদের কাছে অবান্তর। কিন্তু সংস্কৃতি কিচেনেও নিজের রাজস্ব চালায়। মিছরীর সুতো আবার স্মরণীয়। মোগলদের মহিমায় বিকাশ-কালেই এদেশে পোলাও (পলান্ন) টেবিলে পৌঁছায়। সেন্ট্রাল এশিয়ার মাংস এবং ভারতীয় চাল মশালার যোগসাজশে-তিন উপাদানের পরাকাষ্ঠ বুরাণীর স্বাদ এখনও দাওয়াতে মেলে। আব্বাসীয় খলিফাদের গৌরবময় কাল, নবম শতাব্দীতে খলিফা মামুনের কন্যা বুরহান এই হজমী ক্ষুধাবর্ধক পানীয়ের আবিষ্কার কর্ত্রী। কালে কালে আরো উপাদান যোগ হয়েছে। বুরহানী এখন বুরানিতে পরিণত। সংস্কৃতি সেই চেতনা বা জীবনের সকল উপকরণকে আর্ট-শিল্পে পরিণত করে।

তাই এখানে আন্তর্জাতিক সমস্যার উত্থাপন কিছু অবান্তর নয়। ইসলামের শৈশবলীলা দেখতে মক্কা-মদিনা তীর্থ ভূমির মাটি অঙ্গে মাখুন। কিন্তু ইসলামের যৌবনের পেশী-থরথর কম্পন, ম্যাজিক যদি দেখতে হয়, আপনাকে যেতে হবে দামেস্কে, বাগ্‌দাদে, কর্ডোভা, গ্রানাডা, ইস্পেহান, প্রিয়ার গালের তিলের বদলে বিনিময়তব্য হাফিজের সমরকন্ধ, বুখরা দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি কেন্দ্রে। বীজের বনিযাদ যেখানে, বিকাশের পরিবেশ সেখানে ছিল না। উটের দুধ মাংস খোমা তরমুজ-এমন কয়েকটি সামগ্রী খাদ্যের তালিকাভুক্ত। অস্তিত্ব টেকানো যেখানে বড় কঠিন দায়িত্ব, সেখানে মন আর কল্পনায় সওয়ার হতে অক্ষম।

১. speculation

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিংশ শতাব্দী মানুষের জন্যে বিরাট সম্ভাবনার যুগ। অস্তিত্ব-টেকানোর একঘেয়েমি থেকে অন্তত সব মানুষ মুক্ত হতে পারে। আত্মজিজ্ঞাসা এবং আবেষ্টনীর জ্ঞানের পশরা আর কোন যুগে মানুষের হাতে এমনভাবে ধরা দেয়নি। প্রকৃতি মানুষের জন্যে অপরিহার্য-এক বিশেষ বন্ধন। বাঁচার জন্য প্রকৃতির কাছ থেকে যা আদায় হয়, তা মেহনৎ মারফৎ। এই মেহনৎ-ই অর্থনীতি। জড়-পদার্থের উপর উপর যতই আধিপত্য বিস্তার করে, যত কৌশল-গত শক্তি-সঞ্চয় করে, ততই মানুষের প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসে এবং ইতিহাসে প্রবেশ-পথ পায়। এই পদক্ষেপ ব্যক্তির নিকট স্বাধীনতা। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যে-পর্যায়ে উপনীত সেখানে আর বিশ্বময় নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি রচনার সুযোগ অপেক্ষারত। মানুষের সামর্থ্য, আভ্যন্তরীণ শক্তি এখন বিপুল প্রচণ্ড। তবু-তবুও গত দুই তিন দশকে পৃথিবীর রক্তাক্ত রঙ্গমঞ্চ কাউকে আশান্বিত করে না। তেজস্ক্রিয় ধুলো শুধু বিচরণ করবে এই পৃথিবীর উপর আর জীবন্ত কিছু থাকবে না। পঁয়ত্রিশ-ছয়ত্রিশ বছর আগে স্বর্গীয় বিজ্ঞানচার্য সত্যেন বসু প্রথম হাইড্রোজেন বোমা ফাটার সময় লিখেছিলেন। সে-বোমা ত বর্তমানে সাধারণ পট্‌কার সামিল। সুতরাং আতঙ্কিত হতেই হয়। কিন্তু মানুষের নৈতিক শক্তি বা সামর্থ আজ কম নয়। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে জাতিতে জাতিতে, শ্রেণিতে শ্রেণিতে সংঘাত, বিশ্বে রাষ্ট্রশক্তির ভারসাম্য রক্ষায় মাদারীর খেল-এসব পরিবেশে নৈরাশ্যবাদী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু "মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ" রবীন্দ্রনাথের বাণীও এই সঙ্গে স্মরণীয়। বর্তমানে কুজ্ঝটিকা একদিন সরে যেতে বাধ্য।

www.amarboi.com

সংস্কৃতি কখনো সমতলে একই গতিতে হাঁটে না। তার চড়াই আছে, উৎরাই, আছে। বিশ্বে সব সংস্কৃতি সমানভাবে বিকশিত হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসম উন্নয়ন যেমন বর্তমানে বহু সংকটের উৎস, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা বহুবার ঘটেছে। ফলে সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি জিতে যায়। সংস্কৃতি সেদিক থেকে সত্যের সম্প্রসারণ। এই পথ মানুষকে সৌন্দর্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয় দেয়। কারণ, জীবনের এক সামগ্রিক রূপ যাদের কাছে প্রতিভাত, তারা জগতে এবং আপন চতুর্দিক-কার পরিবেশেও স্নেহশান্ত রূপের ছটা দেখার প্রয়াসী। একই সময়ে অবিশ্যি সংস্কৃতির ভেতর বিভিন্ন মানবিক উপাদান এক সঙ্গে বিকাশিত হয় না। গ্রীকরা মনের স্বাধীনতাকে শিরোপা দিয়েছিল। কিন্তু অন্য দিকে তারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। তাদের দার্শনিকরা দাসপ্রথার অর্থনৈতিক কিন্তু দেখেনি। জুড়াইজ্‌ম এ দিকে ভ্রাতৃত্বের পথে প্রথম সরব ঘোষণা। বাইবেলে ইসারায় সেই বাণী কী কখনও ভোলা যায়?

The lord will enter into judgement with the ancients of his people and the princes thereof; for ye have eaten up the ineyard; the spoil of the poor is in your houses. What mean ye that ye beat my people to pieces and grind the faces of the poor? ... woe unto them that join house with house that lay field to field that may be placed in the midst of the earth

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

... and what will ye do in the day of visitation, and in the desolation which shall come from afar? To whom will be fiee for help and where will ye leave your glory? To what prupose is the multitude of your sacrifices into me, saith the Lord; I am full of burnt offering of rams, and the fat of fed beasts... yyour appointed feast my sout hateth; they are trouble unto me; I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from youp yea when ye make many prayers I will not hear; your hands are full of blood. wash ye, make thee clean; put away the evil of your doings from bdefore mine eyes! Cease to do evil; leam to do wall; seek judgemnet, relieve the oppressed, judege the fatheriess, plead for the window.... অতি সরল ভাষা কি শক্তিধর, তার নমুনা ছাড়াও নৈতিক হাতিয়ার বটে এই উচ্চারণ!

তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সামনে রয়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদ এবং পৃথিবীর তাবৎ সংস্কৃতির মনি-মঞ্জুষা। জঠরের ক্ষুধা অনুন্নত দেশে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের অনন্তের ক্ষুধা, বৃহতের এষণা, সর্ব-মানবের সঙ্গে আলিঙ্গনের তৃষ্ণ-প্রেরণা। এই জন্যে উৎরায়ের চালু পথ তাদের কাছে মনে হয়েছে স্বাভাবিক। অবতরণ সব সময় স্বল্প শ্রমের ব্যাপার এবং বিপদ-কালে বিচার-বুদ্ধি কখনও জনপ্রিয় হয় না। নিজের আবেষ্টনী সম্পর্কে সুষ্ঠু চেতনা এবং আবেষ্টনীর রূপান্তর ঘটানোই এখন তৃতীয় বিশ্বের নিকট প্রধান দায়িত্ব। তাদের সংস্কৃতির চড়াই পথ এই যাত্রাবিন্দু থেকেই শুরু হবে। সংগ্রামের পথ নিশ্চয়। সংস্কৃতির অপর নাম সংগ্রাম। বাঁচার অনুপ্রেরণা সেখানে মেলে। তেমন অস্তিত্ব যাপনের হুক অবন্তনদের জন্যে রেখে গেছেন আমার মরহুম নমস্য অগ্রজ মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর "সংস্কৃতি কথা" গ্রন্থে অতি বিস্তারিত ধারায় : ".... সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মান-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; কাব্য-পাঠের মারফতে ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণ-গুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা; বিরহীন নয়ন-জলে, মহতের জীবন-দানে বাঁচা, গল্প কাহিনীর মারফতে নরনারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা, ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবন-কাহিনী মারফতে দুঃখী জনের দুঃখ-নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বিশ্বের বুকে বুকে মিলিয়ে বাঁচা।"

এই নির্দেশ-নামা জীবনেরই পথ। সংস্কৃতির চড়াই-পথে তার প্রতিধ্বনি যুগে যুগে অনুরণিত হতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম মানসের রূপান্তর

AMARBOI.COM

প্রবন্ধসমগ্র-১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম মানসের রূপান্তর
(১৮০০-১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ)

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৌষ ১৩৯৩
প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

AMARBOI.COM

উৎসর্গ

তিরিশ বছর ব্যবধানে লোকান্তরিত
দুই অগ্রজ-বন্ধু
কুমিল্লা দারোগাবাড়ী নিবাসী
মোতাহের হোসেন চৌধুরী
ইসলামী ইতিহাসের অধ্যক্ষ
ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাক-পরিচয়

১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ– এই চার বছর বক্ষ্যমান বিষয়বস্তু আমাকে বেশ উত্তেজিত রেখেছিল।

তখন এদেশী-বিদেশী বহু মনীষীদের রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কোন কোন বইয়ের সংক্ষিপ্ত নোটও রেখেছিলাম। নোট কীভাবে বিস্তারিত রাখতে হয়; চল্লিশ বছর পূর্বে তা-ও জানতাম না। অনেক বই আজ হাতের কাছে নেই। নামও মনে না-থাকার কথা।

পরে সামাজিক রূপান্তরের বিষয়টির প্রতি কৌতূহল থাকলেও তা নিয়ে আর বেশীদূর এগোইনি। মাঝে মাঝে নতুন বই থেকে তথ্য পেলেও নোট রাখার আগ্রহ তেমন ছিল না। এই বই প্রায় স্মৃতি থেকে লেখা।

চল্লিশ বছর কেটে গেছে। নোটটি জরাজীর্ণ অবস্থায় কী করে টিকে রইল, তা-ই অবাক করে দেয়। ঝড়-ঝাপ্টা তো কম যায়নি এই উপমহাদেশের উপর দিয়ে : দেশবিভাগ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। শেষোক্ত কাণ্ডে আমার ঘরটি ২৫ শে মার্চের পরবর্তী সাত মাস পাকিস্তানী সৈন্যদের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল। কিছু বই নষ্ট হয় তখন। কিন্তু পূর্বোক্ত নোট অক্ষত থেকে যায়।

স্নেহাস্পদ মফিদুল হক কলেজে আমার ছাত্র ছিল। তাই বোধ হয় সে স্কেচ্-জাতীয় নোটই বই-আকারে ছাপার আগ্রহ দেখায়। আমি আর বেশী আপত্তি তুলিনি যদিও ব্যাপারটা আমার মত গল্প-উপন্যাস-লেখকের জন্যে অব্যাপার।

দেশী-বিদেশী বহু মনীষীর ঋণ অতিবিস্তারিত আমার জনসমক্ষে প্রচার করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু বয়স বাধা এবং পরিশ্রমের বহর দেখে ভীত, আমি অকৃতজ্ঞতার অপবাদই শিরে ধারণ করলাম। কয়েক জন বিদেশী মনীষীর নাম এখানে স্মৃতি থেকে উল্লেখিত। তন্মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে উইলফ্রেড সি, স্মিথের কথা। অন্যান্য বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ– ইসলামের উপর যাঁদের গবেষণা জগদ্বিখ্যাত– ডব্-ু, মন্টগোমিরি ওয়াট, এইচ, এ আর, গিব্স্, ম্যাক্সিম রোদাঁস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইবনে খলদুনের অনুবাদক ফ্যাঞ্জ রোজেনথাল প্রমুখের রচনা দ্বারা আমি উপকৃত। দেশী মনীষী জন? কত জনেরই বা তালিকা দেওয়া যায়? মাসিক সওগাত, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকার বহু লেখকের নাম করতে হয়। মৌলানা আকরম খাঁ কি সওগাত-সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেবরা হয়ত বিশেষ পরিচিত। তা ছাড়াও বহু জনের তালিকা-সংগ্রহ এখন আমার পরিশ্রমের সাধ্যের বাইরে।

লোকান্তরিত অগ্রজ-বন্ধু, ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহকে এতৎসঙ্গে স্মরণ করছি। বহু বিশ্রম্ভ-আলাপে তিনি আমাকে আলোকিত করেছেন বহুবার। এক দিকে তিনি ছিলেন খুতখুতে পূর্ণাঙ্গবাদী Perfectionist এবং অন্য দিকে প্রচণ্ড জ্ঞান-তৃষ্ণায় আকুল, পিপাসাহর কিছু সন্ধানে তৎপর। এই দোটানায় পড়ে তিনি আমাদের জন্যে বিশেষ কিছু বড় কাজ রেখে গেলেন না। আলস্যের অপবাদ তাঁকে দেওয়া অন্যায়। কারণ, পড়ার তো বিরাম ছিল না তাঁর। এদেশে বর্তমান কাজটি গ্রহণের তিনিই ছিলেন যোগ্য বিদ্বান-জন।

পরিশেষে আরো কয়েকটি কথা চেপে যাওয়া আমার পক্ষে অস্বোয়াস্তি কর। এই পুস্তক যাঁর নামে উৎসর্গীয় মরহুম মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন বংশসূত্রে সৈয়দ। কিন্তু তিনি তা স্বেচ্ছায় ছেটে ফেলে দেন। তাঁর "সংস্কৃতি কথা" নামক অমূল্য প্রবন্ধের বইখানার সঙ্গে আশা করি অনেকে পরিচিত।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। ঠিক চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার সংক্ষিপ্ত নোট এক আসরে দুইজন শ্রোতার উপস্থিতিতে পড়েছিলাম। অকুস্থল নারায়ণগঞ্জ। স্বর্গীয় মোতাহের হোসেন চৌধুরীর আপন ভাগিনা, কৃতী প্রশাসক, কবি সানাউল হক ও সৈয়দ মান্নান বখ্শ– দুই শুভানুধ্যায়ী তখন নারায়ণগঞ্জে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের আমন্ত্রণেই সেখানে যাওয়া। সানাউল হক ইকনমিকস এবং সৈয়দ মান্নান বখ্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মতামত কোন কাজে লাগবে তখন ভাবিনি। সেই নোট বর্তমানে পুস্তক রূপে প্রকাশিত। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলুম। তারা হয়ত ভুলে গেছেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক বাংলাদেশে যদি বৃহত্তর গবেষণা-অভিমুখে কোন সুধীর অনুপ্রেরণা যোগায়, তাহলেই আমি আমার এই শ্রম সার্থক মনে করব।

শ.ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু গোড়ার কথা

One cannot take bath twice in the same river
এক নদীতে দু'বার স্নান করা যায় না।

– হিরাক্লিটাস
[খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০]

১

প্রজন্ম-ফারাক বা জেনারেশান গ্যাপের দুর্ভোগের কাহিনী এখন সর্বজন বিদিত। পুত্র স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী, জনকের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন হামেশা ঘটে, তা কেউ বলে না। কিন্তু কালের ব্যবধানে এমন আবহাওয়ার দেখা মেলে। কলেরা রোগ হয়। তা যখন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার নামকরণ ঘটে ঃ মহামারী। প্রজন্ম-ফারাকের ব্যাপার কতকটা অনুরূপ। সবযুগেই অমন বিচ্ছিন্নতার কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু এক-এক সময় তার ব্যাপকতা চোখে জানান দিতে থাকে। সাধারণ মানুষ এমন অস্বাভাবিকতার জুলুম কালের উপর চাপিয়ে দেয়। বাংলা প্রবাদ আছে : কলি তার উল্টো মুখ থলি। কলি যুগের নাম। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি– এই চার ভাগে এক কালে শাস্ত্রকারগণ পার্থিব সময়কে বিভক্ত করেছিলেন।

AMARBOI.COM

যুক্তিবিচার এবং অনুভূতির মাঝখানে অনেক সময় ফাঁক থেকে যায়। 'বুঝি, কিন্তু মন মানে না', এমন জবাব তো ব্যক্তিকে দিতে হয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি। আবেগ এবং যুক্তির মধ্যে সাযুজ্যের অভাব ঘটলে যেমন ব্যক্তি-জীবনে, তেমনই সমাজ-জীবনে ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয়। প্রজন্ম ফারাকের ক্ষেত্রে তেমনই অবস্থা দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় কালের ব্যবধানে এমন পরিস্থিতি থাকে না। যুক্তি এবং অনুভূতি একে অপরের দোসর হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে গা-সওয়া– এই শব্দটা বড় তাৎপর্যপূর্ণ। এক সময় যা অতি বিরক্তিকর ঠেকত, হয়ত তা আর তেমন পীড়াদায়ক নয়। অর্থাৎ সহনশীলতা, যে-কোন কারণেই হোক, সেখানে উপস্থিত। ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনে কোন কালে অমন বিরক্তিকর পরিস্থিতি ছিল, পরে তার চিহ্নও মেলে না।

একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যায়। ঢাকা কি অন্য মফস্বল শহরে, বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে কেউ কল্পনা করতে পারত না, বিনা পর্দায় কোন মুসলমান মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় হাঁটবে– বাজারে যাওয়া তো দূরের কথা। এখন বাজারেও বহু গৃহবধূ দেখা যায়, যারা থলি হাতে বাজার চষে বেড়াতে অভ্যস্ত। আশপাশে মরদের ভিড় তাকে কাবু করতে অক্ষম।

এই পরিস্থিতি থেকে, দুটি সিদ্ধান্তে খুব স্বচ্ছন্দে আসা যায়। প্রথমত এক শ্রেণীর নাগরিকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা মেয়েদের অবরোধ করে রাখার বিরোধী। দ্বিতীয়ত আর এক শ্রেণীর মানুষ যারা পর্দাহীনতা-কে শরিয়ত-বিরোধী বেলেল্লাপনা মনে করত তাদের চেতনার সাবেক ধার অনুপস্থিত। তারা পিছু হটেছেন। অর্থাৎ তাদের প্রাক্তন ঈমান কমজোর হয়ে গেছে। এক কালে পর্দা কী মেয়েদের স্কুলে পাঠালে একঘরে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বেশী দিনের কথা নয়, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ – চৌদ্দট্টি বৎসর পূর্বের কথা– খুলনা শহরের আবুল হাকিম নামধারী এক শরীফ ব্যক্তি মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। বর্তমানে তেমন পরিস্থিতি কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু এক কালে তার জন্যে কল্পনা ছিল স্রেফ বাহুল্য। চেতনার অমন মোকাবিলা নতুন কিছু নয় মানুষের সমাজে। কারণ, গোড়ায় পরিবর্তন। পাশ্চাত্য–শিক্ষায় শিক্ষিত বহু নাগরিক এখনও ভূরিভূরি মেলে যাদের পিতৃদেব গাঁয়ের 'মিয়া' কিন্তু তারা 'মিস্টার' বনে গেছেন হালেচালে খানাপিনায় ইত্যাদিতে। হেতু, চেতনায় প্রাচীন জগৎ অনুপস্থিত।

কেন এমন ঘটে? ব্যাখ্যার জন্য কোন সমাজতাত্ত্বিকের কাছে যাওয়ার দরকার হয় না। সাধারণ জ্ঞান সামান্য প্রখর হলেই তা অনুধাবন সম্ভব। অতীত মাত্রেই এক ধরনের ট্র্যাজেডি। যেহেতু, তা আর ফিরে আসে না বা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। কালস্রোত নদীর মতই প্রবাহ-পথে নানা চেতন-অচেতন মানসিক বনভাসি খড়কুটো ভাসিয়ে আনে। নতুন পরিবেশ তৈরী হয়। প্রত্যেক নতুন বর্তমান অতীতের গর্ভজাত। কিন্তু এক দিকে তা স্বয়ম্ভূ- অর্থাৎ নিজের শরীর স্বেচ্ছায় গঠন করে। 'পথই আমায় পথ দেখাবে সার', –রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন কথা প্রয়োগ করেছিলেন। ইতিহাসের বেলায়ও তা স্বচ্ছন্দে প্রযোজ্য। সড়ক মোড় নিতে পারে। সেখানে নতুন-নতুন দৃশ্যের যোজনা হয়ত প্রতীক্ষার্থী। এই নতুনের আবির্ভাব মেনে নিলে, সমাজের অনেক রহস্য আর রহস্য থাকে না, বরং প্রাকৃতিক নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়।

সোজা বলা যায়, কাল-প্রবাহে নানা উপাদানের প্রক্রিয়ার যোগফল সমাজ-কাঠামোয় অবলবদল ঘটায়। তখন মানস-জগতেও ওলট-পালট দেখা দেয়। বহু সময় সমাজের প্রাচীন বনিয়াদই চাপা পড়ে যায়।

এই কথাটুকু মনে রাখলে সমাজ-ইতিহাসের ব্যাখ্যা কিছু সহজ হয়ে আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোক জগৎ থেকে কালের আসন গুম করে দেয়। নিষ্কাল Nontemporal জগতের অধিবাসী তারা। পরিবর্তনের ব্যাখ্যা তাদের কাছে আদিদৈবিক। অথবা, অনেক সামাজিক আদর্শ তারা আঁকড়ে ধরে থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষপাতী– যার ঠিকুজী এবং উপযোগিতা উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ যে-কালের পরিবেশে উক্ত আদর্শের সূত্রপাত, সেই পরিবেশই আর নেই। আয়নার উপর প্রতিফলিত ছবির বস্তু-সামগ্রী উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু দর্শকেরা এখনও পুরোনো ছবি দেখছেন। ইতিমধ্যে তাদের চোখের পর্দা যে ব্যাধিগ্রস্ত তা আর তারা টের পান না। এমন ব্যক্তিদের পাজিতে গতকাল থাকে না। তাদের পরশুও কল্পনার ভোজবাজি। অর্থাৎ কপোল-কল্পনা। সুতরাং মোহাচ্ছন্ন জগতে এমন ব্যক্তিদের অধিবাস। অবিশ্যি তাদের সংস্কার মূর্তি পদে পদে চোখে পড়বে। প্রতিক্ষণ নসীহৎ, উপদেশের বহর, এমন ব্যক্তিদের বড় দীর্ঘ হয়। কারণ, প্রয়োগ-সাধ্য নয়। তা পরিণামে ফলপ্রসূ কি না, এসব সমস্যা নিয়ে তাদের কোন শিরঃপীড়া নেই।

এই সূত্রে একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়।

অধ্যাবসায়, মিতব্যয়িতা বিশেষ সদগুণ মনুষের জন্যে। তা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু নিষ্কাল জগতের বাসিন্দারা পরিস্থিতির বিচার না করেই নসীহৎ উপদেশ আওড়ে চলে। সব সময়ে অধ্যবসায় কাজে নাও লাগতে পারে। হয়ত দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তা পণ্ডশ্রম। কিন্তু নসীহৎ ওয়ালাদের পরিবেশ-জ্ঞান আদৌ থাকে না। কারণ, তারা নিষ্কাল জগতের অধিবাসী। এমনিতে যে কোন সদগুণ নাম-মাত্র। জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেই তার মূল্য-বিচারের প্রশ্ন ওঠে। সামান্য স্বল্পশিক্ষিত সিপাই ল্যান্স-করপোরাল থেকে হিটলার জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। অধ্যবসায় ছিল বৈকি পেছনে। কিন্তু তার পরিণাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচ কোটি লাশ এবং কয়েক কোটি পঙ্গু মানুষ। সম্পদ অপচয়ের কথা আর তোলা নিষ্প্রয়োজন। জীবনের প্রবাহ-ই অধ্যবসায়ের প্রামাণ্য যাচায়ের আসল ক্ষেত্রভূমি। নচেৎ তা ব্যাকরণের নিবস্তুক abstract বিশেষ্য পদ। অধ্যবসায় এবং মিতব্যয়িতা সদগুণ থাকার ফলে বহু মানুষ দরিদ্র থেকে ধনীতে উন্নীত এমন নজীর মেলে। অনেক ধনকুবেরের কাহিনী অধ্যবসায়ের পরিণাম হিসেবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ খাড়া করা যায়। কিন্তু কোন্ কালে তারা দারিদ্র্য-মুক্ত বিত্তশালী হয় তা-ও তো হিসেবের মধ্যে গণ্য করা উচিত। সমাজের অবস্থা তখন কী ছিল? কোন বর্ধিষ্ণু, বিকাশোন্মুখ সমাজ গঠনে অধ্যবসায় প্রয়োজন। সামাজিক আদর্শরূপে তা ধরা উচিত। ধরা হয় ও। অধ্যবসায় তখন ফল দেয়। মুর্গী ডিম প্রসব করে। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির তোড় যদি পূর্বের মত না থাকে, তখন আর হাজার অধ্যবসায়-যোগেও বিত্তবান হওয়া সম্ভব নয়। যদি হয়ও, তার সংখ্যা হবে মুষ্টিমেয়। তাছাড়া আরো একটি উপাদান যেন চোখ এড়িয়ে না যায়। সমাজের কোন স্তরে ওই-সব হবু অধ্যবসায়ীদের অবস্থান? বিখ্যাত ধনকুবের ইস্পাহানীর পুত্র-কন্যাতো বিনা মেহনৎ, বিনা অধ্যবসায় জন্ম থেকেই কয়েক কোটির মালিক। তার জন্যে তাদের অমিতব্যয়িতা বা অধ্যবসায় কিছুই দরকার হয়নি। আর একজন ছা-পোষা কেরানী তো হাজার রকম মিতব্যয়িতা কি অধ্যবসায়- যোগে কয়েক হাজার টাকারও মালিক হতে পারবে না ইহজন্মে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ এক ধরনের নসীহৎ-দাতারা খুব ভাল-ভাল, চমৎকার-চমৎকার বাণী প্রতিদিন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আওড়ে যায়। কিন্তু ভাল-ভাল কথার পরিণাম কী অথবা ভাল কথা তখন ফলপ্রদ কি না– তার বিচারের কাছাকাছি তারা নেই। বহু মূর্খ শিক্ষক অধ্যাপক সুন্দর-সুন্দর উপদেশ উগরে চলে প্রতিদিন ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে। তারা নিজেরাই জানে না, তাদের উত্তম-উত্তম বুলি থেকে তখন কোন ফসল হওয়ার মওকা বা মৌসুম আছে কি না। অর্থাৎ, কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদের মগজ থেকে অন্যত্র উধাও। তারা জানে না, পুতুলের বিয়ে দেওয়া যায়, বিয়ে হতে পারে, কিন্তু তা থেকে বাচ্চা পয়দা হয় না কোন কালে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন এদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল নগন্য। নতুন সমাজের পত্তন। উন্নত হিন্দু প্রতিযোগীদের হটিয়ে মুসলমানের রাষ্ট্র হলো। মুসলমানদের রাষ্ট্র মানে সব মুসলমানদের নয়। মধ্যবিত্ত মুসলমানদের। তার বিকাশতো স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে ধনী এবং মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছিল, তা তাদের হালচাল, ইমারৎ, খানাপিনা আধুনিক জীবনযাপনের কে তা থেকে বেশ আন্দাজ করা যেত। পাকিস্তান আমলেই কিন্তু উন্নয়নের স্রোতে ভাটা দেখা গেল। তখন মধ্য বিত্তের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। সেই ধিকিধিকি তুষের আগুন পরে পূর্বপাকিস্তানের দাউদাউ জ্বালা বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশে পরিণত হয়। একদা হালুয়া-রুটির সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত হিন্দুদের হটানোর জন্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন হয়েছিল। পবিত্র ইসলামও আসরের টানাটানি থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু সমস্যা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মিটল। মধ্যবিত্ত আবার হা-ভাতে। এবার দুশমন মুসলমান ভাই; সব অন্য প্রদেশের অধিবাসী। জাতীয়তাবাদী চৈতন্য প্রয়োজন মোকাবিলার জন্যে। কারণ, ইসলামের বাণতো প্রতিপক্ষের তুণেও রয়েছে, হালুয়া-রুটির সিংহভাগ তারাই খেয়ে যায়। বাংলাদেশের পত্তন সেই সংঘাতেরই জের। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনে আজকাল যুবকদের লম্বা লাইন থেকে বুঝা যায়, বিকাশের স্রোতে আবার ভাটা দেখা দিয়েছে। এমন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ভাষায়–সমাজ স্তরীভূত stratified হয় ক্রমশ । তখন প্রত্যেকে যে-যার অবস্থানে টিকে থাকার জন্য সতর্ক। যখন সমাজের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় তখন এই সব আলামৎ দেখা দেয়। মানুষের ভেতরকার সদগুণ এমন কালে গায়েব হতে থাকে। তা বিচিত্র কিছু নয়। অনেকে বেচারা শয়তানের উপর সব অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে শান্তচুপ, খাতির জমা থাকে। কিন্তু শয়তানীর আসল আঁতুর ঘর সামাজিক পরিস্থিতি। শয়তান বেকার থাকলেও পারে। কিছু আসে যায় না। সমাজ আপন নিয়মে তার কাজ সম্পন্ন করে চলে। কখনও সে দরিদ্র থেকে ধনী, অনেক অধ্যবসায়ীর জন্মদাতা; কখনও নানা রকমের দুর্নীতি, বেঈমানী, বেকারী, দেউলিয়া, আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ায়। পতন অভ্যুদয়-মন্থিত ইতিহাসের সড়ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশ স্বতন্ত্র হলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মানসিক মৌসুমও বদলে যেতে বাধ্য। কিন্তু বহু লোক তখনও অতীতের মানস-লোকে বাস করে। প্রজন্ম-ফারাকের অন্যতম হদিস এখানে মেলে। পিতাপুত্র কি এক প্রজন্মের তরুণদের সঙ্গে যখন অন্য প্রজন্মের তরুণদের যে বিরোধিতা বাধে তা সোজা পরিবেশ-পরিবর্তনের ফল। এসব কথা পুরাতন। অনেকেই তা জানে কিন্তু সামাজিক আচরণে নিজেদের অগোচরেই তারা অতীতের আড়তে নিজেদের আত্মা মর্টগেজ দিয়ে বসে থাকে। এমন ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার খুব সহজে চোখে পড়ে : গা-সওয়া হয়ে যায় কালের অত্যাচার। শহরে মেয়েদের চলাফেরা নিয়ে এখন তেমন কেউ বিরোধিতা করে না। পত্রিকায় লেখালেখি তো দূরের কথা। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় যথা, সওগাত, মোহাম্মদী, হানাফী, নবনূর, ছোলতান প্রভৃতি– পর্দা নিয়ে তুলকালাম বাদানুবাদ চলত। আজ তা নিয়ে কারো মাথা ঘামানোর উৎসাহ নেই। হয়ত অন্তর্দাহ অনেকের দূর হয়নি। এখানে একটা রূপক পরিস্থিতি বিশদের জন্যে, আশা করা যায় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একে অপরের মুখোমুখি, চ্যালেঞ্জের পর দাঁড়িয়ে গেছে। দুজনের মধ্যে একজন বেশ তাগড়া বলবান, অন্য জন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। প্রথম ব্যক্তি নিজের তাগদ সম্পর্কে বেশ সচেতন। সে প্রথমে এক ঘুষি ঝেড়ে দিলে প্রতিপক্ষের মুখ বরাবর। এমন ঘটনা নতুন নয়। দুর্বল জন পিছু হটে গেল। কিন্তু তার মুখের গালি আর রোয়াব বন্ধ হয় না। সে আবার চীৎকার ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারে, "আর একবার মার দেখি, ব্যাটা।" বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী আবার দাওমত ঝেড়ে দিলে আর এক ঘুষি। কমজোর জন পিছু হটে আর দুগুজ কিন্তু তার মুখ আদৌ হটে না। গালিসহ সে আবার হাঁক মারে, "মার দেখি আর একবার, এবার দেখিয়ে দেব।" এই তামাসা চলতেই থাকে, যতক্ষণ না দুর্বল লেজ গুটিয়ে পিঠটান দেয়।

সমাজ-জীবনে একদম অবিকল ব্যাপারটা ঘটে। একটা নজীর তো এখনও সামনে রয়েছে : সুদ-সমস্যা, শরীয়তের বিধান নিয়ে তর্ক। ব্যাঙ্কের মতো ইনস্টিটিউশান ছাড়া বর্তমানে কোন রাষ্ট্র চলতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের প্রধান শর্ত : উপার্জন। সেখানে সুদ সর্বাগ্রগণ্য। দেখা গেছে, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পর এক শ্রেণীর পরহেজগার (ধর্মনিষ্ঠ জন) ব্যাংকে টাকা রাখত, সুদ নিত না। এখনও দু'চার জন এমন ব্যক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়, এক ব্যাংক ম্যানেজারের রিপোর্ট। তেজারতীর নীতিশাস্ত্রের (ethics) নিকট ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র শেষ পর্যন্ত মধ্য যুগের দাপট থেকে সরে আত্মরক্ষামূলক পজিশন নিতে বাধ্য হয়। অথবা তা আপোষ করে টিকে থাকে। কোন কোন জায়গায় সুদের নতুন নামকরণ ঘটে : মুনাফা। যার নাম বারো বুড়ি তার নাম তিন পণ। বাংলা প্রবাদ। পুরাতন কড়া গণ্ডা বুড়ি পণের হিসাব উঠে গেছে। বর্তমানে মেট্রিক পদ্ধতি। এখনকার ভাষায় বলতে হয়, যার নাম হাজার গ্রাম, তার নাম এক কেজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ সামান্য খোলা রাখলে, হাজার রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। মৌলিক অদল-বদল অবশ্য সকলে ধরতে অক্ষম। সেখানে নানা ধরনের আলো-আঁধারির খেলা চলে, মানসিক অবস্থান যেখানে প্রধান প্রহরী। পর্দার ব্যাপারই ধরা যাক। এখনও তার নানা মাত্রা দেখা যায়। প্রাচীন বয়স্ক মুরুব্বী আছে ঘরে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে বাড়িতে পর্দা পালিত। ঘরে বোরখাও আছে। তা পরেই বিবি বাড়ি থেকে বেরোয় স্বামীর সঙ্গে। তারপর পাড়ার আড়াল হলে বোরখা ঢুকল পকেটস্থ পলিথিন ব্যাগের ভেতর। যুক্তি এবং আবেগের দ্বন্দ্ব-সংবাদ পূর্বে পরিবেশিত। আমার মনে হয়, বোরখা-সংক্রান্ত ওই ছবি মনে রাখলে ব্যাপারটার সম্যক অনুধাবনে কোন হোচট খেতে হবে না।

মোদ্দা কথা, স্রোতবাহী নদীর উপর নৌকার সঙ্গে সমাজ তুলনীয়। তা কখনও স্থির থাকতে পারে না। হয় এগোবে নতুবা পিছিয়ে যাবে। সেখানে হোচটের যত বাধা-বিপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু স্থিরতার ধর্ম সমাজের উপর প্রযুজ্য নয়। মাটির তলায় ধ্বসের ইতিহাস গোপন থাকে। পাড়ে ভাঙন শুরু দেখা দিলে স্থানীয় অধিবাসীরা টের পায়। সামাজিক পরিবর্তনও খুব নিঃশব্দে অগোচরে চলার পর হঠাৎ জানান দিতে থাকে।

কিন্তু কারা এই পরিবর্তন অস্বীকার করে? দুই শ্রেণীর মানুষ পরিবর্তন-বিরোধী কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ তো এখন উপকথায় পরিণত। তিনি যখন রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত ক্রীতদাসদের সংঘটিত করছিলেন, তখন হাজার হাজার গোলাম ছিল রোমে যারা নিজ প্রভুদের সমর্থক। মনিবদের সঙ্গে তারা নিজেদের স্বার্থ এক করে ফেলেছিল। গোলাম, তার জীবজন্তুর শামিল, তেমনই ব্যবহার পেত গৃহস্বামীদের কাছ থেকে। তবু কেন তারা অভিজাতদের পক্ষে? ব্যাপারটা স্ববিরোধ মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে মূলে কোন ফাঁক ছিল না। মনুষ্যত্বের আদর্শ কী হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ শাসকশ্রেণীর হাতে থাকে। তাদের পরিকল্পিত মডেলের বাইরে যেন অন্য আদর্শ না এসে পড়ে, সেদিকেও তারা ভয়ানক সাবধান। শিক্ষাদীক্ষা, দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা শাসক সম্প্রদায়। ফলে মানুষের মন তাদের আদর্শের ছাঁচেই গড়ে ওঠে। বিশ্বাস এমন জিনিস– যা একবার বুকে দানা বাঁধলে আর অত সহজে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তা রাতারাতি বদলে ফেলা অসম্ভব। কারণ আশৈশবের বিশ্বাস এমন দাগ কেটে বসে মনে যে তা মুছে ফেলা দায়। শাসকশ্রেণী আফিমের নেশার মতো নিজেদের মতাদর্শে মানসিক আবহাওয়া তৈরী করে রাখত। এই আচ্ছন্নতা যেন জগদল পাথর। স্পার্টাকাসের ডাকে তাই অসংখ্য গোলাম আর সাড়া দেয়নি। কারণ, সাড়া দিতে অক্ষম।

সব যুগেই শাসকশ্রেণী দুই জাতের জল্লাদ নিয়োগ করে। এক শ্রেণীর জল্লাদ বিচারের পর ধড় থেকে মাথা খসিয়ে নেয়। কিন্তু আরো এক শ্রেণীর জল্লাদ তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোষে। তারা মনিবদের ধ্যান-ধারণা দাসগণের মধ্যে বদ্ধমূল করে ছাড়ে। নানা ক্রিয়াচারের মালিক এই জল্লাদগণ তাদের হাতে ছুরি-ছোরা ফাঁসির রশি–এসব কিছুই থাকে না। তারা আলখেল্লা পারে থাকে। চেহরা জল্লাদের মত ভীতপ্রদ নয় আদৌ। বরং শান্ত নিরীহ সৌম্য আদল। এমন সারল্যের নিকট সহজ বিশ্বাস-প্রবণতার শিকার সাধারণ মানুষ অনায়াসে প্রতারিত হয়। এখন তাই কালে কালে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সমাজ-পরিবর্তনের জন্য আদর্শের পরিবর্তন অপরিহার্য।

জটিল-কুটিল সমাজের বিন্যাস। তাই নিজের স্বার্থ, আচ্ছন্ন জনসাধারণ, সব সময় যাচাই করতে অক্ষম। প্রাচীন আদর্শে মোহগ্রস্ত নিপীড়িত মানুষও ভাবে, পরিবর্তন হলে সমাজ রসাতলে যাবে এবং তারা হবে প্রচণ্ড পাপে পাপী। এমন মোহমুক্তি ঘটতে বিলম্ব লাগে। ব্যক্তির জীবন সেদিক থেকে এক করুণ ট্র্যাজেডি। প্রায় দু'শ বৎসর পর এই ভূখণ্ড ইংরেজের দাসত্ব-মুক্ত। এই সুদীর্ঘ কাল বহু স্বাধীনচেতা মানুষ কতো মানসিক যন্ত্রণা না ভোগ করেছে। মানব জাতির বয়স এত অল্প নয়। সেখানে দশ বিশ হাজার বছরের পরিচয় পাওয়া যায়। তা অগ্রগতিরই প্রতিধ্বনি। মানুষের উপরে মানুষের নিপীড়ন প্রাকৃতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কী মর্মন্তুদ না ছিল। উদাহরণত টায়ফয়েডের কথা ধরা যাক। প্রাকৃতিক এই দানবের নিকট কতো জননীর কোল থেকে সন্তান, কতো রমণীর কোল থেকে স্বামী খসে যেত– অপমৃত্যুর মিছিল। বর্তমানে টায়ফয়েড কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। সহজ তার প্রতিষেধক। আজ একজন মধ্যবিত্ত যে-বিলাস ভোগ করে মোগল বাদশার পক্ষে তা কল্পনাও কঠিন ছিল। রেফ্রিজিরেটর, ঘড়ি, বিমান-সফর, ক্যাসেটে দেশ-বিদেশের সঙ্গীত বা এই জাতীয় উপভোগ মানবজাতির ইতিহাসের সর্বাত্মক ফল। ন্যুবিয়ান স্বর্ণখনির গোলামদের পশু-সুলভ জীবন অন্তত বর্তমানে কেউ কোথাও যাপন করে না।

তবু পরিবর্তন সম্পর্কে ভীতি এবং আশঙ্কা পদে পদে। এ কথাও সত্যি, কোন সমাজ সহজে নতুনের জায়গা করে দেয়নি। উন্নত যন্ত্রশিল্প এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকারী উন্নত রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের জন্যে নিজেদের সামান্যতম আরাম-আয়েশ ছাড়তে নারাজ। অথচ একদা উপ-নিবেশের লুটতরাজ মারফতৎই তাদের সকল ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছিল।

অবিশ্যি পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের জোর-জবরদস্তি অব্যাহত থাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

২

পরিবর্তনের পথেই রূপান্তর সৃষ্টি হয়। লেজ খসে গেলে ব্যাঙাচি হয় ব্যাঙ। তখন দু'য়ের রূপে অনেক ব্যবধান। সমাজ-জীবনে একই কাণ্ড ঘটে। অবিশ্যি টাইম, কাল সেখানে অন্যতম মহানায়ক। আরো নানা উপাদান আছে। তা-ও তুচ্ছ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষীরা প্রধান-প্রধান কাঠামোর মধ্যে রূপান্তরের ঠিকুজী খুঁজে বের করেন। সেখানে অর্থনীতির ভূমিকা এবং অভিঘাত প্রচণ্ড। এই-উপমহাদেশেও তা-ই ঘটেছে।

ইংরেজদের আগমনের ফলে এদেশী জীবন-যাপনের ধারায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ, যদিও উপনিবেশবাদীরা তেজারতীর সড়ক ধরে এসেছিল, তার মূল দ্যোতনা কিন্তু শুরু হয় যন্ত্রশিল্পের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া থেকে। যন্ত্রের জন্যে কাঁচামাল দরকার। এই কাঁচামালের খোঁজে য়ুরোপীয়রা পৃথিবীরময় ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রশিল্পের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে প্রায়শ। তার ফলে, পৃথিবীময় আলোড়ন। কাঁচামালের অন্বেষণই উপনিবেশবাদের মূল হেতু। সাম্রাজ্যবাদের এই ইতিহাস নতুন করে বলার কিছু নেই। তার ফলে, উপনিবেশের কৃষিপ্রধান, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমশ ধসে পড়তে লাগল। দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ কিছু সামগ্রীর জন্যেও তখন দেশবাসী বিদেশীর মুখাপেক্ষী। যন্ত্রশিল্প-জাত পণ্যের বাজারে পরিণত উপনিবেশ সেই আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

নতুন পরিবেশের মুখোমুখি মানুষ। তাদের অন্তর্জগত তখন শান্ত থাকে না। ভাবজগতেও নানা চাঞ্চল্য। তা স্বাভাবিক। মোকাবিলার জন্যে মানুষের আদর্শ প্রয়োজন। আরো স্পষ্ট বলা যায়, ঈমান দরকার। পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক রকমের লড়াই বৈকি। কোন আদর্শ-বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তো এই সংগ্রাম শুরু হয়। তখন অন্তর্জগতে আলোড়ন না উঠে পারে না।

এই দেশে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি-রূপে ইংরেজ টিকে রইল। অবিশ্যি ভাগাড়ে শকুন অনেক পড়েছিল। পর্তুগীজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি লালাসিক্ত জিভ নিয়েই হাজির হয়। কাঁচামাল সংগ্রহ এবং পণ্যের এমন তোফা বাজার। লাভের লোভ স্বাভাবিক। ইংরেজের দাগাবাজি এবং তুখোড় চালের কাছে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গগণের লেজ গুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য পথ রইল না।

য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের থাবা এমনই দিগ্বিসারী যে কোন দেশের মুসলমান সমাজের তা থেকে রেহাই ছিল না। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডের রূপে দেখা দিল। যেখানে রাজদণ্ড যায়নি, তেমন দেশও পরোক্ষ বা গৌণভাবে পদানত হয়ে রইল। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির নিগড়ে গোটা পৃথিবী বাঁধা। ফলে, পৃথিবীর সকল মুসলমান সমাজের উপর তার আঘাত পড়ল। সেখানে মানসিক আলোড়নও অবশ্যম্ভাবী। গবেষকদের কল্যাণে বহু দেশের সংবাদ পাওয়া যায়।

বর্তমান গ্রন্থকার তেমন কোন উচ্চাভিলাষ পোষণ করে না। এই উপ-মহাদেশেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তা-ও রূপরেখা-নির্ভর। কোন বিস্তারিত আলোচনা ক্ষুদ্র-কলেবর পুস্তকে সম্ভবও নয়। মজকুর গ্রন্থকারের নিকট কাল-পরিমাপ মাত্র দেড় শ' বছর। ইতিহাসের যাত্রাপথের মোটা মোটা কয়েকটি দাগ ধরেই বর্তমান লেখকের পদচারণা।

মূলত মানুষ-জগৎ আলোচনার বস্তু। তারও কিছু পরিচয়-দান প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস ছাড়া সমাজ-জীবন অচল। সেখানে এই যুগে ধর্মের জায়গা প্রধান। মুসলমানের ধর্ম ইসলাম, তা বলা বাহুল্য। সুতরাং গ্রন্থের আলোচনার বিষয়বস্তু ইসলামী চিন্তাধারার বিবর্তন।

কিন্তু এখানে স্বস্তি সহজে মেলে না। কারণ, ইসলাম বর্তমানে একটি নির্বস্তুক abstreat বিশেষ্য মাত্র। শুধু এই একটি শব্দে কিছুই জানা যাবে না একজন মানুষের ঈমান সম্পর্কে। একজন ইসলাম ধর্ম-পালন করে। তা বলামাত্র কারো ঈমানের সম্যক ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে না।

তবে কী পৃথিবীর অন্যতম মহান ধর্মের আরো রূপ আছে? তা স্বীকার করতে যে-কোন সৎ মানুষের দুঃখ পাওয়ার কথা। কারণ, তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ইসলাম অখণ্ড নয়, বরং নানা বর্ণছায়ায় বিভক্ত। এক কালের অখণ্ড এক মহতী উচ্চারণ– বা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে আত্মশ্রদ্ধাসহ বাঁচার পথ ও প্রেরণা যুগিয়েছে, তার একক প্রতিমা এখন খুঁজে পাওয়া দায়। তখন কুটিল ব্যঙ্গ বহির্গত লোলজিহ্বাসহ ভ্রুকুটির সামনে আর মাথা তুলে তাকানো চলে না। হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বালী, মালেকী, শিয়া-সুন্নী, আহমদী, ইসমাইলী– এমন ডজন ডজন খণ্ড ইসলামের ছবি মিছিল সহ সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলে।

তা কোন দুঃখের ব্যাপার নয়। এক সামগ্রীর নানা রূপ থাকতে পারে পরিবেশ-গুণে। কিন্তু এখানে এই জাতের বিভেদ পারস্পরিক আত্মঘাতের ইন্ধন। শিয়া-সুন্নীরা তেরশ' বছর ধরে একে অপরের রক্তপিপাসু। ভারতে লাক্ষ্মৌ শহরে মুসলমানদের কলঙ্কময় ধর্মান্ধতার আদল দেখুন। ওরা এখনও স্বপ্নাচ্ছন্ন সুদূর কোন অতীতের সড়কে নিশিগ্রস্ত হেঁটে চলছে। প্রতি বছর লাক্ষ্মৌ শহরে খুনখারাবী শিয়া-সুন্নীর দাংগা তো আছেই। তাছাড়া প্রায় পাঁচ সাত জন বলি যায় মহরমের সময়। আর পাকিস্তানের ভাগ্যাহত আহমদীয়া সম্প্রদায়। নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যেক মানুষের বাঁচার অধিকার আছে যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, যদি সেই সব বিশ্বাস সমাজ-জীবনের দৈনন্দিনতায় কোন উপদ্রবের উৎস না হয়। আহমদীয়া ভাইদের কিছু নিজস্ব বিশ্বাস, মতামত ক্রিয়াচার আছে। তা থাকুক না কেন। কিন্তু সেই বিশ্বাস মুছে দিতে পাকিস্তানের অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী বদ্ধ পরিকর। ফ্যাসিজুমের ধর্মীয় প্রকাশ আর কোথাও আছে কী? আরো পরিতাপের বিষয় রাষ্ট্র পর্যন্ত এগিয়ে আসে সেই ফ্যাসিস্ট আচরণের সমর্থনে, সেই মধ্যযুগীয় হিংস্র সংকীর্ণতা বজায়ে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে মরহুম জুলফিকার আলি ভুট্টো তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানীদের গণহত্যার রাস্তা পরিষ্কার করেছিলেন। পরে নিজেই নিজের খোঁড়া গর্ত-পথে সিপাইদের প্রহসন-ধর্মী বিচারের শিকার রূপে তিনি ফাঁসির রশির শেষ প্রান্তে ঝুলে পড়েন। এই ভুট্টো সাহেবই গদীনশীন অক্তে পার্লামেন্টে আইন পাস করান যে আহমদীয়ারা অমুসলমান অর্থাৎ মুসলমান নয়। ইতিহাসের পরিহাস আর কাকে বলে? তার ফল কী দাঁড়ায়? গত পাঁচশ' বছরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(উলুগ বেগ, বোধ হয়, শেষ ঝলক) কোন বিশ্ব-যশস্বী কী, মুসলমান সম্প্রদায় থেকে কোন ছোটখাট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও দেখা যায় না। বহু কাল পরে পদার্থবিদ অধ্যাপক আব্দুস সালামকে পেলাম। কিন্তু তিনি মুসলমান নন। কারণ, তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমানরা কী কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার আরো সূচীভেদ্য করে তোলার ইজারাদার বর্তমান বিশ্বে? নচেৎ অমন কাণ্ড ঘটবে কেন? বিশ্ববিশ্রুত একজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে কওমী আত্মশ্লাঘা করার পথটুকু পর্যন্ত রুদ্ধ। কেন, কেন, কেন – বার বার এই প্রশ্ন তুলতে হয়।

ভুট্টোর পর গদীনশীন ইসলামের আর এক চ্যাম্পিয়ন, ব্যারাকে-নির্মিত মুসলমান, পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। তিনিও ভুট্টো সাহেবকে অনুসরণ করলেন। না, তিনি এখনও নিজে ফাঁসিতে ঝোলেন নি। তবে পৃথিবীর তাবৎ মুসলমানদের ফাঁসির রশিতে ঝুলবার পথ তেলতেলে করে দিলেন। সোজা কথায়, জিয়াউল হক অর্ডিন্যান্স পাস করলেন, আহমদীয়রা মুসলমান নয়।

যে-কোন সৎ মানুষের জন্যে এই সব হাল-হকিকৎ আদৌ সুখের ব্যাপার নয়। বর্তমান যুগে মুসলমানদের জন্য পরিস্থিতি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে তাদের কোন স্থান নেই। কারণ, নিষ্কাল জগতের অধিবাসী তারা আত্মহত্যা-প্রবণতার তপস্যামগ্ন, জীবন-ধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ। তাই 'ফেরকার' (সম্প্রদায়জাত বিভেদ) সংখ্যা বেড়েই যায়।

এই সঙ্গে আরো একটি কথা বলা দরকার।

প্রাক-শিল্পযুগে (Pre-industrial age) কী পূর্ণ সঙ্গতিময় সমাজ বিরাজ করত, যার ফলে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিত না– বর্তমান কালে যা ঘটে। এমন কল্পরাজ্য পৃথিবীতে এখনও সৃষ্টি হয়নি, যদিও মহাপুরুষেরা সদাসর্বদা তেমন স্বপ্ন দেখে এসেছেন কালে কালে। প্রাক-শিল্পযুগ অর্থাৎ কৃষি-নির্ভর সমাজে প্রতিবাদ দেখা দিত বৈকি। দাস-বিদ্রোহ কি কৃষক-বিদ্রোহের ভূরিভূরি নজীর আছে পূর্ব কালে। কিন্তু সেই সামাজিক প্রতিবাদ ধর্মীয় আবরণে দেখা দিত।

দৈববাণীর মতো চর্তুদিকে ধ্বনিত হয়, "পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করো, নচেৎ ধ্বংস হও।" ডাইনোসোর, ডোডো প্রভৃতি প্রাণী পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তি তাদের ছিল না। সভ্যতার ক্ষেত্রে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি একদম। কিন্তু অমন সংগতির অভাবে মানুষ খুব নিম্ন পর্যায়ে পড়ে থাকে। আদিম অধিবাসী তো পৃথিবীতে এখনও অনেক আছে। কিন্তু তাদের কোন অবদান নেই বর্তমান পৃথিবীর সভ্যতায়।

দুনিয়ায় মুসলমান আছে, মুসলিম রাষ্ট্রও বর্তমান। কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক–এমন কী নৈতিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোন অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। এমন-কী নিজেদের দেশ রক্ষা করার হাতিয়ারও তাদের অপর জাতির নিকট থেকে খরিদ করতে হয়। হাল জমানার মারণাস্ত্র দূরের কথা, কাঁদুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যাসও এক ফোঁটা তৈরী করতে তারা অক্ষম।

এই দুর্দশায় উপনীত হওয়ার মূল হেতু, পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রক্ষার শক্তি মুসলমানেরা অর্জনে অক্ষম। এমন ক্ষেত্রে কচ্ছপ মডেল হয়ে দেখা যায়। খোলের মধ্যে ঢুকে আত্ম-সন্তুষ্টির পর্বত-রচনা তখন এক মাত্র করণীয় কর্তব্য।

পরিবেশের সঙ্গে সংগতি-রক্ষার জন্যে পদে পদে সতর্কতা অপরিহার্য। সেই চোখই অবক্ষয়-দুষ্ট জাতি হারিয়ে বসে। হিটলার ছয় লক্ষ ইহুদী নিধনে বেশ কয়েক জায়গায় গ্যাস-চেম্বার তৈরী করছিল। হত্যার পূর্বে বন্দি শিবিরে নামমাত্র আহার ও পুষ্টির বিনিময়ে হতভাগ্য কয়েদীদের রেখে দেওয়া হতো। ফলে, কয়েক মাসে তারা অস্থিচর্মসার এক ধরনের শীর্ণ কঙ্কাল। নাৎসী শিবির-রক্ষীরা ওই ভাগ্যহীন নর-নারীদের উপ-হাসচ্ছলে "মুসলমান" বলে ডাকত। উন্নত সভ্য জাতির নিকট আমাদের কওমী মর্যাদা আজ কোথায় উপনীত, স্বচ্ছন্দে আন্দাজ করা যায়।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। প্রাকশিল্প যুগে প্রতিবাদ হতো বৈকি। তা ধর্মের নানা আবরণে। একই ধর্মের বিভিন্ন মার্গের (Sect) অভ্যুদয়ের ইতিহাস সেইখানে নিহিত। ধর্মের জায়গা নিয়েছে বর্তমানে রাজনীতি। এমন-কী যারা এখনও ধর্মীয় ঝাণ্ডার তলায় আন্দোলন করে, তাদেরও রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে। নচেৎ অমন আন্দোলনের অস্তিত্বই টিকবে না। আয়াতুল্লা খোমেনী ধর্মীয় নেতা। কিন্তু প্রতিবাদের প্রবাহ তাঁকে রাজনৈতিক মঞ্চে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

বর্তমান কালের এই বাধকতা বন্ধন কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকন একান্ত অপরিহার্য। নচেৎ পরিবেশের সঠিক আলেখ্য আর চোখে ধরা দেবে না। এমন ভ্রান্তির মাশুল বড় চড়া। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কালে কালে, পুরুষানুক্রমে।

অথ রূপান্তর

> "নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও শাস্ত্র-আলোচনা দ্বারা কিছু লাভ করিতে পারে না। আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মুর্খও লাভবান হইয়া থাকে।"
>
> – ব্যাস মুনির উপদেশ
>
> মহাভারত, আদিপর্ব ঃ ৪০ অধ্যায়

১

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথিবী ত্যাগ করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ এই উপ-মহাদেশের ইতিহাসের জন্য একটি বিশেষ তারিখ। এই সন থেকে এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী য়ুরোপের যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য বিক্রয় শুরু করে। এতকাল কাঁচামাল সংগ্রহই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু তা আর রইল না। বিদেশী পণ্যের আমদানী শুরু হলো এই উপ-মহাদেশে। দেশী কুটির-শিল্পের সঙ্গে ফলত যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা এমন ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। বড় অসম প্রতিযোগিতা। দেশী শিল্প পদে পদে পর্যুদস্ত। তার আর্থসামাজিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্যে বিশেষ কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয় না। বিদেশী ভাষায়, শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া বা চেন-রিএ্যাক্‌শানের ছবি চোখের সামনে সহজে ভেসে ওঠে। দেশী কারিগরগণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য সস্তা এবং বহুল সংখ্যায় উৎপাদিত। কুটির-শিল্পের সেখানে যুঝে-ওঠা দায়। অসহায়, বেকার কারিগরগণের অধিকাংশ অগত্যা চাষের দিকে ঝুঁকতে হলো। জমির খণ্ডীকরণের সূত্রপাত তখন থেকে। সুষ্ঠু চাষের জন্যে যতটুকু জমি দরকার, তা আর রইল না। জমির উপর চাপ বেশী। তদুপরি কোম্পানীর জুলুম তো ছিলই। ম্যাঞ্চেস্টারের কলে তৈরী কাপড় বিক্রির জন্যে এখানে তাঁতীদের আঙুল আর আস্ত থাকল না। বিখ্যাত মসলিন লুপ্ত হওয়ার ইতিহাস অনেকে জানেন।

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, স্যার সৈয়দের সঙ্গে এই পটভূমির সম্পর্ক কোথায়? কোন পারিপার্শ্বিকতার ভেতর মানুষের জন্ম এবং এমন পরিবেশে তার ভূমিকা কী ছিল, তা না জানলে কিছু জানাই হয় না কোনো ব্যক্তি-সম্পর্কে। আর অর্থনৈতিক নিগড়ে সকল মানুষই বাঁধা। তেমন পটভূমি উহ্য রাখা আর অন্ধকারে কালো খড়ি দিয়ে অন্ধজনের ছবি আঁকা সমান।

মক্কা-মদিনা এবং ওই সব অঞ্চলের কারিগরী উৎপাদন তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। এই জন্যে তেজাতরী ব্যবসায় উপর নির্ভর। আমাদের প্রিয় নবীর জীবনে ব্যবসা-উপলক্ষে অন্যান্য নগরে সফর-কাহিনী সর্ব-জনবিদিত। এই জন্যে ইসলাম ধর্মে তেজারতী-সংক্রান্ত বহু ইমেজ পাওয়া যায়। যেমন, পাপ-পুণ্যের বিচারে তৌলদণ্ড উল্লেখিত। এক পয়সা দুঃস্থ জনকে ভিক্ষে দিলে পরকালে সত্তর পয়সা-দানের সওয়াব পাওয়া যাবে। সোজা বিনিময়ের হিসাব। এমন আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

সুতরাং অর্থনৈতিক পটভূমি কোন মানুষ সম্পর্কে আলোচনায় পাশে হটিয়ে রাখা যায় না। স্যার সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর তারিখও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ উনবিংশ শতাব্দী তখন প্রায় সমাপ্ত বলা চলে। তার এক বৎসর পূর্বে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে জামাল উদ্দীন আফগানীর মৃত্যু হয়। স্যার সৈয়দের মত আর এক প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক। উভয়ের পারস্পরিক সাক্ষাতের কোন প্রতিবেদন নেই। তবে একে অপরের চিন্তাধারা সম্পর্কে হয়ত ওয়াকিবহাল ছিলেন। উভয়েই মুসলমান সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গলকামী দেশপ্রেমিক। অবিশ্যি জামাল উদ্দীন আফগানীর কর্মক্ষেত্র ছিল আরো বিস্তৃত। ইরান, তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্যেও তিনি সংস্কারের বাণী নিয়ে পৌঁছান। প্যান-ইসলামের ভাবাদর্শ আধুনিক যুগে তখনই চালু হয়, যদিও নজরুল রসিকতা করে বলতেন, "পান-ইসলাম চুরুট ইসলাম আমি বুঝি না।"

প্রথমেই স্যার সৈয়দ আহমদ-কে দিয়ে পুস্তকের এই অধ্যায় শুরু। কারণ ইংরেজ বা বৃটিশের পদানত হওয়ার পর মুসলমান সমাজের অধঃপতিত পচন-দৃষ্ট দুর্দশা থেকে উত্তরণের জন্য তাঁর ঐকান্তিকতা ছিল প্রচণ্ড। যুগের সীমাবদ্ধতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এই জন্যে অনেকে স্যার সৈয়দ-কে দোষারোপ করেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। প্রথমেই স্যার সৈয়দের উপর আলোচনার প্রমাণ কারণ, তিনি ছিলেন এক যুগের প্রতিভূ। ঔপনিবেশিক আওতায় সমাজ-সংস্কারের নেশায় স্যার সৈয়দ সনাতন ঐতিহ্য থেকে কতখানি দূরে সরে ছিলেন, তাও দেখা দরকার। কারণ, মানসে পরিবর্তন তো খামখা হয় না। আর তা হলে, তার স্বরূপ কী, জানা প্রয়োজন। সেদিক থেকে স্যার সৈয়দ এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্রোশফলকের সাহায্যে পথের হদিস পাওয়া সম্ভব। আমার আলোচনা সেই প্রণালীতেই ক্রমশ অগ্রসর।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্যার সৈয়দের মতো বিচক্ষণ সমাজ সংস্কারক আর কাউকে দেখা যায় না। ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতাগণের দেশপ্রেম ছিল। কিন্তু যুগের কলকজা তারা বুঝতে পারেননি। ফলে, তাঁদের আন্দোলন অসফল। ধর্মীয় আবরণ ভেদ করে তাদের আন্তরিক সরলতা দেখে শ্রদ্ধাই জাগে। তাদের আন্দোলন এদেশে প্রথম ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ইতিহাসের অগ্রগতির সহায়ক কোন শ্রেণীর মানুষ ছিল না বলেই তা ব্যর্থতার বালুচরে হারিয়ে যায়। স্যার সৈয়দ সেদিক থেকে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। মুসলমান সমাজ ধর্মের নামে কূপমণ্ডুকতার পূজারী, অবজ্ঞেয় বৃহত্তর পৃথিবীতে। আপন সম্প্রদায়ের এই দুর্দশা তাঁকে বিচলিত করেছিল বৈকি। স্যার সৈয়দের অদ্ভুত কর্মবহুল জীবন সেদিক থেকে শ্রদ্ধার্হ। মধ্যযুগীয়তা থেকে দেশবাসীকে আধুনিক জগতে টেনে আনার জন্য তার সাংগঠনিক দক্ষতা রীতিমত বিস্ময় উদ্রেক করে। পত্রিকার সম্পাদক, তর্জমা সমিতির পরিচালক, শিক্ষাব্রতী, প্রশাসক-এমনতর নানা ভূমিকায় স্যার সৈয়দের ঝলক হৃদয়গ্রাহী। আর সব ছাপিয়ে চোখে পড়ে তাঁর অকুতোভয়তা। প্রাচীন আলেমরা তাঁকে কাফের ফতোয়া দিতে আদৌ বিলম্ব করেনি। ফতোয়ার পর ফতোয়া জারী হয়েছে কিন্তু অটল ছিলেন তিনি। আলেমদের উষ্মা খুব স্বাভাবিক। ইংরেজী শিক্ষার সমর্থক স্যার সৈয়দ। আরবী-উর্দু ভাষার উপর যাদের জীবিকা নির্ভর করে তারা তো তাঁকে সমর্থন দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে না। ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিক প্রশ্ন কীভাবে জীবিকার সঙ্গে জড়িত থাকে, তার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উনিশ শতকে উলেমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণ। ফতোয়ার উৎস এখানে স্পষ্ট। শুধু ফতোয়া জারী নয় স্যার সৈয়দের প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত উলেমারা দিতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন ভোগ করেনি।

স্যার সৈয়দ মনে করতেন, ব্রিটিশ রাজত্ব সহজে যাওয়ার নয়। অনর্থক ছায়ার সঙ্গে লড়াই কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশের দিকে ঝুঁকতে থাকে। অন্যপক্ষে ব্রিটিশও ভেদনীতির জাল ঠিক সময়েই পেতেছিল। স্যার সৈয়দ মধ্যবিত্ত মনোভাবের পুরোধা রূপেই সমাজ-রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশকে সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেননি। ব্রিটিশ রাজত্ব টিকে থাকার জন্যে এদেশে হাজির, তিনি তা বিশ্বাস করতেন। দুই রূপে তাঁর এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গেল। প্রবাদিক রূপকে বলা যায়, তিনি কনের ঘরের মাসী এবং বরের ঘরের পিসী সাজলেন। ব্রিটিশদের তিনি বোঝালেন, বিদ্রোহের জন্যে মুসলমানেরা দোষী নয়। আর মুসলমানদের নসিহত দিলেন, ব্রিটিশ বিরোধিতা মানে আত্মহত্যা! স্যার সৈয়দের একটি ইশতেহার আছে। নাম : 'আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দু' (সিপাহী বিদ্রোহের মালমশালা)। তিনি ইশতেহারে ঘোষণা করলেন, সামান্য অনুকম্পা প্রদর্শন করলেই মুসলমানেরা 'রাজভক্ত প্রজা' বনে যাবে। কারণ ইসলামে বিদ্রোহের কোন জায়গা নেই। নমুনা স্বরূপ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশের সাহায্যকারী নবাব, জমিদারদের নাম ইশতেহারে তুলে ধরলেন। অন্য দিকে তিনি বিভিন্ন শহরে 'তর্জমা-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করলেন, উত্তম-উত্তম পুস্তক অনুবাদের জন্যে। পশ্চিমের শিল্প এবং বিজ্ঞানের বই তর্জমা হতে লাগল। এমন সাংস্কৃতিক বিস্তারের একটা ফল তো স্পষ্ট। যে-জাতির এমন উন্নত শিল্প ও বিজ্ঞান আছে, তারা মুসলমানের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে না। অনেকের কাছে সংস্কৃতি-বিস্তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। তা যে রাজনৈতিক কাজে লাগাতে পারে, স্যার সৈয়দের এই পদক্ষেপ তার এক উদাহরণ। অনেক সময় সংস্কৃতিরও রাজনীতির আজ্ঞাবাহী গোলাম হওয়া সম্ভব।

গাজীপুর অনুবাদ সমিতির উদ্বোধনী বক্তৃতায় স্যার সৈয়দ সিপাহীদের তুলোধোনা করে ছাড়েন এবং নচিহৎ বিতরণ করেন। অমন ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, তার জন্যে প্রত্যেকের ইতিহাস এবং ইকনমিকস পড়া উচিত। আর জানা কর্তব্য : রাজস্ব আদায় করা হয় জনসাধারণের মঙ্গলার্থে, সরকারের উপকারের জন্য নয়।

সিপাহী-বিদ্রোহের সবক ব্রিটিশ গ্রহণ করেছিল বৈকি। এতদিন হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সুয়োরাণী এবং মুসলমান দুয়ো। এবার চাকা ঘুরে গেল। নতুন জনসমর্থন প্রয়োজন। স্যার সৈয়দ ইংরেজদের ভর্ৎসনা করেন হিন্দু-মুসলমান সিপাইদের যৌথ মেলামেশার অনুমতি দেওয়ার জন্যে। শুধু নেতিমূলক তিরস্কার নয়, একদম জলজ্যান্ত উদাহরণ দিতে ভুলে যান না। নাদির শাহ দুই ধরনের লস্কর রাখতেন বাহিনীতিঃ আফগানী ও পারসীক। তাদের মেলামেশার আদৌ সুযোগ দিতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং এক পক্ষ বিদ্রোহী হলে অপর পক্ষ দিয়ে উৎখাত করতেন। ব্রিটিশ সরকার এমন নসিহৎ কান পেতেই নিয়েছিল। উইলিয়াম হান্টার নামক এক সিভিলিয়ানকে দিয়ে পুস্তক লেখানো হলো ঃ The Indian Mussalman. এই বই সরকারের তরফ থেকে মার্জনা ভিক্ষায় ফিরিস্থি। উদ্দেশ্য স্পষ্ট মুসলমান জনসাধারণের বন্ধুত্বের প্রত্যাশা। একটু অপ্রাসঙ্গিক, তবু বলা যায় : চল্লিশ বৎসর পরে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন হিসেবে মুসলিম লীগের নেতা বুদ্ধিজীবীগণ ওই বই থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতেন। গুরু মেরে ইংরেজ জুতাদানের ভাল ফাঁদ পেতেছিল এই দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে।

স্যার সৈয়দ ভাবলোকের ক্ষেত্রে ছায়ার জন্যে আর এক বৃক্ষ রোপণ করলেন। এক পুস্তক লিখলেন The Mahomedan Commentary on Bible প্রতিপাদ্য বিষয় : ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্ম মূলত এক। অবিশ্যি সব ধর্মই এক। তবে ক্রিয়াচার উপচার প্রভৃতি-তে কিছু উনিশ-বিশ থাকতে পারে। তা নিয়ে কোন ঝগড়া করা উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ ছিলেন উদারপন্থী, গোঁড়ামি তাঁর নিকট অস্বোয়াস্তিকর ঠেকত।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ বিলাত যাত্রা করলেন। এতদিন তিনি গঙ্গাস্নান করেছেন, এবার উৎস গঙ্গোত্রী মুখে গিয়ে পৌঁছলেন। বিমোহিত না হয়ে পারেননি। স্বদেশের ছবি তাঁর চোখে ছিল : নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ, কর্মহীন আলস্যের আড়ৎ, মানবেতর রুচির ক্ষেত্র এবং পারলৌকিকতার তপস্বী। সেই জায়গায় য়ূরোপ মানব-উদ্যমের এক সদা ফলপ্রসূ তরঙ্গিত লীলা-প্রাঙ্গণ। স্বদেশে স্যার দেখিয়েছেন রাজনৈতিক আনুগত্য, এবার শুরু হলো সাংস্কৃতিক আনুগত্য। আনুগত্য নয়, বরং বলা যায়, সংস্কৃতিক বন্দনা। আলীগড়ের Scientific Society বৈজ্ঞানিক সমিতি-কে ১৫ই অক্টোবর ১৮৬৯ তারিখে লিখিত এক পত্রে লন্ডন শহর থেকে তিনি লিখছেন, ... The natives of India, high or low, merchant and petty shopkeeper, educated and illiterate, when contrasted with the English in education, manner, uprigtness, are as like them as a dirty animal is to an able and handsome man.

এখানে লক্ষ্যণীয় 'নেটিভ' Native ইংরেজী শব্দ। নানা অর্থধারী। তন্মধ্যে একটি : অ-ইউরোপীয় বা অসভ্য জাতির লোক। ইংরেজরা এই অর্থে উপনিবেশের বাসিন্দা সম্বন্ধে প্রয়োগ করত। স্যার সৈয়দ হয়ত সেই অর্থে ব্যবহার করেন নি। তবু কানে কেমন যেন খটকা লাগে। তিনি লিখেছিলেন, "... ভারতের অধিবাসী, সে ছোট হোক বড় হোক, বড় সদাগর কি ছোট দোকানদার হোক অথবা শিক্ষিত বা মূর্খ– তাদের যখন শিক্ষা আদব-কায়দা, সততার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করি, তখন মনে হয়, কোন শক্তিমান সুশ্রী মানুষের সঙ্গে নোংরা জানোয়ারের তুলনা।" বড় নিদারুণ তুলনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার সৈয়দ আরো সাফাই গাইছেন। ইংরেজরা যদি নেটিভদের অবজ্ঞার চোখে দেখে তা তাদের প্রাপ্য। একটি পত্রে তিনি আরো লিখেছেন, "If Hindustanis attain to civilization, it will probably owing to its many excellent, natural powers, become if not superior, at least the equal of England."

পত্রটি আরো উদ্ধৃতিযোগ্য, স্যার সৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণের জন্যে। "The result of all is that although I do not absolve the English in India of discourtesy and of looking upon the natives of that country as animal and beneath contempt, I think they do so from not understanding us ; and I am afraid I must confess that they are not far from wrong in their opinion of us. Without flattering the English I can truely say that ... The English have reason to believing us in India to be imbecile brutes. ... What I have seen is beyond the imagination of a native of India ... All good things spiritual worldly which should be found in man have been restored by the Almigty on Europe and specially on England.

শেষ অংশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। স্যার সৈয়দ লিখেছেন, "অধ্যাত্মিক এবং পার্থিব– যা কিছু ভালো মানুষের ভেতর থাকা উচিত, আল্লাহতায়ালা তা ইউরোপের উপর ঢেলে দিয়েছেন, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের উপর ... ।"

স্যার সৈয়দের ব্রিটিশ-বন্দনার মাত্রা এই স্তরে পৌঁছেছিল। তিনি মনে করতেন এবং সেই মর্মে লিখেছেন যে ইসলাম ধর্ম ভিক্টোরীয় যুগের সকল মূল্যবোধ ও আদর্শের বিরোধী নয়। যা বিরোধী তা ইসলাম নয়। তিনি লেবাসে য়ুরোপীয়দের সমর্থক– কোর্ট পাংলুন টাই পরতেন। ইংরেজ সাধারণের সঙ্গে দহরম-মহরম খানাপিনা সবই বেশ চালাতেন। স্যার সৈয়দের চোখে তখন প্যান্ট মানে ইসলামী পাজামা।

পশ্চিমী সংস্কৃতি কীভাবে দেশবাসীর মধ্যে প্রসার লাভ করে, সেদিকেও তাঁর চোখ ছিল। তিনি কলেজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তদনুযায়ী চাঁদা সংগ্রহে ব্রতী হন। সরকার পিছিয়ে রইল না। মুসলমানদের সমর্থন লাভের মওকা ছেড়ে দেওয়ার মত মূর্খ নয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় স্যার য়ুরোপীয় র‍্যাশনালিজ্‌ম বা যুক্তিবাদের আলোকে কোরানের তফসীর লেখেন। উল্লেখযোগ্য প্রায় একই কালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার মালমশালা সংগ্রহে ব্রতী। তিনি দেখিয়েছেন হিন্দু ধর্ম র‍্যাশনালিজম বিরোধী নয়। এই সমান্তরাল মানসিকতার আরো হদিস থাকা উচিত।

স্যার সৈয়দ কলেজ প্রতিষ্ঠা করবেন। তার উদ্দেশ্য ... To establish a college in which Mussalman may acquire an English education without prejudice to their religion ... (নিজেদের ধর্মের প্রতি কোন প্রতিকূল ধারণা ছাড়া যেন মুসলমানেরা ইংলিশ শিক্ষা পায়) ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো অন্যতম উদ্দেশ্য ... To make Mussalman worthy subject of the British মুসলমানদের ব্রিটিশের উপযুক্ত প্রজা বানানো। এদিকে স্যার সৈয়দের কোন প্রচ্ছন্ন কৌশল ছিল না। তিনি খোলাখুলি কথা বলতেন। আলিগড় কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ভাইসরয়-কে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, সেক্রেটারী হিসাবে তাঁরই মুসাবিদা নিশ্চয়। উক্ত মানপত্রে এক জায়গায় আছে The British rule in India is the most wonderful phenomenon the world has over seen. ব্রিটিশ রাজত্ব এক অত্যাশ্চার্য প্রপঞ্চ যা পৃথিবী কখনও দেখেনি।

স্যার সৈয়দের ব্রিটিশ-বন্দনায় কোন খুঁত ছিল না তাঁর দিকে থেকে। তিনি জানতেন না তার অধস্তন পুরুষের মুসলমান-হিন্দু আশি বছর পরে বিশ শতকের চতুর্থ দশকে রাজনৈতিক সভার প্রারম্ভ-সূচীর গান গাইবে, “আরে ভাগো লন্ডন যাও।” ঐ গান এখন সব মনে নেই। কিন্তু শেষ কলি স্মৃতি গাঁথা : “আরে আপনা কুত্তা ভী লে যাও।” ইংরেজদের কুত্তা-প্রীতি জগৎ বিখ্যাত। প্রজাদের তা চোখ এড়ায়নি।

এইখানে আরো একটি কথা পূর্বেই বলে রাখা যুক্তিযুক্ত। কারণ, এমন পরিস্থিতি যুগে যুগে প্রায় একইভাবে দেখা দেয়। যে-কোন ভাবাদর্শের অখণ্ড রূপেই সূত্রপাত। যদ্দিন তা বাস্তব রূপ না পায়, অথবা প্রারম্ভিক যুগে তার আদল অখণ্ড থাকে। কিন্তু যখন সমাজ জীবনের নিয়ামক হিসেবে এগোয়, দেখা যায়, কালক্রমে তার সমর্থকদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। এই বিভেদের কারণ, সমাজের খোপে প্রাচীন আদর্শ আর ঠিকঠিক খাপ খায় না। তখন সেখানে দুটো দল প্রধান রূপে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল সংশোধন-বাদী, অন্য দল মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিস্ট। এক দল সাবেক মডেল কিছু অদলবদলের পক্ষপাতী, অন্য দল নারাজ। তখন দুই দলে একই ধরনের সমান্তরাল লাইন বনে যায়। মিল বহুৎ, কিন্তু দু'য়ে আর মিলন ঘটে না। শিয়া-সুন্নী, ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট, হীনযান-মহাযান, শ্বেতাম্বর-দিগম্বর– এমন বহুৎ দৃষ্টান্ত টানা যায়। পাঁচ বছরের ছেলের জামা পনর বছর বয়সেও পরাতে গেলে ধস্তাধস্তি হয়। শেষে হয়ত জামা-ই ছিঁড়ে যায়। বর্তমানে বামপন্থী রাজনীতির দুর্দশা নতুন নয় পৃথিবীতে। মধ্যযুগে খ্রীস্টানদের এত রকম 'তরীকা' (Sect) গজায় যে এক রসিক ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, They are creating brotherhood to destroy brotherhood.

ধর্মতত্ত্বের বেলা স্যার সৈয়দ নিজস্ব মতামত গড়ে তোলেন। তিনি মনে করতেন কোরান-ই মূল পথপ্রদর্শক। হাদিস ইত্যাদির অত প্রয়োজন নেই। এমনকি শরীয়তের বহু শাখার কোন গুরুত্ব দিতে তিনি গররাজি ছিলেন। কোরান সম্বল করেই তিনি আধুনিক সমাজের বিচারে অগ্রসর হন।

স্যার সৈয়দ এখানে সনাতন মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিস্ট। কালের ব্যবধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব ঘটে, তা সামান্য পূর্বে উল্লেখিত। আর অন্যদিক থেকে তাঁর এই চিন্তাধারা প্রাচীন সমাজের চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আধুনিক পুঁজিবাদী যুগের সমস্যার বহু জবাব পুরাতন নীতি দিতে পারে না– অথবা তা নতুন পরিস্থিতির জন্যে যথেষ্ট নয়। মনে রাখা উচিত, কৃষি-সমাজ স্থায়ী ফ্রেমে আঁটা। তার সমস্যা যুগ-যুগ প্রায় একই রকম থাকে। বহু লোকের পূর্ব পুরুষেরাও একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন ছিল। যুগযুগান্তের ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা-ভান্ডার থেকেই তার সমাধান পাওয়া যেত। কৃষিপ্রধান সমাজে নৈতিকতা বিধিবদ্ধ করা যায় এবং কর্তৃপক্ষ তা চালু রাখতে পারে সামাজিক দণ্ড এবং শাসনদণ্ডের সাহায্যে। গ্রামের সমাজে এখনও তার জের রয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এমন কর্তৃত্ব মানুষের গা-সওয়া। কিন্তু পুঁজিবাদী যন্ত্রযুগের সমাজ আর এক স্বতন্ত্র পরিবেশ। ধনতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার জন্মভূমি গ্রাম থেকে ছিটকে পড়ে। শহরে স্বাধীনতা অনেক। তাকে সহজে কেউ একঘরে করবে না বা করতে আসবে না। নগরে নতুন জীবনের যে-কোন প্রশ্ন তার নিজেকেই দিতে হবে। এখানে গ্রামের মিয়া মোড়ল, কাজী কি আলেম-মৌলবী নেই, প্রতিবেশীও নেই বা সামাজিক শাসন নেই যে কেউ একঘরে করে তার অবাধ্যতার জবাব দেবে। এমন কর্তৃপক্ষ কোথায় পাওয়া যাবে যে পদে-পদে তা-কে হুঁশিয়ার করে দেবে, গ্রাম-সমাজে যা সহজলভ্য ছিল? শিল্প-বিপ্লবের ফলে আত্মকেন্দ্রিকতার এই বন্যায় পুরাতন সমাজে নৈতিকতা সহজে থ' পায় না। অনেকেই জানে না, আধুনিক মানুষ আর এক ধরনের মানুষ।

এই উপ-মহাদেশে পুঁজিবাদের গতি যত শ্লথই হোক না কেন, তার প্রসার দৈনন্দিন জীবন-যাপনপ্রসূত এমন সব জটিল প্রশ্ন ডেকে আনছিল যে শরীয়তের মত তৈরী লিপিবদ্ধ জবাব দিতে পারে– এমন কিছু ব্যক্তির পক্ষে পাওয়া মুশকিল। অনেক ক্ষেত্রে জবাব তার নিজেকেই দিতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ। এখন দায়িত্ব প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার জন্যে নতুন নীতি প্রয়োজন। এই জন্যে স্যার সৈয়দ কোরানই প্রধান সম্বল করেন শরীয়তের পাশ কাটিয়ে। তিনি কোরানপন্থী সেদিক থেকে মৌলবাদী। কিন্তু সংশোধন-প্রার্থী প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে। এদিক থেকে সংশোধনবাদী। আলেমরা যে তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছিল, তা বিচিত্র কিছু নয়। ষাট বছর পরে ১৯২০ সনের দিকে নজরুলকে একই অপবাদের শিরোপা শিরে গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্যার সৈয়দ কোরান ছাড়া আর কিছু বিশুদ্ধ নেই মনে করতেন। হাদিস খলিফাদের আমলে সংগৃহীত। সুতরাং তার মধ্যে ভুলচুক কিছু ঢুকে যেতেও পারে, এমন সন্দেহ করা অসমীচীন কিছু নয়। স্যার সৈয়দ অর্থাৎ তাঁর আলীগড় ঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সমর্থকদের উপহাস করে বলা হতো "নেচারী"। কারণ, সৈয়দের মতে Nature ও Reason প্রকৃতি ও বিচার-বুদ্ধি এই হচ্ছে প্রধান মাপকাঠি, যার সাহায্যে তিনি সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রত্যাশা রাখেন। পূর্বকালের ইসলামের তাত্ত্বিক বুজর্গরা মনে করতেন, ধর্ম যুক্তিবহির্ভূত বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপার-র‍্যাশনাল। এই নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট গর্ব ছিল। মোজেজার (অলৌকিক ঘটনা) সাহায্যে তারা অবিশ্বাস্য ব্যাপারকেও মনে করতেন সত্য। স্যার সৈয়দ কিন্তু বিচার-বুদ্ধির মাপকাঠি ছাড়া আর কিছু দিয়ে যাচাইয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। কোরানে যুক্তি-বিরোধী থাকলে তিনি মনে করতেন, সেগুলো অপব্যাখ্যা। এই জন্যে 'মিরাজ-কে তিনি Vision বা স্বপ্নময় দিব্যদৃষ্টি হিসেবে প্রমাণের জন্য নানা তথ্য পরিবেশন করেন। জ্বীন, ফেরেশতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক–অবয়বধারী কোনো কিছু নয়– প্রচলিত যা ধারণা। প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিময় বলেই ইসলাম মহান ধর্ম। স্যার সৈয়দ আরো যোগ করেন।

"প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিময়"– এই মাপকাঠির সাহায্যে তিনি জেহাদ, দাসপ্রথা, নারী-অবরোধ অগয়রহের বিরোধী। অবিশ্যি মজার ব্যাপার, স্যার সৈয়দ পুরুষের বহু-বিবাহের সমর্থক ছিলেন। কারণ, তা পুরুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়।

দেখা যায়, স্যার সৈয়দ উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উদারতাবাদ (liberalism), মানব-মুখীন নৈতিকতা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ সবই আত্মসাৎ করেছিলেন, একজন মুসলমানের পক্ষে যতটুকু পরিপাক সম্ভব।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি চিরকাল ব্রিটিশের অনুরক্ত ছিলেন। বল্কান যুদ্ধের সময় স্যার সৈয়দ তুর্কী খলিফাদের সমর্থন করেননি। কারণ তারা ইসলামের খলিফা নন। কিন্তু স্যার সৈয়দ কখনও সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ অধঃপতিত মুসলমান সমাজের উদ্ধার, উন্নতি, উন্নয়ন প্রভৃতি সমাজ-হিতকর অন্যান্য গন্তব্য। কিন্তু তা হিন্দু-সমাজের বিরোধিতা দ্বারা নয়। তাঁর গাজীপুর তর্জমা সমিতি শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, সেখানে হিন্দু সদস্যও ছিল। অবিশ্যি তিনি ক্রমশ বুঝতে পারেন, সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব বাস্তব এবং তা মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান। তিনি এমন মনোভাবের বিরোধী ছিলেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলছেন, Do we not inhabit the same land .... Remember that the words Hindus and Mahomedan are much for religious distinction—otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan even the christians who reside in this country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation (cheers)." "আমরা কী একই ভুখণ্ডে বাস করি না? .... মনে রাখবেন, হিন্দু এবং মুসলমান শব্দ দু'টি শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের জন্যে দরকার। নচেৎ সমস্ত মানুষ সে হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান–যাই হোক না কেন– যারা এই দেশের বাসিন্দা, এই দিক থেকে তারা এক এবং অভিন্ন জাতি।"

আরো আশি বছর পরে এই দেশেই দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্ম হয়। কালপরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান থাকলে ইতিহাস বুঝতে কোন ধন্দ থাকে না। স্যার সৈয়দ যখন এই সব কথা বলেন, তখনও ব্রিটিশ-প্রবর্তিত পুঁজিবাদের যথেষ্ট সম্প্রসারণের সুযোগ ছিল। কাজেই হিন্দু-মুসলমানে কোন ঠোকাঠুকি লাগেনি। ধীরে ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনতন্ত্রই য়ুরোপে আরো জঘন্য রূপ ধারণ করে, যার শেষ চামুন্ডা-মূর্তি ফ্যাসিজম। উপনিবেশে জাগরণ-মুখী হিন্দু-মুসলমানের বিকাশের সুযোগ কতটুকু? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাত আরো নিদারুণভাবে দানা বেঁধে ওঠে। তখন তা সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়।

স্যার সৈয়দ মুসলমান সমাজের শ্রীবৃদ্ধিকামী। সেই যুগে তাঁর মানবিক অধঃপতন ঘটার কোন হেতু ছিল না। তিনি ন্যাশনাল কংগ্রেসেরও বিরোধিতা করেন। তা হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে নয়। স্যার সৈয়দ মনে করতেন, ব্রিটিশের অসুবিধায় দেশের উন্নতি পিছিয়ে থাকবে। সেই জন্যে হিন্দুদেরও কংগ্রেস ত্যাগ করা উচিত। তিনি পাল্টাদিলেন আর এক সংসদ তৈরি করে : ইন্ডিয়ান ইউনাইটেড পেট্রিয়াটিক অ্যাসোশিয়েশান। উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য, ব্রিটিশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। প্রাথমিক যুগের মত জাষ্টিশ আমির আলি যখন কলিকাতা শহরে ১৮৭৭ সনে রাজভক্তি বজায় রেখে ব্রিটিশের সমালোচনার জন্যে ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন, স্যার সৈয়দ তারও বিরোধিতায় সোচ্চার হন। মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। ফলে, ব্রিটিশ-বিরোধিতা ক্রমশঃ ধোঁয়াচ্ছে, তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। ১৮৬০ সনে যে আবহাওয়া ছিল, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আর তা নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মানুষ তখন য়ুরোপের জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত। যে অস্ত্র ব্রিটিশ সংস্পর্শে এদেশে আমদানী হয়, সেই অস্ত্রে ব্রিটিশকে ঘায়েল করার আয়োজন চলতে থাকে। জীবনের শেষ প্রান্তে স্যার সৈয়দ বুঝেছিলেন তাঁর প্রভাব জন সংখ্যার সব শ্রেণীর উপর তেমন ব্যাপক নয়। কংগ্রেসের দাবীর ন্যায্যতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। বিশেষত অসম আচরণের ক্ষেত্রে। ইংরেজ হলে এক রকম ব্যবস্থা, দেশী হলে আর এক রকম। কালা-ধলার তারতম্য ইংরেজ রক্ষা করতে বেশ সচেষ্ট ছিল। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্টিল ফ্রেমের মধ্যে ক'জনই বা চাকরী পেতে পারে? কাজেই বহু মধ্যবিত্ত মুসলমান তখন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। তৃতীয় প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দীন তায়েবজী যখন ভাষণে বলেন ... [for one at a loss to understand why Mussalmans should not work together with their fellow countrymen ... for the benefit of all ... genetlemen, this is the principle on which we in Bombay Presidency have always acted. তা আনন্দমুখর করতালি যোগে অভ্যর্থনা পায়।

স্যার সৈয়দ সম্পর্কে আজও বহু মানুষের ধারণা, তিনি মুসলমানদের একজন দরদী সমাজ-হিতৈষী ছিলেন। কিন্তু কথাটা আংশিক সত্য। দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রভাব আদৌ ছিল না। শহরঘেঁষা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তই স্যার সৈয়দের সমর্থক। তাঁর সমিতির চাঁদা ছিল পনর (১৫) টাকা। সে-যুগের মুদ্রামূল্যে এই হার সাধারণের নাগালের বাইরে। এই দিক থেকে স্যার সৈয়দ সব শ্রেণীর মুসলমানের কথা ভাবেননি। তাঁর চিন্তাধারায় মধ্যযুগীয়তা কম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগে সম্পত্তি আর বংশ মর্যাদা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। স্যার সৈয়দের চেতনায় আধুনিক কালের গণতান্ত্রিকতার স্পর্শ কিছুই লাগেনি যেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অবিভক্ত ভারতের লাক্ষ্মৌ শহরে তিনি এক বক্তৃতা করেন। উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ। তবু তা দরকার স্যার সৈয়দের মানস- লোকের পরিচয় পেতে।

"If Government fight Afganistan or conqure Burma, it is no business of ours to criticise its policy ... Government has made a council for making laws ... For this council she selects from all provinces those officials who were best acquainted with the administration and the condition of the people, and also some 'Raises' who, on account of high social position, are worthy of seat in that assembly. Some people may ask .... why should than be chosen on account of social position instead of ability ? ... I ask you ... would your aristocracy like that a man of low caste and insignificant orgin, though he be B.A. or M.A. and have the requisite ability should be in a position of authority above them and have power in making the laws that affect their lives and property? Never ... None but the man of a good breeding can the Viceroy take as his colleague, treat as his brother and invite to entertainments at which he may have to dine with Dukes or Earls ... Can we say that the Government in the method it was adopted for legislation, acts without regard to the opinion of the people? Can we say that we have no share in the making of the laws? Most certainly not."

স্যার সৈয়দ সম্পর্কে যেন কোনো বিভ্রান্তি না থাকে সেই জন্যে এই বক্তৃতা অংশটির পূর্ণ তরজমা দেওয়া গেল।

"... যদি গভর্নমেন্ট আফগানিস্তানের সঙ্গে লড়াই করে কি ব্রহ্মদেশ জয় করে সেই নীতির সমালোচনার্থে আমাদের নাক গলানোর কিছু নেই। ... আইন তৈরীর জন্যে সরকারের মন্ত্রণা-পরিষদ আছে ... এই পরিষদের জন্যে সরকার সকল প্রদেশ থেকে সেই সব অফিসারদের বেছে নেন, যারা প্রশাসন এবং জনগণের অবস্থার সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত। ওই বাছাবাছির মধ্যে আরো থাকেন কিছু রঈস (অভিজাত শ্রেণীর মোড়ল-মুখ্যি) যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে ওই পরিষদে আসন পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন– যোগ্যতার জায়গায় সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের নির্বাচন করা হবে কেন? ... আপনাদের জিজ্ঞাসা করব, আমাদের শরীফ অভিজাতগণ কী কোন নীচু বংশের লোককে পছন্দ করবে, যদি সে বিএ, এমএ হয় পাস এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হয় যে সে তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে এবং আইন-প্রণয়নে উপযুক্ত– যার ফলে তাদের জীবন এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব পড়বে? কক্ষণও না। ... ভাল সদ্বংশজাত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের সহকর্মী হিসেবে নিতে তার সঙ্গে ভায়ের মত আচরণ করতে কিংবা দাওয়াৎ দিতে পারে না– যে নৈশ ভোজনে হয়ত ডিউক কী আর্ল (ব্রিটিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজাতদের উপাধি) এর সঙ্গে খানা খেতে হবে। ... আপনারা কী মনে করেন, জনগণের মতামত ছাড়া সরকার কোন আইন বানায়? আপনারা কী মনে করন আইন-প্রণয়নে আমাদের হিস্যা নেই? নিশ্চয় না।"

স্যার সৈয়দের চোখে কোন শ্রেণীর মুসলমান জায়গা পেয়েছিল, মনে হয়, মন্তব্য বাহুল্য মাত্র।

সমাজে এই শ্রেণী অবস্থানের ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। সে-যাই হোক, সীমাবদ্ধতা থাকলেও স্যার সৈয়দ মধ্যযুগীয় ভাবদর্শের দেওয়ালে অনেক ছিদ্র সৃষ্টি করেছিলেন। এই অবদানের মূল্যও কম নয়।

বঙ্গদেশে স্যার সৈয়দের সমান কোন প্রতিভাধর ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে না। তার কারণ ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য। এই অঞ্চলে ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়। মৌলবাদী ইসলামের ভাবাদর্শ বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ার কোন কারণ নেই। ফারাজীও আহলে হাদিস আন্দোলন সবই ধর্মভিত্তিক আন্দোলন। ধ্রুপদী ইসলামে ফিরে যাওয়ার আহ্বান : বর্তমানের নানা অশুদ্ধতা পরিহার করে বিশুদ্ধতার প্রতিষ্ঠা। স্যার সৈয়দের প্রভাব তবুও এই অঞ্চলে পৌঁছায় বৈকি। নওয়াব আবদুল লতিফ স্যার সৈয়দেরই ভাবশিষ্য বলা যায়। দুইজনের গন্তব্য একই জায়গা।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা শহরে Mohomedan Literary Society ম্যাহোমেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল, য়ুরোপীয় শিক্ষার আলোকে ইসলামের স্বরূপ দর্শন। প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল লতিফ ছিলেন হালেচালে সাহেব। তিনি স্যার সৈয়দের মত মনে করতেন, ব্রিটিশ রাজত্ব টিকে থাকার জন্যেই এখন প্রতিষ্ঠিত। প্রবল এই শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করা মূর্খতা। তিনি ঘোষণা করেন ইংরেজী শিক্ষা এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের একমাত্র সহায়ক। লিটারারি সোসাইটির সদস্যরা ছিলেন য়ুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের অধিকাংশ আবার সরকারী কর্মচারী। সুতরাং তাদের রুজিরোজগার ব্রিটিশের অনুকম্পার উপর নির্ভর করত। এমন ক্ষেত্রে মানসিকতার ছাঁচ কিভাবে গড়ে ওঠে, তা কল্পনা করা সহজ। অর্থাৎ নওয়াব আবদুর লতিফ এবং সমিতির সদস্যদের চোখ থাকত গদীর উপর। যা গদী বাঁচায় তা-ই কল্যাণ অর্থাৎ তা-ই ধর্ম। গদী রক্ষা মুখ্য উদ্দেশ্য। ওহাবীরা ব্রিটিশদের কাফের মনে করত। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে জিহাদ ফরজ– অবশ্য পালনীয় আল্লাহর আদেশ। রাজা কাফের। সুতরাং দেশ দারুল হরব– কাফেরের ঘর, কিন্তু 'দারুল ইসলাম' হলে আর সেখানে জেহাদ করা চলে না। তা হবে শরিয়ৎ বিরোধী। ম্যাহোমেডান লিটারারি সোসাইটির সদস্যগণ তখন বড় বড় নামী আলেম, পীর, মৌলানাদের কাছ থেকে ফতোয়া আনলেন– ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম। এমনকি মক্কা শরীফের পেশ ইমামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছ থেকেও একই মর্মের ফতোয়া তারা আনিয়ে নিলেন।

রাজনৈতিক সুবিধার জন্যে ধর্মের ব্যবসা নতুন নয়। স্বভাবতঃই এই সব সদস্যদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের কৃপাদৃষ্টি প্রচুরভাবে বর্ষিত হয়। ওয়াহাবীগণ গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান জমিদারদের উপর হামলা চালাত উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের সংগঠিত করে। লিটারারি সোসাইটির সদস্যরা জমিদারদের কৃতজ্ঞতার দাবীদার হয়ে পড়ল। তদানীন্তন ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর জে. পি. গ্র্যান্টের অনুমতি অনুসারে লিখিত "হুগলী মাদ্রাসার কার্যবিবরণী"র এক জায়গায় লতিফ সাহেব লিখেছেন, "If any language in india could lead to the advancement in life of the learner it is English." সেক্রেটারী হিসেবে তিনিই রিপোর্ট লেখেন। এমন-কী ওই রিপোর্টেই আছে যে তাদের মান ইজ্জৎ সম্পত্তি বজায় থাকার সহায় ব্রিটিশ শাসন।

শাসকদের হালচাল শুধু নওয়াব আবদুল লতিফ গ্রহণ করেননি তাদের মানসিকতা পর্যন্ত এস্তেমালে আনার চেষ্টা পান। এখানে স্যার সৈয়দ ও আবদুল লতিফ একই সমতলের অধিবাসী। অবিশ্যি শ্রেণী অবস্থান মনে রাখলে কারো ধন্ধে পড়ার অবকাশ থাকে না।

AMARBOI.COM

২

মোল্লা !

এই শব্দ যখন বর্তমান হাল-শিক্ষিত ব্যক্তিরা উচ্চারণ করে, তার অর্থ দাঁড়ায়, প্রাচীন ধারায় শিক্ষিত, সংকীর্ণমনা আদবকায়দা খানা-পিনায় রুচিহীন এক ধরনের লোক। ব্যাপারটা ব্যঙ্গ বা তুচ্ছার্থে ঘটে।

অথচ মোল্লা-শব্দের অর্থ এক কালে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে নামী য়ুনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী একজন ব্যক্তি যে মর্যাদা পায় পূর্বে মোল্লা শব্দ তেমনই ঝনঝন বেজে উঠত। মধ্যযুগে ইরানের অধিবাসী মোল্লা নসরুদ্দিন তো এখন পৃথিবীময় উপকথায় পরিণত। তাঁর পাণ্ডিত্য, রসিকতা- বোধের গল্প নানা দেশে চালু আছে। অথচ আজ মোল্লা-শব্দের কী অদ্ভুত দুর্গতি।

বহু শব্দের এমন হাল হয়। ইরানের তেহরান শহরেই প্রায় বিশ বছর পূর্বে আমার জ্ঞানচক্ষু একবার খুলেছিল। পিপাসা লেগেছিল প্রচণ্ড। সরবৎ খাওয়ার ইচ্ছে। এক হোটেলে গিয়ে মনোবাসনা প্রকাশ করলে, প্রশ্ন এল অপর দিক থেকে, কুঁচা ইয়া বুজর্গ ? আমি হতবাক জিজ্ঞাসাকারীর মুখের দিকে তাকাই। সে আমার হালৎ ঠিক ধরেছিল। তাই ছোট এবং বড় দু রকমের গ্লাসের সামনে বসিয়ে দিল। তখন বুঝলাম, ছোট বা বড় গ্লাসে আমার অর্ডার সাপ্লাই হবে। কুচা- ছোটা। তখন মনে পড়ল, কুচার ত বাঙলা ভাষায়ও ব্যবহার আছে। ছোট অর্থে। কুচো ছেলে-মেয়ে। বুজর্গ-বড়। আমার তো বিস্ময়ে আর এক দফা মুখ বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) বুজর্গ্ অর্থ শ্রদ্ধা সমন্বিত বিস্ময়ে যার দিকে তাকাতে হয়–ধর্মপরায়ণতা বা অন্যান্য সদগুণে বিভূষিত এমন কোন ব্যক্তি। পীর, পয়গম্বর বা এমন উঁচু পর্যায়ের মানুষকে বুজর্গ্ বলা হয়। অথচ ইরানে ব্যক্তি থেকে খসে শব্দটি বস্ত্র-সামগ্রীর কাঁধে ভর করেছে।

কেন এমন হয়? শব্দের ভেতর কিন্তু অনেক সময় ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের চেতনার রঙ বদলে যায়। অনেক শব্দের উপর তার ধাক্কা পড়ে। ইরানের ইতিহাস আমার জানা নেই। শব্দটির মর্যাদা-চ্যুতি কখন কীভাবে ঘটল, বলা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রাচীন ধর্মীয় খোলস ছেড়ে শব্দটি ইহলৌকিক রঙে রঞ্জিত। একই শব্দ উৎস। অথচ বাংলায় 'বুজরুকি' শব্দের অর্থ সাহিত্য সংসদ অভিধান থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম পাঠকের জন্যে : বুজরুক বিশ্লেষণ, পাণ্ডিত্যের বা অলৌকিক শক্তির ভানকারী ; প্রতারক। [ফা. বুজর্গ] বিশেষ্য : বুজরুকি– পাণ্ডিত্যের বা অলৌকিক শক্তি বা ধর্মনিষ্ঠার ভান ; প্রতারণা। বাংলাদেশেও দেখা যায়, ইরানের দশা। অথচ মূল বুজর্গ, শব্দটি মর্যাদা-চ্যুত হয়নি বাংলাদেশে।

একটি শব্দটি নিয়ে এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার হেতু, কালের প্রবাহ কী সব অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, তা জানা। হিরাক্লিটাস খামখা বলেননি, এক নদীতে দু'বার স্নান চলে না। তাঁর দৃষ্টি ছিল বহমান জলের উপর। নদীর পাড় হয়ত ঠিক আছে। কিন্তু পানি এক নয়। সুতরাং নদীর নাম না বদলালেও তার আধেয় তো মুহূর্তে মুহূর্তে নবতর।

মোল্লা-শব্দ তুচ্ছার্থে বা ব্যঙ্গার্থে বাংলাদেশের নব্যশিক্ষিত মিয়া বাবুরা ব্যবহার করে। প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিদের আধুনিক মানুষ আর সমীহ করে না। ভেতরে ভেতরে চেতনার পরিবর্তন সৃষ্ট। কালের ব্যবধান এমনই।

স্যার সৈয়দের কালের হাওয়া ক্রমশ বদলাতে লাগল। পরাধীন দেশ। বিদেশী শাসন-কালে নানা বিধি-নিষেধ খাড়া আইন-শৃঙ্খলার নামে। শুধু তা-ই নয়, জীবন-যাপনের পথেও নানা অন্তরায় এসে পৌঁছায়। এমন ক্ষেত্রে সংঘাত শেষ পর্যন্ত অনিবার্য। এক বিদেশী লেখক হারবার্ট আপথেকার তাঁর 'এ্যামেরিকান রিখল্যুশান' গ্রন্থে এই ক্ষেত্রের চমৎকার স্তর বিন্যাস করেছেন : Restraint evoked resistance ; resistence produced punishment ; punishment caused resentment ; resentment was met by forcible repression ; forcible repression led to revolution. অর্থাৎ বিধি-নিষেধ থেকে প্রতিরোধ আসে ; প্রতিরোধের ফল শাস্তি, থেকে আসে বিক্ষোভ ; জবরদস্তি-নিপীড়ন মারফৎ বিক্ষোভের মোকাবিলা করা হয় ; জবরদস্তি নিপীড়ন নিয়ে যায় বিপ্লবে।

এই উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার চেয়ে আরো হালফিল নিকটের নজীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ঠিক পূর্বোক্ত পর্যায় পথে অগ্রসর হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকেই তার সাক্ষী।

স্যার সৈয়দ জীবনের শেষ প্রান্তেই এমন সব আলামৎ দেখে গিয়েছিলেন। সামাজিক পটে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সমান্তরাল এদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটেছে। স্যার সৈয়দ মধ্যবিত্তের আধুনিক জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। অনুভূতির ক্ষেত্রে শ্রেয়বোধ ও শ্রেয়বোধের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ধর্ম। এই ধর্মের ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ কিছু যুগোপযোগী অদলবদল প্রবেশ করান যেন কারো বিবেকে আর কোন দ্বন্দ্ব না থাকে।

মধ্যবিত্ত তখনও নগণ্য, শক্তিহীন। তবু তার সংখ্যা বেড়েছে। বিদেশী শাসন আর তার বিকাশের জন্যে কোন কল্যাণকর কিছু নয়। ব্রিটিশের আওতায় তার ভবিষ্যৎ কোথায়? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ তার প্রতিবন্ধক– আরো সহজ ভাষায় : দুশমন।

স্যার সৈয়দ আহমদ ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের ঐক্য দেখেছিলেন। 'আহলে কেতাব' দুই ধর্ম। অর্থাৎ, উভয় ধর্মের ঈশ্বরপ্ররিত বাণী ভাণ্ডার আছে। এক দিক থেকে তাঁর আলোচনা গা-বাঁচানো, আত্মরক্ষামূলক। মধ্যবিত্তের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। ইংরেজকে আর সদয়-চোখে দেখার মত মেজাজ নেই। আসলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বেরাটোপে সকল মধ্যবিত্তের বিকাশ ত হতে পারে না। সেখানেও মুষ্টিমেয় জন হয়ত সৌভাগ্যের বরপুত্র হয়। বাকী দারিদ্র্যের সম্মুখীন।

স্যার সৈয়দ ব্রিটিশ-বন্দনার সাথে বাইবেল-বন্দনা করেছিলেন। কিন্তু কালের কৌতুক, ইংরেজ যখন শত্রু তার ধর্মগ্রন্থ ধর্ম আর তেমন মর্যাদা পেতে পারে না। আবেগের পর্যায়ে কেন এমন আলোড়ন ও পরিবর্তন ঘটে, তা বুঝার জন্যে সামাজিক কলকজার দিকে তাকানোই সব চেয়ে ভাল উপায়। সামাজিক পর্যায়ে আপোষ করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন স্যার সৈয়দ। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তা-ই দেখা দিল।

এবার পাশা উল্টে গেছে। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও হামলা চালু।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জাস্টিশ আমির আলির সমকক্ষ যুক্তবঙ্গে আর কোন ব্যক্তিত্ব মেলে না। ভাবাদর্শ ছাড়া কাজে কেউ এগোয় না। হত্যার পেছনেও সমর্থন লাগে। ইংরেজ বিরোধিতার জন্যে যে-চিন্তা প্রয়োজন ছিল, জাস্টিশ আমির আলি তা পূর্ণ করেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ : স্পিরিট অফ ইসলাম, শর্ট হিস্ট্রি অফ দি সারাসেনস্ সেদিক থেকে এক দিগন্ত-চকিত প্রতিধ্বনি। দুটি বইয়ের অন্তর্নিহিত মর্মস্বর রীতিমত আক্রমণমূলক। তিনি জানালেন, ইসলাম আধুনিক উদারতাবাদ ও সভ্যতার পরিপন্থী নয়। বরং দুয়েরই উৎস, গঙ্গোত্রী। স্যার সৈয়দ লিখেছিলেন ইসলাম উদার ধর্ম। আমির আলি নাক সিটকে উচ্চারণ করলেন, ইসলাম স্বয়ং উদারতাবাদ বা লিবারালিজম, খ্রিস্টান ধর্মের চেয়ে অনেক উন্নততর। ইসলাম অতীতে যে বিরাট ঐশ্বর্যময় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, খ্রিস্টান ধর্মে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজীর কোথায়? বর্তমানে ইসলাম হৃত ঐশ্বর্য। তা ঠিক। তার কারণ, মুসলমানেরা ইসলামের রাস্তা থেকে বিচ্যুত। আমিরুল মুমেনীনদের শাসন-কালে অনেক সময় খুব উজ্জ্বল চিত্র দেখা যায় না। আমির আলি বলছেন, তা ইসলাম নয়। কলুষিত যুগে ইসলাম এমনই হয়। তা নীতিহীন যুগের অপরাধ। আব্বাসীয় এবং মুরবীয় খলিফাদের ঐশ্বর্য স্মৃতি সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত জোরালো এবং বর্ণাঢ্য ভাষায় পরিবেশন করলেন।

এক কথায় বলা চলে, মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রসার-ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রেও আত্মরক্ষামূলক পজিশন থেকে আক্রমণাত্মক চোটপাট শুরু হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তদ্দশা। স্যার সৈয়দ আহমদের মতে, ইসলাম প্রগতি-বিরোধী নয়, আমির আলী ঘোষণা করলেন, ইসলাম-ই প্রগতি।

ধনতান্ত্রিক যুগের অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা Individualism-এর ছাপ। আমির আলির রচনায় তা বিশেষভাবে প্রকট। পূর্বে হজরত মোহাম্মদের (দ.) মানবিক দিকের উপর তেমন জোর দেয়া হতো না। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা তাঁর অলৌকিক কাহিনী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। মানুষ বা ব্যক্তি হিসেবে তাঁর গুণাগুণের উপর জোর দেওয়া হতো না। আমির আলি তাঁর অনুভূতি, ঈমান, চরিত্রের সমস্ত গুণাবলী খাড়া করলেন। তিনি আধুনিক যুগেও শ্রেষ্ঠতর নাগরিক হতে পারতেন। কারণ, ইসলাম পরিবর্তনের বিরোধী নয়। আমির আলির গ্রন্থে ইতিহাসের এই গতিময়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আলীগড় আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসের উপর তেমন জোর দেয়নি। নিজের চিন্তার সমর্থনে আমির আলি ইসলামের অতীত ঐশ্বর্য ও কৃতিত্বের দিকে মুখ ফেরান। তিনি আরো প্রচার করলেন, শরীয়তের নতুন ভাষ্য শুধু দরকার। তার সাহায্যেই আবার নয়া ইসলামী সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব। আমির আলি নিজে ছিলেন য়ুরোপীয় evolutionary liberal বা বিবর্তনবাদী উদারতাপন্থী। তাঁর মতে ধর্ম মানবতা-উন্নয়নের হাতিয়ার। ধর্মে নানা ধরনের কাহিনী আছে। তা স্থূল চরিত্রের মানুষের জন্যে। যথা বেহেশত দোজখ ইত্যাদি। সৈয়দ সাহেব বিশ্বাস করতেন, সমাজের অগ্রগতি সম্ভব এবং এই অগ্রগতির তালে তালে উন্নততর ধর্ম বিবর্তিত হয়। ধীরে ধীরে সমাজের সকল সুফল জনসাধারণের নিকট গিয়ে পৌঁছবে। এই মতামত পূর্বোক্ত বিবর্তনবাদী উদারতাবাদ ছাড়া আর কী? আমির আলি একজন আদর্শ মানুষের কি কি গুণ থাকা উচিত, তার একটা তালিকা দিয়েছেন : প্রশস্ত অকৃত্রিম হৃদয়, দানশীলতা, কর্তব্য, প্রেম প্রণয় অগয়রহ। এসবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যষ্টিমূলক। সবই উনিশ শতকের য়ুরোপীয় বুর্জোয়াদের আদর্শ। সৈয়দ সাহেবের সমষ্টিমূলক আদর্শ হচ্ছে : ইসলামের চৌহদ্দির ভেতর গণতন্ত্র বা ইসলামী ডোমোক্রেসি– যার মধ্যে সকল মানুষের অধিকার সমান। এই চিন্তাও সৎ উদার য়ুরোপীয় বুর্জোয়াদের অনুরূপ।

তিনি লিখছেন, In the West, as in the East, the condition of the masses

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

was so miserable so as to defy description. They possesed no civil rights or political privilege. তা সত্য। কিন্তু তাদের রুটিও প্রয়োজন। আমির আলি তাঁর ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনার মধ্যে কোথাও অর্থনৈতিক এবং জাগতিক আবেষ্টনীর সামান্যতম উল্লেখও করেননি। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা প্রচুর। বিশেষত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্ম তাঁর শ্লেষ থেকে রেহাই পায়নি।

আমির আলির রচনায় এমনতর আরো বিচ্যুতি চোখে পড়ে। মধ্যবিত্ত মুসলমানদের চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর সাংস্কৃতিক দান বৃহৎ। গোঁড়ামির কোমর এবং ফণা তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে তার এই অবদান অনস্বীকার্য। ইংরেজের সম্মুখে তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা তাঁর রচনা যুগিয়েছে বৈকি।

সত্যিকার ধর্ম শুধু প্রশংসার দাবী রাখে না, তা মানুষকে নানা কর্ম চাঞ্চল্যে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু আমির আলির নব্য ইসলাম তেমন কোন বেগবান স্রোত তৈরী করতে পারেনি। অন্তত সমাজের বুকে তেমন দিক চিহ্ন হয়ে ওঠে না। কারণ আত্মকেন্দ্রিক, ব্যাষ্টিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী য়ুরোপীয় বুর্জোয়াদের নাকের বাইরে কোন জগৎ তুলে ধরতে অক্ষম। আমির আলি নব্য মুসলমান। তিনি মোল্লা নন, য়ুরোপীয় আদর্শের পেছনে দৌড়েছিলেন। সুতরাং তা এদেশে তেমন মহতী কিছু স্বাক্ষর নয়। মাটির কাছাকাছি যেতে, এমন অক্ষমতা নিজেই অক্ষম।

আমির আলি ইংরেজীতে বই লিখতেন ইংরেজী মহিলা শাদী করেছিলেন। বেশভূষায় বিলাতী প্রতিচ্ছায়া। তাঁর বই অন্য ভাষায় অনুদিত হয়নি। তা থেকে অনুমান করা যায়, তিনি দৌড়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ চর্মের পেছনে, দেশী কালা চামড়া তাঁর নিকট-আত্মীয় কিছু ছিল না। তাঁর ক্ষুদ্রকায় ইসলাম গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, ধর্মে যে ভবিষ্যৎ জীবনের কথা থাকে তা নীচু শ্রেণীর মুসলমানের জন্য বড় স্থূল ও জড়বস্তু-প্রধান, এবং উন্নত মুসলমানের জন্যে মহান এবং আধ্যাত্মিক। তিনি লিখেছেন, উপবাস একটি দরকারী শৃঙ্খলতাবোধ। কিন্তু তা স্থূল স্বভাবের (আমির আলির ইংরেজী ভাষায় among coarser nature) স্থূল মানুষদের জন্যে। তিনি সেখানে আরো মন্তব্য ছাড়ছেন, "for whom it was really intended"— বাস্তবিক পক্ষে ওটা তাদের জন্যেই করা হয়েছিল।"

অর্থাৎ সৈয়দ সাহেব অভিজাত মুসলমানদের ফাতোয়া-দাতা, স্থূল সাধারণ মুসলমানের কেউ নন।

আরো একটি ঘটনা কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া অন্যায়। কারণ, আমির আলি মুসলমান কিন্তু কোন শ্রেণীর মুসলমান? তাঁর সহানুভূতি কোন দিকে তা একটি ঘটনা থেকে এমন পরিষ্কার হয়ে যায় যে আর দ্বিতীয়বার চোখ মলে মলে দেখা অনাবশ্যক।

পূর্বে কলিকাতার মাদ্রাসা আলিয়ায় সকল শ্রেণীর মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারত না। তার জন্যে অন্য কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সুপারিশ লাগত। তার নাম শরাফৎ নামা। অর্থাৎ শরাফৎ নামা লাগত। কোন শরীফ মুসলমান উক্ত নামায় সুপারিশ করবেন যে ভর্তি ইচ্ছুক হবু ছাত্র খন্দানী ঘরের সন্তান। এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে coarser nature এবং সহৃদয় সৎ নাগরিকগণ প্রতিবাদ তোলেন। তাদের দাবী : শরাফৎ নামা উঠিয়ে দাও। সব মুসলমান ভাই-ভাই ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী অমন ব্যবস্থা। মাদ্রাসার গভর্নিং বডির মিটিং বসল। জাস্টিশ আমির আলি শরাফৎ-নামা উঠিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেন।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে তেমন কোন পুরোধা সংস্কারক মেলে না যার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। ফরায়েজী, আহ্‌লে হাদিস আন্দোলন ছিল প্রধানত : ধর্মভিত্তিক। এই জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। কারণ, যেসব কর্মপন্থা ও কর্মসূচীর সাহায্যে তখন অগ্রসর হওয়া উচিত, তেমন নেতৃত্ব, প্রাচীন পন্থী নেতাদের কাছ থেকে আশা করা অচল। বাঙালি মুসলমানের ভেতর থেকে কোন নেতা না জন্মানোর আরো কারণ ছিল। শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শই জনসাধারণের মধ্যে চালু থাকে বেশি। মুসলমানদের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে– এমন ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন প্রবল। শাসক ইংরেজও সেই জন্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সদয় ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ওই স্রোত ফিরে যায়। শাসকের কোন সাহায্যহীন বাঙালি মুসলমানরা ক্রমশ হৃৎ-ঐশ্বর্য, হৃৎবল। অবিভক্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান অপেক্ষা বঙ্গীয় মুসলমান তাই পশ্চাৎপদ সব দিক থেকে। হীনমন্যতা-বোধ তাদের জন্মগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালেও তার জের কাটেনি। অনেক পরের ঘটনা। আমাদের আলোচনায় প্রায় অপ্রাসঙ্গিক, তবু না বলে পারলুম না। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙলার মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ অর্থাৎ মেজরিটি। অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাইনরিটির মত তাদের আচরণ। ঢাকা তো পাকিস্তানের রাজধানী হওয়া উচিত ছিল। সে-জায়গায় হলো করাচী। পদে পদে এই হীনমন্যতার জের প্রকট হয়ে রইল চব্বিশ বছর। আজও এই মানসিকতার জের পুরোপুরি কেটেছে বলে মনে হয় না।

স্যার সৈয়দ আহমদ খা্ন সৈয়দ আমির আলির এই পথানুসারী আর এক জনের নাম করতে হয়। বাঙলার নয় বিহারের অধিবাসী তিনি : অধ্যাপক খুদা বখ্‌শ। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রচুর কলম চালিয়েছেন তিনি।

পশ্চিমী পুঁজিবাদজাত সামাজিক আদর্শ রপ্ত বা কুক্ষিগত করাই ছিল এই চিন্তাবিদের ব্রত। তাঁর নিকট উপরোক্ত আদর্শের বিকাশের সহায়ক সব কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম অনুমোদিত। আর যা তার পরিপন্থী তা ইসলাম নয়।

অধ্যাপক খুদা বখ্শ পাশ্চাত্য ভাবধারায় ডুব দিয়েছিলেন। তারই আলোকে তিনি ইসলামের মূল্যবোধ ইত্যাদি যাচাই করেন। ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন ক্রিয়াচার এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর কশাঘাত সদা চালু রাখেন। অবিশ্যি ইসলামকে শুদ্ধ করার দায়িত্ব তাঁর রুটিনে ছিল না। বরং ইসলামকে যুগোপযোগী করে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

অধ্যাপক খুদা বখ্শ লিখেছেন, "It would be the nearest affectation to contend that religious and social system, bequeathed to us thirteen hundreds years ago should now be adopted in their entirety without slightest change or alteration." তেরশ বছর পূর্বের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধান এখন সামান্যতম পরিবর্তন বা অদলবদল ব্যতিরেকে গ্রহণ করতে হবে – তা নিয়ে বহস প্রায়-ভণ্ডামির শামিল।

তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন, The Quoran rightly understood is a spiritual guide... puting forward ideal to be followed ... rather than a corpus juris civilis to be acted for all time. অর্থাৎ যদি ঠিকমত বুঝা থাকে, কোরান হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শক ... অনুসৃতব্য আদর্শ স্থাপনকারী ... কোরান দেওয়ানী আইন নয় যে সব সময় তদনুসারে চলতে হবে।

স্যার সৈয়দ ছিলেন সংগঠক, কর্মপরায়ণ ব্যক্তি। খুদা বখ্শ অধ্যাপকই। কথা বলা পর্যাপ্ত দৌড়। এদিক থেকে তাঁর চিন্তা নঙর্থক। তাঁর কথা হচ্ছে, য়ুরোপীয় আদর্শ পালনের যা পরিপন্থী তা ইসলাম নয়। তার জন্যে কোন কর্মভূমি তিনি বেছে নেননি স্যার সৈয়দের মত। অধ্যাপক বখ্শ বলছেন, "Is Islam hostile to progress? I will emphatically answer question in the negative. Islam stripped of its theology, is a perfect simple religion. Its cardinal principle is belief in one God and belief in Mohammad as his apostle. The rest is mere accretion, superfluity." ইসলাম কী প্রগতির বিরুদ্ধে ? আমি এই প্রশ্নের জবাবে জোর দিয়ে বলব, না। ইসলামে ফেরেশতাদের জন্মতত্ত্ব, কুলজী ইত্যাদি বাদ দিলে ইসলাম খুব সরল ধর্ম। তার মূল নীতি, এক আল্লাহ বিশ্বাস এবং বিশ্বাস করা হযরত মোহাম্মদ তার রসুল। বাকী তো স্রেফ উপলেপ অনাবশ্যক।"

অধ্যাপক বখশের এই সব উক্তি থেকে মনে হয় তিনি ধর্মভীরু লোক ছিলেন না। একই সুরে তিনি আবার লিখেছেন, The requirements of Islam are at once easy and simple, and leave scope to Muslim to take part in their duties as subject or citizen, to attend their religious obligation without sacrificing their wordly prosperity and to adapt whatever is good in any community or civilization without any interference as the part of their religion."

খুদা বখশের মতে ইসলাম সহজ ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় ; খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে ঐক্য অপরিসীম। স্যার সৈয়দের মত তিনিও ছিলেন ইংরেজ অনুরাগী। সুতরাং রাজধর্ম তাঁর ধর্ম আলাদা হবে কী করে? গরজ বড় বালাই।

খুদা বখশ ইংরেজি ভাষায় লিখতেন। সুতরাং চৌহদ্দি আন্দাজ করা যায়। নিজে মধ্যবিত্ত। তিনি তেমন শ্রেণীর প্রতিই তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তরুণ যুবকদের তিনি ব্যবসার দিকে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। যারা ব্যবসা করতে অক্ষম– অর্থাৎ নির্বিত্ত শ্রেণীর জন্যে তাঁর কোন নসীহৎ নেই। অবিশ্যি আধুনিক ব্যবসাদার হতে ধর্মীয় অনেক বাধা আছে। তেমন বাধা যেখানে আছে, তা ইসলাম নয়। শ্রেণী রঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গী এমনই হয়। আর্থিক প্রাচুর্যের সঙ্গে মন অনেক কিছু চায়। বিবিদের নিয়ে বাতাস ভক্ষণের সাধ জাগে। কিন্তু পর্দাপ্রথা সেখানে বাধা। সুতরাং তা ইসলাম নয়। খুদা বখশের রচনার মধ্যে নানা স্ববিরোধের সাক্ষাৎ মেলে। সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে আধুনিক আবহাওয়ায় মুসলমানদের টেনে আনার ব্যাপারে তিনি প্রগতিশীল। কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন কলম চালিয়েছেন, তিনিই আবার বলছেন, ধর্মই একমাত্র সমাজ রক্ষার উপায়। খুদা বখশের ভাষায়, Far more effective than penal code– ফৌজদারী দণ্ডবিধির চেয়ে বেশী শক্তিমান।"

মধ্যবিত্ত সমাজের আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ, দ্বিধাসিক্ত দোদুল্যচিত্ততা খুদা বখ্শে প্রচুর। ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে – ঐতিহ্যের নব-রূপায়ণে যিনি পক্ষপাতী তিনিই আবার শান্তি-শৃঙ্খলার Law and Order–এর মহিমা বর্ণনা করেন। অতীতের বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু বর্তমান সমস্যার মুখোমুখি হলেই খুদা বখ্শ অতীতের পিছু টানে ভেসে যেতে স্বচ্ছন্দে রাজী। এমনকি আরবী ভাষার অবহেলার বিরুদ্ধে তাঁকে ওকালতী করতে দেখা যায়।

যারা পশ্চিমী ভাবাদর্শ অনুযায়ী জীবনকে সাজাতে আগ্রহী এবং যুগপৎ মুসলমান থাকতে চান– এমন সন্দেহ সীমানায় যারা দণ্ডায়মান খুদা বখ্শ চিন্তার দিক থেকে তাদের পথ পরিষ্কার করে দেন। মনীষী হিসেবে তার কৃতিত্ব এইখানে।

একই ধরনের ব্রত যুক্তবঙ্গে অনেকে গ্রহণ করেন। এবং তেমন ভূমিকায় শুধু নব্য শিক্ষিত জন নয়, ঐতিহ্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত জনেরাও এগিয়ে আসেন। প্রাচীন চিন্তাধারার দুশমন তার আভ্যন্তরীণ ফোর্স থেকেও আসতে পারে। মৌলানা আকরম খাঁ সেদিক থেকে এক দিকশুল। অবিশ্যি মৌলানার সামাজিক ভূমিকা সর্বদা উজ্জ্বল নয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তিনি প্রগতিপন্থী ছিলেন। তারপর মুসলিম লীগ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ভূমিকার রং ক্রমশ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। বাঙালি মুসলমান সমাজের মানস-বিবর্তনের বিস্তারিত দিক-দর্শন অনভিপ্রেত বিধায় মোটা- মোটা রেখা-বিহারের দিকেই আমার ঝোঁক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব সংক্ষেপে বলা যায়, খুদা বখ্‌শ এবং মৌলানা ভিন্ন দিক থেকে একই গন্তব্যে পৌঁছান। খুদা বখ্‌শ হালেচালেও সাহেব ছিলেন। স্যুট ছাড়া বাইরে বেরোতেন না। আধুনিক কেতায় তিনি শিক্ষিত। মৌলানা সাহেব তো মৌলানা। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্যে তারা এক। ব্যাংক বীমা (ইনসিওরেন্স)– এসব ইনস্টিটিউশান তো য়ুরোপের বুর্জোয়া অর্থনীতির স্রোতে এদেশেও উপস্থিত। খুদা বখ্‌শ নিজের কৌমী ভাইদের ব্যবসার দিকে যেতে বলেছেন। ব্যবসায় লেনদেন আছে, সুদ দেওয়া-নেওয়া সমস্যা আছে, যা ধর্মে নিষিদ্ধ। মৌলানা আকরম খাঁ সেইখানে আধুনিক জীবনের সামিল হওয়ার পথ পরিষ্কার করেন ধর্মেরই ভাষ্য দ্বারা। তিনিও খুদা বখ্‌শের মতো, যা প্রগতির পক্ষে তা ইসলাম। অন্যথায়, নয়। মৌলানা সাহেবের "সমস্যা সমাধান" গ্রন্থ এবং তৎসম্পাদিত মাসিক সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রচুর রচনা সমাজের পূর্বোক্ত ভূমিকা বড় সুচারু পালন করেছে ; যে-সব সমস্যা নিয়ে আজ কেউ মাথা ঘামায় না। এমন-কী আল্লা-রসুলের দোহাই মেরে যে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরী হলো, সেখানে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান কেন, আরো ব্যবসায়ী ব্যাংক গজিয়ে উঠল। সেই সময় প্রতিষ্ঠিত, হাবীব ব্যাংক তো প্রাইভেট ব্যাংক। বোধ হয়, পৃথিবীর বড় বড় কেন্দ্রে তার এখন শাখা আছে। মোদ্দা কথা, য়ুরোপের বুর্জোয়াদের পদানত এদেশের অধিবাসী। আত্মহত্যা করে যদি গোটা জাতি, সে আলাদা কথা। কিন্তু বাঁচতে গেলে প্রভুর সঙ্গে আপোষ করা ছাড়া অন্য গতি থাকে না। প্রভুর আদর্শের ছোঁয়াচও গ্রহণ করতে হয়। এমন সংকটে নৈতিক সমর্থন আবশ্যক। খুদা বখ্‌শ মৌলানা আকরম খাঁ, আমির আলি– এমন আরো অনেকের নাম করা যায়, যারা সেই সমর্থন যুগিয়েছে সমাজে। অবিশ্যি এমন ক্ষেত্রে হোঁচট খেতে হয় নানা রকম। পূর্বে উল্লেখিত, পর্দার বেলায় মাত্রা স্মরণ করুন। ব্যাংক, বীমার ক্ষেত্রে তেমন ধীরে ধীরে প্রবেশ। বর্তমানে তা দৈনন্দিনতা-আলো-বাতাসের সামিল। ও নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না। মাঝে মাঝে রাজনীতির সঙ্গে তার পুনরুত্থান ঘটে।

AMARBOI.COM

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ইবনে সৌদ রাজ্যে টেলিফোন চালু করে বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলেন। বহু জায়গায় তখন দাঙ্গা হয়ে যায়। পুরাতন Times টাইমস পত্রিকায় তার বিস্তারিত প্রতিবেদন আছে। বর্তমানে টেলিফোন নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নিশ্চয় নেই সৌদি আরবে। কারো পক্ষে ওখানে ভাবাও কঠিন যে টেলিফোন ছাড়া কোন রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয় কিছু চলতে পারে। যুগের পদাঘাত বড় মোক্ষম এবং নির্মম।

সামাজিক পরিবর্তন যে কতো রকম ফাটল তৈরী করে ঢোকে তার হদিস অনেকের কাছে থাকে না। কারণ, মগজ তো মর্টগেজ দেওয়া আছে দূর অতীতের নিকট। জেট-বিমানে চড়ে হুজুর কেবলা হজ্বে যান। হয়ত মনে করেন ওই সামগ্রী আল্লার নেয়ামত (আশীর্বাদ-সিক্ত দান)। কিন্তু তা ইহুদী নাসারার কারখানায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরী। মুসলমানের কারখানায় নয় কেন? এসব চিন্তা তাদের মগজে আসে না। অথচ ইহুদী-নাসারার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্যে ওরা প্রতিদিন নসিহৎ খয়রাৎ করেন। পবিত্র কোরানে একই নসিহৎ একদম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা আছে। নিজেরা টের পান না, সুতরাং তার অস্তিত্ব নেই। এমনই যুক্তির উপর নির্ভর করে নিয়ামত খোর মহাজনেরা সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে বেড়ান। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন কতো দিকে কতো রকমে না অক্টোপাশী নুলো বাড়িয়েছে। এখন এই বাংলাদেশের মেয়েদের কথাই ধরা যাক। তারাও ব্যাংকে টাকা রাখছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার তাদের আছে। সুতরাং ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন স্বাভাবিক। পূর্বে মেয়েদের প্রিয় বস্তু ছিল নিজের সংসার-স্বামী পুত্র কন্যা আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি। এখন আর এক প্রিয়জন যোগ হয়েছে : টাকা। মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনে তার প্রভাব পড়বে বৈকি। তার ফলে, মানস লোক আর পূর্বের অবস্থা যে নেই, তার জন্যে কোন বেশী কল্পনা লাগে না। ভোগ্যপণ্য সমাজ Consumers society কোথায় গেছে, কেন বিদেশীরা উপনিবেশে জানোয়ারের অধম, কেন তারা নিজেদের মধ্যে গলা-কাটাকাটি ছাড়া অন্য দেশে দেশেও যুদ্ধ লাগিয়ে রাখে– এসব প্রশ্ন অনেকের মগজ থেকে দূরে অবস্থান করে। অথচ বিদেশী আয়েশ-উপকরণের জিনিসে তাদের ক্ষুধা সহজে মেটে না। মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহীগুলো তেলের উপার্জনে ফেঁপে এমন য়ুরোপীয় অনুকরণের বিলাসিতায় ইহুদী নাসারাকে হার মানিয়ে দেয়।

মূল প্রসঙ্গ থেকে পাশ কাটিয়ে এসে অনেক কথা বলা হয়ত যুক্তিযুক্ত নয়। তবু পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কিছু বাড়তি কথা সান্নিবেশিত।

আবেষ্টনীর নাগপাশ কে-ই বা এড়িয়ে যেতে পারে? খুদা বখ্‌শ, আমির আলি কি আর কেউ ব্যতিক্রম কিছু নন।

৪.

পরাধীনতা-জাত শোষণ শেষ পর্যন্ত উপনিবেশেও চৈতন্যের বাহক হয়ে এসে পৌঁছায়। প্রতারণা দিয়ে তা ঠেকিয়ে রাখা চলে না। হয়ত সময় যায়। এক দুই করে ক্রমে প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়ে। একদিন এই সংখ্যা এমন পর্যায়ে যায় যে তা সমাজ দেহে আর এক নতুন কাঠামোর আদল হয়ে দাঁড়ায়। কোম্পানীর আমল, ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশে অসন্তোষ গোড়া থেকেই দেখা দেয়। প্রাচীন শাসক এবং সুবিধাভোগীরা তো ছিল-ই। তার সঙ্গে ক্রমশ দেশের জনসাধারণও এসে জোটে। অসম গাঁটছড়া, তবু তা-ও বাঁধা হয়। কারণ দুয়ের স্বার্থের ঐক্য। অবিশ্যি প্রতিবাদ-মুখর সেই সব উচ্চারণ তখন রাজনীতির লেবাসে দেখা দিত না। অন্য-রূপে তার বিকাশ ঘটত।

সাম্রাজ্যবাদীদের বাইবেল আসে প্রথমে। বুলেট তারপর। এক সময় এই বাইবেলের বিরুদ্ধেও ঘৃণা দেখা দেয়। খ্রিস্টান মিশনারীগণ খুলনা, যশোর, নদীয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি এলাকায় নিম্ন বর্ণের হিন্দু নয় শুধু দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করে। কিছু মুসলমানও দীক্ষিত হয়। ওই এলাকার মুন্সী মেহেরুল্লা এবং মিহির ও সুধাকর পত্রিকা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কেতাব লেখেন মুন্সী সাহেব "খ্রিস্টান ধর্মের অসারতা।" যদিও ধর্মীয় আবরণ, তবু এই সব আন্দোলন মূলে বিদেশী শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমির আলির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একই সুর। কারণ, স্যার সৈয়দের সাবেক আবহাওয়া আর নেই। তাঁর 'স্পিরিট অফ ইসলাম' এর আক্রমণাত্মক প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ শোষণ সঞ্জাত। চেতনায় বিপ্লব এইভাবে ঘটে সমাজ-বিপ্লবের পূর্বে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে শেখ আবদুর রহিম লেখেন, "হজরত মোহাম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি। গ্রন্থকার বইয়ের ভূমিকায় লিখছেন যে হযরত মোহাম্মদের প্রচলিত জীবনী বিষয়বস্তুর দিক থেকে অসম্পূর্ণ। কারণ, বিদেশী ঐতিহাসিকরা অনর্থক হযরতের উপর দোষারোপ করেন। তারা বলে তলওয়ারের শক্তি দ্বারা নাকি তিনি ইসলাম প্রচারে সমর্থ হন। শেখ আবদুর রহিম সাহেব ভূমিকায় লেখেন যে তাঁর বই পড়ে লোক জানতে পারবে, তাদের অভিযোগ কতখানি সত্য।

শুধু শেখ আব্দুর রহিম নয়, যদিও ধর্ম অবলম্বন, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ বিরোধিতা কোন না কোনো ভাবে প্রকাশ পায়। যারা বাইবেল-বিরোধী তারা অগোচরেই ব্রিটিশ বিরোধী।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হয়। ইসলামী ভাবধারায় তখন বিরাট কিছু পরিবর্তন না ঘটলেও নানা রকমের শাখা-প্রশাখা দেখা গেল। অবিশ্যি সবগুলোর মূল কথা, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিধান সময়োচিত হয়নি। কোথাও উদারতাবাদের মধ্য দিয়ে রক্ষণশীলতার বালুচরে ঢুকেছে। কোথাও রক্ষণশীলতার উপর আরো কালো রঙের পোঁচ ছোপানো। মোট কথা, য়ুরোপীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে এই ভাবধারার সিদ্ধি ঘটে।

প্রসঙ্গত খুদা বখ্‌শের নাম আবার উল্লেখ করা চলে। তিনি ১৯১২ সনে রাজনীতি বিরোধী ব্রিটিশ ভক্ত প্রজা। কিন্তু ১৯২৭ সনে তিনি তদানীন্তন ঘটনার সঙ্গে জড়িত : European's claim to superiority is a myth য়ুরোপীয়দের দাবী যে তারা জ্ঞানে গুণে উন্নত, তা একটা কল্পকথা মাত্র। অসহযোগ আন্দোলনের তিনি সমর্থক। আমলাতন্ত্রকে শায়েস্তা করার তা-ই একমাত্র পন্থা। ভারতীয় কংগ্রেস এবং খেলাফৎ আন্দোলনের আহ্বানে তখন হিন্দু-মুসলমানে হৃদ্যতার বন্যা শুরু হয়েছে। খুদা বখ্‌শ মহাত্মা গান্ধীর উপর গদগদ প্রশংসা-কীর্তনে প্রবন্ধ লিখলেন। সাম্প্রদায়িক মিলন তাঁর কাছে একটা বাস্তব স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মতবাদেও তিনি অনেকখানি অগ্রসর। স্যার সৈয়দের অনুরূপ তিনিও মুসলমানদের 'ইংরেজ জেন্টেলম্যান' হওয়ার জন্যে ওকালতি করেছেন। ১৯২৩ সনে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছেন "Orientals we are and orientals we must remain ; and European culture can never be for the majority of us more than and incidental and subsidiary acquisition. আমরা প্রাচ্যবাসী এবং প্রাচ্যবাসীই থাকব। আর য়ুরোপীয়দের সভ্যতা আমাদের অধিকাংশ জনের জন্যে একটা আপতিক এবং সম্পূরক অর্জন জাতীয় ব্যাপার।" জাতীয়তাবাদের স্রোতে তখন মুসলমান মধ্যবিত্ত হাবুডুবু খাচ্ছিল কংগ্রেস-খেলাফত প্যাক্টের পর। অধ্যাপক বখ্শ নিজের গতর আর শুকনো রাখেননি। কিন্তু গান্ধীজী বিহারের চৌরাচৌরা নামক জায়গায় উত্তেজিত জনতা কর্তৃক পুলিশ হত্যার পর সেই অসহযোগ আন্দোলন সহসা থামিয়ে দেন। এমন গর্ভস্রাবের পর নিঃসঙ্গ মুসলমান মধ্যবিত্ত তখন ইংরেজের সহযোগিতায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। প্রফেসার সাহেব সেখানেও হাজির। হিন্দু মুসলমানের প্যাক্ট তাঁর কাছে এক প্রচণ্ড মূর্খতা। সাহেব লিখছেন, "Idle to look to swaraj for the care of our present ills. And equally idle ... to look to it for reign of righteousness ... it will devide Indian Humanity into two great unequal halves– Heaven for one. Hell for the other." আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের জন্যে স্বরাজের দিকে তাকানো কুড়েমী ছাড়া আর কী ... ন্যায়পরায়ণতার জন্যে সেদিকে তাকানো একই রকমের কুঁড়েমি... তা ভারতীয় মানবতাকে দুই অসম অর্ধভাগে বিভক্ত করবে– এক জনের জন্যে স্বর্গ, অন্য নের জন্য জাহান্নাম।"

খুদা বখ্শ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্তদের মুখমাত্র। এই দুই শ্রেণীর জন্যে ধর্মের সান্ত্বনা প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন। কারণ, জীবনের সাফল্যে তারা নিরাপত্তাহীন। সুতরাং যেখানে য়ুরোপীয় বুর্জোয়া ভাবধারাসিক্ত মধ্যবিত্ত আছে, সেখানেই তিনি আছেন। গান্ধীজীর প্রশংসা সেই একই সূত্র থেকে।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর মুসলমান মধ্যবিত্ত আরো ব্রিটিশ ঘেঁষা হয়ে পড়ল। জওহরলার নেহরু তাঁর "আত্মচরিতে" স্বীকার করেছেন– "Then came the reaction and communal and back word elements, both among the Hindus and the Muslims, began to emerge from their enforced retirement. It was a slow process, but it was a continuous one. The Hindu Mahasabha for the first time assumed some prominence, chiefly because of the communal tension, but potifically it could not make much impression on the Congress. The Muslim communal organisation were more successful in regaining some of their old prestige among the Muslim masses. Even so a very strong front of Muslim leaders remaine throughout with the Congress. The British Governmnet mean while gave encouragement to the Muslim communal leaders who were politically thorough reactionary. Nothing the success of these reactionaries, the Hindu Mahasabha began to compete with them in reaction, thereby hoping to win the goodwill of the government. Many

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

of the progressive elements in the Mahasabha were driven out or left of their own accord, and it inclined more and more towards the upper middle classes and especially the creditor and banker class.

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য তদানীন্তনকালের কিছু আভাস দেওয়ার জন্য। মানসিক গতির রাস্তা কীভাবে মাঝেমাঝে স্থির হয়, তা এখান থেকে বুঝে ওঠা সহজ হয়।

খুদা বখ্শ সাহেবের দোলাচল অবস্থান-ব্যাখ্যাও সহজ। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমির উপর চোখ নিবদ্ধ থাকলে ইসলামী ভাবধারার নানা ভাষ্যের সঠিক পরিচয় মেলা সম্ভব।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর আরো কয়েক রকমের প্রবণতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মনে রাখা উচিত, প্রবণতা মানসেরই এক প্রতিমূর্তি। রুচির সাহায্যেই একটি মানুষের অনেক কিছু জানা যায়, তার সঙ্গে ওঠাবসা বা অন্য ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই উপ-মহাদেশে সামাজিক চাঞ্চল্য নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। বহির্জগতও তার অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের মতো ছোট শক্তি রাশিয়াকে-কে পরাজিত করে। সমগ্র এশিয়াবাসীর নিকট তা এক বিরাট উদ্দীপনা। য়ুরোপের অগ্রগণ্যতা এবং দম্ভ আর কল্কে পায় না। ঠিক তখন বঙ্গদেশেও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। দেশী শিল্প আবার পুনঃপ্রবর্তন করার প্রচেষ্টা জাতীয়বাদেরই অনুপ্রেরণা। এমনতর বহু উপাদান তখন সামাজিক আলোড়নের পথ প্রস্তুত করছিল। এই সময় মুসলিম সমাজে কয়েকটি প্রবণতা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। মোটামুটি তার বিবরণী একটা দেওয়া যায়।

www.amarboi.com

জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রথম যুগে অতীতের পটভূমি প্রায় প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। য়ুরোপে অন্তত তেমনই ছবি মেলে। এখানে সংস্কারক ও অন্যান্য মুখপাত্রগণ ইসলামের অতীত ঐশ্বর্য-মুখর দিনের কাহিনী টেনে নিয়ে আসেন। বসরা, কুফা, গ্রানাডা, কর্ডোভা প্রভৃতি নগরের ইতিহাস স্মরণ করা হয়। শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে।

জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে গর্বিত আস্ফালন থাকে, তার প্রতিধ্বনিও পাওয়া যায়। তাই ফলাও করে বলা বা লেখা হয়, য়ুরোপ ইসলামের কাছে ঋণী। অবিশ্যি অমন গর্বের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থেকে যায়, "আমাদের বর্তমানে আর করার কিছু নেই।"

য়ুরোপে যখন অন্ধকার যুগ ইসলামের তখন সুবর্ণ যুগ চলছে। য়ুরোপ তখন অসভ্য ছিল। এই সব দম্ভপূর্ণ বয়ানও প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের পূর্বেকার বা জাহেলিয়া যুগের অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশন চলে। ব্যভিচার, কওমী কলহ, দাসপ্রথা হত্যা ইত্যাদি নারকীয় ঘটনা দ্বারা ঐ যুগ রঞ্জিত। আমির আলি পর্যন্ত এই পথ অবলম্বন করেন। অবিশ্যি আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায়, অবক্ষয় ছিল সত্য, কিন্তু তার চিত্র অমন ভয়াবহ নয়। লেখক বা বক্তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের পূর্বেকার ও পরবর্তী – দুই যুগের তুলনার সাহায্যে ইসলামের আসল বৈশিষ্ট্য দেখানো।

কোরানের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের প্রবণতাও ওই সময় দেখা যায়। আধুনিক সব আবিষ্কারের সূত্র কোরানে আছে। বুঝা ও ব্যাখ্যার অভাবে তা এতদিন অনুভূত হয়নি। ইসলাম বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। তার সমর্থনে এই বহুল-উদ্ধৃত উদ্ধৃতি :

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদের্শাবলীর হিয়াছে বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকের জন্য, যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাকে স্মরণ করে এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ...

[কোরান, সূরা এমরান–১৯০ আয়াত] ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত কুরানুল করীমের অনুবাদ গৃহীত।]

এই সময় আরো দেখা যায়, জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের ঐতিহ্য বর্ণনা। উদ্ধৃতির অভাব হয় না। কয়েকটি তো খুবই পরিচিত। ওতলোবুল ইলমা লাও কানা বিসসিন। জ্ঞানান্বষণে যদি চীন যেতে হয়, যাও। শহীদের রক্তের চেয়ে দোয়াতের কালি পবিত্রতর। অধ্যয়নে এক ঘণ্টা অতিবাহিত করা এক বছরের এবাদতের চেয়ে মূল্যবান।

কিন্তু এখানে দেখা যায়, মূলের সঙ্গে কোন যোগ না রেখে শুধু যে-টুকু মধ্যবিত্ত মুসলমানের কাজে লাগে, সেইটুকু উদ্ধৃত করা হয়। পটভূমি সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য থাকে না।

এসব বলা হয়, জ্ঞানের দিকে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নয়, বরং ইসলামের দিকে– যে ইসলাম জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছে। অর্থাৎ, মুসলমান হও, লেখাপড়া শিখিও না। এমনই একটি ইংগিত কী পেছনে থেকে যায় না?

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হযরত মোহাম্মদের অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে কেবল প্রচার করা, তিনি মহামানব ছিলেন– এই প্রবণতা বিশ শতকের গোড়া থেকে বেশ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের যে কোন গুণ থাকা সম্ভব, হযরত মোহাম্মদ (দ.) তার অধিকারী ছিলেন। এইখানে সব লেখকই নিজের শিক্ষা এবং কল্পনার সাহায্যে যে সমস্ত গুণ আবিষ্কারে সমর্থ– সেগুলি হযরতের উপর আরোপ করেন। সেই মহাপুরুষের অবদান ও ভূমিকার বিচার-বিশ্লেষণের পর গুণের সন্ধান নয়– গুণের সন্ধানের পর তা হযরতের উপর প্রয়োগ করা হয়।

অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানের নবী তাদের কল্পনার বাইরে যেতে পারেন না। মধ্যবিত্তসুলভ গুণাবলীতেই তিনি ভূষিত হন এই যুগে। এইসব গুণাবলী কী? বিপদে, দুঃখে অটলতা, মিতব্যয়িতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ইত্যাদি। এই সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ য়ুরোপের পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম যুগে প্রশংসিত হতো। সবচেয়ে বড় গুণ : নিজের কর্তব্য সাধন, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম অগয়রহ।

হযরত মোহাম্মদ (দ.) তাঁর যুগের সামাজিক শক্তি– সোশ্যাল ফোর্সগুলোকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা থাকে না। একটা ভালো কাজ সমাধানের চেয়ে কোন সৎ কাজ সমাধানের আশায় তা গ্রহণ করা যে কম পুণ্যের ব্যাপার নয়– তা মধ্যবিত্ত চেতনার উপলব্ধির বাইরে। প্রতিবেশীকে দয়া করা ভালো কাজ। কিন্তু প্রতিবেশীকে দয়ার পাত্র হতো হবে না– এমন কোন আন্দোলনকে সাহায্য করা বা আন্দোলনে ব্রতী হওয়া, কম সৎ কাজ নয়। মধ্যবিত্তদের তা বুঝে ওঠা মুশকিল। কারণ, মধ্যবিত্তের কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ভিক্ষা দেওয়া সওয়াবের কাজ। কিন্তু এমন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ো যেন দেশে হৃৎ আত্মসম্মান (নিরুপায়, আত্মসম্মান হারাতেই হয়) একটি ভিক্ষুকও না থাকে– তেমন আন্দোলন দেশের শোষক এবং মধ্যবিত্তের নিকট প্রশংসার বিষয় নয়। কারণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উপরই পুঁজিবাদী সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং নিজের গলায় এক উন্মাদ ছাড়া, কে আর ছুরি চালাতে যাবে?

সব দেশেই শোষকবৃন্দ এবং মধ্যবিত্ত আল্লাহ অপেক্ষা মানুষের দিকে অনেক বেশী আগ্রহান্বিত। বর্তমানে ফলাও ভাবে "নবী দিবস" পালিত হয়। তার ফলাফল কেউ হিসাবের মধ্যে রাখে না। বিগত চল্লিশ বছরে এই পবিত্র দিবস ক্রমশ জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবে পরিণত। দেশে ধর্মীয় চেতনার প্রসার অত্যন্ত সুসংবাদ। কিন্তু তার ফল তো সমাজের ফলকে লেখা হবে। ধর্মীয় চেতনা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে সততা এবং মনুষ্যত্বের অন্যান্য সদগুণ সামাজিক আচরণে ঝলক দিয়ে উঠবে। কিন্তু বাংলাদেশে, আগের কথা বাদ দেওয়া যাক, গত পনের বছরে সমাজে দুর্নীতির প্লাবন চলছে। উৎকোচ ছাড়া এক-পা এগোনোর পথ নেই। চৌদ্দ বছরের ছেলে মার্ডার করে। খুন-খারাবী, প্রতারণা, মুনাফেকি একদম মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। কলেজ-স্কুলের ছাত্রদের কথা দূরে থাক, ধর্মভিত্তিক শিক্ষা চলে যেখানে সেই মাদ্রাসার ছাত্রও পরীক্ষায় নকল করে। মসজিদের ইমাম (সম্প্রতি ঢাকা শহরের কলাবাগানের মসজিদের কাণ্ড) চেক জালসই পূর্বক অপরের টাকা ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করে। "নবী দিবস" এক জাঁকজমক, আড়ম্বর বৃদ্ধির সাথে সামাজিক ওই সব কালো ছবি কী করে মেলাবেন? "নবী দিবস" যে বিফলে যাচ্ছে, তা না বললেও চলে।

কারণ, পুঁজিবাদী সভ্যতা সমাজের সমস্যা-সমাধান করতে চায় ব্যক্তি কেন্দ্রিকভাবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে। এই সভ্যতা দেশ বা জাতিকে জানতে চায় না– যে সমষ্টির কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের সঙ্গে পরোক্ষ-অপরোক্ষ সম্বন্ধ দ্বারা জড়িত। এই সমাজের নীতিবিদগণ মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার ঘৃণা করেন। কিন্তু সমস্ত সমাজের সমষ্টিগত রূপ– যার ফল এমন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচার-তা তাঁরা দেখতে জানেন না। অথবা, স্বার্থচ্যুতির আশঙ্কায় জেনেও জ্ঞানপাপী সাজেন। ধর্মের ভাষায়, দয়ালু, মানবিক- প্রেমিক তাঁরা হতো বলেন। কিন্তু তাঁরা কখনও ভেবে দেখেন না, পরম করুণাময় আররহমানুর রহিম আল্লাহর উদ্দেশ্য কী?

পুঁজিবাদী সমাজে হয়ত সৎ মুসলমান বা হিন্দু হওয়া যায়। কিন্তু এই সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া কারো পক্ষে আল্লাহ-প্রেমিক হওয়া সম্ভব নয়।

প্রাচীন কৃষিসমাজের বিধিবদ্ধ (codified) ধর্ম সব সময় যন্ত্রযুগের সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম। মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা এত জটিল এবং ভিন্ন-রকম যে কতগুলি 'কোড' দিয়ে তার জবাব মিলবে না। বর্তমান জীবনের জন্য প্রয়োজন Principle নীতি- আরো ভাল হয়, যদি spirit বা মর্মতেজ মেলে- যার সাহায্যে মানুষ সব কাজের দোসর এবং জবাব পায়। হযরত মোহাম্মদের জীবনের প্রতি প্রেম সেই অভাব থেকে উদ্ভূত। স্যার সৈয়দ শরীয়তের অত গুরুত্ব দেন নি। কোরান সম্বল করে তিনি এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। তা-ও যথেষ্ট নয়। এই জন্যে হযরত নবীর বাণীর দিকে ছুটে যেতে হয়। পরে, বাণী থেকে বাণীর উৎসের নিকট। জটিল সামাজিক সমস্যার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সেই হেতু রসুলের বাণী যে spirit বা মর্মশক্তিতে দেওয়া হতো, তার সন্ধান চলছে। এই সঙ্গে মনে রাখা রাঞ্ছনীয়, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার বুনিয়াদ সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক লোক এই চত্বরে একে অপরের দুশমন। আমার প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করেই আমি চাকুরী বা আর কিছু পেতে পারি। সহযোগিতা ধনতান্ত্রিক সমাজে বেআইনী- যেমন, ক্ষুধার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ বেআইনী। স্যার সৈয়দ আহমদের কালে, মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের প্রসার ছিল। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশেও মধ্যবিত্তের সংকট আরো ঘনীভূত। আর পূর্বের মত চোখের সামনে সুযোগ নেই। ভবিষ্যতের স্বপ্ন অন্ধকার। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পরও কোন রঙীন ভবিষ্যত হাতছানি দিচ্ছে না। জীবন-সংগ্রামের এই মর্মন্তুদ বর্বরতার ভেতর হতাশা-মুখর, জগদ্দ-চাপা সঙ্কীর্ণ সমাজ-কাঠামোর ধ্বংসোন্মুখ বিভীষিকার মধ্যে যদি মধ্যবিত্ত সমাজ হযরত মোহাম্মদের মত বন্ধু খোঁজে- তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এতদ্ব্যতীত, এই বন্ধুত্বের জন্যে কোন সহযোগিতা বা কর্তব্যের সম্পর্ক নেই। বিনা কাজের বিনিময়ে এই বন্ধুত্বের বদৌলতে মানসিক সান্ত্বনা শান্তি এবং আরাম পাওয়া যায়। মধ্যবিত্তদের এই পরিস্থিতি। যারা উপর তলার তাদের অধিকাংশ নামাজও পড়ে না, রোজাও রাখে না- খোদার উপর তেমন নির্ভরতাও লাগে না। "আমাদের নবী আলায়হেসসালাম" এমন-এমন উচ্চারণের মধ্যেই তাদের সকল আধ্যাত্মিক তৃপ্তি। অবিশ্যি এই তৃপ্তি কোন কর্তব্যের তাগিদ কি অনুপ্রেরণা যোগায় না। বরং প্রাচীন কেতায় শিক্ষিত আলেম যাঁরা ইসলাম-কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ করেছেন, তাঁদের এরা আদৌ পছন্দ করে না– উল্টো মোল্লা আখ্যা দেয় আভ্যন্তরীণ বিরূপতা ও ব্যঙ্গের দ্যোতনায়। নব্য তরুণ যারা ইসলামের কোন কোন দিকের ব্যবহারিক প্রয়োগের পক্ষপাতী তাদেরও অভিজাত শ্রেণী সহ্য করে না, নাকচ করে দেয় এই বলে যে ওরা রসুলের ফর্মাবরদার (আজ্ঞাবাহী, অনুসারী) নয়। এমনই সাধারণ আবহাওয়া যেখানে আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে আন্তরিকতা বিরল। সামাজিক ক্ষেত্রে এমন নিষ্ক্রিয়তা শাসক ও শোষক শ্রেণীর পক্ষে কায়েমী স্বার্থ বজায়ের অনুকূল।

৫

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে সাময়িক অর্থনৈতিক প্রসার দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে দোসর খুঁজে পায় না। নতুন স্যাঙাৎ প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে। মুসলমান অভিজাত, মধ্যবিত্ত সহজেই এই টোপ গিলেছিল। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিকে উন্নততর হিন্দু পুঁজিবাদ— দুয়ের মাঝখানে মুসলমান মধ্যবিত্তদের অবস্থিতি। তারা তেমন শক্তিশালীও নয়। কাজেই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদকে তারা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে হজম করতে লাগল– একদা স্যার সৈয়দে তা অত্যন্ত সানন্দে গলাধঃকৃত হয় ভক্তের প্রসাদ-রূপে। অন্যদিকে জন-জাগরণের ভয় থাকে।

এই অবস্থায় তবু সাময়িক আর্থিক সম্প্রসারণের সুযোগ মুসলমানেরা পায়। উদারনৈতিক ইসলামের ধারাও ক্ষীণ স্রোতে বহমান দেখা যায়। নজরুল ইসলামের সর্বগ্রাসী প্রতিভা সেখানে কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছিল। অবিশ্যি পুরাতন সমাজ তাঁকে সহজে গ্রহণ করেনি।

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখন বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি
কোরান ও হাদিস চষে।

'ওমর ফারুক' কবিতায় নজরুলের এই সংস্কার উদ্বুদ্ধ শ্লেষ তাদের বিপন্ন করে তুলছিল বৈকি। কাফের ফাতোয়া প্রাপ্তি ছাড়াও তিনি নানাভাবে নাজেহাল হন। রক্ষণশীল পত্রিকায় নজরুলের প্রতি বিষোদ্গারের অভাব ছিল না। একটি নমুনার লোভ সম্বরণ করতে আমি অসমর্থ। তদানীন্তন বিখ্যাত জননেতা চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর নজরুল তাঁর উদ্দেশে লিখিত কবিতার এক জায়গায় বলেন–

জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে
হে পুরুষবর
কোরান তোমার ঘোষিত মহিমা, হতে
পয়গম্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার কাব্যে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ১৫ই জুলাই ১৯২৫ তারিখের 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকার সম্পাদকীয়ে লেখা হয় : "উঃ, এ কি স্বেচ্ছাচারিতা ! ... নজরুল, তোমায় জিজ্ঞাস করি, কোন সাহসে তুমি এহেন অগৌরবে আল্লার নবীর উপর বাণী প্রয়োগ করিয়াছ। ইসলামের শোণিত বিন্দুমাত্র কি তোমার শিরায় নাই– তোমার প্রাণে কি এতটুকুও ভয় নাই ..."। এইভাবে কবির প্রতি গালাগাল দেওয়ার প্রবৃত্তিকে সম্পাদকীয় খোলসে মুড়েছেন এডিটর সাহেব, প্রাণনাশের ভয়ও দেখিয়েছেন।

স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবীদার, উদারতাবাদের ভগীরথ নজরুলের ভূমিকার আলোচনা অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। ঢাকার "শিখাগ্রুপ" নামে অভিহিত বুদ্ধিজীবীগণ এই মৌসুমে স্মরণীয়। মরহুম আবুল হুসেন (যিনি সৈয়দ বংশ-জাত, কিন্তু লিখতেন না) কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, কবি আব্দুল কাদির, দুই মোতাহার হোসেন– একজন কাজী, অন্যজন চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী প্রমুখ ইসলামকে উনিশ শতকের উদারতার খাতে বইয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। কিন্তু এই মৌসুম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সুবিধার মতই ক্ষণস্থায়ী ছিল। এই গ্রুপের অনেকেই প্রগতিশীল ছিলেন সম্প্রাদয়ের মধ্যে। কিন্তু যখন রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠেছে, উন্নততর হিন্দু সমাজের মুখোমুখি তখনই এদের অনেকে পশ্চাতে হটেছেন। ভাবাদর্শে রক্ষণশীল এদের ভেতরে অধিকাংশ পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক বনে যান। ১৯২৯ সনে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং অর্থ সংকটের স্রোতে উদারতাবাদ ভেসে গেল। শুরু হলো অতীত মুখীনতার জিগীর। 'শিখা' পত্রিকা গ্রুপের শ্লোগান ছিল : জ্ঞান যেথা সীমাবদ্ধ, চিন্তা সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

উদারতাবাদ অবিশ্যি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে রইল। কিন্তু তা কোন কর্মপ্রেরণার সহায়ক নয়। পরিবর্তনকামী তো নয়ই। হযরত মোহাম্মদ (দ.) শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মুসলমান শ্রেষ্ঠ মানব-জীব। মনের ভাব প্রধানত এই রূপ। তার বেশী কিছু না। যেন ধর্ম মধ্যবিত্ত জীবনের পরিতৃপ্তির ঢেকুর বিশেষ। আধুনিক শহরের ড্রয়িংরুমে বাঘ শিকারের কাহিনী শোনার মতো, ভয়ের তো কিছু নেই। কারণ, নিরাপত্তা সম্পর্কে শ্রোতা খাতির জমায় আছে। মধ্যযুগে ধর্ম ছিল অভাবজাত তৃপ্তির পরিবেশক। আধুনিক শোষক নিপীড়ক মধ্যবিত্তের নিকট তা যাপিত জীবনজাত পরিতৃপ্তি।

১৯২৫ সনের পর ঢাকা শিখা-গ্রুপের সাময়িক স্ফুলিঙ্গ বিকাশ ছাড়া উদারপন্থী ইসলামের কাজ হোলো, আর মানবজাতি রক্ষা নয়, বরং ইসলাম-কে রক্ষা। অবিশ্যি বাজে অন্য কোন চিন্তার প্রভাব এসে পড়ে সেই জন্যে ইসলাম-কে আধুনিক লেবাসে সাজানোর চেষ্টাও শুরু হয়। তার জের ১৯৪৭ সনের পর ঢাকার "তমদ্দুন মজলিস" ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্যমে দেখা দেয়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিসাধন নয়, বরং ইসলাম রক্ষণ; যেন ইসলাম ধর্মের ক্ষতিসাধন কেউ না করে বসে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী শুদ্ধভাবে আত্মরক্ষামূলক। এমন মানসিকতা কাউকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান পত্তনের পর এই লক্ষণ আরো প্রকট হয়। সেই কাহিনী যথাস্থানে পরিবেশিত।

উদারতাপন্থী ইসলাম সুষ্ঠু শৃঙ্খলাগত দর্শনহীন। সুসংবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব এমন ক্ষেত্রে ওরা খাড়া করতে অক্ষম। শত শত রকম প্রচার পুস্তিকা বেরোয় : 'ইসলাম ও রাজনীতি,' 'ইসলাম ও বিজ্ঞান,' 'ইসলাম ও নারী' ইত্যাদি, এই জাতীয় উচ্চারণ বহু। কিন্তু সুসংবদ্ধ চিন্তা কোথাও মিলবে না। হযরত মোহাম্মদ (দ.) নবী ছিলেন। তা নতুন কথা নয়। কিন্তু নবুয়ত সম্পর্কে বা নবী সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে কী বলা যায়– তেমন চিন্তা কোথাও মিলবে না। উদারপন্থী ইসলাম হয়ত বোঝে আধুনিক জটিল জীবন পটে শরীয়তের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয় বা কঠিন। কিন্তু শরীয়তের আধুনিক যুগে কী রূপ হবে, তেমন কিছু নির্মাণেও অপরাগ। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নেতিবাচক।

ধর্মের প্রেরণার মধ্যে সৃষ্টিশীল নৈতিকতার দ্যোতনা থাকে। আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টি কোন কর্মপ্রেরণার দোসর নয়। হযরত মোহাম্মদ (দ.) সৎ কাজের উপর জোর দিয়েছিলেন। যার ফলে, আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন এবং বেহেশতে অনন্ত সুখের জীবন মিলবে। কিন্তু আধুনিক কালের প্রবক্তরা বলেন, "না, তুমি পূর্বে বেহেশত এবং পরকালের অনন্ত জীবনে ঈমান রাখো, তাহলেই তুমি এই জগতে ভাল কাজ করতে সক্ষম হবে।"

য়ুরোপের নৈতিক দুর্দশার জন্যে উদারপন্থী মুসলমানেরা তাদের সংস্কৃতি, ইহলৌকিকতা (Secularism) এবং খ্রিস্টান ধর্মের উপর দোষারোপ করে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি কারো চোখে পড়ে না।

ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছিল, সামন্ত যুগের পূর্বে, যাযাবর সমাজের বুকে– যেখানে পুঁজিবাদের বীভৎস ধ্বংসাত্মক আলামৎ দেখা দেওয়া অসম্ভব। অষ্টম শতাব্দীর আরব দেশ ও বর্তমান যে কোন রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ। তুলনা একদিক থেকে চলেই না। কিন্তু তুলনা করা হচ্ছে এক দাঁড়িপাল্লায় তুলে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিকশিত পুঁজিবাদ যে য়ুরোপীয় বা মার্কিন দেশের সব সমস্যাই ডেকে আনবে, তা তুলনাকারী পণ্ডিতেরা কোনদিন কল্পনাই করে না। বর্তমানে পৃথিবীর সব মুসলিম রাষ্ট্রের অর্থনীতি পুঁজিবাদের কাঠামোয় অগ্রসর। সেখানে আধুনিক সব সমস্যা দেখা দিয়েছে। অথচ তরুণ মুসলমান যুবকেরা যখন অগ্রগতির স্বপ্নে বিশ্বের অন্য দিকে তাকায়, তখনই তাদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়, পশ্চিমী সভ্যতার বর্বরতা এবং সকল সামাজিক দুর্দশার কাহিনী। য়ুরোপ এখন ঘৃণ্য। কারণ, পশ্চিমী সভ্যতায় শোষণ, যুদ্ধ, দুর্নীতি, বেকার সমস্যা, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি অনাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ যে তার মূল উৎস, তার সুষ্ঠু বিশ্লেষণ কেউ করতে রাজী নয়। কারণ, সে বিশ্লেষণে মুসলমান রাষ্ট্রও ধরা পড়ে যাবে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে পূর্বোক্ত প্রবণতার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মেলে শুধু এই উপ-মহাদেশের চিন্তাবিদদের মধ্যে নয়, পৃথিবীর মুসলমান রাষ্ট্রের সমাজসংস্কারক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি একই জালে জড়িত।

তাছাড়া, আরো কতগুলো প্রবণতা সহজে চোখে পড়ত। বলা হতো, ইসলামী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ থাকতে পারে না। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ উপনিবেশ পত্তন ও লুণ্ঠন শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, ধন-সঞ্চয় ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোয় বিকশিত হওয়াই অসম্ভব। কথাটা পরবর্তীকালে মিথ্যা প্রমাণিত। পাকিস্তান রাষ্ট্র তো জলজ্যান্ত উদাহরণ সামনে রয়েছে। সেখানে উপনিবেশবাদও অনুপস্থিত নয়। ধনসম্পদে শক্তিশালী পাঞ্জাবীরা সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর সব রকম শোষণই চালিয়ে যাচ্ছে অতি নির্মম কায়দায়। মিশর, ইরান, তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহীগুলো খুব আদর্শ রাষ্ট্র নয় পূর্বোক্ত অনাচারের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই সব অনাচারের উৎস বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী শৃঙ্খল। সেদিকে উদারপন্থী ইসলামী চিন্তানায়কদের চোখই যায় না। সেই জন্যে অনাচারের বিরোধিতার নামে তারা বরং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ওকালতি করে বসেন সজ্ঞানে অথবা নির্জ্ঞানে।

বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্রে পুঁজিবাদ এখনও পূর্ণ বিকশিত নয়। ফলে, য়ুরোপ আমেরিকার মতো দেশে সহজ দৃষ্ট পুঁজিবাদী বিভীষিকাগুলো এখনও তেমন জানান দিতে অক্ষম। সমাজে শ্রেণী-বিভাগ এখনও য়ুরোপের মত কড়া ফ্রেমে আঁটা নয়। মুসলমান রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক অনেক অনাচার নেই, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক জুলুম দূর হয়নি। আধুনিকতায় য়ুরোপীয় এবং মুসলমান রাষ্ট্রের বয়সের ফরাক আছে। সেই জন্যে মুসলমান চিন্তাবিদগণ মনে করে, ইসলামী ও ধনতান্ত্রিক সমাজ একই বিবর্তনের দুই স্তর নয়– বরং একে অপরের বিকল্প।

ইসলাম এবং পুঁজিবাদের মধ্যে ফারাক দেখানোর জন্য কয়েকটি ইসলামী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। যথা, যাকাৎ, মিরাস (উত্তরাধিকার আইন), রিবা বা সুদ।

বিত্তহীনদের কল্যাণে সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ ২% বাধ্যতামূলক দান। যে-কোন আধুনিক রাষ্ট্র শতকরা ১০–১২ ভাগ ট্যাক্স নেয়। তাছাড়া কল্যাণ-রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে (যথা, ইংল্যান্ড) পুওর রিলিফ (দরিদ্রদের সাহায্য) দেওয়া হয় শতকরা ৭। সুয়েজ ক্যানেল নিয়ে ১৯৫৬ সনে মিশর-ইংল্যান্ড যুদ্ধের সময় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এ্যান্থনী ইডেন পার্লামেন্টে খোলাখুলি বললেন যে মিশরের ওই খালের উপর আমাদের কর্তৃত্ব চলে গেলে আমরা যে 'পুওর রিলিফ' দিই শতকরা সাত তা আর দিতে পারব না। কৃষিসমাজে খয়রাৎ দিয়ে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে সেভাবে দারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব। মিশর, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে কোথাও এই ট্যাক্স চালু নেই। ইংল্যান্ড তো কল্যাণ-রাষ্ট্র। সেখানে বেকার নাগরিককে যে সরকারী ভাতা দিতে হয় তা শতকরা আড়াইয়ের ঢের বেশি। কালের বিবর্তন, এমনই সব সমস্যার জনক। এক যুগে অসুখ-বিসুখে পানি-পড়াই সম্বল ছিল। কিন্তু তা দিয়ে দেশের মানুষের আয়ুর গড় বাড়ানো সম্ভব হয়নি– বর্তমানে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে যা সম্ভবপর। তাই য়ুরোপের অধিবাসী গড়ে শতকরা ৭০ বছর আয়ুর অধিকারী। নরওয়ে সুইডেনের গড় ৯০, রাশিয়া ৮১। আর আমরা গড়ে পঞ্চাশও পেরোতে অক্ষম। ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। আয়ু নির্ভর করে আহার, বিশ্রাম, বাসস্থান, স্বাস্থ্যবিধি, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদির উপর।

বলা হয়, মিরাস বা ইসলামী উত্তরাধিকার আইন থাকার জন্য সম্পত্তি ভাগ বা বণ্টন হয়ে যাবে। ফলে, সঞ্চয়-প্রবৃত্তির অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে সমাজ। অর্থাৎ মুসলমান সমাজ। এখানে লক্ষণীয়, এক যুগের কার্যকর নীতি কীভাবে অচল হয়ে পড়ে। অথবা, চালু রাখলেও তার বাস্তবায়ন আর যথাযথ সম্ভব নয়। কৃষিসমাজে জমি ভাগ হয়ে গেলে কারো হাতে বেশি সম্পত্তি থাকবে না। কিন্তু বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে একটা করপোরেশান, কোম্পানী পেট্রোল, লোহা গ্যাসের খনি কি কলকারখানা তো এমনভাবে ভাগ হতে পারে না। আর যদি হয়ও তখন এক-এক জনের ভাগে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ জমে যে তা দিয়ে শোষণের পথ নিষ্কণ্টক রাখা দায়। ১৯৬০ সনের দিকে একবার কৌতূহলবশত বিখ্যাত "জেনারেল মটোরস,"-এর বছরের লেনদেনের হিসাব দেখেছিলাম পাকিস্তানী মুদ্রায় ২৪৮ দুইশ আটচল্লিশ কোটী। এখনকার মালটিন্যাশনাল কোম্পানীদের মূলধন লেনদেন কত? নিজেদের ম্যানেজার বা ঐ জাতীয় অফিসারদের যারা মাসে দশ-বিশ লাখ টাকা বেতন দেয়, তাদের মূলধনের হিসাব না নিতে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তা ভাগ হলেও তো লক্ষ লক্ষ টাকা শেয়ারে যাবে। আমাদের মত গরীব দেশে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করাও কঠিন। মার্কিন দুঁপো, ফোর্ড প্রভৃতি ধনকুবের ও তাদের সম্পদের পরিমাণ কৃষিসমাজের যুগের মহাপুরুষদের সম্মুখে থাকার কথা নয়। তবে একটি জিনিস ছিল– যা শাশ্বত চিরন্তন। তা হচ্ছে, মানব-কল্যাণ। সেই স্পিরিট মর্মশক্তি বজায় রেখেই বর্তমান যুগের সামাজিক সকল অশুভ, যথা, দারিদ্র্য, জুলুম, অপমৃত্যু প্রভৃতির মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু শোষক এবং তাদের নফর-জন; যারা ধর্মের রক্ষক সেজে বসে আছে, তারাই আদর্শের নামে কায়েমী স্বার্থ বজায়ের বরকন্দাজে পরিণত। তাদের হাতে অবিশ্যি অস্ত্র থাকে না। কিন্তু অস্ত্রধারীদের তারা পরম দোসর।

আরো স্মরণ রাখা দরকার, যন্ত্রযুগে জমির ভাগ খুব বেশি হলে Fregmantation বা খণ্ডীকরণের সূত্রপাত ঘটে। ফলে, উত্তম চাষের জন্যে জমি অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের জন্যে আর কোন বাক্যব্যয় অনর্থক।

বর্তমানে সুদের অন্য নামকরণ ঘটেছে : মুনাফা।

সব ধর্মেই সুদের উপর কড়া অভিসম্পাত আছে। দুঃখ-দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে মানুষ শুধু আহার-গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সুদে টাকা ধার করত। মূল কথা : Consumption বা খাদন। কিন্তু বর্তমানে কোন কোম্পানী কি করপোরেশান তো Production উৎপাদনের জন্য ঋণ করে। সেখানে ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের প্রশ্ন ওঠে না। এমন ক্ষেত্রে সুদের উপর দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বদলানো উচিত।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক চালু হয়েছে। তারা সুদ নয়, মুনাফা প্রদান করে। কিন্তু তাদের প্রণালী-প্রক্রিয়া (Method and Process) যে-কোন কমার্শিয়াল ব্যাংকের অনুরূপ। এই ইসলামী ব্যাংকও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে Scheduled তফশীলভুক্ত। যদি ব্যাংক হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন আমানতকারী, ডিপজিটারদের টাকার জন্যে কে জামীন থাকবে? তেমন প্রহরীর কাজও করে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। আমানতকারী যদি জানে যে তার আমানতের নিরাপত্তা নেই, সে কী কেবল ইসলামী জোসে ওই ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখতে যাবে? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, যদি ঢাকার ইসলামী ব্যাংক ঘোষণা করে যে আমানতের টাকার কোন দায়িত্ব তারা নিতে পারবেন না– তা হলে, দেখা যাক, কত জন ডিপজিটার তারা পান? বিত্তবানরাই ব্যাংকের কাছে যায়। তাদের ধর্মীয় জোস অত প্রবল হলে, কেউ বিত্তবান হতে পারতেন না। তা তারাও জানেন। সম্পদ মানেই বর্তমানে বঞ্চনা।

সুদ নিয়ে বহসের অন্ত নেই। কিন্তু সমাজ-প্রক্রিয়া থেকে সুদের উৎপত্তি সেই উৎস সম্পর্কে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। মুনাফা যে সুদেরই আর এক ছদ্মবেশ বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে এবং অর্থনীতিতে তার আলোচনায় স্তব্ধতা পরিলক্ষিত। এক শ্রেণীর লোক আর এক শ্রেণীর ঘাড়ে চেপে মুনাফা করুক- সে ব্যাপারে সমর্থন তাদের চুপচাপ-ভাব থেকেই ধরা যায়।

আমাদের এই কওমী ভায়েরা বুঝতেই পারেন না, 'সুদ হারাম' এই নির্দেশের উপর গুরুত্ব দিলে সমস্ত জমির খাজনা, জমিদারী পর্যন্ত বন্ধ করে জমির ন্যাশনালাইজেশান জাতীয়করণের পথ একদম পরিষ্কার রাখা দরকার। সুদ হারাম করার মূলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং খ্রিস্টান ধর্ম যাজকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল (যখন লেনদেন ব্যক্তিগত– কর্পোরেশন, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর মত অ-ব্যক্তি non-personal নয়) এক জনের উদ্বৃত্ত জমি আছে, আর একজন জমিহীন। যার জমি আছে, তার প্রয়োজন মিটিয়ে আরো জমি বাকী থাকে। এমন ক্ষেত্রে আর একজনকে জমি না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং বিচার সঙ্গত নয়। এমন জমির জন্যে সে যদি আরো কিছু চায়– খাজনা বাবদ–তা-ও অন্যায়। সুদ তো আর কিছু নয় উদ্বৃত্ত পুঁজি, জমি বা এই জাতীয় উৎস থেকে আয় আহরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যোসালিজম, সমাজতন্ত্রবাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের সেই স্বপ্নকেই আজ বাস্তব রূপ প্রদানে ব্রতী। কোন মানবপ্রেমিক ধর্মভীরু ব্যক্তির পক্ষে তা উপলব্ধি আদৌ কঠিন হওয়া উচিত নয়।

৬

গোড়া থেকেই বিশ শতকের প্রথম দশক রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলন-মন্থিত। ১৯০৫ সনে বঙ্গদেশ বিভাগের সময় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিমাপ করা যায়, যদিও এই আন্দোলনের পুরোধা হিন্দু মধ্যবিত্ত। কিন্তু মুসলমানেরা একদম অনুপস্থিত ছিল না। কয়েক বছর পরে ১৯১৪ সনে য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। বিদেশী মাল আমদানী কমে যায়। সেই ফাঁকে দেশী বুর্জোয়াদের শিল্প ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি ঘটে। স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা আরো অনুভূত হয়। তৎপূর্বে বল্কান যুদ্ধ, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ। মুসলমান খলিফা তুরস্কের। খেলাফৎ আন্দোলন তারই সমর্থনে দানা বাঁধলেও যেহেতু তুরস্কের দুশমন ব্রিটেন এবং ব্রিটেন ভারতের প্রভু, মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধিতা আর পিছিয়ে থাকেনি। কংগ্রেস-খেলাফৎ ঐক্য জোরদার হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ প্রখর হয়ে ওঠে।

এই সব রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে মুসলিম মানসের একটা স্বরূপ আবিষ্কার সহজ। মনে রাখা উচিত, ধর্মই এমন ক্ষেত্রে একা সর্বেসর্বা নয়। সামাজিক অন্যান্য ফোর্সও হিসেবে ধরা একান্ত আবশ্যক। কারণ সেই সব ফোর্স আবার ধর্মের অভিঘাত নিরূপণ করে।

স্বাধীনাতার আহ্বান চতুর্দিকে এই সময় নানাভাবে প্রতিধ্বনিত। কর্মচাঞ্চল্যের স্পৃহা স্বাভাবিক। গতিশীল জীবন-সমৃদ্ধির হাতছানি এমনকালেই তো দেখা দেয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ব্রিটিশ-বন্দনায় মত্ত ছিলেন। তাঁর মানসের স্বরূপ পূর্বে বর্ণিত। ১৮৯৭ সনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তার পর আরো দুই দশক অতিবাহিত। ইতিমধ্যে পৃথিবী তো বসে নেই। সমাজের আভ্যন্তরীণ গ্যাস স্বধর্মে মোতায়েন। তার নিষ্কাশনের পথ অবিশ্যি প্রয়োজন। এখানে নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে গীত সঙ্গীত কেউ কানে জায়গা দিতে রাজী নয়। প্রয়োজন কর্মচাঞ্চল্য এবং জীবন-ঐশ্বর্যের বেগবান অর্কেস্ট্রা।

বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতার বিবরণ এখানে আলোচ্য নয়। শুধু এইটুকু বলা যায়, অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান অপেক্ষা তারা অনেক পশ্চাৎপদ। তাই তাদের ইমাম স্বদেশে তৈরি হয় না। এমন কী পীর যদি জেনপুর কি পেশোয়ার থেকে আসে, তার কদর অনেক বেশি। পশ্চাৎপদতা এবং হীনমন্যতা সমান্তরাল চলে। বিংশ শতাব্দীর দশকে যে নকীবের প্রয়োজন ছিল অবিভক্ত ভারতে বাঙালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান তা নিজ জন্মভূমির মধ্যে পায় না। তিনি আগত হন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে। তাঁর নাম: মোহাম্মদ ইকবাল।

তিনি য়ুরোপে গিয়েছিলেন ঠিক স্বদেশী আন্দোলনের বছর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এবং ফিরে আসেন তিন বছর পর। স্বচক্ষে তিনি পৃথিবীর আর এক অংশ দেখে এসেছেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ। যৌবন ঝলকিত দেহ, টগবগে মন। তা-ও দর্শন অনুরঞ্জিত। ফিলজফির ডক্টরেট করে এসেছেন 'পারসিক মরমীবাদ'—এর উপর। য়ুরোপ যেন আর এক পৃথিবী। তার নাগরিকগণ আর এক গ্রহের জীব। প্রকৃতির সঙ্গে তারা বুঝাপড়া করে প্রতিদিন এবং জয়ী তারা। সভ্যতার ঐশ্বর্য তাদের কর্মময়তার ফল। সেই সঙ্গে স্বদেশের তুলনায় মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। স্যার সৈয়দ আহমদের নিকট দেশবাসী "dirty animal নোংরা জানোয়ার" মনে হয়েছিল। ইকবালের রচনায় তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলন অনেকখানি দানা-বাঁধা। তা আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে বৈকি প্রত্যেক ভারতীয়দের বুকে। ইকবাল দেখিয়েছেন বৈকি সেই তুলনায় এদেশবাসী অলস, কর্মবিমুখ পারলৌকিকতার ঝিমধরা মৌতাতে বুঁদ।

"হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনখানে।" ভারতবর্ষময় তখন ধ্বনিত স্বাধীনতার সেরেনাদ। রবীন্দ্রনাথ এই সময় "বলাকা"র মত কবিতা লিখেছেন—যার দর্শনসূত্র সৃষ্টিশীল গতিময়তা। ফরাসী দার্শনিক বের্গসর creative evolution সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদের সঙ্গে দর্শনের ছাত্র হিসেবে ইকবাল নিশ্চয় পরিচিত ছিলেন। মধ্যবিত্ত ভারতীয় মুসলমান তাদের চলা পথে কুচকাওয়াজ গানের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। মোহাম্মদ ইকবাল সেই অভাব পূরণ করেন। স্যার সৈয়দের কর্মচাঞ্চল্য প্রচুর ছিল গণ্ডীর মধ্যে থেকে। গণ্ডী-ভাঙা কর্মচাঞ্চল্য আরো তাগদ এবং আভ্যন্তরীণ প্রেরণার দাবীদার। উজ্জীবনের বাণী পরিবেশন করলেন মোহাম্মদ ইকবাল— যিনি পেশায় ব্যারিস্টার। কিন্তু তাঁর মূল নেশা তো বাক-দেবীর রূপময় প্রতিমা। বাঙালি মুসলমানদের আরো সাত আট বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাদের নিজস্ব ভাষার মাদকতা পরিবেশক মধ্যপাচ্য ফেরৎ এক বাউন্ডেলে চারণের জন্য, যিনি পেশায় সৈনিক : হাবিলদার। তাঁর কথা আরো পরে।

ইকবাল স্বদেশের, আরো বিশেষ করে বলা যায় মুসলমানদের স্থান, কর্মবিমুখ, উদ্যোগ শূন্য ধর্মনীতির জায়গায় নতুন কর্মপ্রেরণা মুখর নীতিশাস্ত্র খাড়া করেন :

নাসিকা, হস্ত, মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং কর্ণ
উপলব্ধি করছিল নিজকে
অন্তর বিদীর্ণ-পূর্বক বাইরে এসে
নতুন রূপে বিকশিত।
চিন্তা কল্পনা ভাব স্মৃতি এবং বোধ
সব কিছুই জীবনের আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতিয়ার আত্মসংরক্ষণ-কল্পে
আপন বিশ্রামহীন সংগ্রামে।

এই বিরামহীন সংগ্রামই জীবন। সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টিশীল বিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। ধর্ম অর্থ নিষ্ক্রিয় আত্মসর্মপণ নয়। ইকবালের ইসলাম পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণ দৈবী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ নয়, বরং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম। আদিম যুগে প্রকৃতির মুখোমুখি মানুষের কোন স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা এসেছেন প্রকৃতির প্রতীক রূপে। ইকবাল স্বচক্ষে য়ুরোপ দেখেছিলেন। বিজ্ঞান মানব জীবনে কী বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা ডেকে আনে, তাও দেখেছিলেন বৈকি। বিজ্ঞান তো প্রকৃতিকে জানা ; প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামজাত জ্ঞান-সমষ্টি। সুতরাং ইকবালের কাম্য, প্রকৃতির বিরুদ্ধে দেশবাসী সংগ্রামশীল হোক। ধ্রুপদী ইসলামে তা সম্ভব নয়। তিনি প্রাচীন সুফী দরবেশদের সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে ওরা গ্রীক এবং পারসীক প্রভাবে সংসার-বিরাগী, পারলৌকিকতার আফিম-ব্যবসায়ী। তা প্রকৃত ইসলাম নয়। এমন ধর্মীয় দর্শন-প্রচারের জন্যে আত্মা ও দেহ বা জড়ের দ্বৈতবাদ অচল। ইকবাল লিখলেন–

দেহ ও মন আলাদা– এ শুধু কথার কথা
দেহ এবং মন কে আলাদা করে দেখা পাপ।
– জবুর-ই-আজম।

আল্লা অপার্থিব নন, তিনি ইহজগতের।
আমরা খোদার কাছে থেকে সরে রয়েছি
তিনি আমাদের খোঁজে বেরিয়েছেন।
আমাদের মত তিনি বিনয়ী এবং নিজ ইচ্ছার কয়েদী।
তিনি আছেন প্রতি অণু-পরমাণু বুকে, তবু তিনি
আমাদের অচেনা।
চাঁদের আলোয় তিনি বিকশিত হন।
–জবুর-ই-আজম

ইসলামী চিন্তাধারায় আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা– এই ইহলৌকিকীকরণ সম্পূর্ণ অভিনব এবং রীতিমত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আল্লাহ সপ্তম আকাশে অধিষ্ঠিত নন। তিনি transcendental স্বাতিক্রমণী আল্লাহ নহেন, তিনি স্বয়ম্ভু বা (Instrumental) আধুনিক বিশ্বজয়ে আগুয়ান অভিজাত সমাজ। তারা কলকারখানা চালাতে চায়– এক কথায়, তারা জীবনের সকল আস্বাদকামী, তাদের স্রষ্টাও সেইভাবে বিবর্তিত। ইকবালের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা কম ছিল না। কিন্তু নতুন প্রগতিশীল অভিজাত মণ্ডলী ইকবালের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র কে খুঁজে পায়– যে কবি কোরান থেকে ও উদ্ধৃতিদানে তৎপর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি ব্যতীত উহাদিগের কোন অভিভাবক নাই।

– *কোরান : ১৩ : ১১*

[ইসলামিক ফাউন্ডেশান প্রকাশিত কুরানুল করীমের তর্জমা]

সৃষ্টিশীল, বিবর্তনবাদী স্বয়ম্ভু আল্লাহ। ইসলামের চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব। এথিকস— নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কবি অদ্ভুতভাবে প্রগতিশীল। ইকবাল দর্শনের ছাত্র ছিলেন কি, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী। প্লেটো-সক্রেটিশের সেই ধাঁধাঁময় প্রশ্ন নিশ্চয় জানতেন। রিপাবি-ক গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা। সক্রেটিশ একদিন প্রশ্ন তুললেন, Whether an act is right because god wills it or god wills it because it is right? অর্থাৎ, একটি কাজ আল্লাহর নির্দেশ বলেই সঠিক অথবা সঠিক বলেই তা আল্লাহর নির্দেশ। প্রথম ক্ষেত্রে নৈতিকতা উড়ে যায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্রষ্টা আর সর্বশক্তিমান থাকেন না। ইকবাল গতানুগতিক নীতিশাস্ত্রের দুর্বলতা বুঝতেন। এই জন্যে তিনি বলছেন, That which fortifies personality is good than that which weakens it যা ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে তার চেয়ে যা ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে তা ভাল।

– আসরার-ই-খুদী গ্রন্থের ভূমিকা

AMARBOI.COM

এই নীতিশাস্ত্র সম্পূর্ণ কর্মময়তার ছবি। সামন্ততান্ত্রিক মৌতাত থেকে বুর্জোয়ারা মুক্তিপ্রার্থী। তাই প্রাচীন চিন্তা তার কাছে পরিত্যক্ত। তাদের কবিও হাঁক দিয়ে ওঠেন–

জাগ্রত হও সৃষ্টি কর নতুন জগৎ
আবৃত করো আপনাকে অগ্নিশিখায়
ইব্রাহিমের মতো।
দুনিয়ার সাথে-সাথে তাল রেখে চলো।
যে ভালবাসে না তোমার দৃঢ় বাসনাকে
তাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও দূরে
সমর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বর্মের অনুরূপ।
সবল চরিত্র মানব–
সে মনিব তার নিজের,
সে লাভ করে সৌভাগ্য সংখ্যাহীন।
পৃথিবী যদি তার অভিলাষ মেনে না নেয়
সে পরীক্ষা করবে রণক্ষেত্রের দুর্ঘটনাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জান্নাতের সঙ্গে
খুঁড়ে ফেলবে এই দুনিয়ার ভিত্তিমূল এবং তার অণু পরমাণু
যোজনা করবে নতুন সৃষ্টির মধ্যে।

অত্যন্ত সাবলীল জোরদার ভাষায় ছড়িয়ে দিলেন তাঁর বাণী-ভাণ্ডার দেশ যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মহৎ কাব্য এমনই Illusion and Reality— মায়া এবং সত্তার ছায়াপথ-রচনা।

বিজ্ঞান বুর্জোয়াদের বিশ্ব-জয়ের হাতিয়ার। স্যার সৈয়দ প্রথমে বিজ্ঞানের স্বীকৃতির পথ সহজ করে দিয়েছিলেন, ইকবাল সহজতর—

বিজ্ঞান আনিয়া দেয় দীপ্তিকণা মানুষের মন
নির্বান মনের কোণে শিল্প রচে বাক্যের বাঁধুনি
শিল্প আর বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আমি জীবনের পদধ্বনি শুনি।

– তর্জমা : সৈয়দ আলী আহসান

শুধু সহজতর নয়, বুর্জোয়া সমাজ গঠনের জন্যে যে কর্মচাঞ্চল্য, গতিশীলতা আবশ্যক, ইকবাল তার ফিলজফিও পরিবেশন করেন। Action and Rapidity কর্মময়তা এবং ত্বরান্বিত গতিই জীবন। সেই হেতু—

আপনে দেবমূর্তি সম্মুখে জাগরিত-চিত্ত কাফের
মসজিদে ঘুমন্ত পরহেজগার মানুষের চেয়ে বেহতের।

– অনুবাদ আমার : জাবিদ-নামা

বেহতের অর্থাৎ আরো ভালো।

সৃজনশীল প্রেম, উৎসাহ-উদ্যাম এবং সৃষ্টিসুখের উল্লাস ব্যতিরেকে এই মানব-জন্ম বৃথা। কবি বলছেন—

শরীয়তের খুঁটিনাটি আইন ও ব্যাখ্যা
আমার জানা নেই ঠিক ;
একটি বিধান ছাড়া : প্রেম ও আবেগ যে অস্বীকার করে
সে কাফের এবং নাস্তিক।

– আমার অনুবাদ : জবুর-ই-আজম

পুনরুক্তি, তবু আবার বলতে হয়, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা স্থানু। তার ধর্ম এবং নৈতিকতা স্থানু। সেই জায়গায় ইকবাল কর্মমুখর জীবন্ত ধর্মের জয়গান করেছিলেন— মুসলমান বুর্জোয়া মধ্যবিত্তদের যার তখন আবশ্যক ছিল প্রচণ্ড মাত্রায়।

কর্মচাঞ্চল্যে জয়গানে কবি পঞ্চমুখেরও অধিক—

হে নাদান দরবেশ, তুমি কী জানো, মাত্র
হৃদয়ের উন্মাদনা-জাত একটি ভুল
শত সেজদার ঈর্ষার পাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– আমার তর্জমা : বাং-ই-দরা

ইকবাল তাঁর রচনায় এক জায়গায় বলেছেন, ইসলামে সুফীবাদ এবং কর্মহীনতার প্রবেশের সূত্র– গ্রীক এবং হেলেনিক দর্শন। সেই হেতু আব্বাসীর খলিফাদের মহান ঐশ্বর্যদীপ্ত যুগের পর ইসলামের অবক্ষয় শুরু হয়।

অবিশ্যি এই বিশ্লেষণ ভুল। তিনি লক্ষণকে হেতু ঠাউরেছেন। ফলকে ঠাউরেছেন কারণ। স্থানু কর্মপ্রেরণাহীন ধর্ম সামাজিক অধঃপতনের ফল। হেতু নয়। যখন সমাজ সত্যি-সত্যিই তার কর্মমুখর সৃজনীশক্তি হারিয়ে ফলে তখন তার আদর্শ আর কোথাও রক্ষিত হয়। অন্তত পৃথিবীতে নয়। কোন দেশে যখন ন্যূনতম বিচার, সৌন্দর্যপূজা, সদাশয়তা বা সততা মানুষ খুঁজে পায় না, তখনই সমাজের বাইরে, অন্য কোন লোকে তার অনুসন্ধান শুরু হয়। এইভাবে যুগ যুগ ধর্ম মানবিক শ্রেয়বোধ Values কে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে। কিন্তু যখন সত্যই সেই শ্রেয়-শ্রেয়বোধ সমাজে লভ্য, তখনও তা বাইরে খোঁজা রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে ইকবাল ছিলেন অতি সৎ এবং সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দয়া ছিল অপরিসীম। এই মানব-প্রেমের টানেই তিনি পুঁজিবাদের বিভীষিকার প্রতি বরদোয়া— অভিশাপ হেনেছেন ঋষি-দরবেশের মত। তাঁর আসরার-ই-খুদী গ্রন্থে সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে দরবেশ মীর ওয়ালীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

অপরের অন্নের উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ
তার ক্ষুধার আগুন গ্রাস করেছে বিশাল পৃথিবী
তার তলওয়ার টেনে এনেছে দুর্ভিক্ষ মহামারী ফসলশূন্য বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড।
তার দারিদ্র্যের জন্য চতুর্দিকে মানুষ আহাজারী-রত।
তার আত্মপ্রবঞ্চনা, নির্বুদ্ধিতা এবং দস্যুবৃত্তির খেতাব হচ্ছে সাম্রাজ্য।

....

কেউ যদি তলওয়ার ধরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে
সেই তলওয়ার বিদ্ধ হবে তার নিজ-বুকে।

কবি আরো অন্যত্র বলেছেন–

পুঁজিবাদীরা শ্রমিকের রক্ত থেকে বের করে স্বচ্ছ মণি।
জমিদারের জুলুম গ্রামবাসীর ক্ষেত ধ্বংস করে
– তাই তো বিপ্লব আসে।

ইকবালের এমন বহু উক্তি আছে যা থেকে তাঁর মানস-জগতের পরিচয় সহজে মেলে। ব্যক্তিমানুষের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি। তাঁর মানবপ্রেমের আবেগ অকৃত্রিম।

কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ Individualism আবার ব্যক্তি মানুষ নিধনেরও পথ। ইংরেজ কবি বাকার তিরিশ দশকের দিকে মানুষের অধঃপতনে ক্ষুব্ধ চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Man is created after god's image
When you see that image
Lower than hogs and dogs
Where would we turn for consolation?

ইকবালও এমনই ব্যক্তিপ্রেমিক, ব্যক্তিপূজারী ছিলেন। তা তাঁকে ব্যক্তিত্ববাদের থিয়োরি গড়তে সাহায্য করেছিল।

তিনি বড় জোরদার তরঙ্গিত ছন্দে লিখেছেন–

খুদী কো কর বোলন্দ এৎনা কে হার তকদীর কে পহ্‌লে খোদ
খোদা বান্দা সে পুছে বাতা তেরা রেজা কিয়া?

যার অনুবাদ দেওয়া গেল অক্ষম গদ্যে–

তোমার ব্যক্তিত্বকে এমন বুলন্দ্ করো যে ভাগ্যলিপির পূর্বেই খোদা
বান্দাকে যেন জিজ্ঞেস করে, তোমার বাঞ্ছা কী, বলো?

কবি ইকবালের দর্শনের দুর্বলতাও কিন্তু এই এইখানে নিহিত।

তিনি ব্যক্তি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু সমাজ তাঁর উৎস-বিন্দু ফোকাসের মধ্যে ঠিকমত ধরা পড়ত না। বৃক্ষে নিবদ্ধ দৃষ্টিপথে অরণ্যের প্রতিবিম্ব দূরেই থেকে যায়।

ইকবাল মূলত কবি, সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না। কিন্তু দর্শনের ডক্টরেট ডিগ্রীধারী হয়েও যে কেন সমাজের সমষ্টিগত রূপ-উদ্ঘাটনে তিনি সক্ষম হননি তা রীতিমত বুঝে ওঠা দায়। সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। তা কবি আর উপলব্ধি করেননি। রাজনৈতিক আবহাওয়া হয়ত তাঁকে ক্রমশ বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে ঠেলে দিয়েছিল। লাক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ব্যর্থতার পর 'ফ্যাসট্রেশান' নিষ্ফলতাবোধ হয়ত কবিকে এমন অবস্থান নিতে বাধ্য করে। সকল প্রগতিমূলক আন্দোলন ইকবালে উপহাসের টার্গেট হয়ে বসে। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের আরাধ্য হয়ে ওঠেন। তাঁর উক্তি তাদেরই কাজে লাগে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজের স্যার-উপাধিতে ভূষিত হন, রবীন্দ্রনাথ যা তিন বছর পূর্বে জালিওয়ান-ওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের পর পরিত্যাগ করেন। জালিওয়ানওয়ালা তো ইকবালের উঠানে অবস্থিত, বলা চলে।

দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদী (Idealist) কবি। তৎপ্রসূত স্ববিরোধ তাঁর চিন্তায় পরিস্ফূট সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই।

ব্যক্তির বিকাশের জন্যই ধনতান্ত্রিক অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পৃথিবীর সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু কবি মনে করতেন, সমাজতন্ত্র খাওয়া-পরার মত জড়-ব্যাপার। জাবিদনামা গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, সমাজতন্ত্র শুধু জঠর নিয়ে পড়ে আছে।

দর্শনের ছাত্র হয়েও তিনি দ্বৈত জড়বাদীদের মত Matter and spirit-কে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছিলেন। অথচ মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় এই বিভেদ অস্বীকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের অর্থনৈতিক জটিলতাটুকু বুঝতে না পেরে তিনি মনে করেছেন, সোস্যালিজম এক রকমের জড় উপাসক। পশ্চিমী পুঁজিবাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু প্রতীচ্যের সমাজব্যবস্থা তিনি তলিয়ে দেখেননি। ধনতন্ত্রবাদের মধ্যেও প্রগতিমূলক স্তর থাকতে পারে, তা তিনি জানতেন না। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান হয়ত কিছু ছিল তা নেহাৎ ভাসা-ভাসা। তাই মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মত জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন–

তুর্কী যন্ত্র থেকে বেরোয় না
আর নতুন সুর।
য়ুরোপের সাবেক, তার নয়া–
পার্থক্য এত দূর।

নীৎসে মুসোলিনী, হিটলার মার্কস্–সকলকে ইকবাল এক পর্যায়ে মুড়িঘণ্ট করে ফেলেন। ১৯৩২ সনে মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর মুলাকাত ঘটে। এমন খুদী (ব্যক্তিত্ব) যে সমস্ত দেশবাসীর পূজ্য এবং পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়ে এতদূর অগ্রসর, তার কবির প্রশংসা পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুসোলিনী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের পর তিনি লেখেন–

গলিত কঙ্কাল নিয়ে চলেছে যে ভাগের উৎসব
কোন সর্বনাশ ধরে আবিসিনিয়ার শব
জানে না কি বিষেভরা য়ুরোপের শকুনীরা সব।
যেখানে দেশের পর দেশ বাঁচে এই দুনিয়ায়
লুট-তরাজের পর, বিকাশের শিখর-চূড়ায়
যখন সভ্যতা উঠে আসে, নীতিজ্ঞান লোপ পায়
নিরীহ মেষের খোঁজে ঘোরে ফেরে নেকড়ের বহর।

– তর্জমা : আবুল হোসেন

অবিশ্যি ফ্যাসিস্ট নেতাদেরও রবীন্দ্রনাথ ঠিকমত শনাক্ত করতে পারেননি। তিনিও মুসোলিনীর প্রশংসায় দু-চার কথা লিখে ফেলেছিলেন। পরে রমা বোলাঁর পত্রে কবির চৈতন্যোদয় ঘটে।

ইকবাল আরো লিখেছেন, In Germany Hitler has created a new era". রাজনৈতিক পটভূমি উপলব্ধি কবির ধাতে ছিল না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেনিনকে দোজখবাসী কাইজারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি রুশ নেতাকে মহামানবের শিরোপা পরিয়েছেন।

ইকবালের চিন্তাবলী কোন শৃঙ্খলা বা প্রণালীর ধার ধারত না, বেশ বুঝা যায়। উপনিবেশ দেশের উপর য়ুরোপের জুলুম কবিকে আদৌ সোয়াস্তি দেয়নি। কিন্তু তাদের বর্বর আচরণ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রসূত তা তাঁর চোখ থেকে দূরে সরে ছিল। তিনি রূপকের ছায়ায় বলা যায়, খুব মজবুত, সুন্দর টুকরো টুকরো সুতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটেছেন, কিন্তু পুরো কাপড়-বোনার দক্ষতা তাঁর ছিল না।

বুর্জোয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা এইভাবে চোরাবালু পথে আটকা পড়েন। কোন ইংরেজ লেখকের ভাষায় তাঁরা যেন খাঁচার ভেতর কর্মপ্রাণ, ঘুরপাকরত চঞ্চল কাঠবিড়ালীর মত সদা মুক্তি-পাগল, কিন্তু বহির্গমনের পথ সম্পর্কে দিশাহীন।

ভাববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ইকবালের চিন্তাধারার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। একটি ব্যাপার তো কারো চোখ এড়ানো উচিত নয়।

মুসলমান বললে তিনি বুঝতেন, ঈমানদার, দেশপ্রেমিক, মানবতার কল্যাণকামী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী, ইত্যাদি গুণ-বিভূষিত ব্যক্তি। কবির সংজ্ঞা জালে পৃথিবীর তাবৎ মানবপ্রেমিক বহু খ্রীস্টান, হিন্দু, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী– এমন কী নাস্তিক, সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিস্টগণ পর্যন্ত আটকা পড়ে যাবে।

কিন্তু যখনই রাজনৈতিক প্রশ্ন পড়েছে তিনি মুসলমান বললে বুঝতেন, মুসলমান পিতার ঔরসজাত (মা হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যা খুশী হোক, আপত্তি নেই) কোন সন্তান– ঠিক সরকারি খতিয়ানে যা ধরা হয়। পাকিস্তান আন্দোলনে তার সমর্থন এইখানে নিহিত। বাস্তবের নির্মম পটে ভাববাদীদের এমনই দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯৩০ সনে ইকবাল গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি প্রথম দিকে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন না। কারণ কংগ্রেসকে হিন্দু ফিউডাল শ্রেণীরা সমর্থন দেয়। অথচ মুসলিম লীগে রাজা অফ মাহমুদাবাদ কেন, বহু খান তো ফিউডাল শ্রেণীর প্রতিভূ। তারা মুসলমান যেমন হায়দারাবাদের তদানীন্তন নিজাম মুসলমান, আগা খান মুসলমান। সুতরাং ফিউডাল শোষণের উর্ধ্বে তাদের অবস্থান। ইকবাল এক প্রবন্ধে এদের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে সব মুসলমান ভাই ভাই; সুতরাং মুসলমান শোষক হতে অপারগ। এমন বালসুলভ সিদ্ধান্ত দার্শনিক কবির কাছ থেকে অন্তত অপ্রত্যাশিত।

য়ুরোপের প্রতি তাঁর ঘৃণা স্বাভাবিক পুঁজিবাদের জন্য। কিন্তু ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করার মতো শক্তি বা ধৈর্য ছিল না ইকবালের। পশ্চিমের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তজ্জড়িত সামাজিক অনাচারের উৎস খোঁজার চেষ্টা তিনি করেননি। তার ফলে, এদেশী মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল সমাজ কবিকে তাদের মতলব সিদ্ধির চমৎকার কাজে লাগায়। বর্তমানে বাংলাদেশে নজরুলের একই দশা। আইয়ুব খানের আমল থেকে এ পর্যন্ত সরকারী কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে নজরুল মুসলমান ছিলেন– শুধু এই সরল বাক্যটুকু প্রমাণের জন্য।

ভাববাদীদের সকল স্ববিরোধ ইকবালের মধ্যে পরিস্ফুট। তিনি তাজা-ব-তাজা নতুনের গান গাইতে বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু নতুনের কোন রূপায়ণ দেখলেই তাঁর রক্তচাপ আর যথাশান্ত থাকত না। মুসলমান সমাজের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সাথে পার্থক্য চিন্তার ক্ষেত্রে। তাদের এই আচরণ একদম ধর্মবিরোধিতা রূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদিত। অথচ তাদের অপরাধ খুব বেশি মনে হয় না। আহমদীয়াদের সেটুকু বিরোধিতা বা পার্থক্য চিন্তার ক্ষেত্রে। সামাজিক ক্ষেত্রে তো এরা য়ুরোপের Masonic Brotherhood-এর অনুরূপ। স্বল্প পরিসরে অর্থনৈতিক সুখসুবিধার জন্যে তাদের এই জমায়েত। পুঁজিবাদের মর্মন্তুদ শোষণ-সমুদ্রে আহমদীয়ারা নিজ সংঘের লোকদের নিয়ে ছোটছোট দ্বীপ গড়ে তোলার কাজে রত। সেখানে প্রচণ্ড কোন অনাচারের কল্পনাও তো করা যায় না। অথচ কেবল কিছু মতবাদ বা বিশ্বাসের জন্যে বেচারারা ঘৃণিত। কবি ইকবাল পর্যন্ত ১৯৩৫ সনে সরকারের কাছে তাদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্যে আবেদন করেন। শুধু ১৯৫৩ সনে নয় (তখন পাঁচ হাজার নিহত তিন দিনে) প্রায় প্রত্যেক আহমদীয়া উচ্ছেদ দাংগায় মুসলমান নামধারী ধর্মান্ধের দল ইকবালের সেই উত্তেজক বাণী চমৎকার কাজে লাগায়। নিজের আদর্শের এই শোচনীয় পরিণতি বেঁচে থাকলে কবি দেখতে পেতেন বৈকি। আমার এখনও মনে আছে, ১৯৫৯ সনে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে কিছুদিন প্রবাস-যাপনের সময়, খয়েরপুর জেলায় এক বাড়িতে বেশ কয়েকজন আহমদীয়াকে পুড়িয়ে মারা হয়। এমন ঘটনা প্রায়শ ঘটে ওই অঞ্চলে।

এহ বাহ্য।

কবি হিসেবে নমস্য, কিন্তু চিন্তাবিদরূপে ইকবাল সম্পর্কে খুব বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। অথচ দর্শনের ডক্টরেট ডিগ্রীধারী, ব্যারিস্টার কবি তিনি।

ইকবালের আত্মবিকাশ বা খুদী তত্ত্বের প্রথম সোপান আনুগত্য। তাই তিনি বলছেন–

আইনের কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না
হাদিসের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না।

– আসরারে খুদী

ওই একই তত্ত্বের দ্বিতীয় সোপান আত্মসংযম। সেখানে কবির উপদেশ–

"তোমার পূর্ব পুরুষদের পথে এগোও
সেখানেই আছে সংঘবদ্ধতার উৎস
সামাজিক রক্ষণশীলতাই কওমের সংঘবদ্ধ হওয়ার উপায়।"

পরস্পর-বিরোধী উক্তির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সমাজ পরিবর্তন চাও, কিন্তু তুমি পরিবর্তনের কাজে এগিয়ো না। থিয়োরী এবং প্রাক্‌টিশের বুর্জোয়া স্ববিরোধিতা।

নীৎসে এবং বের্গসর ফিলজফীর কলম করা ইসলামী সংস্করণ ইকবাল দেশবাসীদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু সামাজিক পটভূমি তাঁর চোখের সামনে ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত Creative evolution সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদ– ঠিক তাঁর রপ্ত হয়নি। তিনি অমন দর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু তা ইসলামের উপর প্রযোজ্য নয়। ইসলাম এক 'চরম বিকাশ' কবির নিকট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন দোলাচল বৃত্ত পদে পদে ইকবালে দেখা যায়।

আধুনিক মানুষ সম্পর্কে তিনি লিখছেন—

"In the domain of thought he is living in open conflict with himself; in the domain of economic and political life he is living in open conflict with others. He finds himself unable to control his ruthless egoism and infinite Gold-hunger which is gradually killing all higher striving in him and bringing him nothing but life-weariness.

চিন্তার ক্ষেত্রে খোলাখুলি লড়াই নিজের সঙ্গে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিসরে একদম নগ্ন সংঘাত নিয়ে তার অন্যদের সঙ্গে বসবাস। নিজের নির্মম অস্মিতা ও অন্তহীন মুদ্রাবুভুক্ষা তার ভেতরের সকল উচ্চতর অভীপ্সা-কে ধীরে ধীরে হত্যা করছে এবং তার জন্যে বয়ে আনছে জীবন-ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু না।

-Reconstruction of Religious Thought in Islam.

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং মন্তব্য সত্যি প্রশংসনীয়। সমস্ত পরিস্থিতি তিনি কয়েকটি কথায় ছেকে তুলে আনেন।

কিন্তু এই জীবন-ক্লান্তি থেকে মুক্তির উপায় কোথায়?

কবির নিদান-শাস্ত্রে তার জবাব আছে—

"Let the individual imitate the proverbial ostrich ... Let him by rislng to fresh vision ... triumph over a society motivated by an inhuman competition and a civilizaion which has lost its spiritual unity by inner conflict."

AMARBOI.COM

প্রতিযোগিতা জর্জর এই সমাজব্যবস্থা বদলে সহযোগিতামূলক সমাজ গড়ার প্রয়োজন নেই। নতুন বিদ্যদৃষ্টি বা vision দ্বারা নতুন যুগ আসবে।

অধ্যাপক খুদা বকশ লিখেছিলেন—

"We believe ... that opinion and nothing but opinion, can affect great permanent changes."

অন্যত্র—

Hence we must combat social evils not by political action but by education."

শেষ পর্যন্ত ইকবাল মতাদর্শে বুর্জোয়াই ছিলেন। খুদা বখশের মতে, opinion দ্বারা সমাজ বদলায়। আর এক বুর্জোয়ার মতে vision ভাববাদীদের দশা শেষে এমন জায়গায়ই পৌঁছায়।

ইকবালের চিন্তাধারার আর এক হোচট-ভক্ষণ কাহিনী না বলে থাকা যায় না।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি তুরস্কের ঘোর সমর্থক ছিলেন। অথচ আরবদেশ তখন স্বাধীনতার জন্য তুর্কী সাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন করতে ব্যস্ত। ইকবাল সেদিকে লক্ষ্য রাখলেন না, প্যান-ইসলামের ধুয়ায় (নজরুল রসিকতা স্মরণীয়) ভেসে গিয়েছিলেন তিনি। ওই ধুয়ার সূত্রপাতও তুরস্ক থেকে। য়ুরোপীয় ধনতন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন মধ্যপ্রাচ্যে ঘাঁটি পাতছে। তার চাপে ওই সব দেশে তুরস্কের অধীনতা ছিন্নকল্পে স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেয়। এই কীলক প্রবেশের বিরুদ্ধে তুরস্কের ফিউডাল সুলতানেরা বিশ্ব মুসলমানের সমর্থনের আশায় ওই ভাবাদর্শ প্রচার করতে থাকে। আসল উদ্দেশ্য, ঘুণে-ধরা সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা। তাই ওই হাতিয়ার-চালনা।

বুর্জোয়া ইকবাল, কিন্তু বুর্জোয়া সম্প্রসারণের পক্ষপাতী নন তিনি। কারণ, সৃষ্টিশীল ক্রমবাদ ইসলামের উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়।

চিন্তার এমন সব দৈন্য ইকবালকে ক্রমশ স্ববিরোধিতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। য়ুরোপীয় ন্যাশনালিজ্‌ম যুদ্ধপ্রসবিনী, সুতরাং ঘৃণ্য। কিন্তু প্যান ইসলাম যে আর এক রকমের জাতীয়তাবাদ তা তিনি লক্ষ্য করলেন না।

মধ্যযুগের চিন্তানায়ক ইরাকী সম্বন্ধে ইকবাল লিখেছেন–

He was unable to see the full implication of his thought partly because he was not a mathematician and partly because of his prejudice in favour of traditional Aristotlian idea of a fixed universe." ইরাকী নিজের চিন্তার পূর্ণ প্রকাশিত অর্থ দেখতে পাননি। তার আংশিক কারণ তিনি গণিতবিদ ছিলেন না এবং অ্যারিস্টটলের জগৎ স্থির– এই চিন্তার দিকে তার বিশেষ পক্ষপাত ছিল।

ইকবাল সম্পর্কেও বলা চলে, তিনি জানতেন না সমাজতত্ত্ব এবং দ্বৈত জড়বাদের ব্যাখ্যা; তা দর্শনের ছাত্র হয়েও তাঁর বোধগম্যের বাইরে থেকে গিয়েছিল। ইকবাল হোচট খেয়েছেন প্রচুর, হাঁটতে শেখেননি।

সমাজতত্ত্বের মোটামুটি কাঠামো সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তাঁর বিশ্লেষণ ভুল। তাঁর মানব প্রেম সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা এবং ক্রোধ সঞ্চার করে, কিন্তু পরিবর্তনের পথ দেখায় না। তার বহু উদ্ধৃত কবিতার পংক্তি যে ক্ষেত থেকে কৃষকের রুটি মেলে না, তার গমের প্রতি খোসায় আগুন লাগিয়ে দাও। প্রচণ্ড ক্রোধ ঠিকই, কিন্তু জঘন্য ইকনমিকস। উৎপাদন এবং বণ্টন আসল সমস্যা। উৎপাদন ধ্বংস করা নয়।

নিজের দুই স্ত্রীকে কবি ঘোর পর্দার মধ্যে রাখতেন। তাঁর খুদী তত্ত্বের প্রয়োগ অন্দর মহলেও প্রবিষ্ট।

কবির জবানবন্দী শুনুন নারীজাতি সম্পর্কে–

সতী ফাতিমা আনুগত্যরূপ জমিনের ফসল
সতী ফাতিমা মাতৃত্বের চরম আদর্শ
গরীবের দুঃখ তাঁর হৃদয় এমন স্পর্শ করত,
নিজের চাদর তিনি বিক্রী করে দিয়েছিলেন।
দোজখ ও বেহেশতের ফেরেশতাদের যিনি হুকুম করতে পারতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাঁর ইচ্ছাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীর ইচ্ছায়।
সৌজন্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষায় তার জীবন চালিত
গম-পেষার সময় তিনি কোরান আবৃত্তি করতেন।

নারীজাতির প্রতি ইকবালের কী অগাধ সম্মান। যেমন আল্লাহর ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছায় মিশে যাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ফলে, তেমনই স্ত্রীর ইচ্ছা স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে। অর্থাৎ মেয়েরা ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মাতা জননী ইত্যাদি রূপে সম্মান পাবে– ব্যক্তি হিসেবে নয়। ইকবালের আত্মবিকাশ তত্ত্ব এমনই সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

চিন্তার পরিচ্ছন্নতার অভাবে মানবতার বন্ধু ইকবাল শেষ পর্যন্ত মানুষের শত্রুদের আত্মীয় হয়ে ওঠেন। রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিকট তাঁর আদর সত্যি বেদনাদায়ক। ইকবাল জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর আদর্শের ট্র্যাজেডি।

৭

বাংলাদেশে ইকবালের অনুপ্রবেশ ঘটে, তাঁর যৌবনের দীপ্ত, পেশল চিন্তা এবং আহ্বানের পথে নয়। বাঙালি মুসলমানের কাছে তিনি ভেসে এলেন রাজনৈতিক স্রোতে, যখন তাঁর ভাটার সময় এবং তিনি নিজ আদর্শের স্ববিরোধিতার ফসল।

এইখানে অল্প পরিসরে পটভূমি বিশদ বলা কঠিন। দু'টি দিকে আমি পাঠকের লক্ষ্য আকর্ষণ করব যদিও তা পূর্বে বিবৃত। সব আন্দোলনের শৈশব কেটে গেলেই তার গতিপথ আর সরল থাকে না, বরং কোন বেগবান নদীর মত শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত থাকে, রাজনৈতিক ভাষায় যা মৌলবাদী এবং সংশোধনবাদী নামে চিহ্নিত।

১৯২০ সনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর, দুঃখের বিষয়, দুই সম্প্রদায় আর রাজনৈতিকভাবে এক সমতলে মিলিত হয়নি। মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদের আর এক শাখায় পরিণত হলো, তা ইসলামের রঙে রঞ্জিত। তার নাম দেওয়া যায় ইসলামী জাতীয়তাবাদ। এইসব আন্দোলনের ঠিকুজী আছে। ইতিহাস-বেত্তারা তার বয়ান লিখেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, অবিভক্ত ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত প্রবল দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবীর সমর্থনে ইসলামই প্রধান বাহন। এই পথেই দ্বিজাতিতত্ত্বের আমদানী, যার মর্মার্থ, মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতি। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তা-ই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় স্বার্থভোগী শক্তি ছিল এই দেশে ব্রিটিশ। তার ভূমিকাও ছোট করে দেখা অন্যায়। তাছাড়া, আরো সোশ্যাল ফোর্স– আপন আপন শ্রেণীস্বার্থের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তৃতীয় দশক থেকেই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের গন্তব্য এক শব্দে মুসলমানের নিকট তখন ধ্বনিত পাকিস্তান চাই অর্থাৎ পবিত্র ভূমি দরকার।

এই রাজনৈতিক ঢেউয়ে ইকবাল বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে আবির্ভূত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩৮ সনে ইকবাল পৃথিবী ত্যাগ করেন। এই ভূখণ্ড হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে ভাগ হয় ১৯৪৭ সনে আগস্ট মাসে। কবির মৃত্যুর পর যে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে তা অবিশ্যি তিনি দেখে যাননি। ভাগ্যবান জন বৈকি, যেমন ভাগ্যবান জন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। পরবর্তীকালে ইতিহাসের যাত্রাপথ ওঠে নৃশংসতা বর্বরতা, রক্তস্নাত পাশবিকতার এক মহা অরণ্য। এসব তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। কবিদের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু তাদের বাণী তো থেকে যায়। ইকবাল বঙ্গদেশে ফিরে আসেন তাঁর প্যান-ইসলামের ঘোড়ায় চেপে। এদেশে কিছু কিছু কবি-লেখক তার অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করে সবই পাকিস্তান আন্দোলনের ধাক্কায়। কিন্তু শত শত শতাব্দীর গোলাম বাঙালী মুসলমান, নিজ কণ্ঠে পাঞ্জাবী পেশী কোথায় পাবে? তারা ঢাকের কাছে টিক্‌টিকি। তখনও– এই দেশে এক পেশল হাঁক-ফুঁকার ডাক দেওয়ার চারণ জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যাধি-বন্দী, অন্য জগতের বাসিন্দা। নজরুলের কথা বলছি। তিনি জীবিত থাকলেই বা কী? তিনি তখন হুজুগের ঢেউয়ের পরিত্যক্ত। তাঁকে একান্ত যদি স্মরণ করা হতো, রাজনৈতিকভাবে যতটুকু কাজে লাগে ঠিক ততটুকুই। ইকবাল এবং নজরুলের খণ্ডিত অংশই তখন তাদের ব্যবহারিক কাজের উপযোগী। ইকবালের মতো নজরুল দার্শনিক মতামতো রেখে যাননি। কিন্তু তাঁর বাণীর মধ্যে দর্শনের প্রতিধ্বনি বর্তমান। মুসলমানদের জন্যে মধ্যযুগীয় সনাতনী পন্থা ছেড়ে নতুন জগতে প্রবেশের ডাক তিনি দিয়েছিলেন অত্যন্ত জোরালো হাঁক হেঁকে। যিনি হাবিলদার ছিলেন একদা পেশায় তিনি স্থবিরতা-মুক্ত কর্মচঞ্চল প্রাণের পিয়াসী। এদিকে নজরুল, ইকবালের ভূমিকা একই রেখায় মিশে যায়। কিন্তু ইকবাল জীবদ্দশায় ক্রমশ রক্ষণশীলতার বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নজরুল আজীবন সেই দুর্বলতা মুক্ত। তাঁর কাব্যের নামের মত তিনি স্বয়ং অগ্নিবীণাই রয়ে গেলেন চিরকালের জন্যে। ফিউডাল চেতনার প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ শ্লেষ– কি গানে কি কবিতায় তদানীন্তন রাজনৈতিক তরঙ্গশীর্ষে নর্তমান ছিল।

AMARBOI.COM

আরে আমাদের মত দাড়ি কৈ ওদের? লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি?
আর আমাদের মত কাছা কোঁচা নাই, ধরিলে মোদের ফাড়িবে কী?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা বস্ত্র যা পরি থান খানিক
তাতে তৌবা তৌবা করি যদি, যাবে কামানের গোলা আটকে ঠিক।
কোরাস ঃ সোবহান আল্লা। সোবহান আল্লা
দ্যাখো তুর্কিরা বটে ছাঁটিয়া ফেলেছে তুর্কি নূর মাথার ফেজ
আর "দীন-ই-ইসলাম" ছেড়ে শুধু তলোয়ারে তারা দিতেছে তেজ
আরে বাপদাদা করে গিয়েছে লড়াই আমরা খামকা কেন লড়ি
দেহে ইসলামী যোশ আনাগোনা করে "ছহি জঙনামা যবে পড়ি"
কোরাস ঃ সোবহান আল্লা! সোবহান আল্লা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[চন্দ্রবিন্দু কাব্য হইতে উদ্ধৃত]

এমনই আরো অনেক কোরাস জুড়েছেন নজরুল অন্যান্য স্তবকের সঙ্গে। যথা– আরে তৌবা, আরে তৌবা, মাশাআল্লা, মাশাআল্লা ইত্যাদি সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয় যে-সব ধ্বনি।

বাংলাদেশের মানুষের নিকট কিংবদন্তীর নায়ক নজরুলের কীর্তি সুবিদিত। তাই তাঁর সম্পর্কে আর কোন ফিরিস্তি বাড়াইনি।

নজরুলের জাতীয়তাবাদ সর্ব সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদ, সেখানে শুধু মুসলমান বাস করে না। সহজ সরল সর্বজন বোধ্য ভাষায় বাঙালী কবি যে ফুকার দিতে যুক্তি এবং আবেগের সাযুজ্য সমন্বয়ে, তার অভিঘাত ছিল অপ্রতিরোধ্য।

মূর্খেরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনও।

জাতীয়তাবাদের উৎসাহ উদ্দীপনার জন্যে যে-মানস প্রয়োজন পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের দুই কবি তার দক্ষ কারিগর। সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার দরজায় উভয়ের করাঘাত ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু যখন দুয়ার খুলল, তখন নজরুল গায়েব। আর ইকবালের মৃত্যু ঘটলেও তাঁর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত রইল পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের আবহে। যুক্তবঙ্গের মুসলমান অধিবাসী তখন তাদের চারণকে পরিত্যাগ করেন অন্যভাষী আর এক কবির বিনিময়ে। কিন্তু জীবনের ধারা এমনই তার সড়ক-পথে সত্যের ঝলক এমন ভঙ্গী নিয়ে আসে যে মনে হয় ইতিহাস এক ধরনের কৌতুকে অভ্যস্ত। বহু পরের ঘটনা, তখনও নজরুল ভারতের অধিবাসী, সুতরাং রাজনৈতিকভাবে তিনি ভারতীয় পাকিস্তানী নন; তবু নিজ জীবদ্দশায় তিনি আবার পাকিস্তানেরও জাতীয় কবিতে পরিণত হন এবং জীবনের শেষ প্রান্তে আবার বাঙালী কবি– যেহেতু বাংলাদেশের কবি। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা "নবযুগ"–এর সম্পাদনাকালে তিনি ধারাবাহিক স্বাক্ষরিত ছ'টি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। এই দুষ্প্রাপ্য রচনায় মুসলমানদের সর্বনাশের ছবি এঁকে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দেন। যেন অভিমানেই তিনি তারপর লোকালয় থেকে বিদায় নেন গন্ধবিধুর ধূপের মত আমৃত্যু আত্মদহনের অভিপ্রায়ে।

তা অবিশ্যি আরো পরের কথা। অন্তত তার সীমারেখা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে

বিগত দেড়শ' বছরে মুসলিম চেতনার পরিব্রজনায় নানা ল্যান্ডস্কেপের মুখোমুখি আসা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিদেশী শাসনের ধাক্কায় শত শতাব্দীর মৌতাত থেকে মুসলিম সমাজের জাগরণ শুরু হয়। আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার, য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানজাত অর্থনৈতিক মুদগরই সেখানে প্রধান চূর্ণকারী— মিসমারের অস্ত্র। প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে বেরিয়ে য়ুরোপ নতুন জগৎ নির্মাণের নানা উপাদান পেয়ে যায়। তারই সাহায্যে অন্যান্য দেশের কাছাকাছি এসে পড়ে য়ুরোপের উন্নত জাতি। মূলত জ্ঞানের প্রসারই অনুপ্রেরণার আসল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দীপক। পরবর্তী কালে উন্নত জাতির উপনিবেশে পরিণত ; শত শত বৎসর দাসত্ব ভোগের পরও অনেকের মোহভঙ্গ হয়নি। আবেগের নিকট জ্ঞান কল্কে পায় না। তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরও।

ইকবাল-নজরুল ছিলেন কবি। তাদের রচনায় ঠিক যুক্তিবিজ্ঞানের ধারায় চেতনা পরিবেশিত হয়নি, কিন্তু তাদেরও তর্জনী ছিল বুদ্ধিদীপ্ত মানস-অভিমুখে। মুসলমানদের তেমন আর কোন শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ে না এই উপ-মহাদেশে, যারা চলমান জগৎ এবং ঐতিহ্যকে একত্রে মেলানোর চেষ্টা পেয়েছেন। আত্মায় কীলক ঢুকে থাকলে তো আর কর্ম-প্রেরণা-মুখর জগৎ হাতছানি দিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদীরা সেই কাজটি প্রথমে খুব চালাকির সঙ্গে সম্পন্ন করে। আর্থিক স্বার্থরক্ষণে তারা দেশী এজেন্ট গড়ে নেয়, যারা হালেচালে ভাষায় তাদের অনুকারক। কিন্তু য়ুরোপের সংস্কৃতির প্রকৃত আস্বাদ তেমন যেন তারা না পায়– সেদিকেও সাম্রাজ্যবাদীরা সতর্ক। এইভাবে স্থানীয় এজেন্ট তৈরি হয়, যারা ধোপার গর্দভ– না-ঘরকা না-ঘাটকা। ওদের দূরদৃষ্টি প্রশংসাযোগ্য। বহু বছর স্বাধীনতা পাওয়ার পরও বর্তমানে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশে শাসকশ্রেণী এবং দেশের শাসিত জনসাধারণের মধ্যে কোন ভাবের সংযোগ নেই। ফলে, কোনও ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পাদনে– (সাধারণ, ধরুন রাস্তার ধারে ফলের গাছ লাগানো) যে-সংঘবদ্ধতা প্রয়োজন, যাকে ইংরজীতে Mobilization বলে— তার ভয়ানক ঘাটতি পড়ে। শাসক ও শাসিতের এই পরিখা পার হওয়ার চেষ্টাও নেই। কারণ অনেকে সচেতনও নয় সে সম্পর্কে। এমনকী জননেতা পর্যন্ত।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জন শুধু মানসিক দূরত্ব নয়, সংযোগ দূরত্ব রাখতেও যেন গুলশান বনানীর মত অভিজাত এলাকায় বাড়ী তোলে। এমন কী জননেতারাও বাদ যায় না। আর যারা সনাতনী পুরাতন কায়দায় শিক্ষিত আলেম সম্প্রদায়, যারা জনসাধারণের কাছাকাছি, তারা আবার আধুনিক জগতের সমস্যার সঙ্গে আদৌ সুচারুরূপে পরিচিত নয়। ফলে, নেতৃত্বদানে অক্ষম। ফাঁক থেকেই যায়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে।

বিশ্বজনের সঙ্গ ছাড়া বর্তমানে নিজ দেশের সমস্যাও মেটানো দুরূহ। সে-আরো পরবর্তী পর্যায়। তৎপূর্বে স্বদেশের মানস পরিচয় এবং পূর্বোক্ত দূরত্ব দূর করা ব্যতীত আধুনিক পৃথিবীর কাতারে সামিল হওয়া অসম্ভব। প্রত্যেকের নিকট স্মর্তব্য, নদীর মতই প্রতিমুহূর্তে মানস পরিবর্তনশীল। তার প্রবাহ-পথ কখনও সরল হয় না।

পরিচয়হীন পরিবেশে দিশাহারা জনের মত দেশ এবং সমাজও তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের তলহীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তার খেসারৎ যুগ যুগ ধরে দিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

আলহাক্কো মোর্রুণ
সত্য মাত্রেই তিক্ত।
– হযরত মোহাম্মদ (দঃ)

With time and march of events all truths are shown and proved.
কাল এবং ঘটনার প্রবাহ দ্বারা সত্য উম্মোচিত এবং প্রমাণিত হয়।
– কামাল আতাতুর্ক

কিছু আরো কথা

নটে গাছ মুড়িয়ে যায়।

কিন্তু মানুষের গল্প কোন দিন ফুরায় না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যে দেড় শ' বছরের মাথায় একটা ছেদ টানা। কিন্তু ইতিহাস তো অবিচল কিছু নয়।

উনিশ-সাতচল্লিশ সনে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয় হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান– এই দুই খণ্ডে। তার মধ্যে পাকিস্তান আবার আটদিক বিশিষ্ট একটি দেশ। কারণ, তারও দুই খণ্ড দুই অংশের মধ্যে দেড় হাজার মাইল ব্যবধান। দিক বৈশিষ্ট্যে পাকিস্তান পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

খ্রিস্টানরা বলে, Faith can move mountain ঈমানের সাহায্যে পাহাড়কে নড়ানো যায়। তা বিশ্বাসযোগ্য। অন্তত পাকিস্তান পত্তনের সময় চোখের সামনে ঈমানের সেই জোর দেখা গিয়েছিল। কোন যুক্তির ধার তখন কেউ ধারে নি। দ্বিজাতি তত্ত্ব– হিন্দু, মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি কেবল মাত্র ধর্মীয় একাত্মতা থেকে তা চিহ্নিত হয়। মানুষের যুগযুগান্তের ঐতিহ্য ধর্মের সঙ্গে মিশে নিজস্ব রঙ গ্রহণ করে। তাই বিভিন্ন দেশে একই ধর্মের স্বতন্ত্র রূপ দেখা যায়। মাটি যেমন স্থানীয় তরুলতা ফসলের আকার ও রূপ প্রদানকারী, তেমনই মানুষের আবহমান কালের ঐতিহ্য ! কিন্তু তেমন যুক্তি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় কেউ স্বীকারে রাজী ছিল না। ঈমান পাহাড় নড়ায়। সত্যি, পাহাড় নড়ে যায়। কিন্তু পাহাড় নড়ে গিয়ে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন অবস্থানে কোন দশায় পৌঁছবে? এমন জিজ্ঞাসা ঈমানদারেরা উত্থাপন করে না। কালের বিশেষ আবেষ্টনী সেইখানে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

উনিশ শতকে মুসলিম মানসের পরিচয় আমাদের দেখা। স্যার সৈয়দ প্রকৃতি এবং যুক্তি বিচার-কে মাপকাঠি বা পথপ্রদর্শক খাড়া করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। ১৮৪০ থেকে তাঁর সামাজিক ভূমিকার সূচনা। ঠিক এক শ বছর পরে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেই প্রস্তাবনায় কিন্তু পাকিস্তান শব্দের উল্লেখ ছিল না। মুসলমানরা যেসব জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ— সেই সব সন্নিহিত এলাকা নিয়ে নতুন রাষ্ট্রপত্তনই উক্ত প্রস্তাবের মূল কথা। রাজনৈতিক নতুন ভূগোল-রচনাই উদ্দেশ্য। স্যার সৈয়দ পশ্চিমের চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন। গত দু'শ বছরে পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষেই কী তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব? পাকিস্তান আন্দোলনও য়ুরোপীয় চিন্তা-প্রসূত সংখ্যালঘিষ্টের আত্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যা যেখানে মূল কথা। পাকিস্তান আন্দোলন য়ুরোপের (ধার্মিক মুসলমানের ভাষায় নাসারার) চিন্তাধারার দান। সেদিক থেকে স্যার সৈয়দ এবং তার পরবর্তীকালের কওমী ভাইদের কোন তফাৎ নেই। কিন্তু স্যার সৈয়দ বিচার বুদ্ধি বা যুক্তিবাদ, র‍্যাশনালিজমের উপর দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। অবিশ্যি আবেগ শূন্য আর কোন মানুষই বা হতে পারে? আবেগ ও বিচার-বুদ্ধির আনুপাতিক প্রাধান্যের হিসাব লক্ষ্যযোগ্য। পরবর্তীকালে যুক্তি কোণ-ঠাসা, আবেগ সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়।

মানস-পরিব্রজনার ইতিহাসে এই ব্যাপারটি যেন কারো চোখ এড়িয়ে না যায়। এই সঙ্গে আরো মনে রাখা কর্তব্য, এমন ঘটনা জাতির জীবনে নতুন নয়। মাত্র ষাট বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলমান মানস থেকে তার সৃষ্ট আদল দেখা যায়। তিনটি জীবন-চরিত এখানে সেই দলীল রূপে বর্তমান। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে শেখ আব্দুর রহিম লেখেন "হযরত মোহাম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি।" মৌলানা আকরম খাঁর "মোস্তফা-চরিত" প্রকাশিত হয় ১৯২২ এবং কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী' বেরোয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনটি জীবন-চরিত একই মহাপুরুষের জীবনী। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুৎ ফারাক। শেখ আব্দুর রহিম সচেতনভাবে না হলেও জাতীয়বাদী চেতনার প্রতিফলন। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তিনি মোহহীন। স্যার সৈয়দ তখনও জীবিত। আরো এগারো বছর পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু শেখ সাহেব এবং সৈয়দ সাহেবের বিদেশী শাসনের প্রতি নেত্রপাত সমকোণে নয়। মৌলানা আকরম খাঁর মোহাম্মদ জীবনী যুক্তিবাদ-নির্ভর। তিনি মহাপুরুষের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকার পরিচয় দিতে তৎপর। কিন্তু প্রায় দুদশক পরে লেখা এবং মৌলানা আকরম খাঁর চেয়ে বয়সে ঢের ছোট কবি গোলাম মোস্তাফা যুক্তিবাদ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তিনি শুধু ভক্তের সম্মোহিত চোখে হযরতকে দেখেননি, নানা অলৌকিকতার উৎস রূপে চিত্রিত করেছেন, তা যতই অবিশ্বাস্য হোক বর্তমান যুগে। প্রচুর কিংবদন্তীকে মোস্তফা সাহেব স্বাভাবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনার মর্যাদা দিয়েছেন। যথা, ছেলেবেলায় ফেরেশতারা হযরত মোহাম্মদের 'কলব' দীল-পরিষ্কার করে দিয়ে যেত। মৌলানা আকরাম খাঁ এমন সব কিংবদন্তী নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফা তা যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন, সে-সব যুক্তি অবশ্য আদৌ জোরালো নয়।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Psyche বা চিত্ত-বিশ্বের পটে বিভিন্ন সময়ে এমন প্রতিফলন থেকে জানা যায় জাতির ইতিহাস।

বলা বাহুল্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, আবেগের উপরে। মুসলিম লীগের নেতাদের সম্মুখে যে-চ্যালেঞ্জ দেখা দিল, তার মোকাবিলা তারা হয়ত সচেতন হলে করতে পারতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নীল-নকশা কিন্তু যারা উচ্চারণ মারফত মুখে ফেণা তোলেন, তারাও দেন না। গন্তব্য পৌছতে হবে কীভাবে? সে-হদিস মুসলিম লীগের নেতাদেন কোনোদিন বিচলিত করেনি। আশু স্বার্থোদ্ধারে মগ্ন এইসব তথাকথিত নেতাগণের দৃষ্টি কখনও রাষ্ট্রবিদ সুলভ ছিল না। এক জিন্না সাহেব ছাড়া মুসলিম লীগের নেতাদের ভেতরে ইহজাগতিক বিষয় আশয় সম্পত্তির ক্ষুধাহীন মাতৃসন্তান এক জনকেও যদি পাওয়া যেত, হয়ত ইতিহাসের সামনে একটা নজীর সৃষ্টি হতো যে আট দিক বিশিষ্ট এক দেশ এবং যার মধ্যে নানা জাতির বাস— এবং আরো সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দুই অংশ– এসব সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তা এক জাতীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে। হয়ত আকাশ কুসুম রচনা। কিন্তু তেমন চেষ্টা মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্রেফ রাজনৈতিক চাল মারফৎ জিন্না সাহেব এক বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র দেখা দিল ভূগোলে। কিন্তু জন্ম থেকেই স্ববিরোধিতাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের কলাকৌশলের ফল দেখা দিতে লাগল। মুসলিম লীগ নেতাগণ রাষ্ট্রের 'আইডলজি' ভাবাদর্শের কিছু আর অদলবদল করলেন না। ধর্মীয় জিগিরের আওতায় শোষণের জাঁতা যথা সক্রিয় রইল। আর জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তো যেমন পূর্বে তেমনি পাকিস্তান পত্তনের পরেও আদৌ গুরুত্বের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতাগণ বিশ্লেষণ করে দেখলেন না। অবিশ্যি তার প্রয়োজন কোথায়? উন্নততর হিন্দু মধ্যবিত্তের মুখোমুখি বিকাশ পথের সংগ্রামে মুসলমান মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল, সাধারণ বিত্তহীন শ্রেণীদের দলে টানার জন্যে। পাকিস্তান প্রাপ্তির পর সেই পুরাতন ফন্দিই বজায় রইল রাজনীতি এবং ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের দুই খণ্ড পূর্ব-পশ্চিম সুতরাং শরীক দুই জন। সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় পশ্চিমের শক্তিধর ফিউডাল অভিজাতেরা পূর্বে কিছু দালাল সৃষ্টি করে শাসন এবং শোষণ অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিল। পূর্বাঞ্চলের মধ্যবিত্তদের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক হাতেখড়ি তো মুসলিম লীগেই শুরু হয়। বাঙালি সাম্প্রতিক জাতীয়তাবাদ তো এই ভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার, পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইখানে প্রয়োজন মানস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ। কারণ, একটি ভূখণ্ডের মানুষের ইতহাস নানা যুগ ও উপাদানের সমষ্টি। সেখানে অনুমানবশত কিছু করা সম্ভব নয়। অথবা কোন 'শর্ট-কাট্' বা পাঁয়তারা মারফত আপাতত আশু লাভ হতে পারে। তা কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে টেকে না। হয়ত অতিসরলীকরণ মনে হতে পারে, কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শুধু সাম্প্রদায়িতা ছিল মুসলিম লীগের পুঁজি। হিন্দু মুসলিম– দুই শব্দ লীগারদের কল্যাণে বর্তমান অশ্লীলতা, পাশবিকতা, বর্বরতা এবং এই জাতীয় অনুষঙ্গে যে কোন সৎ মানুষের কানে বিষবৎ বিঁধতে থাকে। কিন্তু একদা তাই ছিল রণক্ষেত্রের হাতিয়ার। কোন সম্প্রদায়ের মানসের সংবাদ লীগ নেতাদের কাছে ছিল না।

ফন্দীফিকিরে মানসের সাময়িক বিকৃতি ঘটতে পারে। কিন্তু কালের পটে তা টিকতে পারে না।

ইতিহাস সামনে খাড়া। পাকিস্তান ভেঙে গেল। বর্ণবিদ্বেষের আর এক পর্যায় শুরু হয়েছে পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশে। সেখানে পাঠান বিহারী লড়ে। সিন্ধী-পাঞ্জাবী একে অপরের দুশমন। বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাব মুসলমান অধুষিত, সেখানে এক মুসলমান অপরের ভাই নয়। কিন্তু পুরাতন ধুয়া এখনও জীয়োনো। সামরিক ডিক্টেটর জিয়াউল হকের জিগীর : ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা।

মানসের পরিবর্তন ঘটে। তা নানারূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের বীজ তা থেকে ধ্বংস হয় না। এই জন্যেই যদিও রাজনৈতিকভাবে নয়, তবু রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ : শওকত ওসমানের ৭৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে
২রা জানুয়ারি, ১৯৯৫
প্রকাশক : বিদ্যাপ্রকাশ

AMARBOI.COM

উৎসর্গ
বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর
অভিমুখে
স্বদেশের মাটি হোক তোমার তিলক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকার-শিকারের কাহিনী

উপকার-স্বীকার মনে মনে করা যায়। বাইরে তার কোন বুদ্বুদ থাকার কথা নয় সাধারণভাবে। অবিশ্যি উপকার যেখানে ঐতিহ্য-সূত্রে পাওয়া সেখানে জাতীয় জীবনে নানাভাবে তার প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে উপকার-স্বীকার নানা সমস্যার উৎস।

উপকারীর উপকার স্বীকারই কৃতজ্ঞতা। তা জানাতে পারলে উপকৃত-জন আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু সেখানে অপর পক্ষ আছে।

উপকারী হয়ত সমাজে মানবিক কর্তব্য সম্পাদনেই কাজটা করেন, দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মাপকাঠি মনে রেখ। তিনি বলেছিলেন, এমনভাবে কাজ করো যার সম্পাদন সর্বজনীন নীতি হয়ে দাঁড়ায় ঃ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদান—অন্য কিছু প্রত্যাশায় নয়। এমন উপকারীর নিকট তো কৃতজ্ঞতা অস্বোয়াস্তিকর। জানাতে গেলে বিরক্ত হবে। কারণ, কোনও মতলবে তিনি কারো উপকার করেন না।

যে-নামাজ পড়ে দোজখের আগুন থেকে রেহাই পেতে সে ব্যক্তি ধার্মিক নয়—চতুর। আল্লাহর অনুজ্ঞা-রূপে যিনি প্রার্থনা করেন তিনিই প্রকৃত পরহেজগার।

সুতরাং দেখা যায়, উপকারীর উপকার প্রকাশ্যে স্বীকার সব সময় বিড়ম্বনা-হীন নয়।

অন্য পক্ষ আছে, সেখানে কি হয় দেখা উচিত। তা সব সময় জানার উপায় নাও থাকতে পারে। একজন তখন হয়ত পরলোকের বাসিন্দা।

আমার মতে উপকার স্বীকারের দিকে না গিয়ে বরং উপকার-শিকারের দিকে যাত্রা বিড়ম্বনা-হীন।

অথ, আমার বক্তব্য উপকার-শিকারের কাহিনী।

শিকারের লক্ষ্যবস্তু থাকে। তার উপর আলোকপাত করতেই হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টার্গেট স্বনামে বিভূষিত।

স্বনামধন্য এই কবির উদ্দেশ্য বিশ বৎসর পূর্বে স্নেহাস্পদ কবি-নাট্যকার জিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হায়দার লিখেছিল, "আমার চেতনায় তুমি ঈশ্বরের মতো বিধৃত।" কাব্যিক উৎপ্রেক্ষা বাদ দিলে কথাটা একদম বাঙালি জাতীয় জীবনে সত্য। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রপঞ্চ বা ফিনমিনান। এই গ্রন্থে তার বহু প্রমাণ পাঠক লক্ষ্য করবেন। আর কিছু বলা বাহুল্য।

জাহেদ হোসেন

চট্টগ্রামের অধিবাসী কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে গোড়ায় শুরু করেছিলেন–

আবার, আবার সেই কামান-গর্জন
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন !

আমি তেমনই আর এক চট্টগ্রাম-বাসী গোলন্দাজের সম্মুখে পতিত আবার, আবার। তার নাম জাহেদ হোসেন। তিনি "চিটাগোনিয়ান গ্র্যান্ডি" দের অন্তর্ভুক্ত। অবিশ্যি নিপট বাঙালি মানসের অধিকারী। আমার এক উন্মাদ অনুরাগী পাঠক, আমার খুব কম রচনাই তাঁর অপঠিত।

তিনি প্রথমবার গোলন্দাজী করেন একটি গল্প নিয়ে। তাঁর মতে অমন গল্প যেহেতু স্বতন্ত্র স্বাদ, একদম একক চেহারায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অর্থাৎ, এক গল্প এক কেতাব।

এমনিতে গল্পের বইয়ের চাহিদা কম, প্রকাশকগণ সহজে ওপথ মাড়ান না। তদুপরি একটি মাত্র গল্প নিয়ে বই, কোন্ আহম্মক ছাপতে যাবে?

কিন্তু সমাজে কিছু কিছু নির্বোধ থাকে, তাদের এ্যাডভেঞ্চারার বা দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বলতে পারেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমি প্রকাশক পেয়ে গেলাম।

প্রকাশক নয় বরং পূর্ববর্ণিত অভিযাত্রী : স্নেহভাজন এম. আর. আখতার মুকুল, বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে "স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র" থেকে যার "চরমপত্র" অনুষ্ঠান অন্তত এক ডিভিশন মুক্তিযোদ্ধার সমান কি আরো বেশি কর্মতৎপর ছিল।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মানে যারা জানেন, তাদের কাছে অন্য ব্যাখ্যা বাক্যের অপচয়।

আমার "হস্তারক" গল্প একক পুস্তক হিসেবে জনসমক্ষে এসে পৌঁছল।

স্বাধীনতার কুচক্রী দুশমন-কূল প্রতিবিপ্লবে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-রথের চাকা উল্টে চুরমার করে দিলে।

প্রথম সারির একজন মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈগল এখন ফড়িং ধরে বাঁচার জন্যে ! আবেষ্টনী এমনই !

মজিবর রহমান খোকা

জাহেদ হোসেনের জের শেষ হয়নি। আবার যেন জাহেদী- জেহাদের ডাক, "এক নিবন্ধন এক গ্রন্থ।"

প্রস্তাব মৌখিক ব্যাপার। তা সম্পাদন বহু উপাদানের যোগসাজশ।

ব্যতিক্রম, তবে এ্যাডভেঞ্চারার মিলে যায়, আমার সৌভাগ্য বলতে হয়। জনাব মজিবর রহমান খোকা প্রস্তাব উত্থাপন মাত্র আগাপাশতলা বিবেচনায় আনলেন না, 'ডিটো' মেরে দিলেন।

প্রকাশক-রূপে ব্যবসায়িক দিকে চোখ না-রাখা বিপজ্জনক।

তা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি, যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন লেখক লাভবান হতে পারেন।

বুঝলাম, জাত-জুয়াড়ি নাফা-নোকসানের হিসাব করলে তো সে ছকে দান ধরতে অক্ষম।

জাত-প্রকাশক আমার সব শর্ত মেনে নিলেন যা গ্রন্থের হালেচালে প্রকট।

দেরীতে জানা গেল, জনাব মজিবর রহমান খোকা নতুন নন জুয়া-খেলায়। সবে কিশোর উত্তীর্ণ বয়সেই তাঁর হাতেখড়ি।

তিনি একদা-মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। দেশ-জননীর সেই সব সৈনিকেরা লাভ-লোকসানের হিসাব করলে প্রাণ-কোরবানীর ছকে দান ধরতে করতেন কি কোন দিন?

আমার সৌভাগ্য, একজন মগ্নদ্বীপ-ভীত এ্যাড্‌ভেঞ্চারার আবার পেয়ে গেলাম প্রকাশনার ক্ষেত্রে।

AMARBOI.COM

সন্তোষ গুপ্ত

মগ্নদ্বীপ-ভীত লোকের সংখ্যাই, আমার মনে হয়, এদেশে বেশি।

স্বদেশের পঞ্জর-পরিব্রাজক অন্যতম খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীসন্তোষ গুপ্তের অনেক পরিচয় গুপ্ত থাকে। এদিকে যদিও চিকন আদল, হস্তীর সঙ্গে তাঁর তুলনা। দুই দাঁত অন্দরে, দুই দাঁত সদরে। তিনি কেবল সাংবাদিক নন। পদবীর সার্থকতা রক্ষার্থে সম্ভবত বাকীগুলি চেপে রাখেন। দলছুট কবি, বুদ্ধিজীবী এবং এসব ছাপিয়ে বলা যায়, তিনি বরীন্দ্র-বিশ্বকোষ। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য চিঠির হাড়হদ্দ যাঁর মনে থাকে তাঁকে আপনি আর কোন্ আখ্যা দেবেন? আমার রচনায় গুপ্ত-জনাবের কল্যাণ-হস্ত এবং মেধা-স্পর্শ আপনারা স্বচ্ছন্দে চিনে নিতে পারবেন রবীন্দ্র-রচনার উধৃতি থেকে। সূত্র আপনাদের জানার বাইরে রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহরাব হাসান

কবি, সাংবাদিক, বর্তমানে বার্তা-সম্পাদক (ভোরের কাগজ) এবং সোদরপ্রতিম সোহরাব হাসান নেপথ্যবাসী থাকার মধ্যেই ঘোর সুখারাম অর্জনকারী। বাক্য-বৃদ্ধি বিপজ্জনক।

রবীন্দ্রনাথের দেনাদার

আত্মিকভাবে আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী।

একবার এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসেছিলেন অনটনাপন্ন, আর্থিক ঋণের জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহায্য করেন। নামোল্লেখ না করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে গেছেন ব্যাপারটা :

"ভদ্রলোক সাহায্য পেয়ে বললেন, আপনি আমাকে চিরঋণী করে রাখলেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই দেনাদার এই মুহূর্তে আমার নিকট এক মডেল মহাজন।

শওকত ওসমান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করছি,
তুমি যুগবোধ হারিয়ে ফেলেছ।
কাল বা মহাকাল আছে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস জুড়ে।
অনেকে অবিশ্যি তা জানে না।
অথবা, জানলেও তাদের চেতনায় তেমন দাগ বা আঁচড় রেখে যেতে অক্ষম।
তুমি সে-জাতের নও, জানি।
কিন্তু বেশ কিছু দিন থেকে তোমার কাল-বিস্মরণ ঘটছে।
তুমি স্বীকার নাও যেতে পারো।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে, হ্যালিটোসিস। ওটা এক রকমের রোগ, মুখে দুর্গন্ধ হয়। রোগটা যা-কে ধরে সে কিন্তু আদৌ টের পায় না। আশপাশের মানুষ যারা রোগীর কাছাকাছি আসে তারা বেশ টের পায় এবং সৌজন্যের খাতিরে দুর্ভোগ বেমালুম চেপে যায়।

আমি তেমন ভদ্রতা দেখাতে পারলুম না। সেই জন্যে বিশেষ দুঃখিত।
আসল কথা বলে ফেলা যাক।
অনেক কাল আগে থেকে তুমি যুগবোধ হারিয়ে ফেলছ।
আমি তা জোর দিয়ে বলতে পারি।

এই গণ-মাধ্যমে বা 'ম্যাস্‌মিডিয়া'র যুগে তুমি যদি চোখ বুঁজে বসে থাকো, ম্যাস্‌মিডিয়ার গতিবিধি বা অভিঘাত অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইম্‌প্যাক্ট' এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন না থাকো, তবু কি আমি বলব তোমার যুগবোধ আছে?

জার্মানরা বলে, 'জিৎগিস্ত্' বা যুগের 'স্পিরিট' অর্থাৎ মর্মশক্তি।

ব্যাপারটা দু-দিক থেকে দেখা যায়।

একজন সময় সম্পর্কে সচেতন। সে মেনে নিয়েছে 'টাইম' বা সময় নামক এক অদৃশ্য সামগ্রী আছে যা বাতাসের মত জানান দিয়ে যায়। যদিও তার অস্তিত্ব মানুষের চোখের বাইরে।

কিন্তু এমন লোক যুগের মর্মশক্তি সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারে। অর্থাৎ, দেশের উপর দিয়ে কী হাওয়া বইছে, দেশের মানুষ কী চায়, সে সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়।

গণমাধ্যম সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতা বা অচেতনতা থেকে বুঝা যায়, কাল বা টাইম আছে তুমি তা আর মানো না। অথবা তুমি সেই নাদানদের দলে পড়ো যারা টাইম দিয়ে স্পেস্‌ বা ব্যাপ্তি-স্থান হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু কাল সম্পর্কে নিঃসাড়।

তুমি কি লক্ষ্য করেছ, গণমাধ্যমগুলো গত পঞ্চাশ বছরে ধাপে ধাপে কতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়েছে? সাপ্তাহিক, মাসিক ত্রৈমাসিক, দৈনিক সংবাদপত্র বেতার ইত্যাদি সবই গণমাধ্যম। একদম নবতম সংযোজন টেলিভিশন বা দূরদর্শন।

তুমি কি লক্ষ্য করেছ, দৈনিক খবরের কাগজের স্বভাব চরিত্র কী ধারায় কতো বদলেছে?

এখন দৈনিক সংবাদপত্রিকায় সাহিত্যের আসর কেমন জেঁকে বসেছে, লক্ষ্য করো।

সাহিত্যের উপর, জনমতের উপর, প্রকাশনার উপর, গণমাধ্যমের চোটপাট কেমন এবং কি পর্যায়ের–তা নিয়ে তুমি একটা বড় কেতাব লিখে ফেলতে পারো, যদি তোমার অবসর এবং গবেষণায় চোখ থাকে।

আধুনিক যুগে অন্যান্য প্রশাসনিক যন্ত্রের মত 'মানসিক হাতিয়ার'ও লাগে। জনমত ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। রাজনৈতিক পার্টি যারা দেশের শাসন-ভার পায়, তাদের তো এক-পা নড়ার উপায় নেই জনমত ছাড়া। তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল জনমতের উপর। সুতরাং প্রচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে ওদের ঔদাসীন্য অসম্ভব। প্রচার-সংক্রান্ত ব্যাপার মানে গণ-মাধ্যম।

অথচ, তুমি নির্বিকার এসব দিকে।

একজন লেখকের অস্তিত্ব অনেকখানি জনমতের উপর নির্ভর করে।

তোমার ঔদাসীন্য এসব ব্যাপারে আসলে যুগবোধ হারিয়ে ফেলা থেকে শুরু হয়েছে। তুমি সেই জন্যে নির্বিকার।

কিন্তু মনে রেখো, গণমাধ্যমের শুলো নানা দিকে অক্টোপাসের নুলো, তোমার অজানিতে জড়িয়ে বসে আছে। প্রচারের বিবর্তনের দিকে চোখ রাখো, বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

তিরিশ বছর পূর্বে বা তারও কম কাল-সমতলে, তুমি ভাবতে পারতে, ফিলজফি– দর্শনের প্রবন্ধ কি কোন দার্শনিক আখ্যান-বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হবে দৈনিক খবরের কাগজের পাতায়?

এখন কি দেখছো?

সংবাদপত্রের "সাপ্তাহিক সাময়িকী" তেমন চিন্তারাজির আড়ৎ। আগে যারা সিরিয়াস, গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তারা ভাবতেন, তাদের কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা। তা নিয়েই তাদের যতো মাথাব্যথা। সমঝদারের সংখ্যা অল্প তা নিয়ে কোন উদ্বেগ ছিল না এমন চিন্তাবিদগণের।

কিন্তু এখন ব্যাপক বিস্তারের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। অর্থাৎ চিন্তাটা যথাযথ ঠিক হচ্ছে কি না, তা নিয়ে এতটুকু শিরঃপীড়া নেই।

সংখ্যার পানিতে এখন সব পূত বা পাক-পবিত্র হয়ে যায়। প্রার্থনা কোয়ানটিটি– সংখ্যা। কোয়ালিটি গুণ– রসাতলে বা চুলোয় যাক। সংখ্যা এখন 'আবে-জম্‌জম'। মক্কা শরীফের কূপের পানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে সাহিত্য-সমালোচনা বা অন্যান্য বিষয়ের সমালোচনার স্ট্যানডার্ড বা মানের দিকে তাকাও।

দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাসিক পত্রিকা কোণঠাসা হয়ে গেছে। কোন রকমে হয়ত দু-একটা ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে, প্রচণ্ড আর্থিক গচ্চাসহ।

এখন সাহিত্য-সমালোচনা দৈনিক খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় চরে বেড়ায়। স্বল্প আলোচনা, ফিকে স্বাদ। সমালোচনা লেখেন সাংবাদিক বা গ্রন্থকারের বন্ধু-বান্ধব, যা নেহায়েৎ সৌজন্যের ঋণশোধ।

তৃতীয় দশকের দিকে কবি এজরা পাউন্ডের বাক্যগ্রন্থে (বোধ হয়, মর্বেলি নিকসন) এক সফল লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন তরুণ লেখককে মজকুর জন পরামর্শ দিচ্ছে কীভাবে পাবলিশারের কাছে 'এ্যাডভান্স' বাড়ানো যায়, "Butter the reviewer from fifty to three hundred rose in eighteen months. সমালোচক-কে তেল লাগাও। পঞ্চাশ থেকে তিন শ'য় উঠল আঠার মাসে।"

এখন সাহিত্য-সমালোচনা ওই তেল বা মাখনের কারবার। প্রচারের মাধ্যমে প্রচুর বৃদ্ধির ফলে, এখন জিগীর হচ্ছে "সাফল্য এই মুহূর্তে। নামটাম যা হওয়ার তা এখনই হোক।"

খ্যাতনামা ফরাসী লেখক আঁদ্রে জীদ তাঁর জার্নালে আরো সমসাময়িক বিশিষ্ট সতীর্থদের নামোল্লেখ সহ লিখেছেন যে তারা ভাবতেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অখ্যাতই থাকতে হবে, তারপর যদি কিছু নামধাম হয় হতেও পারে। লিখেছেন, "We put our hopes in duration, our sole concern being to produce a work that would last. আমাদের সব আশা ন্যস্ত ছিল স্থায়িত্বের কাছে। আমাদের একমাত্র মাথাব্যথা ছিল, এমন একটা কাজ করা যেন টিকে থাকে।"

গণমাধ্যম বা ম্যাসমিডিয়া সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

এখন জপমন্ত্রঃ মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয় ন ধূমায়িতম চিরম। এক মুহূর্ত জ্বলাই শ্রেয়, চিরকাল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে থাকা নয়।

তার ফল কি দাঁড়িয়েছে জানো?

সাহিত্যের জগতে 'স্পেস্' (ব্যাপ্তিস্থান) খুব বেড়ে গেছে। খবরের কাগজের কল্যাণে, যত গরীব দেশই হোক, পাঠক-সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু time বা কাল-ব্যাপ্তি সংকুচিত।

কেতাব-লিখিয়েরা ভেবে দেখে না, তার কাজটা ক'দ্দিন টিকবে।

কবিদের আয়ু এখন দশ বছরে সীমাবদ্ধ। অমুক দশকের কবি-রূপে পরিচয়। অর্থাৎ, পরবর্তী দশকে তিনি নিশ্চিহ্ন বা প্রায় গায়েব হওয়ার পথে।

চোখ খুলে দ্যাখো। উৎপাদন বা Production বেড়েছে Consumption বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদন (ভোগ) বেড়েছে। কিন্তু সমঝদারিত্ব ধাইছে উল্টো দিকে।

শেষ পর্যন্ত লেখকও নিরুপায়। দু' একজন ব্যতিক্রম। স্রোতের উজান ঠেলা খুব সহজ নয়।

ফরাসী রুশো সাহেব বহু পূর্বে লক্ষ্য করেছিলেন, লেখকরা স্বাধীন, কিন্তু তাদের সুখ-প্রশান্তি নির্ভরশীল অপরের মতামতের উপর। সংখ্যার সাহায্যে তার অস্মিতার মূল্য নিরুপিত হয়।

সুতরাং সত্তা এবং অস্তিত্বের দিক থেকে লেখকের হালতের কথা বিচার করে দ্যাখো। তাদের দুর্দশা আরো শোচনীয়, বস্তুত টেলিভিশনী হামলার পর।

তুমি একটা নিম মানে আধালেখক বা অলেখককে, সমাজে মোটামুটি পণ্ডিত-রূপে পরিচিত এমন দু' তিনজনের সাহায্য দু-তিন মাসে টেলিভিশনের পর্দায় কয়েকবার "পুরো লেখক" বলে জাহির করিয়ে দাও, তারপর মজা দ্যাখো। ওই অচল মাল চালু হয়ে গেছে। অহম-স্ফীতি বা Ego-inflation মুদ্রাস্ফীতির মত জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়, যদিও সামগ্রীটা পূর্ববৎ থাকে।

ইমেজের ধাক্কা বড় প্রচণ্ড।

বর্তমান প্রতিযোগিতা-দীর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন সহিংসতা Violence বা সংগ্রাম অবধারিত। যে-যার কোলে ঝোল বা শুরুয়া মাখাতে তৎপর। প্রচলিত ভাবধারার মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি হয় সেইখান থেকে।

গ্রামে মোড়ল মাতব্বর খাড়া করার প্রতিযোগিতা আছে। কারণ, সাধারণ মানুষ তাদের কথায় সায় দেয়। অর্থাৎ, দলীয় লোকদের জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরা দরকার।

পূর্বে বেতারে গায়েবী স্বর শোনা যেত। এখন সশরীরী মানুষের ইমেজ তোমার চোখের উপর, মনের উপর ধাক্কা দেবে। তার ফল, তাৎক্ষণিক।

বিগত কয়েক বছরে কতো মাটির পুতুলকে মহামানব হয়ে যেতে দেখা গেল না টেলিভিশনের কল্যাণে। অবিশ্যি এমন মহাপুরুষরা মৌসুমী ফুল। ওদের জন্ম তাৎক্ষণিকতায়, কাজেই ঝরে পড়তে বেশী দেরী লাগে না।

আগে ওরা পাউয়ারে আসে তারপর দেশের নেতা হয়ে বসে। ওরা শেখ মুজিব নয় যিনি আটাশ বছর পরে নেতৃত্বের শিরোপা পেয়ে পাউয়ারে এসেছিলেন।

টেলিভিশনের কাজ হচ্ছে উদ্দীপনা, রোমহর্ষকতার ভেতর দিয়ে। ওখানে বাহন ব্যষ্টি তথা ব্যক্তির ইমেজ। এই কৌশল সাময়িক স্বার্থোদ্ধারের বড় উপায়।

বর্তমানে পৃথিবীময় অনুন্নত, সদ্যস্বাধীন বা প্রাক্তন উপনিবেশ দেশগুলোতে অপসংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে তার একটা বড় মিডিয়া বা বাহন টেলিভিশন।

এখন তো ক্যান্ড্ বা টিনের কৌটাবদ্ধ সামগ্রী আমদানী-রপ্তানির যুগ। হালফিল বিদেশ থেকে খুব দ্রুত পাওয়া যায় কৌটাবদ্ধ তথ্য– ইনফরমেশন, কৌটাবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Ideology বা ভাবধারা, কৌটাবদ্ধ অবসর-বিনোদনী। আইডিয়া, আদর্শ এখন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্বে জাহাজে শুধু বই পত্রপত্রিকা আসত। তখন ভাবধারা যা আসত, তার শিকড় পুঁততে লাগত প্রচুর সময়। বিমান চালু হতে কিছু সময় ত্বরান্বিত হলো। কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রোনিক্সের যুগে ভাবধারা নয় শুধু তথ্য এবং অবসর-বিনোদনী সামগ্রী পৃথিবীর চতুর্দিকে দুদ্দাড় ধেয়ে যায় এবং চাক্ষুষ জানান দেয়।

কোকোকোলা-ব-জীন ট্রাঞ্জিস্টার-মার্কা সভ্যতার যে পচা-তলানি হালফিল এদেশের বিত্তবান সমাজের এক বড় অংশ গ্রাস করে বসে আছে, তার কারণ ম্যাসমিডিয়ার জুলুম।

অবিশ্যি দেশী মুৎসুদ্দীরা আবার উন্নত দেশের শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের মনতুষ্টির জন্যে তাদের হালচাল, খানাপিনার অনুকরণ করে। মায় লেবাস পর্যন্ত। আসলে এই শ্রেণীর লোকদের কোন জাতীয়তাবোধ থাকে না। মুনাফাই তাদের মুরশেদ বা পথপ্রদর্শক।

টেলিভিশনের মহিমা অপার। অপসংস্কৃতি ওই মিডিয়ার চাপে কী রকম ত্বরান্বিত হয়েছে, লক্ষ্য করেছো?

বর্তমানে স্বাধীন, একদা-উপনিবেশ দেশগুলোতে ইংলিশ স্কুল কী হারে না গজিয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। কিন্তু গজিয়েছে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিজেদের আইডেনটিটি বা স্বাজাত্য ভুলে যাওয়ার এই এক পিচ্ছিল সড়ক। 'আগডোম বাগডোম' জাতীয় দেশী ছড়া শেখার আগে এখন কচি ছেলেমেয়েরা 'হামটি ডামটি' শেখে। অথচ দেশীয় বীজ, বিলেতী চারার মত আর কী করে হবে? তাই শিক্ষিকার 'মিল্ক' (দুধ) দিয়ে বাক্য রচনার ফরমাসে কচি ছাত্র জবাব দেয়, "মাই মাদার হ্যাজ টু মিল্ক" (আমার মায়ের দু'টি দুধ আছে)। শিক্ষার কর্ণধারদের এনিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ইসলাম তথা আল্লা-রসুলের নামে। তখন থেকেই ইংলিশ স্কুল গজাতে লাগল। বাংলাদেশে একই চিত্র।

আরো মজার ব্যাপার, যে-সব পৃষ্ঠপোষকেরা ছেলেদের মেয়েদের ইংলিশ স্কুলে পাঠায়, তারাই আবার সামাজিক প্রশ্নে ইসলামের প্রচণ্ড সেবক হয়ে ওঠেন।

এই স্ববিরোধিতার অন্তঃস্রোত আরো জোরদার হয়েছে টেলিভিশনের মহিমায়। গণ-মাধ্যমের শক্তি খাটো করে দেখো না।

তুমি এত ঘরকুনো হয়েছে কেন?

তুমি কী আত্মহত্যা করতে চাও লেখক হিসেবে?

উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের তোড়ে সাম্রাজ্যবাদের নাগ-বন্ধন শিথিল হতে লাগল। এদেশের সাম্রাজ্যবাদী একদা-রাজারা সদর দিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল। কিন্তু খিড়কি দিয়ে ঢোকার পথ তারা আগে থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার করে রাখতে ভুলে যায়নি। বিদেশী পুঁজি ক্যাপিট্যাল এবং ভাষা ওদের হাতে এক মোক্ষম অস্ত্র হয়ে রইল।

তুমি যেন মনে করো না, আমি ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখার বিরোধী। আদৌ না। কিন্তু তার বয়স দেখবে না, মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়ম মানবে না? এক সঙ্গে মাতৃভাষা, ইংরেজী, ধর্মভাষা– তিন ভাষার চাপে কতো কচি নাগরিকের মগজ যে ছেলেবেলায়ই মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে তার কোন হিসাব নেই। যত না সয়, তার বেশী ভার মাথায় চাপালে যা ঘটে, তা-ই ঘটছে। বয়স-অনুযায়ী, মেধা-অনুযায়ী মাতৃভাষার বাইরে আরো একটি বা দুটি ভাষা শেখা অবিশ্যি কর্তব্য। তার জন্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নিয়ম মানবে না, এ কেমন কথা?

কথায় কথায় একটু দূরে এসেছি। মোদ্দা ব্যাপার, এযুগে প্রচার-বাহনকে উপেক্ষা করা অন্যায়। যদি আত্মহত্যা করতে চাও, আর কোন প্রশ্ন তুলব না।

কিন্তু চোখ মেলে দ্যাখো।

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানের ভাণ্ডারী রূপে একটা আভিজাত্যই ছিল। এখন ওরা সংবাদপত্র, টেলিভিশনের কাছে পরাজিত। ওদের টেলিভিশনের কাছে ধর্ণা দিতে হয়, নচেৎ ইলেমের মহিমা প্রকাশ পায় না।

সত্যিকার সমঝদারিতা আর বড় কথা নয়। কে কতখানি বুঝল তা এখন গৌণ। তুমি কতো জনের কাছে পৌঁছাতে পারছো তাই এখন তোমার অহম বা 'ইগো'কে শান্তি দিতে পারে।

ঢাকা শহরে লাখ লাখ টেলিভিশন সেট আছে। গড়ে পাঁচজন ধরলে, এক সন্ধ্যায় লাখ লাখ লোকের সামনে তোমার বক্তব্য উপস্থিত।

অবিশ্যি, এই জন্যে মাশুল দিতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জারিজুরি ভেঙ্গে গেছে। পূর্বে সাহিত্য শিল্পে ওদের রায় মানুষ নতজানু-সমীহার সঙ্গে মেনে নিত। এখন ওদের আর সেদিন নেই।

প্লেটো সাহেব এ্যাকাডেমি শব্দটাকে মহান মর্যাদা দিয়ে গেছেন। এখন এ্যাকাডেমি মানে ফসিল, জীবাশ্ম।

দর্শন-ইতিহাস, বিজ্ঞান যা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের গুহায় ঢোকে প্রস্তরীভূত বা বিকৃত রূপে– এমন রূপই নেয় যে চেনা দায়, তুমি কোন গোলক ধাঁধায় ঢুকেছ।

সম্প্রতি সাহিত্যের আলোচনায় ওখানে মার্কস প্রবেশ করেছেন। তারও বিকৃতি ঘটতে বেশী দেরী হয়নি। মার্কসবাদ তো পান্থজনের সখা। ওখানে উড়ন্ত পাখি শিকার করতে হয়। অর্থাৎ চলন্ত জিনিস নিয়ে কারবার। কিন্তু এখন এ্যাকডেমির অচলায়তনের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই অতি-সরলীকরণে ওখানে ডক্টর মহোদয়েরা সিদ্ধহস্ত।

তাই রায় শোনা যায় :

রবীন্দ্রনাথ ? ফিউডাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরৎচন্দ্র ? ফিউডাল।

বিদ্যাসাগর? প্রতিক্রিয়াশীল।

লালন ফকীর? নাকচ।

আসলে সাহিত্য-সমালোচনায় এই জাতীয় পণ্ডিতরা পাতিবুর্জোয়া সুলভ অহমিকা মুক্ত হতে পারেন না। নিরক্ষর এই দেশ। অন্ধের দেশে কানা সম্রাট হয়ে যায়। পণ্ডিতন্মন্যতা সহজেই অনেককে পেয়ে বসে। জাঁ পল সার্ত্রের একটি উক্তি এঁরা স্মরণ কররে পারেন, "পল ভার্লেন ওয়াজ এ পেটি-বুর্জোয়া বাট অল পেটি বুর্জোয়া আর নট পল ভার্লেন।" পর ভার্লেন ছিলেন পেটি-বুর্জোয়া। কিন্তু সব পেটি বুর্জোয়া পল ভার্লেন নয়।

আসল কথা কী, বদহজম বিদেশী ভাবধারা এঁদের উদগারে বেরোয়। উদগার তো? ফলে, তার দুর্গন্ধ দূরে সরিয়ে রাখা দায়।

ওদের রাজনীতির মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। স্বদেশের মাটি তাঁরা পায়ের নীচে থাকা জরুরৎ মনে করেন না। কোনো বিদেশী নেতা নস্যি নিলে এরা হাঁচেন।

আসল কথা পণ্ডিতদের এই শ্রেণীর পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং অতীতে আর প্রয়োজন কোথায়? অতীত-বর্তমানের সম্পর্ক তারা ঘুলিয়ে ফেলেন। বুঝা গেল, মহোদয়দের বসার জন্যে পাছা (শরীফ পাড়ার অভিজাত বিদ্বানদের হয়-নিতম্ব) লাগে না।

রুশ ডেমোক্র্যাট আলেকজান্ডার হার্জেনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "উই আর নট দি ডকটর উই আর দি ডিজিজ।" আমরা বৈদ্য নই, আমরা নিজেরাই ব্যাধি।

আরো শোনা, ম্যাসমিডিয়া, সামাজিক আভ্যন্তরীণ তাগিদে গণ-মাধ্যমের উদয় ঘটে। অতঃপর বন্যাজলের মত তার স্রোতগতি কখনও বাঁধ ভাঙে, ঘরদোর ডোবায়, মানুষের অস্তিত্ব, আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ধরে টান দেয় এবং হেঁচ্‌কা টান।

ব্যাপারটা জৈবিক বা অর্গানিক তা অনেকে বুঝে উঠতে পারে না।

নিরন্তর ঝটকা কোন দিকে ধাইবে ঠাওর পাওয়া দায়।

মানুষ তো এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখে।

একই সময়ে নানা বিন্দু থেকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ অমনভাবে দেখাই জীবনকে জানার বিশিষ্ট উপায়। তাছাড়া, হেতু ও পরিণাম- কজ এ্যান্ড এফেক্‌ট্ সম্পর্কে আর পূর্বের মতো সরল রেখায় দেখা হয় না। অনেকে ভুলে যায়, যে-পৃথিবীতে তাদের বাস তা-ও পরিপূর্ণ গোল নয়, তার উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। অর্থাৎ বক্র। অথচ তুমি যদি সোজা পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও, পদে পদে প্রতারিত হবে। তখন দৃশ্যমান রূপ-এ্যাপিয়ারেন্স মনে হবে রিয়ালিটি বা বাস্তব।

ইতিহাসে কতো ঝড়ের উৎপত্তি যে এই মরীচিকা বা দৃষ্টিভ্রম থেকে তার ইয়ত্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। মরীচিকার পেছনে ছুটলে পথিকের যে-দৃশ্য ঘটে, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে তার ব্যত্যয় হয় না।

এদেশে পণ্ডিতেরা চিন্তা করে। অধিকাংশ স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের ব্যাপার।

তুমি কিন্তু জেনে রাখো, বেচারা গোবিন্দ দাস, বেচারা আদৌ স্বভাব-কবি ছিলেন না। পরিশীলিত মনের মানুষ। তাঁর কাব্যে বহু পরিচয় আছে। অথচ, অপবাদটা বেচারার নামের সঙ্গে লেপ্টে রইল। আমার মনে হয় এদেশের যারা কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি করে তাদের ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের মত অলৌকিক শক্তিধারী জীবরূপে ধরে নেওয়া হয়। আর হেন শক্তির উৎস ঈশ্বর। ক্ষমতাটা স্বভাবজাত। স্বভাব-কবির ধারণা সেদিন থেকেও আসা স্বাভাবিক।

বাদ দাও সব কথা।

আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পণ্ডিতকূল চিন্তা করে, কিন্তু হাতিয়ারের কথা ভাবে না। স্বভাব-পণ্ডিততো। চিন্তা জিনিসটা স্বয়ং হাতিয়ার তা বহুজনের বোধগম্য নয়। ব্যবহৃত হাতিয়ার খানা কেমন তা-ও ভেবে দেখে না। মাটি খুঁড়ছে পণ্ডিত। কিন্তু চেয়ে দেখে না, ওটা খোন্তা, শাবল, না কোদাল। কোদাল তো শাবল নয়। তখন মাটি খোঁড়ার রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি সব বদলে যায়।

হিন্দু পুরাণ-অনুযায়ী, বাসুকী সাপের মাথায় অবস্থিত পৃথিবী। সাপের এদিক-ওদিক হেলাদোলা পৃথিবীরও এদিক-ওদিক পাশ ফেরার চেষ্টা। অর্থাৎ ভূমিকম্প। বর্তমান যুগে বাসুকী কল্পনা হয়ে গেছে। গ্যাসের ফলে পৃথিবীর জঠরে অগ্নিমান্দ্য ঘটে, গ্যাস নিষ্কাশনপ্রার্থী তখন।

এই সিদ্ধান্তে আধুনিক মানুষ পৌঁছল কিভাবে?

হাতিয়ার বদলে গেছে। চিন্তার পদ্ধতি এখন ভিন্ন সড়কের যাত্রী। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা পরীক্ষাদির পূর্বে সেই কথাটা ভাবে। আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিস উচ্চারণ করেছিলেন, "লাইফ আনএকজামিন্ড ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং ... অপরীক্ষিত জীবন নিয়ে বাঁচার কোন সার্থকতা নেই" তা এক ধরনের হাতিয়ারেরই ইঙ্গিত। হাতিয়ারের বিবর্তন ঘটে। গোবিন্দ দাসদের (স্বর্গীয় কবির নিকট এখন ক্ষমাপ্রার্থনাসহ) নিকট এমন বাক্য বাতিল হয়ে থাকে।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব সওয়া শ' বছর পূর্বের ব্যাপার। চিন্তার রাজ্যে এক অগ্ন্যুৎপাত। জীব-জগৎ বিকাশ-পথে খোলস ছেড়ে ছেড়েই এগিয়েছে। অতীতের সঙ্গে না মিলিয়ে কোন কিছুর স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব নয়। অথচ, চিন্তা করতে গিয়ে ক'জনই বা অতীতকে পটভূমিতে টেনে আনে?

বাছুরটা এঁড়ে না বকনা, তা লেজ তুলেই পরীক্ষা করা যায়। বহু পণ্ডিত লেজে হতো দিতেই নারাজ। আলসেমির জন্যে নয়, তার মানস-ছাঁচেই ব্যাপারটা নেই।

সক্রেটিসের খেদোক্তি কী সবার কানে যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকে পরীক্ষা দূরের কথা, জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলাই অসংগত মনে করে। বরং ভেড়ার জোয়ারে স্বচ্ছন্দে ভেসে যায়। নিষেধের সঙ্গে জুজুর ভয় লেপ্টানো থাকে। বিবর্তনবাদে তেমন জুজু নেই। কিন্তু মন আগে থেকেই এমন ভাবে তৈরী হয়ে গেছে, তখন অমন পদ্ধতিই তাদের কাছে অবান্তর।

এই পৃথিবী যে নিরন্তর পরিবর্তনের ঘূর্ণিপুঞ্জ, তা অনেকে উপলব্ধি করে না। ফলে, স্থান-কাল দুই-ই স্থানু-অনড় মনে হয় তাদের নিকট।

তুমি আমার লম্বা ভূমিকার জন্যে হয়ত বিরক্ত হচ্ছ।

থোড়া রসো, বন্ধু।

আমার সাফাই গাইতে দাও।

জানো তো বৃদ্ধকালে শুক্র এবং স্মৃতি উভয় ধারণই কষ্টকর। তোমার স্মৃতিশক্তি প্রখর আছে বলে মনে হয় না।

তোমার কাল-সচেতনতার বহর দেখে বুঝে ফেলেছি। তাইতো এই কথাবতারণা।

তোমার মত অনেকেই অনড় স্থান এবং কালের ব্যাপারী। বালক-কালের জামা যৌবন-কালের গতরে ঢোকানোর চেষ্টা বহুজনে করে। যদি সফল হয় জামাটা ছিঁড়ে বা ফেটেফুটে যায়, দেহের স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট করে এবং অবয়বের কী ছাঁদ হয়, তা বয়ান নিষ্প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

মানস-জগতে একই ব্যাপার দাঁড়ায়।

মেশিনগানের মুখে তাই অনেকে তীরধনু নিয়ে লড়ায়ে প্রবৃত্ত হয়। পরিণাম অবিশ্যি পরাজয়। কিন্তু অন্তর্জগতের মরীচিকা তাদের বিরাট আশ্রয়-সান্ত্বনা। আঁত-রোগী যদি মনে মনে পালোয়ান হতে চায়, কেইবা বাধা দিতে পারে? ইতিহাসে এমন পরিহাস দেখে মাঝে মাঝে মানুষে বিশ্বাস রাখা দায় হয়ে পড়ে। পরিবর্তন তাদের চোখে সেঁধোয় না, নিজেদের হালৎ দেখেও না।

অথচ বিশ শতকের গোড়া থেকে পৃথিবীময় এত ওলট-পালট শুরু হলো যে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ এলো বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে তারা এমন জায়গায় পৌঁছলেন, তখন বস্তু-ধারণা আর পূর্বের মত নিরেট রইল না। দেখা গেল, তা কখনও তরঙ্গ কখনও কণিকা বা উভয়ের সমাহার। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি এবং তেজস্ক্রিয়া– রেডিয়েশান আবিষ্কারের ফলে স্থান এবং কালের চিরাচরিত ধারণার ভিত নড়ে গেল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক সোডী এবং রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয়ার মূল সূত্র আবিষ্কার করে দেখলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু কারণিক (কজাল, হেতু) পরিণাম নয়। আইনেস্টাইন ওই দুই আবিষ্কার তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্বে সমন্বয়ে ঘটান। জগৎকে দেখার সনাতন তিন মাত্রার জায়গায় যোগ হলো চতুর্থ মাত্রা ঃ স্থান-কাল-প্রবাহ। আইনেস্টাইনের ভাষায় স্পেস-টাইম কনটিনিউয়াম। এই প্রবাহ এক রকমের টাইম কিন্তু সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাইমকালের প্রত্যেক মুহূর্তে নিহিত। বড় কঠিন ধারণা। সহজে কল্পনায় ঠাঁই দেওয়া কষ্টসাধ্য। স্থান এবং কালের প্রাচীন ধারণা আর রইল না। সময় সরল-রেখায় বিস্তার নয়, যেমন প্রাচীন উপন্যাসে নায়কের জন্ম–যৌবন–জরা। মার্শাল প্রস্ত, জয়েস জেমস প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীরা অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটেই কিন্তু উপন্যাস রচনায় এগিয়ে গেলেন। প্রুস্ত বিরাটভাবে গোটা সমাজের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু প্রকাণ্ড ক্যানভাস মনে হবে যেন স্থিরচিত্র। গতি যদি কিছু থাকে তা বৃত্তাকার, চক্রাকার এবং তার তাৎপর্য বুঝা যায় পুনরাবৃত্তিতে।

জয়েসের উপন্যাস 'ইউলিসিস' মাত্র একদিনের ঘটনা। কিন্তু তা সময় সম্পর্কে নতুন ধারণার পর্দায় ফেলা এবং বৃহৎ আয়তনে। উপন্যাসের চরিত্রদল যেন কালের সড়কের উপর লেপ্টে আছেন। এই অবস্থা থেকেই তাদের পারিপার্শ্বিক আচরণ, অন্যান্য ঘটনা তাৎপর্য লাভ করে।

বস্তুবিশ্বের ধারণায় ভূমিকম্প।

মানস-বিশ্বও আর চিরাচরিত আদি ঠাঁয়ে থাকতে পারল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছর মানসিক বিপ্লবের এক মন্থিত ময়দান। কয়েকটা ঘটনা মাত্র তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। এই বছরে ম্যাক্স্ প্ল্যাংকের- "কোয়ান্টাম তত্ত্ব" প্রকাশিত হয়। একই বছরে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের "নিউ ইন্টারপ্রেটেশান অফ ড্রিমস বা ভাষ্য" এবং টমাস মানের উপন্যাস- "বাডেনব্রুকস" ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। তিন বছর পরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বিমান-সফর। একই বছরে বেরোয় ম্যাকসিম গোর্কির 'দি লোয়ার ডেপথ' 'পাতালপুরী' নাটক। রিয়্যালিজমের আর এক অভাবনীয় তিক্ত সংযোজনা।

তখন থেকে গোর্কির যাযাবর দল বিশ্বজয়ে অগ্রসর হয়।

এদেশে পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নজরুল প্রমুখের রচনায় তার প্রতিধ্বনি। শ্রীকান্ত, বেদে, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী ইত্যাদি স্মরণীয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আইনেস্টাইনের "থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি"–আপেক্ষিক তত্ত্ব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর সাংস্কৃতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান নায়করূপে অভিনন্দিত হন।

ওই বছরে এক রুশ ভদ্রলোক, ভ-াদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ– এক বই প্রকাশ করেন এন. লেনিন– এই ছদ্মনামে। বইয়ের নাম "টু ট্যাকটিক্স ফর সোশ্যাল ডেমোক্রিসি ইন এ ডেমোক্রেটিক রিভল্যুশান– গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের জন্যে দুই কৌশল।

তিন বছর পর (১৯০৮) রেনার মারিয়া রিল্কের নতুন কবিতার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাসিলি ক্যান্ডিনেসকী প্রথম বিশুদ্ধ নির্বস্তুক এ্যাবস্ট্রাকট পেন্টিং চালু করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নীলস বোহ্‌রকৃত এ্যাটমের কাঠামো ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের এক বিরাট পদক্ষেপ।

পৃথিবীকে আরো চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর এক সামাজিক বিপ্লবের বিস্ময়ের জন্যে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। কাল মার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির সতর বছর পূর্বে। দেখা গেল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সতর বছর পরে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে, রুশ সর্বহারাদের বিপ্লবের আতুর-ঘরে। নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছেন সেই ছদ্মনামা ভদ্রলোক যিনি বারো বছর পূর্বে 'টু ট্যাকটিক্‌স ফর ডেমোক্রেসি ইন এ ডেমোক্রেটিক রিভল্যুশান' পুস্তক লিখেছিলেন। নিজের নামের কাছে তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। লেনিন নামেই এখন তিনি বিশ্বে পরিচিত এবং বহুজনের শিরঃপীড়া।

শৃন্বন্ত, বয়স্য। শোন বন্ধু, শোনো।

তালিকা বহু দেওয়া যায়।

এক কথায় বলতে গেলে মার্কস-ফ্রয়েড-আইনেস্টাইন– এই ত্র্যহস্পর্শে পৃথিবীর ধ্যানধারণা ডিগবাজি খেতে লাগল।

তুমি এত তলিয়ে দ্যাখো বা ভাবো কিনা, আমার সন্দেহ আছে।

লিখেছো তো রাশ-রাশ। কিন্তু দেখা যায়, জীবন-সম্পর্কে আজও তোমার পজিটিভ ধারণা নেই। আর থাকলেও তার তেজ নদারাৎ। তোমার জগচ্চিত্র অস্পষ্ট, রংছুট।

যুক্তির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ঈমানের উপরেই সত্যিকার শিল্প সাহিত্য গড়ে ওঠে। যুক্তিই মুক্তি। অনেক সময় ঈমান হয়ত নিকট ভবিষ্যতে পরিবেশের কোন সুরাহা করে না। কিন্তু পেছনে সত্যিকার সততা থাকলে শিল্পের কিছু মঙ্গল হয়। টি.এস. এলিয়েটের কথা ভাবো। ভদ্রলোক এক পর্যায়ে জাহির করলেন, তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় রাজতন্ত্রী মনার্কিস্ট, ধর্মে ক্যাথলিক, রচনায় ধ্রুপদী অর্থাৎ ক্লাসিসিস্ট। এসব তত্ত্ব তার কাব্যশক্তির কোন ক্ষতি করেনি। এলিয়ট কিন্তু আয়রনিস্ট বা শ্লেষবাদী। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নেতিমূলক। 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' নেতিমূলক, পোড়ো জমির বাইরে তিনি যেতে পারেননি। এমন পজিশান থেকে কাব্যশিল্প হয়ত উৎরাতে পারে, কিন্তু তা জীবন-শিল্প হয়ে ওঠে না।

দান্টে, গ্যেটে, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহৎ শিল্পীরা জাতির জীবনে আলো বাতাসের মত প্রাকৃতিক সহচর হয়ে যান। এলিয়ট তা নন। অপূর্ণতার এই উপলব্ধি তাকে হয়ত শেষে ঈমানের প্রশ্নে উৎপীড়িত করেছিল। তাই বিষ্ণু দে-র ভাষায়, করুণ কালবিরুদ্ধ রাজনীতির গুহায় এলিয়ট অবসিত হন।

এখন নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো, তুমি একটি বেঈমান। পরোক্ষ পরিবেশ-সচেতনতা এবং কাল-সচেতনতা এক জিনিস নয়। পরিবেশ অনেক সময় দুঃসহ বর্তমানের গর্তে ফেলে রাখতে পারে। তুমি যদি সেখানেই বুঁদ হয়ে যাও, কালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃহত্তর পটভূমি তোমার চোখ এড়িয়ে যেতে বাধ্য। মুহূর্তিক প্রত্যক্ষের বাইরেও তো জগৎ আছে, কাল আছে। অর্থাৎ বর্তমানের পাঁকে পড়ে তুমি ভবিষ্যতের ছবি আর দেখো না। আর ভবিষ্যতে কোথায় যাবে তা না জানলে, বর্তমান কী তার সকল করণীয় বক্তব্যসহ তোমার কাছে ধরা দেবে?

আইনেস্টাইনের কালপ্রবাহ বিজ্ঞানের তত্ত্বে যাই হোক, শিল্পীর কাছেও অমূলক নয়। স্মৃতি অতীতের ব্যাপার, আশা ভবিষ্যতের ব্যাপার। বর্তমানে তুমি তো আছোই। শিল্পীর কাজও স্মৃতি, আশা বর্তমানকে নিয়ে। কালের প্রবাহ শিল্পীর চেতনায় ধরা পড়বে না কেন?

অবিশ্যি, ব্যঙ্গ, শ্লেষ শিল্পীর আসরে মে-চ্ছ না হলেও মহৎ শিল্পের পাশে জায়গা পায় না।

এলিয়টের মনে সত্যিই এসব প্রশ্ন উঠেছিল কি না, আমার জানা নেই। তবে আন্দাজে ধারণা করা যায়। যেহেতু ঈমান-ফেইথ্ নিয়ে তিনি প্রচণ্ড মাথা ঘামিয়েছেন। তার বহু প্রবন্ধে তার সাক্ষাৎ মেলে। তবু শ্লেষবাদীরা মহৎ শিল্পী নয়, এলিয়েটের এমন ধারণা অমূলক। পরিবেশের চাপে শিল্পী স্ফীতগ্রীবা গান নাও গাইতে পারেন। আনাতোল ফ্রাঁস তার পরম সাক্ষী। কিন্তু তিনি মহৎ শিল্পী নন, কেউ বলবে না।

একদম নির্জন স্তব্ধতা আর যাই হোক, আত্মসর্বস্ব সন্ন্যাসী, নিউরোটিক বা বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গীত হতে পারে। তাও সন্দেহজনক। প্রৌঢ়কালে বিবক্ষা পেয়ে বসে। বক্‌বক্ করে মানুষ তখন মজা পায়, যেহেতু আর কিছু করার থাকে না। তোমার আমার একই বয়স। একলগ্নে জন্ম। তুমি লক্ষ্য করেছো, আমি বড় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ধাইছি। তুমি বলেই এত স্বাধীনতা নিচ্ছি। সুবাদ বহুৎ বহুৎ আদিম।

কাল-প্রশ্নের কাছে আবার ফিরে যাওয়া যাক।

কাল মৃত্যু নয় এখানে : টাইম।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে কালের ধারণা বদলাতে থাকে। জড়বাদী দার্শনিকের কাছে সময় ছিল বিষয়গত অর্থাৎ অবজেকটিভ, ভাববাদীর নিকট বিষয়ীগত বা সাবজেকটিভ। সেই অবস্থা আর রইল না। অনেকে এই ব্যাপারে নির্বিকার। অপরের অজ্ঞতা তবু তেমন দূষণীয় নয়। কিন্তু কবিকুল, সাহিত্যিক, নিঃস্পৃহ হয় কীভাবে? গোবিন্দ দাস মার্কা কবির সংখ্যা তাই শ'য়ে শ'য়ে মেলে। – এমন তো হওয়া উচিত নয়, কস্মিনকালেও। অন্ধভাবে এখন সাহিত্যের ধর্ম-পালন তো দূরের কথা, সাধারণ ধর্ম পালনও মঙ্গলকর নয়। ধর্ম এবং সাহিত্য তখন দুই-ই হয়ে পড়ে কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার চোরাবালি।

পশ্চিম বঙ্গেও এখন তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মেলে। ওই দেশে তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে এমন ব্যাপার চোখে পড়ত না। অবিশ্যি বিভিন্ন সোশ্যাল বা সামাজিক ফোর্সের গাঁজানি (ফারমেনটেশন) যখন শুরু হয় পরিবেশের চাপে, তখন ক্লেদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁক তলা থেকে উপরে ভেসে ওঠে। ওই বঙ্গেও চিত্র স্বতন্ত্র কিছু নয়। অবিভক্ত বঙ্গে পরশুরাম অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজশেখর বসু তার বিখ্যাত 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প লিখেছিলেন ষাট বছর পূর্বে, তা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এক জেহাদ। এখন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাঁই বাবার ভক্তদের কীর্তন শোনা যায়।

বুদ্ধিবিরোধী, যুক্তিবিরোধী মানসিক প্রবণতার সামাজিক কারণ বহু। সচেতন না হলে তুমি সেই খোন্দলে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এই খোন্দলে পড়ার মানস-আবহও শিল্পী সাহিত্যিক রচনা করতে পারে।

বর্তমানে অনুন্নত দেশের দশা সাম্রাজ্যবাদের থাবার নিচে আরো কাহিল। অপসংস্কৃতির ড্রাশ বিদেশ থেকে বড় সুক্ষ্ম ধারায় আসে, টের পাওয়া দায়। যুগযুগান্তরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকারীরা আর পূর্বের কায়দায় রক্ত মোক্ষণ করতে পারে না। তাই দেশী এজেন্টদের সাহায্য নেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এদেশে জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করেছিল যে-মতলবে, তারি সাংস্কৃতিক প্রতিক্ষেপ এখন নানাভাবে দেখা যায়।

একটা কৌশল হালফিল তুমি দেখেছো।

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশ হঠাৎ প্রাচ্যের ধর্মগুলোর প্রতি ভয়ানক ভক্তিমুখর। ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রশংসায় নতজানু। মধ্যপ্রাচ্যের আমদানী তেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ এখন স্পষ্ট। হিন্দু ধর্মে ওদের মতি আরো বেশী প্রকট। "কৃষ্ণচৈতন্য—কৃষ্ণ-কনসাসনেস" আন্দোলন লক্ষ্য করে থাকবে। পৃথিবীময় ওদের শাখা-প্রশাখার বিস্তার। শ্বেত রঙ, নধর-তনু মার্কিন ভক্ত ন্যাড়া-মাথা, পরনের গেরুয়া, যেন কৃষ্ণসখা বলরাম। পশ্চিমী যন্ত্রসভ্যতার চোলাই এই সব ভক্তের দল অনুন্নত দেশে আসে কৃষ্ণপ্রেমচৈতন্য বিস্তারে। ওরা নিজেদের দেশে আবদ্ধ থাকে না কেন? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গত একশ' বছর দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, নিজেদের ঘরে সেইখানে প্রেম বিতরণে ওরা উদ্যোগী হয় না কেন?

ওরা ভিয়েতনামে যায় না, লেবাননে যায় না, ইসরাইলে যায় না কেন প্রেমের পাইপ নিয়ে?

ফাঁকিটা সেখানেই ধরতে পারবে।

পূর্বে উপনিবেশ-বিস্তারে ওরা বাইবেল তথা পাদ্রী পাঠাত, পরে বুলেট। এখন ওরা মার্কিন দেশ থেকে আর পাদ্রী পাঠায় না। পাঠায় মার্কিন সন্ন্যাসী। কিন্তু অনুন্নত দেশের ছাঁচে তৈরী।

বর্তমান নয়া-উপনিবেশবাদের যুগে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী মুৎসুদ্দীদের গাঁটছড়া বাঁধা দেখা যায়, তারি হুবহু প্রতিচ্ছায়া আধ্যাত্মিক জগতে। এখনও কিন্তু ওরা বুলেট যোগায়। তবে নিজেরা আর পূর্বের মত ব্যবহার করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা বুলেট সরবরাহ করে অনুন্নত দেশের এজেন্ট স্যাঙাতদের হাতে।

এদেশের গোবিন্দ দাস সাহিত্যিকরা জানিতে অজানিতে ওদের খপ্পরে পড়ে। পশ্চিম বঙ্গে এক সাহিত্যিককে দেখলাম রাধাকৃষ্ণের কাহিনী– 'সনাতন বিলকুল' পরিবেশন করেছেন আধুনিক ভাষায়। উত্তম মুদ্রণ, সুশোভন জ্যাকেট গ্রন্থ। তিনি জানতেন না কার্টার (প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) প্রেম এবং কৃষ্ণ- প্রেমের গাঁটছড়া একই রশি দিয়ে বাঁধা।

রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে বই লিখতে আপত্তি নেই। তা আধুনিক চেতনার কোন দিশারী হবে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন : "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।" এই গ্রন্থ মনীষার আলোক-বর্তিকা। কিন্তু যেখানে প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন ভক্তি ছাড়া আর কিছু মেলে না, তা অন্ধতার পিছল সড়ক হয়ে দাঁড়ায়। কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার মারীবাষ্প নার্ভে-মস্তিষ্কে সেই পথে ঢোকে।

পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরা হয়ত এতদিনে উপলব্ধি করেছেন যে, রাজপথে, অলিতে-গলিতে "মাস্তান"দের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্বে অত্রস্থলে সাহিত্যিক মাস্তানদের আবির্ভাব ঘটে। গুণ্ডা সরীসৃপের জন্যে মানসিক ঝোপ-জঙ্গল, বিবর ওৎ পাতার জন্যে, আগেই তৈরী হয়ে যায়।

কল্লোল-যুগীয় তিরিশের বিদ্রোহী কবিদের মানসব্রজনা পঞ্চাশ বৎসর পরে আজ নিরাসক্ত পর্যালোচনা কঠিন নয়।

স্বর্গীয় নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া এক যুগের মহাবিদ্রোহীদের অধিকাংশ পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়ার মোসাহেবে পরিণত হন। নিজেদের পতাকা আর উন্নত রাখতে পারেননি যুগের উন্মোচন-পথে। "সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্রঠাকুর"... রবে যারা হাঁক মেরেছিলেন, তাদের অন্যতম বুদ্ধদেব বসু শেষে রবীন্দ্রনাথেই "সব পেয়েছিল দেশ" লাভ করেন।

অনুন্নত দেশে Sex (যৌন শব্দের জায়গায় আমি 'কন্দর্পনা' ব্যবহার করছি, সকলে ভেবে দেখবেন) একটি 'ট্যাবু'। এই ট্যাবু তৎকালীন কল্লোল যুগের বিদ্রোহীরা ভাঙতে এগিয়েছিলেন। 'ইন্ডিভিজুয়েশান' বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় তাদের দান শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু রোমান্টিক মোড়কে তনু ঢেকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন হাস্যকর, মধ্যবিত্ত-সুলভ তাঁদের বিরোধিতার পরিণামও তদ্রুপ। দন্ত-দর্শনেই সব পর্যবসিত, দংশনে নয়।

স্বর্গীয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কন্দর্পনা বিষয়বস্তু করে (বেদে, টুটাফুটা ইত্যাদি) সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। শেষে তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁর সমাপ্তি। তিনি শেষে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে নির্বাণ লাভ করে। বিবর্তনের ধর্ম অবিশ্যি লেখক কর্তৃক যথা-পালিত। হিন্দু পুরাণ এবং নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সায় আছে ঃ "মানুষ ঈশ্বর পূজার পূর্বে লিঙ্গ-পূজা করিত।" মরমী ভক্তিবাদ প্রতিক্রিয়ার হাত জোরদার করে, স্বর্গীয় সেনগুপ্ত জানতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই উপমহাদেশময় সমাজ-তাণ্ডবের ঢক্কা-বাদকরূপেই এমন মানস-আবহ রচনার কারিগরদের পরিচয় আজ স্পষ্ট।

একদা-বিদ্রোহীদের কাছে বাছ-বিচারও তেমন ছিল না।

উপনিবেশে সাহিত্যিক-দাসত্বের খোঁয়ারি কাটতে সময় যায়।

কল্লোল-যুগের কল্যাণে, ন্যুট হ্যামসুনের "হাংগার-বুভুক্ষা" উপন্যাসখানা তখন সমাদর লাভ করে। মাত্র দুই দশক পরে হ্যামসুন হন হিটলার-পূজারী। টমাস মান গভীর পরিতাপের সঙ্গে লিখেছেন যে তাঁদের এমন এক সতীর্থ ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবেন, ভাবা দায়। লেনিন কিন্তু ওই বই পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, যে লোক ক্ষুধার প্রশস্তি গাইতে পারে সে ত ফ্যাসিস্ট। রাজনৈতিক নেতার দূরদৃষ্টি ছিল। কিন্তু এদেশে রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন "বিদ্রোহীদের" চেতনায় তা ধরা পড়েনি। তাঁদের জীবনের প্রতি কৌতূহল শেষে মরমী ধোঁয়ার ভিতর প্রশান্তি লাভ করেছিল।

আলডুস হাক্সলি ইংলন্ডে মাঝবয়স থেকেই গাঁজায় চক্ষুহীন হন। তাঁর "আইলেস ইন গাজা" স্মরণীয়। উপন্যাসে গাজা যদিও একটি শহরের নাম। মোদ্দা ব্যাপার– সৌন্দর্যের সাধনা সচেতন-ভাবে না করলে বর্বরতা, নৃশংসতা– এক বাক্যে, অমানবিকতার আগমনী হতে পারে।

বাংলাদেশের অধিবাসী তুমি। তোমাকে ওই কথাটা কী ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবে?

তোমার থেৎলানো গায়ের চামড়ায় চাবুকের বহু দাগ রয়েছে। তা কী এত জলদি শুকিয়ে যেতে পারে?

পারো কি তুমি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভুলে যেতে?

পাকিস্তান হওয়ার পর, যদিও সূত্র পূর্বের, চব্বিশ বছর ধরে চলল উত্তরাধিকারের লড়াই। শাসকশ্রেণী এবং তাদের পূর্ব পাকিস্তানী এজেন্টরা সাচ্চা উত্তরাধিকারকে ঝুটা প্রতিপন্ন করার জন্যে কম সচেষ্ট ছিল না।

তারা কখনও টান দিত ভাষা নিয়ে, কখনও ধর্ম ধরে। হ্যাঁ, ধর্ম। ফিরোজ খান নুন নামক এক গভর্নর ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। তিনি হাঁকফুকার ঘোষণা করলেন "বাঙালী মুসলমানের খৎনা হয় না।" তাকে চেপে ধরলে তিনি প্রাইভেটে নাকি বলেন যে তার স্ত্রী তাকে এই তথ্য যুগিয়েছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম ভিকি নুন, যার নামে বর্তমান "ভিখারুন নেসা গালস্ স্কুল।" এই স্কুলের নামটা মহীয়সী কোন বাঙালী রমনীর নামে এখনই পরিবর্তন করা সকলের কর্তব্য।

দাসত্বের এমন চিহ্ন কারো বরদাস্ত করা উচিৎ নয়।

বিদেশী ওই ইটালীয় মহিলা আর যাই হন– মহীয়সী ছিলেন না, যদিও গভর্নরের স্ত্রী রূপে তার শয্যামূল্য থাকতে পারে।

ইটালীয় রোড করপোরেশন সংস্থার চেয়ারম্যান ছিল কাউন্ট কাম্পানেল। ভদ্রলোক আবার "ভিকি নুনের" বন্ধু। সেই সূত্রে পূর্বপাকিস্তানে রাস্তা তৈরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকাদারী ইটালীয় রোড করপোরেশনকে দেয়া হয়। পূর্বপাকিস্তানী বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারদের মুখে যা থুথু স্বরূপ। যেন রাস্তা তৈরী করার মত ইঞ্জিনিয়ারও তখন এদেশে ছিল না।

পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর মানসিক দেউলিয়াপনা প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠল রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর। তখনও স্থানীয় এদেশী অনুচর পাওয়া গেল সমর্থনে কীর্তন গাইতে।

চব্বিশ বছর ধরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরাল উত্তাধিকারের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল বৈকি।

তখন এই দেশে এক শ্রেণীর কবি কী সৌন্দর্যের চর্চায় কবিতা লেখেনি?

এক শ্রেণীর প্রবন্ধকার কী প্রবন্ধ লেখেনি মনীষার প্রদীপ রূপে?

অনেক শিল্পী কি ছবি আঁকেননি?

সবাই সৌন্দর্যের সাধক, বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিবেশক। সংবাদপত্রে অন্যান্য প্রচার বাহনে সবাই খ্যাতনামা।

তাদের অনেকের সৌন্দর্য-সাধনার ফলশ্রুতি ??????

তিরিশ লাখ মানুষের লাশ, ঈমানদার বুদ্ধিজীবীদের নির্মম প্রাণঘাত।

তাদের অনেকের জ্ঞানচর্চা, সৌন্দর্য-সাধনার ফলশ্রুতি???

ধর্ষিতা, মা-বোনের অসহায় আর্তনাদ, জনক-জননীর সম্মুখে কন্যার বেইজ্জতি-লব্ধ, মূক-স্তব্ধতা, নিঃশব্দ ফরিয়াদ—।

তাঁদের সৌন্দর্য-সাধনা তথা প্রাণদাত্রী চেতনা সৃষ্টির পরিণাম ???

দুই কোটির বেশী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আবার আদিম যুগের যাযাবর— গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঝোপ-জংগলে এক ফালি নিরাপদ ঠাঁই সন্ধানে হন্যে, সদা-সন্ত্রস্ত ইঁদুরের প্রতিবিম্ব।

গুণ্ডা—গুপ্ত আঁততায়ী রাজাকার আলবদরের অন্ধত্ব খুনীদের নিঃশঙ্ক বিচরণের উপযোগী অন্ধকারের ছায়া এই সৌন্দর্য-সাধকের দল দেশের মানস-আবহে দিনের পর দিন কি তৈরী করে রাখেননি?

তারা আজ অস্বীকার করতে পারেন?

তাই বলছিলাম, বন্ধু, সৌন্দর্যের সাধনা, জ্ঞানের সাধনা সচেতনভাবে না করলে তা বর্বরতা, নৃশংসতা— এক বাক্যে অমানবিকতার আগমনী, প্রস্তুতি-ভূমিকা হতে পারে।

নৈতিকতার প্রশ্ন তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে চিরকাল জড়িত।

মানস-আবহ থেকে মানবিকতা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিয়ে রাখলে, শূয়োরের গোঁৎ-গোঁতানিও কাব্য-সাহিত্য হয়ে উঠত এবং দান্তে, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিত।

বাঙালী মুসলমানের বয়স আট শ' বছর হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলামীর জিঞ্জির তাদের গলায়। এমন দাস-কূলের প্রত্যাশার আকাশ ও তো দিকচক্রবাল-হীন হতে পারে না। তাই পাকিস্তানী শাসকদের নিকট এদেশী সৌন্দর্য্য-সাধকেরা বড় স্বল্পমূল্যে বিক্রি হতো। কয়েকটা বাড়তি পাৎলুন, জ্যাকেট, মাঝে মাঝে বিদেশী ট্যুর, কিছু "পশ্", হোটেল পশবার মতো পকেটের তাগদ, ঈষৎ আর্থিক নিরাপত্তা। এই ত ওদের দাম !

পুরুষানুক্রম গোলামের প্রত্যাশা গগনচুম্বী হবে কেন?

"দরিদ্রের স্বপ্নেও দীনতা থাকে।" কথাটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।

উত্তরাধিকারের সংগ্রামে ওরা সাচ্চা, না, ঝুটা চেতনা পরিবেশন করছিল, চব্বিশ বছর পরে ইতিহাসের নির্মম বাস্তব তা স্পষ্ট চোখে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আর দৃষ্টিভ্রমে কোন প্রশ্ন ওঠে না, সন্দেহের দোলায় দোলার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

জানিনে, ওদের বিক্রীত এবং বিকৃত বিবেকের গায়ে অনুতাপের কোন স্পর্শ লেগেছে কি না, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো। যে- কোনো মানুষের অধঃপতনে তোমার-আমার দুঃখ পাওয়া উচিত। যেহেতু পতনটা মানুষের।

তবে বেশি দুঃখ করো না। ইতিহাসের ট্র্যাকশটে ওদের ছায়া অন্ধকারও গ্রহণ করবে না।

একদা জিন্না এভিন্যু বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিন্যু। ইতিহাস এইভাবেই তুরুপ করে। তার অত্যারোপ– সুপার ইমপোজিশনের খেল অন্ধের দল কখনও দেখতে পায় না।

ভাবদর্শ–আইডলজি আকারহীন, নির্বস্তুক কিছু নয়।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার অদৃশ্য শিকড় প্রোথিত পোঁতা থাকে।

অত্যাচারী যদি নিজের নিপীড়ন-জুলুমকে ন্যায্য, যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান করে তুলতে না পারে, তার জুলুম তো মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বসবে।

দস্যু নিজেকে দস্যু বলে জাহির করলে কী সে ডাকাতি করতে পারতো?

তাই ছদ্মবেশ প্রয়োজন হয়।

ভাবাদর্শও এই ছদ্মবেশের একটি সহায়।

আলীবাবা কাহিনীর দস্যুরা নিজেদের তেলের সওদাগর বলে পরিচয় দিয়েছিল।

ঈমান এবং সততা নিয়ে বাঁচতে হলে কাল-পটভূমির দিকে সদা-জাগ্রত প্রহরী চোখ রাখা অপরিহার্য।

এখানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলে তুমি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান মানুষ হতে পারো কিন্তু সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে চরম অবমাননায় তার দাম দিতে হয়। এই সোজা সূত্রের কথা অনেকে মনে রাখে না।

চল্লিশ বছর পূর্বে এ কবির উদয়কালে মনে হয়েছিল, ভবিষ্যতে দেশের মানুষ এক মহৎ কবির সন্ধান পাবে। কিন্তু জীবন-যাচাইয়ের পথ তিনি ভুলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পাকিস্তান ও ইসলাম সমার্থবাচক। অর্থাৎ পাকিস্তান টিকে থাকলেই ইসলাম টিকে থাকবে। মূর্খ কবি রাষ্ট্র এবং ধর্মের পার্থক্য বুঝলেন না।

মগজের সাধনা না থাকলে মাজাও আর সোজা থাকে না।

তখন সরীসৃপের দলে পড়তে হয়।

জীবদ্দশায় কবি দেখে গেছেন পাকিস্তান ভেঙে গেল (আর যেটুকু অবশিষ্ট একত্রিত আছে, তা নেহায়েৎ ডাণ্ডার মহিমায়) কিন্তু ইসলাম টিকে রইল যথাপূর্ববৎ।

অন্ধ মোহগর্তে পতিত প্রারম্ভে প্রতিভাবান কবি এখন ডজন ডজন মাইনর রোমান্টিক কবিদের অন্তর্গত। তাঁর বিরাট সম্ভাবনা ভ্রষ্ট বুদ্ধির চোরাবালিতে অজানিতে নিঃশেষ হয়ে গেল। কবি তিনি কিন্তু জালেমের দুঃশাসন, জল্লাদের হাতিয়ার চালানোর মানসিকতা গঠনের কারিগর।

ইতিহাসের কাছে তাঁর এই কলঙ্ক কি কেউ খণ্ডাতে পারে?

তাই বলা হয়, ইতিহাসে ক্ষমা নেই।

জানো, বন্ধু, ইংরেজরা যাকে বলে "সেন্স পিরিয়ড" অর্থাৎ কাল বোধ সম্পর্কে তাই বড় সতর্ক থাকতে হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর তেইশ বছর পেরিয়ে গেল।

জীবনে ইতিহাসের এমন ঘূর্ণিঝড় দেখার সুযোগ তো সচরাচর আসে না।

ঝড় বয়ে গেল।

অথচ আজও একটা উপন্যাস লেখা হলো না।

যা হয়েছে, তুমিও স্বয়ং দাগী আসামী, সব নুন-চামড়ার উপর ঈষৎ খামচি।

বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার কাছে এমন শ্রমসাধ্য ব্যাপার আশা করা যায় না।

কিন্তু তরুণ বন্ধুদের কাণ্ড দ্যাখো।

ওদের কাছে যেন ইতিহাস নেই। 'গ্রান্ড ভিজন' বিরাট দিব্যদৃষ্টি নিয়ে এগোনোর চেষ্টা দূরের কথা, বরং পাশ কাটিয়ে যেতে আনন্দ পায়। অথবা, এখানে-সেখানে ঈষৎ খামচি।

মুক্তিযুদ্ধের এক-আধখানা ঘটনা, লন্ডনে সেই সময় তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ধুক্‌পুকনি, ইতিহাসের লাভাস্রাবী অগ্ন্যুৎপাত নিয়ে প্রায় ছেলেমানুষি বা লেখা-লেখা খেলার এই এক তামাসা চলছে।

এমনিতে বাংলা উপন্যাস বিশ্বের আসরে অতি দীন, দরিদ্র, জীবনের নানা দিকে যাতায়াত-হীন। সেখানে 'মালটিপল টাইম' অর্থাৎ যৌগিক কাল, ভার্জিনিয়া উলফের ডবল টাইম– বা কোন দার্শনিক চিন্তার খেই ধরে এগোনো, কিংবা দর্শকের বিন্দুতে না থেকে লেখক হিসেবে সোজা জীবনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে উপন্যাস রচনা– এমনতর নানা পরীক্ষার চেষ্টা বাঙালিদের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণরা প্রধানত ম্যাসমিডিয়ার শিকার। পূর্বেই বলেছি, ফলে, লেখক নয় ক্যাটারিং এজেন্ট।

খেপ্‌লা জালের বেষ্টনীর মত বিরাট চৌহদ্দি জুড়ে জীবনকে নানা কোণ থেকে ধরার প্রবণতা কোথাও চোখে পড়ে না। ভাসা ভাসা কিছু ঘটনা, কাহিনী বাজারে ছাড়া যেন আমাদের ব্রত।

বাঙালি চিন্তা করে শুনলে তাই আমার হাসি পায়।

এই আত্মদীনতা সম্পর্কে অনেকে সচেতনও নয়।

আজকাল ছোট গল্প লেখা আগের চেয়ে ঢের কঠিন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তাগিদে য়ুরোপে আধুনিক ছোট গল্পের সূত্রপাত। কিন্তু মানুষ আবার যৌথ জীবনের দিকে ছুটে না গেলে তার পরিত্রাণ নেই।

আণবিক দানবের হাতিয়ার তা আরো অবধারিত করে দিয়েছে। নতুন আঙিকের সন্ধানে সিরিয়াস লেখকেরা চিন্তিত।

ছোট গল্পের ফর্ম কী হবে? আবার কী আমরা সোজাসুজি কথকতায় ফিরে যাব, অথবা উপাখ্যানের আঁচল ধরব?

প্রবন্ধের ছাঁচে কী ছোট গল্পকে ফেলা যায় না?

এত রকম সমস্যা সম্মুখে।

তরুণ বন্ধুরা বয়োধর্মে নানা দিকে ফেটে পড়ে না কেন? তবু একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়। সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্যে তা দরকার।

অবিশ্যি তুমি নিজে বৃদ্ধ তা বিস্মৃত হয়ো না।

তোমার-আমার জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এই এক ট্র্যাজেডি। একটা সময়ের পরিসরে তুমি আছো, আমি আছি। গড়ে ষাট-সত্তুর খুব জোর আশি বছর। তার পর নেই।

কিন্তু সংসারের প্রবাহ তো লুপ্ত হবে না। অবিশ্যি মৃত্যু আমার কাছে আর এক ধরনের নতুন জীবন-ধারা, অন্য কেরিয়ার। একটা লোক চলে যায়। কিন্তু তার কৃত কাজ থাকলে তা জানান দিতে থাকে। মানুষের সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় না।

এত দিনে নিশ্চয় তুমি উপলব্ধি করেছ, তুমি লেখক নও। তুমি এক ধরনের মুদ্দফরাস ঝাড়ুদার। লেখনী তোমার পতাকা নয়, তোমার পতাকা সম্মার্জ্জনী।

দুঃসহ বর্তমানের মুখে তাৎক্ষণিকতায় সমস্ত উদ্যম অপচয় করেছ।

জাতীয় জীবনের বুদ্বুদের পেছনে তোমার সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা আইসবার্গের উপরি-স্তর। আরো গভীরে ডুব দিতে শেখনি 'অরূপ রতন আশা করে'।

উপন্যাসের কল্যাণে ব্যক্তি-মানুষ জেনেছে তা-কে ইতিহাস দিয়েছে ব্যক্তি-মানুষের স্বীকৃতি।

ব্যষ্টি-গোষ্ঠির মিলিত জীবন-ধারার তরঙ্গ-কল্লোলের ঐক্যতান শুনতে পাওনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনদিন।

বাংলাদেশের সীমানায় পদ্মানদীর বাঁধ থাকার ফলে আত্মসন্তুষ্টির শিকার এক রকমের গাঁইয়া মোড়ল বা লোকাল 'লায়ন' (স্থানীয় সিংহ) হওয়াই তো এদেশের সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু পৃথিবী আরো বিচিত্র এবং বিশাল তা ভুলে যাও খুব সহজে।

তুমি ওজর তুলবে, আমার জানা কথা, প্রৌঢ়কালে বৃদ্ধকালে কী মত বদলানো যায়? অভ্যেসের মতই তা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবানবন্দি চিরকাল স্মরণীয়।

নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি পরিবর্তনের কথা অকপট স্বীকার করেছেন।

দিলীপ কুমার রায়-কে এক চিঠিতে মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে লিখেছেন, "মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বারবার মত না বদলাতেন তাহলে আজকের দিনের সংগীতসভা, ডাইনসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হতো এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হতো যে যারা আজ নৃত্যকলার পালোয়ানির পক্ষপাতী তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তাহলে বুঝবো এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশের সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি।"

AMARBOI.COM

সৃষ্টির তাগিদে মত বদলানো কোন অপরাধ নয়।

আমার কাছে স্বীকারে তোমার ইজ্জত যাবে না।

কালপরিক্রমা তুমি পরিপূর্ণ অনুধাবনে অক্ষম। তুমি অবিশ্যি স্বীকার না-ও করতে পারো। কিন্তু আমার বক্তব্য বললাম এবং খুব ভুল বকেছি বলে মনে হয় না।

পুরাতন সুবাদের রেশ আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া তুমিও জানো .... অসম্ভব

বন্ধু, তাই তো তোমাকে আহবান জানাই।

এসো নিবিড় নিকটে একবার এসো।

এদেশে জন্মে অখণ্ড, নিরেট ব্যক্তিত্বের স্বাদ ক'জনই বা পায়?

অধিকাংশ জন বাঁচে ফন্দি এঁটে। সেই ফন্দি-ফিকিরের ভোলও তাকে পাল্টাতে হয়। সেখানে সে অবিচল ঈমানদার থাকতে অপারগ।

চোর-গুণ্ডা-ডাকাত, বেশ্যা ইত্যাদিরাই এখন সৎ। তাদের ঈমানে দ্বৈততা থাকে না।

আর আমরা?

চূর্ণ বিচূর্ণ ব্যক্তিত্বের কণিকা, পদে পদে দশমায়িত, মানবতার খণ্ডিত কেরিকেচার।

তার মধ্যেই মোহ মরীচিকা সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত মানব-জন্মের পরাকাষ্ঠা দেখাই এবং বিবেককে চোখ ঠেরে সান্ত্বনা পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসো। নিবিড় নিকটে এসো।
নিজের দিকে তাকাও
আমার দিকে তাকাও
এসো নিবিড় আলিঙ্গনে
যুথবদ্ধ একাকীত্বের স্বাদ-মগ্ন হই।
এসো

পরিশিষ্ট

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত চিঠি

AMARBOI.COM

দিলীপকুমার রায়

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেককাল পূর্বের লেখা। তারপরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্যনূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্প প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সংগীতের, সাহিত্যের কিংবা কোনো ললিতকলার চরম সদগতি নয়। হিন্দুস্থানী কালোয়াতের কণ্ঠব্যায়ামের তারিফ করতে রাজি আছি, এমন কি তার রসভোগ থেকেও বঞ্চিত হতো চাইনে। কিন্তু সেই রস চিত্তকে যদি মাদকতায় অভিভূত করে রাখে, – অগ্রগামী কালের নব নব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাৎ করে রেখে দেয় খাঁচার পাখির মতো যে বুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখেছি তাই কেবলি আউড়িয়ে যাই– এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবি করি, তাহলে এই নকলনবিশী বিধানকে সেলাম করে থাকব তার থেকে দূরে ; নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল-বাঁধা সাক্রেদী করতে পারব না। ভুল ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব নব সৃষ্টির কামনা নিয়ে। বাঁধা মতের প্রবীণদের কাছে গাল খাব– জীবনে তা অনেক খেয়েছি কিন্তু আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই মানব না যে আমি ভূতকালের ভূতে পাওয়া মানুষ। আজ য়ুরোপীয় গুণীমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে বলে না যে অজন্তার ছবি শ্রেষ্ঠ আদর্শের ছবি, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বেওকুফ কেউ নেই যে ঐ অজন্তার ছবির উপর কেবলি দাগা বুলিয়ে যাওয়াই শিল্প সাধনার চরম বলে মানে। তানসেনকে সেলাম করে বলব, ওস্তাদজি, তোমার যে পথ আমারও সেই পথ, অর্থাৎ নবসৃষ্টির পথ। বাংলাদেশ একদিন সংগীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী করে নয়, সঙ্গিনী করে, তার গৌরব রক্ষা করে। সেই বাংলাদেশে আজ নূতন যুগের যখন ডাক পড়ল তখন সে হিন্দুস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুলরক্ষা করতে পারবে না– তখন সে জটিলার শাসন উপেক্ষা করে যুগলমিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে। এ নিয়ে নিন্দে জাগবে কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না।

মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বারবার মত না বদলাতেন তাহলে আজকের দিনের সংগীতসভা, ডাইনসরের ধ্রুপদি গর্জনে মুখরিত হতো এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হতো যে যারা আজ নৃত্যকলার পালোয়ানির পক্ষপাতী তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তাহলে বুঝবো এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রায় আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি। ইতি

৬/২/৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিখতে ক্লান্তি হয়, এ কথা জানিয়ে রাখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা

প্রবন্ধসমগ্র-২১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৯৫
প্রকাশক : শওকত ওসমান, তুরহান স্মৃতিলোক
৭এ মোমেনবাগ, ঢাকা

উৎসর্গ
সমীহার পরম অধিকতায়

ধর্মান্ধতা-সৃষ্টিকারী
সোশ্যাল ফোর্সের বিরুদ্ধে
হিমালয়-সদৃশ
যুগল পাহাড়-পুরুষ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাজী নজরুল ইসলাম
মহান স্মৃতির উদ্দেশে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকথা

২রা জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে আমি উনআশি বছরে পড়লুম।

তা এ দেশী গড়-অনুপাত অনুযায়ী প্রচণ্ড বাড়তি আয়ু এবং সুদীর্ঘও বৈকি।

জীববিজ্ঞানীদের মতে কুমীর দু'শ বছর বাঁচে। আয়ু সব কিছু হলে মানুষ কুমীর হওয়ার সাধনা করত। শুধু বহুকাল বাঁচাই ত জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। বাঁচার মত বাঁচাই সকলের প্রত্যাশা।

এইখানেই সমস্যা।

মানুষ অন্তত অকাল মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে চায়। বাঁচার মত বাঁচার জন্যে আয়ু কম হলে চলে না। অনেক সাধনায় সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন থাকে। ঘাস রাতারাতি গজায়। বৃক্ষের বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। আয়ুর প্রশ্ন সুতরাং এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

কিন্তু এই উপমহাদেশে পৃথিবীর উন্নত দেশের তুলনায় গড় আয়ু ঢের কম। তার কারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার হাতিয়ারের অভাব। আবার অন্য দিকে সামাজিক বিপর্যয়ও বহুৎ দুর্যোগ খেদিয়ে আনে। তার ফলে অপমৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

অন্যান্য বিপর্যয় এখানে আমার আলোচ্য নয়।

সামাজিক দুর্যোগে মানুষের প্রাণ-প্রদীপ কীভাবে অকালে নিভে যায়, তার সাক্ষী আমি স্বয়ং।

বালক-কালের কয়েক বছর বাদ দিলে আমি ইতিহাসের ঝড়-তুফানের সঙ্গী বিগত সত্তর (৭০) বছর। কাল-ব্যাপ্তি কিছু কম নয়। তার মধ্যে ইতিহাসের পাতার ভাঁজ-খোলা স্বচক্ষে দেখা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।
ব্রিটিশ আমল।
বিদেশী সরকার।
অবিভক্ত বঙ্গে দুর্ভিক্ষ।

বাঙলা ১৯৫০ সাল খ্রিস্টিয় ১৯৪৩ সনে ব্রিটিশ রিপোর্টে তিরিশ লক্ষ, বে-সরকারী প্রতিবেদনে ষাট লক্ষ মানুষ অপঘাতে মৃত্যুর বলি হয়ে যায় ওই মন্বন্তরে।

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ-বিভাগ– সব মিলে তিন খণ্ড। এক নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল পাকিস্তান নামে। বাঙলায় যার অর্থ পবিত্রভূমি। এই পবিত্রভূমিতে প্রথম অস্বাভাবিকতার প্রবেশ দেখা যায় : পৃথিবীর সব দেশ চার দিক বেষ্টিত, এই দেশের দিক আটটি। দুই খণ্ড তার। পূর্ব এবং পশ্চিম। চার-চার আট।

অস্বাভাবিকতার ভূমিকা অবিশ্যি 'পবিত্রভূমি' পত্তনের পূর্ব থেকেই শুরু হয়, যার সামাজিক আলামৎ : হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। যেখানে মূলকথা : সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণ বিদ্বেষ Racial hatred.

এসব সামাজিক দুর্যোগ বন্ধের জন্যেই রাজনৈতিক সমাধান : পাকিস্তান।

পাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত লাগে।

দেশবিভাগের পূর্ব থেকেই দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রারম্ভ। আমি তার সাক্ষী। আমার চোখের উপর দিয়ে এই সব পাপোৎপাতের তুফান বয়ে গেছে।

প্রথম বিরাটকায় দাঙ্গা ঘটে ১৯৪৬ সনে। তখনও ব্রিটিশ আমল অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা শহরে। আগস্ট মাসে ঘটিত, তাই 'আগস্ট হাঙ্গামা' 'আগস্ট রায়ট' নামে খ্যাত।

তিন দিকে আঠার (১৮) হাজার প্রাণবলি হয়ে গেল। ধর্ষিতা রমণী, অগ্নিদাহের শিকার ঘর-বাড়ি, আহত পঙ্গুদের হিসাব কেউ রাখেনি।

ব্রিটিশ বিদায় নিল।

স্বাধীন এই উপমহাদেশ।

১৯৫০ সনের দাঙ্গা ভারত ও পাকিস্তানব্যাপী।

বিপুল আকার নারকীয়তা স্নায়ুভাবে লেপ্টে রইল তার সঙ্গে।

আবার ১৯৬৪ সনের দাঙ্গা।

ফেব্রুয়ারি মাস।

বীভৎসতায় কিছু কম নয়।

সেই সময় আমার সতর বৎসরের তরুণ সন্তান তুরহান ওসমান, যে-বয়সে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন বিভ্রান্তি স্বাভাবিক, নিজেকে বলিদান করে চলে গেল ট্রেনের তলায়; নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া স্টেশনের সন্নিকট, পিতার জন্যে দুই পংক্তি লিখে :

সম্পাদক

সমীপে–

মাননীয় মহোদয়েষু,

আগামী ৪ঠা অক্টোবর দুর্গাপূজার মহালয়া দিবসে এতৎসঙ্গে গ্রথিত সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা-কথা যুগপৎ বাঙলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সমূহ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের বাসনা-তাগিদে নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার শরণাপন্ন।

এই ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা অবিশ্যি-অবিশ্যি অপরিহার্য।

বার্তা-সরণীর নিত্য-পথিক রূপে, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার পাশব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাচার-জর্জরিত এই উপমহাদেশের পটভূমি সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল, আপনার নিকট আর কিছু বলা ধৃষ্টতা মনে হয়।

বিশ্বজনের মঙ্গল হোক।

শারদীয় শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আন্তরিক অভিবাদনান্তে,
ইতি,
আরজ-আনত
শওকত ওসমান
বাঙলাদেশ, ২৫/৯/৯৪

বাঙলাদেশ এবং
পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান ও
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের
উদ্দেশে-
শারদীয় শুভেচ্ছা

চিহ্ন অভিধায়
বহু দূর নিয়ে যায়
তাই মূর্তি বানায়
মাটী দ'লে দ'লে
পূজা মূর্তির নয়
কল্যাণ, বরাভয়,
আত্মার সঞ্চয়
অভিসারে চলে॥

শওকত ওসমান
বাংলাদেশ ৪/১০/৯৪

আমি জানি ধ্বংসের এই দায় ভাগে
আমরা দু'জনে সমান অংশীদার।
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
– সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাবা, এদেশে বাঁচার কোন অর্থ নেই। আমাকে মাফ করবেন।"

খেলন

খেলন তার ডাকনাম।

সৎ জীবন-যাপনের বিকল্প মৃত্যু নয়। পুত্রের জানা ছিল না।

অন্যায়ের মোকাবিলাই সেখানে একমাত্র প্রতিষেধ। যেমন কুরুক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন সর্বদা শ্লাঘনীয়।

আত্মহত্যা বিভ্রান্ত ভীরুজনের পশ্চাৎপদতা

বিষাদ-ক্লিষ্ট সেই সময় ঢাকার পূর্ব বাসাবো গিয়েছিলুম এক প্রীতিভাজন সমীপে, দেখলুম ওই বাঁধপথে মাদারটেকের অভিমুখে সন্ত্রস্ত শত শত নরনারী পালিয়ে চলে যাচ্ছে জাগতিক যা পারে কিছু বুচ্‌কী হাতে মাথায় এবং বগলে।

আত্মার নীরব চীৎকার অজানিতে সোচ্চার হেঁকে উঠল, "আজ হিন্দু ভাইবোনেরা চলে যাচ্ছে এই পাপ– পাপের প্রায়শ্চিত্ত মুসলমানদের একদিন করতে হবে।"

প্রাচীন প্রবাদ :

পাপ,

তার নেই মাফ।"

সাত বছরও গেল না, ছ'বছর দেড় মাসের মাথায় এবার হিন্দু নয় শুধু মুসলমানেরাও একই ভাবে এক সাথে ঢাকা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, আপাতত অন্য কোনখানে– যেখানে সন্ত্রাসিত মৃত্যু তা-কে আর পীড়িত করতে অক্ষম।

১৯৭১, ২৫শে মার্চ।

প্রায়শ্চিত্ত-দিবস রূপে পালনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

কিন্তু সে-বিধি গৃহীত হয়নি। জের তাই আজও মেটেনি।

দাঙ্গার উপাদানগুলো জীইয়ে রাখলে কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) অবশ্যম্ভাবী।

আমার এই শীর্ণ-কলেবর পুস্তকে সামাজিক ব্যাধির কতগুলো লক্ষণ, দেশপ্রেমিক শুভানুধ্যায়ীদের সামনে তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য।

ইতিহাসে অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নয় আদৌ।

নিরীহ জনেরাও সেই দুর্ভোগের কবলে পতিত হয়। অজ্ঞতা তা কে রেহাই দেয় না।

এইটুকু জনসাধারণের নিকট বলার জন্যেই আমার এই দীন প্রচেষ্টা।

তবে মনে রাখা দরকার, মৌলবাদীরা এই দেশের সন্তান। আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনেও তারা বিভ্রান্তির কবলে পড়ে। সচেতন জ্ঞানপাপী অবিশ্যি কিছু থাকে নেতাদের মধ্যে কিন্তু তারাও জনমতের বাইরে যেতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশের জনসাধারণ একদিন ওদের জারিজুরি চাতুরী ধরে ফেলে। মৌলবাদীরা পবিত্র ইসলামের সব চেয়ে বড় শত্রু, যারা ওই মহান ধর্মের ভাবমূর্তি যুগ যুগ ধ্বংস-তৎপর নোংরামিতে লেপে দেয়।

চব্বিশ বছর ধরে মৌলবাদীরা পাকিস্তানের শাসকদের দালালী করেছে।

ওরা কী বাঙলাদেশের রাষ্ট্রের জন্ম তথা অভ্যুদয় ঠেকাতে পেরেছে ??

পারেনি।

মৌলবাদীদের ভবিষ্যৎ নেই। থাকতে পারে না। কারণ তার বুনিয়াদ ঝুটে।

পাকিস্তানে তারা বেশ মার খেয়েছে। ওদের ভেল্কি ধরে ফেলেছে ওদেশের জনসাধারণ।

এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। কারণ, আমার ছেলেমেয়ে বংশধরগণ এখানে বসবাস করবে। তাদের অমানুষের জঙ্গলে পরিত্যাগের পূর্বে, আমার অনুরোধ, দেশবাসী যেন আমার মত পবিত্র বাইবেলের একটি কথা মনে রাখেন, "The sin of one generation visits another এক পুরুষের পাপ অন্য পুরুষে বর্তায়।"

এদেশের নারীপ্রগতির অন্যতম পথিকৃৎ বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ওঁদের আত্মীয়) পাকিস্তান-নির্মাণে প্রচুর মদৎ দিয়েছিলেন। তিনি কি জানতেন, ৭১ স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর মাত্র দুই প্রাণপ্রিয় সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান মামুন মাহমুদ (তদানীন্তন রাজশাহীর ডি.আই.জি অফ পুলিশ) এবং নারী-পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক বিদূষী পুত্রবধু মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, যথাক্রমে পাকিস্তান হানাদার সৈন্যবাহিনীর বেয়োনেটের খোঁচা এবং মানসিক রগ্‌ড়ানির চোটে অকাল মৃত্যুর শিকার হবে?

শওকত ওসমান

জানুয়ারি, ১৯৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠত্ব বা মাহত্মা বিচারে এগোয় এবং নিজেকে ঠাওরায় আধ্যাত্মিকভাবে ও নাগরিকভাবে উন্নততর জীব।

এমন প্রবণতা মাত্র দু-চারটি ক্রিয়াচার থেকেই উৎপন্ন হয়। সে মূর্তি-পূজক নয়। তার অহম Ego-এই পথে স্ফীতিলাভ করে। গ্রামে বলে, লেজ মোট হয়।

মুসলমান মূর্তিপূজা করে না বলেই যে মহত্তর জীব এমন চিন্তা অজ্ঞতা প্রসূত।

চিহ্ন বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'সাইন' (Sign) ছাড়া ত কোন সভ্য বা বন্যসমাজ চলতে পারে না। শিক্ষাদীক্ষা সবই ত চিহ্নের উপর নির্ভরশীল। সেখানে হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী– কারো রেয়াৎ পাওয়ার যো নেই।

রাস্তার ট্রাফিক-চিহ্নগুলো কি শুধু অর্থহীন চিহ্নমাত্র? তাছাড়া রোজ এ্যাক্সিডেন্ট তথা প্রায় প্রাণহানি এড়ানো যেত কী?

সাইন ছাড়া কোন ধর্ম এক পা নড়তে পারে না।

যারা হজ্বব্রত পালন করেন তাদের ক্রিয়াচারের অন্যতম দফা কাবাশরীফ-প্রাঙ্গণে রক্ষিত "সংগে আসোয়াদ" বা একটি কালো পাথরে চুম্বন দান। পাথরটা তো পাথর। উপর দিয়ে চৌদ্দ শ' বছর গুজরে গেছে। বহু শীত গ্রীষ্ম ঋতুর প্রকোপে বস্তুধর্ম অনুযায়ী পুরাতন পাথর আর বজায় নেই। তবু হজ্বযাত্রীগণ সেখানে চুমু খান।

কেন?

কেন?

কারণ, এটি একটি চিহ্ন। এই চিহ্নের উপর হজরত মোহাম্মদ (দ.) চুমু খেতেন। এই জন্যে আমরা এখানে তার উপর চুমুর দাগ-রাখার প্রয়াসী।

যা একটি চিহ্ন, এই পাথর মাত্র, তার উপর পবিত্রতা আরোপিত। এই আরোপ মানসিক ব্যাপার। তা পেছনে না থাকলে অন্যান্য পাথরের সঙ্গেই এই বিশেষ প্রস্তর-খণ্ড গণ্য হতো নিতান্ত মূল্যহীন।

হিন্দু ভায়েরা মূর্তিপূজক। একটি হিন্দুস্তান প্রবাদ আছে :

মানে তা দেওতা
নেই ত পাথর।
মানি ত দেবতা
নচেৎ পাথর-পাথর।

অন্য ব্যাখ্যা বাহুল্য।

হজ্বের অন্যতম ক্রিয়াচার : শয়তানের দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ।

ব্যাপারটা চিহ্নের ব্যাপার। তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

এমন সব চিহ্ন গভীর ও বিশাল অর্থের দ্যোতক। অর্থ বা Mea-ning-A

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল কথা। বাঙলায় বলা হয় : অভিধা, যা থেকে অভিধান শব্দ আগত।

মূর্তিপূজক নয়, এ দেশে এমন বহু মূর্খ আছে, যারা ভাবে ঃ যেহেতু সে পৃক রেওয়াজে পালন করে, সেই হেতু উন্নততর জীব। তা স্রেফ অজ্ঞতার ফল। তারা জানে না, মূর্তি একটা চিহ্ন বা সাইন।

কিছু দিন পূর্বে তাই মহালয়ের দিনে আমি এক শুভেচ্ছা বাণীতে লিখেছিলুম ঃ

চিহ্ন অভিধায়
বহু দূর নিয়ে যায়
তাই মূর্তি বানায়
মাটী দ'লে দ'লে।

পূজা মূর্তির নয়
কল্যাণ, বরাভয়
আত্মার সঞ্চয়
অভিসারে চলে।।

অভিসার ঘটে, প্রার্থিত প্রিয়জনের জন্য।

যার যেমন আত্মা তেমন ভাবেই অগ্রসর হয়। ভেতরে হিংস্রতা পশুত্ব থাকলে বাইরেও তার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

সব ধর্মে নরহত্যা নারীহত্যা শিশুহত্যা পাপ। অথচ এখন দেখা যায় একই ধর্মের দুই উপসম্প্রদায়ে খুনোখুনি হানাহানি অবিরাম লেগে আছে।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সংবাদপত্রে দেখলুম, পাকিস্তানের করাচী-শহরে শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গায় ৬ (ছয়) জন নিহত এবং বহু আহত।

শিয়া-সুন্নীর কাইজ্যা এখন মুসলমান সমাজে রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে। গা-সওয়া ব্যাপার। চৌদ্দ শ' বছর ১৪০০ কেটে গেল, ফয়সালা হয় না।

কারণ, পেছনে মগজের তথা মননের অভিঘাত অনুপস্থিত। ফলে, নিতান্ত পাশবিক পর্যায়ে আছে ব্যাপারটা। জন্তুর মত উপজ্ঞা (Instinct) নিয়ে বসবাস, যুক্তিবিচার বা (Rationality) দূরে নিক্ষিপ্ত।

জাগতিক নানা উপাদান, তন্মধ্যে রাজনীতি প্রধান– আশপাশ থেকে ঘটনা-স্রোত এমন তীব্র এবং তিক্ত করে ফেলে যে যুক্তিবিচার আর ধারে কাছে আসে না।

মনন ছাড়া কোন ব্যাপারের মর্মোদ্ধার কঠিন। এই উপমহাদেশে ধর্মে ধর্মে, স্বধর্মের মধ্যে, বিভিন্ন বর্ণের (Race) মধ্যে অন্তর্ঘাত লেগেই থাকে।

পৃথিবীময় এমন উৎপাত অবিশ্যি অজ্ঞতার পরিণাম।

মৌলবাদীরা স্বাভাবিক ও সচেতনভাবে রাজনীতিতে ওই অজ্ঞতাগুলো সুচারু রূপে জীইয়ে রাখে। এই জন্যে তাদের সাফল্য প্রায় দেখা যায়। জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে তারা অত্যন্ত পটু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা

বিগত পঞ্চাশ বৎসর-ব্যাপী এই উপমহাদেশের উপর দিয়ে যে-সব সামাজিক দাবানল বয়ে যাচ্ছে তাণ্ডব লেলিহান শিখা-সহ, আর হেতু-আবিষ্কারে, বোধ হয়, একটি শব্দ বার বার জানান দেয় : সাম্প্রদায়িকতা।

সাম্প্রদায়িকতার নির্যাস-বিবরণ দিতে আমার মনে হয়, দুটি শব্দ যথেষ্ট : দ্বিজাতি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় খুব সংক্ষেপে বলা যায় : ধর্মই জাতীয়তাবাদের একমাত্র নিয়ামক। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম গঠনে ধর্মই একমাত্র উপাদান।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশের অধিকাংশ মানুষ, ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষালাভ করেনি।

দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনৈতিক পরিণাম ভারতবিভাগ তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। তা ১৯৪৭ সনের ব্যাপার। পাকিস্তানে ভুঁড়ি ফেটে আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয় : চব্বিশ বছরের মধ্যে ১৯৭১ সনে পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল।

এত রকমের সামাজিক ঝঞ্ঝা বয়ে গেল এই উপমহাদেশের উপর দিয়ে, কিন্তু কেউ সত্যিকার প্রশ্ন তুলে জিজ্ঞেস করেনি, পাকিস্তান কেন টিকল না?

কেন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ঘটল?

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত এত জলদি কেন ধ্বংস পেল?

বাঙলাদেশের একাত্তরের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সম্পদ ধ্বংস ছাড়াও তিরিশ লক্ষ প্রাণের বলি এবং অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জৎ-লুণ্ঠন খেসারৎ স্বরূপ, কেন দিতে হলো?

প্রশ্নের মূলে এমন গুরুত্ব থাকলে ত মৌলবাদ আর এই উপমহাদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত না।

এমন বিস্মৃতি মর্মঘাতী বৈকি।

বিসর্জনের ধ্বংসমুখী ঝড় কতো জটীল-গতি না বয়ে গেল। আবার তেমনই ঝড়ের ঝাপ্টা লাগা অমূলক আশঙ্কা কিছু নয়। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উৎপাটনের পেছনে দৃঢ় সংকল্প নেই।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান অবস্থান থেকে বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িকতার অষ্টোপাশী হাল-হকিকৎ। সর্বত্র মৌলবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনরুত্থানে তা স্পষ্ট। যেমন ভারতবর্ষে, তেমনই পাকিস্তানে-যদিও সেখানে কিছুটা অবদমিত। বাংলাদেশে রীতিমত চাংগা। পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যাই ত সাফাই-সাক্ষী।

দ্বিজাতি তত্ত্বের অভিশাপ-জাত হলাহল আজও দেশের অভ্যন্তরে পুরাতন শোষ ঘায়ের মতো সঞ্চারণশীল। এ কথা কোন পুনরুক্তি নয়।

এমন পরিবেশে, মানুষের শুভবুদ্ধির দরবারে আরজ ছাড়া আর কোন পথ আছে? প্রথমে নিবেদনের পথ নির্বাচন এই প্রত্যাশায় যে অজ্ঞতার ফলেও সাম্প্রদায়িকতা টিকে আছে কোথাও শাখা-প্রশাখায় আবার কোথাও শিকড়ে।

অনেকে ধর্মের সংজ্ঞা জানে না।

কল্যাণের সঙ্গে ধর্মের কি সম্পর্ক– এমন চিন্তার ক্ষেত্রে বহুজন উদাসীন।

অনেক মুসলমানই ভেবে দেখে না, কেন একেশ্বরবাদী অখণ্ড ইসলাম খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল কালের বিবর্তনে? খণ্ডগুলোর আরবী নাম ফের্কা। ফের্কা একই ধর্মের ভেতর অসংখ্য উপসম্প্রদায়। উপসম্প্রদায়গুলো আবার খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত। তাদের পারস্পরিক হানাহানিও দুঃখজনক। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি মূর্খতা?

শিয়া-সুন্নীর বিরোধ তের শ' বছর পেরিয়ে গেছে, তবু চলছে ত চলছেই। বিরতির কোন লক্ষণ নেই।

অথচ ইসলাম মানে শান্তি। শিয়া-সুন্নীর কাইজ্যার সমাধান পথ বের করার কোন তাগিদ আছে বলে মনে হয় না। তাহলে পেছনে শক্তিশালী কোন চিন্তার উদ্‌ভাবন ঘটত। তা যে নেই, বলা বাহুল্য।

অবিশ্যি একাকী ইসলামই নয়, পৃথিবীর সব ধর্মই ভাঙনের অবশ্যম্ভাবী বন্যায় নিমর্জিত।

আমার মনে হয়, চিন্তাও অদৃশ্য বেড়ির কাজ করে। ঐতিহ্যগতভাবে মানুষ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, মানসিক দাসত্ব থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। রাজনৈতিক দাসত্বই একমাত্র ধরনের গোলামী, ভাবা অবিধেয়। সামাজিক পরিবর্তনের কোন পরিবেশ-গত উপাদান না থাকলে কালপ্রবাহে চিন্তার দাসত্বে মানুষ বুঁদ হয়ে এক রকমের মৌতাত ভোগ করে। আফিমের নেশার মত তা আর সহজে ছাড়তে পারে না। আপন গণ্ডীর মধ্যে এমন আবদ্ধ যে, চোখ নতুন কিছু দেখতে অসমর্থ। একপেশে এই মানসিকতা পরিবর্তন বা সমাধানের অন্তরায়।

এই উপমহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্ব তথা সাম্প্রদায়িকতা আজও টিকে আছে। কায়েমী স্বার্থের যোগসাজস বিপক্ষে থাকলেও ব্যক্তি-মানসও এখানে বড় উপাদান, যার ফলে পরিবর্তন সহজ হয় না।

উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক মুসলমান দেখে তার প্রতিবেশী হিন্দু মূর্তিপূজা করে, সে করে না। অজ্ঞতার ফলে সে এই একটি ক্রিয়াচার বা অনুষ্ঠান থেকে ধর্মের দেশ-বিভাগের কালে ধর্মের দোহাই তুলে বলা হয়েছিল,

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িকতা চিরতরে খতম, আর কোন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কোথাও খতম হয়নি।

তা ভারতে দূর হয়নি। পাকিস্তানে দূর হয়নি। মুসলিম-অধ্যুষিত বাংলাদেশে ক্রমশ চড়া গলায় হুঙ্কার-রত।

মৌলবাদী যারা দেশের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তারা জানে না, কি করে এসেছে। সে হিসাব নিতে তারা অক্ষম।

কারণ, তাদের নিকট নীতিশাস্ত্র এবং মানবিক পর্যায়ে হিসাব, একদম অচেনা বিষয়। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে তারা নির্ধারণ করে কায়েমী স্বার্থের নির্দেশে। অর্থাৎ, যা কায়েমী স্বার্থের অনুকূল-তা-ই তাদের নিকট ন্যায়। আর যা কায়েমী স্বার্থের বিরোধী তা মৌলবাদীদের নিকট অন্যায়। ধর্মে ন্যায়-অন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা আছে। মৌলবাদীদের ধর্মে তেমন কোনো পাল্লা নেই, যদিও চব্বিশ ঘণ্টা তারা ধর্মের দোহাই আওড়ায়। এই দোহাই তাদের মুখোস।

একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ দিলে, আমার মনে হয়, কারো কাছে ওদের মুখোস আর অচেনা থাকার কথা নয়।

১৯৭১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল। সেই পটভূমিতে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাই। যাদের বয়স কম তারা ইতিহাসের দ্বারস্থ হবেন, আশা করা যায়।

১৯৭১ সনে এমন কি স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে পর্যন্ত সামাজিক ইস্যু কী ছিল, যার উপর কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানী নাগরিকদের অভিযোগ। তা এক কথায় বলা যায়, পূর্বপাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-জর্জরিত। তার একটা ফয়সালা হওয়া উচিত। অবিশ্যি রাজনৈতিকভাবে।

টালবাহনায় পাকিস্তানের তদানীন্তন সামরিক কর্তৃপক্ষ সমস্ত রাজনৈতিক আদর্শ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল। যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সনে নির্বাচনে পার্লামেন্টের নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করল, পাকিস্তান শাসকগণ তাদের মুখোস খুলে ফেললে এবং হত্যা রূপী সমাধানের দিকে এগিয়ে গেল। যার পরিণাম : বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম।

মৌলবাদের চেহারা এই সময় কি কোন ন্যায়-নীতি অনুসরণ করছিল? না। পূর্বে উল্লেখিত, ওদের একমাত্র আদর্শ কায়েমী স্বার্থের তল্পীবহন। অর্থাৎ, যা কায়েমী স্বার্থের কল্যাণ তা-ই ন্যায় এবং যা স্বার্থবিরোধী তা-ই অন্যায়। ধর্মের মুখোসের আড়ালে এই একটি নীতিই তারা পালন করে। ১৯৭১ স্বাধীনতার যুদ্ধে এই নীতি থেকে ওরা এক চুল এদিক-ওদিক নড়েনি। সেদিক থেকে সত্যি মৌলবাদীদের পাক্কা ঈমানদার বলতে হয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, ধর্মের এই মহান ধারকবাহকদের বিবেকে এতটুকু চিড় ধরেনি। বেদেরেগ কত্‌লে আম বা গণহত্যা চালিয়ে বাংলার মাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যরা রক্তরঞ্জিত করছিল তখন জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য মৌলবাদী পার্টির নেতৃবৃন্দ অটল রইল এই ধুয়া তুলে যে "শেখ মুজিব তথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীগণ খামাখা শোষণের কথা তুলে ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করছে।"

তা স্রেফ ছুতো বা বাহনা কাউকে বুঝিয়ে বলাবাহুল্য। বাহানার আড়ালে কায়েমী স্বার্থ, এখানে পাকিস্তানী প্রভুদের স্বার্থ-রক্ষার ফন্দী আঁটলে মৌলবাদীগণ।

মনে রাখবেন, ইস্যু শোষণের। তা পেছনে রেখে তারা ধুয়া ধরলো, "ওই পথে গেলে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পাকিস্তান ধ্বংস মানে ইসলাম ধ্বংস– দু'টি একই কথা।"

এখানে ফন্দির স্বরূপ পরিষ্কার।

পাকিস্তান ত পৃথিবীর যে কোন রাজনৈতিক রাষ্ট্রের মতো একটি রাষ্ট্র। ইসলাম একটি মহান ধর্ম– চৌদ্দ শ' বছর প্রাচীন। পাকিস্তানের সৃষ্টি ১৯৪৭ সনে। বয়স চব্বিশ বছর পূর্ণ হয়নি তখনও। মৌলবাদী হুজুরদের জিজ্ঞেস করতে মন চায়, যখন পাকিস্তান ছিল না, তখন কি ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে ছিল না?

কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব দিতে তারা রাজী নয়। বাঙলা প্রবাদ আছে ঃ

লাংয়ে মারছে গুঁতো
সেই হয়েছে মোর ছুতো।

এই প্রবাদের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ছুতো এমনই ব্যাপার, সেখানে যুক্তিবিচারের জায়গা থাকে না। অথচ বাইরে ধর্মের দোহাই এবং জিগীরে সোচ্চার।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন হাজার হাজার বাঙালি মা-বোনের ইজ্জৎ আব্রু ধুলোয় লুটিয়ে দিলে, তখনও ধর্মে এই সাচ্চা ধারক-বাহকগণের প্রাণে এতটুকু দয়ার উদ্রেক ঘটল না– এমনই পাষাণ-আত্মা এই মহাপুরুষেরা। চোরের মায়ের বড় গলা। তাদের গলা ইহুদী নাসারা আবিষ্কৃত মাইক যোগে তখনও উচ্চস্বর এবং ওরা বললে, "যুদ্ধে অমন একটু আধটু হয়ে থাকে।" মৌলবাদী নেতৃবৃন্দ কোনো রমণীর গর্ভপ্রসূত কি না, সন্দেহ হয়।

মোদ্দা কথা, মনে রাখবেন, কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ওদের ধর্ম নির্ধারিত হয়। প্রকৃত মহান ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। যে-টুকু থাকে তা বহিরঙ্গ, মুখোস, কিছু ক্রিয়াচার এবং ধার্মিকতা জাহিরের ফন্দী।

মৌলবাদ শেষ পর্যন্ত দেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে কি অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও মানসিক যন্ত্রণার গর্তে নিক্ষেপ করে, তার সাক্ষী হতে পারেন এক মাত্র সেই নাগরিক, যাঁদের বয়স এখন তেত্রিশ বৎসর। ১৯৭১ তেইশ বৎসর আগেকার স্মৃতি দশ বৎসরের বালকের মনে হয়ত ঝাপসা তবু কিছু বর্তমান থাকতে পারে। এক কোটি বাংলাদেশের অধিবাসী তখন প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল রিফিউজি হিসেবে এবং দু-কোটি লোক দেশের ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানী হানাদারদের জুলুম ও নির্যাতনের দাপটে যাযাবর জীবন-যাপন রপ্ত করছিল সদা ভয়ে কম্পবান যেন মানুষ নয় মুষিক।

তিরিশ লক্ষ প্রাণ-বলির বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত।

অতীতের কাসুন্দি ঘাটা নিস্প্রয়োজন।

বর্তমানে দেশে মৌলবাদের ভূমিকা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত আয়েন্দা ইশারা দেওয়ার চেষ্টা আমার এই দীন নিবন্ধ।

ধর্মীয় রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

তা টিকল না।

তা টিকলে বাংলাদেশ কি বিশ্বমানচিত্রে শোভা পেত?

আরো মনে রাখবেন, পাকিস্তানের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ধর্মীয় রাষ্ট্ররূপে নয়। বরং বলা যায়, ডান্ডীয় রাষ্ট্র। অর্থাৎ, ডান্ডার কুদরত বা কেরামতি গুণে টিকে আছে। বেলুচী, সিন্ধী, পাঠান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহ স্রেফ কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিটারি দাপটে একসঙ্গে লেপ্টে আছে। সুযোগ থাকলে, কবে আমাদের মতো পৃথক অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে যেত। পবিত্র ইসলাম কোন Binding Force শর্তাবদ্ধ শক্তি নয়।

মৌলবাদ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অধিবাসীদের কোন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে পারে তারই একটা আগামী ছবি আপনারা আমার লেখনী-অঙ্কিত দেখতে পাবেন, সামান্য কল্পনাশক্তি ব্যয়ের সাহায্যে।

প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ এখন ব্রহ্মদেশ নয়। নতুন নাম মায়ানমার। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম।

মনে রাখবেন Action and process কর্মধারা এবং কর্মপ্রণালী অঙ্গাঙ্গী জড়ানো। প্রত্যেক কর্মধারার প্রণালী আছে। এবং সেই পথ ছাড়া অন্য কোনো প্রণালীতে যথা ফলাফল পাওয়া যাবে না। ভাত রান্নার প্রণালী আছে : চুলা লকড়ী চাউল ইত্যাদি। তাছাড়া ভাত মিলবে না।

আবার বলা যায়, প্রণালী অনুসরণ করলে তা Action বা কর্মধারার রূপ নেবে। এই সঙ্গে আরো একটি কথা স্মর্তব্য : যদি জমিন ঢালু থাকে জনস্রোত উজান বইবে না। প্রাকৃতিক নিয়ম সেখানে সর্বেসর্বা। অর্থাৎ পানি নিচের দিকে ধাইতে বাধ্য।

মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ এখন বৌদ্ধ রাষ্ট্র। সেখানে Action শুরু হয়ে গেছে। আধুনিক যুগে যদি ধর্মের লেবেল সেঁটে নাগরিকদের সনাক্ত (Identify) করতে হয়, তাহলে জল কোন দিকে ধাইবে?

মায়ানমারে সকল নাগরিক বৌদ্ধ নয়। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় আছে। তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? তারা বুঝেছে, চরণই শ্রেষ্ঠ শরণ (আশ্রয়)। অর্থাৎ, পালাও। তারা পালাচ্ছে। রোহিঙ্গা মুসলমানেরা বাংলাদেশের দিকে ধাইছে হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার। সন্নিকট চট্টগ্রাম। সব চট্টগ্রামে আশ্রয় নিচ্ছে।

স্বদেশে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এমন হীনমন্যতায় কে বসবাস করতে চায়? তার অপরাধ? সে বা তারা মুসলমান।

অনেক সময় দেশত্যাগে কোন জবরদস্তি লাগে না। যদি কোন নাগরিক দেখে যে সামাজিকভাবে সে মর্যাদাহীন : অন্যদিকে রুজি-রোজগার চাকরী ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা ধরনে পক্ষপাতে আবদ্ধ, তাহলে সে কী করবে? পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে অন্যত্র যেতে চাইবে যেখানে ধর্মের জন্য অন্তত তাকে কোন হীনমন্যতায় ভুগতে হবে না।

আরাকানী মুসলমানেরা বাংলাদেশে আসছে। কারণ, পাশে মুসলিম রাষ্ট্র। তারা ইন্দোনেশিয়ার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে না, যদিও ইন্দোনেশিয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইন্দোনেশিয়া সন্নিকট নয় এবং দুর্গম পথে যাওয়া সহজ নয় আদৌ।

আরাকানী মুসলমানেরা বাংলাদেশে আসছে এবং আসতে থাকবে। পাশাপাশি সান্নিধ্য এবং মুসলিম রাষ্ট্র দুই পাওয়া যাচ্ছে।

এই Process কর্মপ্রণালী থামার কথা নয়। মৌলবাদীরা প্রতিদিন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের খোয়াব দেখছে এবং দেখাচ্ছে বাংলাদেশের অধিবাসীদের। তা কি পাশের মায়ানমার রাষ্ট্রের মুসলমানদের কানে যাচ্ছে না?

ফলাফলের দিকে মৌলবাদীদের চোখ কোন কালে যায় না। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাদের মঙ্গল-চিন্তার গাঁঠছড়া চিরকার বাঁধা। ওরা ভাবে, ইসলাম ধর্ম যেন পানি এবং তরল, সব জায়গায় পাত্রের আকার ধারণ করবে। যেন ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিরেট (Solid) কিছু নেই, যা চিরন্তন এবং যা অন্য ধর্মের প্রতিবেশী– যার ফলে, মানবতার দিক থেকে উভয় নানা মিল সামঞ্জস্য বর্তমান.

মৌলবাদীদের স্বপ্ন সফল হলো। অর্থাৎ, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হলো। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদ তা কাগজে-কলমে বানিয়ে বিদায় নিয়ে পচছে জেলখানায়।

মৌলবাদীরা কাগজ-কলম থেকে একদম বাস্তবতায় নিয়ে গেল। ধরা যাক।

মাশাআল্লাহ! আল্লার যা বাসনা।

নিউটন সাহেবের তৃতীয় বিধি থার্ড ল' মৌলবাদীরা জানে না। Every action has equal and opposite reaction প্রত্যেক কাজের সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

তুমি যদি ধর্মীয় রাষ্ট্র চাও তাহলে কি তোমার প্রতিবেশী অধর্ম রাষ্ট্র চাইবে? সেও ত ধর্মীয় রাষ্ট্র-রচনায় ব্রতী হবে। সেখানে যে-সব অন্য ধর্মাবলম্বী নাগরিক আছে, তাদের স্বার্থের দিকে কেন দৃষ্টিপাত করবে? তোমার নিকট তোমার ধর্ম যখন এত প্রিয়, কিসের জন্যে তার ধর্ম, কোন দুঃখে বা মতিচ্ছন্নতায় অপ্রিয় হতে যাবে?

সমস্যা– অন্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সামনে বিকল্প কী? সে নিজ ধর্ম ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রীয় ধর্ম গ্রহণ করবে। অথবা, দেশ ত্যাগ করবে, যেমন রোহিঙ্গা মুসলমানেরা এখন করছে। আরো বিকল্প আছে পাকিস্তান সৃষ্টির পর যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাব গিয়েছিল বীভৎস পাশব নির্যাতন ঠেলে।

কল্পনা করুন, এই 'হিজরৎ' কালে শত শত উলঙ্গ রমণীকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে দলবদ্ধ ধর্ষণ করছে উন্মুক্ত আকাশের তলায় শত শত চক্ষুর আড়ালে নয়– প্রকাশ্যে ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাতে যূথবদ্ধ জীবজন্তুদল। কল্পনা করুন, এমন জানোয়ার-মূলত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পথে স্বামী ভাসিয়েছে, পুত্র বিসর্জন দিয়েছে এবং আরো প্রিয়জন-কে খুনের দরিয়ায়, এমন সদ্য-বিধবা সদ্য পুত্রহারা স্বজন-বিচ্ছিন্ন অবলার ধর্ষণকালীন আর্তনাদ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাপুরুষগণের বুকে কি উদ্বেলিত যন্ত্রণা-কল্লোল তুলেছিল? কল্পনা করুন।

দেখা গেল, বাস্তুচ্যুৎ শত শত দরিদ্র শরণার্থী রোগশোকের সম্মুখীন কেবল অস্তিত্বের মোকাবিলায়। অথচ জৈবিক এই প্রাথমিক পর্যায় না মিটলে মানুষ আর মানুষ হয় না, মানুষ থাকে না।

তবে একটি স্বপ্ন মৌলবাদীদের সফল হলো। পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভেজাল (একদা পশ্চিম পাঞ্জাব) মুসলিম-অধ্যুষিত নির্ভেজাল পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাঞ্জাব সত্যই হিন্দু-শিখ-অধ্যুষিত হিন্দুস্থানে পরিণত।

কিন্তু বঙ্গদেশ তাদের ইতিহাসের উল্লুকে বানিয়েছে। মুখ চুলকালি-মাখা। একদা-পূর্ববঙ্গ (যা পূর্ব পাকিস্তান) নির্ভেজাল পাকিস্তান হয়নি এবং একদা-পশ্চিম বঙ্গও (যা পূর্ব নামই বজায় রাখল) খাঁটি হিন্দুস্তান হয়নি। দুই দেশের নাগরিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। অতীতের দুই বঙ্গখণ্ড হিন্দু মুসলমান মিশ্রিত নাগরিকের বাসভূমি হয়ে রইল যেন ভবিষ্যৎ Pluralistis Sociaty বা বহুত্ববাদী সমাজের ইংগিত-রেখা।

বাঙালির আত্মা তার উত্তরাধিকারের ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্য-মণ্ডিত। সেও মুহূর্তকালীন উদ্‌ভ্রান্তির মোহবশে বর্ণবিদ্বেষ-জাত বর্বরতায় খুব পিছিয়ে থাকেনি, তবে পাঞ্জাবী মুসলমান ও হিন্দু ভা'য়ের পর্যায়ে যেতে অক্ষম। ভারত-বিভাগ কালে পৃথিবী দেখেছে বাঙালি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। সেই অহঙ্কারই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে (একদা-মুসলিম লীগ-পন্থী হওয়া সত্ত্বেও) পাকিস্তানের অস্বাভাবিক দুর্গ চূর্ণ করতে অনুপ্রেরণা অভীপ্সা এবং অকুতোভয়তা যুগিয়েছিল বৈকি।

মৌলবাদী মূর্খেরা কি জানে, বর্তমানে বহু সম্প্রদায়-সমন্বিত মানবধর্মের উপর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত না হলে- (এক কথায়, Pluralistic Society) তার ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

যদি ভারতবাসী কেউ বলে, সে ধর্মরাষ্ট্র অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্র বানাবে-একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান মৌলবাদীর প্রতিবাদের কোন মুখ থাকবে কী? তোমার ধর্ম যখন তোমার কাছে প্রিয়, আর এক জনের ধর্ম ফেলনা, অবহেলনীয় হবে কোন মাপকাঠিতে?

কেন হবে?

এবার Action থেকে Process অথবা Process-পথে Action এ যান।

অনুরোধ করব, মানবপ্রেমিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল বাংলাদেশ নাগরিক-কে সামান্য চিন্তা করে দেখতে : বুড়িগঙ্গার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

ভারতবর্ষের পূর্ব-এলাকা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে সাড়ে এগারো কোটি মুসলমান বসবাস করে। এই বিপুল সংখ্যক নাগরিক পাশাপাশি তিন প্রদেশ জুড়ে রয়েছে।

ধর্মরাষ্ট্রের Action and Process কর্মধারা এবং কর্মপ্রণালীর সড়ক ধরে এই সাড়ে এগারো কোটি মুসলমান কোন দিকে যাবে? বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাংলাদেশের পাশাপাশি এলাকার প্রতিবেশী। সান্নিধ্য তাদের সুবিধা। তাই তারা বাংলাদেশে আসছে। আর মানসিক নেপথ্যে সেই ভরসা আছে যে বাংলাদেশের অধিবাসীরা তাদের সম্প্রদায়– একই ধর্ম উভয়ের। সুতরাং আশ্রয় মিলে যাবে।

ভারতীয় কোনো মুসলমান আর একদা ঢোল-পেটানো 'মুসলিম ওয়াতান' "মুসলিম আবাস-ভূমি"– "Muslim Homeland" পাকিস্তানে যেতে চাইবে না। প্রথম, অসুবিধা : পাশাপাশি সান্নিধ্য নেই। দ্বিতীয়, পথ-দুর্গমতা এবং দূরত্বে ভয়ঙ্কর। তৃতীয়, ত্রাস এবং তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতবিভাগের সময় যে-সব শরণার্থী বা রিফিউজীরা (পরে মোহাজের নামাঙ্কিত) পাকিস্তানে গিয়েছিল তাদের উপর সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান, পাঞ্জাবীরা বর্তমানে যে-অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে (করাচী ও অন্যান্য শহরে দাঙ্গার রিপোর্ট থেকে জানা যায়) কোন ভারতীয় মুসলমান আর পাকিস্তানমুখী হতে চাইবে না। Muslim Homeland-মুসলিম আবাস ভূমির নেশা তাদের ছুটে গেছে।

AMARBOI.COM

সুতরাং, এই সব মুসলমান এবার পূর্বমুখী হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশ। ইসলামী আকর্ষণে তারা পূর্বমুখী হবে স্বেচ্ছায় নয়, নাচার। কারণ, অভ্যন্তরে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর চাপ। Action has equal and opposit reaction ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর জিগীরের ফল তো তা-ই হবে।

তুমি ইসলামী রাষ্ট্র বানাবে, আর একজন হিন্দুরাষ্ট্র যদি বানাতে চায়, তোমার বলার কিছুই নেই।

ইসলাম এবং মুসলমান প্রেমে উদ্বুদ্ধ মৌলবাদীদের কি ইতিহাসের গতিপথ-জ্ঞান সামান্য রাখার মুরোদ বা আক্কেল আছে? জিজ্ঞেস করুন, স্বল্প-মস্তিষ্ক ওই সব নাদানদের। একবার পাকিস্তান বানিয়েও ওদের খাহেশ মেটেনি। তার নতিজা ফলাফল ওদের চোখের সামনে ঘটল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কালে। এসব হিসাব করে মানুষ। মৌলবাদীরা কোন হিসাবের ধার ধারে না। কায়েমী স্বার্থের মঙ্গল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের মঙ্গল।

মৌলবাদীরা কি জানে, বাস্তুত্যাগের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষকে কোন অমানুষ-পর্যায়ে ঠেলে দেয়?

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭। পাকিস্তান সৃষ্টির তারিখ। তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বিহার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশ-আগত রিফিউজীদের দুর্দশা কি ওদের চোখে কোন দিন ঢুকেছে? এই বাংলাদেশে চাটগাঁ ষোল শহর পাহাড়ের কোলে কতো মোহাজের কলেরা ও অন্যান্য মহামারী রোগে ভুগে বিনা পথ্য-চিকিৎসা মাটির তলায় চলে গেছে চিরবিশ্রাম নিতে, তার খবর মৌলবাদীরা রাখে না। আমি চাটগাঁয় ছিলাম ১৯৪৭–৫৭। আমার সব চাক্ষুষ দেখা।

কতো পরিবার মাসের পর মাস বছরের পর বছর রেলের বগীতে কাটিয়ে দিয়েছে। আমি ওদের নিয়ে গল্প লিখেছি ১৯৫০/৫২ সনে, চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে। ভারত থেকে আগত বিহারী তার প্রধান খাদ্য আটা। সে এসে পড়ল চালের মুলুকে, তাও পর্যাপ্ত মেলে না। হঠাৎ খাদ্য-তালিকা বদল। পেটের অসুখ হতে বাধ্য। মহাম্মদপুর, ময়মনসিংহ, সৈয়দপুর প্রভৃতি রিফিউজী কলোনীতে কতো বার না কলেরা লাগল। পানীয় পানি সরবরাহ অত সহজ নয়।

আজও হতভাগ্য হতভাগিনী বহু পড়ে আছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান তাদের গ্রহণ করবে না, বাংলাদেশ তাদের জন্মভূমি নয়। একদা-যারা Muslim Homeland "মুসলমানের দেশ" চেয়ে সব বিসর্জন দিয়ে এসেছিল, তারা আজ Statcles citizen রাষ্ট্রছুট নাগরিক।

AMARBOI.COM

এদেশে সৌজন্যের কল্যাণে আমরা লেখক-নামে পরিচিত। মানবতার এক বিরাট ট্র্যাজেডি-মুখর তুফান বয়ে গেল এই দেশের উপর দিয়ে, আমরা তার সামান্য ছবিও মানুষের সামনে তুলে ধলতে পারলুম না। তবু আমরা নাকি লেখক!

মৌলবাদীদের মানব-প্রেম নেই। পবিত্র কোরানে এক জায়গায় উল্লেখিত যেখানে আল্লা বলছেন যে তাঁর বান্দা-কে যারা ভালোবাসে তারা তাঁকে ভালোবাসে। জিন্নাহ্ সাহেবের মতোই দূরদৃষ্টিহীন মৌলবাদীরা আল্লা-প্রেমিক হতে পারে, কিন্তু ওদের মধ্যে মানব-প্রেম নেই। কোনো কালে ছিল না।

বাংলাদেশ পত্তনের পর এদেশে কতো বিহারী বা ভারত-আগত রিফিউজী ভাই-বোন প্রতিশোধ-পরায়ণ হিংস্র বাঙালির হাতে প্রাণ দিয়েছে। এবার মুসলমান হত্যা করছে বিধর্মী হিন্দু নয়– স্বধর্মী মুসলমান।

যে ইতিহাস, তোমার চরণে কুর্ণিশ!

পাকিস্তান সৃষ্টিকালে বর্ণবিদ্বেষ-ধর্মবিদ্বেষ মারফৎ তো হত্যার দীক্ষা পাওয়া। একদা ধর্মের নামে হিন্দু প্রতিবেশীদের দেশত্যাগে বাধ্য বা দাঙ্গা লাগিয়ে হত্যা সাধনের বীজ ত সেই কালে রোপিত। তা-ই ফলবতী হলো কালে কালে : ব্যুমেরাং এইভাবে ফিরে আসে। একেই বলে, ইতিহাসের প্রতিশোধ বা পরিহাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে পাকিস্তানে একই কাণ্ড ঘটেছে : মুসলমান মুসলমান নিধনে তৎপর। শিয়াসুন্নী ছাড়াও সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান, পাঞ্জাবীরা কুত্তার মত পারস্পরিকভাবে লড়ছে, মরছে।

ইতিহাস এই ভাবে সবক দান করে।

মৌলবাদীদের জ্ঞানের সীমানায় আল্লার মক্কর (রহস্য) হয়ত পৌঁছায় কিন্তু ইতিহাসের মক্কর বহু দূরে থাকে। যারা মানুষকে ভালবাসে না তাদের ধী-শক্তি পঙ্গু হতে বাধ্য।

ওদের জিজ্ঞেস করুন, ইসলামী রাষ্ট্র তৈরী হলো, তা রক্ষার মন্যে আধুনিক ইলেকট্রনিকসের অস্ত্র লাগে। কোন মুসলমান রাষ্ট্র ত সাধারণ টেয়ার গ্যাস (কাঁদুনেবাষ্প) তৈরী করতে জানে না। রাষ্ট্র রক্ষা হবে কী দিয়ে?

ইহুদী-নাসারার আবিষ্কৃত মাইক। গলা-ফাটানো ওই যন্ত্র-ব্যবহার করে মৌলবাদীগণ একদম বেহায়া বেসরম নির্লজ্জের মতো। ইহুদী নাসারার কাছ থেকে হাতিয়ার কিনে তাদের খোয়াবের ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা করবে হুজুরগণ।

এ-ই হচ্ছে ওদের মুরোদের দৌড়!

বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হলে, ঐতিহাসিক ধারায় ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হবে, তখন ভারত-আগত সাড়ে এগারো কোটি মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে আসবে। এখানকার এক কোটি অমুসলিম দেশত্যাগ করলে বর্তমান ১২ বারো এবং দশ ১০ কোটি মোট বাইশ (২২) কোটি মুসলমানের রাষ্ট্র হবে বাংলাদেশ।

AMARBOI.COM

মা-শা আল্লাহ!

তারপর?

তারপর কী হবে?

সে-সব আয়েন্দা সমস্যা কল্পনা করার শক্তি মৌলবাদীদের প্রয়োজন করে না।

কারণ, তারা ইসলাম ধর্ম-রক্ষার জন্যে তৎপর, মুসলমান কওম-কে নয়। তখন মোনাজাতের মহিমায় খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থানের সরঞ্জাম পেট্রল মোটর রেলগাড়ি সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী আকাশ থেকে ঝরে পড়বে। "যাব আল্লাহ দেতা হয় ছাপ্পড় ফাড়কে দেতা হ্যায়।" অনেকে আওড়ায়।

বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা সমগ্র মানবতার সমস্যা, কোন বিশেষ ধর্মের নয়।

মৌলবাদী ধর্মান্ধজনেরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের কোন অতল পরিখার কিনারায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তা শুভ-চেতনার অধিকারী সকল ভাই-বোনগণ ভেবে দেখবেন।

আমি সামান্য ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে যেতে চাই।

মৌলবাদ এই পৃথিবীতে দোজখের আগুন জ্বালায়। ভবিষ্যতের দিকে তাদের দৃষ্টি এগোয় না।

আপনার পুত্রকন্যা এবং বংশধর যাদের মুখের দিকে চেয়ে আপনি গৃহসুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চয়ন এবং বয়ন করেন সুন্দর শান্তিময় বাঁচার স্বপ্ন– মৃত্যুকালে তাদের আপনি কোথায় রেখে যাবেন, কোন পরিবেশে?

তা একবার ভেবে দেখবেন।

মনুষ্যত্বহীন জঙ্গল তৈরী করে মৌলবাদ– মনুষ্য-সমাজ নয়।

সম্প্রতি ঢাকা শহরে হাটখোলা এলাকায় এলিসিয়াম কোর্টে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ঈসা নামক এক ছাত্র-খুনের লোমহর্ষক কাহিনী আপনারা সংবাদ-পত্রে পড়েছেন। খুনীরা অধিকাংশ তারই সহপাঠী।

স্কুলের ছাত্র খুনী এবং দস্যু। শুনে স্তম্ভিত হতে হয়!

ওই খুনী ছাত্ররা মনে রাখবেন, দুর্ভাগা– ইতিহাসের পরোক্ষ শিকার। মানবতার দীক্ষা পায়নি তারা জন্মাবধি, এমনই আবেষ্টনীর মধ্যে বসবাস। তারা ত জ্ঞানাবধি বাল্যকাল থেকে প্রতিবেশী-কে ঘৃণা করতে শেখে, যার সঙ্গে তার মিলই খুব বেশি, কেবল ধর্ম পৃথক। আহার রুচি ভাষা সংস্কৃতি এক। এমনকি বর্ণ হিসেবে (Race) একই। তবু একমাত্র ধর্মের পার্থক্যের উপর জোর দেওয়া হয়। মানুষে মানুষে যে-মিল বর্তমান, সেদিকে জোর নেই। যে-মিলের উপর মানুষ মানুষের আত্মার সান্নিধ্য লাভ করে, ভালোবাসতে শিখে। ভালোবাসা রচনার সেই সেতু অবহেলিত। সকল গুরুত্ব পার্থক্যের উপর। একজন বালকের এই পরিবেশ। জ্ঞানাবধি বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাই তার মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সে আর কি করে মায়া-মমতার চেতনায় দীক্ষা পাবে? সে জ্ঞানাবধি প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতে শেখে। প্রতিবেশী হিন্দু হতে পারে। সে-জায়গায় মুসলমানও হতে পারে, বিশেষত শহরে।

ঘৃণার ঘ্যাপণা জাল যেখানে চতুর্দিকে ছড়ানো সেখানে মানবিক গুণের বিকাশ আর কোন পথে শিকড় মেলবে?

এমন আবেষ্টনী গুণ্ডা মাস্তান চাঁদাবাজ ধান্দাবাজ খুনী শিশু-হন্তারক সৃষ্টি করে।

ঈশা-হত্যা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

বিষবৃক্ষ থেকে কি অমৃত ফল মেলে?

মৌলবাদীদের কাছে সমাজবিজ্ঞান নেই, ইতিহাসতত্ত্ব নেই। জ্ঞান, যুক্তি বিচারের জায়গা নেই। আছে ধর্মের জিগীর, যার ভাষ্য, তফসীর শুধু তাদেরই কৃত। অপরের ব্যাখ্যা সব নাকচ, বাতিল।

মোদ্দা কথা, ওদের আদর্ল ছদ্মবেশ, মুনাফেকী তথা ভণ্ডামির মুখোসে আবৃত।

সেই মুখোস খুলে মৌলবাদের আসল চেহারা দেখার চেষ্টা করুন আপনার পুত্রকন্যা বংশধরদের মুখের পানে চেয়ে।

কল্যাণ হোক বাংলাদেশের।

জয় হোক বিশ্ব-মানবতার।

শওকত ওসমান
১২/১১/৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালের দাপট একমাত্র শিক্ষাগুরু

মূর্খেরা সব শোনো
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনও
– নজরুল

১

আফসোস !

আফসোস হয়!

ওঁদের প্রভাব দেশের মানুষের উপর এত বিস্তৃত-বিস্তীর্ণ অথচ ওঁদের মধ্যে থেকে কোনো দেশপ্রেমিক জন্মায় না কেন, যাঁর হাল জামানার হাল-হকিকত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় আছে এবং সেই ভাবে কোনো ভাবাদর্শ গড়ে তোলে–যা সমাজ সংস্কারের তুফান-সদৃশ শক্তিশালী, বিবাট আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম?

আফসোস!

আমি দেশের আলেমদের কথা বলছি ।

তাঁরা স্রোতহীন ঐতিহ্যের চত্বরে সাঁতার কাটেন, জীবন প্রবাহের কোনো খবর রাখেন না । সামাজিক অতীত এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা– এই দুই চাপের আকর্ষণে-বিকর্ষণে ইতিহাস তার চলাপথ সৃষ্টি করে । এ কথা যেমন দেশ সম্পর্কে খাটে, তেমনই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এইখানে আসে ব্যক্তি মানুষ অথবা সংঘ-মানুষের ভূমিকা । নিঃসঙ্গ অথবা সাংঘিক-সামাজিকভাবে রূপ সেখানে যা-ই হোক না কেন, এমন ক্ষেত্রে মানুষ পরিবেশের স্বরূপ সম্পর্কে যতখানি সচেতন ইতিহাসকে সে বা তারা সেইভাবে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম । আবেষ্টনীর কলকব্জা এবং তৎবিষয়ক জ্ঞান তাই অপরিহার্য । নচেৎ সব অন্ধকারে তীরন্দাজির সামিল ।

আলেমরা এইখানে ফেল করেন ।

আরো মানুষ আছে, আরো সমাজ আছে, পৃথিবীতে তারাও সুখ-দুঃখের সম্মুখীন । সামাজিক দুর্দশার মোকাবিলার তৎপর– তাদের কাছে যেতে আমাদের আলেমরা পরাঙমুখ, যদিও জ্ঞানার্জনের জন্যে রসূল চীন যাত্রার উপদেশ দিয়েছেন । ইহুদী নাসারারাও চিন্তা করে । তারাও রোগে কষ্ট পায়, শোকে কাঁদে । এমন চৈতন্যের মধ্যে আমাদের বুজর্গেরা বসবাস করেন না ।

কিন্তু ইহুদী নাসারার জ্ঞান-নির্মিত সভ্যতার আশীর্বাদ গ্রহণে তাঁরা আদৌ লজ্জিত নন । তাঁরা পবিত্র হজ্বে যান বর্তমানে হাওয়াই জাহাজে চড়ে, কখনও ভাবেন না, এইসব সভ্যতার উপাদানে মুসলমানের কোনো ভূমিকা নেই কেন? ইলেট্রিসিটি ছাড়িয়ে-ওঠা ইলেক্ট্রনিক্সের তেলেসমাতি কাণ্ডে তাঁরা বিস্মিত হন হয়ত, কিন্তু চিন্তায় আনেন না, এমন গঠন জগতে তার কেন জায়গা নেই । জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মওদুদী সাহেব ৭৫ বছর বয়সে আমেরিকার বোস্টন হাসপাতালে মারা যান। ইহুদী নাসারাদের গালাগাল দিলেও তাদের চিকিৎসা নিতে লজ্জা পাননি।

মুসলমান কওমের সৃজনী-দ্যোতনা কয়েক শতাব্দী ধরে বন্ধ হয়ে গেছে কেন? আলেমদের কাছে তা প্রশ্নের আকারে দেখা দেয় না। প্রায় পাঁচ শ' বছর পর মুসলমান সমাজে একজন জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব : অধ্যাপক আব্দুস সালাম। কিন্তু তিনি মুলসমান নন। কারণ তিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সনে গণহত্যার নীল-নকশার সমর্থক, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর ঘাটু-পোলা জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাজত্বে এবং আল্লার রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর আইন পাশ করা হয় : আহমদিয়া বা কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়।

পরবর্তীকালের ইতিহাস অনেকে জানে। মিলিটারীদের উপর ভুট্টো সাহেব আরোহণ করেছিলেন। পাল্টা মিলিটারিদের পালা। তারা প্রাক্তন ঘাটু-পোলাকে ফাঁসি দিয়ে ছাড়ল।

পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক ভুট্টোর মতোই পার্লামেন্টে পাশ করালেন : আহমদিয়ারা মুসলমান নয়।

কওম যখন আত্মহত্যায় মাতে তাদের এমনই দশা হয়। অর্থাৎ মাছের মতো তাদের আগে মাথা পচতে শুরু করে। আলেম শুধু নয়, দেশের জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একই আলামত প্রচণ্ডভাবে দৃষ্ট হয়।

ধর্মের সঙ্গে কল্যাণ সম্পৃক্ত। তাদের আলাদা ব্যবচ্ছেদ চলে না। দেখা যায়, আলেমরা সেই প্রধান গন্তব্যরূপ আলিকা থেকে তা বাদ দিয়ে রাখেন। নচেৎ চৌদ্দ শ' বছর ধরে ফয়সালা হয় না "খতম" নামে পূর্ণাঙ্গ (Perfect) না "শেষ"। এমন বন্ধ্যা তর্কে শত শত বছর কেন কাটিয়ে দেয়? শিয়া-সুন্নী লড়ে চলে। কাদিয়ানী সুন্নীর বিরোধ থামে না। আর ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি ছিদ্র অন্বেষণের এইসব পন্থা মুসলমান কওমকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলেছে, তাঁর কোনো হিসাব নেয় না। চাঁদের মুখে নভোচারীদের বুট-ঘষা যুগে আমরা রিকশা টানি যেন ভারবাহী পশু।

নিশিগ্রস্ত ব্যক্তি মানুষ যা করে, কওমও তা সম্পাদনে সক্ষম, মুসলমান সম্প্রদায়ের সওয়া শ'র বেশি উপ-সম্প্রদায়ের বিভক্তি (ফের্কা) থেকে তেমন সিদ্ধান্তে সহজে পৌঁছানো যায় খুব সহজে। অর্থাৎ হিসাবের বালাই নেই। নিশিগ্রস্তজনের সামনে সাপ আসুক, বাঘ হঙ্কার তুলুক, নদী পড়ুক– কিছুয়ে তার কিছু আসে না।

আপনারা জানেন, তবু একটা উদাহরণ দেওয়ার লোভ সংবরণে আমি অক্ষম।

"নবী দিবস" কি সকলের জানা। এই দিবস পালনের ইতিহাস হয়ত অনেকের জানা নেই। সত্তর বছর পূর্বে আমার বালককালে ওই দিনে কি গ্রামে, কি শহরে অল্পসংখ্য কম ধনী বনেদী পরিবারে মিলাদ হতো এবং যে-যা পারে সামর্থ্য অনুযায়ী বাতাসা বা সন্দেশ সমাগতদের মধ্যে বিতরণ করত।

কিন্তু এই "দিবস" রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি : নেশন (Nation) অর্থে। এই স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করার জন্যে তাঁরা "নবী দিবসও" বেছে নিলেন। কালে কালে তার জৌলুস বাড়তে লাগল। শেষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছল পাকিস্তান অর্জনের পর। এখনও তা অব্যাহত আছে। সেদিন সরকারি-বেসরকারি বিল্ডিংয়ের আলোকসজ্জায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরানো কোনো আদর্শ মানুষ গড়ার ঐতিহ্যে একটি বিরাট উপাদান। এখন এই সব "দিবস" পালনের ফলাফল কি? হিসাব নেওয়া নিশ্চয় দরকার, যদি কওম নিশিগ্রস্ত না হয়ে থাকে।

দেখা যায়, দেশের অধিবাসীগণ নিশ্চিত ধার্মিক হয়নি, সৎ হয়নি। তাহলে পাকিস্তান তো ধ্বংস হতো না আদৌ। পূর্ব-পশ্চিমে শোষণের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা গড়ে উঠত না। নবী দিবস পালনের উদ্দেশ্য বানচাল পদে পদে। এতিহ্য যদি বর্তমান জীবনের অভ্যন্তরে সম্পৃক্ত না হয়, অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ না করে, সবই ভণ্ডুল হয়ে যায়। শোষকের নিকট ধর্ম সর্বদাই মুখোশের কাজ করে। সাধারণত মানুষ সহজে প্রতারিত হয়। নিরীহজনেরা মুখোশ ও মুখের ফারাক চট করে ধরতে অক্ষম। চব্বিশ বছর লেগেছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের এই ভণ্ডামি ধরতে।

সব সংগঠনের এই সময়ে নেতৃত্বের প্রশ্ন অপরিহার্য। গাঁয়ের মানুষেরা বলে, "মুড়ো ও লেজ জোড়া, নচেৎ মড়া।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বের কথা কে অস্বীকার করতে পারে? অমন নেতৃত্ব না থাকলে আরো বহু বছর পড়ে থাকত এই ভূখণ্ড উপনিবেশ রূপে।

AMARBOI.COM

"নবী দিবস" আজও শোষকের কাছে মুখোশের মতো ব্যবহৃত। "নবী দিবস" সার্থক হলে, সামাজিক স্বাস্থ্যের এমন দশা কেন? পাড়ায়-পাড়ায় মাস্তানের জুলুম, প্রশাসনের দুর্নীতির বন্যা আর শাসককুলের এমনই প্রতিমূর্তি যে দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বছরের পর বছর জেল খাটে শক্তির অপব্যবহার নয় শুধু, সাধারণ অর্থগৃধনুতার অভিযোগে।

ফার্স্ট লেডি শক্তিমত্তার এসিড ছুঁড়ে হাজার হাজার টাকা অপচয় করতেন দূরপাল্লা টেলিফোনের পেছনে। এখন প্রায়শ্চিত্ত করছেন। (প্রথম) (First) থেকে তিনি এখন (Past) (বিগত) লেডি।

তালিকা দিলে গ্রন্থ রচিত হবে বহু বালাম (Volume)। দেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ সাহেব গদিচ্যুতির পর বিবিসির প্রতিবেদককে বললেন যে, উচ্চ মহলে দুর্নীতির ফলে তাদের এই পরিণাম। লক্ষ্য করুন, বছরের পর বছর তাঁর আরাম-আয়েশের সব উপকরণ যুগিয়েছে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। গ্রাসাচ্ছাদনের নিচে যাদের শতকরা ৮৭ জনের অবস্থান-ডাগর বেতন যুগিয়েছে। তিনি মসনদের উপর বসে তাহলে কি করেছিলেন? বেহায়ার সংজ্ঞা এখান থেকে পাবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের তরক্কীর বিবর্তনের ইতিহাস অবগতির জন্যে আমার ৮৯ সনের ডায়েরীর পৃষ্ঠা হুবহু তুলে দিচ্ছি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

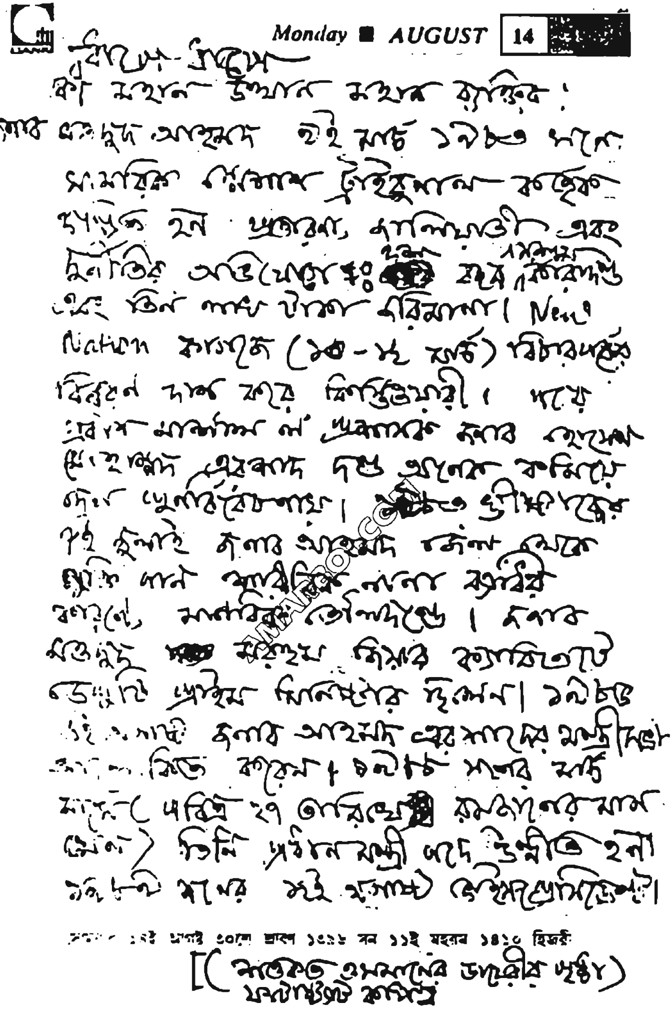

সোমবার ১৪ আগস্ট ৩০শে শ্রাবণ ১৩৯৬ সন ১১ই মহরম ১৪১০ হিজরী
শওকত ওসমানের ডায়েরীর পৃষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাপে ধাপে
কী মহান উত্থান মহান ব্যক্তির!
জনাব মওদুদ আহমদ ৯ই মার্চ, ১৯৮৩ সনে
সামরিক স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক
দণ্ডিত হন প্রতারণা, জালিয়াতি এবং
দুর্নীতির অভিযোগে : দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড
এবং তিন লাখ টাকা জরিমানা। New
Nation কাগজে (১০ – ১২ মার্চ) বিচার পর্বের
বিবরণ দান করে কিস্তিওয়ারী। পরে
প্রধান মার্শাল 'ল' প্রশাসক জনাব হোসেন
মোহাম্মদ এরশাদ দণ্ড অনেক কমিয়ে
দেন পুনর্বিবেচনায়। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের
৭ই জুলাই জনাব আহমদ জেল থেকে
মুক্তি পান শারীরিক নানা ব্যাধির
কারণে, মানবিক তৌলদণ্ডে। জনাব
মওদুদ মরহুম জিয়ার ক্যাবিনেটে
ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন।
১৯৮৫ ৬ই আগস্ট জনাব আহমদ এরশাদের মন্ত্রীসভা
আলোকিত করেন। ১৯৮৮ সনের মার্চ
মাসে (পবিত্র ২৭ তারিখ, রমজানের মাস
যেন) তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন।
১৯৮৯ সনের ১২ই আগস্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

সোমবার ১৪ আগস্ট ৩০শে শ্রাবণ ১৩৯৬ সন ১১ই মহরম ১৪১০ হিজরী
শওকত ওসমানের ডায়েরীর পৃষ্ঠা

এই জিজ্ঞাসা ওঁদের কানে পৌঁছাবে না কোনো দিন।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, মধ্যবিত্ত-জাত এদেশের এইসব সন্তান– (যারা নাড়া-বন থেকে হাই-কমোডে পায়খানা ফেরার প্রমোশন পান) তাদের মগজে কি মনুষ্যত্বের কোন ছাপ পড়ে না? দেশপ্রেমের এতটুকু ছিটেফোঁটা ওদের অন্তরে সেঁধোয় না? অথচ এঁরা শিক্ষিত।

নিশিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ক্ষয়ক্ষতির যাচাই হিসাব মিলিয়ে দেখা, সুদূরের কুহেলিকা। নিশিগ্রস্ত মুসলমান কওমের চেহারা একই ছাঁচে ঢালা। এমন ক্ষেত্রেই অভ্যুদয় ঘটে ফতোয়াবাজদের। তাঁরা আলেম সম্প্রদায় উদ্ভূত। তাদের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর মধ্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অন্য জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস কোন কিছু প্রবেশ করে না। কিংবা তাদের ধারণার বাইরে থেকে যায় অনেক প্রশ্ন, যা হামেহাল জেগে থাকার কথা।

আধুনিক মেশিনের যুগে পেট্রোল ছাড়া চিন্তা করা যায় না কোনো যন্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব। ভূতলের এই তরল স্বর্ণপিণ্ড হাজার হাজার বছর সঞ্চিত ছিল মরুভূমির বুকে। মধ্যপ্রাচ্যে সবই মুসলমান রাষ্ট্র। অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, জ্ঞানেবিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, দরিদ্র জনসাধারণ-যদিও শাসক শ্রেণী বিত্তবান। এই রত্ন উৎস পেট্রোল মানুষের কাজে লাগার কথা অথচ মুসলমানের মগজে কোনো দিন দেখা দেয়নি। ইহুদী নাসারা এগিয়ে এল তাদের উন্নত প্রকৌশল নিয়ে।

কেন এমন ঘটল?

আমাদের আলেমরা তা ভেবে দেখার সময় পান না।

অনেকে জানেন, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সৌদী আরবের কিছু অধিবাসী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন ফরাসী সরকার তার জাতীয় পুলিশ (National Gendarmerie) দিয়ে আমিরাতকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। পবিত্র মক্কার ভেতরে এই বিদ্রোহীরা আশ্রয় গ্রহণ করে। অবিশ্যি সশস্ত্র। মক্কা শরীফের ভেতরে অমুসলিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু বিপদ বড় বালাই। সৌদী আরব ফরাসী পুলিশের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়নি।

আমাদের আলেমরা পৃথিবীর এসব ঘটনা বিশ্লেষণের সময় পান না। তাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় না, বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইসলামের মোহাফেজ রক্ষক নামে কথিত সৌদী রাষ্ট্রের সাহায্যে এগিয়ে আসে নাসারা পরিচালিত আর এক রাষ্ট্র যা ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা রূপে বিশ্বে পরিচিত। অথচ লড়াই চলছিল মুসলমানে মুসলমানে : কুয়েত বনাম ইরাক।

প্রত্যেক ধর্মের উত্থানকালে অঙ্গীভূত থাকে প্রচণ্ড মর্মশক্তি– ইংরেজী ভাষায় স্পিরিট– যা অসাধ্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কালে কালে তা হারিয়ে যায় বা শক্তি হারিয়ে ফেলে নানা কারণে। তার বিশদ আলোচনার পরিসর এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলা যায়, ধর্ম মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা মোচনেও সাহায্য করে। উত্তরকালে মন্দীভূত মর্মশক্তি আবার জাগ্রত করার জন্য যারা এগিয়ে আসেন, সমাজের শাসক শ্রেণী তাদের বাধা দেয়। নতুন সংযোজন বা সংগতি উৎপাদনের আর উপায় থাকে না। ফলে এককালের বেগবান ইঞ্জিন প্রায় ব্রেকে পরিণত হয়।

২

এমন ভাটার কালে নানা ফতোয়া-দাতাদের আবির্ভাব ঘটে। এরা আর মানুষে মঙ্গলামঙ্গল দেখে না, দেখে ধর্মের বহিরঙ্গ-বাহ্যিক স্বরূপ। এরা সেই সাতজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাদিক অন্ধ, যারা হস্তী-দর্শনের পর নিজ নিজ মন্তব্য দান করেছিল।

এক অখণ্ড ইসলাম ধর্ম বিগত কয়েক শতাব্দীতে চূর্ণবিচূর্ণ নানা সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। তার কারণ পূর্বোক্ত মূর্খতার অনুসৃতি-ফল।

এই দেশে যে তবলীগ উপসম্প্রদায় আছে, তারাও অখণ্ড এক নয়। নানা খণ্ডতায় বিভক্ত।

অখণ্ড মাটির চূর্ণ বড় চাং ঢেলা বা ধুলোয় পরিণত হয়। তাই ঘটে মানুষের সমাজ জীবনে। গোড়ায় উল্লেখিত অতীতের চাপ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চাপ– এই দুই আকর্ষণে-বিকর্ষণে এক এক শ্রেণীর মানুষ একদম থেঁতলে যায়। তাদের জীবনযাপনও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জর, তখন সমাজে বহু পথপ্রদর্শকের অভ্যুদয় ঘটে। তাদের হুজুর-কেবলা রূপ মেনে নিতে বেশি দেরী হয় না।

মনে রাখা দরকার, এই সব ফতোয়াবাজেরা দীন-দরদ্রের উপর জুলুম চালায় নিজেদের আধ্যাত্মিকতার গদি বজায় রাখতে। এরা শহরে আসে না, ধনীদের উপর ফাতোয়া চালায় না। এই ধর্মধ্বজী শ্রেণী ধনীদের ভয় পায়। নানা হীনমন্যতায় ভোগে। আধুনিক সভ্যতার বহু জড়-সুখ (উন্নত রুচির আহার-বিহার ফ্রিজ মোটর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মেশিন ইত্যাদি) থেকে ওরা বঞ্চিত। অচেতন মনে তার লালসা থাকে বৈকি। আত্মচূর্ণকারী পরিবেশে নিজেদের স্বল্পজ্ঞান, স্বল্পবিত্ত সম্পর্কে সচেতন এই জাতীয় ফতোয়াবাজেরা গরিব পরিবেশে দরিদ্রজনের উপর ছুতোনাতা তুলে নিজেদের সদম (Sadistic instinct) কামেচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটায়। মেয়েদের দোররা মারার ফতোয়া দেয়, যেন পৃথিবী অষ্টম শতাব্দীর মধ্যপ্রাচ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

অথচ মহাপ্রভু মোহাম্মদ (দ.) দীনজনের বন্ধু ছিলেন। অভিজাত কোরেশ বংশের সন্তান দরিদ্র জনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর উম্মতদের চেহারা দেখুন বর্তমানে। তারা নায়েবে নবী বা নবীর প্রতিনিধি নামে বাজারে চালু।

কি করে দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত, মানুষের অস্তিত্ব-রক্ষী দু'মুঠো অন্ন, পরনের বসন, মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং শিক্ষার ব্যবস্থা হবে– এমন সব সমস্যা নিয়ে এসব নায়েবে নবীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা পবিত্র ইসলাম রক্ষা করে মানুষের উপর ধর্মের নামে জুলুম চালিয়ে এবং বর্তমান জগতের হাল-হকিকৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড অজ্ঞতা মগজে গুঁজে রেখে। ওরা অথচ বসবাস করে ইহুদী নাসারা-নির্মিত সভ্যতার প্রতিটি উপাদান নিয়ে। দেশের মানুষ আজও লাংগা বদন বা জরাজীর্ণ বেশ, শীর্ণ দেহে রিকশা টানে। এমনকি এই রিকশার মধ্যেও কাঠ ও বাঁশ ছাড়া আর কোন পার্টস নিয়ে আমাদের বলে গর্ব করার কিছু থাকে না। তখন লজ্জা পান না ইসলাম ধর্মের এই রক্ষকেরা। রিকশায় চেপে বসে থাকেন লাট সাহেবের মতো।

পাপের জন্য ধর্মদ্রোহিতার বিচার করবেন স্বয়ং আল্লাহতালা কেয়ামতের সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজ হাশরের ময়দানে। তার পূর্বেই এই তিমিরাচ্ছন্ন ফতোয়াবাজরা বিচার কি ভাবে হাতে গ্রহণ করেন? কি জবাব দেবেন তারা?

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীরনায়ক মরহুম হুয়ারি বুমেদীনের একটি বক্তৃতাংশ আজ স্মরণীয়। তৎপূর্বে বলে রাখা দরকার আলজিরিয়া মুসলমানদের দেশ। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়ায়ে শতকরা কুড়ি জন (অর্থাৎ প্রতি পাঁচ জনে এক জন) শহীদ হন। এমন চড়া দামে অর্জ্জিত ওঁদের স্বাধীনতা। সে সময় পাকিস্তান সরকার জাতিপুঞ্জে বা অন্য কোথাও এতটুকু প্রতিবাদ জানায়নি। পাকিস্তান অবিশ্যি মুসলমানের দেশ। সত্যি কি তা-ই? আলবৎ। আমি না বললেও চলে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তখন টু শব্দ করেনি। বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র ছয়ের দশকের ব্যাপার। চল্লিশ বছরও হয়নি।

পাকিস্তান। মুসলমানের দেশ– আল্লার নামে নির্মিত– ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৈরি রাষ্ট্র আর এক দেশের মুসলমানের দুর্দশায় তাদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ানো, চুলোয় যাক, একটা মৌখিক প্রতিবাদ কোথাও করল না। এ কেমন ব্যাপার?

আধুনিককালে জীবন কতো জটিল ও কুটীল ফতোয়াবাজদের এসব খবর রাখার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের তাগিদ তো ভেতরে থাকা চাই। তার জন্য মনের বিস্তার প্রয়োজন। কূপমণ্ডুক আকাশের খবর রাখবে কি দিয়ে? তার জন্য মগজ লাগে। মগজের চর্চা লাগে। তারই অভাবে, বর্তমানে মুসলমান রাষ্ট্র রক্ষিত হয়, ইহুদী নাসারার তৈরির অস্ত্র দিয়ে। জেট বিমান, মেশিনগান, রাইফেল, বন্দুক, সাঁজোয়া গাড়ি কোথা থেকে আসে? তার খবর ফতোয়াবাজরা রাখে না।

AMARBOI.COM

সে কথা থাক।

প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের পাট বেচে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত নিজেদের কোলে ঝোল বা শুরুয়া মাখাত পশ্চিম পাকিস্তান। বৈদেশিক বাজারে পাকিস্তানী পাটের দ্বিতীয় উচ্চতম (Second Highest) ক্রেতা টুঁ ছিল ফ্রান্স।

টুঁ করলে, খরিদ্দার ছুটে যাবে।

আর কি কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে?

ফতোয়াবাজেরা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামে আধ্যাত্মিক তেজ দেখায় না।

মরহুম বুমেদীনের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন–

"Spiritual links, whether, Islamic of Christian, did not stand up against the snarl of poverty and ignorance ... what I want to say is that people who are hungry have no need to listen to the holy verses despite all my respect for the Koran which I learnd at the age of ten. People who

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

are hungry need bread, ignoart people need knowledge, and ill people need hospitals : that is the crurx of the matter .... If the mosque is used to defend injustice, explaitation, slavery and feudalism, it is not mosque of Islam, but a mosque which destroys Islam."

"আধ্যাত্মিক যোগসূত্র, হোক তা ইসলামী কি খ্রীস্ত্রীয়, কখনই দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার দাঁত কিড়মিড়ানির বিরুদ্ধে তেমন দাঁড়ায়নি। .... আমি বলতে চাই যে, মানুষ যদি ভুখা থাকে তার পবিত্র আয়েৎ শোনা দরকার নেই। একথা আমি বলছি, পবিত্র কোরআনের প্রতি আমার সব শ্রদ্ধা রেখেই যে পবিত্র কেতাব আমি দশ বছর বয়সেই শিক্ষা করেছি। ভুখা মানুষের দরকার রুটি, অজ্ঞ লোকের দরকার জ্ঞান এবং অসুস্থ জনের দরকার হাসপাতাল। ... খালি পেটে লোক বেহেশতে যেতে চায় না– সমস্ত সমস্যার মূল কথা এইখানে নিহিত। ... মসজিদ যদি ব্যবহৃত হয় অবিচার, শোষণ, 'দাসত্ব এবং সামন্ততন্ত্র (ফিউডালিজম) রক্ষায়, তা হলে তা ইসলামের মসজিদ নয়। তা হবে ইসলাম ধ্বংসের মসজিদ।"

ফতোয়াবাজদের নিকট পৃথিবীর এত সংবাদ কোন কালে পৌঁছায় না। সংকীর্ণ ইলেমজাত চিত্ত তাদের আর কত দূর নিয়ে যেতে পারে বা যায়?

ধর্মগ্রন্থের বাইরে আরও গ্রন্থ আছে। সে সব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ধর্মও কালে কালে তার তেজ হারিয়ে ফেলে।

মুসলমান কওমের দুর্দশা, পশ্চাৎপদতার হেতু এই খানে নিহিত।

AMARBOI.COM

৩

তবে কি ফতোয়াবাজরা যুগে যুগে পবিত্র ধর্মের– এখানে ইসলাম ধর্মের প্রতিবন্ধক রূপেই বর্তমান থাকে?

না, কালের প্রহার বা দাপটে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে দুটি নজীর। অতীতের নজীর বহু দেওয়া যায়।

১. এই ঢাকা শহরে ১৯৪৮ সনে দেখা গেছে পর্দা প্রথার কড়াকড়ি পবিত্র ধর্মের দোহাই যোগে। মেয়েরা স্কুলে ঘোড়ার গাড়ির উপর মশারি চাপিয়ে যেত। খড়খড়ির ছিদ্রের রেহাই ছিল না। বর্তমানে পেটকাটা, বগলকাটা ব-াউসপরিহিতা তরুণী কামিনী রমণীরা ঘুরে বেড়ায়। কেউ বাধা দেয় না।

ঈমান কমজোর হয়ে গেল কেন?

২. নিবন্ধের দীর্ঘতা দেখে সংক্ষেপে বলছি, ১৯২০/২২ খ্রিস্টাব্দে, মুনশী রিয়াজ উদ্দিন নামে এক প্রসিদ্ধ (অবিশ্যি মুসলমান সমাজে) পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, "লোকটা মুসলমান না শয়তান?" শিরোনামায়। তাঁর টার্গেট কাজী নজরুল ইসলাম। মৌল-ানা আকরম খাঁর নিজের সাপ্তাহিক পত্রিকায় "মোহাম্মদীতে" একই ব্যক্তিকে "কাফের" বলেন। মৌলানা নজীর আহমদ লেখেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জারজ" এবং আরো বিশেষণ বিশেষ্য যোগ ছিল।

নজরুল বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

অন্য মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কালের দাপট ফতোয়াবাজদের একমাত্র শিক্ষাগুরু। ওরা মরা সাপের লেজের সঙ্গে তুলনীয়। লাঠির বাড়ি খেয়ে সাপ মৃত। কিন্তু লেজ তারপরও নড়ে, মুড়োর সঙ্গে যোগাযোগহীন। এদের দশা তেমনই। কিন্তু ওদের ধার্মিকতার প্রকাশ প্রত্যন্ত গ্রামে গরিবদের উপর। শহরে বা ধনীর উপর নয়।

নজরুলের বাণী দিয়ে নিবন্ধের প্রারম্ভ, সমাপ্তিও বিদ্রোহী কবির "খালেদ" কবিতার কয়েকটি চরণের সাহায্যে :

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে।
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চষে।
হান্‌ফী ওহাবী লা-মজহাবীর তখনও মেটেনি গোল
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল "তল্‌পী তোল"।
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত।"

AMARBOI.COM

বর্মী মিলিটারী ভজন

অস্থায়ী

বার্মা মুলুকের বাবা ও মিলিটারী,
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

অন্তরা

১

"দস্তা কি টুপী কা পিছে কিয়া হ্যায়?
না মাথা হ্যা-
না মগজ হ্যায়?"
লোকের রটনা-কথা বড় দিগ্‌দারি।
ওরা চেনে না তোমাদের ও মিলিটারী!
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

২

মাঝে মাঝে তোমরা করে বসো বদ্‌কাম
তাই সুযোগ পায় ছড়াতে বদ্‌নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গারদে ভরেছ যারে তার কেবা পিতা?
জেনারেল আউং সাং কে জানো কি তা?
জাপানীর সাথে তিনি লড়বেন বহু দিন
নচেৎ বার্মা মুলুক থাকত পরাধীন।

আমরা বলি ওকে "সু কী" তোমরা "শুচী"
প্রতিবেশীর ভাষা কেন বিকৃতির রুচি?
উচিত নয় আদৌ। সাম্রাজ্যবাদীরা
দিত ওই জুতার ঘা, আজো ফুলে আছে শিরা।
যা খুশী হও হয়ো না অত্যাচারী
....
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

৩

শুচী-কে ছেড়ে দাও, বার্মা হোক শুচি
মানুষ হয়নি আজও যমের অরুচি
অনিয়মে দেহ তার ভেঙে যেতে পারে
স্রেফ মনের জোরে লড়ে কাটা হাড়ে
কতো বল থাকে অবলার? জেনো তাই,
ওর কিছু হলে তোমাদেরও বাঁচা দায়।

তবে এসব ছোটখাট তোমাগো গলদ
আসলে তোমরা মনে নও বদ।
শুচী-কে আটক রাখা ছোটখাট দাগ
চন্দ্রে কলঙ্ক– বিশ্ববাসী বীতরাগ।
তোমাগো গুণের পাল্লা ঢের বেশী ভারী
....
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

৪

তোমরা পড়শী, ধর্মে দিলে মন
যদিও পেশা খুন হত্যা জখম।
মারণাস্ত্র দিয়ে কি চুমু খাওয়া যায়?
অথচ তোমাগো ব্যবহার সৎ কাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-সবের প্রতি রোজ জানাই সালাম।
সুদূর-প্রসারী তোমাদের ধর্ম-মতি
দুনিয়াবাসীর কল্যাণ-কাজে ব্রতী
সজ্জন তোমাদের নামে গায় জারী।
....
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

আমাদের বাদশাও ছিল মিলিটারী
তিন বছর পূর্বে, যেহেতু অত্যাচারী,
ভাগিয়ে দিলাম তাকে, আজ জেলে পচে
পদ্য লেখেন অকবিতা মচ্‌মচে
সেও কিন্তু ধর্মে দিয়েছিল মন
ইসলামী রাষ্ট্র বানালো তখন
শাসনতন্ত্র একদম ছ্যাঁদা করে
প্রশাসন ধমকানি ইত্যাদির জোরে।
কিন্তু তলায় ছিল ঘোর অত্যাচার।
তাই তড়িঘড়ি পতন হোলো তার
ধপাস-পতন বড়ো বড়ো তাড়াতাড়ি
....
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

৫

তোমাদের ধর্মমতি আচরণ ফলে
আমাদের বুকে শত আশা-দীপ জ্বলে।
তোমরা বানিয়েছ দেখি বৌদ্ধ মুলুক
আমাদের তাই ভরা থাকে খালি বুক
আমাদেরও যে হবে ইসলামী শাসন
ভবিষ্যতে, তা দেখা যায় এক্ষণ।
আরকানী মুসলমান নিয়েছে আশ্রয়
বাংলাদেশে। চতুর্দিকে তোমাদের জয়!
এখানে মুসলিমের সংখ্যা বেড়ে যায়।
খাওয়ানের মালিক সে ত আল্লায়।
সংখ্যায় বাড়ে যতো ভাই মুসলমান
ততই জাঁকালো হবে আল্লায় গুণগান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা ধর্মে যদি নাই দিতে মন
পেতাম কি কওমী ভাইয়ের বিশ্ব-বিচরণ?
তোমাদের লাভ আমাদেরও লাভ খুব
বোঝে না এই দেশে কেবল উজবুক।
কালে কালে বার্মাদেশে কি মজাদার
বৌদ্ধ থাকবে, থাকবে না কেউ আর।
বাংলাদেশও মুসলিম দেশ হবে জানি
আল্লা যদি করেন থোড়া মেহেরবানি।
হিন্দু রাষ্ট্র পাশে ভারত নির্যাৎ
নাসারারা বলে (Process)
ধারাবাহিক কার্যপ্রণালী এ তো সোজা বাৎ।

পানি কি উজান বয় জমি যেথা ঢালু
না প্রকৃতির হবে নয়া আইন চালু?
শুধু কালের জন্যে কিছুটা সবুর
খোদার কৃপায় তা-ও নয় বেশী দূর।
বৌদ্ধ রাষ্ট্র, ইসলামী 'হকুমৎ'
পাশে হিন্দু রাষ্ট্র ভারতীয় যথাযথ
পাশাপাশি দ্যাখো অতুলনীয় বাহার।
তেমন ভবিষ্যৎ পানে চাই বারম্বার।

বসবাস করে ভারতের পূর্ব-এলাকায়
এগারো কোটির মত মুসলমান ভাই
গড়েছেন আল্লা এই বিচিত্র সংসার
পশ্চিম বঙ্গ, ইউ পি, আর বিহার
সেখানে সবাই মা'শা'ল্লাহ মুসলিম
আল্লার করুণা ভাবো কত না অসীম!
পাকিস্তান দুর্গম বিধায়, কালে কালে
বাংলাদেশের দিকে খুব খুশী হালে
ফেরাবে আপন কওমের পানে মুখ
সকলে আমার তরে হবে উৎসুক।
বারো কোটি আছি আরো কোটি দশ
একুনে বাইশ কোটি, আল্লার আরশ
পানে উত্থিত, ভেবে দ্যাখো, এত হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলব আমরাই, লক্ষ্য মোনাজাত।
সব কিছু মিলবে নিশ্চয় তার জোরে
মূর্খেরা খামখা খালি-খালি ভেবে মরে।

সবই মিলবে সেই তোড়ে যাবতীয়
খাদ্য দ্রব্য যা-প্রয়োজন স্বীয়-স্বীয়
এবং অবিশ্যি পেট্রল দাওয়াই
শীতাতপ যন্ত্রপাতি আরো যা-যা চায়
দেশের চাহিদা / এমন পণ্য সব
(ছাপ্পড় ফুঁড়ে দেন আল্লা)
ঘরে ঘরে শুরু হবে হর্ষ-কলরব।
দিগ্বিজয়ী যাত্রা শুরু মুসলমানের
সফল হবে স্বপ্ন চোখে আছে ঢের,
বার্মার কল্যাণে ধর্মরাষ্ট্র সারি সারি
....
বার্মা মুলুকের বাবা ও মিলিটারী,
তোমাগো কেরামতিতে যাই বলিহারি!!

AMARBOI.COM

মগ্‌রেবের অঙ্কে শোনো উষার আজান

খবর এসে পৌঁছল অবশেষে

খবর!

আমরা নয় মাস লড়ায়ের ময়দানে। যে-যার ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। গর্দভের সামনে গাজরের আঁটি ঝুলিয়ে প্রলুব্ধ করা হয় এগিয়ে যেতে। আমাদের যদি কেউ তেমন জীবের পর্যায় ফেল, এতটুকু আপত্তি করব না।

রণপ্রান্তরে দামামা ছিল। আরো যুদ্ধের বাজনা ছিল বৈকি। কিন্তু সে-সব আমরা কর্ণপটে গ্রহণ করেছি করিনি, তা মনে রাখারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা খবরের প্রতীক্ষায় ছিলুম সদা-উৎকর্ণ।

কবে সেই সংবাদ এসে পৌঁছাবে, তারস্বরে ধ্বনিত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর এসে পৌঁছল অবশেষে।

নয় মাসের প্রতীক্ষা।

জননীর জঠরে ছিলাম একদিন। আমার জন্যে মা প্রতীক্ষা করেছেন নয়-নয় মাস। তার জঠরের মণিমাণিক্য কবে তাঁর বুকে এসে আলিঙ্গন নেবে, কোল জুড়াবে।

এই বার্তা আলাদা। বিপরীত। কারণ, কাল অস্বাভাবিক। জননী সন্তানের অপেক্ষায় থাকে। এখানে সন্তান ছিল তার স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর প্রতীক্ষায়। এবং এক আধ দিন নয় আদৌ বরং নয়-নয় মাস। জন্মদাত্রীর সেই দর্শনের জন্যে বাজি সর্বস্ব।

বাজি প্রাণ।

মার জন্যে জান-কোরবানী ছিল অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

খবর এসে পৌঁছল অবশেষে।

তৎপূর্বে বহু তাজা তরুণের লাল রক্তে বাংলাদেশের পলিমাটি রঞ্জিত হয়ে গেছে। শরীর অটুট থাকলেও অনেকের বুকের ভেতর সহস্র রোলার মেশিনের শত-দু'শত টনী চাকা গড়িয়ে গেছে নির্মমতার সকল প্রান্তর জুড়ে, যেখানে কান্না আর চোখের জলে হয় না, দুমড়ানো-মুচড়ানো পাঁজরের বিদার-ধ্বনি শুধু একমাত্র বিনিময়।

তরলের জায়গা নিয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরেট শক্ত ঋতু। কংক্রিট।

খবর এসে পৌঁছল অবশেষে।

আমার জন্যে মা ন' মাস ধৈর্য ধারণ করেন। এবার ছিল আমার প্রতীক্ষার পালা। জননীর জন্যে সন্তান ধৈর্যহীনতার মুহূর্ত যাপন করেছে দিনরাত্রি। আমার হারানো মা'র সঙ্গে আবার দেখা হবে।

হারানো নয়। ভুল বললাম। উন্মাদিনীর বেশ আমার জননী। দুর্বৃত্ত দস্যু-ধর্ষিতা ছিন্নভিন্ন বেশ এবং কেশ, অঙ্গশ্রীহীন আমার জন্মদাত্রী।

তাঁর উদ্ধার-কল্পেই তো বিগত নয় মাসের এত দুঃখ সওয়া।

শুধু আমি নই। তাঁর কোটি কোটি সন্তান।

খবর এসে পৌঁছল অবশেষে।

ভৈরব-বব তাথিয়া-তাথিয়া তাণ্ডব-নৃত্যমুখর সাইমুম মরুপ্রান্তে বিরাট ধাবমান বালু-প্রাচীরের মত ক্রমশ অগ্রসর।

এখানে নেই সেই প্রাণ-ভীতি, নেই দুর্জনের সন্ত্রাসিত আবেষ্টনী যা প্রতি মুহূর্তে তোমাকে থেৎলে-থেৎলে 'কিমা' বানায় আর অখণ্ড এক প্রাণী রূপে থাকতে দেয় না। অর্থাৎ, তুমি আর মানুষ নও– নর-মাংসের বা নারী মাংসের 'কিমা'।

এই বালু-প্রাচীরের অদ্ভুত এক ধর্ম আছে। যখন তা নিকটে আসে তার বেগ যায় কমে, গতি মন্দীভূত এবং নিমেষে মনে হয়, চলমান কুয়াশা। অবিশ্যি ধূসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ চোখ সামনে বেশি দূর এগোতে দেয় না। তার হেতু আছে বৈকি। যথাস্থানে তা বয়ানের ব্যবস্থা আছে।

খবর এল বেতার মারফৎ। খুব সংক্ষিপ্ত খবর : পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যবাহিনী আজ ভারত ও বাংলাদেশ– এই জোট মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

আর ত কিছু শোনার প্রয়োজন করে না।

এমন সংবাদের জন্যে বিগত নয় মাসের প্রতীক্ষা। সামান্য সংবাদ দ্যোতনার অসংখ্য প্রাণ-বীজ হয়ে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে।

এই আনন্দ-বার্তা কিন্তু পরমুহূর্তে বিষাদের ছায়া হয়ে তোমার বক্ষপিঞ্জর ধরে অসহ্য গতিবেগে নাড়া দিতে থাকে। তাই চতুর্দিকে আর কিছু দেখা যায় না। মনে হবে সবই যেন কুয়াশার আস্তরণ।

মুদ্রার অপর পিঠ থাকে।

তাই ত দিশা আর আপন কক্ষ-পথে এগোতে পায় না।

যেই মুহূর্তে প্রাণ চীৎকার দিয়ে ওঠে নজরুলের ভাষায়, "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে/ .... মোর টগবগিয়ে খুন হাসে/" তিরিশ লক্ষ দেশবাসীর বলি ছাড়াও তখনই যুগপৎ প্রাণ-চক্ষুপটে ভেসে ওঠে হাজার রকম দৃশ্য, যা নারকীয় বীভৎস অভিঘাতসহ তোমার সামনে আছড়ে পড়ে। রণক্ষেত্রে পাশাপাশি সঙ্গী আর ফিরে আসেনি।

আকুল-প্রতীক্ষু তার জননী সন্তানের আশায় আশায় থাকবে।

জননী দুই রকম। একজন শুধু জননী, অন্যজন দেশ-জননী। দেশ-জননী তার অশরীরী সন্তানকে কাছে রেখে দেয়, জননী তা পারে না। দু'জনে সমান্তর, তবু মনে হয়, তারা যেন সতীন।

ক্ষুদ্র সংবাদের এত বিচিত্র অভিধা যে যেন কুয়াশার মধ্যে তোমার দিন-গুজরান।

দুদিন পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর তুমি জেনেছ দেশের যারা জীবনের আস্বাদ-বাহক সেই ভাগ্যহত বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিক অধ্যাপকদের পাকিস্তানের মনুষ্যআকার শয়তানেরা পূর্বকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

অনেকে তো আমার চেনা নয়– আত্মার আত্মীয়, সুহৃদ ছিলেন।

মুনীর চৌধুরী নাট্যকার, সাহিত্যিক এবং বাগ্মীতায় দেশের প্রথম সারির বক্তা– যার কণ্ঠ সামান্য দুর্বল একটু ঘৃষ্ট– নচেৎ বাচনভঙ্গীতে তিনি পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বক্তার সমতুল্য। পাকিস্তানী হানাদারদের দোসর ধর্মের লেবেল-সাঁটা মুনাফেকবৃন্দ আলবদর, রাজাকার আল শামস্ প্রভৃতি জীবজন্তু দেশের ভবিষ্যৎ পথপ্রদর্শকদের জীবন-প্রদীপ নির্মমতার চূড়ান্ত নজীর রেখে নিভিয়ে দিয়েছে চিরতরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসক এবং মানুষ উভয় দিক চরিত্রের উজ্জ্বলতম নিদর্শন ডক্টর ফজলে রাব্বী ছিলেন আমার নমস্য সুহৃদ– হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাও। গৌর চেহারায় ফর্সা মুখের মৃদু হাসি তোমার রোগ অনেকখানি মুছে নেবে চিকিৎসকের স্পর্শের পূর্বে।

"হৃদবিশেষজ্ঞ??? হা-হা-হা। রসো, পাকিস্তানের দুশমন তোমার কলিজাই আগে ছিঁড়ে নেব।"

বধ্যভূমির প্রান্তরে সেই পৈশাচিক হাসি ওদের মনুষ্যত্বের আর সামান্যতম অংশও বজায় রেখেনি।

ফজলে রাব্বীর সনাক্ত লাশ প্রমাণ দেবে পাকিস্তান তথা ইসলামের এই রক্ষাকর্তাগণ রক্তের কি নারকীয় হোলিখেলায় না মেতেছিল। ...

চোখের সামনে দেখতে পাই, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন, ডাকনাম বাচ্চু– বাচ্চু ভাই বয়সে ঢের ছোট, আচরণে ঢের বড়ো, সদ্য পরহিতব্রতী, মহতো-মহীয়ান আত্মার অধিকারীকে লাশের স্তূপ থেকে বের করা যায়নি।

দেশের মাটির সঙ্গে যার সংযোগ, অকৃতদার– যিনি নাগরিক হিসেবে গর্ব হতে পারেন যে-কোন সভ্য সমাজে, মাটির সঙ্গেই মিশে গিয়েছিলেন, যেখানে দেশবাসীর সমষ্টিগত রূপ পাওয়া যায়।

তাঁর আকৈশোরের স্বপ্ন এইভাবে পাকিস্তানীরা চুরমার করে ছিটিয়ে দিয়েছিল তাঁর রক্তের ফিনকির সঙ্গে।

আহ্, কতো মুখ!

ডক্টর মর্তুজা, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক। সব ছাপিয়ে দেশপ্রেমিক-কোন দিন ভাবেননি তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটবে এইভাবে ঘৃণ্য মানবেতর জীবদের পৈশাচিকতায়।

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা যিনি 'রাইফেল রোটি আওরাত" উপন্যাস লিখে নিজেকে বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙলার ইতিহাসে অমর করে রেখে গেছেন, তাঁর সরল মুখপানে তাকিয়ে রসিকতার আর সুযোগ এল না।

অদম্য অকুতোভয়তা বুকে না থাকলে শত শত প্রাণহর ঝুঁকি নিয়ে অমন উপন্যাস কি লেখা যায়?

শুধু তা-ই নয়, শিল্পীর 'নির্বিকল্প সমাধি' ভাবের কথাও ভেবে দেখুন– যা রচনার ভেতরে দীপ্তি দান করে। ওই অস্বাভাবিক সময়ে আনোয়ার পাশা ভবিষ্যতের দলিল তৈরি করে গেলেন। এমন নার্ভ মানুষের কি সহজে হয়? দেবদূতের ভর যেন অধ্যাপকের কাঁধে।

আরো স্মৃতি ....

অধ্যাপক মোফাজ্জেল হায়দার চৌধুরী যিনি জুন (৭১) মাসে ঝুঁকিসহ আমার বাড়ি গিয়েছিলেন পলাতক আসামীর খোঁজ নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

... সকল শহীদদের প্রতি আমার সালাম। আমি তাঁদের ক্ষমাভিক্ষাপ্রার্থী, আজ সকলের নামোল্লেখ করতে পারলুম না।

খরব এসে পৌঁছল অবশেষে!

ক্ষুদ্র সংবাদের সঙ্গে এত অনুষঙ্গ। কণ্টক হয়ে বসে প্রতিটি ছোটখাট স্মৃতি বুকের রন্ধ্রপথে।

অথচ যৌথ কোলাহল ত শুধু রোদনের নয়।

অশ্রুপাত করা কি আনন্দমুহূর্তে উচিত?

এই জবাব দিতে সেদিন অনেকেই অপারগতায় জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী আবার বৃন্দ-কণ্ঠের সঙ্গে কোরাস-কীর্তনে উল্লাস-মত্ত চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কথায় আত্ম-সুর আরোপ মারফৎ :

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল না'ক তারা।

....

আজ ডিসেম্বর মাসের শীতকাল :

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মৌসুম ছিল ভিন্ন।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কথা এবং সুরদাতা লিখেছিলেন ঃ

ফাগুন রাতে কুঞ্জ বিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে
কেতনপুরে বকুল বাগানে।
কেসর খাঁয়ের খেলা হ'ল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
....
সে পথ দিয়ে ফিরল না'ক তারা।

না।

না।

না।

বাংলাদেশে কবিগুরুর বাণী মিথ্যে প্রমাণিত, যদিও আমাদের তিনি আত্মার সহচর।

বাংলাদেশে মুসলমান হিন্দু চিরকাল গোলাম– ক্রীতদাস।

ক্রীতদাসের খসলৎ পরিবর্তন রাতারাতি হয় না।

বাংলার ইতিহাস সাক্ষ্যদাতা।

পাল শাসকগণ বহিরাগত।

সেন শাসকগণ বহিরাগত।

মোগল পাঠানেরা বহিরাগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজরা অবশ্যই আরো বহিরাগত। তারা এদেশ শাসন করত, এদেশে বসবাসের কথা কখনও মনে জায়গা দিত না।

ধর্মের ঐক্য-পথের ভুল-ভুলাইয়া শব্দের গোলক ধাঁধায় আগত পাঞ্জাবী, কেউই বাংলাদেশের ভূমি-পুত্র বা ভূমি-জাত নয়। সবই আগন্তুক বা আজনবী।

তাই বাংলাদেশের ক্রীতদাসেরা নিজেদের স্বভাব আর বদলাতে পারেনি।

ক্রীতদাসের ভূমিকা প্রভুরঞ্জন। অর্থাৎ মনিবের মন-যুগিয়ে চলা। তাই পদে পদে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তা-কে অত আলোড়িত করে।

মুক্ত মানবের সামনে একটি প্রশ্নই থাকে : ততঃ কিম?

তারপর কী?

বাঙালির অভ্যন্তরে ক্রীতদাসের খসলৎ আজও যায়নি। তাই কবিগুরুর কেসর খাঁ পাঠানেরা আবার ফিরে আসে।

'পাকিস্তান' শব্দ অনেক-কে অতীতের দিবাস্বপ্ন-সুখে ডুবিয়ে রাখে।

রবীন্দ্রনাথের "হোরি খেলা" কাব্যকাহিনীতে আছে বিজিত রাজপুত্র রমণীরা কিভাবে ছলনা মারফৎ পাঠান সৈন্যদের ধ্বংস করেছিল, তাই তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। স্বাধীন মুক্ত রমণীর যে প্রতিশোধ-স্পৃহা থাকে, ক্রীতদাসে তা প্রত্যাশা করা যায় না। প্রাক্তন প্রভুর প্রতি দাসের আনুগত্য বিলোপ হতে বহু বিলম্ব ঘটে।

সেদিক থেকে বাঙালিরা রাজপুত রমণীর নিকটেও অধম যেন নপুংসক।

তাই এ দেশে আবার পাঠানেরা ফিরে আসে। হয়ত শারীরিকভাবে নয়, তবে মানসিকভাবে। অবশ্যই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক মহা-অপরাধী আইকম্যানকে ইসরাইল রাষ্ট্র আরজেন্টিনা থেকে ষোল বছর পরে ধরে এনে ফাঁসি দিয়েছিল বিচারপর্ব যথারীতি সমাধা-মারফৎ। প্ল্যাস্টিক সার্জারির সাহায্যে চেহারা-বদল– ইউরোপে ৬০ লক্ষ ইহুদীর রক্তপায়ী– ওই নরনারী ঘাতক আইকম্যান-কে সনাক্ত করে পরে যে কৌশলে ইসরাইলী কমান্ডোরা তাকে ধরে এনেছিল তা ডিটেকটিভ গোয়েন্দা উপন্যাসের কাহিনীকে হার মানিয়ে দেয়।

এদেশের ক্রীতদাস সাংবাদিকরা অবিশ্যি ঘুমায় নাসিকাগর্জন মারফৎ। আজও সেই কাহিনী এ দেশে পরিবেশিত হলো না। অথচ, আইকম্যানের জীবনের এই পর্ব নিয়ে কতো বই বেরিয়েছে ইউরোপে।

আর বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীগণ "চোরের মায়ের বড় গলা" প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

আমার নতুন প্রজন্মের প্রিয় ভাই-বোনগণ,

তোমাদের উপরই দায়িত্ব ও রয়েছে এই দেশ-কে সত্যিকার মুক্ত স্বাধীন দেশরূপে নির্মাণের– যার নাগরিকগণও হবে স্বাধীন মুক্ত– যেখানে গোলামির কোন চিহ্ন থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা লড়েছিলাম শোষণ-বর্জিত সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে ধর্মের লেবেল দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিমাপ হবে না। মানুষের বিচার হবে মনুষ্যত্বের তৌলদণ্ডে, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠির সাহায্যে। তাই লড়েছিলাম হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী সব বাঙালি মিলে।

আজ সেই আদর্শ পদে পদে মুছে দেওয়ার অভিযান চলছে প্রতিদিন।

অনেক কথা বিশদ বলার দিন আজ নয়।

শুধু এইটুকু বলা যায়, পাঠানরা আবার সমাগত।

কেবল পুরাতন শাসনতন্ত্রের সঙ্গে বর্তমান শাসনতন্ত্রের তুলনা করো, স্পষ্ট দেখতে পাবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র গায়েব। মৌলবাদের তাই এত দাপট, জয়জয়কার।

প্রিয় ভাই-বোনগণ,

বুঝতে পারবে, পুরাতন মগরেবের তমসা আবার সব ফিরে এসেছে।

সরীসৃপদের বিচরণের জন্যে তোফা অন্ধকার।

তাজা-তরুণ ভাই-বোনেরা,

আজ তাই ফিরে যাও, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই রণাঙ্গনে যেখানে নব-প্রভাতের প্রত্যাশায় আমরা নতুন আজান দিয়েছিলুম— ভোরের আজান।

বাংলাদেশ মগরেবের ওয়াক্তে আজ সমাচ্ছন্ন।

চতুর্দিকে অন্ধকার আর হত্যাযজ্ঞের নারকীয় কোলাহল।

একবার নতুন করে উষার আজান শোনার জন্যে প্রস্তুত হও।

আবার নতুনভাবে প্রভাতের মঙ্গল-আরতি শোনার জন্যে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে প্রস্তুত হও।

প্রস্তুত হও।

AMARBOI.COM

শেখের সম্বরা

একটি সওয়াল

মোয়াসসেফো বেসেফাতিল্লাহ্

আল্লার গুণে গুণান্বিত হও

— আল-হাদিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভণ্ডের কানে সেঁধোয় না কখনও
আমার প্রিয় রসূলের বাণী,
তাই জীবজন্তুর মতো পরস্পরে
মারামারি, করে নিত্য হানাহানি॥

....
ইহুদী-নাসারার মগজ-জাত হাতিয়ার
মাইকের সামনে দ্যাখো ওগুলোর কারবার।
মাইকের জন্ম কণ্ঠ-শিরা বাঁচানোর তরে
আহম্মকগুলো সেখানে চেঁচায় ফোলা গলা ভরে।
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (Wave-length) কি মহিমা জানে না কিছুই
ওরা আতস-বাজি ফুটাবে-ছুটাবে ছোঁবে না ভুঁই।
মূর্খেরা মাঠে ময়দানে বড় জুড়ে চীৎকার।
নসীহত ছড়ায় প্রতিদিন মর্মে-চর্মে গণ্ডার।
ওদের বলছি, "দেশে উপদেশ ছড়িয়েছ ঢের,

"এবার জবাব দাও, আমার এক সওয়ালের।"

তৎপূর্বে স্মরি জগৎপালক আল্লার নাম
সকল পার্থিব স্পর্শের বাইরে যাঁর মোকাম

সওয়াল

জবাব দাও, জবাব দাও আল্লা কি শিয়া?
জবাব দাও, জবাব দাও আল্লা কি সুন্নী?
জবাব দাও, জবাব দাও আল্লা কি হানাফী?
জবাব দাও, জবাব দাও, মিয়া এক্ষুণি।

জবাব দাও, আল্লা কি মালেকী, শাফেয়ী,
হাম্বলী, আহলে-হাদিস, ওহাবী
লা-মজহাবী, খোজা, যেমন, নাখোদা, ইসমাঈলী
কাদিয়ানী, আহমদিয়া, বাবী, বাহায়ি, সুফী,
চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দী, মারফতী,
অগয়রহ অগয়রহ অগয়রহ ? ? ? ?
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ? ? ? ? ? ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
জবাব দাও, জবাব দাও, আল্লা কি খ্রিস্টান?
তবে তরিকার (মার্গ) বয়ান বা তাও তিনি কি ক্যাথলিক
প্রটেস্ট্যান্ট, লুথারিয়ান, ব্যাপটিস্ট, ইউনিটেরিয়ান,
জেস্যুট, গ্রিক অর্থডক্স, মর্মন, প্রেসবিট্যারিয়ান,
প্যাপিস্ট, ফ্রান্সিসক্যান etc etc etc
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ? ? ? ?
জবাব দাও, জবাব দাও, আল্লা কি হিন্দু?
কোন মার্গ-পথে? শিবশঙ্কর-ভক্ত, শক্তি-উপাসক,
লিঙ্গায়ত, বামাচারী, অঘোরপন্থী,
তান্ত্রিক, কালীসাধক, কণ্ঠীধারী, রামায়েৎ,
বৈষ্ণব, কর্তাভাজা, নদীয়া-নাগরী, হরিভক্ত
দাদুপন্থী, আউল-বাউল ইত্যাদি ইত্যাদি
জবাব দাও, জবাব দাও, আল্লা কি শিখ?
কিন্তু সেখানে সে কি আকালী, খালসা, নিরঙ্করী
আর কি – কি – কি – কি – কি – কি – কিনা আছে?
বৌদ্ধগণ সৌগত, হীনযান, মহাযান,
বৈনায়িক, অর্হৎ, সদ্ধর্ম, জেন
আর জৈনগণ শ্বেতাম্বর অথবা দিগম্বর;
এইভাবে টেনে যেতে পারেন; সবাই লম্বা (Chain) চেন্
তারপর জবাব দাও, আল্লা কোন ধর্মাবলম্বী?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
আমার এই সওয়ালের উত্তর দেওয়ার আগে
মগজটি পরিষ্কার করো বিচার-যুক্তির দাগে।
মনে রেখো, "শোষণই মানুষকে ভাগ-করার ঘাঁটি,
তোমরা সেখানে ধর্মের লেবাস-আঁটা আড়কাঠি।"

ভণ্ডদের নিকট পৌঁছে না আমার রসূলের বাণী?
এই সুন্দর বিশ্বে তাই এত কাটাকাটি, হানাহানি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তব্য মৃগয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
প্রকাশক : আগামী প্রকাশনী
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

AMARBOI.COM

উৎসর্গ

একেয়েন আহমেদ
সৈয়দ আলী কবীর
প্রীতি আচ্ছাদিত ভালবাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলো গত পাঁচ বছরের মধ্যে লিখিত। দুনিয়ায় ওলটপালট অনেক, সময়-পরিসর যদিও বেশী নয়। অনেক চিন্তা দূরে সরে গেছে। আমি অনেক দূরে সরে গেছি তবু এক কালের মতামতের পরিচয় দিতে, লেখায় কোন অদলবদল ঘটাইনি। পাঠক তা লক্ষ্য করবেন।

জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে জনাব ওসমান গনি নিজের জীবিকা অর্জনের পথ এমন সঙ্গতিময়রূপে যোজনা করেছেন যে তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না। আরো শ্রীবৃদ্ধিময় হোক আগামী প্রকাশনী কালে কালে।

প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী বর্তমানে ধন্যবাদের নাগালের বাইরে অবস্থানরত। ফলে লেখক নাচার।শওকত ওসমান

WWW.AMARBOI.COM

সূচিপত্র

অন্বেষা ঃ কল্যাণ
উজান গাঙের নাইয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গদী বুমেরাং যদি
স্বদেশ সংস্কৃতি সঙ্গমে
জন্মদিনে দেশবাসীর উদ্দেশে
একটি ভাষণ
যীশুখ্রীষ্ট শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে
রাষ্ট্রপতি সমীপে খোলা চিঠি
তারিখ পড়ে নিয়মিত সঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্বেষা : কল্যাণ

১

সব্বে সত্তা সুখিত ভবন্তো
সকল প্রাণী সুখী হোক
– বুদ্ধদেব

আধুনিককালে মানব-কল্যাণ প্রসংগ সোজাসুজি টেনে নিয়ে যায় উনিশ শতকের ইংরেজ উপযোগিতাবাদীদের নিকট। তার পূর্বে বিষয়টি নিয়ে কী তবে কারো শিরঃপীড়া ছিল না? এমন উচ্চারণ অবিশ্যি অযৌক্তিক। দর্শন-জগতে প্লেটো থেকে বহু জনেই আদর্শ সমাজের ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। আদর্শ-সমাজের যাত্রাবিন্দু মানব-কল্যাণ ছাড়া আর কী? সভ্যতার পত্তনের সাথে সাথে অনেকই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। শুধু মাথা ঘামানো নয়, অনেকের কাছে মানব-জন্মের কোন সার্থকতাই ছিল না কল্যাণ-ব্রত ছাড়া। তারা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। পৃথিবীতে শহীদের সংখ্যা কি কম? অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে যদি পর-পদানত দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস খোলা যায় তাহলে আত্মোৎসর্গিত ব্যক্তির কাহিনী কতই না সামনে এসে জড়ো হয়।

ইংরেজ উপযোগিতাবাদী (ইউটিলিটেরিয়ান) জেরেমী বেণথাম, জেমস মিল ও তদীয় পুত্র স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের স্মরণ এজন্যে স্বাভাবিক যে তারাই বিষয়টিকে গাণিতিকভাবে তত্ত্বগত পর্যায়ে বন্ধনের চেষ্টা পান। "গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার"–সর্বাধিক সুখ সর্বাধিক জনের জন্যে। এই শ্লোগান অভূতপূর্ব বৈকি। শব্দ চারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে মানব-কল্যাণ সাধনের রোমান্টিক ধারণা অনুপস্থিত। সকলের মংগল-সাধন সম্ভব নয়, তা প্রথম শব্দেই নিনাদিত। তাই বাস্তবধর্মী 'সর্বাধিকতম' শব্দটি খুবই সংগতিপূর্ণ। ব্যাপারটি (এ্যাবস্ট্রাকশান) নির্বস্তুকতা থেকেও রক্ষা পায়। সাধারণত অতীতের সমাজ-সংস্কারকগণ মানব-গোষ্ঠীকে কোন সীমাবদ্ধতার মধ্যে ফেলতে রাজী ছিলেন না। তারা ভাবতেন, কোন নীতি বা প্রদর্শিত পথে সব মানুষ স্বচ্ছন্দে পৌঁছতে পারে। শুধু নীতি-পালনের অপেক্ষা। উপযোগিতাবাদিগণ সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তারা অমন সর্বাধিকতম মংগলের কথা বলেন। অর্থাৎ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মংগলের পর্যায়েও পরিপূর্ণভাবে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমার মনে হয়, ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পথিকৃৎ-জোয়ারের পরিণাম উপযোগিতাবাদীরা আঁচ করেছিলেন। কুটীর-শিল্প থেকে পুঞ্জীভূত উৎপাদন বা ম্যাস-প্রডাকশান-এর দিকে মুখ ফিরিয়েছে তদানীন্তন সমাজ। সেখানে সংখ্যা একটি চূড়ান্ত উপাদান বৈকি। অবিশ্যি দার্শনিক হেগেল—১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রয়াত—তার পূর্বে সংখ্যার গুণগত পরিবর্তনের তত্ত্ব দিয়ে গেছেন। ইংরেজ উপযোগিতাবাদীদের দৃষ্টি সেদিকে ছিল স্বচ্ছন্দে নির্দ্বিধায় বলা যায়। ম্যালথুসের জনসংখ্যা তত্ত্বও গণিতস্পৃষ্ট। অবশ্যি মানস-জগতে গণিতের হামলার পথিকৃৎ স্বয়ং এ্যারিস্টটল। তাঁর "গোলডেন মিন" বা হিরন্ময় মধ্যক মনস্তাত্ত্বিক প্রাংগণে গাণিতিক প্রয়োগ ছাড়া আর কী?

উপযোগিতাবাদীদের প্রতি সকল শ্রদ্ধা রেখে বলা যায়, তাদের গোড়ায় কিছু গলদ থেকে গিয়েছিল। অবশ্যি তার জন্যে ওই মতবাদ একদম উড়ে যায় না। ইংরেজ আমূল পরিবর্তনকামী বা রেডিক্যাল সমাজসেবিগণের প্রেরণার উৎস ছিল ইউটিলিটেরিয়ানিজম। সেই পথ ধরে সমাজতন্ত্রের আগমন। উপযোগিতাবাদীদের কুল-পুরোহিত ছিলেন কিন্তু জন লক। তিনি কল্যাণকে মনে করতেন আনন্দ এবং অকল্যাণ বা অমংগল যন্ত্রণা, তাই বেদনারই নামান্তর। সুখ এবং আনন্দ ছিল তাঁর কাছে সমার্থবাচক। জেরেমী বেনথাম মনস্তাত্ত্বিক এই অন্ধকারে ঠিক পথ দেখতে পাননি। 'সর্বাধিকতম আনন্দ সর্বাধিক জনের জন্য'—এই ধুয়া সহজেই তাঁর কাছ থেকে আসে। মানব-কল্যাণ সাধনায় শত শত শহীদের ব্যাখ্যা তিনি কী করে দেবেন? যন্ত্রণা-সহন যারা আনন্দের পরিপূর্ণতম পর্যায় মনে করেন, তাদের নিকট কী জবাব দেবেন জেরেমী বেনথাম? আবার মর্ষণ-কামেচ্ছু (ম্যাসোকিস্ট) জনের মানস-হদিস তো নির্জলা উপযোগিতাবাদে পাওয়া সম্ভব নয়। কিংবা জর্জ বার্নার্ড শ'র "এ্যানড্রোক্লিস এ্যান্ড দি লায়ন" নাটকের কথা স্মরণীয়, সেই অংকের কথা যেখানে রোমান সৈন্য জিজ্ঞেস করছে রোমান যুবতীকে যে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়ার মত যন্ত্রণা তাদের এমন সহজে সহ্য হয় কী ভাবে? তরুণী জবাব দিয়েছিল, তা যথাযথ জানা থাকলে কী অত কষ্ট সইতে পারত সে! উত্তর বেশ অস্পষ্ট রয়ে গেছে। আসল ব্যাপার, অপরের জন্য যারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে, তার পেছনে ম্যাসোকিস্ট বাসনা থাকে বৈকি। কিন্তু তা মেনে নিলে উপযোগিতাবাদের ভিত নড়ে যায়। মানুষের কাছে তা-ই কাম্য যা তাকে আনন্দ দেয়। সুতরাং যা আনন্দ দেয়, তাই তার কাম্য হওয়া উচিত। উপযোগিতাবাদের যুক্তি সব জায়গায় খাটে না। বার্ট্রেন্ড রাসেল উপযোগিতাবাদের প্রশংসা করেও পরে বলতে বাধ্য হয়েছেন, ওদের যুক্তির ভিত নড়বড়ে।

উপযোগিতাবাদের মুখপাত্র ছিলেন জেমস মিল এবং তদীয় পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল। রাসেল স্টুয়ার্ট মিলের একটি যুক্তি খণ্ডনে বলেন : মিলের মতে, আনন্দই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র জিনিস যা সকলে কামনা করে। সুতরাং আনন্দই একমাত্র সকলের কাম্য হওয়া উচিত। সমর্থনে তিনি বলেন যে, সে জিনিসকেই আমরা দৃশ্যমান বলি যা দেখা যায়। তেমনই যা কানে শোনা যায়, তাকেই বলি শ্রোতব্য। সুতরাং একমাত্র কাম্য জিনিস হচ্ছে যা কামনা করা যায়। মিলের এই যুক্তি খণ্ডনে রাসেল বলেছেন যে কোন কোন জিনিসকেই আমরা দৃশ্যমান বলি যদি তা চোখে দেখা যায়। কিন্তু যখন বলি, কোন জিনিস কাম্য তার অর্থ জিনিসটা কামনা করা উচিত। এখানে ঔচিত্যের প্রশ্ন আছে বা উঠছে। তা নীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব। সুতরাং যা কামনা করি তা কাম্য হওয়া উচিত– এমন সিদ্ধান্তে যাওয়া কোনমতেই চলে না বা বাঞ্ছনীয় নয়।

রাসেল আরো লিখেছেন, যদি কোন লোক বস্তুত বা অবশ্যম্ভাবীরূপে নিজের আনন্দ অনুসরণ করে, তাহলে তাকে আর কিছু করা উচিত বলা অর্থহীন। দার্শনিক কান্ট মনে করতেন, "তোমার করা উচিত" এই বাক্যেই নিহিত আছে "তুমি তা করতে পারে" যদি না পারো, তোমাকে করতে বলা বৃথা। যদি প্রত্যেক মানুষ নিজের আনন্দই অনুসরণ করে তাহলে নীতিশাস্ত্র তো দূরদর্শিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তুমি অপরের স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করবে এই আশায় যে অপরেও তোমার স্বার্থরক্ষণে এগিয়ে আসবে। তখন ব্যাপারটা আর নৈতিকতার পর্যায়ে থাকে না।

প্রত্যেক মানুষ কী তার নিজের সুখের পেছনে ছুটে যায়? এই প্রশ্নে দুটি ব্যাপার পরিষ্কারভাবে জড়িত। প্রথম, প্রত্যেক ব্যক্তি কি সত্যিই তাই করে? দ্বিতীয়, সাধারণ সুখ কি মানুষের কাজকর্মের পরিণতি?

যখন বলা হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সুখ কামনা করে, এই বিবৃতির দুটো অর্থ হয়। তার একটি স্বতঃসিদ্ধ। অন্যটি মেকি। আমি যা কামনা করি, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হলে আনন্দ পাবো বৈকি। এই অর্থে আমি যাই কামনা করি তা আনন্দ। অথবা হেলাফেলাভাবে বলা যায়, আনন্দই আমি কামনা করি। সেই অর্থেই তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়। তা স্বতঃসিদ্ধ, বলা বাহুল্য।

কিন্তু যদি ধরা হয়, আমি কোন জিনিস কামনা করি, তা কামনা করি, কারণ তা আমাকে আনন্দ দেবে–কথাটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্য নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল এখানে চমৎকার উপমা হাজির করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি আহার্য কামনা করেন। যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, আহার্য তাঁকে আনন্দ দেবে। এখানে ক্ষুধা– এই কামনা প্রথমে আসে। আনন্দ হচ্ছে কামনার ফলাফল। অবশ্যি রাসেল বলেছেন যে অনেক সময় আসে যেখানে আনন্দের কামনা সোজাসুজি আসে। যদি কেউ মনে করে থাকে সন্ধ্যাটা সে থিয়েটারে কাটাবে, তাহলে সে এমন রংগশালা খুঁজে নেবে যা তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। কিন্তু সোজাসুজি আনন্দের জন্য এই কামনা ধর্তব্যের ব্যাপার নয়। আনন্দ ও যাতনার হিসাবের পূর্বে মানুষের কাজকর্মের হাল-হকিকত তার কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপযোগিতাবাদের বুনিয়াদে নানা ছিদ্র থাকতে পারে। কিন্তু উনিশ শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মতবাদের অভিঘাতে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। খাতনামা অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো, বেনথাম, ম্যারথুস, জেমস নীল প্রমুখের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর মূল্যতত্ত্ব বা থিয়োরি অফ ভ্যালুজ। পণ্যের বিনিময়-মূল্যের উৎস শ্রম– যা উৎপাদনের মজুর নিয়োগ করে।

এই প্রতিধ্বনি সহজে মিলিয়ে গেল না। মেহনত যখন মূল্যের উৎস, শ্রমজাত ফল শ্রমিকের পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পুঁজির মালিক, জমির মালিকের বঞ্চনার জন্যেই তাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা।

ইংলণ্ডে রবার্ট আওয়েন নিজে ছিলেন কারখানার মালিক। তিনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত এগিয়ে এলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মেশিনের ফলে মজুররা উৎখাত হচ্ছে এবং পুঁজিবাদী নীতি মজুরদের মেশিনের মোকাবিলায় কোন সাহায্যে আসছে না। তখন আওয়েন এই অন্যায়ের দূরীকরণে যে প্রতিষেধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা-ই হচ্ছে আধুনিক সমাজতন্ত্রের আদিরূপ।

শ্রমিক-স্বার্থ-সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞ রবার্ট আওয়েনের অনুসারী সংগীদের বলা হতো সোস্যালিস্ট। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম এই শব্দটি উচ্চারিত হয়। আওয়েনের কীর্তিকথা আরো বিস্তারিত বলা দরকার। তা যথাস্থানে উল্লেখিত হবে।

১৮২৭ সন। তারপর দেড় শ' বছর অতিবাহিত। সমাজতন্ত্র বর্তমানে কোন কেতাব-বন্দী মতবাদ নয়। রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, কিউবা, দক্ষিণ ইয়ামেন, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। দেড় শ' বছর পরবর্তী পৃথিবীর দিকে তাকালে যে ছবি চোখে পড়ে, তার একটা পরিণাহকনট্যুর দেখা যেতে পারে।

বিশ্বের এই পরিবর্তনের অনুপ্রাণন-শক্তি কোথায় নিহিত? কোথা থেকে এলো সমাজতন্ত্র? তার জবাবে অনেকেই আমার সংগে বলে উঠবেন, সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিবাদ স্বরূপ এই চ্যালেঞ্জের উদ্ভব।

মূল চালিকাশক্তি মানবকল্যাণ।

চিরাচরিত নীতি ঃ আলোর সর্বোত্তম পরিচয়দাতা অবশ্যি অন্ধকার।

২

হেগেল তার "ফিলসফিক্যাল হিস্ট্রী" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, " দি হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড ইজ নান আদার দ্যান দি প্রগেস অফ কনসাসনেস অফ ফ্রীডম, এ প্রগেস হুজ ডিভলাপমেন্ট এ্যাকর্ডিং টু দি নেসেসিটি অফ ইট্স নেচার। পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনার অগ্রগতি। এই অগ্রগতি ঘটে তার বৈশিষ্ট্যের অপরিহার্যতা অনুযায়ী।"

এখানে বলে রাখা ভাল, হেগেলের দর্শন তাঁর অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্যাল ধ্যান-ধারণার অনুসারী। স্বাধীনতা এবং অপরিহার্যতা (ফ্রিডম এবং নেসেসিটি) দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের তাই সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রকৃতি ও সমাজের বিধির সংগে সম্পর্ক-পরিচায়ক শব্দ দুটি ক্যাটিগরি বা মূল ধারণা। ভাববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, ক্যাটিগরি দুটি একে অপরের 'এক্সক্লুসিভ' বা একে অপরের বহিষ্কার বা যাদের সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। স্পিনোজা প্রথমে দু'য়ের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা পান। তিনি স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেন : 'রিকগনাইজড্ নেসেসিটি'– প্রত্যভিজ্ঞ অপরিহার্যতা। হেগেলের মতো দুটি ক্যাটিগরির সুবাদ দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেকটিক্যাল– কোন মতেই বহিষ্কারক এক্সক্লুসিভ নয়। ভাববাদী দার্শনিক তিনি, ব্যাখ্যাও সেইভাবে প্রদত্ত। বর্তমানে ক্যাটিগরি দুটির অর্থ হেগেল-প্রদর্শিত পথে নতুন গন্তব্যে উপনীত। দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা মনে করেন, বিষয়মুখী অপরিহার্যতার প্রত্যভিজ্ঞা (রিকগনিশান) হচ্ছে প্রাথমিক এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তি (উইল) চেতনার স্থান তারপর। অপরিহার্যতা প্রকৃতি এবং সমাজে বিষয়মুখী বিধি (অবজেকটিভ ল') রূপে বর্তমান। প্রত্যভিজ্ঞাহীন বিধির প্রকাশ যেন দৃষ্টিহীন অন্ধ। ইতিহাসের গোড়ার দিকে মানুষ প্রকৃতির রহস্য- ভেদে অপারগ ছিল। ফলে, প্রত্যাভিজ্ঞাহীন (আনরিকগনাইজড) অপরিহার্যতার ক্রীতদাস। পরিণাম অ-স্বাধীন বা 'আনফ্রি'। প্রত্যভিজ্ঞার প্রাংগণে মানুষ গভীরভাবে যতই বিষয়মুখী বিধি জড়ো করতে সমর্থ সে ততই হতে লাগল আরো স্বাধীন এবং আরো সচেতন তখন তার কর্মলীলা। মানুষের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর, বরং আধিপত্য-বিস্তারকারী সামাজিক শক্তি বা স্যোসাল ফোর্সের উপরও নির্ভরশীল। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলোও বিরুদ্ধাচারী হয় এবং মানুষের উপর দাপট চালায়। স্যোসালিস্ট বিপ্লব শ্রেণী-বিরোধের উৎখাত-মারফৎ সামাজিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করবে। উৎপাদনের উপায়াবলী (মিনস অফ প্রডাকশান) সমাজীকরণের ফলে পুঁজিবাদী সমাজের নৈরাজ্য দূর হয়। তদস্থলে পৌঁছায় অভীষ্ট সাধন-রত, অভীষ্ট লক্ষ্যজনিত পরিকল্পনা-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি।

এতদিন জীবন-যাপন ধারণের ধারা, দিন-গুজরানের পরিবেশ ছিল বিরোধী, স্বতঃস্ফূর্ত ফোর্স দ্বারা প্রভাবিত, তা এতকাল পরে এলো মানুষের সচেতন পরিকল্পনা-মুখর তাঁবে। এংগেলসের ভাষায় বলা যায়, মানুষ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল অপরিহার্যতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে। "ফ্রিডম ইজ রিকগনিশান অফ নেসেসিটি"– অপরিহার্যতার প্রত্যভিজ্ঞাই হচ্ছে স্বাধীনতা।

সমাজতন্ত্র গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, মানুষ সামাজিক উন্নতিকল্পে প্রকৃতির বিষয়মুখী বিধি অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় চালনা মারফৎ তাদের জড় (ম্যাটেরিয়াল) ও আধ্যাত্মিক সামগ্রী তৈরি করে নিতে পারে।

বসন্ত রোগ একযুগে প্রায় মহামারীরূপে দেখা দিত। পিছনে রেখে যেত দুর্বিসহ অভিশাপ, কতো রকমের শোকাবহ ঘটনা : হয়ত পরিবারের একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অথবা বিধবা জননীর সবেধন নীলমণি একমাত্র পুত্র ওই ব্যাধির শিকার। গ্রামকে গ্রাম উজাড়, পরিবার খতম। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টীকা একদিন বেরুলো। নানা রকম তার উন্নতি। আজ এই উপমহাদেশ বসন্ত রোগ-মুক্ত। যা আছে তা জলবসন্ত– আদৌ প্রাণঘাতী নয়। প্রকৃতির বিষয়মুখী বিধি জানার ফলেই মানুষ বর্তমানে নিঃশঙ্ক চেতনার অধিকারী। এই শতাব্দীতে মানুষ প্রথম তার জীবন-যাপনের ধারা ও পরিবেশন ক্রমশ সচেতন নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করেছে। তাই অপরিহার্যতার প্রত্যভিজ্ঞাই স্বাধীনতা। মানব কল্যাণকামী সমাজ সংস্কারক রাজনীতিবিদ দার্শনিকের নিকট একই ব্যাপার ভিন্নভাবে প্রতিভাত।

৩

মাটি ও পাথর কাটি আর কুঁদি দেবতা গড়িনু ঢের
মাপিলাম কল্যাণ
বেদীমূলে তার শোণিতের দাগ লেগে থাকে তাই
দেবতার অপমান।
– প্রেমেন্দ্র মিত্র

AMARBOI.COM

সম্প্রতি প্রয়াত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার টুকরো দিয়ে এই অধ্যায়ের সূত্রপাত।

আমার বেপথু যাত্রা অনেকের কাছে অসংগত ঠেকতে পারে। ধানভানার অক্তে শিব-সংগীত। তবু শ্রোতাদের ঈষৎ ধৈর্য আশা করব।

কল্যাণের পথ সর্ব যুগেই নানা সর্পিলতা-মণ্ডিত। সোজাসুজি যেন পৃথিবীতে কোন কিছুই ঘটে না। বেপথু ভ্রমণ তাই পথিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব তো স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। বলা যায়, চার 'শ' বছর পর হঠাৎ মানুষের কাছে এই মুক্তির সংবাদ উপনীত। দুঃখ-দারিদ্র্য কোন কালে ছিল না? এই পৃথিবীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী চালু ছিল দাসপ্রথা। মহাপুরুষ, সমাজসংস্কারকগণ এই অসহায় মানবদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের উপদেশদান ব্যতীত বেশি কিছু করতে পারেননি। কতো শত বছর না লেগে গেল ওই বর্বর প্রথা দূরীকরণে।

সুতরাং প্রার্থনা করলেই কল্যাণ দরজার কড়া নাড়বে না। শিশুর দাঁতের মত তা কোথাও আজ পর্যন্ত আপনা-আপনি গজায়নি।

যুগে যুগে কল্যাণের একই উৎস : পরিবেশের নিপীড়ন। এবং তা প্রাকৃতিক অথবা মানবিক দুই-ই হতে পারে। একদিন থেকে এই সংগ্রাম যেন মানুষের অস্তিত্বের শর্ত। নিরুপদ্রব হওয়ার উপায় নেই। চলমান পৃথিবীর মত মানব-সমাজও সদা অস্থির। তাই সর্বদা খাপ-খাওয়ানো বিন্যাস (এ্যাডজাস্টমেন্ট) লাগে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগতি রক্ষা করতে না পারলে সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হয়। প্রকৃতির দিক থেকে অথবা সমাজের অন্তর্নিহিত পরিবেশ থেকে এই ডুয়েল-দ্বৈরথের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ইতিহাসের যাত্রাপথের এই ছন্দ বর্তমানে আমার বিচার্য নয়। মোদ্দা কথা, পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানব-সভ্যতা টিকে থাকার অপরিহার্য শর্ত। এই পথ ধরেই সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটে। তবে সব কিছুর মূলেই থাকে মানব-কল্যাণ। পরিবেশ থেকে মুক্তির আহ্বানই মানুষকে নানা পথে টেনে নিয়ে যায়। গুহামানব থেকে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের পরিণাম-পর্ব খুব সহজ নয়, বরং অতিশয় বক্র জটিলতা। সে যাই হোক, মানুষই সব জায়গা কেন্দ্রবিন্দু।

সমাজতন্ত্রের কথা আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি। কারণ, মানব-কল্যাণের অগ্রগতি-পথে তা নিকটতম স্টেশন। হালফিল ব্যাপার। যদিও ১৮২৭ থেকে ১৯৮৭ সন– মাত্র এক শ' ষাট বছরের ঘটনা। তবু ইতিহাসে এই কাল-পরিমাপ খুবই তুচ্ছ কিছু। আমার উদ্দেশ্যে, ইতিহাসের নিকট-পর্বের কিছু উত্থান মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক। নানা যুগ বিচরণের ইলেম আমার অন্তত নেই। অকপট স্বীকার করছি।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ঘাত-অভিঘাত সব দেশেই বহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে শেষ পর্যায়ে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরীর আবির্ভাব বহুজন মনে প্রাণে প্রার্থনা করছিল। আবার ঠিক একই সময়ে আর এক দেশের নেপথ্য শাসানি থাকার ফলে মার্কিন রণতরী এতদূর ঢুকতে সাহস পায়নি। দেশটি সমাজতান্ত্রিক দেশ : রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক নাম ইউ.এস.এস.আর। সুতরাং মানব-কল্যাণের নমুনা দেখতে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন কী? হালফিল ঘটনা সহজে চোখ ও কানের কাছে জানান দিতে পারে। সেখানেই আঙুল বাড়ানো যুক্তিযুক্ত। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বা গতিচিত্র ধরতে কারো কষ্ট হবে না। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নানা অজস্র নাটকীয় ঘটনা আছে। জাতিপুঞ্জে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুবার "ভেটো" প্রয়োগ কম নাটকীয় নয়। সেখানে একই সমাজতান্ত্রিক দেশে মদদ্‌গার। নচেৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোথায় তলিয়ে যেতো। আবার ঠিক একই সময়ে সমাজতন্ত্রের পতাকাধারী আর এক দেশ বাঙালিদের সংগে হাত মিলিয়ে চুরুট ফুঁকছিল এবং স্বাধীনতা ঠেকাতে অসমর্থ হয়ে বাংলাদেশের জাতিপুঞ্জে প্রবেশের বিরোধিতা করছিল নানা চাল চেলে। সমগ্র উপনিবেশ দেশ এককালে চীনের জাতিপুঞ্জে প্রবেশের দাবী জানিয়ে আসছিল আর তখন তথাকথিত পশ্চিমী গণতন্ত্রের মহিমা-কীর্তনিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্লজ্জ "ভেটো" দিচ্ছিল নিতান্ত জবরদস্তি গা'র জোরে, বিবেক বিসর্জন মারফত। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের জাতিপুঞ্জে সভ্য-পদ আটকাতে পারেনি। বিবেক এবং লজ্জা-খোয়ার এক মহান সম্পদশালী জাতির নৈতিক অধঃপতন দেখলে মনে হয়, মানব-কল্যাণ অন্য জাতির জন্যে ওদের খতিয়ানে লেখা নেই। ফরাসী মানব-প্রেমিক সা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিমো উনিশ শতকে রাশিয়া প্রাশিয়া অস্ট্রিয়া এই তিন শক্তির জোট-প্রধান (বলা হতো "হোলি এ্যালায়েন্স)"-দের এক চিঠিতে আবেদন জানিয়েছিলেন–

"... Princes, hear the voice of God, which speaks to you through my mouth. Become good christian again. Throw off the belief that the hired armies, the nobility, the heretical clergy, the corrupt judges. Constitute your principal supporters, unite in the name of christianity and learn to accomplish the duties which christianity imposes on the powerful, remember the christianity commands them to devote their energies to bettering as rapidly as possible the lot of the poor."

"মহামান্য শাসকবর্গ, আপনারা ঈশ্বরের কথা শুনুন যা আমার মুখ-মারফত উচ্চারিত। আপনারা আবার সৎ খ্রীস্টান হন। ভাড়াটে সিপাই, আমীর ওমরাহ, ঈশ্বরদ্রোহী পাদ্রী, দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক শুধু আপনাদের সমর্থক– এই বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে দিন। যীশুখ্রীস্টের দোহাই, আপনারা সম্মিলিত হন এবং শক্তিমানের উপর যে দায়িত্ব খ্রিস্টধর্ম অর্পণ করেছে তা আপনারা পালন করুন। মনে রাখবেন খ্রিস্টধর্মের আদেশ, শক্তিমানেরা যেন যত দ্রুত সম্ভব দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নে সকল উদ্যম নিয়োগ করে।"

আমার অনেক সময় খেয়াল চাপে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তো খ্রিস্টান। তাঁকে অমন পত্র লিখলে কেমন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হয় বাংলা প্রবাদ : চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

সাঁ সিমোকে মনে করা হয় সমাজতন্ত্রী সুবে-সাদেকের নকীব। বলাবাহুল্য, তাঁর আহ্বান সেদিন ইউরোপের পথে-প্রান্তরে অরণ্য-রোদন রূপেই ধ্বনিত হয়েছিল।

কল্যাণ-কামনা সকল সৎ মানুষের অগ্রগণ্য ইচ্ছা। কিন্তু কল্যাণের দিশা অত সহজে মানুষের নিকট ধরা দেয় না। প্রেমের মতই কল্যাণের গতি কুটীলা ভবেৎ।

৪

রবার্ট আওয়েনের কথা পূর্বে উল্লিখিত। এই মহান মানব-প্রেমিকের জীবন–ধারার কিছু পরিচয় আমাদের সাহায্য করবে, কল্যাণের মরীচিকা কিভাবে ধরা দিয়েও ধরা দেয় না। দিকচক্রবালের মত তা ক্রমশ দূরেই সরে যায়।

রবার্ট আওয়েন ছিলেন ওয়েল্‌স-বাসী এক জিন-গদী প্রস্তুতকারকের সন্তান। দশ বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ভাগ্যান্বেষী যুবক, যখন কুড়ি মাত্র বয়স তখন এক তুলাকলের প্রধান হয়ে পড়েন। পাঁচশ মজুর তাঁর অধীনে কাজ করে। এইখানে তিনি কল-কারখানার মজুরদের দুরবস্থার সংগে পরিচিত হন। অভুক্ত অর্ধভুক্ত-যথা পরিচ্ছদের অভাবে শীতক্লিষ্ট, শীর্ণদেহ, রোগে চিকিৎসার অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য অথবা নিরানন্দ দিন-গুজরানের বস্তিবাসী। শত শত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যাহতদের সংস্পর্শে তিনি আসেন। কারখানার মালিকেরা এদের দুর্দশা-লাঘবে কিছুই করত না। আওয়েন তাঁর রচনায় এক জায়গা লিখেছেন যে নিষ্প্রাণ মেশিনের কতো যত্ন হেফাজত। কিন্তু প্রাণধারী মেশিন– সমস্ত সম্পদের যারা উৎস– তাদের দিকে বিত্তবান মালিকদের কোন দায়দায়িত্ব নেই। এমনকি আমেরিকায় গেরস্থর গোলামেরা কারখানার মজুরদের চেয়ে ভাল খেয়ে-পরে থাকে। ইংলন্ডে গাঁয়ের ক্ষেতমজুর দাসদাসী শহরের মজুরদের চেয়ে ঢের বেশি আরাম পায়। বর্তমানে ঢাকা শহরে রেললাইনের ধারে নারিন্দা, দয়াগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় বস্তিবাসীদের মতই ছিল ইংলন্ডের শ্রমিকদের অবস্থা। স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই ছিল না। মানবেতর জীবনযাপন করত তারা। ঢাকার ধাঙড় পল্লীর দশা যদি কেউ দেখে থাকেন কতকটা আন্দাজ করতে পারবেন। শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে ১৮৩৪-৫০-এর কালে এমনই ছিল বিলেতী মজুরদের হালৎ।

নিজে কারখানার মালিক আওয়েন এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েন। শুধু নিষ্ক্রিয় দরদ-প্রদর্শনের বান্দা তিনি ছিলেন না। ইংরেজরা বলে, বদান্যতা গৃহেই শুরু হয়। আওয়েন ইংরেজ ছিলেন না, নিজের কারখানায় তিনি তাঁর সেবাব্রতের পরীক্ষা শুরু করলেন। আওয়েন মনে করতেন, মানুষ জন্মায় সহজাত সদগুণ নিয়ে। কেবল পরিবেশ তাদের বিকৃত করে তোলে। মানুষ হয় ফলে অমানুষ। যদি গোড়া থেকে বা কৈশোরকাল থেকে মানুষকে গড়ে তোলা যায়, তাহলে তারা আর অসৎ কদাচারী হতে পারে না। বলাবাহুল্য, তিনি নিজের কারখানায় এক্সপেরিমেন্ট আরম্ভ করে দিলেন। শুধু তাদের উপযুক্ত বেতন দিয়ে থেমে গেলেন না। তাদের মানস-গঠনেও ব্রতী হলেন। তিনি গঠন করলেন সমবায় পল্লী। পঁচিশ বছরের মধ্যে তিনি তাঁর মজুরদের জীবনযাপনের মান তো উন্নত করলেনই, শিক্ষায়-দীক্ষায়ও তারা পিছিয়ে রইল না। তিনি আরো এক কাজ করলেন। বেতন না কমিয়ে তিনি মজুরদের কাজের সময় কমিয়ে দিলেন। অবসর সময় কেমন সুন্দরভাবে ফলবতী করে তোলা যায় তারও আদর্শ নমুনা তৈরি করলেন।

এইভাবেই তো মানবগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে যেতে পারে, যদি সকলে মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এগোয়। আওয়েন ভাবলেন। কিন্তু বিত্তবান মিল-মালিকেরা তো নির্বিকার, নিঃসাড় তাদের দৃষ্টিভংগী। আওয়েন অস্থির হয়ে পড়তেন। মালিকদের চরিত্রও দূষিত। আওয়েনকে পার্টনার নিয়ে কারবার করতে হতো। তিনি তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন যে ওরা সস্তা দামে কিনে চড়া দামে বেচা ছাড়া আর কিছু জানে না। এই পেশাই ওদের নিচে নামিয়ে আনে। ওদের সকল সুকুমার চিত্তবৃত্তি ধ্বংস করে দেয়।

আওয়েন আরো লিখেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভেতর তিনি বহু বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটিয়ে দিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, এমন স্বার্থপরতা-জড়িত পেশায় কোন উন্নতমানের চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। আওয়েন লিখেছেন, সভ্য, সততা, নৈতিকতা- এসব কথার কথা হয়ে থাকবে। এই সমাজ-ব্যবস্থার সীমানার মধ্যে কোন সত্যিকার সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। কারণ, এই সভ্যতা মানুষকে পারস্পরিক বিরোধিতা এবং কখনও কখনও ধ্বংসের জন্য লালনপালন করে। সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এ একটা নোংরা অজ্ঞ ও নীচ স্তরের পন্থা। চরিত্র-গঠনশীল এবং সম্পদ সৃষ্টিকারী এমন কোন উন্নততর পন্থা যদি এই কাঠামো ছাপিয়ে না যায়, তাহলে কোন কোন স্থায়ী সাধারণ বাস্তব শ্রীবৃদ্ধির আশা সুদূরপরাহত।

১৮১৭ সনে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনের সেক্রেটারী এক পুরাতন ডিপ্লোম্যাটের সংগে সেখানে আওয়েনের সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাকে বুঝানোর চেষ্টা পেলেন যে, বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে বর্তমান যুগে সুখস্বাচ্ছন্দ্য মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে এর সীমাবদ্ধ রাখার কোন বাধ্যকতা নেই। কেবল কিছু লোক লেখাপড়া শিখবে আর খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে তেমন সীমাবদ্ধতার দিন ফুরিয়ে গেছে। সভ্যতার আশীর্বাদ এখন সকল মানুষের নিকট পৌঁছতে পারে। উক্ত ডিপ্লোম্যাট জবাবে বলেছিলেন, তিনি তো শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি, কাজেই তার ভাল করে জানা আছে যে হুজুররা তেমন পথ মাড়াতে অনিচ্ছুক। কারণ, জনসাধারণ যদি সংগতিপন্ন এবং স্বাধীন হয় তাহরে শাসকেরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে কি ভাবে?

হতাশ আওয়েন ভাবলেন, শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণিকে বুঝানো তাঁর দায়িত্ব যে, অজ্ঞতার ফলেই পরস্পরে ওই ভুল-সমঝোতা। নচেৎ উভয়ের স্বার্থ এক।

এমন প্রজ্ঞার ফল দাঁড়াল 'উল্টা বুঝলি রাম'। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। এক বক্তৃতায় আওয়েন শুধু ধর্মকে আক্রমণ করলেন না, তার সংগে যোগ করলেন সম্পত্তি এবং পরিবার। ফলে চার্চ থেকেও আওয়েনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হলো। বন্ধুরা তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগল পাছে চার্চের লোক জেনে ফেলে ঈশ্বরদ্রোহীর সংগে তাদের সংসর্গ।

ইউরোপ পচে গেছে।
ইউরোপ রুগ্ন।

আওয়েন ভাবলেন, দুনিয়ার কোন তাজা এলাকায় যাওয়া দরকার। সেখানে তাঁর আদর্শের রূপায়ণ নিশ্চয় সম্ভব। সেখানে নতুন সমবায় পল্লী গড়বেন। তাঁর সেই উপনিবেশে নানা রঙের দল মেলবে মানুষে মানুষে মৈত্রীর বন্ধনে। উন্নতমান চরিত্রের আঁতুর ঘর হবে নতুন আবাসভূমি। আশ্রমোপম হবে তাঁর গড়া জনপদ। আওয়েন স্থির করলেন তাঁর সেই কল্পরাজ্য আমেরিকা। তা ইউরোপের মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাতন হয়নি। সুতরাং সেখানেই তাঁর আদর্শ রূপায়ণের প্রকৃষ্ট সুযোগ থাকবে। নতুন সমাজ গড়ে তিনি দেখিয়ে দেবেন, বর্তমান বিষয়-বিষ-দুষ্ট জীবন থেকে গোটা মানব গোষ্ঠী রেহাই পেতে পারে। আমেরিকার ইন্ডিয়ানা স্টেটে গিয়ে তিনি উঠলেন। সেখানে তাঁর সমবায় পল্লীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের আহবান জানালেন ঘোষণাপত্র মারফত। অবশ্যি এই উপনিবেশ গড়ার জন্যে তিনি কিনলেন তিরিশ হাজার 'একর' জমি। নতুন জনপদে লোকের অভাব হয়নি। সব ঠিকঠাক করে তিনি আবার ইউরোপে ফিরে এলেন। ইন্ডিয়ানা স্টেটের নিউ হারমনী নামক এই এলাকা মার্কিন নাগরিক অধ্যুষিত। দেখা গেল তারা আরো এক কাঠি বেশি নোংরামিতে ইউরোপের মানুষের চেয়ে। বহু ফাঁকিবাজ অসৎ লোক আওয়েনের পল্লীতে ঢুকে পড়েছিল। সদস্য গ্রহণের সময় তিনি তো বাছ-বিচার করেননি। যে এসেছে সে-ই জায়গা পেয়েছে। তার ফল আর ভাল কী করে হবে? আওয়েন সেই সময় ন্যায়অন্যায়-জ্ঞান-বর্জিত টেলর নামক এক লোককে শরীকরূপে নিয়েছিলেন। শেষে নিরুপায়, তিনি ভাবলেন, ওর খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়া দরকার। তিনি তাকে পল্লী গড়ার জন্যে আলাদা জমি কিনে দিলেন। দলীল হওয়ার আগের রাত্রে টেলর আওয়েন-পল্লী থেকে বহু যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র পাচার করে নিয়ে গেল এবং নিজের সম্পত্তিভুক্ত করে বসল। শুধু কি তাই? প্রচারিত আদর্শের মুখে নূড়ো জ্বেলে দিয়ে সে পল্লী গড়ার জায়গায় মদ-চোলাই কারখানা এবং ট্যানারির পাশে প্রতিযোগিতায় আর এক ট্যানারি তুলে ফেলল। তিন বছর টিকেছিল আওয়েনের আদর্শ জনপদ। শেষে তিক্তবিরক্ত আওয়েন তাঁর স্বপ্নরাজ্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন এবং এবার কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট নয় বরং এক ব্যক্তির নিকট।

স্নেহ-মায়া-মমতার বাঁধনই হবে একমাত্র বাঁধন মানুষের জনপদে এবং সেখানে মানুষের সকল কর্ম-চাঞ্চল্যের লক্ষ্য হবে উন্নত চরিত্রের পর্যায়ে পৌঁছানো ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। আওয়েন স্বপ্ন দেখতেন।

তিনি ওয়েলসের অধিবাসী। কিন্তু ইংলন্ড, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি জায়গায় নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-ব্রতে অজস্র মুদ্রা ব্যয় করলেন আদর্শ-পল্লী গঠনে। তাঁর পল্লীর ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা সবই ছিল সকলের জন্য কল্যাণ-প্রণোদিত। অনেক সময় তিনি ভবিষ্যতের হিসাব বা ফলাফলের হিসাব করতেন না। একটা কারখানা-ঘর তৈরি করলেন। তার হেফাজত কিভাবে হবে বা তা থেকে কি আয় হবে– এসবও তলিয়ে দেখতে–এখন বলা যায় অসমর্থ ছিলেন। স্বপ্নচারী নিজ জগতে বিচরণ করেন, তাদের কোনকালে হিসাবের সংগে তেমন সম্পর্ক থাকে না। ইংরেজ কবি শেলির সংগে হৃদ্যতা ছিল আওয়েনের এবং তৎকালীন মানবতাবাদী অন্যান্য ইংরেজের সংগে। তিনি ভাবতেন, শেলী প্রমুখ মহৎপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তাঁর স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। সমগ্র মানবজাতির জন্যে এখন সম্পদ তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব, অথচ দারিদ্র্যের দরিয়ার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু দ্বীপবাসী ছাড়া অগণন মানুষ বাস করে। এই অসংগতি তো অসংগত বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন নরবারীর জন্যে। এই ঘোষণার রবার্ট আওয়েনের কোন ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁর কারখানা-বিষয়-আশয় কিছুই ছিল না। খুব দারিদ্র্যের মধ্যেই এই পূজ্য মহৎপ্রাণ স্বপ্নচারীর জীবনাবসান ঘটে।

৫

রবার্ট আওয়েনের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বয়ানের উদ্দেশ্য : শুভ কামনা এবং আন্তরিকতা যেখানে, সেখানে কেন একটি আদর্শের রূপায়ন মরীচিকা হয়ে রইল?

তবে কি কল্যাণ কামনাই যথেষ্ট নয়?

তার জবাব দিতে হয়।

পরিবেশ থেকে মুক্তি সকল কল্যাণ কামনার আবহে থাকে। এখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কিন্তু যখন কল্যাণ রূপায়িত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখন আর সহজ থাকে না সওয়ালটির জবাব। গন্তব্য এক। কিন্তু পথ আলাদা হয়ে যায়। তখনই জটিলতা ঘিরে ধরে। এবং নানা দিক থেকে।

আওয়েনের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। শ্রমিক সমাজের বাইরেও তাঁর সমর্থক ছিল। পাদ্রী পুরোহিতের মত তিনি নিজে মানুষের মানুষে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান বেশ উচ্চস্বরে। তবু তাঁর আবেদন মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছল না কেন?

এই প্রশ্ন তুলছি। কারণ, অনেকে মনে করেন, মানবিক আবেদনই যথেষ্ট কোন আদর্শের রূপায়ণে। আবেদনের লক্ষ্য মানুষ। অবশ্যি। কিন্তু কোন্ মানুষ? ব্যাষ্টি না সমষ্টি? ইন্ডিভিজুয়াল না কালেকটিভ? অতীতে ব্যক্তি-মানুষ বা ইন্ডিভিজুয়াল ছিল সর্বেসর্বা সমাজ-সংস্কারদের নিকট। অর্থাৎ আবেদন ব্যক্তিমানুষের নিকট গিয়ে পৌঁছলেই হলো। আজও বহু সমাজ-হিতৈষীর দৃষ্টি সেই স্থানে আটকে রয়েছে। তার নড়চড় ঘটেনি শত শত বৎসরে। সমাজ-পরিবর্তনের সড়ক তাদের কাছে খুব সরল, উপদেশের বন্যা বইয়ে দাও মানুষের কাছে, তাহলে আর কোন দিকে চাইতে হবে না। এক কালে মানুষ এই আদর্শের মহিমা লুফে নিয়েছে,আজও তা নিতে বাধ্য। এই সব উপদেশ-বর্ষণকারীদের ধারণা তেমন বৃত্তেই সর্বদা আবর্তিত হয়।

যখন দেখা যায় তাদের দাওয়াই কোন কাজে লাগছে না, বরং প্রতিষেধ ব্যধির চেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠছে, তখনও তাদের চৈতন্য অনড় থাকে। তখন তারা বলতে থাকে মানুষ শয়তান হয়ে গেছে অর্থাৎ বদ হয়ে গেছে– তাই ওই আদর্শ আর কোন ফলদানে অপারগ। এমন চিন্তাবিদগণ অন্য কোনভাবে সমস্যা তলিয়ে দেখতে চায় না। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আদর্শ বর্তমানে তার আকর্ষণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি হারিয়ে ফেলেছে কেন? তখন তাদের জবাব বাঁধা গতে পরিণত : আদর্শ কি করবে, মানুষ যদি খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা পরিবেশকে অস্বীকার করে। ভাববাদী বা আইডিয়ালিস্টিক দর্শনের প্রয়োগে যে ট্র্যাজেডি ঘটে অমন সমাজ-নায়ক বা চিন্তানায়কের তা বুঝতে অক্ষম। মহাভারতের যুগে ভীষ্মের নিকট যা স্পষ্ট ছিল তা গত দেড় শ' বছরে অর্থাৎ আধুনিক কালেও তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে কোন দাগ কাটতে পারে না।

মহাভারতের শান্তিপর্বের ৬০-৭০ অধ্যায় ক'টি সমাজতন্ত্রের দিক থেকে খুব মূল্যবান। ভীষ্ম বলছেন, "নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা কিছু লাভ করিতে পারে না। আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে মুর্খও লাভবান হইয়া থাকে।"

সুদূর-অতীতেও পরিবেশ- চেতনা কিছু কিছু লোকের ছিল বৈকি। এমনকি সময়ের কথা শুদ্ধ ওইখানে উক্ত। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী তো কালের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং ভীষ্মের দৃষ্টি তেমনই প্রণালী-সচেতন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগেও বহু সমাজ-নায়ক এই সোজা ব্যাপার হৃদয়ংগমে অক্ষম। এই অক্ষমতার উৎস ব্যক্তিমানুষের উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি। মানুষ যে সামাজিক জীব তা তারা বিস্মৃত হন। বর্তমানে সমাজতত্ত্ববিদগণ নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকলেও এই এক ক্ষেত্রে তারা সমস্বর : কল্যাণের প্রশ্নে কেউ আর কেবল ব্যক্তিকেই সর্বেসর্বা মনে করেন না। সামাজিক মানুষ হিসেবে ব্যক্তি দংগলের অধিবাসী ; অর্থাৎ গ্রুপের অধিবাসী। গোষ্ঠীগত পরিবেশের মধ্যেই জন-কল্যাণের রূপায়ন সম্ভব। অন্যথায় আর যে কোন পন্থা অবলম্বন করা হোক না কেন, তা মানুষকে প্রতারণা করার ফন্দি বই আর কিছু নয়। সচেতনভাবে না হলেও অচেতনভাবে তো বটেই। অনেক কাল পূর্বে জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ কার্ল মান্‌হাইমের এক প্রবন্ধ পড়েছিলাম। গোষ্ঠীর প্রভাব ব্যক্তির উপর কি রকম পড়ে তার কতকগুলো উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন।

মার্কিন এক সমাজতত্ত্ববিদ দূর থেকে সমাজের অপরাধ জগতের হাল-বিশ্লেষণে রাজী ছিলেন না। তিনি চিকাগো শহরে বদমাশ-গুণ্ডাদের দলে মিশে যান। এক হাজরের বেশি ওই জাতীয় সমাজ-বিরোধী দল তিনি সমীক্ষা করেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রত্যেকটি অপরাধ-প্রবণ গুণ্ডাদলের নিজস্ব জগৎ আছে তাদের মানসিক আবহাওয়া সহ। বিভিন্ন দলের কিন্তু একই রকম বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তাদের আচরণ এবং ভূমিকা একই রকম। ছোট দল, কিন্তু সদস্যদের উপর প্রভাব প্রচণ্ড। তা এমনই যে, গ্রুপ বা দলের বাইরে তাদের যে কর্তব্য আছে, তার সংগে আর তারা খাপ খাওয়াতে পারে না। ওই সমাজতত্ত্ববিদ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ওদের যদি স্বাভাবিক সুস্থ নাগরিকরূপে ফিরে পেতে হয় তাদের ব্যক্তি হিসেবে দেখলে চলবে না। তাদের দেখতে হবে দলের অংশ হিসাবে। এই সব বেপথু নাগরিকদের নিকট তাছাড়া বক্তৃতা নসিহৎ উপদেশ প্রদান পণ্ডশ্রম। যদি ওই দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে নতুন আদর্শ বা উচ্চাভিলাষ জাতীয় কিছু সঞ্চারিত করতে পারো, গোটা দলের কাছে, তাহলেই ওদের সমাজের হিতব্রতী সদস্যরূপে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যারা চটজলদি অসামাজিক অপকর্ম ভুলচুককে অসৎ চরিত্রের ফলাফল মনে করেন, তাদের কাছে এই সবক বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্ল মানহাইমের আরো একটি উদাহরণ মনে রাখার মতো।

তাঁর এক বন্ধু শরণার্থী বা রিফিউজী কলোনীর অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ওখানে দেখা গেল, কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা আছেন, যারা এককালে উঁচু মহলের বাসিন্দা–নানা সুখের মুখ দেখেছেন। সেই জন্যে রিফিউজী উপনিবেশে তারা দৈহিক কোন শ্রমের কাজ করতে চাইতেন না, যা তাদের কাছে মনে হতো আত্মসম্মান-হানিকর। অমন কাজ করা মানে সমাজে খাটো হয়ে যাওয়া বা লোক-চক্ষুর নিকট হেয় হওয়া।

তাদের নিয়ে কলোনী পরিচালক এক সমবায়ী কর্মীদল– কোওপারেটিভ স্কোয়াড–গড়ে তুললেন। তাদের কাজের মধ্যে পড়ল হাসপাতাল, ইস্কুল প্রভৃতি পরিষ্কার করা। এসব কাজ তো ঝাড়ুদার-মেথরের কাজ। কিন্তু দেখা গেল ওই মহিলা কর্মীদল সমাজে হেয় কাজের উপর নিজেদের আভিজাত্যের কথা ভুলে রীতিমত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যখন সমবায়ী কর্মীদল হিসেবে তারা পরিচিত, তখন আত্মসম্মানের কথা তারা ভুলেই গেছেন। গ্রুপের বা জোটের ভেতর দিয়ে এ কাজ মর্মতেজ বা মর্মশক্তি মহৎচেতনার আস্বাদ পায়। অমন দলের সামাজিক ভূমিকাই বদলে যায়। এইসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে না গেলে, যে কোন লোকের মনে হতো, অভিজাত মহিলাগুলোর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভংগী একদম অনড়। আর শারীরিক শ্রমসাপেক্ষ কোন কাজ দিলেই ওরা ঘাড় বাঁকাবে, গজগজ শুরু করবে।

মানুষের আচরণ যে "ইলাস্টিক" বা সম্প্রসারণশীল বিভিন্ন গোষ্ঠী পরিবেশের তা অনেকে জানেন না। আমরা মানুষকে হামেহাল চিরাচরিত পারিপার্শ্বিকতার ভেতর দিয়ে দেখি কিনা, তাই ভাবি কাঠামো বুঝি নড়চড়হীন। কেউ লাজুক, কেউ বদ, কেউ অসৎ ইত্যাদি। তাদের পরিবর্তন অসম্ভব। পরিবর্তন সম্ভব তা মনেই থাকে না। সোজাসুজি হুকুম না চালিয়ে নসিহৎ না করে শুধু গোষ্ঠীকাঠামোর (গ্রুপ স্ট্রাকচার) অদলবদল মারফত মানুষকে বদলানো যায়– এই সোজা কথা অনেকে মনে জায়গা দিতে অক্ষম। আধুনিক যুগের সামনে এই বিশেষ অভিজ্ঞতা এখন ঐশী বাণীর মত এসে পৌঁছেছে। গোষ্ঠী-জীবনের ভেতর দিয়েই সুপ্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সমাজের কাজে লাগানো যায় তা বর্তমানে কোন নতুন কথা নয়। সমাজতাত্ত্বিক মহলে এই চাবিকাঠির দাম ঢের বেশি। সংশোধনের দুঃসাধ্য অপরাধী নাগরিক যে সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন জীবে পরিণত হতে পারে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এখন ভুরি ভুরি মেলে।

পুঁজিবাদী দেশে হয়ত খুব স্বল্প পরিসরে এই নীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতান্ত্রিক দেশে গ্রুপ-স্ট্রাকচার অদল বদল মারফত মানব-চরিত্র বদলানো তো মূলমন্ত্র। সোভিয়েট রাশিয়া বর্তমানে দুই পরাশক্তির অন্যতম। অথচ ১৯১৭ সনে ছিল অত্যন্ত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। দুঃসহ দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু এবং প্রশাসনিকভাবে ন্যুজ তার অধিবাসী। ১৯৬৫ সনে আমার ইজবেকিস্তান সফরের সুযোগ ঘটেছিল। এদেশে 'উজবুক' শব্দটির উৎস ও অর্থ সবাই জানেন। আমি সমরকন্দ ও বুখারার লেখক সংঘের বন্ধুদের প্রথম দিনের পরিচয়ের পর সোজাসুজি 'উজবুক' বলে সম্বোধন করতাম। বাংলা ওই শব্দটির অর্থ তারা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছিল। তাদের হাস্যচ্ছটার সংগে আমার হাসির ঝলক টক্কর খেত। অর্থনীতির পরিসংখ্যানবিদগণ বলতে পারেন হালফিল কী অবস্থা ওই দেশে। আমি ১৯৬৫ সনের কথা বলছি। তখন সোভিয়েট রাশিয়ার এক উজবেকিস্তান রিপাবলিকে যে-মেগাওয়অট বিদ্যুৎ খরচ হতো তা ভারত, পাকিস্তানে– তখন পূর্ব-পশ্চিম দুই পাকিস্তানে– ব্যবহৃত বিদ্যুতের সমান। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাপ দিয়েও এক দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি বা উন্নয়নের বেশ কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার পাশ্চাৎপদতা বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বিশ্ববিদিত ছিল। ১৯১৭ সনে অক্টোবর বিপ্লবের সময় বুখারায় দুটি মাত্র বাড়িতে বিদ্যুৎ চালু ছিল। একটি খোদ বুখারার আমিরের প্রসাদে। অন্যটি তার হুজুর কেবলা পীর সাহেবের ইমারতে। ১৯১৭ সন। তারপর পঞ্চাশ বছর পেরোয়নি, সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অমন সংখ্যাগত উল্লম্ফনের হেতু কোথায় নিহিত?

জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে কী? নিশ্চয় উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি ক্রমশ এমন পর্যায়ে উন্নীত যে চাহিদার সংগে সংগতি রাখতে অমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে।

শ্রমশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতাগণ পূর্বোক্ত গ্রুপ মেথডের প্রয়োগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। এবং আজও ক্ষেত্রবিশেষে তেমন প্রয়োগ অব্যাহত আছে।

প্রতিযোগিতা, পরে হানাহানি, হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ তা স্বীকার করেন। আধুনিক কালে যুদ্ধে অন্যতম বিশেষ হেতু দেশে দেশে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। তা বালকের নিকটও পরিচিত। খোদ ইউরোপ বিশ বছর ব্যবধানে দুটি মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ না তোলাই মংগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর লোকক্ষয় দু'কোটি এবং রাশিয়ার আড়াই কোটি। সভ্য দেশের মানুষের কান্ড-কাহিনী শুনে আফ্রিকার ট্রাইবাল গোষ্টীর এক লোক মন্তব্য করেছিল, "ওদের কি এত ক্ষিদে পেয়েছিল?" নগ্ন প্রতিযোগিতার পরিণাম আখেরে এমনই। সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট প্রতিযোগিতার ধারণা অন্য রকম। তারা প্রতিযোগিতা চালিয়েছিলেন বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কাজের দিকে উদ্দীপক (ইনসেনটিভ) হিসেবে। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, বরং গ্রুপ এলাকা বনাম এলাকা। মোকমী কর্তৃপক্ষগণ দেখলেন, যেসব লোক নিজেকে হাম-বড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপন্ন করার জন্যে তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করত, কাজের ব্যাঘাত ঘটাত, সেই ব্যক্তিই আপন দলের নিকট অনুগত আর এক ধরনের মানুষ। কার্ল মানহাইম মন্তব্য করেছিলেন যে ইংলন্ডের খেলার মাঠ যে মর্মশক্তির ভাণ্ডার তা স্থানান্তরিত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার স্কুলে, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়। তার ফলে আত্মকেন্দ্রিক মজদুর হয়ে পড়েছে নিজের নিজের সংগী-সাথীদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যকারী। ওদের স্কুলে দেখা যায়, আপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্র মদৎ দিচ্ছে আর এক সহপাঠীকে। কারণ ক্লাসের কাজ তো সকল সদস্যের দায়িত্ব।

বিশেষজ্ঞদের মত, এইসব উদাহরণ থেকে দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্য সমান। মানুষকে জানার এবং বুঝার ব্যাপারে নতুন চাবিকাঠি বা দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেছে।

অতীতে দার্শনিক মনস্তত্ত্ববিদ শিক্ষাবিদ প্রমুখ জনমানুষকে দেখত দৈনন্দিনতার পরিচয়ে প্রাপ্ত একক– ইন্ডিভিজুয়াল-ব্যক্তি হিসাবে। যথা, রোগী, ছাত্র, বন্ধু ইত্যাদি। তাদের তাঁরা দেখতেন বিভক্ত– 'আইসোলেটেড'– বিচ্ছিন্ন জন। মানুষের শ্রেণি-অবস্থান চেতন বা অচেতনভাবে তাদের চোখে পড়ত না অথবা চোখ এড়িয়ে যেত। ফলে তাদের অভিগমন বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেহাৎ ব্যক্তি পর্যায়ে। শিক্ষক মানে শিক্ষা যে দেয়, ডাক্তার মানে যে রোগীকে দাওয়াই দেয়, পীর মানে একক বিবেকের কাছে যে ওয়াজ-নসীহৎ দাতা– ইত্যাদি।

বর্তমানে আর তেমন ভাবে মানুষকে দেখা হয় না। আরো দেখা হয়, পরিমণ্ডলের প্রভাব, অভিঘাত তার উপর কি রকম ক্রিয়াশীল। গোষ্ঠীজীবনের সমীক্ষণে দেখা গেল, একক ব্যক্তি মোটামুটি যুক্তিবাদী বিবেচক। কিন্তু জনতার দংগলে তার আচরণ অন্যরকম হয়ে যায়। তা থেকে সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণাও বদলে গেছে। মানুষ শুধু ব্যক্তি-মানুষ নয়, সে সমষ্টি বা সামাজিক-মানুষও বটে।

মানব-কল্যাণের প্রশ্নে বর্তমান যুগে এই সত্যটি আর অস্বীকার করা তো দূরের কথা, এক পাশে সরিয়ে রাখাও অযৌক্তিক। সমাজে সংস্কারের আন্দোলন কখন দেখা দেয়? যখন সংগতি-রক্ষার, এ্যাডজাস্টমেন্টের চিরাচরিত কাঠামো আর সক্রিয় থাকে না বা অকেজো হয়ে যায়। প্রথমে বিশেষ কয়েকটি সংস্কারের দিকে হয়ত নজর পড়ে। উদাহরণত শিশুশ্রম, 'কলকারখানার মজুরদের অবস্থা-উন্নয়ন। এসব থেকে প্রমাণ করা যায় যে, আধুনিক যুগের অনেক কুৎসিত সমাজক্ষত পরিকল্পিত উপায়ে দূর করা যায়। কল্যাণের দিকে এ আলো চিরদিন এই পথেই এসেছে। কিন্তু সমস্যা বর্তমান আবহে এত বিপুল যে, ছোটখাট সংস্কার মারফত আর সাফল্যে পৌঁছানো দায়। সমাজকর্মীদের জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তিমানুষ এবং গ্রুপের অসংগতির উৎস কোথায়– কিভাবে তা দূর করা সম্ভব–এ সবের গোড়ায় পৌঁছানোর দৃষ্টিভঙ্গিসমন্বিত হাতিয়ার। অন্যথায় হাজার সদিচ্ছা আন্তরিকতা ভেস্তে যেতে বাধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবার্ট আওয়েনের জীবনেতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। শুধু তিনি নন, বিগত দেড় শ' বছরে বহু মানব-প্রেমিক শেষ পর্যন্ত চোখে অন্ধকার দেখেছেন। আবার অনেকে মানব-প্রেম দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অজানিতে পৃথিবীর দুঃখদুর্দশার মূলে যাদের মধ্যে সম্পদ-অর্থগৃধ্নুতা এবং নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান–তাদেরই কাছে ধরা দিয়েছে।

মোদ্দা কথা, সমাজে হাল-হকিকত জেনেই এগোতে হবে, কল্যাণের পথে। প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা আর নতুন শব্দ নয়। সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে তার জোরদার সুপারিশ এলেও পুঁজিবাদী দেশও ধীরে ধীরে ওই ফাঁসে মাথা গলিয়েছে। কারণ, নগ্ন শোষণ যুগে সম্ভব নয়। কিন্তু প্ল্যানিং মানে শুধু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয়। অনেকে তা-ই মনে করে। সমাজের বিভিন্ন মানবিক যতো দিক আছে সব চোখের সামনে এনে তবে ভবিষ্যতের পদক্ষেপ স্থির করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাবতে হবে সংগঠনের কথা। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন করলেই সব জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে–তা ভাবা নয়। বরং সংগে সংগে মনস্তাত্ত্বিক যত সমস্যা আছে সমাজে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াও অপরিহার্য। মানুষের আচরণ কোন্ ক্ষেত্রে কি হতে পারে, কতখানি বুঝিয়ে-সুজিয়ে মানানো যায়, কতখানি শাস্তি বা ধমকের চোটে–ইত্যাদি নানা মানসিক দিকের পর্যালোচনা ছাড়া কল্যাণ মরীচিকা হয়েই থাকবে। যদি কেউ মনে করেন, পরিকল্পনা মানে গৃহ-নির্মাণ, সামাজিক বীমা, কি বড় বাজার তৈরি বোঝেন– তাহলে তারা মুদ্রার এক পিঠ দেখলেন। অন্য পিঠ আছে না? বিভিন্ন পরিকল্পনার দিকে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কি, অন্য পরিকল্পনা কতখানি তাদের চরিত্র গঠন করছে নাগরিক হিসেবে–তা চোখের সামনে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত থাকা বাঞ্ছনীয় কি, বাধ্যতামূলক। সামাজিক পরিকল্পনা এমনই হওয়া উচিত, যার কাঠামোর মধ্যে স্বাধীন গ্রুপ-ফোর্স বিপথগামী যুবক-যুবতী ব্যর্থ-বাঞ্ছা ফ্রাসট্রেটেড মানব-মানবী এমন কি দাগী আসামী অপরাধীকে পর্যন্ত আরো স্বাস্থ্যময় এবং সংগতিপূর্ণ জীবন যাপনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অবশ্যি এখানেও সতর্কতা প্রয়োজন। ফ্রাসট্রেশান থেকে মুক্ত করতে ইউরোপে ফ্যাসিস্টরা কম মোহমরীচিকা সৃষ্টি করেনি। উত্তম সামাজিক প্রণালী অসৎ মতলবেও কাজে লাগানো যায়।

মোদ্দা কথা, মানব-কল্যাণের পথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আধুনিক কালের সমাজসেবীদের মনে রাখা উচিত, শুধু নিজ দেশের নয়, পৃথিবীর তাবৎ পটভূমির পর্যালোচনা ব্যতীত কল্যাণের পথ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

৬

কল্যাণের পথ আর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পথ নয়। তাই বিশ্ব-পটভূমির কাছে ছুটে যেতে হয়। জার্মান এক মনীষী বলেছেন, আজকের দিনে এই পৃথিবী অতীতকালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে আরো কঠিন, আরো যুদ্ধমুখী, আরো আরো অমিশুকভাবে স্বতন্ত্র এবং ঢের বেশি একক ব্যষ্টি (সিংগেল ইউনিট)– যার ভেতর সব কিছু একে অপরে উপর প্রতিক্রিয়ামুখর ও অভিঘাত সৃষ্টিকারী। কিন্তু তার মধ্যে সব কিছু পরস্পর সংঘৃষ্ট এবং একে অপরের বিরোধী এবং ভিন্নমুখে ধাবিত। বলা বাহুল্য, যন্ত্রশিল্পের কল্যাণে পৃথিবীর এমন এককতায় পরিণত। রসিক জন বলেছেন, দুনিয়া তো এখন গোলকগ্রাম। যন্ত্রশিল্পের প্রভাব সমাজজীবনের গত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে পরিবর্তনের সূচনা করে, তার সংগে বিংশ শতাব্দীর তুলনা করা দায়। নকশার এমনই অদলবদল। কয়লা, লোহা তারপর ইস্পাত ও বিদ্যুৎ পেরিয়ে বর্তমানে ইলেকট্রোনিক্স এবং সাইবারনেটিক্সে উপনীত।

উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের সংগে শুরু হয় উপনিবেশবাদ। ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার তখন ছিল ঈশ্বরের আদেশের মতো। প্রাচ্যের সভ্যতা মজা খাল। সেখানে প্রবাহ-সৃষ্টির জন্যে ইউরোপীয়দের বিবেকে কোন খটকা ছিল না। যদি অমন বিস্তারের পথ রক্তমাখা হয় কুচ পরোয়া নেই। সভ্যতার বিস্তারই ঈশ্বরের আদেশ। যদি সেই আদশে পালনে কিছু নেটিভের ঘর পোড়ে, কিছু রমণী ধর্ষিত হয় বা মানুষ মরে তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। বিস্মিত হতে পারেন, এমন কী জর্জ বার্নার্ড শ'র পর্যন্ত পদস্খলন ঘটে এই ক্ষেত্রে। তিনি লিখেছিলেন যে চীন যদি শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সভ্য জীবন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ গড়তে অপরাগ হয়, তাহলে সভ্য জাতির সেই আবেষ্টনী গঠনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট শ'র এই কাণ্ড। "শেয়ালদের কোনটি ভালো?" "যেটি গাছে চড়িয়া প্রস্রাব করে।" বাংলা প্রবাদটি স্মরণীয়। বার্নার্ড শ' বিপ্লববাহী রসিকতার জন্যে বিশ্ববিখ্যাত হন। বৃটিশ শাসক শ্রেণিদের সেই তুলনায় ক্ষমা করা যায়। লর্ড কার্জন, একদা বংগীয় লাট, তো খোলাখুলি বলেছিলেন "ইন এম্পায়ার উই হ্যাভ ফাইন্ড নট মেয়ারলি দি কী টু গ্লোরি এ্যান্ড ওয়েল্‌থ, বাট দি কল টু ডিউটি এ্যান্ড দি মীন্‌স অফ সারভিস্‌ টু ম্যানকাইন্ড।" মানবতার সেবার ওই জারজ ভৃত্যের সাম্রাজ্যবাদীর মুখোশধারী অভিনয়ের কথা এড়িয়ে গেলাম এই জন্যে যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যারা জন্মেছেন তারা এই ভণ্ড জনের সেবার নমুনা পেয়েছেন। এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কতো শহীদের অকাল-প্রয়াণ না দেখলাম : ভগৎ সিং, কাকোরী মেল-ডাকাতির আসামীরূপে ফাঁসির রজ্জুর শিকার আসফাক উল্লাহ, সূর্য সেন– এমন বহু জনের নাম করা যায়। শত শত জনের বিচার-প্রহসন। অবিভক্ত বৃটিশ আমলে বোম্বায়ে এক ইউরোপীয় ক্লাবের গেটে সাইনবোর্ড টানানো থাকত : ডগ্‌স এ্যান্ড ইন্ডিয়ান নট এ্যালাউড– কুকুর ও ভারতীয়ের প্রবেশ নিষেধ। কলকারখানার চাকা চালু রাখার জন্যে কাঁচামালের সন্ধানে উপনিবেশ সভ্যজাতিগুলোর চোখে পড়ে। তারপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রজদণ্ডরূপে।" অতীতের সেই কাহিনী-কীর্তন কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রাসংগিক মনে হতে পারে শ্রোতাদের নিকট। কিন্তু যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বাস করেনি, তাদের কিছু আঁচ দেওয়ার জন্যে দেওয়া দরকার। মানব কল্যাণের রূপায়ণের সম্মুখে উপস্থিত প্রতিবন্ধগুলো তাদের চোখে পড়া উচিত। জারের একদা শাসিত মধ্য এশিয়ার উপনিবেশগুলো মাত্র কুড়ি বছরে সমাজতান্ত্রিক ছোঁয়াচে এক লাভে কোথায় এগিয়ে যায়। সেখানে দু'শ বছরে ইংরেজ শাসনে এই উপমহাদেশ তার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছতে পারে না।

কল্যাণ নির্বস্তুক (abstract) কোন শব্দ নয় যেমন মানুষ পটভূমিহীন বায়বীয় কোন জীব নয়। তাই অতীতের আবহ জানা দরকার। যদিও উনিশ শতকের সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ আজ কোথাও নেই, তবু জানা দরকার তথাকথিত যন্ত্রশিল্পে উন্নত জাতিগুলোর হালচাল। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্যে বিগত পঁচিশ বছর ধরে যক্ষ্মা বুকে শ্বেতচামড়া প্রিটোরিয়া সরকারের জেলে ধুঁকছেন নেলসন ম্যান্ডেলা। তিনি নিজ স্বদেশ প্রবাসী। আর প্রিটোরিয়া সরকারের স্যাঙাৎ ম্যাগী থ্যাচার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান কি বুশ মুখও খোলে না। ওরা নাকি খ্রিস্টান এবং গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী। নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী খেলের সংগে অনেকের পরিচয় নেই। বৃটিশ ইলেকট্রিক... ইউনিয়ন এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি পাউন্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় খাটে। এমন ল্যাংগ-কে কি চটানো যায়? ম্যাগী থ্যাচার কি ইংলন্ডে শ্রমিকদের পার্টি আছে লেবার পার্টি, এদের নেতাগুলো আসলে লর্ড। তাই ঘরে সমাজতন্ত্রী কিন্তু বাইরে তাদের লজ্জা-শরম নেই সাম্রাজ্যবাদী হতে। বিশ্বাসঘাতক র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের ভূত এখনও ওদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তাই গণতন্ত্রের মহিমা-কীর্তনকারীদের দেশে এখনও রাজতন্ত্র বহাল টিকে থাকে।

পরিবেশের ভেতরই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আবেষ্টনী অস্বীকার কর তো কল্যাণের সৌধ গড়া যায় না।

ইউরোপীয় সভ্য দস্যুদল মাত্র বিশ বছরের মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ এবং জনসংখ্যার এক-দশমাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়। আফ্রিকা তো দেশ নয়। প্রায় মহাদেশ। ইউরোপের সাইজের চার গুণ। এই বিশাল ভূখণ্ডের এক-দশমাংশ না তারও বেশি ইউরোপীয় শক্তির করতলগত হয়। পঞ্চাশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় ছয় কোটি লোক। এই ছিল ১৮৭৬ সনের হিসেবে। বাকি চব্বিশ বছরে উনিশ শতকের অবশিষ্ট নয়-দশমাংশ সভ্য জাতিগুলো দখল করে নেয়। সভ্য জাতিগুলোর লেজ দাঁত নখ আছে বলে কেউ দাবী করেনি। আফ্রিকার অধিবাসীদের তা করা উচিত। আফ্রিকার জংগলে পাহারারত সৈনিকের স্বভাবতই বোর্ডম বা একজাতীয় একঘেয়েমি-প্রসূত ক্লান্তিতে ভোগা স্বাভাবিক। কি করা যায়? তাস খেলা যেত তাস থাকলে। তাস নেই। একটা উপায় করো। কয়েকটা কালা আদমী ধরে এনে তাদের চামড়া তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে তা শুকিয়ে তৈরি হলো তাস। ইংরেজ ফরাসী ডার্চ জার্মান– সব শুয়োরের গঁৎগতানি একই ধরনের শব্দে।

ফ্রান্সের সাইজের বিশগুণ এলাকা ফরাসী সরকারের উপনিবেশে পরিণত হয়। তাছাড়া আরো জায়গা, যথা মাদাগস্কার দ্বীপ, টনকিন প্রভৃতি দখল করে নেয় বিগত শতকে। ১৮৮৩ সনে আনাম ফরাসী রাজ্যভুক্ত হয়। বৃটেন কি করে পেছনে পড়ে থাকবে? ১৮৮৬ সনের মধ্যে ছুতোনাতায় ইংরেজ ব্রহ্মদেশ দখল করে বসল। আর চীন দেশ, উনিশ শতকের শেষ পাদের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির তাঁবে চলে যায়। কোথাও জবরদস্তি দখল, কোথাও স্থানীয় পুতুল সরকার মুখোশ স্বরূপ রাখা, নামমাত্র স্বাধীনতা দান। চীন সম্রাটের প্রাসাদ দখলের সময় এমন মূল্যবান শিল্প-নিদর্শন নষ্ট হয় যা মানব-সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। সভ্য ইউরোপীয় জাতিগুলোর এইসব বর্বর চণ্ডালী আচরণ বিস্ময়কর নয়। অনুন্নত দেশে সভ্যতা বিস্তারের আদেশ পেয়েছে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে। তারা তো ধর্মীয় বিধি পালন করছে। পেছনে যীশু খ্রিস্টের দোহাই বাদ যায়নি। ইউরোপীয় সভ্য শ্বেতাঙ্গ জাতি কোন এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তারের পন্থাস্বরূপ প্রথমে পাদ্রী ও বাইবেল পাঠায়। তার পেছন-পেছন বুলেট আসে। এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা সব জায়গায় একই চিত্র। যন্ত্রজাত মালবিক্রির জন্য বাজার চাই। বাজারের জন্য এলাকা চাই। এই জাগতিক লালসা মেটানোর প্রলেপস্বরূপ খ্রিস্টধর্মের এস্তেমাল। পাদ্রীর দল কি তা তলিয়ে দেখতে জানত না? সকলে মূর্খ? না। ওদের ভেতর সচেতন যাজক থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু বিবেককে চোখ-ঠারা তো সহজ। খ্রিস্টধর্মের এই মহান সেবকবৃন্দ তো ঈশ্বরের মহিমা বিস্তারের নিমিত্তমাত্র। আধুনিক যুগের নজীর তো আমাদের সামনে রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জনাব হিটলার যখন লক্ষ লক্ষ ইহুদী নিধনযজ্ঞ করছিল গ্যাস-চেম্বার মারফত, খবরটা চাপা থাকেনি। মহামান্য পোপের কাছে তো ঈশ্বরের গায়েবী বাণী পৌঁছায়। তাঁর কাছে কি খবরটা অজানা ছিল? নিশ্চয় না। কিন্তু যীশুর শ্রেষ্ঠ সেবক মহান পোপ ভ্যাটিকান থেকে মুখ খোলা কি একটা কনিষ্ঠ অংগুলিও সামান্য নাড়েন নি। কারণ, ব্যাপারটি রাজনৈতিক। সেখানে ধর্মের নাক-গলানো নিতান্ত গর্হিত অন্যায়। ঘোর অন্যায়। আধ্যাত্মিকতার একদম চূড়ায় আসীন এক মহাপুরুষ কি করে জাগতিক অমন ডাহা নোংরামির ভেতর কাদা ঘাঁটতে যেতে পারেন? তা একজন মহৎ যাজকের পক্ষে আত্মসম্মান-হানিকর। চুপচাপ রইলেন তিনি ঈশ্বরের বাণী যার কাছে আসে এবং যিনি তা উচ্চারণ করেন।

আপনাদের ঈষৎ ধৈর্য কামনা করব। আর একটি উদাহরণ প্রদানের লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় মুখোমুখি সংঘাতে মার্চ মাস ১৯৭১। পাকিস্তানী বর্বরদের গণহত্যার নৃশংস সংবাদ বিশ্বের তামাম পত্রিকায় তখন ঠাঁই পাচ্ছিল। কিন্তু তিন মাসেও জাতিপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট উ থান্টের চোখে তা পড়েনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের এক মহা প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রধান। তিনি নরনারী নিধন যজ্ঞ বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারতেন। একটা বিবৃতি দিতে পারতেন। উ থান্ট সাহেব আবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। যে ধর্মের মূল কথা প্রেম। তাইতো বুদ্ধদেব বার বার বলেছেন : মাঃ গৃধঃ। গণহত্যার মত অঘন্য অপরাধের কথা জনাব উ থান্টের কানে ঢুকতে লেগেছিল মাত্র চার মাস। চার মাস পরে তিনি তাঁর মহান দুই পবিত্র ওষ্ঠ ঈষৎ ফাঁক করতে পেরেছিলেন। আল্লার কাছে শুকর, অশেষ-অশেষ। উ থান্ট মহামান্য পোপের মত পবিত্র ওষ্ঠ যুগল বন্ধ করে বসে বসে থাকতেও তো পারতেন। তা তিনি শেষ পর্যন্ত করেননি। আরো অনেক বাংলাদেশীর প্রাণহানি হতে পারত। সেই জন্যে বহু বছর পরে আমি ধন্যবাদ জানাই জনাব উ থান্টকে।

আর নজীর বাড়াব না।

ইউরোপীয় যন্ত্রশিল্প-জাত পুঁজিবাদের জোয়ারে ভেসে আসা উপনিবেশ বিস্তার নামক ব্যাধি উনিশ শতকে ভূত চাপার মত ওদের ঘাড়ে চেপে বসে। দু-তিন দশকের মধ্যে রাশিয়ার জার উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, কিরিঘিজিস্তান– এশিয়া মাইনরের দেশগুলো দখল করে নেয়। লেখক ডস্টয়ভস্কি যে-ভূখণ্ড সম্পর্কে নিজের ডায়েরীতে মন্তব্য রেখে গেছেন। তিনি ওই এলাকাকে বলেছেন "রুশদেশের অনাবিষ্কৃত আমেরিকা"। তাঁর মতে, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ ইউরোপে নয় বরং এশিয়াতেই নিহিত।

ইউরোপে বেচারা জার্মানী। তার উপনিবেশ-বিস্তার বেশি হয়নি অন্য সভ্য প্রতিবেশীর মত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম হেতু এই অসম শেয়ার যা জাতি-বিদ্বেষে পরিণত করে হিটলার তুমুল ফায়দা ওঠায়। হিস্যায় ছোট তরফ কিন্তু উনিশ শতকেই আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পয়ত্রিশ। হাজার বর্গমাইল ছিল জার্মানীর তাঁবে। সেখানে লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি তিরিশ লক্ষ।

এই গেল পূর্বে গোলার্ধের কথা। পশ্চিম গোলার্ধে উদীয়মান মার্কিন দেশ পেছনে পড়ে থাকেননি। তা সম্ভব নয়। বাজার চাই। পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী লজিক। পিছু হটা দায়। তার জের আজো চলছে। প্রাক্তন উপনিবেশের নাম ওরা বদলে দিয়েছ নেহাৎ শরমে নিজেদের পাপ ঢাকার অছিলায় কবলে : অনুন্নত দেশ। আরো পরে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্ব। সে কাহিনী যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

আপাতত মার্কিন দেশের পুরাতন কাহিনী গতিবিধি লক্ষ্য করা যাক। ইউরোপ মার্কিনদের জ্ঞাতি। জাতীয় স্বার্থে জ্ঞাতিদের কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে থাকা যায় না। উনিশ শতকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলো মার্কিন-জিহ্বায় প্রচুর লালা নিঃসরণের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইউরোপের দেখাদেখি– তা বলতে পারেন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে তো পূর্বেই প্রভুত্ব বিস্তার চলে। তখনও আশ্রিত। ১৮৯৮ সনে সোজাসুজি দখল। পার্ল হারবার দ্বীপ আরো তেইশ বছর আগে অধিকৃত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ নৌঘাটির জন্যে দরকার। অতএব দখল। এক কথায় বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে, গোটা দুনিয়া পুঁজিবাদী দেশের এজমালী সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

আমি ইচ্ছে করেই বিংশ শতাব্দীর দিকে এগোইনি। হালফিল ইতিহাস অনেকের জানা। পুঁজিবাদী রথের চাকা শুধু দেশ নয়, তার নরনারী এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গুঁড়িয়ে এগোতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী লালসার নির্লজ্জ নিদর্শন, বোধ হয়, মুসোলিনী ও হিটলার। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া জয় তেমনই ঘটনা। ওই দেশ জয়ে মুসোলিনী বিষ বাষ্প ব্যবহারে পিছ-পা হয়নি। ট্রাজেডির ভেতর অনেক সময় কমেডি পাওয়া যায়। আবিসিনিয়ার সময় একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। আপনাদের নিকট বয়ানের লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

ইতিহাসে ব্যক্তিপর্যায়ের মত পরিহাসের কাহিনী ভুরি ভুরি মেলে না, তবে মেলে। আমাদের জানা, আবিসিনিয়ার সম্রাট ধর্মে খ্রিস্টান। তথৈবচ মুসোলিনী। যুদ্ধ চলাকালে বর্ষাকাল আসন্ন। কিন্তু মৌসুম তো পাঁজি ধরে আসে না। কখনও ক'দিন আগে বা পরে এসে হাজির হয়। বর্ষাকাল আবিসিনিয়ার যুদ্ধে এক বিরাট ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। ঋতুর আধিপত্য রাজনীতির ক্ষেত্রে কম নয়। প্রজ্ঞার সংগে কখনও কখনও মিতালি পাতায়।

স্বদেশের একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন, ব্যাপারটা হৃদয়গংমের জন্যে। ১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে দংষ্ট্রা দন্ত-নখর সহ আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী জংগীবাহিনী নিরীহ অধিবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাথমিক ত্রাস-সঞ্চারী হামলার সময় শহরে হিন্দু-মুসলমান বাছ-বিচার ছিল না। পরদিন পরবর্তী ধাপে শুরু হলো দ্বিজাতিতত্ত্বে হাতিয়ারী প্রয়োগ : স্রেফ, হিন্দু নিধন। কিন্তু সেখানেও কুলানো দায়। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা তো বর্ণে (রেস) এক। বাছ-বিচার কঠিন, কে হিন্দু, কে মুসলমান। শুরু হলো গণহত্যা। তখন বাঙালীই যথেষ্ট। গণহত্যায় না গিয়ে উপায় নেই। খেদানো জানোয়ারের মত তখন এই ভূখণ্ডের অধিবাসী লাখে লাখে ধাইছে ভারত-সীমান্তের দিকে প্রাণ ভরে সন্ত্রস্ত। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। ১৮ই এপ্রিল যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেন, ভারতের সমগ্র জনসাধারণ এক-শরীর ধারণপূর্বক তা মেনে নিত। কেউ উচ্চবাচ্য করত না। কিন্তু রাষ্ট্রনায়িকা এতটুকু নড়লেন না। এপ্রিল থেকে অক্টোবর– ছ' মাস পরে মিসেস গান্ধী বেরুলেন বিশ্বের দুই পরাশক্তি ও অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সমঝোতায়। ছ'মাস অতিবাহিত। বাংলাদেশ তখনও ভারত কর্তৃক অস্বীকৃত। ফিরে এলেন স্বদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ছ' মাসে সংবাদপত্রে বিশ্বজনমতের মানস-পটভূমি পেতে দিয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রে পাকিস্তানী জংগীশাহীর স্যাঙাৎ। কিন্তু মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে। রাষ্ট্র বনাম জনগণের টাগ-অফ-ওয়ার। পৃথিবীময় বাংলাদেশ পত্তন করার সমর্থক তখন কোটি কোটি মানুষ। তদানীন্তন পটভূমি আরো লক্ষ্যণীয়। মহাচীনের মত বিরাট দেশ পাকিস্তানের ঘোর সমর্থক। এমন-কী যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্তু "জান্তা" গণহত্যা শুরু করল তখনও মহাচীন পাকিস্তানের পোঁ ধরে বসে রইল। বর্তমান বক্তা সেই সময় প্রধানমন্ত্রী চাউ এন-লাইকে এক খোলা চিঠি লিখেছিল। তার মূল সুর সমাজতন্ত্রের মধ্যে কি নৈতিকতার কোন ঠাঁই নেই? তা না হলে একটি সমাজতন্ত্রী দেশ এমন অন্ধ-সমর্থন কি করে দিতে পারে একটি স্বৈরাচারী দেশকে যার বনিয়াদ পর্যন্ত ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্ন। পাকিস্তানের বনিয়াদ দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ধর্মের উপর জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে– এই জিগীর। ধর্ম আবার সমাজতন্ত্রীদের নিকট আফিম বিশেষ। অথচ পাকিস্তানের নৃশংসতার সমর্থক এক সমাজতন্ত্রী দেশ। এই বক্তার আরো অভিযোগ ছিল চৈনিক প্রধানমন্ত্রীর সমীপে। পুরাতন চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি বাংলা তর্জমায়। কারণ, মূল পত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত। উদ্ধৃতি : আফিমের সাহায্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতার কথা আপনি বলেন তখন বাংলাদেশবাসীর আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার– সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, একটি অমূল্য সংযোজন। পূর্ব পাকিস্তানীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। সংখ্যাগরিষ্ঠরা কেন্দ্র থেকে 'সিসিড' করে আপনি কখনও শুনছেন? যাক, যে-কথা। পাকিস্তান একটি বহুজাতি অধ্যুষিত দেশ। চীন ও রাশিয়া সমাজতন্ত্রী কাঠামোর মধ্যে ওইরূপ রাষ্ট্র নির্মাণে সক্ষম হয়েছে কিন্তু পাকিস্তানের শাসকবর্গ তো দেশকে অনেক জাতির আবাসভূমি বলতে নারাজ। তাহলে তাদের দ্বিজাতিতত্ত্ব যে ভেস্তে যায়। আপনি এমন সব মানুষকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন যাদের দুই হাত কৃষক ও শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত। ওই দস্যুদল এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কুড়ি লাখ লোক হত্যা করেছে এবং গ্রাম পুড়িয়েছে আট হাজার। ভারতে আশি লক্ষ শরণার্থী ছাড়াও শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাস্তুভিটাচ্যুত লোকের সংখ্যা আরো দু' কোটি। এহিয়া সরকারের প্রতি আপনার নৈতিক সমর্থনদানের সংবাদ পাওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ কীভাবে কেটেছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তা বুঝাতে পারব না। কি করে এমন কাজ আপনার পক্ষে সম্ভব হলো? পূর্বে উল্লিখিত, রূপায়ন-অসম্ভব আদর্শ ভাববাদী ভাঁওতা (আইডিয়ালিস্টিক ব্লাফ)। চীন দেশ হবে মানব-গোষ্ঠীর বিবেক। সাময়িক রাজনৈতিক মুনাফার সংগে এমন মহান দেশ কখনও নৈতিকতা বিনিময় করতে পারে না। 'বরং কৃশ এবং সৎ হও অসৎ হয়ো না।' বলেছেন কনফ্যুসিয়াস।

নৈতিকতা ও জনকল্যাণের সম্পর্ক আমি পরে আলোচনা করব। প্রসংগ থেকে দূরে সরে এসেছি, শুধু পটভূমি তুলে ধরার জন্যে।

ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর নিকট চীনের নৈতিক সমর্থন দূরে সরিয়ে রাখার মত ব্যাপার নয়। বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়া মানে, যদি যুদ্ধ বাধে পাকিস্তানের মদৎগার হবে মহাচীন। তার হিমালয়-পথে ভারত আক্রমণ বিচিত্র নয়। ডিসেম্বর মাসে জন্যে অপেক্ষা করলেন মিসেস গান্ধী। তখন ওই পথ বন্ধ। জেনারেল বরফ তথা জেনারেল শীত তখন মিসেস গান্ধীর অন্যতম মোক্ষম জেনারেল হয়ে বসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চীন সাহস করবে না ভারত আক্রমণে। তাই তো এতদিন অপেক্ষা। অন্যদিকে কয়েক মাসে সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যম পাকিস্তানী নৃশংসতার এমন মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরেছে যে কোন সমর্থক দেশের সরকারের বাইরে পাকিস্তানের জন্য সমর্থন দেওয়ার মত আর কোন লোক ছিল না পৃথিবীময়। শীতের মৌসুমের জন্য মিসেস গান্ধী অপেক্ষা করছিলেন। আর আবিসিনিয়াবাসীরা প্রার্থনা করছিল গডের নিকট, "প্রভু তুমি তো সব পারো। এবার জলদি জলদি বর্ষা নামিয়ে দাও। তাহলে মুসোলিনীর ট্যাংক-সাঁজোয়া গাড়িগুলো আর আমাদের দেশের কাদামাখা নরম মাটিতে ঢুকতে পারবে না।"

ইতালীও খ্রিস্টান দেশ। তারাও প্রার্থনা করছিল, "প্রভু, এবার বর্ষা একটু দেরীতে পাঠাও আবিসিনিয়ার মাটিতে। না হলে আমাদের ট্যাংকগুলো আর এগোতে পারবে না। তুমি তো সবই পারো।" ঈশ্বর দুই দিকের ভক্তদের আচরণে কি করেছিলেন তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয় ইতালীতে খুব জাঁকজমকের সংগে প্রতিপালিত হয়েছিল এবং ভ্যাটিকাল নীরব থাকেনি।

পুরাতন প্রসংগে ফিরে যাওয়া যাক।

পুঁজিবাদী ইউরোপের পেছনে পড়ে থাকেনি মার্কিন দেশ। ১৮৯৮ সনে দখলিত ফিলিপাইন ও গুয়াম। শোষণের নিগঢ় পরিহিত অধিকৃত দেশে অধিবাসীদের অবস্থা সর্বত্র একই রকম। ওদের কলংক-কাহিনী ইতিহাসের সব চেয়ে ঘৃণিত অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ওদের বেশ দমিয়ে দেয়। ফলে ভোল পাল্টাতে সাম্রাজ্যবাদীরা বাধ্য হয়েছে। ১৯১৭ সনে রুশবিপ্লবের পর পৃথিবীময় নিপীড়িত জনগণ আর শান্ত থাকেনি। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ এ্যালেক্সি তোকেভীল লিখেছেন যে শোষিত মানুষ যতদিন না বিকল্পের মুখোমুখি হয় অথবা কথা না শোনে, ততদিন তারা আর নড়েচড়ে না। এবং পরিবেশ তাদের কাছে মনে হয় নিয়তি। কিন্তু যেই মাত্র বিকল্প হাজির হয় তখন আর মানুষকে পুরাতন খাঁচায় আটক রাখা দায়। ওরা তখন নড়তে থাকে।

চোখের সামনে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইউরোপীয় দেশের কৃষক-মজুরদের মধ্যে তো বটেই, উপনিবেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করতে লাগল ১৯১৭'র পর। অন্য দিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সহজ ছিল না। বেকার, মন্দা, অতি-উৎপাদনের ফলে দাম হ্রাসের ভয়ে গম ও অনেক আহার্যাদির সমুদ্রবিসর্জন– এবম্বিধ কাণ্ড-কারখানায় মোহমুক্ত মজুর ও কৃষক এবং অন্যান্য ক্লান্তি মানুষকে চঞ্চল করে তুলবে তা আর বিচিত্র কি?

প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটেছিল উপনিবেশের দখলীস্বত্ব নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তেমন নির্লজ্জতা না থাকলেও বুচকী-সমাল প্রতিযোগিতা কিছু কম ছিল না। পূর্বে উপনিবেশ ছিল কাঁচামাল সংগ্রহের আড়ৎ। বর্তমানে পুঁজিখাটানোর কেন্দ্র হিসাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রয়োজন আরো বেশি। অবশ্যি বর্তমানে ওদের পুরাতন খসলৎ কিছুই এদিক-ওদিক হয়নি। নানা ভোল পালটেছে নয়া যুগের সাম্রাজ্যবাদীরা। এখন বিভিন্ন জাতির দস্যুরা একত্র হয়ে মালটিন্যাশনাল কোম্পানী বানিয়েছে- প্রাচীন কালে নিজেদের মধ্যে যে আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা ছিল তা অনেকখানি হ্রাস করেছে। তবে ওরা বুঝে ফেলেছে অতীতের কায়দায় শোষণ আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরো ত্বরান্বিত করেছে সেই উপলব্ধি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সনে। তার পনর বছরের মধ্যে চল্লিশটি দেশ স্বাধীন হয় যার লোকসংখ্যা আশি কোটি। আরো আটাশ বছর কেটে গেছে, আরো দেশ স্বাধীন হয়েছে। এক দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কিছু দ্বীপ ছাড়া উপনিবেশ বলতে আর কিছুই নেই। যা আছে তা ফন্দিফিকির-খচিত স্বাধীন দেশ।

১৯৬০ সনে 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল উপনিবেশ সম্পর্কে যে, ইউরোপীয়দের জন্যে পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার শিক্ষা-সবক হচ্ছে : "গরম কেটলীর উপর বসে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়"। কিন্তু আপন স্বভাব না পারে ছাড়িতে চোরা। তাই ফিকিরের তল্লাস অনেক আগে থেকেই চলে। রাজনৈতিকভাবে ওদের স্বাধীনতা দিয়ে দাও, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে এমন প্যাঁচ কষে রাখো যেন কিছু খোয়াতে না হয়। অবশ্যি কিছু না খুইয়ে উপায় ছিল না। বাংলা প্রবাদ 'ডুবো কড়ির মুষ্টিলাভ' ওরা ভাল জানে।

নয়া ঔপনিবেশিকতা তখন থেকেই রূপ নিতে থাকে। কংগোর কথা আপনারা জানেন। তার ভূগর্ভে নানা ধরনের খনিজ ও আকরিক পদার্থে বোঝাই। এসবে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল বেলজিয়াম, আমেরিকা, বৃটিশ, জার্মানী, ফরাসী। আধুনিক যুগে যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আকরিক পদার্থ ইউরোনিয়াম এবং কোব্যান্ট্-নিকেল জাতীয় ধাতু বিশেষ। কংগোর স্বাধীনতার প্রাক্কালে এক মার্কিন শিল্পপতি রবার্ট সি বুয়ার্ক যা বলেছিলেন, তারই বহু উদ্ধৃতি শুনুন : The greatest hope of the moneyed interest was that independence would bring such chaos the a new kind of economic colonization might be imposed, with the white men continuting to run things but under a black figurehead whose meterial wants might be appeased in wine. woman and flashy cars, plus a swiss bank account. [আর্থিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় আশা- স্বাধীনতা ওদেশে এমন বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে যে তখন নতুন ধরনের ঔপনিবেশিকতা চাপিয়ে দেওয়া সহজ হবে – যেখানে শ্বেতাংগই সব চালাবে, তবে সাক্ষীগোপলরূপে থাকবে এক কালা আদমী- মদ মেয়েমানুষ, ঝকঝকে গাড়ি তৎসহ একটি সুইস ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট দিয়ে তার জাগতিক জড়ক্ষুধা সহজে নিবৃত্ত করা যাবে।]

আমার মনে হয় এমন খোলাখুলি রামনাম আর কখনও পাপিষ্ঠের মুখ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারিত হয়নি। ১৯৪৫-৮৮ এই তেতাল্লিশ বছর আমাদের উপর দিয়ে নির্বিবাদ দিন যায়নি। প্রাক্তন অবিভক্ত ভারত কেন, সুদূর কোরিয়া থেকে ধরলে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বাধীনতা প্রদানের ফন্দী তো পরিষ্কার। উনিশ শতকে কলানীতে যা মূলমন্ত্র ছিল, ডিভাইড এ্যান্ড রুল, বিংশ শতাব্দীতে তাই আছে ভোল পাল্টে। কোরিয়া আজও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। ভিয়েৎনামও দুই ছিল। সমাজতন্ত্রী নেতাদের দেশপ্রেম সে ভেদরেখা মুছে দিয়েছে অনেক রক্ত ও সম্পদ ক্ষয়ের পর। ভারতবর্ষ ফাড়া হয় দুই টুকরোয়। পরে তার শিং গজিয়ে তিন টুকরো হয়েছে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্যালেস্টাইনবাসীদের উৎখাত করে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সহায়তায় পত্তন ইসরাইলী রাষ্ট্রের। মধ্যপ্রাচ্য সিরিয়া লেবানন প্রভৃতি রাজ্যে যতো অমানবিক নৈরাজ্যবাদী কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয তার মূলে থাকে প্রাক্তন উপনিবেশভোগী সাম্রাজ্যবাদী শূকরের পাল। কূটনৈতিকতা কেন্দ্র করে যতো রকম ধাপ্পাবাজি অমানুষিকতা কল্পনীয়, তার প্রত্যেকটির গোড়ায় থাকে মার্কিন চালবাজি। সম্প্রতি ইরান ও নিকারাগুয়ার কন্ট্রাবিদ্রোহীদের ব্যাপার আপনাদের জানা। সৌদী আরবের সংগে সমঝোতাসহ মার্কিনরা অস্ত্র বিক্রি করত ইরানে। অথচ ইরাক তাদের মিত্ররাজ্য। মুনাফেকীর এমন বৃহৎ নজীর আছে। কানাডাবাসী এক রাজনীতিবিদ পাঁচের দশকে কি তার সামান্য পরে বলেছিলেন, "অল রোড্স ইন দি কমনওয়েলথ লিড্স টু ওয়াশিংটন। কথাটা নির্মম সত্য।

নয়া উপনিবেশবাদের মুখোশ নানাভাবে আজও প্রকট। তবে যার মোদ্দা সুর : প্রাক্তন উপনিবেশে এক স্থানীয় শ্রেণীর জন্ম দাও যারা নিজেদের স্বার্থে স্বদেশের মানুষের উপর আধিপত্য চালাতে বাধ্য হবে। বর্তমান বিশ্বে পূর্বোক্ত রবার্ট রুয়ার্ক সাহেবের ভাষণনীতি তাবৎ সাম্রাজ্যবাদীরা পালন করে। আর্থিক কাঠামোর সুড়ঙ্গ পথেই অদৃশ্য শিকল অনুন্নত দেশের জন্য তৈরি হয়। শুধু লেনদেনের নয়, বরং অতীত দাসত্বের– যা প্রকাশ্য নয়। কিন্তু তার অদৃশ্য জগদ্দল আর সহজে বুক থেকে নামে না। পৃথিবী এইভাবে জড়-পর্যায়ে বিভক্ত। সব সদস্য স্বাধীন দেশে নানা বিশৃংখলার অন্ত নেই। অর্থনৈতিক দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে স্থানীয় সুবিধাভোগী সৃষ্টি করা হয়, তারা যেন গদীচ্যুত না হয় সেদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের নজর থাকে ষোল আনা। আধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যবসা তো উন্নত দেশের একচেটে ব্যাপার। সেই ব্যবসায় না মন্দা থাকে সেদিকেও পুঁজিবাদীদের খেয়ার টনটনে রাখতে হয়। আবার নতুন অস্ত্র উদ্ভাবনের ফলে পুরাতন অস্ত্র অচল হয়ে যায়। এই অচল মাল বিক্রি ও সরবরাহের আড়ৎ প্রাক্তন উপনিবেশ বা অনুন্নত স্বাধীন দেশ। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, পরম লজ্জার বিষয়, সামান্য কাঁদুনে গ্যাসও তৈরি করতে পারে না। কিন্তু ইহুদী-নাসারাদের অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করে বাইরের কোন শক্তির সংগে লড়াইয়ে নয়, বরং নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে। ১৯৭৯ সনে পবিত্র কা'বা শরীফ কেন্দ্র করে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তা ঠাণ্ডা করার জন্য সহায়তা স্বরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসী সরকার পুলিশ পাঠায়। পবিত্র কা'বা প্রাংগনে নাসারা পুলিশ– যা একদা কল্পনায় দুঃসাধ্য ছিল।

আমি জোর দিয়ে বলব, বিশ্বের এই পটভূমি প্রত্যেক মানব-কল্যাণকামীর চোখের সামনে থাকা অপরিহার্য। কিসের কল্যাণ? তারজন্যে কি পরিবেশ দরকার? এসব চিন্তা ছাড়া আর সবকিছু ইউটোপিয়া নিয়ে খেলা করা।

সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত ভেঙে গেছে। নয়া ঔপনিবেশিকতার কোমরে আর তেমন জোর নেই। আফ্রিকা-এশিয়ার জনগণের চৈতন্য-পথেই তো এসেছে স্বাধীনতা– তা যতই রুগ্ন হোক না কেন। তার কারণ, আর পূর্বের মত মানুষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

১৯০৭ সনে ঢাকা ও চাটগাঁ বিভাগে লোকসংখ্যা ছিল এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ। তা শাসনের জন্যে তখন দরকার হতো ২১ জন রাজ-সনদপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান আর ১২ জন বৃটিশ পুলিশ অফিসার। কেম্ব্রিজ হতে প্রকাশিত "হিস্ট্রী অপ বৃটিশ ইনডিয়া" গ্রন্থে আরো পরিসংখ্যান আছে। আমার বলার উদ্দেশ্য, জনগণ তখন এতই অধিকার-অচেতন ছিল যে হাতে গোনা যায় ক'টা সাদা চামড়া দিয়েই মানুষকে দাবিয়ে রাখা যেত। অদৃশ্য আততায়ীর ভয়ে ত্রস্ত বালকের নিকট জুজু-শব্দ উচ্চারণই যথেষ্ট। টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সতর্কতা প্রচারিত হয়। (গরম কেটলীর ঢাকনায় বসা বুদ্ধিমানের কাজ নয়) তখন উপনিবেশের মানুষের চৈতন্যে অনেক আলোড়ন ঘূর্ণি তুলেছে। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশময় বিদ্রোহের প্রচণ্ড প্লাবন। জব্বলপুরে সেনাবিদ্রোহ, বোম্বায়ে নৌবিদ্রোহ এবং জনশক্তির মারমুখ সংঘবদ্ধতা দেখে বৃটিশ প্রভুরা সলায় বসেছিল। একটা অপ্রাসংগিক কথা তার আগে বলে দিই। নৌবিদ্রোহের অন্যতম নেতা শিবসাধন গুপ্ত ছিল আমার ছাত্র। শিক্ষকতার দাম মেলে অদৃশ্যভাবে। আবার প্রসংগে ফিরে যাই। সেই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইস্টার্ন কম্যান্ডের প্রধান ছিলেন লর্ড ইসমে। তার কথা হুবহু আজ মনে নেই। তবে তিনি যা বলেছিলেন তার নির্গলিত অর্থ, খেল্ খতম। খাজনার চেয়ে বাজনায় অনেক বেশি খরচ হবে। সুতরাং এদেশ থেকে হাত গুটাও। এসো ফন্দি করে কেটে পড়ি অথচ বুচকি যেন ঠিক থাকে।

পরবর্তী ইতিহাস অনেকের জানা। সাম্রাজ্যবাদী ধড়িবাজেরা এমন চাল চেলে গেছে যে আজও রেহাই নেই। আগে হিন্দু-মুসলমানে লড়িয়ে দিয়ে মজা লুটত, এখন ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ। পাকিস্তান আবার দু-ফাঁক হয়ে গেছে। বৃটিশ পুঁজি কম খাটে না এখনও এদেশে। পুরাতন যা জীইয়ে রেখেই বৃটিশ বিদায় নিয়েছিল। তাই ঘা হলো এখন সাইনাস বা শোষ। ঘা শুকাল না। আর কতো রকমের না চুলকানি বা খাউজানি সহ্য করতে হয়। ম্যাপের উপর সাম্রাজ্যবাদী লাইন টানা। জের : প্রায় সীমান্ত সংঘর্ষ। দহগ্রাম ছিটমহলের কোন্দল। ১৯৪৭ সনে দেশ-বিভাগের সার্ভেয়ার ছিল এক ইংরেজ, নাম র‍্যাডক্লিফ। তাকে পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কোন্ নীতি অনুযায়ী ম্যাপে দাগ টেনেছিলেন? তার জবাব, "তা কি আর আমি জানি?" গত চার দশক ধরে এই উপমহাদেশে নানা রকম বিশৃঙ্খলা, সর্বদা স্থিতিশীলতার অভাব লেগেই আছে। এমন পরিবেশে কোন মানব কল্যাণের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়, সম্ভব নয়। সমাজ-উন্নয়ন কল্যাণেরই অংগীভূত।

রাজনৈতিক দাসত্ব গেছে কিন্তু অর্থনৈতিক পরমুখাপেক্ষিতা আজও ঘোচেনি। এই চেতনাটুকু তৃতীয় বিশ্বের সমাজ সংস্কারকদের থাকা উচিত। তাছাড়া কোন সুষ্ঠু গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব। এই জন্যে বর্তমান বিশ্ব-পটভূমি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামান্য পরিণাহ কন্ট্যুর দিতে বাধ্য হলাম।

৭

আপনারা জেনেছেন অর্থনৈতিক শোষণ পুঁজিবাদের পক্ষে আর উনবিংশ শতাব্দীর মত সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় খোদ যন্ত্রশিল্পে উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই ভোল পাল্টাতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানেও সংগতি-রক্ষায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অন্য নাম 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' বা জন-কল্যাণ রাষ্ট্র। এ সবই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থের ব্যাপার। এখন ইংল্যান্ডে নাগরিক বেকার থাকলে তাকে বেকার-ভাতা দিতে হয়। একথা চার দশক আগে কেউ কল্পনা করতে পারত না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্তমানে এমন ব্যাপক। 'লেসেইজ ফেয়ার ইকনমি' থেকে 'প্ল্যান্ড ইকনমি' বা পরিকল্পিত অর্থনীতি—এই পরিবর্তন বিস্ময়কর বৈকি। গন্তব্যে পৌঁছতে নানা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে মূল নিয়ন্ত্রক যে মানব-কল্যাণ তা আর না বললেও চলে।

প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল-ছেঁড়া স্বাধীন অনুন্নত দেশ আবেষ্টনীর ধাক্কায় কল্যাণমুখী হতে বাধ্য। ক্ষুধার্ত জনের কাছে পূর্ণিমা চাঁদ ঝলসানো রুটি। কবির এই পরিবর্তন বিস্ময়কর বৈকি। গন্তব্যে পৌঁছতে নানা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে মূল নিয়ন্ত্রক যে মানব-কল্যাণ তা আর না বললেও চলে।

প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল-ছেঁড়া স্বাধীন অনুন্নত দেশ আবেষ্টনীর ধাক্কায় কল্যাণমুখী হতে বাধ্য। ক্ষুধার্ত জনের কাছে পূর্ণিমা চাঁদ ঝলসানো রুটি। কবির এই খেদোক্তির পেছনে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ কামনাই প্রকট। ভরপেট মানুষ নানা রকম খেয়ালের ঢেকুর তুলতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত জনের কাছে একমাত্র চিন্তা তো আহার্য। কারণ তাছাড়া তার কল্যাণ কোথায়? জীবনের সকল বিকাশ ও রুদ্ধ হয়ে থাকবে। ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড এ্যালোন। আহারই মানুষের জন্য সবকিছু নয়। হাচা কথা। কিন্তু আহার্য ছাড়া তাদের জন্যে বেশি দিন বাঁচা সম্ভব নয়। একথাও স্মরণীয়।

অনুন্নত দেশে জন-কল্যাণ-রাষ্ট্র নির্মাণ খুবই কঠিন। দুনিয়ার স্বল্প-সংখ্যক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক উন্নত দেশের অধিবাসী। অর্থনীতিবিদদের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দুনিয়ার মালমাত্তার উপর ব্যাপক প্রভাবশালী, সোভিয়েট রাশিয়া বাদ দিয়ে, জনসংখ্যা পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু মোট উৎপাদন ও আয় তিন/চতুর্থাংশের মত। তাদের পুঁজিনিয়োগ নয় / দশমাংশে বেশি। কাজেই উন্নত দেশের সংগে ওদের সম্পর্ক একটি প্রধান বিষয়। অনেক জায়গায় প্রাক্তন গোলামের সংগে মনিবের সম্পর্কের মত। অর্থাৎ একের স্বার্থ অন্যের বিরুদ্ধাচারী।

একটি উদাহরণ তো চোখের সামনে রয়েছে।

কোন অনুন্নত দেশকে যদি 'গ্রোথ' বা প্রবৃদ্ধি পথে নিয়ে যেতে হয় সেখানে সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং যা-তা আমদানি নিষেধ পর্যায়ে রাখতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য উৎপাদনও সংরক্ষিত (প্রটেকটেড) করতে হয়। উন্নত দেশের এসব বালাই নেই। ডিসপেপসিয়া রোগী সব সময় বলবান কুস্তিগীরের আলিংগন এড়িয়ে যেতে চাইবে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়।

তাই উন্নত দেশের হদিস অনুন্নত দেশের জন্য বিষ হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় বিশ্ব জাতীয়তাবাদ ছাড়া এগোতে পারে না কিন্তু যন্ত্রঋদ্ধ দেশে জাতীয়তাবাদের আর দরকার নেই তেমন। অথচ অনুন্নত দেশে রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণের লোকও আছে। আর্নল্ড টয়েনবী মরে ভূত হয়ে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদের ঢক্কাবাদক এই জেনটেলম্যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকে জাহির করছিলেন, জাতীয়তাবাদের দিন খতম। মেনে নিলাম, তা ইউরোপের জন্য ঠিক হ্যায়। কিন্তু অনুন্নত দেশ কি সেই পথে যাবে? অনেক শ্রদ্ধা রেখে বলছি, যারা তার বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ রচনার জন্যে তহবিল ঢেলে দিয়েছিল লাখ লাখ পাউন্ড, তাদের তো টয়েনবী নাখোশ করতে পারেন না। সেই শ্রেণির নিকট নিমক-হারাম তিনি কি করে হবেন? অথচ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, আবেগের রাজ্যে, জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম পাকড়ে আমরা ওই তথাকথিত সভ্য জাতির খপ্পর থেকে মুক্ত হয়েছি, যারা সিন্দাবাদের ভূতের মত আরো কত শতাব্দী আমাদের ঘাড়ে বসে থাকত কে জানে? পণ্ডিত হলেই মানুষ হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। টয়েনবী তার মূর্তিমান নজীর। সাম্রাজ্যবাদীরা বিবেক নিয়েও ব্যবসা করে তা যদি– ডাইডেনের ভাষায়– ওই 'বুকফুল ব্লকহেড' জানতেন। সব বাদ দিলেও অনুন্নত দেশে যেসব ট্রাইব্যাল চেতনা এখনও ছড়িয়ে রয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ কোথা থেকে আসবে? প্রভুপদলেহী টয়েনবী কি তা বুঝতেন না?

হালফিল স্বাধীন অধিকাংশ দেশে জাতীয়তাবাদের মত সমন্বয়-সাধক মর্মতেজ আজও একান্তভাবে অপরিহার্য। প্রথমে তো একজাতি হওয়া দরকার। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্য কোন পরিবেশে সম্ভব নয়।

জনসাধারণকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা থেকে তুলে আনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে সমবেত যৌথ ব্যষ্টি (ইউনিট)-তে পরিণত হওয়া একান্ত দরকার। এমন মানস-পরিবেশ থেকে উদ্বুদ্ধ হয় দিব্যদৃষ্টি নতুন সমাজগঠনের। যৌথভাবে কর্মোদ্দীপনা সেখানেই নিহিত।

ভারত কি পাকিস্তান কেটে হলো দুই ফালি– তার কারণ নেতৃত্বে অনুসারীদের মহান কোন চেতনার মুখোমুখি তুলে আনতে পারেননি। অবিশ্যি আদর্শের বুলি প্রচারের কমতি ছিল না। কিন্তু পিছনে সদিচ্ছার অভাব তো ছিলই। মহৎ উদ্দেশ্য সংঘবদ্ধকরণ বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'মবিলাইজেশান'– তা করতে না পারলে কোন আদর্শই বাস্তবায়িত হতে পারে না। বিশেষত সভ্যতার বিবর্তনে যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের বিশ্বের উন্নত দেশের পাশাপাশি ঠাঁই পাওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদ এখনও এক বিশেষ শক্তিশালী প্রেরণাদায়ী মন্ত্র।

সাধারণত অনুন্নত দেশের মানুষ এখনও নানা বিচ্ছিন্নতার শিকার। কতো রকমের সম্প্রদায় না আছে। আবার মশারির মত– ঘরের ভিতর ঘর– একই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর বর্ণগত ধর্মীয় ব্যবধান বর্তমান। এই দেশে জেলাওয়ারী কি এলাকাওয়ারী প্রবণতা দেখা যায়। তার মূলে রয়েছে জাতীয়তাবাদী বিকাশের অসমাপ্ততা। গ্রাম শহর সম্প্রদায় ইত্যাদি কোন্দলে আটক মানুষের চেতনার পরিসর-বিস্তারে জাতীয়তাবাদীদের প্রয়োজন আজও ফুরোয়নি। রাজনৈতিক ব্যষ্টিরূপে (ইউনিটরূপে) দেশকে সংহতি দানে তা অবশ্যি অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় এই চেতনাই ছিল অনুন্নত দেশে বিরাট মোক্ষম হাতিয়ার। মবিলাইজেশনের সেই অস্ত্র কখনও কখনও বিপথগামী হয়। তাও জানা দরকার, কেন হয়?

অনুন্নত দেশে ক্ষমতাসীন সুবিধাভোগীরা মাঝে মাঝে নিজেদের দুর্নীতিপরায়ণ অযোগ্যতা ঢাকা দেওয়ার জন্য জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নেয়। তখন প্রচার করা হয়, দেশের তাবৎ পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা। অথবা, তখন যদি কোন প্রতিযোগী রাষ্ট্র কাছে থাকে যাদের সংগে ছোটখাটো বিরোধ বাধে, তাহলে আরো তোফা। তখন জনগণকে তাদের দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধের উৎস এমন জায়গায় নিহিত। সাধারণ মানুষের হতাশা নিষ্ফলতাবোধ ফ্রাস্ট্রেশন-জাত উষ্মা তখন শাসকদের দিকে না গিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পানে ধায়। গদী আঁকড়ে পড়ে থাকার এই ফিকির বহু পুরাতন। তাই জন-কল্যাণ-ব্রতী সংস্কারকের দৃষ্টি অন্ধ উন্মত্ত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত।

সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন কামড় আর নেই। তবু ফন্দী-ফিকিরে তারা আর্থিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার তালে ঠিক থাকে। প্রত্যেক দেশে তাদের প্রজেন্ট তৈরি করা হয়। তাদেরই সাহায্যে তারা নিজেদের 'মেটেরিয়াল' লোভ-লালসা পরিতৃপ্ত করে। পূর্বে একথা উল্লেখিত। এই সংগে যোগ করা যায় আরো একটি ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁচামাল কিনুক কি পুঁজি নিয়োগ করুক, নিজেদের বুচকী সামাল দিতে তারা কখনও পিছ-পা নয়। কোথাও পুঁজি ঢেলে, দেখা গেল, স্থানীয় সরকার সব জাতীয়করণের চেষ্টা পাবে। তাহলে তো সমূহ ক্ষতি। তা ওরা ঘটতে দিতে পারে না। সেই জন্যে অনুন্নত দেশের রাজনীতির উপর ওদের প্রভাব পড়তে বাধ্য। অনুন্নত দেশের রাজনীতি কি রূপ নেবে, তা পুঁজিনিয়োগকারীর দায়িত্বের আওতায় আসে বৈকি। ব্যবসা-বাণিজ্য তো বদান্যতা নয়। কোন উন্নত দেশ অথচ পুঁজিবাদী নিঃস্বার্থিকভাবে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের উন্নয়ন এগিয়ে এসেছে, আজও দেখা যায় না। মার্কিন-ভিয়েতনাম যুদ্ধে এক পর্যায়ে আমেরিকার যা ব্যয় হতো তা সমস্ত অনুন্নত দেশের বাৎসরিক বাজেটের সমান। এই একটি ব্যাপার থেকে ওদের হালচাল বুঝে নেওয়া উচিত। এক মহান জাতি, সভ্যতায় কতো উন্নত কিন্তু বিশ্ব-পর্যায়ে ঠিক মাস্তান-গুণ্ডারও অধম।

ওরা অনুন্নত দেশের মংগলকামী আদৌ নয়। অথচ উন্নয়ন-অর্থনীতির কথা (ডিভলাপমেন্ট ইকনমি) কথা রোজ বলে, পরামর্শ দেয়, সলা দেয়। এই সলা পরামর্শ নয় অন্য শলা– তালব্য শ' দ্বারা উচ্চারিত। কিন্তু প্রবৃদ্ধি-অর্থনীতির দিকে ওরা যেতেই দেয় না। টালবাহানা তো করেই। বাংলাদেশের 'পেট্রোকেমিক্যাল' ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠতে পারে সহজে। তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে লক্ষ্যে কোন উন্নত দেশ এগিয়ে আসে না। কৃষি উন্নয়নে তাদের সায় ষোল আনা। আন্তর্জাতিক মনিটারি ফাণ্ড, ওয়ার্লড ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সবই পুঁজিবাদী দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। 'চাষীর ব্যাটা চাষা থাক/ তুই কেন রাজাতে চাস শাঁখ? বাংলা প্রবাদ।

বিভিন্ন নেশন-স্টেট বা জাতিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব যদি বিভিন্ন জাতি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে এবং যার মূলমন্ত্র হবে মানব-কল্যাণ– তাহলে হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী অভিশাপমুক্ত হতে পারে। সোয়েডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মার্দাল মনে করেন, ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার স্টেট গড়ার চেয়ে বিশ্বকল্যাণ রাষ্ট্র গড়া ঢের বেশি দুরূহ।

জাতিক রাষ্ট্র থেকেই 'কোল্ড ওয়ার বা ঠাণ্ডা যুদ্ধের" সুত্রপাত। পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত– সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী। নৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কোথাও দাঁড়াতে পারে না। পৃথিবীর যেখানে যত 'অথারিটেরিয়ান স্বৈরাচারী' সরকার আছে তার মদৎগার পশ্চিমা গণতন্ত্রের কীর্তনকার মার্কিন দেশ। তাদের স্যাঙাৎ চিলির পিনোচেট, কৃষ্ণাংগদের রক্তশোষক আফ্রিকার শাসকবৃন্দ অগয়রহ। একদা ইরানের শাহ ছিল মার্কিন 'পেট বয়'। তিনি প্রথম মসজিদে ইমাম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পোঁ ধরেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D প্রাপ্ত শাহ সাহেব কি রকম ধার্মিক সৎ, বিশ্ববাসী জানে, শেষে দেশ থাকে তাড়িত ইদুরের মত অক্কা পান, যখন তার মুরুব্বী মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারও তাকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। শাহ কেন হঠাৎ ধর্মভীরু হয়ে পড়েছিলেন পঁচিশ বছর ধরে স্বৈরাচারী জালেমের ভূমিকা-পালনে, তা আপনারা জানেন।

মানব-কল্যাণকামী প্রত্যেকের চিন্তা কোন ছোট এলাকায় বর্তমান যুগে কুক্ষিগত রাখা অর্থ অনর্থক পণ্ডশ্রম বা ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনার চরিতার্থতা সম্পাদন। সজ্জন কি ধার্মিক হওয়া বর্তমান যুগে বড়, বড় কঠিন। এত রকমের ফ্যাসাদ বাধাবিপত্তি সম্মুখে। সবচেয়ে আরো মারাত্মক আশঙ্কা মানুষের সৃষ্টি আণবিক দানবের আবির্ভাব। স্বার্থের হানাহানি থেকে যুদ্ধের উৎপাত জনসাধারণ নরাকার শয়তানদের দুর্ভোগ সহ্য করে এসেছে। কিন্তু এবারকার যুদ্ধ তো বিশ্বধ্বংসী, মানবতাধ্বংসী। "উইট আউটউইটস্ ইটসেলফ"— বুদ্ধি নিজেকে হতবুদ্ধি করে ফেলে। জ্ঞানের জগতে মানুষের উপস্থিতি বিস্ময়কর। কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে এখনও বহু দূর সফল বাকী। এতদিন মানুষ পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই মারফত যুগযুগান্তের পথ অতিক্রম করেছে। আপোস করেনি প্রকৃতির সংগে সংগ্রামের।

এবার মানুষ আপোস করবে, কে তার গ্যারান্টি দেবে?

৮

কল্যাণের পটভূমি ও রূপায়ণের পথ-সন্ধানে অনেক দূর এসে পড়েছি। আমার কাছেও খটকা বৈকি। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, রাজনীতির সংগে অর্থনীতির সংগে কল্যাণের সম্পর্ক কতটুকু? আধুনিক যুগে নির্বস্তুক বা abstract কল্যাণের আলোচনা অবান্তর। এমনকি ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগী থেকে তা দেখাও পাপ, এই জন্যে যে খামখা তেমন সদিচ্ছা পোষণ করে লাভ কি? চুরি না থাকলে পুলিসের প্রয়োজন হতো না। চৌয-বৃত্তির উৎস কোথায় না জেনে এমন কথা বলে বিবেককে চোখঠারা যায় অথবা কাল্পনিক স্বর্গ গড়া চলে।

গোটা পৃথিবী নয়, বিশ্বে নিরন্নের সংখ্যা গণনাহীন এমন কি বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি অর্থনৈতিক শীর্ষে খাড়া আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত জন কি বেকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অথচ প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির ভূত ওসব দেশের ঘাড় থেকে নামেনি। অনুন্নত দেশে কিন্তু এই ভূতের দরকার আছে। কারণ ইউরোপের কাছ থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেছে যে জীবন-যাপনের ধারা সহজ হলে, অনেক ধরনের নৈতিকতা স্বতঃস্ফূর্ত ফুটে ওঠে। পানির কলের গোড়ায় পানি নিয়ে গালাগালি মারামারি অনেক সময় খুন অন্তত ইউরোপে কোথাও দেখা যাবে না। ন্যূনতম ম্যাটেরিয়াল বেসিস বা জড়-ভিত্তি থাকলে মানুষ অনেক ভালো ও সৎ হয়ে যায়। খবরের কাগজগুলো যে ওদেশের রাস্তার ধারে বিক্রির জন্য পড়ে থাকে, কোন লোক থাকে না, তা যেকোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যুরিস্টের চোখে পড়বে। এই নৈতিকতার বুনিয়াদ কোথা থেকে এলো?

ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে পা দিলেই দেখবেন, সেই নৈতিকতার নামগন্ধ নেই। অথচ ধর্মের জিগীর প্রতিদিন– এখনও চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ এদেশে একজন পরহেজগার ব্যক্তিরূপে খ্যাত। তিনি ১৯৫০ সনে– সনটা মনে রাখবেন– কাবা শরীফের প্রাংগণে ওজু করতে গিয়ে প্রস্রাবের গন্ধে তাঁর উক্ত মহৎ বাসনা পরিত্যাগে বাধ্য হন। তাঁর 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' পুস্তকে ঘটনাটি পড়ে মর্মাহত, ওঁকে সাক্ষাৎ মত জিজ্ঞাসায় তিনি এই অধমকে বলেন, "– আমি প্রকৃত ঘটনা লিখেছি।" ১৯৬২ সনে সৌদি আরবে আরব-মার্কিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা। তেল-উত্তোলক নাসারাদের মহিমায় তারপর ছাব্বিশ বছরে ওদেশে কি হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রতিদিন টেলিভিশনে অন্তত নামাজের সময় কাবা শরীফের আলোকমালার ঝলমানিতে আপনি তাজ্জব হবেন। ওই সব দেশের অন্ধকার প্রাক্তন শহরগুলো এখন রাত্রে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। অধ্যক্ষ খাঁ সাহেবের বর্ণিত হালৎ নিশ্চয় আর এখন নেই।

নৈতিকতার জড়ভিত্তি যারা অস্বীকার করে তারা জেগে ঘুমায়। প্রক্রিয়াশীলদের এই এক পন্থা জনগণকে বঞ্চনায় এবং তাদের চোখে ধূলা দিতে।

কিন্তু প্রবৃদ্ধি (গ্রোথ) ভূত ঘাড়ে চাপার ফলে উন্নত দেশের কি অবস্থা হয়েছে তা অনেকে জানেন। ওই দেশের মনীষীরা প্রায়ই সতর্কবাণী ছাড়ে। অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দুর্ভোগ। মটোর গাড়ী আছে। কিন্তু যান-জট (ট্রাফিক জ্যাম) এবং পার্কিয়ের সমস্যায় বাহনটি আর আরামপ্রদ মেশিন নয়। উপকূলীয় শহরগুলো ক্রমশ বিশ্রী, বাতাস দূষিত। নদীগুলো পংকিল ড্রেনের ময়লায়, বিষাক্ত নদীতীর। নদীতে ফালতু জঞ্জাল (ওয়েস্ট) ফেলতে হয়। কীটনাশক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহারে বনের পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ শেষ ; বন-উজাড়নের ফলে পারিবেশিক (ইকলজিক্যাল) ভারসাম্য বিনষ্ট। পশ্চিম দেশের বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক মহল থেকে প্রতিবাদ উঠছে হরদম। 'গ্রীন হাউজ এফেক্ট' এর জন্য বায়ুস্তরে 'ওজোন" হ্রাস হওয়ার ফলে ক্যানসার ছাড়া আরো নানা রাগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। শুধু তাই নয় পরবর্তী প্রজন্মেও সেই রোগ দেখা দেবে। এসব আবার নাকি আণবিক বোমা বিদারণের ফল।

ইউরোপীয় এমম্বিধ জীবনের জন্য অর্থনীতিবিদ মনে করেন প্রবৃদ্ধির পথেই সমাজ-কল্যাণ নিহিত– এ ধারণা ভুল। তারা মনে করেন, বেছে বেছে প্রবৃদ্ধি ঠিক করতে হবে যেন মানুষের ঘরদোর গাছপালা এমনভাবে গড়ে ওঠে যে জীবন-যাপন আরামপ্রদ ও সুখের হয়। ইন্ডাষ্ট্রি ও যানবাহনের দিকে শুধু নজর থাকলে চলবে না।

কিন্তু অনুন্নত দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যে-জড়ভিত্তি দরকার সেখানে প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। সংগে সংগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো নানা দিকে দৃষ্টি প্রদান একান্তই দরকার। জাগতিক কল্যাণ অপরিহার্য এই জন্যে যে তার সংগে নৈতিকতা জড়িত। তা আলাদা নিরালম্ব কিছু নয়। জাগতিক কল্যাণ পথে পা বাড়াতে হবে খুব সতর্কতার সংগে, যেখানে প্রবৃদ্ধিই সবকিছু নয়। নচেৎ কল্যাণ অকল্যাণরূপে তাণ্ডব নাচতে পারে।

আমি দৃষ্টিহীন কল্যাণকামীদের এক নতিজার (পরিণামের) উল্লেখ করছি অভিজ্ঞতা থেকে, সদ্য প্রাপ্ত পাকিস্তান এবং ধর্মে দোহাই মেরে। ধর্মীয় রাষ্ট্রে তো পাপ কাজ চলতে দেওয়া যায় না। বেশ্যাপল্লী কি করে অমন রাজ্যে থাকতে পারে। অতএব শহরের বারাংগনারা উচ্ছেদের ঠ্যালায় পড়ল। রাতারাতি বেশ্যাপল্লী হয়ে গেল খাস জমি অর্থাৎ মালিকের জমি। নেপথ্যে জানা গেল, শহরে জমির দাম প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। বেশ্যাপল্লীর আয় ভাড়া ওঠাতে গুণ্ডাপাণ্ডা পুষতে হয়। সুতরাং মালিকের ধর্মপ্রাণতার পেছনে অমন হিসাব ছিল না, তা হলফ করে বলা দায়। মোট কথা, নিষিদ্ধ পল্লী অবারিত মহল্লায় পরিণত হলো। কয়েক মাস পরে দেখা গেল, হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেলেও ব্যবসাদারগণ কিছু কিছু পুরাতন মহাজনদের কৃপা লাভ করে। এখানে তেমনই কিছু ঘটল বৈকি। দেখা গেল, বারবনিতাদের ব্যবসা শহরে জমে উঠেছে। পূর্বে ব্যবসা ছিল কেন্দ্রীভূত এবার হয়ে পড়ল বিকেন্দ্রীভূত। ডিসেন্ট্রালাইজড। ছোঁয়াচে চামড়ার ব্যাধি যেমন শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা বিস্তার লাভ করে, মজকুর নগরের দশা তাই হয়ে পড়ল অতঃপর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মরণীয় : পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী/বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে, নগরময় ছড়িয়ে গেল ব্যভিচারের লাভা। এমন ফল তো কল্যাণকামীদের কাম্য ছিল না।

বর্তমান যুগে কল্যাণকামনার পেছনে নানা ভাবনাচিন্তা অপরিহার্য। খামখেয়ালীপনার কোন জায়গা নেই এই ক্ষেত্রে। আধুনিক জগৎ আর এক নতুন জগৎ। সেখানে অতীতের কিছু ছিঁটেফোঁটা পাওয়া যেতে পারে মানসলোকে। কিন্তু জড়লোক তো সম্পূর্ণ আলাদা। আগে উল্লেখিত কয়লা-লোহার জগৎ থেকে ইলেকট্রনিক্স ও সাইবারনেটিক্সের প্রাংগণে পদার্পন। কাজেই খেয়ালীপনা অচল। কতো রকমের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় অনুন্নত দেশের মানুষকে। অবিশ্যি প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন আমাদের 'ডিভলপিং' উন্নয়নীল দেশ বলে খাতির করে।

প্রবৃদ্ধি অর্থনীতি ছাড়া মুক্তি নেই। কিন্তু সেপথে এগোতে গেলে উদ্দীপক– ইনসেনটিভ– যোগাতে হবে। না হলে কেউ কেন ভবিষ্যতের কথা ভাববে? এ যুগে সঞ্চয়ের একটি বড় উদ্দীপক টাকা জমানৎকারীর সামনে সুদ। সুদ আদান-প্রদান ধর্মসিদ্ধ নয়। নৈতিক এই এক উভসংকট। অবিশ্যি সব মানুষ সজ্জন হয়ে গেলে তো আর কোন সমস্যাই থাকত না। গাঁয়ের অবিবাহিত চাষী দেবর বলেছিল, "ভাবী সাহেবেরা ভাইসাব হইয়া গেলে আমরা সবাই একত্রে ঘুমাইতে পারিতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তো কল্পনা জগতের ব্যাপার। বাস্তব জগতের সমস্যা-মোকাবিলায় স্বপ্নের কোন জায়গা থাকে না।

উনিশ শতকে ছ'য়ের দশকে কার্ল মার্কসের সঙ্গে পি.ভি. আনেকোভ নামক এক রুশ বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ভদ্রলোক তার অভিজ্ঞতার এক বিশদ বয়ান লিখে রেখে গেছেন। সেই সময় মার্কস এক শ্রমিক নেতার সাথে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা চলাকালে হঠাৎ শ্রমিক নেতার কি এক মন্তব্যে বেশ উত্তেজিত এবং শ্লেষের সংগে মার্কস বলে ওঠেন যে, কাজে নামার পূর্বে কোন সুষ্ঠু এবং বিবেচনা-সম্মত ভিত্তি ছাড়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা স্রেফ সহজ প্রতারণা–আর কিছু নয়। আনেকোভের রচনায় মার্কসের মুখজবানি শুনুন, "... The awakening of fantastic hopes would never lead to the salvation of those who suffered, but on the contrary to their undoing. To go to the workes in Germany without scientific ideas and concrete doctrine would mean an empty and unscrupulous playing with propaganda, which would invertably involve, on the one hand, the setting up of an inspired apostle and on the other hand, simply asses who listen to him with gaping mouth."

বাংলা তর্জমায় : "উদ্ভট আশায় চেতিয়ে দিলেই নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আসবে না। বরং ফল হবে বিপরীত। সর্বনাশ হবে ওদের। বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং নিরেট মতবাদ ব্যতীত জার্মান শ্রমিকদের নিকট যাওয়া মানে হুজুগ নিয়ে ফাঁকা, বিবেক-বর্জিত ধরনের খেলা। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, একদিকে গজিয়ে উঠবে প্রেরণাদীপ্ত ভগবদবাণী-প্রচারক দূত অন্যদিকে সেখানে দেখবে স্রেফ আহম্মক গর্দভ যারা হাঁ-করে তার কথা শুনছে"।

মানব-কল্যাণের এক অপূর্ব সুযোগ বর্তমানে মানবগোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত। কোন দেশের মানুষ আর বিচ্ছিন্ন জীব নয়। ইউরোপ প্রকৃতির উপর রাজত্ব করার পথে আর স্বদেশের সীমানায় আটক থাকতে পারেনি। তা অবশ্যি কোটি কোটি মানুষের দুর্দশার কারণ হয়েছে। কিন্তু জগৎকে এক অখণ্ডতায় বেঁধেছে। তা অস্বীকার করা যায় না। মেশিন-বদৌলত এই গ্রহ-বিজয় তাদের কীর্তি। তার মূলে প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি বর্তমান। আধুনিক কালে যন্ত্রশিল্পে অগ্রসর জাতিগুলো নিজেদের সমস্যা সমাধানে হিসাব-নিকাশ নিতে বাধ্য। বহুবার উল্লেখিত উনিশ শতকের মত শোষণ আর কোথাও সম্ভব নয়।

এইখানে আসে রাজনীতির কথা। পুরাতন কলংকিত পৃথিবী মুছে ফেলে নতুন দুনিয়া গঠন তাছাড়া উপায় নেই। রাজনীতি যখন ভাবের আদানপ্রদান, মেলামেশার সুযোগ করে দিতে সক্ষম হবে তখনই পত্তন হবে নয়া-দুনিয়ার প্রথম ধাপ। মাত্র পঁচিশ বছরের ব্যবধানে ইউরোপে দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছ। প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত, কিন্তু নৈতিকতায় অশেষ অশেষ গরমিল। যার ফলে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়া সভ্যতা ধসে যাচ্ছে। একথা মেনে নেওয়ার সময় এখন আগত। অন্যথায় বিশ্বধ্বংসের হাত এড়ানো কঠিন।

ওদেশের চিন্তাবিদরাই মনে করেন, বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের (বায়োলজি) উপর জোর দেওয়া উচিত। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার উদ্ভাবন বিজ্ঞানের সূত্র থেকে এসেছে। টেলিফোনের রিসিভার মানুষের কানের গঠন আদর্শে তৈরি। জীবজন্তুর নড়াচড়া-ওড়ার হদিস নিয়ে গবেষণা পরীক্ষা শুরু হয়। তারই পরাকাষ্ঠা বর্তমানে 'সুপারসোনিক' বিমান।

তাছাড়া প্রাণীবিজ্ঞান-প্রসূত জ্ঞানের ফলে খাদ্য-উৎপাদন এবং মানুষের আহার্যের প্ল্যানিং সম্ভব হচ্ছে। আহারের জন্য খাদ্য এখন প্রচুর উৎপাদন করা যায়। ফলে, গড়পড়তা মানুষের আয়ু এখন সব দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশা করা যায় মানুষের যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যাবে। আগ্রহ যদি নৈতিকতা ও নন্দন-শাস্ত্রের দিকে যায় (To ethics and aesthetics) তাহলে মেশিন ও মেশিনজাত চিজের উপর মানুষের আকর্ষণ নিশ্চয় হ্রাস পাবে। অবসর কাঠানোর জন্যে লোক যদি মটোরে শত শত মাইল দূরে বেড়ানোর চেয়ে বই পড়ে, ছবি এঁকে গান শুনে আনন্দ পায়, স্বভাবই মটোরের চাহিদা কমে যাবে। প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির ভূত তখন অনেকখানি শায়েস্তা হতে বাধ্য।

মানুষের বাসনা-কামনা যে অনুপাতে বেড়েছে এবং তা মেটাতে পেরেছে সেই অনুপাতে নাকি তাদের পরিতৃপ্তি (satisfaction) বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নোংরা ধারণা থেকেই মানবগোষ্ঠীর অশেষ দুঃখদুর্দশার উৎপত্তি। কিন্তু দেখা যায়, পরিমিতি এবং অনতিক্রম্য গণ্ডিই (রেসট্রিকশান) মানুষের অস্তিত্বের সব ক্ষেত্রে মঙ্গলপ্রদ। এক বিদেশী মনীষীর লেখায় পড়েছিলাম যে পশ্চিমী সভ্যতায় সংখ্যাগত আকর্ষণ-অনুরাগের জায়গা নেবে গুণগত আকর্ষণ অনুরাগ। পূর্বে জড়-বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবার তা দেখা দেবে সমাজতত্ত্বে এবং ব্যক্তিত্ববিজ্ঞান বা 'পার্সনোলজিতে'– যেসব বিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের মেথডলজি বা প্রণালীবিজ্ঞান অনুসরণ করে না।

উক্ত মনিষী আরো মনে করতেন যে পাউয়ার-ক্ষমতা এবং অবসর তাৎপর্যহীন, যদি না আমাদের অবসর ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিত্ব এবং সমাজ-সম্পর্কে সেই সব উপাদান গড়ে তুলতে না পাউয়ারের একরোখা অনুসরণে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে-সরিয়ে রাখা বা বিকৃত করা হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেরণার মধ্যে যে নিকট সম্পর্ক বর্তমান– তা জানা এবং সেইভাবে সমাজ-পরিচালনা আমাদের সামনে দাবিদার মানব-কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক দক্ষতা যেমন প্রয়োজন তেমনই অপরিহার্য দার্শনিক দিব্যদৃষ্টি। ডস্টয়ভস্কি তাঁর 'ব্রাদার কারামজোভ' উপন্যাসে প্রশ্ন তুলেছিলেন, পৃথিবীতে নিরীহ জনেরা, নিষ্পাপেরা কেন এত কষ্ট পায়? কল্যাণ, অকল্যাণ কোথা থেকে আসে? নিষ্পাপ নিরীহ জন দুঃখের বোঝা বহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কেন? কেন? তবে কি ঈশ্বর নেই? অথবা তিনি নিজেই অমংগল? দার্শনিকসুলভ এই জিজ্ঞাসা। আমি জবাব দিতে অক্ষম।

এখানে জানিয়ে রাখা ভাল, পুরাকালে ধর্ম যে ভূমিকা পালন করত, বর্তমানে রাজনীতি মানব-কল্যাণের সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ হ্যারোল্ড ল্যাস্কি অনেক কাল আগে লিখেছিলেন যে কোন সমাজে মূল্যবোধের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিকদের মধ্যে সেই সব অভ্যাসের উন্নতিবর্ধন যা ক্রম-বিস্তৃতমান কল্যাণের সুযোগ করে দেয়। বড় দামী কথা। তিনি আরো বলেছিলেন, দুভাবে মূল্যবোধের দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। এক, যুক্তিপরামর্শ দ্বারা রাজী করানো। দুই, জবরদস্তি। তবে বর্তমান যুগে জবরদস্তি খাপ খায় না। কারণ, প্রযুক্তিগত পরিবেশে প্রগতির জন্যে শান্তি দরকার। জনগণের উপর যা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তা শেষ পর্যন্ত শাসকদের প্রতি আর আনুগত্য রাখতে সাহায্য করে না। পরিণাম : সামজিক আলোড়ন। তখন আবার নতুন মূল বোধের নতুন দায়িত্ব অর্পণ দরকার। তাই ল্যাস্কি বলেন, সামাজিক কাঠামোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এমন এলাকা বাড়ানো যার ভেতর মানব-সভ্যতার মূল্যবোধ, সত্য, সুন্দর, প্রেম এবং ব্যক্তির নিজকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি উপলব্ধির সুযোগ থাকে। এই উপলব্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন শান্তি, সামাজিক "স্টেবিলিটি" বা সুস্থিতি।

জীবনের অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে। অর্থের ভাষ্য এবং উদ্দেশ্যে সংজ্ঞা– দুয়ে মিলে মানুষকে দেয় পথের হদিস : বাঁচার নীতি এবং উদ্দেশ্য। কীভাবে বাঁচব? কিসের জন্যে বাঁচব? যখন কোন ব্যক্তির সামনে এমন প্রশ্ন খাড়া হয়, তখনই কল্যাণ হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন মুহূর্তেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য হাঁক দিয়ে যান–

এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংস্তূপ-পিঠে চলে যেতে
হবে আমাদের।
চলে যাব, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

এই কণ্ঠস্বর বিশ্বমানবতার প্রতিধ্বনি। জার্মান নাট্যকার তাই যৌথভাবে আহ্বান করেন– একই সময়ে শোনা যায় বার্টোল্ড ব্রেশটের উচ্চারণ:

পৃথিবী পরিত্যাগের পর্বে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো
তুমি শুধু সৎ সুন্দর ছিলে, তা নয়–
নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো
তুমি একটি সৎ সুন্দর পৃথিবীও পেছনে ফেলে যাচ্ছো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজান গাঙের নাইয়া
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১

বিংশ শতাব্দী সমাপ্তির পথে।

বেশি দূর নয় গত একুশ' বছর মুসলিম বিশ্বের স্বরূপের দিকে তাকালে একটি সমস্যা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুসলমান সমাজের প্রধান সমস্যা ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ। ঐতিহ্য অনড় কিছু নয়। যুগে যুগে পরিবর্ধন মারফত তা সজীব থাকতে পারে। নচেৎ ঐতিহ্য আর জাতির জীবনে চালিকাশক্তি থাকে না। পুরাতন ইঞ্জিনব্রেকে (Brake) পরিণত হয়।

আধুনিক বিশ্ব প্রচণ্ডভাবে জটিল। পুরাতন ট্রাইবাল সমাজ সেই তুলনায় ঢের বেশি সরল। যেকোনো উপদেশ, বিধি-নিষেধ সমাজের পক্ষে পালনও খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের যুগের পদে পদে বাধা। উদাহরণত আধ্যাত্মিক জীবন ঐশ্বর্যময় করতে ধ্যান একটি হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমান দুদ্দাড় দ্রুত জীবন-ধারায় তার সময় কোথায়? এবং এ যুগের মানুষ জেনেছে সমাজের জড়-ভিত্তি (material basis) যদি উন্নত করা না যায়, আধ্যাত্মিক জীবন মার খায়। অবসর প্রচুর দরকার জ্ঞান অন্বেষণে, চিন্তার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটাতে। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের পর্যায়ে থাকলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনও পালিয়ে বেড়ায়। ভিক্ষুক আত্মমর্যাদা হারিয়েই ভিক্ষুক হতে পারে।

আধুনিক বিশ্বে যন্ত্রশিল্পের পত্তন ছাড়া জাতীয় জীবনে কোনরকম উন্নতি সম্ভব নয়। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে যেন আত্মিক শ্রীবৃদ্ধি গাঁঠছড়া বেঁধে বসে আছে। সোজা কথায় বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া কোন আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলা অসম্ভব। এই জন্যে বর্তমানে দেখা যায়, ধর্মভিত্তিক যেসব রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদেরও অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম তুলে ধরতে হয় জনসাধারণের সম্মুখে। অথচ, কথায় কথায় বলা হয়, ধর্ম মানুষের উন্নততর জীবনের সোপান, সেখানে জাগতিকতা মানুষকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, আধ্যাত্মিকতারও জড়-ভিত্তি অপরিহার্য। ভিক্ষা দিলে পণ্য সঞ্চয় হয়। এই পুণ্য অর্জনে বিত্ত তো অপরিহার্য। নচেৎ ভিক্ষে দেবে কোথা থেকে?

যদিও বর্তমানে ধর্মভিত্তিক পার্টিগুলোর অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম আছে, এককালে তেমন চিন্তা ছিল সমাজদ্রোহিতা। এই দেশে খুববেশি দিনের কথা নয়, বিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানেরা ব্যাংক-ইনসিওরেন্সে টাকা খাটানো গুনা মনে করত। কারণ, সেখানে সুদের গন্ধ আছে। প্রথমত অনেকে ব্যাংকে টাকা রাখত না। আর যারা রাখত তারা সুদ দিত না। আজও এমন দু-চারজন আছে, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ সম্পর্কে গোড়ায় উল্লিখিত। উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট বুঝা উচিত। ঐতিহ্যের বিস্তারপথ এত সহজে তৈরি হয় না। আরব দেশ ১৯২৭ সালের দিকে টেলিফোন ব্যবহারের বিরুদ্ধে রীতিমত। দাংগা-হাংগামা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কারণ, তা শয়তানের ফিসফিসানি। প্রায় ওই কালে বাদশা আমানুল্লাহ খান রেডিও চালু এবং মেয়েদের শিক্ষার জন্যে আধুনিক পদ্ধতি চালু করেন। কিন্তু তা এগিয়ে নিতে পারলেন না, রাজ্য হারালেন।

এই ধারায় আরো একটি দৃষ্টান্ত মনে রাখা দরকার। ১৯৩৬ সাল তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক যখন তুর্কী ভাষায় পবিত্র কোরান অনুবাদ করাতে চান, তখন একটি লোকও পাওয়া যায়নি। ধর্মগ্রন্থ আরবী। সে ভাষার সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের পরিচয় নেই। এমন ক্ষেত্রে সে পাঠ মনের সঙ্গে যোগ হয় না। মাতৃভাষা শুধু অমন যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এক যুগে প্রচুর বাধা ছিল সব দেশে। এদেশেও পবিত্র কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক কোন মুসলমান নয়। প্রথম তর্জমাকারক গিরীশ চন্দ্র সেন– যিনি তাঁর চরিত্রের ঐশ্বর্যে ও উদারতায় মানুষের কাছে 'ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন' নামে পরিচিত ছিলেন। বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার আচ্ছন্নতায় অনেকের কাছে ব্যাপারটা আজগুবি হতে পারে।

ঐতিহ্য যদি নতুন জীবন ধারার সঙ্গে মিশে যেতে না পারে তাহলে তা সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিগত দেড়শ' বছর ধরে ফলে সামাজিকভাবে অপর সম্প্রদায় কি নিজ সম্প্রদায়ের ভেতর আত্মদ্বন্দ্ব বিদঘুটে রূপে চালু আছে। শিয়া-সুন্নীরা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে লড়ছে। ওদের কোন চৈতন্য হয় না। কিন্তু জীবন নিরন্তর প্রবহমান। তাই দেখা যায়, ঐতিহ্যের সম্প্রসারণবাদীরা শেষ পর্যন্ত জেতে, হেরে যায় বিরোধীরা। কিন্তু ওদের দাপট থামে না। রক্তবীজ রাক্ষসের কাহিনীর মত যুগে যুগে ওদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নজরুল ওদের হাতে কম নাজেহাল হননি। অতীতের কাহিনী অনেকে জানেন। তবু আবার শুনে রাখুন। "জারজ", "শয়তান" ইত্যাদি নানা অশালীন গালি বর্ষিত হয়েছিল মুসলমান সমাজের ক্ষণজন্মা এই প্রতিভাধর মানুষটির উপর। বর্তমানে তিনি আমাদের "জাতীয় কবি" রূপে পরিণত। মৌলবাদীরা চিরকাল কালের হিসেবে আনাড়ী। কালের পদাঘাতে ওরা সিধা হয়। বর্তমানে ঢাকায় পেটোদম, বগল-উদম কতো তরুণী দেখা যায়। আর কেউ প্রতিবাদ করে না। এককালে স্কুলে যেতে বন্ধ ঘোড়ার গাড়ির উপর মশারি চাপিয়ে মেয়েরা চলত।

ঐতিহ্যের সম্প্রসারণে বড় বাধা এইসব জীবন-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলবাদ এ যুগের ব্যাধি নয়, তা মুসলমান সমাজে সর্বকালের ব্যাধি। ওদের তাড়নায় মুসলমান সামজের এমন পশ্চাৎপদ দুর্গতি। মার্কিন-রুশ নভোচারীগণ যখন চাঁদের বুকে বুটে চিহ্ন রেখে আসে, তখন দুরন্ত গ্রীষ্মের দিনে ক্লান্ত লবেজান আমার দেশবাসী ভাই রিকশা টানে এবং প্যাসেঞ্জার হিসেবে কতটুকু লজ্জা অনুভব হয় না আমাদের।

ইংরেজ এক লেখক রসিকতা করে লিখেছিলেন (নাম মনে পড়ছে না), ওরা ইহুদী নাসারার বিরুদ্ধে খুব 'ওয়াজ" করে, কিন্তু ইহুদী নাসারার আবিষ্কার (মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন তো দূরের কথা) ছোটখাট গেরস্থলি জিনিস যথা ছুরি কাঁচি, প্যান ইত্যাদি ব্যবহারে কোন লজ্জা পায় না। বিলাতী জিনিসের কদর খুব বেশি। হোন্ডা, ভেসপা বা ওই জাতীয় গাড়ি চালায় ওরা। কিন্তু ভাবতে অক্ষম যে কওমের বড়াইয়ে স্ফীত সে ফুলে- ফেঁপে, সে-কওমের মগজে ওসব আবিষ্কার এখন বন্ধ হয়ে গেছে কেন?

২

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তৃতীয় বিশ্বের কাছে এখন স্পষ্ট ধরা পড়েছে, য়ুরোপীয় সভ্যতা এত উন্নত তার কারণ, জড়-জীবন– এক কথায় ইহজাগতিকতাকে তারা অস্বীকার করেনি। আর আমরা তার বিপরীতে মানবেতর পর্যায়ে রয়ে গেছি।

ইউরোপ তার অধ্যাত্মিক জীবন–সোজা-কথায়– ধর্মীয় জীবনকে রাজনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। এই পথেই তাদের বর্তমান ইতিহাস গড়ে উঠেছে। তাই ধর্ম নিয়ে হানাহানি একদম মুছে না গেলেও অন্তত মুধ্যযুগে ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট হিসেবে খ্রীস্টানেরা যে ধর্মযুদ্ধ করত ব্যাপক হারে তার পুনরাবৃত্তি আর কোথাও চোখে পড়ে না।

মুসলমান সমাজ ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিতে অপরাগ। জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে না পারলে ঐতিহ্য শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবোধ উদ্দীপনের বড়ি হয়ে দাঁড়ায়, আজও তা অনেকের উপলব্ধির বাইরে।

এই পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা স্মরণীয়।

মুসলমান সমাজে পথিকৃৎ রাজনীতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখার ব্যাপারে। সেদিক থেকে শুধু চিন্তাবিলাসী ছিলেন তিনি, এমন আর বলা যাবে না। এক নতুন রাষ্ট্রের স্থপতি তিনি। সেই রাষ্ট্রের অন্যতম বনিয়াদরূপে তার ঘোষণায় ধ্বনিত হলো একটি শব্দ : ধর্মনিরপেক্ষতা।

ইসলাম ধর্মের অতীত কাল থেকে আর কোন রাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠ থেকে অকপট এমন প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি যা আন্তরিক ঈমানের প্রতিবিম্বন।

ইউরোপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করলে, কওমের বর্তমান দুরবস্থা কোনদিন ঘুচবে না। মৌলবাদের কল্যাণে একে একে মুসলমান দেশগুলো পরিণত হয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশ– ইহুদী-নাসারার কলোনী। এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে কত বছর না লেগে গেল। গোলামের আবার ধর্ম থাকে নাকি? ধর্মান্ধ জনেরা তা বুঝতেও অক্ষম।

বঙ্গবন্ধুর সমাজ গড়ার স্বপ্ন মরীচিকা হয়ে রইল। বাস্তব রূপায়নের সুযোগ পেলেন না তিনি, দেশী-বিদেশী নরাধমদের চক্রান্ত জালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন অকালে।

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের আরব্ধ কর্তব্য অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেই খেই হাতে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।

চলো, টুংগীপাড়া চলো।

৩

টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমাদের নানা সমস্যা-পীড়িত শ্রীমণ্ডিত হাজার হাজার গ্রামের অন্যতম টুংগীপাড়া। কিন্তু এখানেই ওই পল্লীটির পরিচয় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

শুধু এই উপমহাদেশের মুসলমান নয়, বিশ্ব- মুসলিমের মুক্তি-সনদ ধর্মনিরপেক্ষতা-রূপায়ণের পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্য কৈশোরের লীলাস্থল এবং শেষ বিশ্রামভূমি– এই এলাকা অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানরূপে চিহ্নিত হবে যুগ যুগ, কালে কালে, পৃথিবীর নিকট।

চলো, টুংগীপাড়া চলো।

AMARBOI.COM

গদী বুমেরাং, যদি

১

এই আলোচনার গোড়ায় একটি পুরাতন গল্প বলা দরকার।

গল্পটি যে অতীত কালের সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে হওয়া যায়। কারণ, পটভূমি কালের সঙ্গে জড়িত। ঘটনার আরম্ভ এক গৃহস্বামী এবং মুসাফির বা পথিকের সংলাপ মারফত।

পথিক : জনাব একটি কথা।

গৃহস্বামী : বলুন।

পথিক : আমি–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহস্বামী : আমি কী? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার কাজ আছে।

পথিক : (আরো কাচুমাচু) আমি-

গৃহস্বামী : আমি কী? ঝামেলা–

পথিক : (ঈষৎ দীপ্ত) আপনাদের বাড়িতে মেয়েছেলে আছে?

গৃহস্বামী : তা থাকবে না কেন? আপনার কী দরকার?

পথিক : এখন সন্ধ্যা, আমি রাত্রিবাস করব।

গৃহস্বামী : (ক্ষিপ্ত) শুয়ারের বাচ্চা, রসিকতার আর জায়গা পেলে না। তুই কুত্তার আওলাদ– তুমি... তুমি... তুমি...

পথিক : গালাগাল দেবেন না হুজুর। অধমের কথা শোনেন– অন্তত দশ বাড়িতে ঢুঁ দিয়েছি। হঠাৎ অচেনা জায়গায় এসে পড়েছি, রাত হয়ে আসছে, আমার আশ্রয় দরকার। তাই প্রার্থনা। যে-বাড়ী যাই, তারাই বলে, "মেয়েছেলে আছে জায়গা দিতে পারব না।" তাই আগেই আপনাকে জিজ্ঞেস করলুম।

ঘটনাটি বলাবাহুল্য, আধুনিক যুগের নয়। অতীতে নীতিবাক্যের মধ্যে আছে অতিথি-সেবা, অতিথি-পালনের নানা ফিরিস্তি। কারণ, সে যুগে যত্রতত্র তো হোটেল গজিয়ে উঠত না। সুতরাং সামাজিক মেলবন্ধন যথাযথ রাখার অমন ধারা। যন্ত্রশিল্পের যুগে মানুষের মানস-পরিবর্তন ঘটেছে বৈকি। আগে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে হঠাৎ-ওঠা রেওয়াজ ছিল। এখন যেটুকু আছে তা সামাজিক পশ্চাৎপদতার ফল। ইউরোপে আত্মীয় বাড়িতে হঠাৎ-ওঠা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সেই জন্যে হোটেলের অত ছড়াছড়ি।

পূর্বেই তাই উল্লিখিত, পটভূমির সঙ্গে কাল জড়িয়ে থাকে।

এখন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমাদের পূর্বোক্ত পথিক গালাগাল খেলেন কি নিজের আহাম্মকির জন্যে?

না। সরল মানুষ, তিনি ভেবেছেন, তার বাসনা-পূর্তির জন্যে যা বাধা, তার উল্লেখ পূর্বে করলেই বোধ হয় আর বিড়ম্বনা থাকবে না।

এখন ব্যাকরণের ভাষায় বলা যায়, ভদ্র পথিক সদর্থক থেকে নঞর্থক রাস্তা ধরেছিলেন। ইলেকট্রিসিটির যুগে পজিটিভ-নিগেটিভ এখন চলতি কথায় ঢুকে গেছে। অর্থাৎ পথিক পজিটিভ ছেড়ে নিগেটিভ ধরেছিলেন। ফলাফলের কথা ভাবতে পারেননি।

যে-কোন কাজে এই পজিটিভ-নিগেটিভ খেলা বিদ্যমান। দুটি ব্যবহারের উপর অনেকখানি নির্ভর করে, নচেৎ আমাদের মজকুর মুসাফিকের মত ফ্যাসাদে পড়তে হবে। গৃহস্বামী সেদিন তাকে পেটাতে শুরু করলেও বলার কিছু ছিল না।

হামেহাল যে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা শোনা যায়, তা মূলত এই পজিটিভ-নিগেটিভ প্রয়োগের ফল। দুটি বৈদ্যুতিক তারের মত তাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরিস্থিতিও সেখানে বড় বিচার্য বিষয়। কোন সময় কতখানি প্রযোজ্য তার হিসেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার। সেখানে ভুল হলে যে-কেউ মুসাফিরের দশায় পৌঁছাবে।

কথাগুলো খোলাসা করার জন্যে সমাজ-জীবন থেকে উদাহরণ নেওয়া যায়।

রাষ্ট্র কিভাবে চলবে তা স্থির করার জন্যে প্রত্যেক সভ্য দেশেই নির্বাচন ব্যবস্থা আছে। নানা মত এবং নানা পথের সংঘাত-জাত জুলুম থেকে রেহাই পেতে এই রীতি সকল আধুনিক রাষ্ট্রে প্রবর্তিত। নির্বাচন বা ইলেকশন মোটামুটি একটা দিক-নির্দেশ করে দেয়।

যেহেতু সমাজ বিভিন্ন শ্রেণির উপাদানে গঠিত, সেইভাবে স্বার্থেরও স্পষ্ট এলাকা আছে। এই এলাকাওয়ারী সংঘাত স্বাভাবিক। কৃষকের স্বার্থ এবং জমিদারের স্বার্থ এক হতে পারে না। এই সব স্ববিরোধ মেনে নিয়েও মোটামুটি সমাজ চালু রাখার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়।

ইলেকশনের সময় দেখা যায়, প্রতিপক্ষের যতো রকম দুর্বলতা আছে, তারই তুলো-ধোনা করে এক-এক দল। অধিকাংশ ক্ষেত্র প্রতিপক্ষের মতবাদের ভুল-ত্রুটির উপর প্রচণ্ড এমন চাপ সৃষ্টি হয় যে বিকল্প কি হবে সেদিকে খেয়াল থাকে না। অথবা, বিকল্প সম্ভব কিনা, তা-ও চোখ এড়িয়ে যায়। এমন দৃষ্টিভঙ্গী আসলে নিগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গী। অধিকাংশ নির্বাচনে তা-ই দেখা যায়। চালুনী সুঁচের ছিদ্রের অপযশ কীর্তন করে।

নির্বাচনের মৌসুম চলে যায়। রাষ্ট্রযন্ত্র চালনার ভার কোন দল গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ কোন এক জায়গায় উপমা দিতে লিখেছিলেন যে পুরাতন ঘোড়ার গাড়ী দড়িদড়া দিয়ে সাজিয়ে বেঁধে রাখা চলে, যাতায়াত চলে না। চলার সময় তো এক এক পার্টস এক এক দিকে ধাইবে। আগ্‌লী চাকা যদি যার পশ্চিমে ত পিছ্‌লী চাকা ছোটে উত্তরে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে।

নির্বাচন অন্য কথায়, গদী আরোহণের সিঁড়ি। কোচওয়ানের সীট নির্ধারিত হয় এইভাবে। তারপর গাড়ী-চালানোর প্রশ্ন। তখনই উঠে সমস্যা।

নির্বাচনকালে ঝোঁক থাকে নিগেটিভ তারের উপর। গদী-আরোহণের পর সেই ঝোঁক নিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। পূজোর পর হিন্দু-সমাজে বিসর্জন দেওয়ার শাস্ত্রী রীতি আছে। প্রতিমা জলে ফেলা হয় এবং ভক্তেরা চীৎকার দিয়ে ওঠে ঠাকুর বা ঠাকুরাণীর নাম ধরে। একবার বিসর্জনে দেবীর সংখ্যা ছিল বেশি। সেইভাবে অনুষ্ঠান চলছে। জোকার উঠছে ভক্তদের কাছ থেকে– 'জয় মা দুর্গা', 'জয় মা কালী', 'জয় মা জগদ্ধাত্রী'। শেষে 'জয় মা কার্তিক' রবে চীৎকার। কার্তিক যে মা নয়, বাবা– সেদিকে আর ভক্তদের খেয়াল থাকে নি। ঝোঁক বা প্রবণতা এমনই জিনিস।

পূর্বোক্ত ঠাকুর-ঠাকুরাণী পূজকদের জাত গদী-আরোহীরা দিশা হারিয়ে ফেলে। একদা নিগেটিভ তারের উপর দিয়ে তাদের সাফল্য এসেছিল। কিন্তু পজিটিভ তার ছাড়া যেমন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে না, জন-জীবনেও তা সত্য। ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে রাষ্ট্রচালকদের ফলে জন-সমর্থন হ্রাস পেতে থাকে। এবং গদী ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত চালকগণ আত্মসম্মান খোয়ায় এবং একদিন জগপ্রদত্ত অধিকারচ্যুত হয়।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের একথা বিশেষভাবে স্মরণ করা উচিত। কারণ, পৃথিবীর অনুন্নত বা দরিদ্র দেশের সমস্যা শুধু স্থানীয় নয়, বরং বলা চলে আন্ত র্জাতিক। দেশটির সমস্যাও প্রচণ্ড মনোযোগের দাবী রাখে। এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রায়ই গদী ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

একটি উদাহরণ বিশদ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ভূমাওলিক রাজনীতির খপ্পর থেকে কোন দেশের– যতই অনুন্নত হোক– রেহাই নেই। এই দেশের মধ্যে অধিকাংশ ছিল সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ। সেখানে যন্ত্র-সভ্যতায় উন্নত দেশগুলো যদ্দুর সম্ভব শোষণের পায়তারা বজায় রাখত। আর্থিক রাজনৈতিক সামাজিক– এমন কি সাংস্কৃতিক স্বার্থের দিকেও তাদের দৃষ্টি থাকত প্রখর। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের এক শ্রেণির জীবন-যাপনের ধারা উন্নত দেশের অনুকরণ। নিত্যব্যবহার্য অনেক সরঞ্জাম তো বিদেশের রপ্তানি। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা পথও প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা তৈরি করে ফেলে। ইংরেজরা এই দেশে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব চালিয়ে গেছে, তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আফিসের কামরা কি বসবাসের ঘরের কথা তারা ভাবেনি। কিন্তু কালে কালে দেশের আর্থিক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এইসব দ্রব্য আমদানির নীতি জলাঞ্জলি দেওয়া হলো। মূলে থাকে, মানসিক হীনমন্যতা– বহু বছরের পরপদানত গোলামের জন্যে যা স্বাভাবিক। এমন মানসিকতা গড়ার জন্যে প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাংস্কৃতিক চাপ নানা অছিলায় সৃষ্টি করে। তার পিছনে থাকে দেশের কায়েমী স্বার্থের এক অংশ। আরাম-আয়েশ–ভোগী। (যেহেতু আর্থিক স্বার্থের বড় ভাগীদার) উঁচ মহলা শ্রেণির উন্নত দেশের ব্যবসাদার প্রশাসক, কূটনীতিবিদ অগয়রহের সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা হয় খুব সহজে। তোয়াজের প্রশ্নে অবিশ্যি হীনমম্যতা অনুঘটকের কাজ করে। ফলে, বর্তমান যুগে সুস্থ জাতীয়তা-বোধও মার খায়। স্বদেশের জন্যে অনুন্নত দেশের ওই শ্রেণির প্রেম আর পূর্বের মত দেখা যায় না। কারণ, আর্থিক স্বার্থের বনধন সেখানে বড় হয়ে দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এইসব দৃশ্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয় বিশ্বে, দেশের রাজনীতির কাঠামো পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট বণ্দক মর্টগেজ হয়ে যায়। আর্থিক নিগড়ে বাঁধা থাকলে, সহজে রেহাই পাওয়া দায়। রাজনৈতিক কাঠামো আর্থিক স্বার্থের পাহারাদার।

তাই অধিকাংশ অনুন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতি সর্বদা টলোমলো, বিপদাপন্ন। তৃতীয় বিশ্বে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিসংখ্যান আমার জানা নেই, তবে এটুকু বলা যায়, তার সংখ্যা কিছু কম হবে না। বাংলাদেশের আমরা ভুক্তভোগী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধুর মর্মন্তুদ প্রয়াণের দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এইসব রাজনৈতিক তুফান কিন্তু স্থানীয় ব্যাপার নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঝাপটায় এমন সব কাণ্ড ঘটে।

তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাদের উপর গিয়ে পড়ে, তাদের মনে রাখা উচিত, নিরাপদে ক্ষমতা-ভোগ আদৌ সম্ভব নয় বর্তমান কালে, যদি স্বদেশের মাটির উপর দুই চরণ না থাকে। অন্যথায়, গদী ব্যুমেরাং হতে পারে।

এই পর্যায়ের কথা আমরা প্রাকারান্তরে বিশদ আলোচনা করব, তৃতীয় বিশ্বের সেনাবাহিনীদের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য আলোচনায়। এখন এইটুকু বলে রাখা যায়, গদী ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে যদি সজাগ দৃষ্টি না থাকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার পাহারায়। তা তখনই সম্ভব যখন দেশের বিপুল জনসাধারণ এগিয়ে এসে দাঁড়ায় প্রশাসনের অর্থাৎ সরকারের পেছনে। এমন গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে না পারলে, সমস্যা থেকেই যাবে।

অবশ্যি ভূমাণ্ডলিক রাজনীতির হাওয়া পাল্টে গেছে। বর্তমানে পুঁজিবাদ বনাম সাম্যবাদ (সমাজতন্ত্র) দ্বন্দ্বধারায় পৃথিবী দুই শিবিরের বিভক্তি আপাতত নেই। পূর্বে এই বিরোধের দেশে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটত। রাজনেতিক পার্টিগুলোর পেছনে মদত যোগাত রাশিয়া এবং আমেরিকা। দুই পরাশক্তির এই খেলা আপাতত বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, এক পরাশক্তি পরাভূত। আগামী পৃথিবীর রাজনৈতিক রূপরেখা কি রূপ নেবে, বলা মুশকিল। কারণ, ভৌগোলিক কারণে, এই বিশ্বের অস্তিত্ব এখন বিপদের সম্মুখীন। বোধ হয়, আন্তর্জাতিকভাবে এই সমস্যার সমাধানে সব দেশ এগিয়ে আসবে। রাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্যা এইভাবে মেটাতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই। চেতনার এই আন্তর্জাতিকতা মানবগোষ্ঠীর ভবিস্যতে টিকে থাকার একমাত্র পথ। সে যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ আর নেই দুই পরাশক্তির মধ্যে। একদিক থেকে তা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা বৈকি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা আমার মনে হয় ভেবে দেখার মত।

মানবজাতি বর্তমানে যে-স্থানে দাঁড়িয়েছে, তা শত শত শতাব্দীর বিবর্তনের ফলে। গুহা-মানব থেকে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানবে পরিণত হওয়ার পেছনে কতো ক্ষয়ক্ষতি ত্যাগ-বিসর্জন সাধনা-সাফল্যের ইতিহাস লিখিত, তা নিরূপণ সহজ নয়। তবে একটি কথা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে : মানুষ বনাম প্রকৃতির দ্বন্দ্বে মানুষ কখনও আপোস করেনি। বলা যেতে পারে এক রকমের জিদই যেন চালিকা-শক্তিরূপে পেছনে সদা বর্তমান ছিল। আমরা দেখেছি, দুই পরাশক্তি নেমেছিল মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায়। তার ফলে, দুই দেশের অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে মার খাচ্ছিল। কারণ, আণবিক বোমার এই সব মারণাস্ত্র নির্মাণের ব্যয় বিপুল। তার মধ্যে কল্যাণকর কিছু নেই। অন্যদিকে পৃথিবীময় ক্ষুধার মানচিত্রের এলাকা বেড়েই চলেছে। যন্ত্রশিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ আমেরিকার নিউইয়র্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরেই নিরন্নের সংখ্যা কম নয়। শতকরা আড়াই জন বেকার মার্কিন দেশে। একদিকে জ্ঞানের প্রসার আকাশচুম্বী অন্যদিকে কল্যাণের পর পাতালমুখী। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না দুই পরাশক্তির। অস্ত্রের ভেল্কিবাজিতে মেতেছিল তারা। এবং মনোবৃত্তি প্রতিযোগিতায়, পারস্পরিক কুস্তির দৃশ্যে। প্রকৃতির মুখোমুখি মানুষ আপোসহীন। আজ সে আপোস করবে তার গ্যারান্টি কে দেবে? এই গ্যারান্টি না পেলে তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৮ সনে বিশ্বখ্যাত বাঙালী পদার্থবিদ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন যে তাঁকে আটঘাট আণবিক বোমা দেওয়া হোক, পৃথিবীর কয়েক জায়গায় ফেলবেন তারপর এই ভূমণ্ডলে তেজোকীর্ণ ধুলো (Radioaction dust) ছাড়া আর জীবন্ত গাছপালা মানুষ প্রাণী কিছু থাকবে না। স্মরণীয়, বর্তমান হাইড্রোজেন বোমার সঙ্গে তুলনায় ১৯৪৮ বা চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বের বোমাগুলো ছিল ছেলেখেলা পটকার মত।

যাক, সুখের বিষয়, বর্তমানে তেমন আশঙ্কা আর নেই। সোভিয়েট রাশিয়া মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত। অস্ত্র-প্রতিযোগিতা অন্তত আর থাকবে না। তবু অন্য বহু সমস্যার সমাধান এখনও বাতাসে ঝুলন্ত। আশা করা যায়, অস্ত্র-প্রতিযোগিতার মতই অন্যান্য ক্ষেত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের সৎ-মানবিক চেতনা ফিরে আসবে যেখানে আত্মহত্যা রোধের জায়গা নেবে জীবন-বোধ।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের সমস্যা কম জটিল নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে তাদের চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যেতে হয়। গদী-সামলানো তখন দায় কি, অনেক ক্ষেত্রে উল্টে যায়। গদী হয় ব্যুমেরাং। তাদের সমস্যা জটিল এই জন্যে, চেতনার ক্ষেত্রে দেশবাসীর পশ্চাৎপদতার ফলে, তাদের তরী সামলানো দায় হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক সভ্য উন্নত রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ তো চায় না, সেই পশ্চাৎপদতা দূর হোক। আর্থিক স্বার্থের যূপকাঠে তারা নৈতিকতা বলি দেয়। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ তো সামনে রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে যন্ত্রশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি দরকার জীবন-যাপনের মান উন্নত করার জন্যে। কিন্তু সেখানে পক্ষপাত আছে। ইণ্ডাষ্ট্রি উন্নয়নের দিকে তারা এগোয় না। সাহায্য অবশ্যি তারা দেয়, কিন্তু তার খাত ঠিক করেই দেয়। ইকনমিকসের ভাষায় বলা যায়, Development (উন্নয়ন) economy তে অগ্রণী বিশ্ব সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু growth (প্রবৃদ্ধি) অর্থনীতিতে নয়। বিশেষজ্ঞদের মত, আমাদের দেশে গ্যাস আছে প্রচুর, তা রপ্তানি পর্যন্ত করা যায়। কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্রি গড়তে গেলে হাজার হাজার কোটি টাকা দরকার। এই বিপুল পুঁজি দরিদ্র দেশ কোথায় পাবে? উন্নত দেশ এগিয়ে আসবে না সহজে।

গদী-আরোহী বা আরোহিনীদের এদিকে দৃষ্টি থাকে কিনা খোদাকে মালুম। রাষ্ট্র পরিচালনা, পূর্বে এক রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন, বাঘে চড়ার সামিল। নামার উপায় নেই। পিঠ থেকে কে পেটে ঢুকতে চাইবে? পিঠে বসে থাকারও স্বস্তিদায়ক নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিহীন হলে গদী ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।
তার নানা ফের্কা।

২

রাষ্ট্রনায়িকা হিসাবে জগদ্বিখ্যাত রুশ-সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দি গ্রেটের সঙ্গে ফরাসী বিশ্বকোষ রচয়িতা দার্শনিক দ'হলবাকের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁকে লেখেন যে, দার্শনিকের কাজ কাগজের উপর। কিন্তু "আমাকে লিখতে হয় মানুষের সংবেদনশীল চামড়ার উপর।" সম্রাজ্ঞীর বক্তব্য অস্পষ্ট কিছু নয়। রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা ধরণের মানুষ, মানুষের দল ও তাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এসবই নাজুক (স্পর্শকাতর) ব্যাপার। সুতরাং সেদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। সমাজ মানুষের তৈরি। কিন্তু তার কাঠামো সবসময় জটিল। এই কাঠামোর দিকে সদ্যস্বাধীন পরিচালক বা পরিচালিকাদের দৃষ্টি অপরিহার্য।

বর্তমান বিশ্বে ভূমাণ্ডলিক রাজনীতির প্রভাব কিরূপ যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত দেশের উপর, তার আভাস পূর্বে প্রদত্ত। তা দেশের বাইরের ব্যাপার। দেশের অভ্যন্তরও নানা দোলাচলে তরঙ্গায়িত থাকে। সেগুলোও লক্ষণীয়।

বাংলাদেশ তো সদ্যস্বাধীন দেশ। মাত্র মাত্র কুড়ি বছর হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনকালে বিরোধী মনোবৃত্তির রাজনীতি সর্বেসর্বা হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজীতে যাকে বলে (oppositional politics) অপজিশনাল পলিটিকস। সেই সময় সামাজিক দায়িত্বের কথা অনেকে ভাবে না। এমন-কি নেতৃবর্গও সুষ্ঠু চিন্তা এড়িয়ে যান। ভবিষ্যতের কথা অনেক ক্ষেত্রে আঁচ করা যায় না। কিন্তু নেতৃবর্গ যদি মোটামুটি অনুমানও না করেন বা ভ্রূক্ষেপ না রাখেন তাহলে বিভ্রান্তি স্বাধীনতা অর্জনের কাল থেকেই দেখা দেয়।

গোড়ায় উল্লিখিত, নিগেটিভ কর্মকাণ্ডের দিকে তখন ঝোঁক পড়ে। বিরোধিতার মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকেই যায়।

আরো লক্ষণীয়, রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে একঘেয়ে রুটিন, এক রকমের দৈনন্দিনতা আছে। হাটে বাজারে ময়দানে বক্তৃতা প্রদানের মধ্যে নাটকীয়তা, উত্তেজনা তরঙ্গায়িত ভাব থাকে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরূপে যখন নেতাদের প্রশাসন পরিচালনা করতে হয়, সেখানে পূর্বোক্ত নাটকীয়তা নেই, নিস্তেজ এক রকমের আচ্ছন্নতা আবহাওয়ায় মিশে থাকে। ফাইলে সই করা তো যান্ত্রিক ব্যপার। তৃতীয় বিশ্বে কাজের প্রতি যে শৈথিল্য দেখা দেয়, তার উৎসের পেছনে নানা হেতু থাকতে পারে, কিন্তু তার অন্যতম হেতু নেতৃবর্গের মধ্যেও কর্মশৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়। অধঃস্তনদের মধ্যে তা সহজে চুয়ে পড়ে।

সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে, বাংলাদেশে তো বটেই, আরো একটি ব্যাধি বেশ গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। মাঝি যদি না জানে তার নৌকা কোন্ পথে নিরাপদে গন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যে পৌঁছবে, তার যে দশা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রপরিচালক বা পরিচালিকাদের দশা তার চেয়ে কিছু আশানুরূপ ভাল নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাক্তন উপনিবেশের প্রভুদের ধ্যানধারণা পরবর্তী শাসকদের মনে চেপে বসে। নিজের দেশের উপযোগী মডেল বা আদর্শ তৈরি করতে তারা অক্ষম। অথচ তাদের কামনায় থাকে দেশ প্রগতিশীল এবং আধুনিক হোক। কিন্তু কীভাবে? তার সুষ্ঠু চিন্তা তাদের উচ্চারণে থাকে না। কারণ, পুরাতন ঐতিহ্যের নিগড় তো কম নয়।

একটা উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই বর্তমান। জাতি বা নেশনের চেতনা এখনও ব্যাপক নয় এই দেশে। প্রাচী ট্রাইব বা কৌমের চেতনা আজও বহমান। তাই শহরে যখন কেউ বলে, এবার ছুটিতে সে 'দেশে' যাবে না,– এই 'দেশ' তার জন্যে বাংলাদেশ নয়, বরং তার গ্রামে যেখানে তার জন্ম শৈশব কৈশোর অতিবাহিত।

এমন মানস-লোক তো জাতি গঠনের অন্তরায়। তাই বর্তমানে বাংলাদেশের নেতা পাওয়া যায় না। মেলে খুলনার নেতা, কি চাটগাঁর নেতা, কি রংপুরের নেতা। সমগ্র দেশের সমস্যায় তারা উদ্বিগ্ন হন না। জেলা, উপজেলা অথবা যে নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি বা তিনিনী (স্ত্রী তিনি) খাড়া হবেন, সেই এলাকার সমস্যায় তারা উদ্বিগ্ন বা এলাকাবাসীর যন্ত্রণার শরিক। উত্তরবঙ্গের অধিবাসী নিজেকেও দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসীদের থেকে তফাৎ করে দেখেন। জেলায় জেলায় রেষারেষি দেখে মনে হয়, অতীতের কোন্ যুগে আমাদের বাস।

পুরাতন ঐতিহ্যের প্রশ্ন আসে এইখানে। পূর্বে আধুনিক জাতীয়তার কোন বালাই ছিল না। এ যুগে জাতীয়তার চেতনা ছাড়া পুরাতন বহু মানসিকতা দূর করা দায়। নেতৃবর্গ এইসব সমস্যা নিয়ে বিচলিত হন বলে মনে হয় না। তাই বাংলাদেশের মানচিত্র অনেকের চোখের বাইরে পড়ে থাকে। সেই জায়গায় দেখা দেয় জেলা-উপজেলা বা নেতাদের নির্বাচনী এলাকা।

বাংলাদেশে যারাই রাষ্টপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন না কেন, তারা জানে কী প্রচণ্ড কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়। সমস্যার কী অন্ত আছে! কৃষিপ্রধান দেশ। আধুনিক রাষ্ট্র গড়তে গেলে যেসব মালমশলা দরকার তা নেই। বাংলাদেশে খনিজ পদার্থ একমাত্র গ্যাসই সম্বল। তদুপরি দেশের আয়তন জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে দরকার। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। এইখানে আসে মানসিকতার কথা। সনাতন ঐতিহ্য অনেক সময় প্রগতিশীলতার পরিপন্থী। "জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।" এই আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর করলে আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কোথায়? অথচ সব রাষ্ট্র পরিচালকগণ চান যে আধুনিক প্রগতিশীল হোক তার দেশ। গত বছরও সংবাদপত্রে দেখা গেল, গ্রামের এক লোককে বয়কট করা হয়েছে, কারণ সে তার স্ত্রীকে জন্ম-নিরোধের জন্যে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিকতা দূর করার জন্যে চিন্তার ক্ষেত্রেও কিছু রবদবদল হওয়া দরকার। সেখানে বিরাট বাধা রক্ষণশীলতা।

অথচ মানুষ চায় আধুনিক কলাণরাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হোক তার দেশ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, স্বাস্থ্যের সমুজ্জ্বল প্রকাশ- এই জাতীয় বাসনার পেছনে থাকে আন্তর্জাতিক আসরে যথাযোগ্য সমাদর পাক তাদের দেশ। কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্যে যে প্রক্রিয়া-পথ গ্রহণ দরকার সেদিকে কারো খেয়াল থাকে না। এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নেতৃত্বের বিপুল অংশের থাকা দরকার বুদ্ধিমত্তা, চরিত্রগুণ এবং নৈতিকতার এক অতি উচ্চ পর্যায়।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর চেতনা অতি সংকীর্ণ, জাতীয়তা বিকাশের অন্তরায়। পূর্বে আলোচিত। অথচ সেই পাপচক্র ঘিরেই থাকে বাংলাদেশের মত সকল পশ্চাৎপদ দেশে।

তা সত্ত্বেও দেখা গেছে, জনসাধারণ সৎ ও সঠিক নেতৃত্বের পেছনে সামাজিক ইস্যুর ক্ষেত্রে সাড়া দিতে দেরি করে না। বাংলাদেশে তার কয়েকটি উদাহরণ আছে। ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করুন। দেশময় সেই তুমুল তরঙ্গ হাজার সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে আছড়ে পড়েছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। উনসত্তরে আইয়ুব-শাহী স্বৈরাচারী আন্দোলনের কথা ভাবুন। তার অনুভূমিক বিস্তার কম ছিল না। পৃথিবীতে আর কোথাও কোন কালে জনজাগরণ এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দেখা দিয়েছে কিনা সন্দেহ। রুশ বিপ্লবে ভূমিকা ছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু আরো বারো বছর কেটে যায়, তারপর দেখা দেয় বিপুলাকার জনজাগরণ। কিন্তু বাংলাদেশে উনসত্তরের পর মাত্র দু'বছরের মধ্যে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন অনুভূমিক এবং উলম্ব (vertical) বিস্তারে এক অভূতপূর্ব প্লাবনের মত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার বলার উদ্দেশ্য, হাজার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নেতৃত্বের রূপ প্রেরণামুখর হলে কোন বাধা আর উত্তরণের পথ বন্ধ করতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এই দেশের মাটি যেমন ফসল-প্রসবিনী স্বর্ণপিণ্ড, তেমনই তার মানুষ। মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির অভাব ও দোলাচল-বৃত্তি শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটায়।

এক কথায় বলা যায়, নেতৃত্বের বৈভব অনুন্নত দেশে অনুঘটক (catalysis) হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অন্যান্য উপাদান মূল্য বা শক্তিহীন।

এই জন্যে স্বাভাবিক উন্নত দেশে মুখ্য নেতা তেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন না, অন্তত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। সব দোষ নন্দঘোষ- নেতার উপর গিয়ে পড়ে।

সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু আধুনিকতার দিকে সব শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

বর্তমানে আধুনিকতা মানে কৃষি থেকে যন্ত্রশিল্পে উত্তরণ। এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যবাদীরাও সামিল থাকে। এখানে লক্ষ্য-পথে বামপন্থী-ডানপন্থী সমান। ধর্মের ব্যবসা যাদের কাছে রাজনীতির অন্য নাম– তাদেরও পার্টি প্রোগ্রামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা থাকবেই। তাছাড়া জনসাধারণ আকৃষ্ট হবে কেন? শুধু পরকাল দেখিয়ে কোন রাজনৈতিক পার্টি গড়ে উঠতে পারে না, তা তাদের ভালরূপে জানা। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত কোন দেশ উন্নত বলে কথিত হয় না।

আধুনিক যুগে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা অপরিহার্য। অর্থনীতিবিদ ছাড়া তা কে করবে? বর্তমান কালে পদে পদে পরিসংখ্যান ছাড়া চলে না, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে। দেশে লোকসংখ্যা কত? সেই অনুপাতে তাদের দৈনন্দিন জাগতিক চাহিদা কত? প্রতিটি তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ তৈরি করতে হবে। সেখানে সীমার প্রশ্ন আছে। কারণ, ব্যক্তিগত জীবনের মতই রাষ্ট্রের সামর্থ্যের হিসাব নিতে হবে। ইংলন্ডে জনস্বাস্থ্য এখন রাষ্ট্রীয় খাতের অন্তর্গত। সকল মানুষের স্বাস্থ্যের খবরদারী সরকারী ব্যাপার। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশ কি তেমন ভার গ্রহণে সক্ষম? যদি বর্তমানে না হয় কোন্ অদূর ভবিষ্যতে সেখানে পৌঁছতে পারব, তারও জনসাধারণের নিকট জবাবদিহির দায়িত্ব সরকারের। আর অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কতো রকমের ফিরিস্তি না সামনে এসে দাঁড়ায়। বীজধান না থাকলে তো আগামীতে ধান হবে না। দেশের ক্ষেত্রে সঞ্চয় তেমনই প্রয়োজন। কিন্তু তার হার কি হবে? সঞ্চয় ও নিয়োগের অনুপাত কি হবে? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। বৈদেশিক মুদ্রা ফলে অর্জন দরকার। তা কোন্ খাতে কিভাবে এগোবে? এসব নির্ণয় প্ল্যানিংয়ের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণ কতখানি সাড়া দেবে বা পণ্য-ভোগের কতখানি ত্যাগ করতে স্বচ্ছন্দে রাজি হবে– তাও ধর্তব্যের ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় জোর খাটিয়ে এইসব ক্ষেত্রে কতখানি এগোনো যেতে পারে? এ সবই রাজনীতির ব্যাপার। নেতা এবং জনগণের সম্পর্কের উপর নির্ভর। দেশের মঙ্গলের জন্যে ত্যাগ প্রয়োজন আছে, তা মেনে নেওয়ার জন্যে যে প্রেরণা সৃষ্টি প্রয়োজন তা নেতা নয় শুধু, চেতনার কারিগরদেরও দায়িত্ব। এইখানে আসে সাংস্কৃতিক কর্মীদের দায়িত্ব। কারণ, মানুষের চেতনার আবিষ্কার তারাই করে। রাষ্ট্রনায়ক কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কংগেসে ঘোষণায় বলেন যে, তাঁরা জানেন যে, প্রত্যেক মানসিক জগতের নিজস্ব জড়ভিত্তি আছে। মাথা ছাড়া তো মাথা ব্যথা হতে পারে না। কিন্তু জনসাধারণকে দেওয়ার মত তাঁদের বস্তুভিত্তি নেই। আহার, বাসস্থান তো সেখানে অপরিহার্য আইটেম। কিন্তু দেশের জীবন-যাপনের মান রাতারাতি তো উন্নয়ন সম্ভব নয়। ফিডেল ক্যাস্ট্রো তাই বলেন যে, বাইরের খাদ্য যখন তিনি দিতে অক্ষম, ভেতরের খাদ্য পরিবেশনে দেশের তাবৎ সাংস্কৃতিক কর্মী যেন এগিয়ে আসেন। কাব্য, সাহিত্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত– মানুষের আত্মার উন্নয়নের এই সব উপাদান পরিবেশনে যেন সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ কার্পণ্য না করেন।

কৃষিপ্রধান দেশে এমন সমস্যা তো অহরহ দেখা দিতে পারে। তবু সমৃদ্ধির পথে আরো কতো রকম দায়িত্ব এসে পড়বে তার ইয়ত্তা নেই। পথ-ঘাট, বন্দর, রেলপথ নির্মাণ, কৃষি গবেষণা, সার তৈরি ফ্যাক্টরী, কলকারখানা– এই জাতীয় শত শত তালিকা। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, নানা ধরনের প্রকৌশলী তো প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থা আর দূরে রাখা চলে না। স্কুল-কলেজ কি দূরে ঠেলা সম্ভব?

একটি দেশের শ্রীবৃদ্ধির দায়িত্ব আধুনিক যুগে এক বিরাট জটিলতা এবং তা অবশ্যি যন্ত্রণা। কারণ, পদে পদে মানুষ নিয়ে কারবার। গোড়ায় উল্লেখিত রুশ সাম্রাজ্ঞী কাথরিন দি গ্রেটের কথাটি স্মরণীয়, "আমাকে লিখতে হয় মানুষের সংবেদনশীল চামড়ার উপর।"

এই মানবিক পর্যায়ে জটিলতা সর্বাপেক্ষা বহু দূরপ্রসারী।

মধ্যযুগীয় মৌতাত কাটিয়ে উঠতে না পারলে তো আধুনিক যুগে প্রবেশ সম্ভব নয়। কিন্তু সুষ্ঠু বিভাগ সচরাচর দেখা যায় না। বাংলাদেশের রাজপথের সড়ক তার বিশেষ পরিচয়। স্বল্প চিন্তায় দেশের আত্মার পরিচয় মেলে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার নমুনা বিরাট নভোচারী ইমারত চোখে পড়বে। আর দেখা যাবে ধনবস্ত মোটরের পাশে পাল্লা দিতে রিকশা, ঠেলাগাড়ি ছুটছে। দো-আঁশলা এই এক সভ্যতার ভেতর দিয়ে আমাদের প্রাত্যহিকতা। কারণ, আধুনিকতার সকল প্রতীকের আঁতুড়-ঘর তো ইউরোপ। এই যুগে বহুজাতিক কোম্পানীর অভিঘাতে প্রাক্তন উপনিবেশে হালফিল যুগের কিছু ছোঁয়াচ লেগেছে মাত্র। ফলে, অতীত এবং বর্তমান এক সন্ধিমূলক বিরোধিতায় কোলাকুলিরত।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কের এই স্ববিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয় সামাজিক তথা মানবিক পর্যায়ে। এই মোকাবিলার তেমন অকাট্য সুষ্ঠু পথ এখনও এদেশে অজ্ঞাত বলেই সমস্যার খুব সরলীকৃত সমাধান এসে জোটে। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়ানোর সময় সুতো জট পাকিয়ে গেলে শেষে ছিঁড়ে জোড়া দেওয়ার কায়দায় তৃতীয় বিশ্বে সমাধান চালু আছে।

এই জোড়াতালি নানারূপ পরিগ্রহ করে।

৩

ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী কিছু বিলুপ্ত সভ্যতার বিবরণ থেকে ইতিহাসের পদক্ষেপের একটা নকশা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে সমাজের মধ্যেও এই চাল দেখা যায়। প্রবাহমান সমাজে পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান দরকার। যদি পরিস্থিতির মোকাবিলা সুচারুরূপে না ঘটে তাহলে সমাজদেহে যুগ ধরে এবং একদিন এই ঘুণের একুন-ফল সভ্যতার বিলুপ্ত। টয়েনবী মনে করেন এই প্রক্রিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু কাল ধরে চলতে থাকে। ইতিহাস তথা সমাজের এই চাল সাড়ে তিন কদমে সমাপ্ত হয়। উচ্ছেদ-সমাবেশ-উচ্ছেদ-সমাবেশ-উচ্ছেদ-সমাবেশ-উচ্ছেদ। ঐতিহাসিকের ভাষায় Rout-rally- Rout-rally- Rout-rally- Rout. উচ্ছেদের পর সমাবেশের সুযোগ থাকে। কিন্তু এক সময় আসে উচ্ছেদেই সমাজের বিলুপ্তি ঘটে। তখন মোকাবিলার সব ক্ষমতা হারিয়ে বসে থাকে এই হতভাগ্য সভ্যতা।

বিগত আলোচনায় দেখা গেছে, অনুন্নত দেশে সমস্যা অন্তহীন। বাংলাদেশ আদৌ তার ব্যতিক্রম নয়। সমস্যার অর্থ পরিস্থিতির মোকাবিলা। মোটামুটি বনিয়াদ নড়বড়ে নয় এমন রাষ্ট্রে মোকাবিলা হয় সমাজের দৈনন্দিনতার বিরাট ওলটপালট না ঘটিয়ে। কিন্তু যেসব দেশ সবেমাত্র কৃষিপ্রধান চরিত্র থেকে যন্ত্রশিল্পের যুগে প্রবেশের জন্যে সচেষ্ট দেখা যায় সেখানে সামাজিক কোন পরিবর্তন খুব শান্তভাবে হয় না। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধাক্কা সেখানে না পড়ে পারে না। এই ঘূর্ণিজালে পড়া ছাড়াও সমাজের অভ্যন্তরীণ দশা এমন থাকে সমস্যার মোকাবিলা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে।

একটা ছবি তো ক্রমশ স্পষ্ট। যন্ত্রশিল্পে উন্নত রাষ্ট্র– শুধু নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখার জন্যে অনুন্নত দেশে পণ্য-সম্ভোগের একটা মানসিকতা গড়ে তোলে, পশ্চিমের অর্থনীতিবিদেরা যাকে বলেন Consumers society সেই পণ্যসম্ভোগী সমাজের আকর্ষণ। এই আবর্ত থেকে পৃথিবীর কোন দেশের রেহাই নেই। অথচ কৃষিপ্রধান দেশের অভ্যন্তরে এমন মানসিকতা বেশ বিপজ্জনক, আবার অন্যদিকে তাছাড়া সমাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে গেলে ন্যূনতম জীবন-ধারণের কতকগুলো সামগ্রী প্রয়োজন। কিন্তু সেদিকে গেলে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের মানসিকতা এসে পড়ে। এই দোটানার মধ্যে প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন শ্রেণি স্ব-স্ব স্বার্থের রশি টেনে ধরে। দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত সমাধানের কোন সহজ পথ থাকে না। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতে গেলে বালকেরা যা করে, এমন পরিস্থিতিতে ঠিক তাই ঘটে। সুতো জট পাকিয়ে গেছে। অত খোলার চেষ্টা কেন? ছিঁড়ে গিঠ দিয়ে নাও। অনুন্নত দেশে এখন ঠিক তাই ঘটছে। শেষ পর্যন্ত জোর-যার-মুলুক-তার নীতি সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের অধিবাসীর নিকট এই বাক্য তথা ছবির কোন ব্যাখ্যাদান অনাবশ্যক।

১৯৫৮ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। এই চৌত্রিশ বছরের ঘটনাবলী চোখের সামনে রয়েছে।

১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তদানীন্তন পাকিস্তানের সামরিক আইন জারি করেন। অনুন্নত দেশে সমস্যা সমাধানে এ-ও একটি উপায় বটে।

গদী আরোহী বা আরোহিনীদের এদিকেও লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্তব্য।

অনুন্নত দেশে কতো রকম না বিপর্যয় এসে জোটে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেই। অনুরূপ সামাজিক বিপর্যয়জাত সমস্যা-সমাধানে বেসামরিক পর্যায় থেকে সামরিক পর্যায়ে উল্লম্ফন। সিভিল থেকে মিলিটারী লাফ।

সাধারণত পুরুক্তি, তবু বলা যায়, বালকের হাতে ঘুড়ির জট-পাকানো সুতোর দশা ঘটে অনুন্নত দেশে। তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত সামাজিক বিপর্যয় দেখা যায়। বিগত চৌত্রিশ বছরের মাত্র স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে তিন বছর এবং বিগত দেড় বছর– এই পাঁচ বছর ছাড়া বাকি উনত্রিশ বছর সামরিক শাসনের আওতায় দেশবাসীর দিন-যাপন ঘটেছে। বাস্তব ঘটনার পুনরুল্লেখ মাত্র।

বেসামরিক থেকে সামরিক এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা থাকা একান্ত দরকার।

অনুন্নত দেশে ওলটপালট খুব হিতকর কিছু নয়। কারণ, মোটামুটি কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে সমাজ-দেহে যে-ভারসাম্য প্রয়োজন, তা যদি না থাকে, দেশ আর উন্নয়ন বা প্রগতির মুখ দেখে না।

কিন্তু যেহেতু একটি দেশ নানা দিকে পশ্চাৎপদ, সেখানে সামরিক সমাধানও আরো সমস্যার খনি হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত দেখা যায়, অনুন্নত দেশ প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসকদের অনেক সরকারী কাঠামো ত্যাগ করতে অক্ষম। বাংলাদেশের কথা ধরা যেতে পারে। ইউরোপীয় কায়দায় এখানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চালু আছে। অন্তত আদর্শ তেমন গন্তব্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রশাসনিক শ্লথতা, দুর্নীতি বাদ দিলেও এই ব্যবস্থার মধ্যে ভর করে আছে নানা অসুবিধা যার ফলে সামাজিক উন্নয়ন পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথচ অন্যদিকে পণ্য সম্ভোগী সমাজ গড়ার আকর্ষণ। জনসাধারণের মধ্যে তখন ফ্রাসট্রেশান– নিষ্ফলতাবোধ এমন পেয়ে বসে যে, সরকার সমর্থন হারিয়ে ফেলে।

এই ফাটল দিয়েই সামরিক শাসনের অনুপ্রবেশ ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খামাখা "বাকশাল" গঠনের ঝুঁকি নেননি। তাঁর পরীক্ষা তো চালুই করা গেল না। আন্তর্জাতিক ও দেশী দালালদের ষড়যন্ত্রে তার বিদায়-পর্বের সঙ্গে সেই প্রস্তাবনা কল্পনাই রয়ে গেছে। সেই সময় বহু তথাকথিত বামপন্থী, মার্কসবাদী (হয় মাওয়েন বাচ্চা, নয় ব্রেজনেভের ব্যাটা) হৈ হৈ করে উঠল যে বিরোধী পার্টি যখন নেই, তখন "বাকশালে" গণতন্ত্র থাকে কী করে? অথচ সব সমাজতন্ত্রী দেশে পার্টি তো একটাই। পার্লামেন্টারী আবহাওয়ায় আজন্ম প্রতিপালিত অনেকের ধারণা, আর এক পার্টি না থাকলে গণতন্ত্র ধূলিসাৎ মার্কসবাদের নোট-পড়া বামপন্থীদের দৌড় আর কতদূর যেতে পারে।

অতীত নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। বর্তমান নিয়ে আমাদের আলোচনা।

সামরিক শাসন পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দুর্বলতার ফাটল দিয়ে উঁকি মেরে আসে। তাদের গুরুত্ব তখন অনুভূত হয়। ফ্রাসট্রেশান-বিরক্ত জনসাধারণ মেনে নেয়। কিন্তু তারপর আবার কুকুরের লেজ বাঁকাতে শুরু করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিকল্পনা বোর্ড (প্ল্যানিং বোর্ড) এবং বেসামরিক উচ্চপদস্থ আমলাদের থেকে যা পায় তার বেশি আর কিছু ভাবতে পারে না। সুতরাং সহজেই গন্তব্যহীন যাত্রার খোন্দলে গিয়ে পড়ে। বেসামরিক প্রশাসকদের উপর কোন শ্রদ্ধাও থাকে না সামরিক কর্তৃপক্ষের ফলে নিঃশব্দ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফলে, প্রশাসনের যন্ত্র তেমন সুচারু চালু হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শ্লথতা সব সময় জনসাধারণের মধ্যে সমর্থন-বিরোধিতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশাসনিক দিক ছাড়াও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে তো কেউ ব্যবসাদার বা বেসামরিক প্রশাসকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভাবাদর্শ নিয়ে থাকে না। দেশের আর্থিক ব্যাপারে স্বভাবতই স্বাধীন পন্থা গ্রহণ বা মতামত দানের উৎসাহ থেকে বঞ্চিত ব্যবসাদার এবং পূর্বোক্ত বেসামরিক প্রশাসকগণ। ওদের স্বাধীনতা দিলে কর্তৃপক্ষের আধিপত্য বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে, এ ভয় তো আছে। ফলে, দেশ একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বিরাজ করে। কিছুদিন এই অবস্থা বজায় থাকতে পারে। কিন্তু সময়ের ব্যাপার। তা অতিবাহিত হলে সামরিক কর্তৃপক্ষের বুলি আর কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নিষ্ক্রিয়তা জনসাধারণকে ক্রমে ক্রমে দুঃসাহসী করে তোলে বিরোধিতার পথে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের রাজত্বের শেষপ্রান্তে এসব আলামত অনেকে দেখেছেন। তাছাড়া সৈনিক তো আমলা হতে পারে না। আমলাদের তত্ত্বাবধান করতে পারে, নাক গলাতে পারে তাদের কাজে এবং মাথার উপর ডাণ্ডা ঘোরাতে পারে দিনরাত্রি। তার বেশি আর কিছু করা মানে আমলাদের গুণাবলী অর্জন। তাহলে তো মিলিটারী আর মিলিটারী থাকবে না।

এখানে বলে রাখা ভাল, আমলাতন্ত্রকে যতই গালাগাল দেওয়া হোক, কিন্তু আমলা ছাড়া তো প্রশাসন চলবে না। সেখানে ত্রুটিমুক্ত আমলাতন্ত্র আদর্শ। কিন্তু আমলা অপরিহার্য।

অবিশ্যি একটি কাজ সামরিক শাসনে সুচারু সম্পন্ন হয়। তা হচ্ছে পুলিশের কাজ। কিন্তু এই কাজে এগিয়ে তারা বিচার বিভাগকেও তাদের তাঁবে নিয়ে আসে স্রেফ গোপন ধমকানি বা ভ্রূকুটি মারফত। অর্থাৎ দেশের বিচার-বিভাগ আর বিচার-বিভাগ থাকে না। বরং প্রভুমনোরঞ্জক এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সরকারী ইমেজ আর উজ্জ্বল থাকে না।

গভর্নমেন্ট পরিচালনা এক জটিল ব্যাপার। মার্কিন এক সমাজতত্ত্ববিদ গভর্নমেন্টকে তুলনা করেছেন বিরাট নৌকার মোটা কাছির সঙ্গে। কাছি পাটের ফেঁসো বা নারিকেল চোপড়া দিয়ে তৈরি। এইসব ফেঁসো বা চোপড়ার সাহায্যে অনেক লম্বা দড়ি পাকানো হয়, সেই সব দড়ি আবার একত্রে পাকানো চলে যতক্ষণ না প্রয়োজন মাফিক মোটা না হয়। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেছেন যে, একটি রাজনৈতিক সমাজ এমন অসংখ্য দড়ির সমাহার সমন্বিত কাছি। সবগুলো একত্রে জড়ানো আছে, তা কাছির টেকসই শক্তি এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। এসব দড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন। কোনটা অর্থনৈতিক, কোনটা ধর্মীয় বিশ্বাস, কোনটা পারিবারিক অনুভূতি, কোনটা শিক্ষার দড়ি– এক কথায় মানবিক নানা প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি ব্যাপার। কাছিটা স্বভাবত জটিল প্যাঁচ সমন্বিত। যদি কখনও কোন দড়ি খুলে ফেলার বা কাটার প্রয়োজন হয় কোন কারণে, তাহলে তা একটি মাত্র শর্তে করা যায় সুস্থ রাজনীতি বজায় মারফত। গ্রন্থী কেটে ফেলা (ঘুড়ির উপমা স্মরণীয়) চলবে না। তারপর শেষে সমাজতাত্ত্বিকের মন্তব্য ভাষায় শুনুন "Anybody can solve the problems of political power by martial law" but only a fool would mistake that process for government".

"যে কোন আহাম্মক রাজনৈতিক ব্যাপারের সমস্যা সামরিক আইন মারফত সমাধান করতে পারে। কিন্তু এই আহাম্মকই কেবল এই প্রক্রিয়াকে রাজ্যশাসন বলে ধরে নেবে।"

অবিশ্যি মুখরক্ষার জন্যে স্বৈরাচারী সামরিক আইনের আমলেও প্রেসিডেন্ট কিন্তু "গণতান্ত্রিক" উপায়ে নির্বাচিত হতে পারে। তা এরশাদের আমলে, জিয়ার আমলে আপনারা দেখেছেন। কাহিনী বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন।

সামরিক শাসন পূর্বোক্ত নানা কারণ এবং পরিস্থিতির ফলে বেশি দিন টেকে না। সময় সেখানে বিচারক। প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয়। আইয়ুব খান দশ বছর উদযাপনের উৎসরের ভেতর বিদায় নিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পাঁচ বছর গদীতে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ন বছরের শেষপ্রান্তে কুপোকাৎ হলেন। সাহিত্যে দশ বছর বা দশক একটা মাপকাঠি হয়ে গেছে। কোন দশকের কবি? চার-পাঁচ-ছয়-সাত ইত্যাদি। সামরিক শাসনে গমন তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। কারণ অনেকে বেশ টিকে যায়। ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল সুহার্তো ১৯৬৯ থেকে এখনও গদীনসীন। কারণ, দেশটা বাংলাদেশের মত দরিদ্র নয়। দারিদ্র্য মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে। আর ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মান্ধতার প্রকোপ প্রচণ্ড। ইহলৌকিক কল্যাণের চেয়ে যেখানে পারলৌকিক কল্যাণের গুরুত্ব বেশি, সেখানে সমাজ পরিবর্তন অতিশয় দুরূহ। স্পেনে জেনারেল ফ্রাংকো ১৯৩৫ থেকে আরো সাঁইত্রিশ বছর টিকেছিলেন আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের গৌণ সহায়তা মারফত।

মোদ্দা কথা, সামরিক শাসন শেষ পর্যন্ত ধ্বসে যেত বাধ্য। প্রথমে, বেসামরিক শাসন উচ্ছেদ করে তাদের উদয় ঘটে। কিন্তু শুধু সামরিক ভিত বা বেস (Base) নিয়ে দেশ চালানো সম্ভব নয়। জনসাধারণের মধ্যে সমর্থন বা 'বেস' খুঁজতে হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের খালকাটার মহানুভবতার হদিস এখানে খুঁজে পাবেন। সিভিল মেরে মিলিটারীতে 'বেস' পাওয়া গেল। বেশ। মিলিটারী মেরে সিভিলে 'বেস' পেতেই হবে। নচেৎ বেশিদিন টেকা দায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে অক্ষম হলেন, আমরা জানি।

এ জন্যে সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, মিলিটারী পেশা রাজ্যচালনার মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন দায়িত্ব গ্রহণের সুচারু ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়।

রাজ্য শাসনের জন্যে দরকার :

পরিস্থিতি-পাঠের দক্ষতা,
প্রয়োজনে আপোস,
সকলের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা,
সকল মতামত প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি,
আইন-মান্যতা এবং
কখনও আইনকে নিজের খামখেয়ালীর কাছে বিকিয়ে না-দেওয়া।
ভুল করলে তা সংশোধনের জন্যে সাহস-থাকা,
উপদেশ-ভিক্ষা প্রার্থনা এবং
উপদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও পরে নির্বাচন
অশেষ ধৈর্যশীলতা, এবং
সব সময় মনে জাগরুক রাখা যে তার (রাষ্ট্র চালকের) শক্তি জনগণের সমর্থনের নিকট ওয়াদা বা অঙ্গীকারবদ্ধী।

সামরিক প্রশিক্ষণে এসব উপলব্ধি বা গ্রহণের তেমন ব্যবস্থা কোথায়? অধস্তনদের (নীচের র্যাংকের) আনুগত্য এবং নীরস কণ্ঠে Command হুকুম প্রদান... পেশার এই তো চৌহদ্দি। সেখানে মানবিকতার অজস্র বর্ণালির প্রবেশ খুব সহজ নয়।

তাই দেখা যায়, সামরিক শাসনের মেয়াদও অনুন্নত দেশে স্বল্পস্থায়ী।

তাই পরিবেশে সিংহাসন আরোহী বা আরোহিনীদের তাই স্মরণীয় যে রাজ্যচালনা কোন সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষত সদ্য স্বাধীন প্রাক্তন উপনিবেশ জাতীয় দেশে যেখানে পৌর-চেতনা প্রায় ক্ষুদ্র দশমিক বিন্দু। গদী সেথা সর্বদা ব্যুমেরাং হওয়ার সম্ভাবনা। আমার একটি প্রবাদ শাসক এবং প্রশাসকদেরও কাজে লাগতে পারে :

উচাসন
খোঁচাসন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ সংস্কৃতি সঙ্গমে

পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল বাংলাদেশের আয়তন। ব্যক্তির জন্যে বিশাল বৈকি এই পরিমাপ। একটি মানুষের জন্যে কতটুকু জমি লাগে? টলস্টয় সেই প্রশ্ন তুলে জবাব দিয়েছিলেন, যে যার হাতের মাপের সাড়ে তিন হাত জায়গাই তো যথেষ্ট। অর্থাৎ একটি কবরের জন্যে যতটুকু জমি দরকার, তার বেশি আর প্রয়োজন কী? মরার পর ওই চৌহদ্দি যথেষ্ট।

কিন্তু বাঁচার জন্যে সাড়ে তিন হাত কুলাবে না। জীবন-ধারণের বায়নক্কা অনেক। প্রথমত ভাতের সমস্যা। সেই জমি তো সাড়ে তিন হাত হতে পারে না।

জনসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশের আয়তন বড় ছোট। অর্থনীতিবিদেরা আশংকিত আর আট বছর পর একুশ শতাব্দীর গোড়ায় লোকসংখ্যা পনর কোটি ছড়িয়ে যাবে। তখন খাদ্য সমস্যা সমাধান পৌঁছবে আয়ত্তের বাইরে।

দেশের আয়তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবনযাপনের রূপ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশের জুলুম অনস্বীকার্য। মানুষের অস্তিত্বের সম্মুখে চিরকাল এই প্রশ্ন চিহ্ন খাড়া থাকবে।

কিন্তু মানুষই আবষ্টেনীর গোলামী থেকে মুক্তি পায়। জীবজন্তুর গোটা জীবন এক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ এই গণ্ডী কেটে বেরিয়ে আসতে সমর্থ। তাই গুহামানব থেকে বর্তমান সভ্য জগতের মানুষ একদিকে পরিবেশের সৃষ্টি হলেও অন্যদিকে সে নিজেকেও প্রস্তুত করে যা প্রকৃতির ছাঁচের মধ্যে পড়ে না।

অভাবনীয়তার কারিগর মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে, মাত্র দু'টি উপাদানের সাহায্যে : মেহনত ও মনন। মেহনত বাস্তব রূপায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় মননের মধ্যে যে ছাপ কল্পনায় থাকে। এই যুগল আবার একে অপরের পরিপূরক। সেখানেও দ্বন্দ্ব আছে এবং এই মল্লযুদ্ধ মানুষের রূপ এবং মেহনতের রূপ পাল্টে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, উভয়ের অবস্থান ভুমি বদলে গেছে। একটি উদাহরণ দেয়ার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

পুরাতন ঢাকা শহরের অধিবাসীরা দেখেছেন মেথরদের কার্যকলাপ খোলা পায়খানার টব থেকে বিষ্ঠা উদ্ধার। বর্তমানে আন্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনের কল্যাণে তেমন দৃশ্য আর চোখে পড়বে না। যতই ন্যাক্কারজনক, বমি উদ্রেকের উৎস হোক মানুষকে অমানুষের পর্যায়ে ঠেলে দেওয়ার সেই দৃশ্য, মানবপ্রেমিক যে কোন ধার্মিক জনকে তা মেনে নিতে হয়েছিল। গোটা সমাজের পরিচ্ছন্নতার জন্য তার একাংশে কিছু নোংরা মানব-কলংকের বোঝারূপে না হয় থাকল। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। মেথরকে যে অমন রেহাই দেওয়া গেছে তার কারণ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোজাসুজি বলা যায় তার ভিত্তি কিন্তু জড় ব্যাপার। অনেক মূর্খ এই কথাটা সহজে বোঝে না। যারা ফাঁকা আধ্যাত্মিকতার আওয়াজ তুলে জড়বাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, তার আসলে সমাজের একশ্রেণির তল্পীবাহক। এই শ্রেণি প্রধানত শোষক শ্রেণি। তারা সমাজের পরিবর্তনবিরোধী, যেহেতু স্থিতাবস্থা থেকে তারা তো ফায়দা লুটে, শারীরিকভাবেও তারা আরাম-আয়েশ ভোগ করে, তাদের তো পায়খানার টব কাঁধে শহরের রাস্তায় হাঁটতে হয় না।

পূর্বোক্ত মানবিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির মূলে কিন্তু খাড়া আছে পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভাবনীয় উন্নতি, ধাতব-বিদ্যার কলাকৌশল– যার ফলে বিরাট বিরাট ব্যাসবিশিষ্ট পাইপ তৈরি সম্ভব হয়েছে। জল নিকাশের মোটা পাইপে শহরের তলদেশ আকীর্ণ। তাই রেহাই পেয়েছে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ। অন্তত পূর্বের জীবসদৃশ করুণা থেকে তাদের অব্যাহতি ঘটেছে।

মেহনত এবং মনন, আরো স্পষ্ট বলা যায়, জড় এব অ-জড় এই দু'য়ে মিলে মানুষের অগ্রগতি ঘটে। সমগ্র মানব সমাজের ইতিহাস তার সাক্ষীরূপে খাড়া শুধু মানবতার শত্রুরাই জীবনের এই দুই দিক পানে যুগপৎ একই সঙ্গে তাকাতে পারে না। না, তা হয়ত পারে, কিন্তু প্রগতিবিরোধী সমাজশক্তির দোসররূপে তারা শুধু তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার মহিমার জিকির নিয়ে বসে। একটা ছোট উপমা দেওয়া গেল, শুধু মোটামুটি ব্যাপারটা খোলাসা করার তরে।

সঙ্গতিময়, পরিপূর্ণ মানব জীবন হয়ত কোনদিন হবে না। কারণ, অস্তিত্বের গেরো বড় শক্ত। প্রকৃতি উল্টে ছোবল মারে। খাদ্য সমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া এই সমস্যা নিবারণ কঠিন। এক শ্রেণির মানুষ পাওয়া যাবে, যারা এখনও "জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি" এই বাণীর লেজ পাকড়ে আছেন। পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা তাদের কাছে স্বাভাবিক। কারণ, মানুষের চিন্তাধারা তো রাতারাতি বদলায় না। যথাথ Rationality যুক্তি-বিচার প্রয়োগ মানুষের পক্ষে কবে সহজে হবে, স্রষ্টা জানেন। অনেক বার উল্লিখিত তবু পুনরুক্ত : রোমে স্পার্টাকাস যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদের ঝাণ্ডা তুললেন তখন বহু দাস তাদের পায়ে গোলামীর জিঞ্জীর অটুট রাখার জন্যে কী স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে লড়েনি? একই দৃশ্য আমাদের দেখা, ১৯৭১ সনে মুক্তিসংগ্রামকালে একশ্রেণির দোসর জুটে গেল যারা পাকিস্তানী সৈন্যদের অবাধ "কাতলে আম" (গণহত্যা) গৃহদাহ, লুণ্ঠন এবং মা-বোনের বেইজ্জতির কোন হিসেব নিলে না বরং আল্লা-রসুলের দোহাই মেরে বিবেকের চোখে ধুলো দেওয়ার ফন্দি অব্যাহত রাখলে। তাই বলছি, বড় নির্মম অস্তিত্বের বোঝা। যুক্তিবিচার রাতারাতি দু-চার জন ছাড়া সকলে প্রয়োগ করতে অক্ষম। এই দেশে Wretchedness is blessedness (জীবজন্তুসুলভ দুর্দশাগ্রস্ত জীবনই স্বর্গসুখের আর্শীবাদ) বলে একশ্রেণির ধার্মিকজনেরা কী প্রতিদিন চিৎকার করে না? নিষ্ক্রিয়তার এক রকমের বড়ি তারা বিতরণ করেন, তাই কওম আর মগজ, হাত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ ব্যবহারে অক্ষম। যার ফলে গত পাঁচ শ' বছরে মুসলমান কওম আজও ভিক্ষুকের কওম, ইহুদী নাসারা কনসোর্টিয়ামের কাছে গিয়ে হাত পাতে, ইহুদী নাসারার কাছ থেকে কেনা অস্ত্র দিয়ে 'ইসলামী' রাষ্ট্র রক্ষা করে। মগজ তো (বন্দক) রেহেনী-খৎ-প্রাপ্ত। সুতরাং শরম গায়েব। তাছাড়া উপায় কী? দেশের মানুষকে তো অভুক্ত রাখা যাবে না। কিন্তু এই দশায় আমরা কীভাবে পৌঁছলাম, তার হিসেব কোনদিন শোষকের গুণকীর্তনকারী আধ্যাত্মিক ব্যবসায়ীদের কাছে মিলবে না। কারণ, চিন্তার দরজা বহুকাল বন্ধ।

বাংলাদেশের আয়তন দিয়ে শুরু করেছিলাম এজন্য যে দারিদ্র্যের চেহারা কত বীভৎস তা স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্যে। সরকারী পরিসংখ্যানে শতকরা ছেষট্টি জন ভূমিহীন। অর্থাৎ গালভরা স্বদেশে তাদের সুচাগ্র পরিমাণ জমি নেই। "আমার সোনার বাংলা" তাদের কাছে নিরর্থক হয়ে যায় না কি? পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, শতকরা সাতাশি জন গ্রাসাচ্ছান পর্যায়ের নীচে বসবাস করে। বাকী তের জন দেশের সম্পদ ভোগী। অবিশ্যি সেখানেও স্তর বিভাগ আছে।

এই দারিদ্র্যের হেতু শুধু মেহনত বিমুখতা নয়, বরং মনন বিমুখতাও তার সঙ্গে জড়িত। সমাজের শোষক শাসকশ্রেণি এই বিমুখতার প্রধান হেতু, তা বলার জন্যে কোন দ্বিধা লাগে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অহরহ সংগ্রামের মোকাবেলার চেতনা প্রয়োজন। সেখানে ঘাটতি থাকলে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে জাতির আসন শেষ সারিতে গিয়ে ঠেকে। শুধু তাই নয়, পদে পদে আত্মাবমাননার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। রুশ নেতা গর্বাচেভের রাজনীতি যা হোক, একটি অমূল্য বাণী তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, "Life punishes them who comes late." যারা বিলম্বে আগত জীবন তাদের শাস্তি দান করে। বড় কঠোর দণ্ড। রুশ-মার্কিন নভোচারীরা চাঁদের মুখে বুটের গন্ধ শুঁকিয়ে আসে, তখন দুরন্ত রৌদ্র দরদর ঘামের দরিয়ায় স্নাত, অপুষ্টিকর শিকার শীর্ণদেহ আমাদের রিকশাওয়ালারা গাড়ি টেনে মরে জীবিকা অর্জনে।

সংস্কৃতি জীবনকে মোকাবিলার চেতনা। সেই পথেই মহাশূন্য নভোযান চালনার হিকমত চন্দ্রগামী জাতির এখতিয়ারে আসে।

এই জন্যে সংস্কৃতি বিশ্বমানবতার সম্পদ। তা কোন বিশেষ জাতি ধর্ম দেশ বা জাতীয় সংকীর্ণতায় বাধা পড়ে না। তবে যাত্রার প্রারম্ভে যেমন কোন জায়গা লাগে, তেমন যাত্রাবিন্দু সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয়। এই যাত্রাবিন্দু মাটি তথা জমিন তথা স্বদেশের জমিন। এক কথায়, স্বদেশ। আমাদের জন্য বাংলাদেশ।

মানুষের জন্যেই সংস্কৃতি। সুতরাং প্রথম শর্ত মানুষরূপে গণ্য হওয়া। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জন। তা যেমন ব্যক্তির পক্ষে তেমনই জাতির পক্ষে অর্জিতব্য। শিশুর দাঁত গজানোর মত তা আপানা-আপনি উদ্ভুত হয় না। কোন সহজ সংকীর্ণ উপায় এখানে নিষিদ্ধ। ব্যক্তি অথবা জাতি এখানে এক দায়বদ্ধতায় বন্দী। এখানেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির মত কোন সংকীর্ণ গণ্ডী নেই। কোন দেশ, ধর্ম, পরিবার বা এই জাতীয় গণ্ডী দিয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন অসম্ভব। মীরজাফর কী মুসলমান ছিল না? তবু ব্যক্তি হিসেবে ও-নাম ঘৃণ্য কেন? মনুষ্যত্ব অর্জন করেনি সে, তাই ঘৃণ্য। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকরূপে এই উপমহাদেশে ওই নাম উচ্চারিত। আর একটি নাম আছে তা স্বল্প উচ্চারিত। অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতায় মীর জাফরের কাছে পরাজিত– সে ভারতের দাক্ষিণাত্য নিবাসী মুহাম্মদ সাদেক যে টিপু সুলতানকে ইংরেজদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মীর জাফর ও সাদেক দুইজনকে এখন অপরাধের দিক থেকে মাসুম নিষ্পাপ বাচ্চা মনে হয়। তারা ইতিহাসের ক্রীড়নক বিদেশীদের সাহায্য করেছিল অজানিতে। সবচেয়ে বড় দিক উভয়ে মীরজাফর বা সাদেক আল্লা-রসুলের পূতপবিত্র ভাবমূর্তি কলংকিত করেনি। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে একাত্তর সালে পাকিস্তানী নরাধম সৈন্যদের দোসরগণ ধর্মের আলখেল্লা চাপিয়েছিল শরীরে এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মের আবাকাবা।

এই ইতিহাসের রক্ত আজও আমাদের বুক থেকে শুকিয়ে যায়নি। ইসলাম ধর্মের প্রর্বতক প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) ছিলেন নিপীড়িত সর্বরিক্ত বঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণকামী আত্মীয়। ঝুটা আভিজাত্যের মুখে পদাঘাতকারী সেই বংশের সন্তান এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাতারে। কিন্তু একাত্তরের ঘাতকদের গত পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি সর্বদা শোষক-বঞ্চনাকারীদের ফরমাবরদার (আজ্ঞাবাহক) রূপে। উর্দু প্রবাদ :

মুর্দা দোজখ ইয়া বেহেশ্‌তমে জায়ে মেরা হালুয়া রোটি সে কাম।

মুর্দা দোজখ না বেহেশতে যাবে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, আমার দরকার হালুয়া-রুটি।

পাকিস্তানী সৈন্যের দোসরগণ সেই হালুয়া-রুটির তরফে সর্বদা অবস্থানরত। মোহাম্মদ (দঃ)-এর সেই অপূর্ব ঘোষণা আলফাকরো ফাখরী– দারিদ্র্য আমার ফখর (গর্ব) এদেশের ধর্ম ব্যবসায়ীদের কানে পৌঁচেছে কিনা আমার সন্দেহ। এরা কেউ দরিদ্র জনের মত বাস করে না। ইহুদী নাসারাদের উপর দিনরাত্রি গালিবর্ষণ করলেও তাদের জীবনযাপনের ঠাঁট, তাদের আবিষ্কৃত আরাম-আয়েশের সুবিধা গ্রহণে ধর্মব্যবসায়ীদের কোন লজ্জা হয় না। অনেকে প্রচুর সম্পদের মালিক। এমনকি এদের বৈঠকখানা (অভিজ্ঞতা থেকে বলছি) ইহুদী নাসারাদের কায়দায় সাজানো। রান্নাঘরে গেলে বেসিন, Sink সিংক, গোসলখানায় বেসিন ইত্যাদি-ইত্যাদি পাবেন। এরা কখনও চিন্তা করেন না, প্রথম ক্রুসেডের পর বারো শতাব্দীতে মুসলমান যোদ্ধাদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপে প্রথম তোয়ালে ও সাবান গিয়েছিল। সেই ইউরোপের রুচির দাসত্ব পর্যন্ত কি করে আজ এদেশের প্রাত্যহিক জীবন ধারায় ঢুকে গেল?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, এরা চিন্তা করেন না। মগজ চোখ হাত পাঁচ শতাব্দী পূর্বে গোমরাহীর নিকট বন্ধক-প্রদত্ত। কিভাবে আর চিন্তা করবেন ? খোদ মরহুম মওলানা মওদুদী আমেরিকার বোস্টন হাসপাতাল চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন, সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি কি ভেবেছিলেন, চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যেতে হয় কেন?

কেন সিংগাপুর, লন্ডন, আমেরিকা দৌড়াতে হয়?

জীববোধ যাদের থাকে তারা জীবনকে বাঁচাতে, বাঁচিয়ে রাখতে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিন্তা করে। এদেশে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে মৃত্যুবোধকে অহরহ জাগিয়ে রাখে, অগ্রগণ্যভাবে, তাই মৃত্যু বড় তাড়াতাড়ি আসে এই উপমহাদেশে। ভূমধ্যসাগর। পার হলেই ইউরোপে আয়ুর পরিমাপ সত্তরের উর্ধে। আর এই উপমহাদেশে শ্রীলংকাই প্রথম ছাপ্পান্ন, ভারত বাহান্ন, বাংলাদেশ তার নীচে। মৃত্যু এত তাড়াতাড়ি আসে কেন এই উপমহাদেশে? বাঁচার সাধনা না থাকলে মৃত্যু ছোবল দিতেই থাকবে। প্রকৃতির সংগ্রাম তো দয়াপরবশ বন্ধ হয়ে যাবে না।

পুরাতন চেতনার দূরীকর বা নবায়ন বাঁচার আসল পথ।

মানসিকতা পরিবর্তনের বড় হাতিয়ার সংস্কৃতি। মানুষের এই সাধনায় চেতনার আবিষ্কার ঘটে। নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় মানুষ। সেই উদ্বোধনীর উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে স্বদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিমূর্তি, তার আবহমানকালের সকল সাধনার ঐকতানসহ।

সংস্কৃতি কর্মীগণ প্রত্যেকেই আত্মার কারিগর। তা কেউ বিস্মৃত যেন না হয়।

AMARBOI.COM

জন্মদিনে দেশবাসীর উদ্দেশে

পঁচাত্তর বছর।

তৃতীয় বিশ্বে গড়-আয়ুর তুলনায় বহু দূর পার হয়ে এসেছি।

আজ পিছনে তাকাই।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-মথিত এক জগতের পরিচয় পাই। তবু খোয়ার মানুষের মত কাতর স্বরে বলব না, "এ জীবন নিরাশার স্বপন।"

সাফল্যের খতিয়ান তো আমাদের কম নয়। বৃটিশ আমলে গোলাম নাগরিকরূপে জন্ম, তারপর স্বাধীন নাগরিক। এই বিজয়ের পেছনে দেশবাসীর অকুতোভয় বীরোচিত সংগ্রামের কাহিনী-কথা কী করে ভুলে যেতে পারি?

সেই সড়কে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে জেনেছি, মানুষের সামনে কোন জগদ্দলই অনড় নয়। জেনেছি, নতুন জগদ্দল আবার হাজির হয়। আরো জেনেছি, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবন্ধকতা হটানোই অস্তিত্বের প্রধান শর্ত। জীবন মানেই সমস্যা। যদি সমস্যা না থাকে, জীবনও থাকে না। সেখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন স্বতঃই জড়িত। কিন্তু কোন পরাজয়ই চিরকালীন নয়। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বমুখর প্রাত্যহিকতা স্বীকার করে নিলে বাঁচার আস্বাদ মেলে।

১৯৪৭ সনে স্বাধীন হলাম। কিন্তু বুনিয়াদ ছিল পলকা। তাই টিকল না। চব্বিশ বছর ধরে আমাদের লড়ায়ের ময়দানে নামতে হলো। স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের কৃতিত্বের সাফল্যে। অবিশ্যি তা আদৌ নিরুঙ্কুশ নয়।

আদর্শের পতাকা ছাড়া কোন যুদ্ধ চলতে পারে না। প্রত্যেক দলের নিজস্ব নিশান থাকে। এই পতাকা-প্রতীক তাদের সংঘবদ্ধতার প্রেরণা যোগায়। যতই গাল-ভরা বাণী দিয়ে কোন আদর্শ ঠাসা থাক না কেন, তার শিকড় থাকে দেশের মাটিতে তথা সমাজে। আরো সহজ ভাষায়, দেশের জীবন-যাপনের ধারায়। ফুলের মূলে মাটি-লাগা শিকড় থাকে। উদ্ভিদবিদ না হয়েও তা অনেকে জানে। কিন্তু জীবনের বেলা বহু জনই মূল-কথা ভুলে যায়।

স্বাধীনতার লড়াইয়ের পতাকার কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। মাত্র কুড়ি বছর আগেকার ব্যাপার। নতুন প্রজন্মের কাছে তা ঐতিহাসিক কাহিনী মাত্র। তবু তাদের ভাল করে জানা দরকার, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব সাম্প্রদায়িকতা থেকে, বর্ণবিদ্বেষ থেকে।

ধর্মের লেবেন এঁটে মানুষ চেনানোর ব্রত নিলে আধুনিক রাষ্ট্রের বনিয়াদ কমজোর হয়ে যায়: হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধের সমস্যা মেটানো হলো ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র পত্তনের ভেতর দিয়ে। বর্ণবিদ্বেষ হলো দরিয়া পাড়ি দেওয়ার তরী।

তার ফলাফল আজ স্পষ্ট। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত তারই জের। তবু পাকিস্তান টিকে রইল, সেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি বড় করুণ। বেলুচ সিন্ধী পাঠান পাঞ্জাবী এবং একদা-ভারত-আগত বিহারী-সকলে মুসলমান হয়েও আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত। ইরাক-ইরানের ন'বছর কুস্তাকুস্তি ও বারো লক্ষ প্রাণের অপচয় ইতিহাসে দৃষ্টানের জন্য এক অনন্য দলিল হয়ে থাকবে।

কিন্তু এদেশে আর যা-ই হোক ওই দৃষ্টিদান এখনও ঘটেনি।

আজও ভোল পাল্টে ধর্মের ধুয়া তুলে সাম্প্রদায়িকতা জীইয়ে রাখার চেষ্টা এক শ্রেণির মানুষের কাছে অপরিসীম। ওদের ইতিহাস কোন শিক্ষা দেয়নি। রণক্ষেত্রের অকেজো, পুরাতন পতাকা ওরা হাতছাড়া করতে অক্ষম।

আমার ধারণা, এমন কওম নিশিগ্রস্ত জনের মত ঘুমের ঘোরে হাঁটতে অভ্যস্ত। এই জাতীয় তন্দ্রাচারীরা ফলাফলের তোয়াক্কা রাখে না। জীবনের চেয়ে মৃত্যুবোধ (Death-wish) তাদের টানে বেশী। এইভাবে মুসলমান কেন, সব কওমেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চাৎপদতা শুরু হয়। জীবন তাদের আকর্ষণ নয়। অথচ মৃত্যুবোধ পদে পদে তাদের নানা রকমের হতাশার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। হতাশা সাধারণত নিষ্ফলতাবোধ (Frustration) থেকে উদ্ভুত হয়। এমন ক্ষেত্রে পারলৌকিকতার দিকে মানুষ বেশী ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু দৈনন্দিনতা বড় কড়া মনিব। সহজে রেহাই দেয় না। তার ধাক্কায় ধাক্কায় মানুষ কোথা যায় সে জানে না। দিশা হারিয়ে ফেলে। বৃটিশ আমলে এক দল সমাজ সংস্কারক প্রচার করলে যে ইংরেজী ভাষা হারাম। তাই মুসলমান সমাজ বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে রইল। তার ফল দাঁড়িয়েছে কী? আজকে যে-কোন মুসলমান রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা বজায়ে ইহুদী-খৃস্টান (নাসারা) রাষ্ট্রের শরণাপন্ন। সৌদী আরব রক্ষার জন্যে কেবলই মার্কিন সমরাস্ত্র নয়, খোদ মার্কিন সৈন্যদের জংগের ময়দানে এসে দাঁড়াতে হয়। মুসলমান শাসকেরা লজ্জার মাথা খেয়ে বসে থাকে।

জীবনের সমস্যার অতি সরলীকরণ বড় পাপের সামিল। শিয়া-সুন্নী চৌদ্দশ' বছর চালিয়ে যাচ্ছে তাদের লড়াই। দুই মুসলমান জং বাহাদুর। মহরমের সময় ইমামদের জন্যে মাতমের জায়গা নেয় ওদের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে মাতম (শোক-বিলাপ) কারণ, দুই মুসলমান উপ-সম্প্রদায় একে অপরকে জবাই না করে পরিতৃপ্ত হয় না। এসব ঘটে কিন্তু ধর্মের দোহাই মেরে। নারীহত্যা, নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ-ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যদের মগজ-ধোলাই করে আনা হতো বলা হতো, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা মুসলমান নয়, তাই পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

১৯৭১ সনে তাদের আদম বর্বরতার নমুনা আপনারা দেখেছেন।

আজ সমাজতাত্ত্বিকদের কল্যাণে জানা গেছে যে গোড়ায় শোষক-শোষিতের সুবাদে গড়ে উঠলেও কালে কালে সব ভাবাদর্শ-আইডলজি নিজস্ব অস্তিত্বে আর এক সোশ্যাল ফোর্স বা সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়। তাই দেখা যায়, কোন ভাবাদর্শের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলেও তা সমাজের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে থাকে এবং তার দাপট আদৌ কম নয়। বহু কুসংস্কার এই ভাবে সামাজিক অগ্রগতির শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই গর্ত থেকে উত্তরণের উপায় কোথায় নিহিত? তার একবাক্যে কোন জবাব মিলবে না। তবে এটুকু বলা যায়, সমাজ বিবর্তনের ভেতর দিয়েই ওইসব অনাচার থেকে মুক্তি মিলতে পারে। মনুষ্যত্বের সাধনা সেই পথেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর কোন শর্ট-কাট নেই পৃথিবীতে। ম্যাক্সিম গোর্কির একটি অমূল্য বাণী সদা স্মরণীয়। Only in resistence to environment man becomes man- মানুষ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মারফতই মানুষ হতে পারে।

সুদীর্ঘ সাত দশকের জীবন-সড়কে আমি এই বাণীর যাথার্থ উপলব্ধি করেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং জেনেছি, মানব-প্রেমের ভেতর দিয়েই সত্যিকার আধ্যাত্মিক জীবন লাভ সম্ভব। মানব-কল্যাণে সেইখানে মহতী দিশারী। অনেকে তা লক্ষ্য করে না, বরং চিরাচরিত সংস্কারের গর্তে ঢুকে আত্মপ্রশান্তি খুঁজে পায়।

উদাহরণত ক্ষুধার কথা ধরা যায়। ক্ষুধা মানব সমাজের এক চিরকালীন দুশমন। ভুখা পেটে কারো মতি স্থির থাকতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও তা বুঝেছিলেন। তাই তার মুখেই শোনা যায়, একটি কুকুরও যতদিন ভারত বর্ষে ক্ষুধার্ত থাকবে, স্বামীজীর দায়িত্ব হবে এই কুকুরকে খাওয়ানো।

এমন ব্রত সুষ্ঠুভাবে সুন্দর সমাজ গড়ার অন্যতম সোপান বৈকি।

কিন্তু গণ-দুশমনেরা মানুষের গ্রাস শুধু কেড়ে নেয় না ; এই বঞ্চনার সমর্থনে নানা রকম ইচ্ছা-পূরণের কাল্পনিক গালগল্প পরিবেশন করে রাখে যেন তাদের ভাতের থালার পাণে চেয়ে কারো চোখ না টাটায়। এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আবেষ্টনী বদলানোর এক নির্ঘাৎ উপায়।

আরো দেখা যায়, এক শ্রেণির মানুষ সম্পদ গড়ার পেছনে নেশাগ্রস্ত এমনই যে তারা আর কারো দিকে তাকায় না। অপর মানুষের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তারা নির্বিকার। এইখানে আছে সমাজ-ব্যবস্থার কথা। ওই বদ খসলৎ যেন কারো মধ্যে না গজায়– সমাজের আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে তার উৎস থাকা উচিত।

স্বতঃই এখানে রাজনীতি কথা এসে পড়ে। না এসে উপায় নেই। দলবদ্ধ জীব মানুষকে সমাজব্যবস্থার ভেতর দিয়েই এগোতে হয়। যুগে যুগে মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্র বদলেছে জীবন-যাপনের ধারা সহজ করে তুলতে।

এইখানে ব্যক্তিপর্যায়ে একটি প্রসঙ্গ স্মরণীয়। মনুষ্যত্ব অর্জনের সড়ক খুব সহজ বা সরল নয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকু বলা যায়, বহুদূর যেতে হলে বোঝা যতো হালকা হয় ততই মঙ্গল। কারণ, চলার পথে যে-কোন বোঝার ভার ক্রমশ বেড়ে যায়। যাত্রাকালে যা এক কিলোগ্রাম থাকে, তিন-চার মাইল হাঁটার পর তা হয় তিন কিলোগ্রাম। বোঝার ভারে ক্লান্ত পথিক বেশি দূর এগোতে অক্ষম।

সামান্য রূপক করে বললুম। কিন্তু কথাটি পালনের চেষ্টা থাকা উচিত। মনুষ্যত্বের সড়কে কালে কালে নব-নব আদর্শ যারা আবিষ্কার করেছেন– তাদের মানসিক আবহে ছিল যদ্দুর সম্ভব জাগতিক সম্পদের দিকে লোভ একদম ন্যূন পর্যায়ে রাখা যেন অস্তিত্ব রক্ষার বাইরে আর উদ্বৃত্ত প্রয়োজন আত্মার উপর কোন ছোবল না মারে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, তা হলো ব্যক্তি-পর্যায়ের কথা। কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে সম্পদ যতো বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। উপনিষদের বাণী, "নাল্পে সুখমস্তি– অল্পে সুখ নেই" আজও স্মর্থব্য। সমাজ-সম্পদের আধিক্যে জীবন-ধারা অনেক সহজ হয়ে যায়। বস্তি এলাকায় একটি কলের পাশে কলস-হাড়ি, অন্যান্য মাটির পাত্রের প্রতিনিধিত্ব অনেক কাল পূর্বে পাঁচের দশকে চিত্রশিল্পী আমিনুল ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকা একটি ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। কলকাতার পাশে নীচতা, দীনতা-এক কথায় মনুষ্যত্বের অবমাননার কতো খুনসুটির উৎস দরিদ্র পল্লীর এই আবহাওয়া। ব্যক্তি পর্যায়ে নির্লোভ আবার যুগপৎ সমাজের বেলা প্রচণ্ড লোভী– এই দ্বৈতাদ্বৈত মিলনের ভেতরই মানুষের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক শ্রীবৃদ্ধির উপায় নিহিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু মানুষ আকাশের খোঁজে পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলে আবার অনেকে পৃথিবীর সন্ধানে এমন মশগুল যে আকাশ তাদের কাছে চিরদিন অপরিচিত থেকে যায়। মুরুব্বী-সুলভ আমার এই উপদেশের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সচেতন। চিরাচরিত আজও বহু আহা-উহু-জাতীয় আফশোস শোনা যায়।... আহা, মানুষ যদি এইসব নীতি পালন করত ... আহা, মানুষ যদি অমুখ-তমুক মহাপুরুষের নির্দেশত কাজ করত...মানুষ যদি ঈমানদার হোত...তাহলে দুনিয়ার দুঃখ দারিদ্র্য জুলুম অন্যায় বিচার কিছুই থাকত না। আহা, যদি... যদি... উহু...। বহু শতাব্দী ধরে এমন শোক-বিলাপ করে আসছে সেইখানে পৃথিবীর বহু সৎ এবং মূর্খ নাগরিক।

কিন্তু সমস্যা তো তারা সেইখানে ধরতে পারে না। সমস্যা যে কী তারা ঠিক হদিস করে উঠতে পারেন না। কেন তারা নিজেদের জিজ্ঞেস করেন না, কেন লোকে অমন ভাল-ভাল উপদেশ বাণীর প্রতি বিমুখ? কেন মানুষ সৎ পথের দিকে ধায় না? কেন লোকে কুপথগামী হয়? সবাই তো জানে, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে অনিষ্টকর, তবু প্রতিদিন কেন কোটি কোটি শলা সিগারেট চুরুটের ধোঁয়া গ্রীবা পথে সোঁধিয়ে যাচ্ছে। সবাই জানে লেখাপড়া শিখলে মানুষ হওয়া যায়। অনেকে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না, অনেকে সুযোগের অবহেলা করে। কেন এমন হয়?

মাঝে মাঝে কেন, হর-ওয়াক্ত সর্বক্ষণ দেখা যায়, দেশ উপদেশে-উপদেশে ছয়লাব। কতো রকমে না তার প্রচার। অথচ দেশের নৈতিক আবহাওয়া ক্রমশ অধঃপাতে যাচ্ছে। কেন? বরং আরো দেখা যাচ্ছে, যারা প্রতিদিন যারা প্রতিদিন উপদেশ নসীহৎ খয়রাত করে- করে মুখে ফেনা তোলে এবং গাড়লের মত মাইকের সামনে চিল্লাচিল্লি মত্ত (সে টুকু জ্ঞান ও নেই যে ওই যন্ত্রের সামনে ধীরে ধীরে মৃদু শব্দে কথা বলা উচিত) তাদের ভেতরই চরিত্রহীনের নমুনা অসংখ্য।

সমাজ সুন্দর এবং শান্তিময় করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়– কিন্তু শত শত বছরেও তার সমস্যা মেটে না। তার একটি মাত্র সমাধান আছে পৃথিবীতে শোষিত-বঞ্চিতদের হাতে সামাজিকভাবে এমন হাতিয়ার তুলে দাও যেন তারা অন্যায় প্রতিরোধ করতে পারে, যেন তারা প্রতিহত করতে পারে যে-কোন আক্রমণ তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষাকল্পে। অবিশ্যি তাদের সুযোগ থাকবে ওই সব প্রতিষ্ঠান গঠনের। হাতিয়ার হবে এমনই। অন্যথায় যতই উপদেশ দাও, সৎ বুলি প্রচার করো... সব বিফলে যেতে বাধ্য।

১৯৮১ থেকে বিগত ন' বছর দুঃশাসনের আমলে আমরা দেখেছি ভাল ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা প্রচারে কত রকম পাঁয়তারা। মহাপুরুষের বাণী প্রচারের ফন্দী কতো। কখনও যন্ত্রযোগে কখনও মানুষের গালাবাজি মারফত। কিন্তু কুমতলবে প্রচারিত সৎ কথার নিকট যে কোন মিথ্যা হার মেনে যেতে বাধ্য।

মানুষের পক্ষে দৈনন্দিন জীবন-যাপন কষ্টের এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে অতিষ্ঠ জনগণ শেষে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। গত ডিসেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ থেকে আমরা দেখলাম, কবির ভাষায়, জনসমুদ্রের জোয়ার-যার প্লাবনে স্বৈরশাহী তলিয়ে গেল। কারণ, তার মূলে ছিল সজ্জনের মুখোশ-পরিহিত মিথ্যার বেসাতি। মসজিদে মসজিদে টুপি মাথায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে তার ফেরেস্ত াপনা জাহির করতে আপনারা কি দেখেননি। স্বৈরশাহীর রকম-সকম এমনই। প্রেসিডেন্ট সাহেবের এক ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে গরীব দেশের ট্যাক্স-দাতাদের কত খরচ হতো তার কৈফিয়ত তো কাউকে দিতে হতো না। রাজধানীর বাইরে গেলে তো আরো ব্যয়। হেলিকপ্টারে পেট্রোলের খরচ, নিরাপত্তা-জনিত অন্যান্য খরচ। সব মিলে কী পরিমাণ অর্থের অপচয় হতো, তা জানার অধিকার আছে বৈকি দেশবাসীর। অথচ স্বৈরাচারীকে কারো কাছে কাছে জবাব দিতে হতো না। ওই পরহেজগার প্রেসিডেন্টের অর্থগৃধ্নুতা এবং নারী-লালসার কাহিনী তো এখন সর্বজনবিদিত। পুরাতন কাসন্দী ঘাঁটলাম যেন ভবিষ্যতে দুর্জনের ছলনায় কেউ প্রতারিত না হন।

জীবনের গোধুলি লগ্নে এসে পৌঁছলাম শত আস্বোয়াস্তির ভেতর দিয়ে।

বিগত পঞ্চাশ বছর কেন, চারের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বড় ঝড়ঝাপ্টা যন্ত্রণার ভেতর দিয়েই এদেশের সকাল হয়, সন্ধ্যা হয়। অকাল মৃত্যুর মিছিল কতো ভাবে না দেখলাম।

প্রশাসনের অবহেলা-জাত প্রক্রিয়ার এক লঞ্চডুবির শিকারদের খতিয়ান কেউ নিয়েছে কী? স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বলি হলো। সাম্প্রদায়িক দাংগার ফন্দীবাজগণ ধর্মের পবিত্র অঙ্গ কতো রকমের ক্লেদ না নিক্ষেপ করলে, যার পরিণাম বহু মৃত্যু-অনর্থক মৃত্যু। তার কতো রকম না জের-যন্ত্রণা যেখানে মূল গায়েন।

এমন বহু ফিরিস্তি টানা যায়। মর্মন্তুদ কাহিনী সেখানে সর্বেসর্বা।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বার বার পেছনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিতে মন চায় না।

আজ জন্মদিনে প্রত্যাশা করব, বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ হোক যথাযোগ্য আসনের অধিকারী। প্রত্যাশা করব তার সন্তানগণ অকিঞ্চিৎকর অভাবজাত খেদের শিকার নয়। বরং সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীমুক্ত মানব-জন্মের গৌরব-অর্জনে অহর্নিশ ব্রতী।

১৯৭১ সনে জন্মভূমি-জননীর পরাধীনতা ঘুচাতে মুষ্টিমেয়, নরাকার অমানুষ ছাড়া, তার সন্তানেরা পরিণত হয়েছিল একসূত্রে গাঁথা মন ও প্রাণ যেন একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল স্পন্দিত মানবাত্মার প্রতীক। সেদিক কোথাও শান্তি-শৃঙ্খলার ঘাটতি পড়েনি। দস্যুও সেদিন তার পুরাতন অভ্যাস বিসর্জন দিয়েছিল।

আজ জন্মদিনের এই লগ্নে প্রত্যাশা করব, আবার আমরা যেন তেমনই চেতনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ি। স্বৈরাচার ধূলো হয়ে গেল সেই চেতনার ফুৎকারে। ফিরে আসুক আমাদের কেনানে হারানো ইউসুফের মত সেই দুকূলপ্লাবী মানসলোক।

পুনর্বার আমাদের রণধ্বনি হোক : জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা।

একটি ভাষণ

বাংলা একাডেমী কী প্রাতিষ্ঠানিক একটি নাম-মাত্র? না। এই নাম উচ্চারণে সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইতিহাস অতীতের অযুত নর নারীর যৌথ কণ্ঠস্বরূপে দুদ্দাড় আমার কানে আছড়ে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের এক পবিত্র জ্ঞানপীঠ যার প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যের বহু দিকশূল সারি সারি প্রোথিত। এমন স্থানে আমার মত নগণ্য সাহিত্যসেবীর দাঁড়াতেও পায়ে কম্পন লাগে, তরঙ্গিত হয় বুক। অন্যদিকে আন্ত রিকতার অমর্যাদা কোন শোভন ব্যাপার নয়। তাই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার সাহস হয়নি।

এই প্রাঙ্গণ থেকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি রচনার সূত্রপাত। মজকুর এলাকা আর পূর্ব-পাকিস্তান নয়। ইতিহাস রায় দিয়ে বসে আছে। আমার আর কিছু যোগ করা বাহুল্য।

কিন্তু এই চত্বরে আমরা সহজে হাজির হতে পারিনি। অশ্রু, রক্ত ও বহু দুঃখের দরিয়ায় সাঁতার দিতে হয়েছিল তৎপূবে। সালাম, বরকত, জব্বার এবং অনামা বহু শহীদের আত্মতর্পণ আমরা ভুলে যাইনি। কারণ, ভুলে যেতে অক্ষম। ইতিহাসের কতো দিকশূল অনির্বাণ মশালের মতো না তারা পুঁতে গেছেন ভবিষ্যৎ চলা-পথের সমতলে। মনুষ্যত্বের বহু সেবক তো শহীদদের কল্যাণেই পাওয়া। এই ভুখণ্ডের অধিবাসী ১৯৫২ সনে উপলব্ধি করেছিল : স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মাতৃভাষার সর্বস্তরে ব্যবহারের স্বাধীনতা কোন স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। জেনেছিল এই মুলুকের অধিবাসীগণ, নিরস্ত্র রিক্ত হস্তের মুঠির উপর নির্ভর করেই যে-কোন হাতিয়ারের হোক না তা আধুনিক মরণাস্ত্র মোকাবিলা সম্ভব। মর্মতেজ বা মর্মশক্তির নিকট চামুণ্ড পেশী-শক্তি শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য। ১৯৫২ সনের পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নরহত্যা-মারফত মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে জবরদস্তি প্রয়োগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। উনিশ বছর পরে ১৯৭১ সনে আরো বিরাট পর্যায়ে দ্বিগ্বিদিক তাদের হিংস্র মূর্তি আমরা দেখলাম, বুকফাটা আহাজারী সিক্ত ধর্ষিতা জননী-ভগিনীর ধুলিশয্যায় : মানুষের পুরুষানুক্রমে বহু যুগের মেহনতে গড়া লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ মাথা- গোজার আশ্রয় স্থলে জলে জাঙ্গালে মাঠে ময়দানে গণ কবরের অন্ধকার আদিম স্তব্ধতায়। সেদিনও হানাদারেরা কওমীভা'য়ের লেবাস এবং পরিচয় ত্যাগ করেনি। তারপর থেকে আমরা জানলাম, না শিখলাম : কেবল কয়েকটি আচার-উপাচারের মিল বা সাযুজ্যে ভাই তৈরী হয় না। মনুষ্যত্বের আরো অন্যান্য উপাদান লাগে তৎসঙ্গে। কওমী লেবাস এবং ধুয়া ছিল জালেমদের ছদ্মবেশ আর এক রকমের মুখোস।

এমনতর কঠিন সবক এই প্রাঙ্গণ থেকেই দেশবাসীর পাওয়া। ইতিহাসের সারিসারি দিকশূল-মশাল এখানে সাজানো যেন সহজে আমরা দিশাহারা, দিকশূন্য না হই।

সত্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সত্যের সৈনিক হওয়ার হদিস বাংলাদেশে আর কোথায় মিলবে? এখান থেকে কতো রকমের শিক্ষাই না পেলাম।

ভাষা আন্দোলনের কালে অনেক মিষ্টি কথা চালু করেছিল তদানীন্তন শাসনদণ্ডধারী বরকন্দাজের দল। কী চমৎকার আপাত মঙ্গলের আহ্বান : বাংলাভাষা হিন্দু মালাউন কাফেরের ভাষা, হিঁদুয়ানি-চর্বিত ওই জবানের নিকটে থাকা মানে কালে কারে মুসলমানত্ব গায়েব।

ধর্মচ্যুতির এমন আতঙ্কও সেদিন সরল জনসাধারণের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রচারণা মারফত। প্রচার যন্ত্রের মালিকও তারাই। আবহামান কাল থেকে চালু আছে বাংলা প্রবাদ : "দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলো না।" এই প্রাঙ্গণ থেকে আমরা এক মোক্ষম সবক পেলাম। প্রবাদের ঈষৎ হেরফের। কিন্তু যোগ-বিয়োগ: "দুষ্ট লোকের মিষ্ট নীতিবাক্যে, শাস্ত্র-বাক্যে ভুলো না।"

অবিশ্যি দৈনন্দিনতার প্রভাব এবং সমাজের শত্রুদের ভোল-পাল্টানো ভোজবাজিতে অনেক সময় মানুষ ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে যায়। একদা যারা বাংলা ভাষাকে কাফেরী জবান বলে প্রচারের জন্যে গলায়-গর্দানে তাগদ সঞ্চয় করেছিল তারা আর জন-সমক্ষে তেমন উচ্চারণে সাহস পায় না। তাই বলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এমন ধারণা ভুল। পিঠের ব্যথা পেটে যেতে পারে। তখন চিকিৎসকগণ তার অন্য নামকরণ করে। কিন্তু ব্যথা ব্যথাই। সুস্থ শরীরের শান্তিহারী

রাজাকার শব্দটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকাল থেকে বহু পরিচিত। তারা ছিল পাকিস্তানীসৈন্যদের আজ্ঞাবহ গোলাম, কেউ কেউ বন্দুক বা অন্য অস্ত্রধারী অথবা নিরস্ত্র। এদের রাজনৈতিক রাজাকার বলা চলে। কিন্তু আরো এক ধরণের রাজাকার ছিল তখন। তাদের আখ্যা দেওয়া যায় "সাংস্কৃতিক" রাজাকার। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল না। ছিল কলম পেন্সিল তুলি ক্যামেরা ইত্যাদি। কিন্তু দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণির রাজাকার-ই সুবাদে যমজ সহোদর। একে অপরের পরিপূরক। পেশাদার খুনী হত্যা করে কিন্তু খুনের প্রেরণা যে যোগায়, সে অস্ত্রহীন হলেও বিচারে তার অপরাধ কী লঘু করে দেখা হয়? সাংস্কৃতিক রাজাকার পূর্বে ছিল, এখনও আছে। তবে তারা ভোল পাল্টে ফেলেছে। তাদের চেনা এখন সহজ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী শুধু নয়, সকল দেশপ্রেমিকের সতর্ক দৃষ্টি লাজেমী-ভাবে এই দিকে জাগ্রত থাকা উচিত। ভাষা-আন্দোলন কালের মুখোশহীন নগ্নমূর্তি ওই রাজাকারদের আমরা আর দেখব না। কিন্তু তারা ডাইনোসোরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমন ধারণা ভুল। চিন্তা, ভাবাদর্শের পরিণাম শেষ পর্যন্ত সংঘাত এবং কর্মময়তা বা অ্যাকশান। পরিস্থিতি গুণে আদর্শ ঘুনের উত্তেজনা যোগায় বৈকি। কবি সাহিত্যিক নাট্যকার সুরকার শিল্পী প্রমুখ সকল সংস্কৃতি-কর্মী কৃতকর্মের পরিণাম মনে রেখেই নিজ-নিজ সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেশবাসী তাই প্রত্যাশা করে। চোখ এমন ভাবে খোলা থাকলে নিজের ভুল সংশোধন অনেক সহজে হতে পারে। প্রশ্ন ওঠা সমীচীন, ভাষার উপর শাসক সম্প্রদায়ের এমন চোটপাট কেন? তার উৎস কোথায়? দলবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত, মেহনত এবং ভাষায় দৌলতে। রবীন্দ্রনাথে কথায়, ভাষায় মত জীবনে-জীবন- যোগ-করার এমন হাতিয়ার, অন্য প্রাণী পায়নি। হৃদয়সংবাদ বহনের এই যন্ত্রের গোটা সমাজে ও সামাজিক কাজে সংগতি দান করে। কিন্তু এখানে স্ববিরোধ এসে পড়ে। সেই স্ববিরোধের, মাশুল মানুষকেই দিতে হয়, অন্য কোন জীবকে নয়। দলবদ্ধ জীব মানুষ। ব্যক্তি-মানুষ সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টি। ভাষার জন্যই গোটা সমাজ তার মনের মধ্যে হারিয়ে যায়। এখানে "হারিয়ে যায়" অর্থ জায়গা। তার সম্ভব ভাষার মত সংকেত ইংরেজীতে কোড (code) থাকার ফলে। অন্যদিকে দলের মধ্য ব্যক্তি মানুষ হারিয়ে যায়। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব মানুষের অস্তিত্বের একটি শর্ত। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ভাষার ভূমিকা, চারুশিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় socio-linguistic relation বা সমাজভাষিক সম্পর্ক ইতিহাসের অন্যতম চালিকা শক্তি। পাকিস্তানের দণ্ডধরগণ এবং তাদের পূর্ব পাকিস্তানী এজেন্টরা বিন্দুমাত্র ভুল করেনি সমাজের যথা নাজুক স্থানে ঘা দিতে। মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে যে কোন জীবের নড়াচড়ার ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। ভাষা সমাজ দেহের অত্যন্ত প্রাণবাহী কেন্দ্র। তা ভেঙে দিতে পারলে যে কোন সমাজের মানুষ আর সংহতি খুঁজে পাবে না। বিচ্ছিন্ন বুদ্বুদের মধ্যে নিরেট, কংক্রিট আর কী পাওয়া যাবে? এমন ক্ষেত্র মানুষ হয়ে পড়ে আজ্ঞাবাহী গোলাম বা বাক-বিশিষ্ট রবোট (robot)। দেশের ভাষা ও সাহিত্যে সম্পর্কে কোন দেশপ্রেমিক উদাসীন থাকতে পারেন না, থাকা কর্তব্যের ত্রুটি। আমি আরো যোগ করব : মনুষ্যত্বের বিচ্যুতি।

ইংরেজ colonialist বা উপনিবেশবাদীরা ফার্সির জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষা খামখা বানায়নি। একশ সাতাশি বছর এই উপমহাদেশ পরাধীন হয়ে রইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ যেখানে প্রভু। উপনিবেশ-ত্যাগের সময় তারা পাঁয়তারা কষা শেষ প্রস্থান-পদাঘাত দিয়ে গেল। তার যন্ত্রণা আমরা ভোগ করছি স্বাধীনতার পর আজও। বিদেশী পুঁজি খাটানোর সুড়ং তারা কেটে গিয়েছিল রাজনৈতিক চাল মারফত।

ভাষা আপাতত শ্রব্য ক'টা শব্দ-সমষ্টি নয়। ইতিহাসের সড়কে আরো কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে গেলে একই দৃশ্য দেখা যায়।

বঙ্গদেশের পাঠান সুলতানদের আমলে বাংলা সাহিত্যের বেশ বিস্তার ঘটেছিল রাজকীয় প্রেরণায় হোসেন শাহ ও পরবর্তী আমলে সুলতানেরা নেহাৎ গরজে বাংলা-ভাষা-প্রেমিক হয়েছিল। ইতিহাসের পদক্ষেপ ব্যক্তির অগোচরেই হয়ে যায়।

কারণ, প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কাঠামো আছে। এবং সেখানেও আত্মসদৃশ persona বা প্রতিমূর্তি সক্রিয় থাকে। সেন-রাজাদের নিকট থেকে বখতিয়ার খিলজি রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। প্রাক্তন শাসকশ্রেণিকে isolate বা কোণঠাসা কর। ছিল তদানীন্তন নতুন অধিপতিদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। অন্যথায়, তারা নিজেরাই উচ্ছেদ হয়ে যেতেন। সাবেক শাসক-শ্রেণি ছিল ব্রাহ্মণ। রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত। বেদ-স্পর্শ পর্যন্ত শূদ্রদের জন্যে নিষিদ্ধ। ধর্মের নানা নিগড়ে ব্রাহ্মণ শাসকশ্রেণি কর্তৃক জনসাধারণের বিকাশ-পথ এমনই রুদ্ধ ছিল যে তাদের নিকট ত্রাণকর্তা রূপেই যেন সুলতানদের আবির্ভাব। সুলতানদের জন্যে জনগণের সমর্থন টিকে থাকার জন্যে বাধ্যতামূলক। তাদের নিজেদের সমস্যা তখন নিশ্বাসের জন্যে নাক-রক্ষা। নিজ অস্তিত্ব রক্ষা। কেউ যেন মনে না করেন। হোসেন শাহ বা অন্যান্য মুসলমান শাসকেরা ধার্মিকতার দ্যোতনায় বাংলা ভাষার প্রেমিক হয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

অতীতের শিকড়-সন্ধান ছাড়া ভবিষ্যতের পানে এগোনো কষ্টসাধ্য। দাগেস্তানী প্রবাদ : If you fire at the past with a pistol, the future will shot back from a cannon. যদি অতীতের দিকে পিস্তল ছোঁড়ো ভবিষ্যৎ তোমার পানে কামান দেগে জবাব দেবে।" ইতিহাসের অপব্যাখ্যার জন্য দিতে হয়, চড়া দাম। কারণ, ইতিহাসের গতি-পথ সম্পর্কে অজ্ঞতা। বাংলাদেশে বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপনকারী চার লক্ষ মোহাজের ভাই আছে। তাদের কোন রাষ্ট্র নেই, তার stateless. পাকিস্তানে তারা যেতে চায়। কিন্তু পাকিস্তান তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে আগ্রহী নয়। সম্প্রতি করাচী শহর বিহারী ও পাঠানদের দাঙ্গায় যে-কোন সৎ মানুষ দুঃখ বোধ করবে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের এই দুর্দশা ইতিহাসের অপব্যাখ্যার ফল, গতিপ্রকৃতি না জানার পরিণাম।

বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনার নকীব। আমি আশা করব, তাদের দায়িত্বের মধ্যে গবেষণার স্থান যেন থাকে খুব উঁচু পর্যায়ে। কারণ, গবেষণা অতীত-তথা ইতিহাসকে জানার অন্যতম সুষ্ঠু উপায়। অবিশ্যি গবেষণার নামে বিবরণ ধর্মী এক ধরনের বস্তা পচা পুঁথি কীর্তন শোনা যায়। কর্তৃপক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণার বিষয় বস্তু ও গবেষক নির্বাচনে যত্নশীল হবেন। ইতিহাসের পটভূমির মোজেক রূপেই যেন তাদের ফসল জন সমক্ষে উপস্থিত হয়।

বর্তমান ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় সুষ্ঠু জ্ঞান-বিকীরণের পথেই আসতে পারে। সত্যের সন্ধান সামাজিক শ্রীবৃদ্ধিরও পথ। পুরাতন কথা। তবু পুনরুক্তি করতে হয়।

বাংলা একাডেমীর পত্তন ইতিহাসের সড়কে। সামাজিক এই পটভূমি যেন একাডেমী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে না যায়। বিশেষভাবে তারা যেন আরো মনে রাখেন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও এ যুগে অজাতশত্রু নয়। সঙ্কুচিত পৃথিবীতে হামলা শুধু 'লোকাল' (Local) মোকামী থাকে না ; আন্তর্জাতিক হতে পারে। প্রাক্তন উপনিবেশবাদী– আরো স্পষ্টত সাবেক সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতির উপরও থাবা মারে নিজেদের অতীত স্বার্থ বজায়ে। বিড়ালের মত নরম পশমে ঢাকা থাকে তাদের থাবার নখর। অবিশ্যি উপনিবেশের একদা প্রভুরা জানে : তে হি না দিবসা ঃ। সেই দিন আর নেই। চোখ রাঙিয়ে ভুরু নাচিয়ে আর কার্যোদ্ধার সম্ভব নয় বর্তমানে। মাত্র ছেষট্টি বছর পূর্বের ঘটনা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। মিশরের কায়রো শহরে একটা ইংরেজ পুলিশ মেরে ফেলেছিল উত্তেজিত জনতা। বৃটিশ সৈন্যরা বেধড়ক গ্রেপ্তার, লুটপাট চালিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। নরগবাসীদের শাস্তি দেওয়া হলো, এক মাস তারা চার-হাত পায়ে হামাগুড়ি গিয়ে ওই রাস্তা পার হবে। এক মাস এই ফরমান চালু ছিল। জনাকীর্ণ নগরে-কেন্দ্রের পথ। মজবুর বহু পথিককে ওই ভাবে চতুষ্পদ সাজতে হয়। এমন অসংখ্য মানবেতর আচরণের বিবরণ দেওয়া যায়। ফরাসী ইংরেজ ডাচ মার্কিন প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা কালা মুলুকে সকলেই হিটলারের জারজ বাচ্চা বনে যেত। মার্কিন পুঁজিবাদ বিস্তারের অধ্যায় এমনই রক্তাক্ত নৃশংসতার কাহিনী। মুনাফা এবং নিজেদের বিলাসবহুল আয়েসী জীবন-যাপন থেকে আরও ওইসব সভ্য জাতি তৃতীয় বিশ্বের জন্যে এতটুকু ত্যাগ-স্বীকারে রাজী নয়। তারা ভিক্ষা বা খয়রাৎ অবিশ্যি দান করে। তা 'এড' (aid) নামে পরিচিত। কিন্তু সে-সবের শর্ত কোন স্বাধীন জাতির জন্যে সম্মানজনক নয়। এবং দেখা যায়, এই বদান্যতা তথা ঋণের ভারে অনুগ্রহ প্রাপ্ত দেশ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে মাটির উপর। তাদের উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি তো দূরের কথা, গণতন্ত্র মার খায় প্রচণ্ডভাবে। স্থানীয় দেশী এজেন্ট-দালালদের সঙ্গে যোগসাজশে বিদেশী ঋণদাতারা কর্তৃত্ব প্রধান অথারিটেরিয়ান (authoratarian) শাসনভার চাপিয়ে দেয় অস্ত্র সরবরাহ মারফত। প্রাক্তন উপনিবেশে ওরা রাখ-ঢাক-হীন সোজাসুজি নগ্ন মোকাবিলা করত। বর্তমানে প্রকাশ্য সাম্রাজ্যবাদ ভগ্ন-মাজা। তাই শোষণের খেমটা নৃত্য চালু রাখতে ঘোমটা প্রয়োজন হয়। মহাজন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন অদৃশ্য থেকে এবং দূর থেকে রশি টানে। ওদের অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী দেশী এজেন্টগণ নফরের কাজ করে। যেহেতু তৃতীয় বিশ্ব সভ্যতা তথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, তাই উক্ত প্রাক্তন উপনিবেশবাদীরা তাদের উন্নত যন্ত্র-উৎপাদিত চকচকে নানা পণ্যের ঝলকে অধিবাসীদের– বিশেষত তরুণদের – চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ব্লু জীনের পাৎলুন, টু-ইন-ওয়ান এবং এই জাতীয় গ্যাজেটের আকর্ষণে মোহগ্রস্ত বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়। জওয়ান কালে ওইসব জিনিসের প্রতি লোভ স্বাভাবিক। তারা তলিয়ে দেখতে শেখে না, যে-সভ্যতার ঝলক এমন নেশাপ্রদ, তার মানবিক উৎপাদন– (human product)– ১৯১৮-৩৮ মাত্র কুড়ি বছরে কেন একে অপরের গলা কাটার জন্যে দু-দুটো মহাযুদ্ধ করল? প্রাণের অপচয় পাঁচ কোটি মানুষ। সম্পদের হিসেব বাদ দিলুম। তবু একটি নিরীক্ষার কথা না বলে পারলুম না। এক অর্থনীতিবিদ লিখেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-সম্পদের অপচয় ঘটে তা মানব কল্যাণে নিয়োজিত হলে, পৃথিবীর প্রত্যেক নাগরিক-কে প্রতিদিন এক পাউণ্ড রুটি অন্তত বিনামূল্যে বিতরণ করা যেত। বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজের আশি ভাগ এক সময় জার্মানীর একচেটে ছিল। সেই বিজ্ঞানমনা জার্মানীতে কী করে হিটলারের আবির্ভাব ঘটল ভেবে কুল পাওয়া দায়। অবিশ্যি ছয় লক্ষ ইহুদীকে হিটলার বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হত্যা করেছিল গ্যাস-চেম্বারে। বন্দীদের দাঁত বাঁধানো সোনাটি পর্যন্ত খুলে নেওয়া এবং তাদের চামড়া দিয়ে লাইটের শেড বানানো হতো। All that glitters is not gold যা চকচকে করে তা-ই সোনা নয়। প্রবাদটা ইউরোপের এবং ইংরেজের। তৃতীয় বিশ্বের তরুণদের প্রবাদটি মনে গেঁথে রাখা উচিত। শুধু বাইরের আড়ম্বরে মানুষের আত্মা গড়ে ওঠে না। সভ্যতাগর্বী জাতিগুলো অনুন্নত দেশের সংস্কৃতির উপর হামলা চালায় খুব সতর্কতার সঙ্গে, অতি সন্তর্পণে নানা পাঁয়তারাসহ।

বাংলা একাডেমীর সেদিকে সজাগ থাক উচিত। কারণ, সংস্কৃতির কারিগরি দিকের দায়িত্ব এমন সব প্রতিষ্ঠানের। অনেক সময় পাউন্ড-ডলারের থলি হাতে ওরা হাজির হয়। হা-ভাতে দরিদ্র জাতি আমরা। আমাদের পক্ষে ওদের ফিরিয়ে দেওয়া সহজ হয় না। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে থাকে মজকুর সভ্য জাতির পর। বাংলা একাডেমীর চোখ যেন খোলা থাকে এমন ক্ষেত্রে। যদিও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তবু জানা দরকার, শিল্প-সাহিত্য কার জন্যে, কিসের জন্যে? উপযোগিতা বা utilty এই প্রশ্নে অনেকে নাক সিটকাতে পারেন। তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের পক্ষে বর্তমান পুঁজিবাদী সভ্যতার মুখোশধারী তথাকথিত আন্তর্জাতিক ফড়ে-দালাল-মার্কা হাঙরদের হাঁ মুখের ব্যাদান-মোকাবিলায় সৌন্দর্য থেকে উপযোগিতার প্রশ্ন আলাদা থুয়ে রাখা অন্যায় নয় শুধু, চরম মূর্খতা। বিবেক, রুচি গঠনের পরোক্ষ-ভার বাংলা একাডেমীর উপর ন্যস্ত বৈকি।

শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের আরো লক্ষ্যস্থল থাকে ব্যক্তিপর্যায়ে। সংসকৃতিসেবী ব্যক্তিদের সামনেও তারা টোপ ফেলে। দরিদ্র তৃতীয় বিশ্ব। দরিদ্রতর লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্রকার, সুরকার প্রমুখ জন। তৃতীয় বিশ্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতিসেবী সন্তানদেরও জানা উচিত, ব্যক্তি পর্যায়েও সভ্য জাতির দুরভিসন্ধি ও নাশকতা অব্যাহত থাকে। এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল দেশের নাগরিক এবং শিল্পের সাধক হিসেবে। স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির উপরই শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ এবং আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। স্পেনের কবি লোর্কারই স্বদেশবাসী আর এক আধুনিক কবি গ্যাব্রিয়েল সেলায়া Gabriel Celaya তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র হিসেবে চিৎকার দিতে বিস্মৃত হন না। ইউরোপের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ স্পেন ও পর্তুগাল। ওদের অবস্থা অনুন্নত দেশের মতই। তাই বোধ হয়, কবি সেলায়া ফুকার দিয়ে ওঠেন–

Let us not be poet, baying like a solitary hound in he night of crime. খুন-খারাবীর রাত্রে নিঃসঙ্গ কুকুরের মত আর্তনাদ উত্থাপনের মত কবি যেন আমরা না হই।

আমার মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি-কর্মীদের কর্তব্য তিনি যথাযথ চিহ্নিত করেছেন। কবি আরো বলেন–

Let us be like those poetss-the great, the only, universal ones who instead of speaking to us from without as in a confessional, speak within us and stimulate that indentification with them or of them with us, which guarantees their authenticity.

যদিও গ্যাব্রিয়েল সেলায়া এখানে কবিদের আদর্শ উত্থাপন করেছেন, তবু সেই জায়গায় প্রত্যেক সংস্কৃতি-সাধক যে-যার বিভাগীয় পূর্বসূরীদের নাম বসিয়ে নিতে পারেন। এই আহ্বান তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক কর্মীর জন্যে। কবি বলছেন সকলের আদর্শ পুরুষ এমনই ব্যক্তি হওয়া উচিত, যিনি অনন্য এবং বিশ্বজনীন পর্যায়ে পৌছেছেন। তাঁদের বাণী বাইরে থেকে কথিত নয় যেমন পাদ্রীর নিকট স্বীকারোক্তিতে ঘটে। তাঁরা বলেন ভেতর থেকে যা তাঁদের সঙ্গে আমদের অথবা আমাদের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা উদ্দীপিত করে। যার ফলে তাঁদের অকৃত্রিমতার আর সন্দেহের কোন জায়গা থাকে না।

তৃতীয় বিশ্বের সকল কবি সাহিত্যিক শিল্পী প্রমুখের আদর্শ পথ এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিট্যুশানে দায়িত্ব আরো বেশি। তাই আমি মনে কবি প্রতিষ্ঠান স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া একান্ত দরকার, যেন কোন বিবেকের প্রশ্ন মোকাবিলায় পরমুখাপেক্ষী না হতে হয়।

দুঃখের বিষয়, বাংলা একাডেমী একত্রিশ বছরেও তেমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। অস্তিত্ব সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতি-পরিখা থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়, তা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা উচিত। স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপর জোর দেওয়ার হেতু, তা–ছাড়া বাংলা একাডেমীর জ্ঞান এবং বিবেক সাধনার মহৎ পীঠে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। দারিদ্র্য কাউকে মহৎ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। নজরুল নিজের জীবন উদাহরণে প্রমাণ করে গেছেন, বৃহত্তর সম্ভাবনাময় মহীরুহ কীভাবে অকালে শুকিয়ে যেতে পারে। অন্য আর এক বিপদ আছে। সব রকম অনুদানের পেছনে রশি থাকে। নুন খেলে কিছু গুণ গাইতে হয়। তখন বিবেকের সঙ্গে আপোষের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কোন প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা এবং পবিত্রতা রক্ষা এমন ক্ষেত্রে দায় হয়ে পড়ে। উদাহরণ বহু দেওয়া যায়। হাতের কাছ থেকে একটি : কুড়ি হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত তার অত্যাচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি প্রায়শ্চিত্তিস্বরূপ যাকে রক্ষা করতে পারেনি এবং দেশে দেশে ইঁদুরের মত আশ্রয়-সন্ধানে পরে দেশে দেশে হন্যে তৎপর হতে হয়েছিল যে ব্যক্তি মহোদয়কে সেই ইরানের শাহকে কী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়– হোক তা অনারাবি – ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়নি?

নেপথ্য–পেছনের কাহিনী আন্দাজ করা আদৌ কঠিন নয়। পাকিস্তান সরকারের চাপ ধর্মী অনুরোধ বিদ্যা নিকেতনের কর্তৃপক্ষকে রক্ষা করতে হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার শা'কে তোয়াজ করার অভিলাষী। কারণ, উভয়ের সাদৃশ্য শোষণের ক্ষেত্রে। এক বিধবা আর এক বিধবাকে বোন ডাকে। বাহ্যত ইরান ও পাকিস্তানের বন্ধুত্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নাকি গড়ে ওঠে। অন্তত তা-ই প্রচার করা হয়। অথচ ফরাসীদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে পাকিস্তান সরকার টু শব্দ পর্যন্ত তোলেনি। বলা বাহুল্য, আলজেরিয়া মুসলমানের দেশ এবং তার শতকরা কুড়িজন অধিবাসী (পাঁচ জনের পরিবারে এক জন) প্রাণ-বিসর্জন দিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ তখন কোথায় ছিল, খোদা-কে মালুম। আমাদের নিকটে অবিশ্যি থোড়া থোড়া মালুম। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে ফ্রান্স ছিল পাটের খরিদ্দার হিসেবে নাম্বার টু–দুই নম্বর খরিদ্দার। সোনালি আঁশ বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করে। ফ্রান্স তখন সেই স্বর্ণপ্রসবিনী প্রাবাদিক হংস। এমন হাঁসকে কী বধ করা যায়? তাদের চটানো ত মুর্খতা। বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া করাচী মুলতান লাহোর প্রভৃতি শহরে বিরাট আধুনিক যন্ত্রশিল্প কী করে গড়ে উঠবে? তেজারতীর নিকট ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তুচ্ছ। পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র মুসলমান চাষী ভাই পচা পানিতে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে দেহময় পাঁচড়া রোগ-সহ পাট কাচে অর্থাৎ সোনালী আঁশ তৈরি করে। ওদের কথা পাকিস্তান সরকারের মনেও থাকেনি। আভিজাত্য, রুচির প্রশ্ন আছে না? পচা ডোবার দিকে কেন বোরা-ম্যামন প্রভৃতি ব্যবসাদারদের তোষণকারী সরকারের নজর যাবে? এই জন্য বলছি, অনুদান বা অন্যান্য সাহায্য ইনস্টিট্যুশানের জন্য কল্যাণকর নয়।

বর্তমান যুগে শুধু মোকামী নয়, বিদেশী দুশমনদের কথাও ত হিসাবে রাখতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের নবলব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃতভাবে টিকিয়ে রাখা দায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদিবা মেলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিকিয়ে যায়। নেই ভাত তো জোড়হাত। বাংলা প্রবাদ স্মরণীয়। স্বাধীনতা হয়ত কোন রকমে টিকে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তা ভগ্ন মেরুদণ্ড এমন কী নৈতিক মেরুদণ্ড পর্যায় চূর্ণবিচূর্ণ।

এই মানবেতর চেতনার বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক ইনস্টিট্যুশানের, প্রতিটি দেশপ্রেমী ব্যক্তির। গণতান্ত্রিক মানস-আবহাওয়া গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক। সমাজ গঠনে এবং আত্মিক উন্নয়নে। অবিশ্যি গণতন্ত্রের নানা সংজ্ঞা চালু আছে। পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত মহলে। ইংলন্ডে এখনও রাজা-রানীর পালা বর্তমান। তবুও তা গণতন্ত্র এবং কেউ কেউ মন্তব্য করে : উত্তম গণতন্ত্র। গ্রীক নগর রাষ্ট্রে হাজার হাজার ক্রীতদাসদের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না, ভোট তো দূরের কথা। তা-ও নাকি গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা-পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায়।

আমার গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কিন্তু মনে রাখা খুব সহজ। একটি দেশে কতখানি গণতন্ত্র চালু আছে তা নিরূপণও প্রায় বিনা মেহনতে সম্ভব। জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে দৈনন্দিনতার প্রবাহ পটে ও অন্যন্য পর্যায়ে দেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা কতখানি চালু আছে? এমন প্রশ্নের উপরই হিসেব করা যায়, গণতন্ত্রের পরিমাণ কতখানি বা কতটুকু। অনুপাতই সেখানে আসল পরিচয়। সত্তর বছর পূর্বে জন্মেছিলাম। বর্তমান মেট্রিক বিন্যাসের তখন প্রচলন ছিল না। সেকালে টাকার মূল্য ছিল ষোল আনা। তা দিয়ে অনুপাত (ইংরেজি রেশিও) নির্ধারণ হতো। যদি দেখা যায় দেশে মাতৃভাষার ব্যবহার বারো আনা, তাহলে ওইখানে আছে বারো আনা গণতন্ত্র, বাকী চার আনা ফু-ফু ফুসমন্ত্র। দশ আনা মাতৃভাষার প্রচলন থাকলে দশ আনা গণতন্ত্র, বাকী ছ'আনা ফাঁকিজুকি যন্ত্র। আট আনা আট আনা চালু থাকলে অর্ধেক গণতন্ত্র বাকী অর্ধেকে হাড়-পেষাই মুড়িঘন্ট। যদি চার আনা মাতৃভাষার ব্যবহার চলে, তাহলে চার আনা গণতন্ত্র বাকী বারো আনার চৌহদ্দি ঝলমল, চকমকে বিবির বেড রুম পর্যন্ত। এইভাবে নানা অনুপাত নির্ধারণ করা যায়। অবশ্যি পণ্ডিত পলিটিসিয়ানরা নানা চুলচেরা তর্ক জুড়তে পারেন। সাধারণভাবে আমার মানসাঙ্ক খুব সহজেই কষে নেওয়া যায়। বিশেষ মেহনত লাগার কথা নয়।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, কতো দিকে না চোখ রাখতে হয় বর্তমান যুগে কোন আদর্শের নিকটে পৌঁছুতে। পরিবেশ-সচেতনতা অবিশ্যি সব যুগেই দরকার হয়। কিন্তু হাল-জমানায় তাছাড়া এক পা এগোনোর উপায় নেই। উনিশ শতকের পৃথিবী গায়েব। প্রযুক্তি বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের মহিমার পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে কিন্তু দায়িত্ব অনুপাতে প্রচণ্ড বিস্তৃত। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও তা থেকে রেহাই নেই। তার অর্থ এই নয় যে স্বদেশে চতুর্দিকে প্রাচীর তুলে আমাদের বসবাস করতে হবে। রাজনৈতিক মানচিত্রে সীমান্ত (ফ্রন্টিয়ার) থাকতে পারে। কিন্তু আজব এক রাজ্য সাংস্কৃতিক রাজ্য– যেখানে সীমান্ত অচল, যেখানে কাঁটা তারের বেড়ার প্রস্তাব উত্থাপনও মুর্খতা। সাংস্কৃতিক সম্পদে কোন জাতির একচেটে অধিকার থাকে না– তার সূত্রপাত যেকোন দেশেই হোক না কেন। আবু সীনা, আবু রুশদ কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইবনে খলদুন মুসলমান ছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টান না অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট তাঁরা অস্পৃশ্য হবেন – এমন চিন্তা এক রকমের আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার সামিল। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি তা ইউরোপের অবদান। আরো চিহ্নিত করে বলা যায় তা খ্রিস্টান এবং ইহুদীগণের অবদান। ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন আলবার্ট আইনেস্টাইন। এই আপতিক উপাদানের জন্যে তাঁর সাধনা লব্ধ ফলকে যদি কোন মুসলমানা অস্বীকার করে তা আত্মহত্যা ছাড়া আর কী? গোটা পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে আইনেস্টাইনের কল্যাণে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের উৎস সেইখানে। এমন উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়। ম্যালেরিয়ার জুলুমে কুষ্টিয়া যশোর খুলনা প্রভৃতি জেলার গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে উনিশ শতকে। বিদেশী ডাক্তার– খ্রিস্টান অবিশ্যি– ডেনিসন রস ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ বের করলেন কলিকাতা শহরের এক ল্যাবোরেটরির ভেতর বছরের পর বছর গবেষণার ফলে। গবেষণা নয়, একে এবাদত তপস্যা বলা যায়। এই মহাপ্রাণ ইংরেজ কী খ্রিস্টান বলে শ্রদ্ধেয় নয়? মানুষের দুর্দশা-দুঃখ, রোগভোগের যন্ত্রণা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ওই মহতী সাধনায়।

যাদের নাম করলাম, তাঁরা সকলেই বিশ্বনাগরিক। উনবিংশ শতাব্দীর উগ্র জাতীয়তাবাদ বর্তমান যুগে অচল। জাতিপুঞ্জের পত্তন তো সূত্রপাত। প্রাচীন মহাপুরুষেরা স্বপ্ন দেখেছিলেন মানবজাতি সম্পর্কে : একটি পরিবার একটি আকাশের নীচে। সেই পথেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। নচেৎ দানব আণবিক বোমার যুগে গোটা মানব-জাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী।

বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ সর্বের হবে বৈকি। একদা বর্ধমান হাউসেই বাংলা একাডেমী বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত। একাডেমীর ঠিকানায় বর্ধমান হাউসের উল্লেখ থাকা উচিত। সংস্কৃতির লক্ষ্যই বিস্তার এবং সীমান্ত উত্তরণ। বর্ধমান শব্দ সেই দ্যেতনা বহন করে। হাউস শব্দও থাকা দরকার। কারণ, এই ইনস্টিট্যুশান কোন রকম কূপমণ্ডুকতার আশ্রয় স্থল নয়। তা ঘোষিত হয় ওই ইংরেজী শব্দে। একাডেমী তো গ্রীক শব্দ, প্লেটোর নামের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু বিদেশী শব্দ তা কো সংস্কৃতি-পূজারী পরিশীলিত মনের মানুষ বাদ দিতে বলবে?

গোড়ায় উল্লেখিত, বাংলা একাডেমী সারি সারি ঐতিহ্যের দিকশূল। মানুষের স্বাধিকার, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, মানবিক মর্যাদার ঝাণ্ডা চিরউড্ডীন রাখার শপথ এবং এমনতর আরো মূল্যবোধ উজ্জীবনী চেতনার উৎস।

এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবী অবলোকনের জানালা, জ্ঞান-চর্চার বিশাল নিকেতনরূপে কালে কালে বিস্তার লাভ করুক।

বাংলাদেশের ঠিকানা হোক বাংলা একাডেমী।

এই স্বপ্ন আমি পোষণ করে যাব তাবৎ জীবৎ কাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যীশুখ্রিস্ট শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে

এইমাত্র আমরা শ্মশান থেকে ফিরে এলাম।

এইমাত্র আমরা কবরস্থান থেকে ফিরে এলাম।

আমাদের পদবী কি জিজ্ঞেস করো না। তার জবাব দিলেও অর্থ তোমাদের বোধগম্যের বাইরে থেকে যাবে।

"আমরা চিতাগোরী"।

এমন উত্তর দিলে তুমি কি বুঝবে? তুমি নিশ্চয় এমন শব্দ কোনদিন তোমার কানে পড়েনি।

তাই ব্যাখ্যা দরকার।

চিতা এবং গোর-শ্মশান ও গোরস্থান আমাদের গন্তব্য। আমাদের জীবনের আর কোন লক্ষ্য থাকে না। শুধু ওই দুই জায়গায় পৌছলে আমাদের পাওয়া হয়ে যায়। মানব জীবনে কতো রকম আশা-আকাংক্ষা, সাধ-কামনা থাকে। তা আমরা শুনেছি মাত্র। তার বেশি আর কিছুই জানা নেই। মৃত্যুই আমদের চরম গন্তব্য, চরম আদর্শ। তাই ধ্বংস হওয়ার যতো রকম ফন্দী আছে, তা আবিষ্কার করতে হয়। সবই এক লক্ষ্যে এগোনো : মৃত্যু, মৃত্যু। তাই উৎসব সিথানে আমরা কাঁদি। আমরা সেই গোত্রে পড়ি, বিবাহের দিনে যারা কাঁদে।

এইমাত্র আমরা শ্মশান থেকে ফিরে এলাম।

এইমাত্র আমরা কবরস্থান থেকে ফিরে এলাম।

"আমরা চিতাগোরী"।

ওই দুই তীর্থস্থানে আমাদের সকল পুণ্য সঞ্চয় হয়।

২

আমার খেদোক্তি অনেকের কাছে হেঁয়ালি ঠেকতে পারে। কিন্তু আমার কথনে কোন অতিশয়োক্তি নেই।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকাও।

ওইসব দেশের নাগরিকদের গড়-আয়ুর পরিসংখ্যানের দিকে তাকাও। তাহলেই আমার কথার মর্মার্থে সেঁধোতে পারবে। শুধু ভূমধ্যসাগর পার হয়ে যাও। দেখবে, ওদের সত্তর বছরে কম কেউ বাঁচে না। ফরাসী, ইংরেজ, জার্মানদের গড়-আয়ু বাহাত্তর। রাশিয়া আশি পেরিয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি বাঁচে নরওয়ে সুইডেনের মানুষ। ওরা গড়ে নব্বুই পেরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব গেল ভূমধ্যসাগরের সে-পারের কথা এবার এপারের দিকে তাকাও। এশিয়া শ্রীলংকার মানুষ বাঁচে ৫৬ ছাপ্পান্ন বছর। এশিয়ার সর্বোচ্চ। ভারত বাহান্ন। আমরা পঞ্চাশের নীচে।

আমরা এত কম কেন?

কারণ, আমরা চিতাগোরী। আমাদের এই পদবী বুঝতে এখন কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। পরম প্রশান্তি নাকি মেলে মৃত্যুর পর, প্রাজ্ঞজনেরা বলে গেছেন। তাই মৃত্যুর আহ্বানেই আমরা তড়িঘড়ি সাড়া দিই।

নরওয়ে, সুইডেনে বৃদ্ধজনেরা আত্মহত্যা করে অপেক্ষাকৃত তুলনায় বেশি। কারণ, জীবনের প্রায় সবকিছু চাওয়া ওদের পাওয়া। আহার আরাম শিক্ষা দীক্ষা, হৈ-হুল্লোড় আনন্দের নানা উপকরণ। কিছুই আর চাওয়া থাকে না জীবনে। নরওয়ে সুইডেনের বুড়োরা একঘেঁয়েমিজাত ক্লান্তি বা ইংরেজীতে যাকে বলে Boredom (বোরডম)-এ ভুগে। শেষ তাই বুড়োগুলো নিজকে নিজে হত্যা করে। আর তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ বাংলাদেশের আত্মহত্যা করে কম-বয়সী তরুণ-তরুণীরা বেশি। কারণ, তারা জীবনের সাধারণ অনেক কিছু পায় না। যে দেশের খাদ্য অন্যদেশের চালানের উপর নির্ভরশীল, তাদের বহু মানুষ যে পেট ভরে খেতে পায় না, তা চক্ষু বুঁজে বলা চলে। যৌবনে আহার লেবাসের লোভ বেশি থাকে। অথচ তখনই তা দুষ্প্রাপ্য অথবা সহজে জোটে না। কতো শিক্ষিত জন বেকার থাকে। সামাজিক ঘেরাটোপে মেয়েদের অবস্থা আরো সঙ্গীন এবং সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ। এমন অসহায় অবস্থায় জীবনে স্বাদ স্বাভাবিকভাবে আর থাকে না। তখন জীবনই অনেকে খতম করে দেয়।

AMARBOI.COM

অথচ সমাজের পরিচালকগণ বাঁচার উপদান সংগ্রহের দিকে মন দেয় না। ইহলৌকিক খাদ্যের চেয়ে পারলৌকিক খাদ্য পরিবেশন করে অনেক বেশি। আসল পথে কেউ হাঁটে না। সামাজিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলার ভয়ে। তাই যেসব চিন্তা তোমাকে তাড়াতাড়ি করব বা শ্মশানের দিকে ঠেলে দেবে, তেমন চিন্তাই অহরহ ছড়ানো হয় সামাজিক বাতাসে।

জীবনের বোধ আর কোথা থেকে আসবে?

তাই মৃত্যুর ডাক আমাদের কাছে সহজে পৌঁছায়। হাতেম তায়ের পুঁথিতে কো-ই-নেদা (পর্বতের ডাক)র যে কাহিনী আছে তেমনই ডাক আসে আমাদের যাব পরিণাম অবধারিত মৃত্যু।

আত্মক্ষয়ের যতো রকম সড়ক আছে, সবই আমাদের তরে উন্মুক্ত থাকে। পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য যখন ভায়ে ভায়ে আত্মকলহ মত্ত হয়। একথার ব্যাখ্যা দরকার হয় না। পরিবারের ক্ষেত্রে যা সত্য দেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত ধ্বংস ডেকে আনে। এই ফন্দীর ফাঁদ আমাদের সহজেই আকৃষ্ট করে। কারণ, আমরা চিতাগোরী। অভিজ্ঞতা থেকে – যেহেতু ঠেকে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ শেখে, আমরাও তাও শিখি না।

একটি উদাহরণ তো সহজে দেওয়া যায়।

দ্বিজাতিতত্ত্ব অর্থাৎ মুসলমানরা এক জাতি, হিন্দুরা আর এক জাতি। ধর্ম অনুসারে জাতীয়তা নির্ণয়। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী একদা অখণ্ড ভারতবর্ষের খণ্ডিতরূপে আর এক রাষ্ট্রের উত্থান ঘটল। পাকিস্তানের ঠিকুজী ইতিহাসে সুবিদিত। কিন্তু দেখা গেল, পাকিস্তানের দুই খণ্ড আবার বারো শ' মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। বিজ্ঞানের যুগে স্থানিক দূরত্ব কিছু ধর্তব্য নয়। কিন্তু দুই খণ্ডে মানসিক দূরত্ব আকাশ পাতাল ফরাক। অথচ দুই খণ্ড এক ধর্ম বা মুসলমান অধ্যুষিত। কিন্তু এই ধর্মীয় ঐক্য কোনো আন্তরিক ঐক্যপথ তৈরি করে না। ঠুনকো সুবাদ। তাই পাকিস্তানের কবরের উপর আমাদের স্বদেশ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল।

এ ত সেদিনের কথা। মুক্তিযুদ্ধকালে তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত এখনও স্মৃতিপটে টাটকা দগদগ করছে। বুদ্ধিজীবীদের আত্মদান নির্দয় জন্তু ছাড়া আর অপরের পক্ষে বিবরণ অসম্ভব। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা কি কোন কাজে লেগেছে? দ্বিজাতি তত্ত্ব একটা ভুয়ো তত্ত্ব, ইতিহাসে প্রমাণিত। তবু এক শ্রেণির মানুষ আজও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্প্রদায়গতভাবে বা সাম্প্রদায়িকভাবে করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে কেন? এখন দেখা যাচ্ছে, দ্বিজাতি তত্ত্বের মৃত্যুর পর তার প্রেত আজও নেচে বেড়াচ্ছে শয়তানী প্ররোচনার মত।

তাই দেশে মাঝে মাঝে মৃগী রোগীর খেঁচুনির মত হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। যুগাযুগান্তের মূল্যবোধের উপর দিয়ে রোলার চলে যায়।

এখন স্পষ্ট, একদা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের নেতাগণ সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সমাধানে যে পথ বেছে নিয়েছিল, তা ফেল করে গেছে। এসব বুঝাতে কারো চোখে আঙ্গুল দেয়ার প্রয়োজন আছে কী?

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যে-স্বাধীনতা এসেছিল, তা বৃহত্তর মানবতার দিক থেকে অন্তঃসারশূন্য, জোরগলায় বলা যায়।

এই জন্যে স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ বিশেষভাবে অপরিহার্য।

পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভ অবিশ্যি স্বাধীনতা। বৃটিশের দাসত্ব ঘুচালাম, পাকিস্তানী গোলামীর মাথায় পয়জার মারলাম। তা অবিশ্যি স্বাধীনতা।

কিন্তু মানব সমাজ কখনও অনড় থাকে না। তার প্রত্যেক পদক্ষেপের আঁকেবাঁকে অভিযোজন (adjustment) অপরিহার্য। অন্যথায় দুর্বিপাক অবশ্যম্ভাবী। একটি অতিসরলীকৃত উদাহরণ মারফত বলা যায়, পাঁচ বছর বয়সী বালক-বালিকার যে জামা ছিল, তা আর কৈশোরকালে গায়ে লাগবে না। জামা বদলাতে হবে।

এই বদলানোর প্রক্রিয়া সংঘাতময়। কারণ একঅংশে অনড়ত্ব গজিয়ে ওঠে। কায়েমী স্বার্থ এইভাবে বুনিয়াদ পাকা করে। সহজেই তা পরিবর্তন বিমুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই জন্যে স্বাধীনতার পদে পদে সংজ্ঞায়ন প্রয়োজন। এইখানে অনেকে মারাত্মক ভুল করে।

পরাধীনতাজাত মুক্তির পর স্বাধীনতা অন্য রূপ পায়। কারণ, পরিস্থিতি ভিন্ন। সমাজ প্রবাহে অনড়তা মিথ্যা, অসম্ভব। এই জন্যে অভিযোজন পদে পদে দরকার। স্বাধীনতা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ সুগম করে। কিন্তু তা ব্যক্তি স্বাধীনতা নয়। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব শব্দ দুটি খুব মনোযোগের সঙ্গে বিচার্য। স্বাধীনতা ব্যক্তিত্বের জন্যে স্বাধীনতা। ব্যক্তি মানুষের কাছে স্বাধীনতা সেভাবে আসতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের কাছে তার দায়বদ্ধতা আছে। তার জন্যে যা খুশি করার অধিকার নেই। এমন স্বেচ্ছাচারিতার প্রস্তাব দলবদ্ধ সমাজে অচল। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের দায়-দায়িত্ব তাকে আরো নানা সামাজিক বন্ধনে বাঁধে যা তার এবং দেশের সকল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে দিতে সক্ষম।

ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব এবং দলবদ্ধতার বৃত্তে ইতিহাসের চাকার আবর্তন ঘটে।

সমাজের শত্রুরা কিন্তু ঘোলা পানিতে শিকার করে। তারা ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বের ফারাক ঘুলিয়ে ফেলে অথবা জীবনধারার নানা ভাষ্য রচনা করে নিজেদের স্বার্থ-অনুযায়ী। তখন আদর্শের খণ্ডায়ন শুরু হয়। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মে এই ব্যাপারটা দেখা যায়। গোড়ায় থাকে এক অখণ্ড। তারপর খণ্ড খণ্ড। আরবীতে বলে "ফির্কা" সম্প্রদায়, পার্টি অর্থে। যেমন, সুফী মতবাদ ইসলামের একটি অঙ্গ। কিন্তু সুফিদের মধ্যে আবার তিন চার ভাগ আছে। জৈন ধর্মে হীনযান, মহাযান। তাদের মধ্যে আবার উপভাগ। এইভাবে খন্ডায়ন চলে বর্তমান রাজনৈতিক মতবাদেও দশা। সমাজতন্ত্রের "ফির্কা" বহু। রুশচৈনিক তো মোটা দাগ। তারপর মিহিদাগের অন্ত নেই। শিয়া-সুন্নীর কথা অনেকে জানেন। চৌদ্দশ বছরেও তার ফয়সালা হল না। অথচ গোড়া সব আদর্শ অখণ্ড থাকে।

তাই ইতিহাসের চাকার হদিস না জেনে যদি রাষ্ট্রনায়কগণ দেশ পরিচালনা করেন, তাহলে বাদ বিসম্বাদের কোন পরিসমাপ্তি ঘটবে না। অন্যায়কে তখন ন্যায় বলে চালানোর গা জুরি চলতেই থাকবে। এমন কালেই সামাজিক নানা উৎপাত, দেখা দেয় মতবাদের ক্ষেত্রে তো বটেই, আরো দেখা দেয় মূল্যবোধের অসহায় দুর্দশায়। এমন পরিস্থিতিতে যীশুখ্রিস্ট জুডাসের হাঁকে শূলে চড়ে। 'সামাজিক মাস্তানদের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বেই বিচার বুদ্ধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শনকারী চিন্তাবিদ মাস্তানদের আবির্ভাব ঘটে দেশে।

আজ ১৬ ডিসেম্বর।

এই দিনের বৈভব-মহিমা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশে এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে, দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অধমের এই সামান্য কথা ক'টি পরিবেশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রপতি সমীপে খোলা চিঠি

প্রিয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

আমার মোবাররকবাদ গ্রহণ করুন।

রাজনৈতিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভগ্নস্তূপে পরিণত দেশের ক্রান্তিলগ্নে উত্তরণের হাতিয়াররূপে আপনাকে পাওয়া জাতির জন্য এক পরম সৌভাগ্য। আমি চাই না, আমার ব্যক্তিগত আনন্দের উল্লেখ মারফত আপনাকে বিব্রত করতে। কারণ ঐতিহাসিক মুহূর্তে যথাযথ অস্ত্র সবসময় দুস্প্রাপ্য। সেই অভাব ঘুচে গেলে কে না আনন্দিত হবে? আপনার মত বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব বিরল বৈকি। আপনি সিভিল সার্ভিস আগত। প্রশাসনক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় আপনি নিপুণ সজ্জিত। আদৌ সামান্য নয় এই দিক। অন্য দিকে আপনি এদেশে বিচারকের মহতী অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আপনার ন্যায়াধীশ আদলের সহিত দেশ অনেক দিন পূর্ব থেকেই পরিচিত। এবংবিধ কারণে, নানা প্রত্যাশায় টইটম্বুর আমার মত অনেকেই আপনার দিকে প্রতীক্ষমান নয়নে চেয়ে আছে।

আপনি আর একবার আমার মোবারকবাদ গ্রহণ করুন।

কয়েকটি নিজ কথা বলার পূর্বে, আর একটি কারণে আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী।

জনাব রাষ্ট্রপতি, আপনার পদমর্যাদার পূর্বে সকলে প্রতিদিন অস্থায়ী এই বিশেষণটি ব্যবহার করে। কেন? আমি বুঝতে অক্ষম। সকলে জানে, তিন মাস নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের পর আবার ন্যায়দণ্ড চালনার জন্যে বিচারকের আসনে আপনি ফিরে যাবেন। সে কথা অহরহ প্রতিদিন স্মরণের জন্যে কি ওই বিশেষণটি তারা ব্যবহার করেন? আমি তাদের দংগলে ঢুকতে অক্ষম।

অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের সীমানা কি খুব সংকীর্ণ যে, সংকটকালের একজন পরম শুভার্থী রাষ্ট্রপতিকে পদে পদে অস্থায়ীরূপে চিহ্নিত করব? তার প্রয়োজন কোথায়?

নির্বাচন কি বায়ুহীন শূন্যস্থানে অনুষ্ঠিত হবে? না, এই দেশের লোকালয়ে? লোকালয় মানে মানুষের সমাজ। সুতরাং গোটা মনুষ্য সমাজের গতিবিধি আপনার পর্যবেক্ষণ সীমানাভুক্ত। এই কথাটি অনেকে ভুলে যায় এখন তাই বোধহয় অস্থায়ী শব্দের অমন ছড়াছড়ি ঘটে প্রতিদিন।

শুধু অমন আচরণে প্রতিবাদ নয়, অমন মানসিকতা দেশের কল্যাণের পরিপন্থী। সেটুকু দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই আপনার বহু ব্যস্তমণ্ডিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমূল্য সময়ের ওপর খোলা চিঠি মারফত দীন অধমের এমন অনধিকার প্রবেশ। আপনি তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, আপনার খেদমতে বান্দার এই প্রার্থনা।

অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে দেশের নৈতিক আবহাওয়া সুষ্ঠু থাকা অপরিহার্য। স্বল্পকাল-মাত্র তিন মাসের জন্য হলেও নৈতিকতা রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব অবহেলনীয় নয়।

কিন্তু চোর খোঁজে ভাঙ্গা বেড়া, দুর্জনেরা ছল। নিরপেক্ষতা শব্দের ব্যাখ্যা বর্তমানে বদলে গেছে। চোর, ডাকাত, বদমাশের দল মনে করে, এই ৩ মাস অপরাধের বিচার স্থগিত থাকবে, তা মজকুর কালে বা অতীতে যখনই অনুষ্ঠিত হোক না কেন। কারণ, নির্বাচন হবে এবং সেখানে নিরপেক্ষতাই মূল কথা। নিরপেক্ষতা ওদের কাছে নিষ্ক্রিয়তা। তার বেশি কিছু না।

ওরা জানে না, জীবন তো প্রবাহমান। অতীত বা বর্তমানে অনুষ্ঠিত খুনের বিচার বা যে কোন অপরাধের বিচার যুগপৎ চলতে থাকবে। জীবন কখনও থেমে থাকে না। নিরপেক্ষতা অর্থ সিনেমার ফ্রিজ শট নয় যে সব বাদ দিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় স্থির অবিচল হয়ে যাবে এবং সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জনাব রাষ্ট্রপতি ন্যায়দণ্ডের পরিচালক অর্থাৎ বিচারক হিসাবে আপনার বিশেষ জানা, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় আইনের পেছনে Moral judgement বা নৈতিক মূল্যায়ন নেপথ্যে লুকিয়ে থাকে। তাছাড়া বিচার তো প্রহসন। সমাজে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে নৈতিক আবহাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ইতালীর দার্শনিক কাম্পানেলা (Campanella) আড়াই শ' বছর পূর্বে লিখেছেন যে, যদি সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হয়, তার প্রতিষ্ঠানগত বা Institutional policy একটি বাক্যে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত : Scoundrels should be kept at their proper place either without power or without wealth. অর্থাৎ পাজি বদমাশ ছ্যাচোড়দের যথাযথ নিজস্থান আটক রাখতে হবে– হয় দবদবা (Power) শূন্য অথবা শূন্য।

এই বাক্যে সমাজে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির একটি চমৎকার মন্ত্র। অবিশ্যি ঈষৎ নেতিমূলক। ইতালীর দার্শনিক সামান্য ভুল করেছিলেন। পাওয়ার কেড়ে নিলেও চোর ছ্যাচোড় বদমাশদের যদি সম্পদ রাখতে দেওয়া হয়, তা হলে অনাসৃষ্টি বন্ধ হবে না। সম্পদ-দৌলত আর এক রকমের বড় কার্যকর 'পাওয়ার' তা দার্শনিক লক্ষ্য করেননি।

জনাব রাষ্ট্রপতি, বিচারকরূপে আপনি জানেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বিচারের বাণী নিভৃতে নীরবে কি রকম অশ্রুপাত করে। যাদের বিত্ত স্বল্প তাদের কাছে ইনসাফ সহজে পৌঁছায় না। গরীব লোক ব্রিফলেস সাধারণ উকিল ধরে, বিত্তবানে ব্যারিস্টার। ফলে বিচারে দাঁড়িপাল্লা সেদিকে ঝুলে পড়ার সুযোগ বেশি। গ্রামাঞ্চলে কিংবা নগরেও বিত্তবানেরা আইন রক্ষার মেশিনে তেল দিতে সক্ষম। সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জন্যে তা সংরক্ষিত এলাকা প্রবেশ নিষেধের অদৃশ্য নোটিশ লটকানো। থানার বড়বাবু বা মিয়া তো ডায়েরী না দিয়েই দাবড়িযোগে অনেককে ভাগিয়ে দেয়। কারণ অপরাধ সংঘটকরা আগেই বড় বাবু বা মিয়া পকেট ভারী করে দিয়ে বসে আছে। অর্থনৈতিকতার সঙ্গে নৈতিকতা সম্পর্কহীন নয়।

প্রিয় রাষ্ট্রপতি, এসব কথা বাসি হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে বিচারের বাণীর নীরব কান্না জাতির জন্যে বড় দুর্ভাগ্যজনক অমঙ্গল ডেকে আনে এবং তা সর্বনাশের অশনি সংকেত। ব্যাপারটি ব্যক্তিপর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না সব সময়।

এদেশের সকলের জানা কথা, তবু পুনরুক্তি করছি বেয়াদবি মাফ করবেন। এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দানের অন্যতম সর্বাধিক অগ্রগণ্য নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার আজও হয়নি। শেখ মুজিব কি খুন হয়েছিলেন? তাহলে বিচার হয়নি কেন? গুম-খুন হলেও তো ইনকোয়ারী হয়। কিছু হয়নি। তবে কি তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন? অপাপবিদ্ধ আট বছরের বালক রাসেলও কি আত্মহত্যা করেছিল? আদালতে হত্যার কোন মামলা ওঠেনি কেন? তার কি কোন আত্মীয় ছিল না বাদীরূপে মামলা করে? তেমন কারো প্রয়োজন ছিল না। শেখ মুজিব তো গোটা দেশকে আপন হৃদয়ে বহন করতেন, নাইবা থাকল তার কোন আত্মীয়স্বজন। কি প্রয়োজন তার? কেউ একজন তো আদালতের শরণাপন্ন হবে বিচার প্রার্থীরূপে। তা হয়নি। দেশে কি তখন গভর্নমেন্ট ছিল না? নিশ্চয় ছিল। তবু একটা গোটা পরিবারের খুনের জন্যে কেউ এগিয়ে আসেনি।

AMARBOI.COM

জনাব রাষ্ট্রপতি, এসব কথা আপনি জানেন, আমরা জানি। থানার বড়বাবুর ডায়েরী গ্রহণে অসম্মতি বিবর্ধন (ম্যাগনিফাই) করে দেখুন, তাহলে জবাব মিলবে। দুঃশাসক দুর্জনের ভ্রুকুটিতে গোটা দেশের বিবেক স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতিহাসে এমন ব্যাপার ঘটে বৈকি। তবে দুর্ভাগা সেই জাতি যার বিবেক বোবা হয়ে যায়।

সরকারের হেফাজতে ছিলেন কারাবন্দী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, তাজউদ্দীন– বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তাদের অসহায় মৃত্যুর কোন কিনারা হয়নি। এই মর্মাঘাত আপনার মত প্রজ্ঞাবান বিচারক ছাড়া কেইবা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম?

সমদর্শী রাষ্ট্রপতি, বড় যন্ত্রণায় আপনার নিকট বক্ষ উন্মোচনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। পুরাতন হত্যার বিচার প্রার্থীরূপে নয়। পনের বছর কেটে গেছে বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ধানের পর। তার বিচারের জন্যে পনের বছর অপেক্ষা করেছি। আরো না হয় সবুর করতে হবে কিছু অনিশ্চিত কাল।

কিন্তু সম্প্রতি যেসব হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল গত অক্টোবর-নভেম্বর মাস জুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ডিসেম্বর মাসের কয়েক দিন, সে সবের বিচারের ব্যবস্থা তো আজও তেমন শৃংখলার সঙ্গে হয়নি। যখন সরকারী আদালত নীরব থাকে তখন সৎ নেতৃত্ব পেলে গণ-আদালত সরব হয়। যেহেতু সাধারণ আদালত নিষ্ক্রীয় হয়ে গিয়েছিল দুর্জন দুঃশাসকদের রক্তচক্ষুর তলায়, জনগণ এগিয়ে এলো বিচারের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিতে। জনতার রায় আমরা পেয়েছি। ওইসব হত্যার পেছন থেকে যারা কলকাঠি নাড়ছিল, তাদের দেশের মানুষ একবার এস্তেমালের পর কন্ডোমের (Condom) মত নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এ প্রেক্ষাপট আমরা ভুলে যেতে পারিনি। তা ভুলে যাওয়া মহ্য অপরাধ।

জনাব রাষ্ট্রপতি, আপনি সেই জনগণের প্রতিনিধি যারা দেশের অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতির প্লাবন সৃষ্টিকারী ও বঞ্চনার মসনদ-ভোগীদের সরীসৃপের মত অন্ধকার গর্তে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। আপনার দায়িত্বে উৎস সেই পটভূমি। নানা কাজের ব্যস্ততায় পাছে আপনি তা ভুলে যান, সেজন্য আপনার সময়ের ওপর এই অবাঞ্ছিত হানা। আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

সাধারণ ধারণা, বিচারকের প্রধান গুণ নিরপেক্ষতা। ধারণাটি আংশিকভাবে ভুল। পূর্বে উল্লিখিত, আইনের সঙ্গে Moral judgement নৈতিক মূল্যায়ন নেপথ্যে লুকিয়ে থাকে। ন্যায় এবং অন্যায়ের প্রশ্নে বিচারক মতো সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন।

ন্যায়ের পক্ষই বিচারকের পক্ষ। অতএব তিনি আর নিরপেক্ষ রইলেন না।

কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তিনি নিশ্চয় নিরপেক্ষ থাকবেন এবং সেই নিরপেক্ষতা তার গৌরবের পতাকা।

বিচারের প্রক্রিয়া (Process) অর্থাৎ মামলার উন্মোচনপর্বে একজন বিচারক নিশ্চয় নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে, নৈতিকতার প্রশ্নে আর নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। তিনি কিসের জন্য বিচারক, যদি নৈতিকতার মাপকাঠি না থাকে? তাহলে বিচারক, আদালত, জেল, ফাঁসি ইত্যাদি সব ঝুট হয়ে যায়।

জনাব রাষ্ট্রপতি, নিরপেক্ষ থাকার সদুপদেশ প্রতিদিন কতো না ভাবে আপনাকে খয়রাত করা হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি বা জলাবর্ত দেখা যায়। অপরাধীরাও এখন উপদেষ্টার দলে ভিড়ে গেছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, যে জন্তুটা জন্তু বলে চেনা যায় না সেটা আরো বিপজ্জনক। তাই উপদেষ্টাদের ভিড়ে আপনি বিভ্রান্ত হতে পারেন। সকলেই এখন বৃষ্টিস্নাত তুলসীপাতা— নির্মলতার প্রতীক।

প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর রকমসকম দেখে প্রয়াত শিল্পী কামরুল হাসান চোখের সামনে ভেসে ওঠেন। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পোস্টারটি এঁকে যান, যার শিরোনামায় লেখা ছিল : "দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বাণীর সত্যতা যাচাই হয়ে যায় প্রাচী শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচন- প্রার্থনায় মনোনয়নপত্র দানের তৎপরতা দেখে। নিজেকে একদম নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ না মনে করলে তো হেন মহৎ কার্মে তারা অগ্রসর হতেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ঠিক ছেচল্লিশ বৎসর পূর্বে ন্যুরেমবুর্গ শহরে যুদ্ধপরাধী নাৎসী নেতা ও জেনারেলদের বিচার শুরু হয়। জায়গায় নামেই ট্রাইবুলানটি আজ ন্যুরেমবুর্গ ট্রয়াল' নামে পৃথিবীময় খ্যাত। গ্যাস চেম্বারের উদগাতা জার্মান নাৎসীরা ষাট লাখ ইহুদী নিধন করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় মারা যায় আড়াই কোটি লোক, জার্মানীর মৃত্যের সংখ্যা অনুরূপ। তাছাড়া পঞ্চাশ লাখ লোক মারা যায় মিত্রশক্তি ফরাসী, মার্কিন প্রভৃতি দেশের নাগরিক। ট্রাইবুন্যালে ছয় কোটিরও বেশী হত্যাযজ্ঞের নায়কের নিজেদের নিরপরাধ রূপে জাহির করে। সকলেই নির্দোষ। যেহেতু উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন ছাড়া তাদের তো আর অন্য কাজ ছিল না। এখন হুকুমের মধ্যে হত্যার মত নোংরা কিছু এসে পড়লে তারা নাচার। কারণ চাকর কি করবে, মনিবের আদেশ পালন ছাড়া?

নুরেমবুর্গ ট্রায়ালে বিচারপতি ছিলেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বনামখ্যাত ন্যায়াধীশ বিচারপতিগণ। ওই ট্রায়ালের সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মার্কিন জাস্টিস রবার্ট এইচ জ্যাকসন। তার সেই ভাষণ সাহিত্য, আইন মুক্তির ঝলক, কাব্য সঙ্গীত না নাটক- না, সব কিছুর ঐক্যতান ঝংকার, আমার পক্ষে বলা মুশকিল। সুদীর্ঘ অপূর্ব একদম শেষ অংশটুকু যথাযথ ও চলনসই তরজমায় পেশ করছি পাঠকদের তরে।

যুদ্ধের পটভূমি এবং হিটলারের এসব নেতাদের রক্তরঞ্জিত ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা শেষে জাস্টিস জ্যাকসন বলছেন, "It is against such background these defendants now ask this tribunal to say that they are not guilty of planning, executing or conspiring to commit this long lists of crimes and wrongs". 'এমনিই পটভূমি এবং দণ্ডনীয় অপরাধের দীর্ঘ তালিকা। তবু প্রতিবাদীরা বলছেন, তারা নিরপরাধ।'

অতঃপর বিচারপতি জ্যাকসন শেকসপীয়ারের রাজা তৃতীয় রিচার্ড-এর একটি দৃশ্যের প্রতিধ্বনি তুলেছেন। গ্লাস্টারের ডিউক রাজা চতুর্থ এডোওয়ার্ডকে হত্যা করেন। রাণী স্বামীর লাশের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

জাস্টিস জ্যাকসন নাটকের ওই দৃশ্য স্মরণ করে বলেছেন, They stand before the record of this trial as blood stained Gloucester stood by the body of the slain king. He begged of the windo as they beg of you." Slay them not. And the queen replied." Then say they were not slain but dead they are".

"...... If you are to say of these men they were not guilty, it would be as true to say there has been no war, there are no slain, there has been

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

no crime." প্রতিবাদীরা নিহত নৃপতির লাশের পাশে রক্তরঞ্জিত গ্লচেস্টারের ডিউকের মত দাঁড়িয়ে আছে। এরা আপনাদের কাছে মিনতি করছে যেমন ডিউক বিধবা রানীর কাছে মিনতিপূর্বক বলেছিল, "বিশ্বাস করুন, আমি ওদের হত্যা করিনি" রানী জবাব দিয়েছিলেন, "তাহলে বিশ্বাস করো, ওদের কেউ হত্যা করেনি। কিন্তু ওরা মরে তো গেছে ... ।"

"আপনারা যদি বলেন, এসব লোক নিরপরাধ, তাহলে বলতেই পারেন, কোনো যুদ্ধ হয়নি, কেউ নিহত হয়নি, কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়নি কোথাও।"

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর রুই-কাতলা চুনোপুঁটির হালচাল জাস্টিস জ্যাকসনের অপূর্ব ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওইসব ভদ্রমহোদয়েরা যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন তাহলে তো বলতে হয়, বাংলাদেশে গত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কোন গণআন্দোলন হয়নি, আততায়ী বা পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কোন সন্ত্রাস তাণ্ডব চলেনি এবং শেষ প্রান্তে ডাক্তার শামসুজ্জামান খান মিলনের মত ট্রাজেডি মুখর মৃত্যুর সম্মুখীন হয়নি কেউ।

জনাব রাষ্ট্রপতি, আপনার উপস্থিতি তাহলে আমাদের কাছে মরীচিকা, মতিভ্রম, দৃষ্টিভ্রম না স্বপ্নলব্ধ কোন আলেখ্য? আপনার বর্তমান ভূমিকা সব তো মিথ্যে হয়ে যায়। না, ন্যায়অধীশ রাষ্ট্রপতি মহোদয় না, লজিক সবসময় পরিস্থিতি-চিত্র দিতে অক্ষম। আপনি আমাদের কাছে নিরেট বাস্তব, আপনি আমাদের পথপ্রদর্শক ইতিহাসের আহবানে।

হে মহামান্য জন, আমাদের বুঝতে বাকী নেই, দেশ সেবা আপনার রক্তে বর্তমান ছিল। তাই নিজের শান্তিময় নীড় পরিত্যাগ করে আপনি কর্তব্যের রণপ্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিকের মত, যদিও জানতেন সময় বড় কঠিন এবং দুর্যোগময়। প্রয়াত কবি আহসান হাবীবের উত্তরাধিকারী পুত্র মঈনুল আহসান সাবের গ্রীক ট্রাজেডীর অনুরূপ একটি ছোট উত্তম নভেল লিখেছে। নাম : পাথর সময়। তরুণ লেখকের দু শব্দে আমাদের কাল যথাযথ বন্দী। শুধু কঠিন, জটিল-কুটিল নয়, পাথর সময়। তারই মোকাবিলা করতে হবে আপনাকে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস খ্যাত সন্তানরূপেই আপনি গণ্য হবেন। কোটি কোটি নরনারী আপনার নির্দেশনার দিকে চেয়ে আছে। আপনি তাদের প্রতিনিধি, কোন একক ব্যষ্টি (unit) নন।

প্রিয় রাষ্ট্রপতি, আপনার দায়িত্ব পালনের সড়কে অগ্রগণ্যতমের অগ্রগণ্য (Priority of priopities) হচ্ছে দার্শনিক কাম্পানেলার বাণী স্মরণ, কিছু সংশোধনী সহ : Scoundrels should be kept at their place without power and without wealth নচেৎ দেশে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে না, বর্তমানে যা আশু প্রয়োজন নির্বাচনের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার প্রশাসনের চাকার আবর্তন ত্বরান্বিত করুন, প্রিয় রাষ্ট্রপতি।

বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বাংলা প্রবাদ :

দেরী যদি ইনসাফ

তবে গোড়া শুদ্ধ গাপ।

Justice delayed is justice denied বিলম্বিত বিচার মানে প্রত্যাখ্যাত বিচার। এই বাণীর মর্মোপলব্ধি আপনার চেয়ে বড় কার পক্ষে বেশী সম্ভব?

আজ জীবনসায়াহ্নে উপনীত আমি। শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিবাহিত। জ্ঞানাবধি দশকের পর দশক প্রতীক্ষা করে আছি, ভাগ্যহত এই দেশ এবং আত্মসম্মান বোধহীন ধর্মব্যবসায়ীদের কুহকে বিভ্রান্ত এই কওম– ফিরে আসুক মানবিক দিশায়, আসন পেতে নিক বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গন-সভায়। বারবার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার নতুন স্বপ্ন রচনা করেছি।

সচেতন জন কল্লোলের ভেতর আবার নতুন যুগ সৃষ্টির সঙ্গীত শুনতে পাই। ইতিহাসের হাতিয়ার আপনি। তাই আপনার কাছে মচকানো পাঁজরসহ ভগ্নোদ্যম বক্ষ ভার উজাড় করলুম। ক্ষমা করবেন যদি অব্যাপার, অসৌজন্যের পথ অজানিতে মাড়িয়ে যাই।

আল্লাহ ও দেশের মজলুম নরনারী আপনার সহায় হন, প্রিয় রাষ্ট্রপতি।

আদাব,

ইতি–

আরজ গুজার

শওকত ওসমান

AMARBOI.COM

তারিখ পড়ে নিয়তির সঙ্গে

"উত্থিষ্ঠ, জাগ্রত

ওঠো জাগো

উত্থিষ্ঠ, জাগ্রত"।

দিগদিগন্ত হাঁক দিয়ে গেল তার স্বরে। অনুরণন সহজে প্রতিধ্বনির সঙ্গে

প্রতিযোগী বার বার ডাক দিয়ে যায় :

ওঠো জাগো। উত্থিষ্ঠ, জাগ্রত

ওঠো জাগো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলোকন করো চতুর্দিক।

চেয়ে দ্যাখো, টাইগার নিয়াজী ব্যাঘ্র নিয়াজী এখন গিদ্‌ধড়-শৃগাল, শৃগাল। গেরস্থর মুরগী চুরির পর ধূর্ত জানোয়ার পালানোর কালে তাড়া খেয়ে যখন শিকার ফেলে দেয় এবং প্রাণ ভয়ে আরো জোর দৌড়ায় কম্পিত বুক, তেমনই দুর্দশা ওই গিদ্‌ধড় নিয়াজীর, হোটেল কন্টিনেন্ট্যালের ঝোপ থেকে বেরিয়ে রমনার ময়দানের দিকে ধাইছে।

প্রতিধ্বনি হেঁকে যায় : "বাইশ বছর ব্যাপী আমার ডাক কি তোমরা শোননি, হে নতুন প্রজন্মের ভাইবোনগণ? তখন অনেকে তোমাদের হয়ত পৃথিবীর মুখ দ্যাখেনি। অথবা, তখন শিশু, বালক-বালিকা কি কিশোর-কিশোরী। কাহিনী ইতিহাস নয়। কিন্তু ইতিহাস কাহিনী হয়।

আমাকে অনুসরণ করো। তোমাদের কাহিনী শোনাই যা ইতিহাস।

মামনুসর।

আমাকে অনুসরণ করো।

দেখেছো?

কি দেখছ?

অগণন নরনারী ভয়ার্ত হেঁটে চলেছে দেশের সীমান্তের দিকে। কতো তারা সুমারে? বলা দুষ্কর। কারণ, শত হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। কতো লক্ষ তাও হিসাব পাবে না। খেদিয়ে নিয়ে গেলে জন্তু যেমন প্রাণপণে দৌড়ায়, এখানে তেমনই চিহ্ন তুমি খুঁজে পাবে। কিন্তু, কোথায় যাচ্ছে তারা? গন্তব্য কোথায়? তা আজ কেউ বলতে পারবে না। দুঃসহ বর্তমান থেকে যখন মানুষ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়, তখন হিসাব করার সব আক্কেল লোপ পায়। তখন একমাত্র গন্তব্য কোন নিরাপদ আশ্রয় যেখানে কেউ তার প্রাণ হরণ করবে না। আশ্রয় পেলেও কাল ত প্রবহমান। ভবিষ্যৎ কি তখন থেমে থাকবে? আগামী দিনের ছবি কেমন হবে, তেমন হিসাব থাকা উচিত। মানুষের অস্তিত্ব ধারণ করতে হয়। এই শর্ত তার ভবিষ্যতে পদক্ষেপের বিরাট প্রতিবন্ধক। মানুষকে খেতে হয়, পরতে হয়, তার দৈনন্দিনতার কতগুলো চাহিদা আছে। যা তাকে মেটাতে হয়। সে ত জন্তুর মত যেখানে আহার সেখানেই জলত্যাগ মলত্যাগ করতে পারে না। এসব এখন ওদের হিসাবের বাইরে। আকাশ আছে। তা তাদের ঘরের চালের মত। অন্তত কেউ সেখানে আগুন ধরাতে পারবে না। অন্তত গোটা পরিবার সহ পুড়ে মরতে হবে না। তাদের সকলের ঘর, পরিবার ছিল বৈকি। আজ কিছু নেই। নেই থাক।

তার জন্যে কারো আফশোস নেই।

আপাতত ক্ষুধা পিপাসায় ক্লান্ত যারা পিছিয়ে পড়ে, তাদের জন্যে কে থেমে থাকবে? নিকট দরদী জনেরা হয়ত থামে। কিন্তু আবার চলতে হয়। দেখছ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত লাঠির উপর ভর করে এগোচ্ছে সাধ্য অনুযায়ী। তারা কেন প্রাণভয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীত? মৃত্যুর জন্যে এরা কেউ পরোয়া করে না। কিন্তু অপমৃত্যু কে চায়? আততায়ীর হাত নিসপিস করছিল বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে, সে নিসপিসানি বা চুলকানির প্রতিষেধক রূপে মানুষের উপর ব্রাশ ফায়ার চালিয়ে দিলে। তখন তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হতে পারে। এমন জখম হলো যে শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে আসবে না, তা ঠিক। কিন্তু ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু কেউ চায় না। বৃদ্ধ জনেরাও ঘর ছেড়েছে পরিবার পরিজনের সঙ্গে। এই ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গেছে অনেকে। কবে নাগাল পাবে কেউ জানে না। তবু এগোতে হয়। ভবিষ্যৎ আশার পতাকা দোলায়।

এত ভিড়, এত মানুষের সমাগম। কিন্তু কোলাহল নেই কেন? শব্দও ত গতিবিধি জানান দেয়। শত্রু টের পেতে পারে। সড়কের গাছপালা আজ শুধু ছায়া দান করে না, শত্রুর আড়াল করে রাখে সবাইকে। গাছপালার যে মাতৃমূর্তি হতে পারে বহু দিন এই ভূখণ্ডের মানুষ উপলব্ধি করেনি। উন্মুক্ত আকাশের তলায় কেউ আগুন জ্বালায় না শত্রু টের পেয়ে যাবে। শিশুরাও যেন জেনে গেছে শব্দ করা উচিত নয়। মায়ের কাঁখে পিতার পিঠে সওয়ার বালক-বালিকারা, যারা কথা বলে, হেঁটে যেতে চায়। বয়স তাদের তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে। বয়স্করা যখন আচমকা আঘাতে স্তব্ধ, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে প্রায়, ছোটরা তখন যেন সাবালকত্বের পথে পা বাড়িয়েছে।

এত ভিড় এত মানুষ। আর কখনও কেউ এক জায়গা দেখবে না। প্রাচীনকালের যাযাবর বন্য মানুষ এক এলাকায় খাদ্য শেষ হয়ে গেলে আবার নতুন বন জঙ্গল অন্বেষণে দলবদ্ধ হতো। অন্যথায়, না। কিন্তু বিশ শতকের সভ্য মানুষের এই দুর্দশা কি তবে তেমন খাদ্যভাব ঘটিত? না। এযুগে তেমন ঘটা অস্বাভাবিক। ব্যক্তি হয়ত বেকার হলে আর কোথাও ভাগ্যান্বেষণে যায়, তাও সপরিবারে নয়। দু-এক জন হয়ত এমন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু লাখ লাখ লোক অন্যত্র যাচ্ছে খাদ্যের সন্ধানে, আশ্রয়ে খোঁজে এমন ঘটনা বিরল। প্রায় অসম্ভব।

"নিয়াজী কে? গিদধড়ের মত যাকে পালাতে দেখলাম।

অতীতের ছায়ায় বিচরণ আমাদের।

আপাতত এই ত আমাদের পথ। ইতিহাসেরও পথ তা-ই। বর্তমান অতীতের বুক থেকে বেরোয়। বর্তমানই প্রাকজন্মে ভবিষ্যৎ এবং জন্মের পর আবার অতীত হতে থাকে। কালের ছায়ানট রাগ এক জটিল আবর্তের ঘুর্ণী। নিয়াজীর কথা পরে বলব। আপাতত দেখে যাও।

তোমরা এত, এত, কৌতূহলী তাহলে শুনে যাও। চোখ খোলা রেখো।

আগুন নিভে গেছে আজ। কিন্তু পোড়া দাগ ত সহজে মিটে যায় না। সেখানে পোড়া দাগ দেখবে, জানবে তা নিয়াজীর মহৎ কীর্তি। মসজিদের গায়ে বুলেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাগ বহু দেখবে। পবিত্র উপাসনা গৃহের এ দুর্দশা কেন? তাও নিয়াজির মহৎ কীর্তি। আজ বিশ্বাস করা দায়, পাকিস্তান, রাষ্ট্রের জন্ম-মূলে ছিল ইসলামের দোহাই। অবিশ্যি নিয়াজীর ত শত শত হাত থাকার কথা নয়। ১৯৭১ সনে তার সৈন্য সামন্তরা এই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে এমনই জুলুমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। নয় মাসের তাণ্ডব নৃত্য। এক কোটি লোক পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আশ্রয় নিয়েছিল। এক কোটির বেশি লোক স্বদেশে আশ্রয়হীন। স্বদেশে মানে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান। সেই নয় মাস নিয়াজী, রাও ফরমান আলী ইত্যাদি কিছু নাম লোকে ভাবত ওরা জানোয়ারের আওলাদ, কোন হায়েনার ঔবসজাত বাচ্চা। শেষোক্ত আধা-হায়েনা আধা-নর রাও ফরমান আলী এদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাদাতা, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দেশময় আরও একটি সুপরিচিত নাম টিক্কা খান যে তার সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিল, "হাম জমিন দেখনে মাংতা আদমী নেহি। আমি জমিন দেখতে চাই মানুষ না।" এদেশে গণহত্যার এই সব নরাকার জন্তু স্থপতিদের কথা কেউ সহজে ভুলে যেতে পারে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান আজও পাকিস্তানের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

শোষণের প্রতিবাদে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠে, তখন শাসকশ্রেণি কিছু এজেন্ট সৃষ্টি করেছিল। তারই চূড়ান্ত রূপ আল বদর, আল শামস প্রভৃতি হিংস্র ফ্যাসিষ্ট সংঘ। চোখের উপর দিয়ে জানান দেয় ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ। তবুও আজ অনেকের বোধগম্য হয় না, ধর্মের ভাওতার আড়ালে কি নির্মম অত্যাচার নিপীড়ন অনুষ্ঠিত হতে পারে। আল্লা রসুলের অবমাননা কোন পর্যায়ে অভিমুখী হতে পারে।

আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠেনি। মধ্যযুগীয় বর্ণবিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা ছিল আন্দোলনের উৎস। আরো সোজা করে বলা যায়, হিন্দু মুসলমানের বিরোধই ছিল সমস্ত আন্দোলনের চালিকা-শক্তি বা ডাইনামিক্স। কেবল এই নিগেটিভ বা নঙর্থকতার উপর দাঁড়িয়ে একটা রাষ্ট্র পাওয়া গেল। কিন্তু তা বেশি দিন টিকতে পারে না। শুধু ধর্মের উপর ভিত্তি করে চলে গেলে এ যুগের যে কোনো রাষ্ট্র বানচাল হতে বাধ্য। তার জ্বাজ্জ্বল্য প্রমাণ পাকিস্তান। চব্বিশ বছরও টিকল না। তবু অন্ধগলি পথে হাঁটার উৎসাহ আজও বহু মূর্খের মধ্যে বিদ্যমান।

বর্তমানে যে পাকিস্তান টিকে আছে তা কেবলমাত্র অস্ত্রের মহিমায়, অন্য ভাষায়, পশুশক্তির চাপে। বেলুচিস্তানের লোকসংখ্যা পাকিস্তানের শতকরা চার মাত্র। তদুপরি দরিদ্র। তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয় "বুচার-অফ বেলুচিস্তান" বেলুচিস্তানের কসাই নামে আখ্যাত টিক্কা খান– যাকে পরে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয় বাঙালিদের শায়েস্তা করতে।

কিন্তু মানুষের বিশ্বাস হারানো পাপ। রবীন্দ্রনাথ আরও বলে গেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মনুষ্যত্বের প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।" ইতিহাস তার সায় দিয়ে গেল এদেশে। ২৫ মার্চে উনিশ'শ একাত্তরের আচমকা আঘাতের পর ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠল প্রতিরোধ। তারই সমষ্টিগত ফলাফল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

নিয়তির সঙ্গে তারিখ পড়ে এইভাবে।

অবিশ্যি প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ সবই জড়িয়ে ছিল এই গন্তব্যে পৌঁছাতে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিয়াজীর কথা প্রথমে উল্লেখ করেছিলুম এই জন্যে যে দাম্ভিক এই মুর্খ জানে না ইতিহাস কিভাবে শিক্ষা দেয়। সেখানে নিয়তি আর এক পন্থায় অগ্রসর হয়। কিন্তু নাদানদের মূর্খদের মগজে তা ঠাই পায় না।

আজ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বাইশ বছর পূর্বে টাইগার নিয়াজীর শেয়ালের মত মিত্রশক্তির নিকট রমনার ময়দানে আত্মসমর্পণ কাহিনী আজ অনেকের জানা। নতুন প্রজন্মের ভাইবোনেরা মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো ইতিহাসে পাবে।

আমার কাহিনী আরো আগে থেকে শুরু।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। তখন স্বতন্ত্র মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে। তার ফলশ্রুতি হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ে বিরোধও তীব্র আকার ধারণ করছে ক্রমশ। কোথাও কোথাও দাংগা বাধছে, তবে ব্যাপকভাবে নয়। কিন্তু নোয়াখালী ফেনী অঞ্চলের একটি নির্যাতিত হিন্দু পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সমস্ত জেলায় দাংগা প্রসারিত হতে থাকে। তখনও ব্রিটিশ আমল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায়, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার সৈন্য নামাতে বাধ্য হয়।

পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি আসেন শান্তির বাণী নিয়ে। তিনি তখন জননেতা। ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্যও ছিলেন না। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ তার ডাকে সাড়া দিত। সেই জন্যে তার নোয়াখালী আগমন। সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তখন কয়েক জায়গায় দাংগা হয়। মহাত্মা গান্ধী পায়ে হেঁটে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ও তার মানবতার বাণী শোনান। কয়েক এলাকায় তাঁবু পাতেন। তখন তাঁর বয়স ৭৮ আটাত্তর। বৃদ্ধ জন তেশষ দিকে তিনি শুধু কৌপিন পরে থাকতেন হাতে একটি লাঠি। নিজের পায়খানা কাউকে সাফ করতে দিতেন না। নানা মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত এই মহান পুরুষ তাই "মাহাত্মা গান্ধী" নামেই পরিচিত ছিলেন।

নোয়াখালী পরিদর্শনকালে তাঁর ক্যাম্পে এলাকার ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন দেখা করতে আসে। কথোপকথন কালে মাহাত্মা গান্ধী তাকে বললেন যে সে যুদ্ধে ফেরৎ সৈনিক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বার্মা ফ্রন্টে লড়েছে জাপানীদের বিরুদ্ধে। এখানে ত কিছু দুর্জন লোক গণ্ডগোল করছে। অথচ সে তাদের শায়েস্তা করতে পারছে না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন জওয়াব দিয়েছিল "দেয়ার ইট ওয়াজ ওয়ার, হিয়ার ইট ইজ পলিটিক্স। সেখানে ছিল যুদ্ধ এখানে ত রাজনীতি।"

মূর্খ ক্যাপ্টেন জানত না একদিন সে সেই রাজনীতির শিকার হবে।

এ এ কে?

ইতিহাসের পরিহাসই বটে-ওর নামও এ, এ, কে নিয়াজী আমির আব্দুল্লা খান নিয়াজী।

গিদধড়েরা ইতিহাসের খবর রাখে না। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আমির আদুল্লা খান নিয়াজী জানত না, পচিঁশ বছর পরে ১৯৪৭-৭১ সেই দ্বিজাতিতত্ত্ব জাত রাজনীতি তার মুখে কলঙ্কের চুনকালি লেপে দেবে শুধু বাংলাদেশ নয়, জগৎবাসীর সম্মুখে। ভীত সন্ত্রস্ত্র "টাইগার"। শেষে আশ্রয় নিয়েছিল তদানীন্ত ন হোটেল কন্টিনেন্টালের (বর্তমান শেরাটন) ঝোপে।

নেপথ্য হাঁক দিয়ে যায় নিরন্তর :

আর ভুল কর না।
স্বাধীনতা দিবসে শপথ নাও।
সাওতাল চাকমা মুরং তিপরা প্রমুখ
উপজাতিসমূহ এবং
হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
আমরা সবাই ভাই ভাই
বাঁচার ভিন্ন রাস্তা নাই।।

দেশ জননীর সন্তান যতো ওঠো জাগো
উথিষ্ঠ, জাগ্রত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গ নির্মাণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৬
প্রকাশক : নওরোজ সাহিত্য সংসদ

উৎসর্গ

লোকান্তরিত দুই সুহৃদ
আহসান হাবীব
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

আমার কথা

খ্রীস্টাব্দ ১৯১৭। আমার জন্ম জর্জিয়ান আমলে। সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বকাল, বৃটিশ তখন গোটা ভারতের প্রভু। অর্থাৎ, পরাধীন দাস রূপে জন্ম। অতঃপর, পাকিস্তানি আমল। গোলামী ঘুচল না। তাই লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা অর্জন করতে হোলো।

বলা বাহুল্য, বর্তমানে আমি স্বাধীন নাগরিক। সুখের বিষয়, এবারও জর্জিয়ান আমলে বাস। তবে এখন সম্রাট আমার মতই বাঙালি, ইফতেখার রসুল জর্জ নামে পরিচিত এবং সে তাঁর পিতৃদেব সুসাহিত্যিক মরহুম নাসির আলী সাহেব-সূত্রে ছেলেবেলা থেকে অবিশ্যি আমার স্নেহভাজন। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলো জর্জেরই আগ্রহে প্রকাশিত। সাবেক সম্পর্কের জন্য প্রকাশক-কে ধন্যবাদ দিতে পারলাম না। মনে কিছু অস্বোয়াস্তি থাকা স্বাভাবিক।

ফকিরের পোল এলাকার 'ভুঁইয়া গ্রুপ অফ পাবলিকেশান'-এর তিন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কুল—জনাব মারুফ মাহমুদ, আয়াজ মাহমুদ, অলক (মঈনুদ্দিন) ভুঁইয়ার তৎপরতায় বইটি তাড়াতাড়ি জনসমপেক্ষ উপস্থিত। এই জন্যে তাদের নিকট আমি ঋণী রইলাম। প্রেসের প্রধান কম্পোজিটর আমজাদ হোসেন ও অন্যান্য কর্মী এবং মেশিনম্যান সোহরাব হোসেনের আন্তরিকতা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

তরুণ সাহিত্যসেবী, কবি, লেখক, সমালোচক প্রমুখ সতীর্থ অনুজদের এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধটি পড়ে দেখার জন্যে অনুরোধ জানাই। প্রবীণজনের কথা তাদের চলা-পথে কিছু কাজে লাগতে পারে।

দেশের বাণী-ভাণ্ডার হোক নওরোজ সাহিত্য সংসদ। পরিশেষে, আমার এই শুভেচ্ছা রইল।

শ. ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

১ । সত্তার সঙ্গে সংলাপ
২ । মঞ্চের অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে
৩ । মাস্টার মশাই : সু কু চ
৪ । স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায়
৫ । ভাতের কাহিনী, ভাষার লড়াই
৬ । অভিধায় আত্মমগ্ন ব্যঞ্জনায় শরণার্থী
৭ । স্বাধীনতার সিগ্‌ন্যাল সাংস্কৃতিক পটভূমি
৮ । প্রজ্জ্বলিত নিমেষে নির্বাপিত

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্তার সঙ্গে সংলাপ

বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি যুগবোধ হারিয়ে ফেলেছ। কাল বা মহাকাল আছে পৃথিবীর আকাশ বাতাস জুড়ে। অনেকে অবিশ্যি তা জানে না। অথবা জানলেও তাদের চেতনায় তা তেমন আঁচড় রেখে যেতে অক্ষম। তুমি সে গোত্রের নও, জানি। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে তোমার কাল-বিস্মরণ ঘটেছে। তুমি স্বীকার নাও করতে পারো। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে হ্যালিটোসিস–এক রকমের রোগ, মুখে দুর্গন্ধ হয়। রোগটা যাকে ধরে সে কিন্তু টের পায় না। আশপাশের লোক যারা রোগীর সংস্পর্শে আসে তারা সহ্য করে এবং ভদ্রতার খাতিরে দুর্ভোগ চেপে যায়–একদম বেমালুম। আমি তেমন সৌজন্য দেখাতে পারলাম না। তাই অশেষ দুঃখিত।

আসল কথায় আসা যাক। অনেক কাল থেকে তোমার যুগবোধ নেই। আমি তা জোর দিয়ে বলতে পারি। এই গণ-মাধ্যম বা 'ম্যাস-মিডিয়া'র জমানায় তুমি যদি চোখ বুজে বসে থাকো, ম্যাসডিমিয়ার গতিবিধি, ইমপ্যাকট বা অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন না হও, তবু কী আমি বলব, তোমার যুগবোধ আছে? জার্মানরা বলে "জিৎগিস্ত" বা যুগের স্পিরিট অর্থাৎ কালের মর্মশক্তি। ব্যাপারটি দু'দিক থেকে দেখা যায়। একজন সময় সম্পর্কে সচেতন। সে মেনে নিয়েছে টাইম, সময় নামক এক অদৃশ্য ব্যাপার আছে, যা বাতাসের মত জানান দিয়ে যায়, কিন্তু অদৃশ্য। কিন্তু সে যুগের স্পিরিট বা মর্মশক্তি সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারে। দেশের উপর দিয়ে কী হাওয়া বইছে, দেশের মানুষ কী চায়, সে সম্পর্কে সে কিছু টের পায় না। গণ-মাধ্যম সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতা বা অচেতনতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, টাইম আছে–তুমি তা আর মানো না। অথবা, তুমি সে-ই দলে পড়ো যারা টাইম দিয়ে স্পেস (স্থান) বোঝায় অথচ টাইম সম্পর্কে নিঃসাড়।

গত পঞ্চাশ বছরে গণ-মাধ্যমে উপায়গুলো ধাপে ধাপে এগিয়েছে, লক্ষ্য করেছো? সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, দৈনিক পত্রিকা, বেতার ইত্যাদি। এবং নবতম সংযোজন টেলিভিশন। দৈনিক পত্রিকাগুলোর স্বভাব চরিত্র কতো বদলেছে। এখন দৈনিক সংবাদপত্রে সাহিত্যের আসর কেমন জেঁকে বসেছে, লক্ষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করো। সাহিত্যের উপর জনমতের উপর প্রতিক্রিয়া, সাহিত্যের বিচার কোন স্তরে গেছে—এমন সব ব্যাপার নিয়ে তুমি একটা বড় কেতাব লিখে ফেলতে পারো, যদি তোমার সময় এবং গবেষণার চোখ থাকে। আধুনিক যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রশাসনিক যন্ত্রের মত 'মানসিক হাতিয়ার'ও লাগে। জনমত ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। সুতরাং প্রচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে ঔদাসীন্য অসম্ভব। অথচ তুমি নির্বিকার থাকো। অবিশ্যি প্রচারের বিবর্তন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্থসামাজিক ঘূর্ণিপাকের ফল। এই ছেঁদো বাক্য দিয়েই শেষ করলাম। মোদ্দা কথা, প্রচার-যন্ত্র ছাড়া এক পা চলার উপায় নেই। তিরিশ বছর পূর্বে, তুমি ভাবতে পারতে, খবরের কাগজে কোন দর্শনের প্রবন্ধ ছাপা হবে? প্রথমতঃ যারা সিরিয়াস চিন্তা করতেন, তাদের সমঝদারের সংখ্যা অল্প, তা নিয়ে আদৌ তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। চিন্তাটা সঠিক হচ্ছে কি না—সেখানেই যতো উদ্বেগ জমা। কিন্তু এখন ব্যাপক বিস্তারের দিকে সকলের চোখ। চিন্তা ঠিক হোলো কি না, সেদিকে চোখ রাখার প্রয়োজন কোথায়? এখন সংখ্যার পূতঃজলে সব পবিত্র হয়ে যায়। কোয়ানটিটি (সংখ্যা) প্রার্থনা, গুণটি চুলোয় যাক। বর্তমান সাহিত্য সমালোচনার মানের দিকে তাকাও। দৈনিক পত্রিকার প্রতিযোগিতায় মাসিক পত্রিকা কোণঠাসা হয়ে গেছে। কোন রকমে ধুঁকে ধুঁকে দু'একটা টিকে থাকে। এখন সাহিত্য-সমালোচনা দৈনিক পত্রিকায় বিচরণ করে। স্বল্প আলোচনা, আস্বাদে ফিকে; লেখেন কোন সাংবাদিক বা গ্রন্থকারের বন্ধু-বান্ধব—নিতান্তই সৌজন্যের ঋণশোধ। ষাট বছর পূর্বে এজরা পাউণ্ডের কাব্যগ্রন্থে—বোধ হয়, মবেলি নিকসন (বিগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নয়) এক সফল লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন তরুণ লেখককে উক্ত জন পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে প্রকাশকের কাছে 'অ্যাডভান্স' বাড়ানো যায় : "বাটার দি রিভ্যুয়ার। ফ্রম ফিফটি টু থ্রি হান্ড্রেড রোজ ইন এইটিন মান্থস। সমালোচককে তেল লাগাও। পঞ্চাশ থেকে তিন শ'য় উঠল আমার অ্যাডভান্স আঠারো মাসে।" এখন সাহিত্য সমালোচনাই ওই তেল বা মাখনের কারবার। প্রচারের বাহন প্রচুর বৃদ্ধির ফলে শ্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ "সাফল্য এই মুহূর্তে।" আর তা না হলে পরকাল ঝরঝরে। খ্যাতনামা ফরাসী লেখক আঁদ্রে জীদ তার জার্নালে আরো বিশিষ্ট সতীর্থদের নামসহ লিখেছেন যে তাঁরা ভাবতেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অখ্যাতই থাকতে হবে, তারপর যদি কিছু নামধাম হয়, হতেও বা পারে। জীদ লিখেছেন, "উই পুট আওয়ার হোপস ইন ড্যুরেশান, আউয়ার সোল কনসার্ন বিইং টু প্রড্যুস এ ওয়ার্ক দ্যাট উড লাস্ট। আমাদের সব আশা ন্যস্ত স্থায়িত্বের কাছে। আমাদের একমাত্র মাথাব্যথা ছিল, এমন একটা কাজ করা যেন টিকে থাকে।" ম্যাসমিডিয়া সেই ধৈর্যের প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। এখন জপমন্ত্র : "মুহূর্ত জ্বলিতং শ্রেয়"—এক মুহূর্ত জ্বলাই বড় কথা। ফল কী দাঁড়িয়েছে জানো? সাহিত্যের জগতে স্পেস খুব বেড়ে গেছে। খবরের কাগজের কল্যাণে পাঠক-সংখ্যা, যত গরীব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশই হোক বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু 'টাইম' ক্রমশ সংকুচিত। কেতাব লেখকরা ভেবে দেখে না, তার কাজটা ক'দ্দিন টিকবে? তাই কবিদের আয়ু দশ বছরে সীমাবদ্ধ। বলে, অমুক দশকের কবি। অর্থাৎ উৎপাদন, প্রডাকশান, কনজামশান (ভোগ) বেড়েছে, কিন্তু সমঝদারিতা ধাইছে উল্টো দিকে। শেষ পর্যন্ত লেখকেরও উপায় থাকে না। স্রোতের উজানে দাঁড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। রুশো সাহেব বহু পূর্বে লক্ষ্য করেছিলেন, লেখকরা স্বাধীন। কিন্তু তাদের সুখ নির্ভরশীল অপরের মতামতের মধ্যে। সংখ্যা দিয়ে তার অস্মিতার মূল্য নিরূপিত হয়। সুতরাং সত্তা এবং অস্তিত্বের দিক থেকে লেখকের হালতের দুর্দশা বিচার করে দ্যাখো। তাদের দুর্দশা আরো অর্থাৎ ঘনীভূত, বস্তুত টেলিভিশন আমদানীর পর। তুমি এটা আধা-লেখক বা অলেখককে, সমাজে মোটামুটি বিদ্বানরূপে পরিচিত, এমন দু'তিন জনকে দিয়ে দু'তিন মাসে টেলিভিশনের পর্দায় পাঁচ ছ'বার কিছু সুখ্যাতি করিয়ে দাও, তারপর মজা দ্যাখো। অচল মাল চালু হয়ে গেছে! অহমস্ফীতি–'ইগো' স্ফীতি–মুদ্রাস্ফীতির মত জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়, যদিও জিনিসটা পূর্ববৎই থাকে। ইমেজের ধাক্কা বড় প্রচণ্ড। বর্তমান প্রতিযোগিতা-মুখর সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন সংগ্রাম অবধারিত। যে যার কোলে ঝোল মাখাতে ব্যস্ত। তাই ভাবধারার মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। গাঁয়ে মোড়ল-মুখ্যির কথা সাধারণ জন শোনে। তাই সব ক্ষেত্রেই এমন মোড়ল-মাতব্বর খাড়া করার প্রতিযোগিতা আছে। অর্থাৎ, তোমার দলীয় লোকদের জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরো। পূর্বে বেতারে গায়েবী স্বর শোনা যেত। এখন সশরীরী মানুষের ইমেজ তোমার চোখের উপর, মনের উপর ধাক্কা দেবে। তার ফল, তাৎক্ষণিক। বিগত কয়েক বছরে কতো মাটির পুতুলকে মহামানব হয়ে যেতে দেখা গেল টেলিভিশনের কল্যাণে। অবিশ্যি এমন মহাপুরুষরা মৌসুমী ফুল। ওদের জন্ম তাৎক্ষণিকতায়, কাজেই ঝরে পড়তে বেশী দেরী লাগে না। টেলিভিশনের কাজ হচ্ছে উদ্দীপনা, রোমহর্ষকতার ভেতর দিয়ে। ওখানে বাহন ব্যষ্টি তথা ব্যক্তির ইমেজ। এই কৌশল সাময়িক স্বার্থোদ্ধারের বড় উপায়। বর্তমানে পৃথিবীময় অনুন্নত, সদ্যস্বাধীন বা প্রাক্তন উপনিবেশ দেশগুলোতে অপসংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে তার একটা বড় মিডিয়া বা বাহন টেলিভিশন। এখন ত ক্যান্ড্ বা টিনের কৌটাবদ্ধ সামগ্রী আমদানি রপ্তানির যুগ। হালফিল বিদেশ থেকে খুব দ্রুত পাওয়া যায় কৌটাবদ্ধ তথ্য–ইনফরমেশন, কৌটাবদ্ধ ভাবধারা, কৌটাবদ্ধ অবসর-বিনোদনী। আইডিয়া আদর্শ, এখন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে জাহাজে শুধু বই পত্রপত্রিকা আসত। তখন ভাবধারা যা আসত, তার শিকড় গাড়তে লাগত প্রচুর সময়। বিমান চালু হতে কিছু সময় ত্বরান্বিত হোলো। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্সের যুগে ভাবধারা নয় শুধু তথ্য এবং অবসর-বিনোদনী পৃথিবীর চতুর্দিকে দুদ্দাড় ধেযে যায় এবং চাক্ষুষ জানান দেয়। কোকোকোলা ব্লুজীন-ট্যাঞ্জিস্টার মার্কা সভ্যতার যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পচা-তলানি হালফিল এদেশের বিত্তবান সমাজের এক বড় অংশ গ্রাস করে বসে আছে, তার কারণ ম্যাসমিডিয়ার জুলুম। অবিশ্যি দেশী মৎসুদ্দিরা আবার উন্নত দেশের শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের মনতুষ্টির জন্যে তাদের হালচাল, খানাপিনার অনুকরণ করে। মায় লেবাস পর্যন্ত। আসলে এই শ্রেণীর লোকদের কোন জাতীয়তাবোধ থাকে না। মুনাফাই তাদের মুরশেদ বা পথপ্রদর্শক। টেলিভিশনের মহিমা অপার। সংস্কৃতি ওই মিডিয়ায় চাপে কী রকম ত্বরান্বিত হয়েছে, লক্ষ্য, করেছ। বর্তমানে স্বাধীন, একদা-উপনিবেশ দেশগুলোতে ইংলিশ স্কুল কী হারে না গজিয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। কিন্তু গজিয়েছে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিজেদের আইডেনটিটি বা স্বাজাত্য ভুলে যাওয়ার এই এক পিচ্ছল সড়ক। 'আগডোম বাগডোম' জাতীয় দেশী ছড়া শেখার আগে এখন কচি ছেলেমেয়েরা 'হামটি ডামটি' শেখে। অথচ দেশী বীজ, বিলেতী চারার মত আর কী করে হবে। তাই শিক্ষিকার 'মিল্ক' (দুধ) দিয়ে বাক্য রচনার ফরমাসে কচি ছাত্র জবাব দেয়, "মাই মাদার হ্যাজ টু মিল্ক" (আমার মায়ের দু'টি দুধ আছে)। শিক্ষার কর্ণধারদের এ নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা নেই। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ইসলাম তথা আল্লা-রসুলের নামে। তখন থেকেই ইংলিশ স্কুল গজাতে লাগল। বাংলাদেশে একই চিত্র। আরো মজার ব্যাপার, যে-সব পৃষ্ঠপোষকেরা ছেলেদের মেয়েদের ইংলিশ স্কুলে পাঠায়, তারাই আবার সামাজিক প্রশ্নে ইসলামের প্রচণ্ড সেবক হয়ে ওঠেন। এই স্ববিরোধিতার অন্তঃস্রোত আরো জোরদার হয়েছে টেলিভিশনের মহিমায়। গণ-মাধ্যমের শক্তি খাটো করে দেখো না। তুমি এত ঘরকুনো হয়েছে কেন? তুমি কী আত্মহত্যা করতে চাও লেখক হিসেবে?

উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের তোড়ে সাম্রাজ্যবাদের নাগ-বন্ধন শিথিল হতে লাগর। এদেশের সাম্রাজ্যবাদী একদা-রাজারা সদর দিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল। কিন্তু খিড়কি দিয়ে ঢোকার পথ তারা আগে থেকেই পরিষ্কার করে রাখতে ভুলে যায়নি। বিদেশী পুঁজি ক্যাপিট্যাল এবং ভাষা ওদের হাতে এক মোক্ষম অস্ত্র হয়ে রইল। তুমি যেন মনে করো না, আমি ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখার বিরোধী। আদৌ না। কিন্তু তার বয়স দেখবে না, মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়ম মানবে না? এক সঙ্গে মাতৃভাষা, ইংরেজি, ধর্মভাষা–তিন ভাষার চাপে কতো কচি নাগরিকের মগজ যে ছেলেবেলায়ই মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। যত না সয়, তার বেশি ভার মাথায় চাপালে যা ঘটে, তা-ই ঘটছে। বয়স অনুযায়ী, মেধা অনুযায়ী মাতৃভাষার বাইরে আরো একটি বা দুটি ভাষা শেখা অবিশ্যি কর্তব্য। তার জন্যে মানব-বিকাশের নিয়ম মানবে না, এ কেমন কথা? কথায় কথায় একটু দূরে এসেছি। মোদ্দা ব্যাপার, এযুগে প্রচার বাহনকে উপেক্ষা করা অন্যায়। যদি আত্মহত্যা করতে চাও, আর কোন প্রশ্ন তুলব না।

কিন্তু চোখ মেলে দ্যাখো। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানের ভাণ্ডারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপে একটা আভিজাত্য ছিল। এখন ওরা সংবাদপত্র, টেলিভিশনের কাছে পরাজিত। ওদের ওখানে দৌড়ে যেতে হয়, নচেৎ ইলমের মহিমা প্রকাশ পায় না। সত্যিকার সমঝদারিতা আর বড় কথা নয়। কে কতখানি বুঝল তা এখন গৌণ। তুমি কতো জনের কাছে পৌঁছাতে পারছো তাই এখন তোমার অহম বা 'ইগো'কে শান্তি দিতে পারে। শুনেছি, ঢাকা শহরে পনর হাজার টেলিভিশন সেট আছে। গড়ে পাঁচজন ধরলে, এক সন্ধ্যায় পঁচাত্তর হাজার লোকের সামনে তোমার বক্তব্য উপস্থিত। অবিশ্য, এই জন্যে মাশুল দিতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জারিজুরি ভেঙ্গে গেছে। পূর্বে সাহিত্য শিল্পে ওদের রায় মানুষ সমীহার সঙ্গে মেনে নিত। এখন আর সেদিন নেই। প্লেটো সাহেব অ্যাকাডেমি শব্দটাকে মহান মর্যাদা দিয়ে গেছেন। এখন এ্যাকাডেমি মানে ফসিল। দর্শন-ইতিহাস, বিজ্ঞান যা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের গুহায় ঢোকে প্রস্তরীভূত বা ধিকৃত রূপে–এমন রূপই নেই নেয় যে চেনা দায়, তুমি কোন গোলক ধাঁধায় ঢুকেছ। সম্প্রতি সাহিত্যের আলোচনায় ওখানে মার্ক্স প্রবেশ করেছেন। তারও বিকৃতি ঘটতে বেশী দেরি হয়নি। মার্কসবাদ তো পান্থজনের সখা। ওখানে উড়ন্ত পাখী শিকার করতে হয়। অর্থাৎ চলন্ত জিনিস নিয়ে কারবার। এখন এ্যাকাডেমির অচলায়তনের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই অতি অতিসরলীকরণের ওখানে ডকটর মহোদয়েরা সিদ্ধহস্ত। তাই রায় শোনা যায়: রবীন্দ্রনাথ? ফিউডাল। শরৎচন্দ্র? ফিউডাল। বিদ্যাসাগর? প্রতিক্রিয়াশীল। লালন ফকীর? নাকচ। আসলে সাহিত্য-সমালোচনায় এই জাতীয় পণ্ডিতরা পাতিবুর্জোয়া সুলভ অহমিকা মুক্ত হতে পারেন না। নিরক্ষর এই দেশ। অন্ধের দেশে কানা সম্রাট হয়ে যায়। পণ্ডিতন্মন্যতা সহজেই অনেককে পেয়ে বসে। জাঁ পল সার্ত্রের একটি উক্তি এঁরা স্মরণ করলে পারেন, "পল ভার্লেন ওয়াজ এ পেটিবুজোয়া বাট অল পেটিবুজোয়া আর নট পল ভার্লেন।' "পল ভার্লেন ছিলেন পেটিবুর্জোয়া। কিন্তু সব পেটিবুর্জোয়া পল ভার্লেন নয়।" আসল কথা কী, বদহজম বিদেশী ভাবধারা এঁদের উদ্গারে বেরোয়। উদ্গার ত? ফলে তার দুর্গন্ধ দূরে সরিয়ে রাখা দায়। ওদের রাজনীতির মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। স্বদেশের মাটি তাঁরা পায়ের নিচে থাকা জরুরৎ মনে করেন না। কোনো বিদেশী নেতা নস্যি নিলে এরা হাঁচেন। আসল কথা পণ্ডিতদের এই শ্রেণীর পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং অতীতে আর প্রয়োজন কোথায়? অতীত বর্তমানের সম্পর্কে তারা ঘুলিয়ে ফেলেন। বুঝা গেল, মহোদয়দের বসার জন্যে পাছা (শরীফ পাড়ার অভিজাত বিদ্বানদের হয়–নিতম্ব) লাগে না। আলেকজান্ডার হার্জেনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "উই আর নট দি ডক্টর উই আর দি ডিজিজ। আমরা বৈদ্য নই, আমরা নিজেরাই ব্যাধি।"

আরো শোনো, ম্যাসমিডিয়া, গণ-মাধ্যমের সামাজিক আভ্যন্তরীণ তাগিদে উদয় ঘটে। অতঃপর, বন্যাজলের মত তার স্রোতগতি কখনও বাঁধ ভাঙে, ঘরদোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোবায়, মানুষের অস্তিত্ব, আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ধরে টান দেয় এবং হেঁচ্‌কা টান। ব্যাপারটা জৈবিক বা অর্গানিক তা অনেকে বুঝে উঠতে পারে না। নিরন্তর ঝটকা কোন দিকে ধাইবে ঠাওর পাওয়া দায়। মানুষ ত এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখে। একই সময়ে নানা বিন্দু থেকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ অমনভাবে দেখাই জীবনকে জানার বিশিষ্ট উপায়। তাছাড়া, হেতু ও ফলের-কজ অ্যান্ড এফেকট-সম্পর্ক আর পূর্বের মত সরলরেখায় দেখা হয় না। অনেকে ভুলে যায়, যে পৃথিবীতে তাদের বাস তা-ও পরিপূর্ণ গোল নয়, তার উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। অর্থাৎ বক্র। অথচ তুমি যদি সোজা পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও, পদে পদে প্রতারিত হবে। তখন দৃশ্যমান রূপ (এ্যাপিয়ারেন্স) মনে হবে রিয়ালিটি বা বাস্তব। ইতিহাসে কতো ঝড়ের উৎপত্তি যে এই মরীচিকা বা দৃষ্টিভ্রম থেকে তার ইয়ত্তা নেই। মরিচীকার পেছনে ছুটলে পথিকের যে দৃশ্য ঘটে, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে তার ব্যত্যয় হয় না। এদেশে পণ্ডিতেরা চিন্তা করে। অধিকাংশ স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের ব্যাপার। তুমি কিন্তু জেনে রাখো, বেচারা গোবিন্দ দাস, বেচারা আদৌ স্বভাব-কবি ছিলেন না। পরিশীলিত মনের মানুষ। তাঁর কাব্যে বহু পরিচয় আছে। অথচ, অপবাদটা বেচারার নামের সঙ্গে লেপ্টে রইল। আমার মনে হয় এদেশের যারা কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি করে তাদের ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের মত অলৌকক শক্তিধারী জীব রূপে ধরে নেওয়া হয়। আর হেন শক্তির উৎস ঈশ্বর। ক্ষমতাটা স্বভাবজাত। স্বভাব-কবির ধারণা সেদিক থেকেও আসা স্বাভাবিক। বাদ দাও ওসব কথা। আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পণ্ডিতকূল চিন্তা করে, কিন্তু হাতিয়ারের কথা ভাবে না। স্বভাব পণ্ডিত ত। চিন্তা জিনিসটা স্বয়ং হাতিয়ার তা বহুজনের বোধগম্য নয়। ব্যবহৃত হাতিয়ার খানা কেমন তা-ও ভেবে দেখে না। মাটি খুঁড়ছে পণ্ডিত। কিন্তু চেয়ে দেখে না, ওটা খোন্তা, শাবল, না কোদাল। কোদাল ত শাবল নয়। তখন মাটি খোঁড়ার রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি সব বদলে যায়। হিন্দু পুরাণ-অনুযায়ী, বাসুকী সাপের মাথায় অবস্থিত পৃথিবী। সাপের এদিক-ওদিক হেলাদোলা পৃথিবীরও এদিক-ওদিক পাশ ফেরার চেষ্টা। অর্থাৎ ভূমিকম্প। বর্তমান যুগে বাসুকী কল্পনা হয়ে গেছে। গ্যাসের ফলে পৃথিবীর জঠরে অগ্নিমান্দ্য ঘটে। গ্যাস নিষ্কাশনপ্রার্থী তখন। এই সিদ্ধান্তে আধুনিক মানুষ পৌঁছল কিভাবে? হাতিয়ার বদলে গেছে। চিন্তার পদ্ধতি এখন ভিন্ন সড়কের যাত্রী। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা পরীক্ষাদির পূর্বে সেই কথাটা ভাবে। আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিশ উচ্চারণ করেছিলেন, 'লাইফ আনএকজামিন্ড ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং ... অপরীক্ষিত জীবন নিয়ে বাঁচার কোন সার্থকতা নেই" তা এক ধরণের হাতিয়ারেরই ইঙ্গিত। হাতিয়ারের বিবর্তন ঘটে। গোবিন্দ দাসদের (স্বর্গীয় কবির নিকট এখন ক্ষমাপ্রার্থনাসহ) নিকট এমন বাক্য বাতিল হয়ে থাকে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব সওয়া শ' বছর পূর্বে ব্যাপার। চিন্তার রাজ্যে এক অগ্ন্যুৎপাত। জীব-

জগৎ বিকাশ-পথে খোলস ছেড়ে ছেড়েই এগিয়েছে। অতীতের সঙ্গে না মিলিয়ে কোন কিছুর স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব নয়। অথচ, চিন্তা করতে গিয়ে ক'জনই বা অতীতকে পটভূমিতে টেনে আনে? বাছুরটা এঁড়ে না বক্না, তা লেজ তুলেই পরীক্ষা করা যায়। বহু পণ্ডিত লেজে হাত দিতেই নারাজ। আলসেমির জন্যে নয়, তার মানস-ছাঁচেই ব্যাপারটা নেই। সক্রেটিশের খেদোক্তি কী সবার কানে যায়? অনেকে পরীক্ষা দূরের কথা, জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলাই অসংগত মনে করে। বরং ভেড়ার জোয়ারে স্বচ্ছন্দে ভেসে যায়। নিষেধের সঙ্গে জুজুর ভয় লেপ্টানো থাকে। বিবর্তনবাদে তেমন জুজুর নেই। কিন্তু মন আগে থেকেই এমন ভাবে তৈরি হয়ে গেছে, তখন অমন পদ্ধতিই তাদের কাছে অবান্তর। এই পৃথিবী যে নিরন্তর পরিবর্তনের ঘূর্ণিপুঞ্জ, তা অনেকে উপলব্ধি করে না। ফলে, স্থান-কাল দুই-ই স্থানু-অনড় মনে হয় তাদের নিকট। তুমি আমার লম্বা ভূমিকার জন্যে হয়ত বিরক্ত হচ্ছ। থোড়া রসো, বন্ধু। আমার সাফাই গাইতে দাও। জানো ত বৃদ্ধকালে শুক্র এবং স্মৃতি উভয় ধারণই কষ্টকর। তোমার স্মৃতিশক্তি প্রখর আছে বলে মনে হয় না। তোমার কাল-সচেতনতার বহর দেখে বুঝে ফেলেছি। তাই ত এই কথাবতারণা। তোমার মত অনেকেই অনড় স্থান এবং কালের ব্যাপারী। বালককালের জামা যৌবনকালের গতরে ঢোকানোর চেষ্টা বহু জনে করে। যদি সফল হয় জামাটা ছিঁড়ে বা ফেটেফুটে যায় দেহের স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট করে এবং অবয়বের কী ছাঁদ হয়, তা বয়ান নিস্প্রয়োজন। মানস-জগতে একই ব্যাপার দাঁড়ায়। মেশিনগানের মুখে তাই অনেকে তীরধনু নিয়ে লড়ায়ে প্রবৃত্ত হয়। পরিণাম অবিশ্যি পরাজয়। কিন্তু অন্তর্জগতের মরীচিকা তাদের বিরাট আশ্রয়-সান্ত্বনা। আঁত-রোগী যদি মনে মনে পালোয়ান হতে চায়, কেইবা বাধা দিতে পারে? ইতিহাসে এমন পরিহাস দেখে মাঝে মাঝে মানুষে বিশ্বাস রাখা দায় হয়ে পড়ে। পরিবর্তন তাদের চোখে সেঁধোয় না, নিজেদের হালৎ দেখেও না। অথচ বিশ শতকের গোড়া থেকে পৃথিবীময় এত ওলট-পালট শুরু হলো যে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয় প্রথম চ্যালেঞ্জ এলো বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে তারা এমন জায়গায় পৌঁছলেন, তখন বস্তু ধারণা আর পূর্বের মত নিরেট রইল না। দেখা গেল, তা কখনও তরঙ্গ, কখনও কণিকা বা উভয়ের সমাহার। কিন্তু ইলেক্‌ট্রিসিটি এবং তেজস্ক্রিয়া (রেডিয়েশান) আবিষ্কারের ফলে স্থান এবং কালের চিরাচরিত ধারণার ভিত নড়ে গেল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক সোডী এবং রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয়ার মূল সূত্র আবিষ্কার করে দেখলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু কারণিক (কজাল, হেতু) পরিণাম নয়। আই) নেস্টাইন ওই দুই আবিষ্কার তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্বে সমন্বয়ে ঘটান। জগৎকে দেখার সনাতন তিন মাত্রার জায়গায় যোগ হোল চতুর্থ মাত্রা : স্থান-কাল-প্রবাহ। আইনস্টাইনের ভাষায় স্পেস-টাইম কনটিনিউয়াম। এই প্রবাহ এক রকমের টাইম। কিন্তু সমস্ত টাইম আবার কালের প্রত্যেক মুহূর্তে নিহিত। বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন ধারণা। সহজে কল্পনায় ঠাঁই দেওয়া কষ্টসাধ্য। স্থান এবং কালের প্রাচীন ধারণা আর রইল না। সময় সরল-রেখায় বিস্তার নয়, যেমন প্রাচীন উপন্যাসে নায়কের জন্ম–যৌবন-জরা। মার্শাল প্রুস্ত, জেমস জেমস প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীরা অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটেই কিন্তু উপন্যাস রচনায় এগিয়ে গেলেন। প্রুস্ত বিরাটভাবে গোটা সমাজের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু প্রকাণ্ড ক্যানভাস মনে হবে যেন স্থিরচিত্র। গতি যদি কিছু থাকে তা বৃত্তাকার, চক্রাকার এবং তার তাৎপর্য বুঝা যায় পুনরাবৃত্তিতে। জয়েসের উপন্যাস ইউলিসিস' মাত্র এক দিনের ঘটনা। কিন্তু তা সময় সম্পর্কে নতুন ধারণার পর্দায় ফেলা এবং বৃহৎ আয়তনে। উপন্যাসের চরিত্রদল যেন কালের সড়কের উপর লেপ্টে আছেন। এই অবস্থা থেকেই তাদের পারিপার্শ্বিক আচরণ, অন্যান্য ঘটনা তাৎপর্য লাভ করে।

বস্তুবিশ্বের ধারণায় ভূমিকম্প। মানস-বিশ্বও আর চিরাচরিত আদি ঠাঁয়ে থাকতে পারল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছর মানসিক বিপ্লবের এক মস্থিত ময়দান।

কয়েকটা ঘটনা মাত্র তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দ। এই বছরে ম্যাক্স্ প্ল্যাংকের–কোয়ান্টাম তত্ত্ব" প্রকাশিত হয়।

একই বছরে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের "নিউ ইন্টারপ্রেটেশান অফ ড্রিমস বা ভাষ্য", এবং টমাস মানের উপন্যাস–বাডেনব্রুকস" ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে।

তিন বছর পরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বিমান-সফর।

একই বছরে বেরোয় ম্যাক্সিম গোর্কির 'দি লোয়ার ডেপথ-পাতালপুরী' নাটক।

রিয়্যালিজমের আর এক অভাবনীয় তিক্ত সংযোজনা।

তখন থেকে গোর্কির যাযাবর দল বিশ্বজয়ে অগ্রসর হয়। এদেশে পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র অচিন্ত্য সেনগুপ্ত নজরুল প্রমুখের রচনার তার প্রতিধ্বনি। শ্রীকান্ত, বেদে, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী ইত্যাদি স্মরণীয়।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আইনস্টাইনের 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি–আপেক্ষিক তত্ত্ব।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর সাংস্কৃতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান নায়করূপে অভিনিন্দিত হন।

ওই বছরে এক রুশ ভদ্রলোক, ভলাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ–এক বই প্রকাশ করেন এন, লেনিন–এই ছদ্মনামে। বইয়ের নাম "টু ট্যাকটিকস ফর সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ইন এ ডেমোক্রেটিক রিভল্যশান-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের জন্যে দুই কৌশল।

তিন বছর পর (১৯০৮) রেনার মারিয়া রিল্কের নতুন কবিতার দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাসিলি ক্যান্ডিনেস্কী প্রথম বিশুদ্ধ নির্বস্তুক এ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং চালু করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নীল্স্ বোহ্র-কৃত এ্যাটমের কাঠামো ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ।

পৃথিবীকে আরো চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর এক সামাজিক বিপ্লবের বিস্ময়ের জন্যে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। কাল মার্কসের মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ আঠার শতিরাশি খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির সতর বছর পূর্বে। দেখা গেল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সতর বছর পরে তাঁর পুনজন্ম ঘটেছে, রুশ সর্বহারাদের বিপ্লবের আঁতুর ঘরে।

নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছেন সেই ছদ্মনামা ভদ্রলোক যিনি বারো বছর পূর্বে টু ট্যাকটিক্স ফর ডেমোক্রেসিক ইন এ ডেমোক্রেটি রিভল্যুশ্যান পুস্তক লিখছিলেন। নিজের নামের কাছে তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। লেনিন নামেই এখন তিনি বিশ্বে পরিচিত এবং বহুজনের শিরঃপীড়া।

শৃন্বন্তু, বয়স্য। শোন বন্ধু শোনো।

তালিকা বহু দেওয়া যায়।

এক কথায় বলতে গেলে মার্কস-ফ্রয়েড-আইনস্টাইন—এই ত্র্যহস্পর্শে পৃথিবীর ধ্যানধারণা ডিগবাজি খেতে লাগল।

তুমি এত তলিয়ে দ্যাখো বা ভাবো কিনা, আমার সন্দেহ আছে। লিখেছে ত রাশ-রাশ। কিন্তু দেখা যায়, জীবন-সম্পর্কে আজও তোমার পজিটিভ ধারণা নেই। আর থাকলেও তার তেজ নদারাৎ। তোমার জগচ্চিত্র অস্পষ্ট রংছুট। যুক্তির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ঈমানের উপরেই সত্যিকার শিল্প সাহিত্য গড়ে ওঠে।

যুক্তিই মুক্তি।

অনেক সময় ঈমান হয়ত নিকট ভবিষ্যতে পরিবেশের কোন সুরাহা করে না। কিন্তু পেছনে সত্যিকার সততা থাকলে শিল্পের কিছু মঙ্গল হয়।

টি, এস, এলিয়টের কতা ভাবো। ভদ্রলোক এক পর্যায়ে জাহির করলেন, তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় রাজতন্ত্রী মনার্কিস্ট, ধর্মে ক্যাথলিক, রচনায় ধ্রুপদী অর্থাৎ ক্লাসিসিস্ট। এসব তত্ত্ব তার কাব্যশক্তির কোন ক্ষতি করেনি। এলিয়ট কিন্তু আয়রনিস্ট বা শ্লেষবাদী। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নেতিমূলক। 'ওয়েস্ট ল্যান্ড, পোড়ো জমির বাইরে তিনি যেতে পারেননি। এমন পজিশান থেকে কাব্যশিল্প হয়ত উৎরাতে পারে, কিন্তু তা জীবন-শিল্প হয়ে ওঠে না। ডান্টে, গ্যেটে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহৎ শিল্পীরা জাতির জীবনে আলো বাতাসের মত প্রাকৃতিক সহচর হয়ে যান। এলিয়ট তা নন। অপূর্ণতার এই উপলব্ধি তাকে হয়ত শেষে ঈমানের প্রশ্নে উৎপীড়িত করেছিল। তাই বিষ্ণুদের ভাষায়, করুণ কালবিরুদ্ধ রাজনীতির গুহায় এলিয়ট অবসিত হন।

এখন নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো, তুমি একটি বেঈমান। পরোক্ষ পরিবেশ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচেতনতা এবং কাল-সচেতনতা এক জিনিস নয়। পরিবেশ অনেক সময় দুঃসহ বর্তমানের গর্তে ফেলে রাখতে পারে। তুমি যদি সেখানেই বুঁদ হয়ে যাও, কালের বৃহত্তর পটভূমি তোমার চোখ এড়িয়ে যেতে বাধ্য। মুহূর্তিক প্রত্যক্ষের বাইরেও ত জগৎ আছে, কাল আছে। অর্থাৎ বর্তমানের পাঁকে পড়ে তুমি ভবিষ্যতের ছবি আর দেখো না। আর ভবিষ্যতে কোথায় যাবে তা না জানলে, বর্তমান কী তার সকল করণীয় বক্তব্যসহ তোমার কাছে ধরা দেবে?

আইনস্টাইনের কালপ্রবাহ বিজ্ঞানের তত্ত্বে যাই হোক, শিল্পীর কাছেও অমূলক নয়। স্মৃতি অতীতের ব্যাপার, আশা ভবিষ্যতের ব্যাপার। বর্তমানে তুমি ত আছোই। শিল্পীর কাজও ত স্মৃতি, আশা বর্তমানকে নিয়ে। কালের প্রবাহ শিল্পীর চেতনায় ধরা পড়বে না কেন? অবিশ্যি, ব্যঙ্গ, শ্লেষ শিল্পীর আসরে ম্লেচ্ছ না হলেও মহৎ শিল্পের পাশে জায়গা পায় না। এলিয়টের মনে সত্যিই এসব প্রশ্ন উঠেছিল কি না, আমার জানা নেই। তবে আন্দাজে ধারণা করা যায়। যেহেতু ঈমান 'ফেইথ্' নিয়ে তিনি প্রচণ্ড মাথা ঘামিয়েছেন। তার বহু প্রবন্ধে তার সাক্ষাৎ মেলে। তবু শ্লেষবাদীরা মহৎ শিল্পী নয়, এলিয়টের এমন ধারণা অমূলক। পরিবেশের চাপে শিল্পী স্ফীতগ্রীবা গান নাও করতে পারেন। আনাতোল ফ্রাঁস তার পরম সাক্ষী। কিন্তু তিনি মহৎ শিল্পী নন, কেউ বলবে না। একদম নির্জন স্তব্ধতা আর যাই হোক, আত্মসর্বস্ব সন্ন্যাসী, নিউরোটিক বা বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গীত হতে পারে। তাও সন্দেহজনক।

প্রৌঢ়কালে বিবক্ষা পেয়ে বসে। বক্ বক্ করে মানুষ তখন মজা পায়, যেহেতু আর কিছু করার থাকে না। তোমার আমার এইক বয়স। একলগ্নে জন্ম। তুমি লক্ষ্য করেছো, আমি বড় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ধাইছি। তুমি বলেই এত স্বাধীনতা নিচ্ছি। সুবাদ বহুৎ বহুৎ আদিম্।

কাল-প্রশ্নের কাছে আবার ফিরে যাওয়া যাক। কাল মৃত্যু নয় এখানে : টাইম। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে কালের ধারণা বদলাতে থাকে। জড়বাদী দার্শনিকের কাছে সময় ছিল বিষয়গত অর্থাৎ অবজেকটিভ, ভাববাদীর নিকট বিষয়ীগত বা সাবজেকটিভ। সেই অবস্থা আর রইল না। অনেকে এই ব্যাপারে নির্বিকার। অপরের অজ্ঞতা তবু তেমন দূষণীয় নয়। কিন্তু কবিকুল, সাহিত্যিক নিঃস্পৃহ হয় কীভাবে? গোবিন্দ দাস মার্কা কবির সংখ্যা তাই শতে শতে মেলে। –এমন তো হওয়া উচিত নয়, কস্মিনকালেও। অন্ধভাবে এখন সাহিত্যের ধর্ম-পালন ত দূরের কথা, সাধারণ ধর্ম পালনও মঙ্গলকর নয়। ধর্ম এবং সাহিত্য তখন দুই-ই হয়ে পড়ে কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার চোরাবালি।

পশ্চিমবঙ্গেও এখন তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মেলে।

ওই দেশে তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে এমন ব্যাপার চোখে পড়ত না। অবিশ্যি বিভিন্ন সোশ্যাল বা সামাজিক ফোর্সের গাঁজানি (ফারমেনটেশন) যখন শুরু হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশের চাপে, তখন ক্লেদ, পাঁক তলা থেকে উপরে ভেসে ওঠে। ওই বঙ্গেও চিত্র স্বতন্ত্র কিছু নয়। অবিভক্ত বঙ্গে পরশুরাম অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজশেখর বসু তার বিখ্যাত 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প লিখেছেন ষাট বছর পূর্বে, তা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এক জেহাদ। এখন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাঁই বাবার ভক্তদের কীর্তন শোনা যায়। বুদ্ধিবিরোধী, যুক্তিবিরোধী মানসিক প্রবণতার সামাজিক কারণ বহু। সচেতন না হলে তুমি সেই খোন্দলে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এই খোন্দলে পড়ার মানস-আবহও শিল্পী সাহিত্যিক রচনা করতে পারে।

বর্তমানে অনুন্নত দেশের দশা সাম্রাজ্যবাদের থাবার নিচে আরো কাহিল। অপসংস্কৃতির ড্যুশ বিদেশ থেকে বড় সূক্ষ্ম ধারায় আসে, টের পাওয়া যায়। যুগযুগান্তরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকারীরা আর পূর্বের কায়দায় রক্ত মোক্ষণ করতে পারে না। তাই দেশী এজেন্টদের সাহায্য নেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিশ এদেশে জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করেছিল যে মতলবে, তারি সাংস্কৃতিক প্রতিক্ষেপ এখন নানাভাবে দেখা যায়।

একটা কৌশল হালফিল তুমি দেখেছো। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশ হঠাৎ প্রাচ্যের ধর্মগুলোর প্রতি ভয়ানক ভক্তিমুখর। ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রশংসায় নতজানু। মধ্যপ্রাচ্যের আমদানী তেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ এখন স্পষ্ট। হিন্দু ধর্মে ওদের মতি আরো বেশি প্রকট। কৃষ্ণচৈতন্য–কৃষ্ণ-কন্‌সাসনেস"–আন্দোলন লক্ষ্য করে থাকবে। পৃথিবীময় ওদের শাখা-প্রশাখার বিস্তার। শ্বেত রঙ, নধর-তনু মার্কিন ভক্ত ন্যাড়া-মাথা, পরনের গেরুয়া, যেন কৃষ্ণসখা বলরাম।

পশ্চিমী যন্ত্রসভ্যতার চোলাই এই সব ভক্তের দল অনুন্নত দেশে আসে কৃষ্ণপ্রেমচৈতন্য বিস্তারে। ওরা নিজেদের দেশে আবদ্ধ থাকে না কেন?

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গত একশ' বছর দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, নিজেদের ঘরে সেইখানে প্রেম বিতরণে ওরা উদ্যোগী হয় না কেন?

ওরা ভিয়েতনামে যায় না, লেবাননে যায় না, ইসরাইলে যায় না কেন প্রেমের পাইপ নিয়ে? ফাঁকিটা সেখানেই ধরতে পারবে।

পূর্বে উপনিবেশ-বিস্তারে ওরা বাইবেল তথা পাদ্রী পাঠাত, পরে বুলেট। এখন ওরা মার্কিন দেশ থেকে আর পাদ্রী পাঠায় না। পাঠায় মার্কিন সন্ন্যাসী। কিন্তু অনুন্নত দেশের ছাঁচে তৈরি। বর্তমান নয়া উপনিবেশবাদের যুগে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী মুৎসুদ্দীদের গাঁটছড়া বাঁধা দেখা যায় তারি হুবহু প্রতিচ্ছায়া আধ্যাত্মিক জগতে। এখনও কিন্তু ওরা বুলেট যোগায়। তবে নিজেরা আর পূর্বের মত ব্যবহার করে না। ওরা বুলেট সরবরাহ করে অনুন্নত দেশের এজেন্ট স্যাঙাতদের হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশের গোবিন্দ দাস সাহিত্যিকরা জানিতে অজানিতে ওদের খপ্পরে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ এক সাহিত্যিককে দেখলাম রাধাকৃষ্ণের কাহিনী–সনাতন বিলকুল–পরিবেশন করেছেন আধুনিক ভাষায়। উত্তম মুদ্রণ, সুশোভন জ্যাকেট গ্রন্থ। তিনি জানতেন না কার্টার (প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) প্রেম এবং কৃষ্ণ-প্রেমের গাঁটছড়া এই রশি দিয়ে বাঁধা। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে বই লিখতে আপত্তি নেই। তা তো আধুনিক চেতনার কোন দিশারী হবে।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন : "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।" এই গ্রন্থ মনীষার আলোক-বর্তিকা। কিন্তু যেখানে প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন ভক্তি ছাড়া আর কিছু মেলে না, তা অন্ধতার পিছল সড়ক হয়ে দাঁড়ায়। কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার মারীবাষ্প নার্ভে-মস্তিষ্কে সেই পথে ঢোকে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা হয়ত এতদিনে উপলব্ধি করেছেন যে, রাজপথে, অলিতে-গলিতে 'মাস্তান'দের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্বে অত্রস্থলে সাহিত্যিক মাস্তানদের আবির্ভাব ঘটে। গুণ্ডা সৃরীসৃপের জন্যে মানসিক ঝোপ-জঙ্গল, বিবর ওৎ পাতার জন্যে, আগেই তৈরি হয়ে যায়। কল্লোল-যুগীয় তিরিশের বিদ্রোহী কবিদের মানস-ব্রজনা পঞ্চাশ বৎসর পরে আজ নিরাসক্ত পর্যালোচনা কঠিন নয়।

স্বর্গীয় নজরুল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া এক যুগের মহাবিদ্রোহীদের অধিকাংশ পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়ার মোসাহেবে পরিণত হন।

নিজেদের পতাকা আর উন্নত রাখতে পারেননি যুগের উন্মোচন-পথে। "সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্র ঠাকুর" রবে যারা হাঁক মেরেছিলেন, তাদের অন্যতম বুদ্ধদেব বসু শেষে রবীন্দ্রনাথেই "সব পেয়েছির দেশ" লাভ করেন। অনুন্নত দেশে Sex (যৌন শব্দের জায়গায় আমি 'কন্দর্পনা' ব্যবহার করছি, সকলে ভেবে দেখবেন) একটি 'ট্যাবু'। এই ট্যাবু তৎকালীন বিদ্রোহীরা ভাঙতে এগিয়েছিলেন।

ইন্ডিভিজুয়েশান' বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় তাদের দান শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু রোমান্টিক মোড়কে তনু ঢেকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন হাস্যকর, মধ্যবিত্ত সুলভ তাঁদের বিরোধিতার পরিণামও তদ্রূপ। দন্ত-দর্শনেই সব পর্যবসিত, দংশনে নয়। স্বর্গীয় অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত কন্দর্পনা বিষয়বস্তু করে (বেদে, টুটাফুটা ইত্যাদি) সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। শেষে তথাকথিত অধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁর সমাপ্তি। তিনি শেষে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে নির্বাণ লাভ করেন। বিবর্তনের ধর্ম অবিশ্যি লেখক কর্তৃক যথা-পালিত। হিন্দু পুরাণ এবং নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সায় আছে : "মানুষ ঈশ্বর পূজার পূর্বে লিঙ্গ-পূজা করিত।"

"মরমী ভক্তিবাদ প্রতিক্রিয়ার হাত জোরদার করে, স্বর্গীয় সেনগুপ্ত জানতেন না।

এই উপমহাদেশের সমাজ-তাণ্ডবের ঢক্কা-বাদকরূপেই এমন মানস আবহ রচনার কারিগরদের পরিচয় আজ স্পষ্ট। একদা বিদ্রোহীদের কাছে বাছ-বিচারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন ছিল না।

উপনিবেশে সাহিত্যিক-দাসত্বের খোঁয়ারি কাটতে সময় যায়।

কল্লোল যুগের কল্যাণে, ন্যুট হ্যামসুনের “হাংগার-বুভুক্ষা” উপন্যাসখানা তখন সমাদর লাভ করে। মাত্র দুই দশক পরে হ্যামসুন হন হিটলার-পূজারী। টমাস মান গভীর পরিতাপের সঙ্গে লিখেছেন যে তাঁদের এমন এক সতীর্থ ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবেন, ভাবা দায়। লেনিন কিন্তু ওই বই পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, যে লোক ক্ষুধার প্রশস্তি পাইতে পারে সে ত ফ্যাসিস্ট। রাজনৈতিক নেতার দুরদৃষ্টি ছিল। কিন্তু এদেশে রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন “বিদ্রোহীদের” চেতনায় তা ধরা পড়েনি। তাঁদের জীবনের প্রতি কৌতূহল শেষে মরমী ধোঁয়ার ভিতর প্রশান্তি লাভ করেছিল। আল্‌ডুস হাক্সলি ইংল্যান্ডে মাঝবয়স থেকেই গাঁজায় চক্ষুহীন হন। তাঁর “আইলেস ইনি গাঁজা” স্মরণীয়। উপন্যাসে, গাঁজা যদিও একটি শহরের নাম। মোদ্দা ব্যাপার–সৌন্দর্যের সাধনা সচেতনভাবে না করলে তা বর্বরতা, নৃশংসতা–এক বাক্যে, অমানবিকতার আগমনী হতে পারে।

বাংলাদেশের অধিবাসী তুমি। তোমাকে ওই কথাটা কী ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবে? তোমার থেৎলানো গায়ের চামড়ায় চাবুকের বহু দাগ রয়েছে। তা কী এত জলদি শুকিয়ে যেতে পারে? পারো কী তুমি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভুলে যেতে? পাকিস্তান হওয়ার পর, যদিও সূত্র পূর্বের, চব্বিশ বছর ধরে চলল উত্তরাধিকারের লড়াই। শাসকশ্রেণী এবং তাদের পূর্ব পাকিস্তানী এজেন্টরা সাচ্চা উত্তরাধিকারকে ঝুটা প্রতিপন্ন করার জন্য কম সচেষ্ট ছিল না। তারা কখনও টান দিত ভাষা নিয়ে, কখনও ধর্ম। হ্যাঁ, ধর্ম। ফিরোজ খান নুন নামক এক গভর্নর ছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। তিনি হাঁকফুকার ঘোষণা করলেন, “বাঙালি মুসলমানের খৎনা হয় না।” তাকে চেপে ধরলে তিনি প্রাইভেটে নাকি বলেন যে তার স্ত্রী তাকে এই তথ্য যুগিয়েছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম ভিকি নুন, যার নামে বর্তমান “ভিখারুন নেসা গার্লস্ স্কুল।” এই স্কুলের নামটা মহীয়সী কোন বাঙালি রমণীর নামে এখনই পরিবর্তন করা সকলের কর্তব্য। দাসত্বের এমন চিহ্ন কারো বরদাস্ত করা উচিত নয়। বিদেশী ওই ইটালীয় মহিলা আর যা-ই হন–মহীয়সী ছিলেন না, যদিও গভর্নরের স্ত্রী রূপে তার শয্যামূল্য থাকতে পারে। ইটালীয় রোড করপোরেশন সংস্থার চেয়ারম্যান ছিল কাউন্ট কাম্পানেল। ভদ্রলোক আবার “ভিকি নুনের” বন্ধু। সেই সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা তৈরির ঠিকাদারী ইটালীয় রোড করপোরেশনকে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারদের মুখে যা থুথু স্বরূপ। যেন রাস্তা তৈরী করার মত ইঞ্জিনিয়ারও তখন এদেশে ছিল না। পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর মানসিক দেউলিয়াপনা প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠল রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর। তখনও স্থানীয় এদেশী অনুচর পাওয়া গেল সমর্থনের কীর্তন গাইতে। চব্বিশ বছর ধরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকারের সংগ্রামে অব্যাহত ছিল বৈকি। তখন এই দেশে এক শ্রেণীর কবি কী সৌন্দর্যের চর্চায় কবিতা লেখেনি? এক শ্রেণীর প্রবন্ধকার কী প্রবন্ধ লেখেনি মনীষার প্রদীপ রূপে? অনেক শিল্পী কী ছবি আঁকেননি? সবাই সৌন্দর্যের সাধক, বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিবেশক। সংবাদপত্রে অন্যান্য প্রচার বাহনে সবাই খ্যাতনামা। তাদের অনেকের সৌন্দর্য-সাধনার ফলশ্রুতি ? ? ? ? ? ? তিরিশ লাখ মানুষের লাশ, ঈমানদান বুদ্ধিজীবীদের নির্মম প্রাণঘাত। তাদের অনেকের জ্ঞানচর্চা, সৌন্দর্য-সাধনার ফলশ্রুতি? ? ? ধর্ষিতা, মা-বোনের অসহায় আর্তনাদ, জনক-জননীর সম্মুখে কন্যার বেইজ্জতি-লব্ধ মূক-স্তব্ধতা, নিঃশব্দ ফরিয়াদ–। তাঁদের সৌন্দর্য সাধনা তথা প্রাণদাত্রী চেতনা সৃষ্টির পরিমাণ? ? ? –দু'কোটির বেশি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আবার আদিম যুগের যাযাবর–গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঝোপ-জঙ্গলে এক ফালি নিরাপদ ঠাঁই-সন্ধানে হন্যে, সদা-সন্ত্রস্ত ইঁদুরের প্রতিনিধি। গুণ্ডা–গুপ্ত আততায়ী রাজাকার আলবদরের অন্ধত্ব খুনীদের নিঃশঙ্ক বিচরণের উপযোগী অন্ধকারের ছায়া এই সৌন্দর্য-সাধকের দল দেশের মানস আবহে দিনের পর দিন তৈরী করে রাখেনি? তারা আজ অস্বীকার করতে পারেন? তাই বলছিলাম, বন্ধু, সৌন্দর্যের সাধনা, জ্ঞানের সাধনা সচেতনভাবে না করলে তা বর্বরতা' নৃশংসতা এক বাক্যে অমানবিকতার আগমনী, প্রস্তুতি ভূমিকা হতে পারে। নৈতিকতার প্রশ্ন তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে চিরকাল জড়িত। মানস-আবহ থেকে মানবিকতা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিয়ে রাখলে, শূয়োরের গঁৎ-গঁতানিও কাব্য-সাহিত্য হয়ে উঠত এবং ডান্তে, গেটে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিত। বাঙালী মুসলমানের বয়স আট শ'বছর হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী গোলামীর জিঞ্জির তাদের গলায়। এমন দাস-কুলের প্রত্যাশার আকাশ ত দিকচক্রবাল-হীন হতে পারে না। তাই পাকিস্তানী শাসকদের নিকট এদেশী সৌন্দর্য-সাধকেরা বড় স্বল্পমূল্যে বিক্রি হাত। কয়েকটা বাড়তি পাৎলুন, জ্যাকেট, মাঝে মাঝে বিদেশী ট্যুর, কিছু "পশ্", হোটেলে পশবার মত পকেটের তাগদ, ঈষৎ আর্থিক নিরাপত্তা। এই ত ওদের দাম। পুরুষানুক্রম গোলামের প্রত্যাশ্যা গগনচুম্বী হবে কেন? "দরিদ্রের স্বপ্নেও দীনতা থাকে।" কথাটা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের। উত্তরাধিকারের সংগ্রামে ওরা সাচ্চা না, ঝুটা চেতনা পরিবেশন করছিল, চব্বিশ বছর পরে ইতিহাসের নির্মম বাস্তব তা স্পষ্ট চোখে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আর দৃষ্টিভ্রমের কোন প্রশ্ন ওঠে না, সন্দেহের দোলায় দোলার কোন প্রশ্ন ওঠে না। জানিনে, ওদের বিক্রীত এবং বিকৃত বিবেকের গায়ে অনুতাপের কোন স্পর্শ লেগেছে কি না, খোঁজ নিয়ে দেখো। যে-কোন মানুষের অধঃপতনে তোমার আমার দুঃখ পাওয়া উচিত। যেহেতু পতনটা মানুষের। তবে বেশী দুঃখ করো না। ইতিহাসের ট্র্যাকশটে ওদের ছায়া অন্ধকারও গ্রহণ করবে না। একদা জিন্না এভিন্যু বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিন্যু। ইতিহাস এইভাবেই তুরুপ করে। তার

অত্যারোপ–সুপার-ইমপোজিশনের খেল অন্ধের দল কখনও দেখতে পায় না। ভাবাদর্শ আইডলজি আকারহীন, নির্বস্তক কিছু নয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার অদৃশ্য শিকড় প্রোথিত পোঁতা থাকে। অত্যাচারী যদি নিজের নিপীড়ন-জুলুমকে ন্যায্য, যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান করে তুলতে না পারলে, তার জুলম ত মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বসবে। দস্যু নিজেকে দস্যু বলে জাহির করলে কী সে ডাকাতি করতে পারতো? তাই ছদ্মবেশ প্রয়োজন হয়। ভাবাদর্শও এই ছদ্মবেশের একটি সহায়। আলীবাবা কাহিনীর দস্যুরা নিজেদের তেলের সদাগর বলে পরিচয় দিয়েছিল। ঈমান এবং সততা নিয়ে বাঁচতে হলে কাল-পটভূমির দিকে সদা-জাগ্রত প্রহরী চোখ রাখা অপরিহার্য। এখানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলে তুমি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান মানুষ হতে পারো কিন্তু সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে চরম অবমাননায় তার দাম দিতে হয়। এই সোজা সূত্রের কথা অনেকে মনে রাখে না। চল্লিশ বছর পূর্বে এক কবির উদয়কালে মনে হয়েছিল, ভবিষ্যতে দেশের মানুষ এক মহৎ কবির সন্ধান পাবে। কিন্তু জীবন-যাচায়ের পথ তিনি ভুলে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পাকিস্তান ও ইসলাম সমার্থবাচক। অর্থাৎ পাকিস্তান টিকে থাকলেই ইসলাম টিকে থাকবে। মূর্খ কবি রাষ্ট্র এবং ধর্মের পার্থক্য বুঝলেন না। মগজের সাধনা না থাকলে, মাজাও আর সোজা থাকে না। তখন সরীসৃপের দলে পড়তে হয়। জীবদ্দশায় কবি দেখে গেছেন পাকিস্তান ভেঙে গেল (আর যেটুকু অবশিষ্ট একত্রিত আছে, তা নেহায়েৎ ডাণ্ডার মহিমায়) কিন্তু ইসলাম টিকে রইল যথাপূর্ববৎ। অন্ধ মোহগর্তে পতিত প্রারম্ভে প্রতিভাবান কবি এখন ডজন-ডজন মাইনর রোমান্টিক কবিদের অন্তর্গত। তাঁর বিরাট সম্ভাবনা ভ্রষ্ট বুদ্ধির চোরাবালিতে অজানিতে নিঃশেষ হয়ে গেল। কবি তিনি। কিন্তু জালেমের দুঃশাসন, জল্লাদের হাতিয়ার চালানোর মানসিকতা গঠনের কারিগর। ইতহাসের কাছে তাঁর এই কলঙ্ক কী কেউ খণ্ডাতে পারে? তাই বলা হয়, ইতিহাসে ক্ষমা নেই। –জানো বন্ধু, ইংরেজরা যাকে বলে “সেন্স পিরিয়ড” অর্থাৎ কাল-বোধ সম্পর্কে তাই বড় সতর্ক থাকতে হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর দু'দশক পেরিয়ে গেল। জীবনে ইতিহাসের এমন ঘূর্ণিঝড় দেখার সুযোগ ত সচরাচর আসে না। ঝড় বয়ে গেল। অথচ আজও একটা উপন্যাস লেখা হল না। যা হয়েছে, তুমিও স্বয়ং দাগী আসামী, সব নুন-চামড়ার উপর ঈষৎ খাম্‌চি। বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার কাছে এমন শ্রমসাধ্য ব্যাপার আশা করা যায় না। কিন্তু তরুণ বন্ধুদের কাণ্ড দ্যাখো। ওদের কাছে যেন ইতিহাস নেই। ‘গ্র্যান্ড ভিজন’ বিরাট দিব্যদৃষ্টি নিয়ে এগোনের চেষ্টা দূরের কথা, বরং পাশ কাটিয়ে যেতে আনন্দ পায়। অথবা, এখানে-সেখানে ঈষৎ খামচি। মুক্তিযুদ্ধের এক-আধখানা ঘটনা, লন্ডনে সেই সময় তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ধুক্‌পুকনি ইতিহাসের লাভাস্রাবী অগ্ন্যুৎপাত নিয়ে প্রায় ছেলেমানুষি বা লেখা-লেখা খেলার এই এক তামাসা চলছে। এমনিতে বাংলা উপন্যাস বিশ্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসরে অতি দীন, দরিদ্র, জীবনের নানা দিকে যাতায়াত-হীন। সেখানে 'মাল্‌টিপল টাইম' অর্থাৎ যৌগিক কাল, ভার্জিনিয়া উলফের ডবল টাইম–বা কোন দার্শনিক চিন্তার খেই ধরে এগোনো, কিংবা দর্শকের বিন্দুতে না থেকে লেখক হিসেবে সোজা জীবনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে উপন্যাস রচনা–এমনতর নানা পরীক্ষার চেষ্টা বাঙালীদের নেই। তরুণরা প্রধানতঃ ম্যাস-মিডিয়ার শিকার। পূর্বেই বলেছি, ফলে, ক্যাটারিং এজেন্ট। খেপ্‌লা জালের বেষ্টনীর মত বিরাট চৌহদ্দি জুড়ে জীবনকে নানা কোণ থেকে ধরার প্রবণতা কোথাও চোখে পড়ে না। ভাসা ভাসা কিছু ঘটনা, কাহিনী বাজারে ছাড়া যেন আমাদের ব্রত। বাঙালী চিন্তা করে শুনলে তাই আমার হাসি পায়। এই আত্মদীনতা সম্পর্কে অনেকে সচেতনও নয়। আজকাল ছোট গল্প লেখা আগের চেয়ে ঢের কঠিন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের তাগিদে ইউরোপে আধুনিক ছোট গল্পের সূত্রপাত। কিন্তু মানুষ আবার যৌথ জীবনের দিকে ছুটে না গেলে তার পরিত্রাণ নেই। আণবিক দানবের হাতিয়ার তা আরো অবধারিত করে দিয়েছে। নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে সিরিয়াস লেখকেরা চিন্তিত।

ছোট গল্পের ফর্ম কী হবে? আবার কী আমরা সোজাসুজি কথকথায় ফিরে যাব, অথবা উপাখ্যানের আঁচল ধরব?

প্রবন্ধের ছাঁচে কী ছোট গল্পকে ফেলা যায় না? এত রকম সমস্যা সম্মুখে।

তরুণ বন্ধুরা বয়োধর্মে নানা দিকে ফেটে পড়ে না কেন? তবু একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়। সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্যে তা দরকার।

অবিশ্যি তুমি নিজে বৃদ্ধ তা বিস্মৃত হয়ো না।

তোমার আমার জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এই এক ট্র্যাজেডি। একটা সময়ের পরিসরে তুমি আছো আমি আছি। গড়ে ষাট সত্তুর খুব জোর আশি বছর।

তার পর নেই। কিন্তু সংসারের প্রবাহ ত লুপ্ত হবে না। অবিশ্যি মৃত্যু আমার কাছে আর এক ধরনের নতুন জীবন-ধারা, অন্য কেরিয়ার। একটা লোক চলে যায়। কিন্তু-তার কৃত কাজ থাকলে তা জানান দিতে থাকে। মানুষের সঙ্গে সব সুমাদ শেষ হয়ে যায় না।

এত দিনে নিশ্চয় তুমি উপলব্ধি করেছ, তুমি লেখক নও।

তুমি এক ধরনের মুদ্দফরাস ঝাড়ুদার।

লেখনী তোমার পতাকা নয়, তোমার পতাকা সম্মার্জ্জনী। দুঃসহ বর্তমানের মুখে তাৎক্ষণিকতায় সমস্ত উদ্যম অপচয় করেছ। জাতীয় জীবনের বুদ্বুদের পেছনে তোমার সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা আইস্‌বার্গের উপরিস্তর। আরো গভীরে ডুব দিতে শেখনি 'অরূপ রতন আশা করে'। উপন্যাসের কল্যাণে ব্যক্তি-মানুষ জেনেছে তা-কে ইতিহাস দিয়েছে ব্যক্তি-মানুষের স্বীকৃতি।

ব্যষ্টি-গোষ্ঠির মিলিত জীবন-ধারার তরঙ্গ-কল্লোলের ঐক্যতান শুনতে পাওনি কোনদিন। বাংলাদেশের সীমানার পদ্মানদীর বাঁধ থাকার ফলে আত্মসন্তুষ্টির শিকার

এক রকমের গাঁইয়া মোড়ল বা লোকাল লায়ন (স্থানীয় সিংহ) হওয়াই ত এদেশে সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু পৃথিবী আরো বিচিত্র এবং বিশাল তা ভুলে যাও খুব সহজে। তুমি ওজর তুলবে, আমার জানা কথা, প্রৌঢ় কালে বৃদ্ধকালে কী মত বদলানো যায়? অভ্যেসের মতই তা কঠিন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবানবন্দি চিরকাল স্মরণীয়। নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি পরিবর্তনের কথা অকপট স্বীকার করেছেন। এবং বলেছেন যে, বিধাতা যদি তার সৃষ্টি তথা মত না বদলাতেন তাহলে আজ যেখানে ধ্রুপদ সঙ্গীতের আসর বসছে সেখানে ডাইনোসোরের গর্জন শোনা যেত। কাছে বই নেই। তাই তাঁর অপূর্ব কথামৃতের সবখানি তরল তোমার কানে ঢেলে দিতে পারলাম না। সৃষ্টির তাগিদে মত বদলানো কোন অপরাধ নয়। আমার কাছে তা স্বীকারে তোমার ইজ্জত যাবে না। কালপরিক্রমা তুমি পরিপূর্ণ অনুধাবনে অক্ষম। তুমি অবিশ্যি স্বীকার না-ও করতে পারো। কিন্তু আমার বক্তব্য বললাম এবং খুব ভুল বকেছি বলে মনে হয় না।

পুরাতন সুবাদের রেশ আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া তুমিও জানো অসম্ভব....... বন্ধু তাই ত তোমাকে আহবান জানাই।

এসো নিবিড় নিকটে একবার এসো।

এদেশে জন্মে অখণ্ড, নিরটে ব্যক্তিত্বের স্বাদ ক'জনই বা পায়? অধিকাংশ জন বাঁচে ফন্দি এঁটে। সেই ফন্দি ফিকিরের ভোলও তাকে পাল্টাতে হয়। সেখানে সে অবিচল ঈমানদার থাকতে অপরাগ। চোর গুণ্ডা ডাকাত বেশ্যা ইত্যাদিরাই এখন সৎ। তাদের ঈমানে দ্বৈততা থাকে না।

আর আমরা? চূর্ণ-বিচূর্ণ ব্যক্তিত্বের কণিকা, পদে পদে দশমায়িত, মানবতার খণ্ডিত কেরিকেচার। তার মধ্যেই মোহ মরীচিকা সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত মানব-জন্মের পরাকাষ্ঠা। দেখাই এবং বিবেককে চোখে ঠেরে সান্তনা পাই ....

নিজের দিকে তাকাও,
আমার দিকে তাকাও।
এসো নিবিড় আলিঙ্গনে যুথবদ্ধ
একাকীত্বের স্বাদমগ্ন হই। এসো........

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চের অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে

আমি চাটগাঁ শহরে এক ভদ্রলোকের অতিথি ছিলাম অনেক কাল পূর্বে। ছোট টিলার উপর দোতলা বাড়ি। ছাদটি মনোরম। প্রাকৃতিক দৃশ্যমণ্ডিত এবং অনেক দূর পর্যন্ত চোখ মেলে দিলে দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটত না। সোজাসুজি দেখা যেত আর এক ছাদ। অন্য টিলার উপর প্রকৃতির রাজ্যে বাস করলেও ওই গৃহস্বামী ছাদে বাগান তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে খান কয় বেতের চেয়ার ও একটি নাতিউচ্চ বেতের টেবিল পাতা। ছাদের কোণে ছিল শেল্‌ফের মত খাঁচা। খাঁচাটি ক্যানারিজাতীয় পাখি বোঝাই।

তাদের কিচিরমিচির শোনা যেত রাত্রির স্তব্ধতায় অথবা খুব সকালে। ওই ছাদে হামেহাল নানা দৃশ্যের অবতারণা ঘটত। কখনও গৃহস্বামী একটা ছাদে হাঁটছেন অথবা গাছপালার খবরাদিতে ব্যস্ত। হাতে ঝারি। কখনও এক সঙ্গীর সাথে সিগারেট ফুঁকছেন। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় চার পাঁচ জনের আড্ডা, নারী-পুরুষ সমন্বিত। রাত্রে ছাদে আলোর ব্যবস্থা ছিল। এক দিন দেখা গেল, দুই তরুণ-তরুণীর ঘন সান্নিধ্যে আলাপ-রত। এমনতর নানা দৃশ্য চোখে পড়ত। একটি কথাও অবিশ্যি শোনা যেত না।

আলোকপাতের ব্যবস্থা আছে। কুশীলব আছে। দৃশ্যের পরিবর্তন আছে। সব মিলে নাট্যমঞ্চের আবহ। এমন প্রশ্ন কেউ সহজে মেনে নেবে না।

গণ্ডী বাড়িয়ে সামাজিক পূজাপার্বণ উৎসবের কথা ধরা যাক। সেখানে কোন ব্যক্তিই ভূমিকাহীন থাকে না। বিবাহ-উৎসবের ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ, পাত্রীর পিতা, মোল্লা পুরোহিত এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন সকলের নিজ-নিজ ভূমিকা আছে। সময়ও সেখানে থিয়েটারের মত নির্দিষ্ট বৈকি। হয়ত টিকেট কিনতে হয় না কাউকে। তা-ও বলা চলে না। নিমন্ত্রিতদের পত্র দেওয়া হয়। দৃশ্যাবলী মজুদ। তবু বিবাহ উৎসব নাটক-অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে না। অথচ মিল প্রচুর।

রসিক ব্যক্তি যিনি সংসারকে সার বা শ্রেষ্ঠ সৎ বলেছিলেন, তার কথার পিছনে হয়ত পরাবিদ্যাগত (মেটাফিজিক্যাল) নৈরাশ্য লুকিয়ে ছিল। কিন্তু মঞ্চের ইঙ্গিত দিতে তিনি ভোলেননি।

খুনের বিচারে ফাঁসির দণ্ডাদেশের পর কি পূর্বে একটা আদালত জুড়ে কম নাটক অভিনীত হয় না। খুনী, তার আত্মীয়-স্বজন, নিহতের শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ, দু'পক্ষের উকিল, ব্যারিস্টার, সাক্ষী, বিচারক....... এবম্বিধ সব মিলিয়ে মানবিক আচরণের এক প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত। কিন্তু আদালত থিয়েটার নয়, যদিও সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

উভয়ের গরমিল আছে বৈকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্র অন্যত্র।

দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহ বাস্তব। তা আদৌ কৃত্রিম নয়। মঞ্চের ঘটনা বিপরীত এবং পূর্ব-পরিকল্পিত। শিল্পের তাগিদ সেখানে মূল নিয়ন্ত্রক।

নাট্যকার এবং পরিচালক পাশাপাশি পুতুলের রশি হাতে উপবিষ্ট। জীবনের প্রবাহ ক্রমাগত ধাবমান। ছাঁদনাতলার পর বিবাহের মুলতুবি ঘটে না। অপ্রত্যাশিত সেখানে কিছু পৌঁছে যেতে পারে। কন্যাপক্ষে বরপক্ষে হয়ত দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল উৎসবের সামিয়ানার নিচে। শাস্ত্রকারগণ বলেছেন জীবনের অপর নাম লীলা। তার হেরফের অদলবদল বিন্যাস অনন্ত নিরবচ্ছিন্নতায় বাঁধা। মঞ্চের ঘটনা পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত। তার প্রারম্ভ, পরিসমাপ্তি একই খাতে সীমাবদ্ধ। মঞ্চে নিহত সৈনিক আবার বেঁচে ওঠে, প্রাত্যহিকতায় যা অসম্ভব। হুগলী নদীর বুভুক্ষু বুক রঙ্গমঞ্চ হ'লে পশ্চিম বাঙলার অভিনয়- নৈপূণ্যের প্রতিমা কেয়া চক্রবর্তীকে অকালে হারানোর ব্যথাতুর প্রশ্ন কোন কালে উঠত না। নদীতে অভিনয়-কালে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বিদ্যাসাগরের চটি অভিনেতা শিরে গ্রহণ করেছিলেন। চার্মিক প্রহার তবু চার্মিংবাস্তব জীবনে চটির এমন কদর কেউ দিয়েছে.... কোন প্রহৃত জন, আজও জানা নেই। মঞ্চ কল্পনার ইমারত। বাস্তব জীবনে বড় জোর দিবাস্বপ্ন দেখা চলে। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তেমন সংক্রমণ যেদি ব্যাপক হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যৌথভাবে এক জায়গায় আখড়া গড়ে তুলেন, তখন বুঝতে হবে, সমাজের কোন এক শ্রেণী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অপর শ্রেণীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এবং পীর-পুরুত, ভণ্ড পলিটিসিয়ান এটাবলিশ্‌মেন্টের ভেল্কি দেখানোর জন্যে ভাড়াটিয়া গোলাম রূপে নিয়োজিত।

মঞ্চের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ উদ্দেশ্য, তার ফলশ্রুতি দর্শকদের চোখে তুলে ধরা। উত্তম পরিচ্ছদবর্গী ব্যক্তি ডাঁটে রাস্তার উপর হাঁটে অপরকে দেখানোর জন্য। সে জবরদস্তি খাটাতে পারে না। মঞ্চে জবরদস্তি আছে, দেমাক অনুপস্থিত। এইসব ক্রমান্বয়ে সজ্জিত দৃশ্যাবলী উপলক্ষ্য মাত্র। গৌণ উদ্দেশ্য সমগ্রতার স্পর্শদান। সেদিক থেকে দৃশ্য মাত্রেই প্রতীক। এবং প্রতীকের অর্থ তার অবয়বে থাকে না। মঞ্চমায়ার তাৎপর্য এখানে নিহিত। সমাজের ঘটনায় এই মায়া গরহাজির, শঙ্করাচার্যের দোহাই সত্ত্বেও।

অবিশ্যি মঞ্চের ক্রিয়াবলী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নয়। নাটকের বিষয়বস্তু, ফর্ম, এমন কী মঞ্চসজ্জা, অভিনয় পদ্ধতি কালের মেজাজেই গঠিত হয়। "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" যোগেশের আর্তনাদ এক যুগের স্মারক হিসেবে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ধরে রাখেন। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্লাবন-ধারা এ-দেশের ভিটেমাটিও স্পর্শ করে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজের যৌথ পরিবার স্বভাবতঃই ধাক্কা খায়। পুরাতন কাঠামো বজায় রাখা দায়। ব্যক্তিতান্ত্রিকের অনুবেদ (সেনসিবিলিটি) কলাগাছের মত ঘনসান্নিধ্য যৌথ পরিবারের শিকড়গ্রাহী হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারাজ। পুরাতন আবরণে ফাটল ধরে। যুগ-সন্ধিক্ষণের নাগরিক যোগেশ আর্তনাদ করে। কালের রথচক্র থামানো তার সাধ্যাতীত। আবার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বেগবান প্রসার মুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বীর-নায়ক খুঁজে পান ইতিহাসে এবং শালপ্রাংশু অটল ব্যক্তিত্বের প্রতিমা খাড়া করেন। সেখানে ভিলেন 'হিরোর' একদম বিপরীত নয়, বরং ব্যক্তিত্বের দিক থেকে সহধর্মী। এমন ইতঃক্ষিপ্ত নয়, বহু বিন্যস্ত উদাহরণ বিশদ দেওয়া যায় নাটক ও সমাজের সম্পর্কের ব্যাপারে।

পশ্চিম বঙ্গেই, এখন দেখা যায়, বহু নাটকের মঞ্চায়ন, রাজরোষের জন্যে যা দু'দশক পূর্বে চিন্তা করা কঠিন ছিল। এক জাতীয় নাটকের জনপ্রিয়তা প্রচুর বেড়েছে, যা কায়েমী স্বার্থ বা এস্‌টাবলিশমেন্ট-বিরোধী। আবার সমর্থক-গোষ্ঠীর আগাছাও সংখ্যায় কম নয়। নিছক অবসর-বিনোদনের নাটক হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে সমাজে প্রত্যেক শ্রেণী নিজ-নিজ চৌহদ্দি-সচেতন হয়ে ওঠে বা পোলারাইজিশানের মন্থনে যায়, সেখানে নিছক অবসর-বিনোদন পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়ার ঢাক হয়ে পড়ে। হয়ত ছদ্মবেশ সহজে ধরা পড়ে না।

ইউরোপেও দেখা যায়, বিবর্তনের ধারা সামাজিক মেজাজের সমান্তরাল। ধর্মীয় প্যাশন প্লে কোণঠাসা হয়ে গেল, রাষ্ট্র হলো চার্চের দাপট-মুক্ত। ক্রমশঃ স্যেকুলোর জায়গা নিল পূত পবিত্রতার এবং জনপূজ্য না বলে ব'লা যায় জন-শ্রদ্ধেয় হয়ে পড়ল। সামাজিক ক্রমবিকাশের এই ধারা প্রায় শাশ্বত। কিন্তু অতীত মুছে যায় না, ছদ্মবেশে উদিত হয়। পুরানের যুগ বিগত। কিন্তু সাহিত্যে কাব্যে শিল্পকলায় তার উপস্থিতি অবিসংবাদিত। নিষ্ঠাবান সজ্জনের উপমায় যুধিষ্ঠির হাজির হন। বিষ্ণু দে কুরুক্ষেত্র-উত্তর যদুবংশের পটে ভারতীয় অবক্ষয়ের ছবি আঁকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লোকান্তরিত কবি কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সৈনিককে মৈনাক হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। অতীত সমাজ আর থাকে না। তার পটস্মৃতি কিন্তু অনির্বাণ। ঐতিহ্যের এমন সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য। কারণ "কোথা যাব?" এই প্রশ্নের সঙ্গে আর এক জিজ্ঞাসা স্বতঃই জড়িত থাকে, "কোথা থেকে এলাম?"

সমাজের খর্পর রঙ্গমঞ্চ এড়াতে অক্ষম। পেছনে যদি সামাজিক স্যাংশান না থাকে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। রঙ্গমঞ্চ নিজেই কৃত্রিম। সেখানে যারা হাসে, কাঁদে, কথা বলে, তারা কেউ বাস্তব চরিত্র নয়। তারা অন্য ভূমিকার বাহন মাত্র। মঞ্চের সম্রাট পরদিন বাজার-সরকার। মঞ্চে স্বৈরিণী, ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ গৃহিণী বা কুমারী। সেখানে মৃত্যু মৃত্যু নয়। অভিনয় শেষে যে যার মেকআপ তুলে কিছু পূর্বে মৃত বা জখম অভিনেতা অভিনেত্রী ও অন্যান্যরা বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে যায়। সবই যুক্তিবিরোধী, ইররাশনাল ব্যাপার। তবু যুক্তিবাদী দর্শক সেখানে ছুটে যায়। তারও এই সব কৃত্রিমতার পেছনে অজানিত-জানিত সমর্থন আছে। সামাজিক মানব গোষ্ঠীর ব্যষ্টি বা ইউনিট হিসেবে ইররাশনালিটির পক্ষে তার স্যাংশান অগ্রিম প্রদত্ত। বিদেশী এক মনীষী লিখেছেন যে, থিয়েটার দর্শকেরাই অতীত কালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিম জনগোষ্ঠী।

চত্বরে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান এবং ঐন্দ্রজালিক গুহার মুখে এক পাথরের বেদীর উপর আসীন। ফারাক স্পষ্ট। যেন এ যুগের অডিটোরিয়াম এবং রঙ্গমঞ্চ। সামাজিক সমর্থন না থাকলে ঐন্দ্রজালিকের কাণ্ড কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। আলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস তাই এক প্রধান শর্ত। গ্রামাঞ্চলে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পূর্বে ব্যাধি নিরাময় উপলক্ষে 'ভূত নামানো হ'ত। তার প্রক্রিয়া উপাচারের জঙ্গলে প্রবেশে এখানে নিস্প্রয়োজন। এখন আর সেসব দেখা যায় না। হয়ত কোথাও কোথাও থাকতে পারে। অবিশ্যি ধাতু পরিবর্তনের দ্বারা সোনা তৈরি-সক্ষম সাধুদের প্রতারণার কাহিনী এখনও সংবাদপত্রে কালেভদ্রে প্রকাশিত হয়। এখানে মোদ্দা কথা, অলৌকিকতায় বিশ্বাস। সামাজিক সমর্থন ছাড়া বুজরুকি দেখানোর সুযোগ থাকে না। অনেক সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব টিকে থাকে বিশ্বাসের মূল শিথিল হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তার মধ্যে অতীতের স্পিরিট বা মর্মতেজ অনুপস্থিত। বর্তমান যুগে পূজা উৎসবে তাই ক্রিয়াচার অপেক্ষা সমাজিক দিক প্রধান হয়ে ওঠে। সামাজিক সমর্থন নির্মূল হয়ে গেলে পূজা উৎসবও যাদুঘর বা গবেষকের বিষয়ে পরিণত হবে। প্রাচীন গ্রীসে রোমে পূজা পৌত্তলিকতা ছিল। আজ আর নেই। মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশে সমাজ-বিপ্লবের ভেতর দিয়ে এমন পরিবর্তন ঘটেছে। নানাকারণে বিশ্বাসের মূল ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বণ প্রবাদ, এখন বাৎকা বাৎ। ভেতর ফাঁকা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজারী ব্রাহ্মণ হরিহর-কে কাল পূর্বেই হরণ করে নিয়েছিল। অতঃপর অস্তিত্ব-সংগ্রামের তাড়নায় কাশীধামে উপনীত অপু এবং সর্বজয়ার সম্মুখে হরি (ঈশ্বর) তার প্রাণ চিরতরে হরণ করল। দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনার জের মাত্র। যজমানের পশার ধীরে ধীরে এযুগে অন্তর্হিত।

মঞ্চের মিথ্যার পেছনে সামাজিক অনুমোদন স্বভাবতই থাকে। তাই আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শক সেখানে জড়া হয়ে পকেটের আসক্তি ত্যাগ সহ। এক দিকে যা সে দিয়ে দিয়েছে তা-ই যেন সে আবার ফেরৎ পাওয়ার প্রত্যাশী। প্রাচীন ঐন্দ্রজালিকের প্রস্তরবেদীরই আদল বর্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চ। অডিটোরিয়াম আর এক এলাকা। ফারাক স্পষ্ট। এই ঐন্দ্রজালিক মণ্ডলে বসে দর্শক জীবনের দৃশ্য অবলোকন করে। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় অনুকরণ কোন ব্যক্তির অনুকরণ নয়। মঞ্চে অনুকৃত হয় জীবন এবং অ্যাক্‌শান। অ্যাক্‌শান অর্থ অস্তিত্বের নানা টানাপোড়েন-জাত বুননি। কিন্তু সেখানে কেউ বাস্তব জীবন-যাপনকারী নয়। পেশাদার অভিনেতারও অন্য ভূমিকা আছে নাগরিক হিসেবে। সে জনক, ভ্রাতা, স্বামী, রাজনৈতিক পার্টির সদস্য। এমনতর নানাতর তার দায়িত্ব এবং সেখানে সে অভিনয় করে না আদৌ। বড় জোর, গুণ্ডামি করতে পারে। অথচ মঞ্চে তার দায়িত্ব সীমিত, সীমাবদ্ধ। নাট্যকার পরিচালক কর্তৃক পূর্বেই নির্দেশিত। মঞ্চ-মরীচিকার মধ্যে দর্শক আবার নতুন করে সংশ্লিষ্ট ওতপ্রোতভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-ও জীবনের কোন এক খণ্ডের দর্শক। তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা উদ্দীপিত হয় এই আসরে। সে কিন্তু স্থানু। একক চেয়ারে আসীন। স্বভাবতই টেন্‌শান সৃষ্টি হয়। এই মানসিক পর্যায় তাকে বিভিন্ন দৃশ্যের ভেতর দিয়ে চালনা করে। সে যেন স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বিছানায় শায়িত। নির্জ্ঞান (অবচেতন) মনের জানালগুলো তখন খোলা। নির্জ্ঞান নিজে অনড় অথচ দৃশ্য সচল সেখানে কিছুই অবাস্তব মনে হয় না। তাই স্বপ্নে যেমন সে কাঁদে, হাসে কি নানা ধরনের সুখ বা দুঃখ ভোগ করে মঞ্চে তেমই মরীচিকার উৎস। দর্শকের যৌথ গোষ্ঠিমানস পূর্বেই এমন মিথ্যের স্যাংশান-দাতা। এবার একান্ত ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সে যেন আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি এবং নিজের মনের কষ্টিপাথরে যাচায়ে সে ব্যক্তিমানব হয়ে ওঠে।

সমাজের ফাংশন অনেক বেশী জটিল। শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি অবিশ্যি অপরিহার্য। এক কাতারে না আনতে পারলে প্যারেড হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুতি শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে আসে। সামাজিক দলবদ্ধ জীবনে ফ্রি-ফর অল বা স্বেচ্ছাচারিতার জায়গা নেই। সমাজে থাকতে গেলে তাই প্রত্যেককেই ব্যক্তিসত্তার অংশ বিশেষ বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু বিসর্জন দিতে দিতে যদি সব চলে যায়, তখন সে মানুষ নয়, দলাপাকানো পিণ্ড অথবা পুতুল, যার অদৃষ্ট অদৃশ্য অন্য কারো হাতের সুতোর উপর নির্ভরশীল। এমন ক্রীড়নকেরা সমাজ-প্রগতির আদৌ সহায়ক নয়, বরং নানা অনর্থের খোঁট। তাই সমাজের দায়িত্ব থাকে যেন ব্যক্তির সত্তা পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে যায়। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নানা স্বার্থের টাকু ঘোরে। বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাত সেখানে অনিবার্য এবং মাৎস্য ন্যায় অতীব প্রকট। ব্যক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব আদর্শে থাকে, বাস্তবে গায়েব। সুস্থ সামাজিক জীবন-রচনায় তাই শূন্যে সূক্ষ্ম তারের উপর হাঁটার মত কঠিন খেলা প্রধান শর্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিমানুষকে সামাজিক মানুষ-রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব অপরিহার্য, তেমনই তা-কে ব্যক্তিমানুষ রূপে নির্মাণের দায়িত্বও ততোধিক। একক তারের উপর দ্বৈততার এই খেলায় সমাজ পুরোপুরি সফল হয় না। সামাজিক সংহতি রক্ষায় ব্যক্তিত্ব থেঁতলে যায়। আবার ব্যক্তিত্ব বাঁচাতে গেলে সংহতি মারা যায়। বিপদ দুই দিক থেকে। মেলানোর দায়িত্ব খুব সহজে নয়। সুষ্ঠু বাঁচার তাগিদেই সমাজে আর্ট, শিল্পের আবির্ভাব।

পূর্ণতার এষণা শিল্পই প্রদানে সক্ষম। পরিবেশ-জাত ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা সেখানে সঞ্চালক শক্তি বা মোটিভেটিং ফোর্স। মানুষের কল্পনা-শক্তির উৎসও এখানে নিহিত। চেনা-জানা প্রত্যয় কিংবা সামগ্রী থেকে নতুন কিছু নির্মাণ ক্ষমতার অপর নাম কল্পনা। ইতিহাসের জটিল-কুটিল সড়ক ধরে কল্পনা-জগতেরও নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর ব্যাপী। তাই আধুনিক কালের শিল্পের কারিগরদের পরিবেশ এবং শিল্পের ঐতিহ্য-দুয়ের উপরই নির্ভর করতে হয়। এই পথেই অভাবনীয় কিছু হাজির হয়। সাম্প্রতিক উদাহরণ : বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবহে পেন্টিং, সঙ্গীত, কাব্য, নৃত্য, উপন্যাস, ওই পৃথিবীর নবতম আর্ট-ফর্মের ছায়ার নিচে যৌথ নট-বিহারী।

মঞ্চে আধুনিক কালে সময়ের গণ্ডি অল্প। তারই মধ্যে থিয়েটার দর্শকের নব জন্মলাভ ঘটে। মঞ্চের কাণ্ডকলাপের পেছনে তার পূর্বতন স্যাংশান যৌথজীবনের শরীক হিসেবে। কিন্তু তার তৎকালীন ভূমিকা ব্যক্ত মানবের। মঞ্চমায়ার ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মুখোমুখি হয় সে পুনর্বার। ছিন্ন শিকলের হারানো আংটা আবার সে ফিরে পায়। সমাজের যৌথ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে না পেলে, ব্যক্তির পক্ষে শুধু একাকীত্ব তার বিকাশের অন্তরায়। শিল্পের সেতু তাকে এই গড়খাই পরীক্ষা পার করে দেয়। নতুন সামঞ্জস্য-সাধনের সুযোগ পায় দর্শক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে। অ্যারিস্টটল যাকে ক্যাথারসিস বা বিশুদ্ধ চিত্তমোক্ষণ বলেছিলেন, তার বহু ভাষ্যের সঙ্গে ঐ কথাও যোগ করা যেতে পারে। শিল্পের বিকাশে যৌথ গোষ্ঠী-উৎসবই ছিল প্রধান উৎস। আবেষ্টনীর চাপে নৃত্য সংগীত, কাব্য অভিনয় আদি আজ স্বতন্ত্র নামের দাবিদার। আদিম যুগে তারা ছিল একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। কালে কালে প্রত্যেক ডালের ঝুরি-উদ্‌গত স্বতন্ত্র বৃক্ষের উৎপত্তি। মূল লক্ষ্যে আজও সব শিল্প এক। সড়ক কেবল আলাদা হয়ে গেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই শিল্পমায়ার হাতছানি মানুষকে যৌথ-জীবনের আসরে টেনে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া সমাজ-জীবনে সংহতি এবং ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের এক বিরাট হাতিয়ার। পূর্বে উল্লেখিত, সামঞ্জস্য সাধনের জন্যে সমাজের দাপট থাকে। কিন্তু তার কার্যকারিতা সব সময় সুফলপ্রদ নয়। সংহতির দিকে ঝোঁক পড়লে ব্যক্তিসত্তা চিড় খায়। ব্যক্তিসত্তার প্রশ্রয় দিলে সংহতি বিনষ্ট হয়। অথচ সমাজ-কল্যাণ ও প্রগতির উদ্দেশ্যে ভারসাম্য অপরিহার্য। এমন দায়িত্বের কার্যকর দোসর শিল্প। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাটক, মঞ্চ ইত্যাদির অপরিহার্যতা সর্বের আধুনিক জীবনে যার চত্বরে বর্তমান অস্তিত্বের জটিলতা আদিম কাল অপেক্ষা ঢের বেশি গ্রন্থিল এবং আবর্ত স্পন্দিত। সমাজের চাপ আসে বাইরে থেকে। ভেতরের চাপের উপাচার সমাজ সাজিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার জন্যে ব্যক্তিসত্তার প্রশ্ন থেকেই যায়।

বিস্ময়কর এই ধাঁধা। সমাজ পুরোপুরি সক্ষম নয় অথচ একই ক্ষেত্রে শিল্প পারঙ্গম। হ্যাঁ, ঘটনা প্রায় তা-ই। আর তাই সংবাদপত্রের প্রকাশিত জলজ্যান্ত অতি-বাস্তব হত্যা, খুন, মৃত্যুতাণ্ডব নানাবিধ লোমহর্ষক ঘটনা সকালে চায়ের সঙ্গে বেশ মেজাজী আরামে গলাধঃকরণ অব্যাহত থাকে। অথচ সবুজ ধোঁয়া-নিকাশের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তৈরী শরৎচন্দ্রের গাঁজার দু'চিলিম-জাত হতাশ প্রেমিক দেবদাসের জন্যে বহু তরুণ চোখের জলে বালিশ ভেজায়। পার্বতী, চন্দ্রাবতী, চুনী লালেরা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। এরা নিছক কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু পরিণাম ভিন্নতর। সংবাদপত্রের বাস্তব কোন কালে সেখানে পৌঁছুতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টার মশাই ঃ সু কু চ

বহুকাল পূর্বে মাস্টার মশাই আমাকে একটা বই উপহার দিয়েছিলেন। দাতার নাম আদ্যক্ষরে স্বাক্ষরিত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে : সু কু চ। বাঙলায় যার নিগলিত অর্থ–ভাল এবং মন্দও।

আত্মপরিহাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আত্ম-সচেতনতার ফলশ্রুতি আত্মপরিহাস। এমন চৈতন্যের অধিকারিগণ আপন ব্রত-মাহাত্ম্য-সম্পর্কে নিঃসংশয়, নির্দ্বিধা। ইতিহাসের স্পন্দন-অস্থির হাত তাদের মনিবন্ধেই রাখী বেঁধে দিয়ে যায়।

কৈশোরে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন এবং পরবর্তী দশকে বিস্তার-বিহ্বল জাতীয়তাবাদের আগমনী স্বর্গীয় মাস্টার মশাই আপন ধমনীতে অনুভব করেছিলেন বৈকি। তাই তাঁর নিকট মাতৃভাষা আর স্রেফ মাতৃভাষা হয়ে থাকেনি, বরং জীবনকে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার বাহনরূপে দাঁড়ায়। অগ্নিগিরি বিদারণ-প্রার্থী।

আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্টতম হাতিয়ার ভাষার প্রয়োজন তখন সর্বাধিক। কারণ সংহতির আসল সড়ক-নির্মাণ হয় আবেগের সমীকরণ মারফৎ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ফারাক ঘুচানোর কাজে প্রতীক এবং ভাষা অপরিহার্য। সংঘের শরণ এবং ভাষার শরণ একই মন্ত্রে ভিন্ন উচ্চারণ মাত্র।

তেমনই পথবাহী লোকান্তরিত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সাদর সম্ভাষণে হামেহাল মাস্টার-মশাই-বৈদেগ্ধ্যের তীর্থে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইতিহাস-বোধ তার নিকট সহযোগীরূপে এসেছিল কালের আবেষ্টনী মারফৎ। হয়ত সব সময় বৈজ্ঞানিক ধারায় নয়, বরং আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়। ভাষার প্রতি প্রেম দেশপ্রেমেরই দীপ্তচ্ছটা।

রবীন্দ্রনাথ মাস্টার মশাইকে ভাষাচার্য উপাধি দিয়েদিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উম্মাদনার সুদীর্ঘ কালব্যাপী ধারক এবং বাহক।

এমন ব্যক্তির সংলাপ-লীলা দর্শনের সুযোগ বর্তমান স্মৃতিধরের বহুবার ঘটেছিল।

অতীতের অন্ধকার থেকে দু' একটি মাত্র বর্তমান উদাহরণ।

জন-মুনিশ অতি পরিচিত শব্দ। জন মানেও মুনিশ। অর্থাৎ মজুর। তবে কী মুর্নিশ শব্দ জোর দেওয়ার জন্যে লেজুড়? একদিন মাস্টার মশাইকে বললুম, মুনিশ আরবি শব্দ। তার অর্থ : আরাম-দাতা।

তখন স্বর্গীয় ভাষাতত্ত্ববিদের চোখের ঝিলিক দর্শনীয় একটি কিছু। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্লাসে উচ্চারণ করলেন, কী মজার ব্যাপার দ্যাখো সমাজের চেহারাও খুলে

গেল। দাসেরা আরাম-দাতা বৈকি। অর্থাৎ শব্দটা দাস সমাজ-উদ্ভূত।

নিরীক্ষা নির্ভুল। আদর্শ কেতাবেই লিপিবদ্ধ থাকে। আরবি ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশে মাত্র পনর বছর পূর্বে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ওয়াজ-নসিহতে কুলোয়নি। হঠাৎ তেলের আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ওই বর্বর প্রথা উচ্ছেদে ঢের বেশী সহায়ক হয়েছে। ঈষাৎ অপ্রাসঙ্গিক, তবু বলা যায়, জড়ভিত্তি বাদ দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। অন্যথায় আদর্শ স্রেফ বুলি মাত্র এবং কেবল কেতাবেই শোভা পায়, বাস্তবে নয়।

স্মৃতিপট থেকে আরো একটি উদাহরণ সহসা উদ্ধার।

ঢাকা শহরের প্রসিদ্ধ অন্যতম এলাকা উয়ারী। সংস্কৃত উপকারিকা শব্দের অর্থ: তাঁবু। প্রাকৃতে হয়ত ছিল উআরিয়া। পরবর্তীকালে কথ্য ভাষার চালে রূপান্তর : উয়ারী। ইতিহাসেও সমর্থন পাওয়া যায়। বাদশাহী আমলে এখানে সেনানী শিবির ছিল। ঢাকায় আজও আছে পীলখানা এলাকা। ফরসী “ফিল” অর্থাৎ হাতী হয়েছে উপভাষায় “পিল”। বুঝা যায়, এখানে হাতীশালা ছিল। আধুনিক-কালে ইংরেজ-প্রদত্ত নাম এলিফ্যান্ট রোড। বাংলাদেশের প্রাচীন বহু ছবি এইভাবে উদ্ধার করা যায়।

ছাত্রদের এমন ছোটখাট আবিষ্কারে মাস্টার মশায়ের উত্তেজনা ছিল দেখার মত। স্মিত হাসির বিচ্ছুরণ সারা মুখে এবং অঙ্গ দোহার। কবিগুরুর “ভাষাচার্য” অপেক্ষা “ভাষোন্মাদ” উপাধি মাস্টার মশায়ের জন্যে ঢের সংগতিপূর্ণ।

মাতৃভাষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গুণান্বিত কান্তলৌহ বা বিশিষ্ট চুম্বক।

প্রায় বিয়াল্লিশ বছর পূর্বেই তাঁরই আকর্ষণে বর্তমান স্মৃতিচারক ভাষার এমন সব তামাসায় কম আসক্ত ছিল না। তখন সেমান্টিষ্ট বা শব্দার্থ বিজ্ঞানীদের বাজার এদেশে ছিল অতি মন্দা। কার্নাপ, আইয়ার প্রমুখ লজিক্যাল পজিটিভিস্টগণ বহু দূরে। ভাষাপ্রসূত ফল অপেক্ষা ফল তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখন উৎসাহীজনের সংখ্যা বেশী। লিংগুইস্ট ফিলজফীর প্রতি মাস্টার মশায়ের আগ্রহ অনাগ্রহ দেখার সুযোগ আমার হয়নি। হেতু, দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশ। শিক্ষক-ছাত্রে সম্পর্ক ঝাপ্‌সা আবহে পরিণত।

কালের ব্যবধান বিস্তর। তবু অতীত ক্যানভাসের উজ্জ্বলতা সময় সাঁতরেই জানান দিয়ে যায়।

মাস্টার মশাই ছিলেন বঙ্গদেশের প্রান্তরের মত উদার। ছিয়াশি বছর বয়সে মৃত্যুর এক বছর পূর্বে এই উপমহাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় সমন্বয়ের উদ্‌গাতা শাহজাদা মোগল রাজকুমার দারা শিকোর চতুর্থ শতবার্ষিকীতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই আয়োজনের উদ্যোগী ছিলেন একান্ন বছর বয়সের সমাজকর্মী রবি উদ্দীন আহমদ। সভাপতি ও উদ্যোক্তার বয়সের ব্যবধান পঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু উৎসাহ, একাত্মতা সমান। যারা কালের প্রবাহ প্রত্যয় হয়ে যান, তাদের নিকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালের কোন তোয়াক্কা থাকে না।

একবার মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্যে মাস্টার মশাইকে যোগাসন-চ্যুত দেখেছিলাম। তা নেহাত চিন্তানায়কের প্রতিক্রিয়া।

১৯৩৮-৪০ খ্রীস্ট্রীয় সন। ভারতীয়-মুসলিম লীগ তখন আর ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠাকালীন হর্স রেসিং ক্লাবের (ঘোড়দৌড়) মত মুসলিন শরীফ অভিজাতদের জমায়েত হওয়ার আড়ত নয়, বরং জনগণের মধ্যে অণু প্রবিষ্ট। সাম্প্রদায়িকতার নিগেটিভ বা নেতিমূলক আদর্শসম্বল মুসলিম লীগের নুলো সমাজের চতুর্দিকে—এমন কী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যালনেলে গতর নিয়ে নড়ে উঠছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম "শ্রী" এবং "পদ্মফুল" অঙ্কিত। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মতলব-হাসিল কৌশল অনুযায়ী তা হঠাৎ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার কাঁটা হয়ে উঠল। জনসমর্থন পুষ্ট মুসলিম লীগ অনুসারী ছাত্রদের তরফ থেকে উঠল সোচ্চার দাবি : প্রতীক শ্রী-পদ্ম হটাও। এই জিগিরের জয়ঢাক ছিল তখন 'মাসিক মোহাম্মদী" ও মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক ভর্তুকি-দত্ত তিরিশ হাজার টাকায় প্রতিষ্ঠিত আজাদ-পত্রিকা।

এই আবহাওয়ায় মাস্টার মশায়ের রুষ্ট স্বর শোনা গেল, "এসব হচ্ছে কী? প্রতীক ছাড়া কোন ধর্ম বা রাষ্ট্র চলে? নিশান, চাঁদতারা ওগুলো কী? রাজনীতির নামে যতো সব বেলেল্লাপনা– ।" কয়েক দিন মাস্টার মশাইকে তিরিক্ষি মেজাজ দেখেছিলাম।

ইতিহাস রায় দিয়ে গেল আরো বত্রিশ বছর পরে। ১৯৭২ খ্রীস্টান সনে। মাস্টার মশাই সেই রায়ের যুগপৎ দর্শক এবং শ্রোতা। তিনি দেখে গেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারি মনোগ্রাম : শাপলা ফুল। অবিশ্যি তা পদ্ম-বংশীয়।

মূর্খ মূঢ়জন যারা ইতিহাস-কে আশু স্বার্থোদ্ধারের গোলাম ঠাউরায়—তাদের জন্যে এই ট্র্যাজিক নির্দয় ব্যঙ্গ শ্লেষ-মিশ্রিত সবক প্রয়োজন ছিল। তবু কালের পর্দায় আবার মূঢ়জনের অভ্যুদয় এবং মূর্খতার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

গুরু হিসেবে মাস্টার মশাই ছিলেন শুধু অন্তরঙ্গ নন অন্তরঙ্গ। ক্লাসে ভাষাতত্ত্বের অভ্যন্তরে রাশিরাশি নুড়ির ভেতর তিনি সুড়সুড়ির জায়গা করে দিতেন অতি সহজে। স্বরাঘাত বা এ্যাক্সেন্ট ভাষার আদল কী রকম পালট করে ছাড়ে, তার জ্যান্ত উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে আমন্ত্রিত। স্থানীয় এক মনীষী ইংরেজী ভাষায় লেখা অভ্যর্থনা-নামা পড়লেন প্রধান অতিথির সম্মাননায়। ভদ্রলোকের উচ্চারণের ঢং বিলকুল জাপানী ভাষার। অভিনন্দনের জবাব দিতে দাঁড়িয়ে কবিগুরু আরম্ভে বললেন যে ওই মহান দেশের ভাষা তিনি বোঝেন না। পেছনে উপবিষ্ট সহযাত্রী মাস্টার মথাই রবীন্দ্রনাথের জোব্বার খোঁট টেনে চাপা গলায় কঁকিয়ে উঠলেন, "গুরুদেব, অভিনন্দন ইংরেজী ভাষায়... ইংরেজী।"

প্রত্যুৎপন্নমতি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদলে দিলেন। ঘটনা সামান্য। কিন্তু মাস্টার মশায়ের বর্ণনা ভঙ্গীর চোটে ক্লাস-কক্ষ হাস্যরোলে ফেটে পড়ত।

উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার দাপট সম্পর্কে তাঁর এক কাহিনী বয়ান এখনও স্মৃতিপটে সজীব। লন্ডনের কোন বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ, নিজেও স্থানীয় অধিবাসী, কিছু পাড়া-পড়শীদের সঠিক উচ্চারণ শিখাচ্ছিলেন। সেদিন তিনি জল বা ওয়াটার শব্দ নিয়ে ব্যস্ত। ককনী-বুলিতে ওয়াটার শব্দ উচ্চারিত হয় 'ও-আ-আ-র' জাতীয়ভাবে। শব্দের বহু অংশ ঠোঁটে ও কণ্ঠে থেকে যায়। শিক্ষক সকলকে 'ওয়াটার...ওয়াটার' রবে সঠিক উচ্চারণে রপ্ত করতে আদেশ দিলেন। ঝাড়া দশ মিনিট কসরৎ চলল। তখন শিক্ষার্থীদের সঠিক উচ্চারণ শুনে ভাষাতত্ত্ববিদ নিজে সাফল্যের আনন্দে চীৎকার দিয়ে উঠলেন, "দ্যাটস... বে-আ-র" ককনী-বুলিতে বেটার" (ভালো শব্দ উচ্চারিত হয়" বে-আ-র" জাতীয় রূপে। অজানিতে শিক্ষক নিজে "স্থানীয়" ব'নে গেছেন।

পরিহাসপ্রিয়তা ছিল মাস্টার মশায়ের নিকট সহজাত ব্যাপার। তেমনই অদ্বিতীয় তিনি মেহনতের ময়দানে। গোগ্রাসী পাঠক হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। পরিশ্রম-সহিষ্ণু হওয়ার জন্যে তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের এক উপদেশ-উদ্ধৃতি আমাদের শোনাতেন, "দাঁড়াতে পারলে বসবে না। বসতে পেলে শোবে না।" যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদ এবং গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহক মৃত উইন্‌স্টন চাচিলের সূত্র ঠিক বিপরীত। তার উপদেশ ছিল সুযোগ পেলে উদ্যম বা এনার্জি-সঞ্চয়। মাস্টার মশাই সাতাশি বছর বয়স পর্যন্ত মেহনতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন। বার্ধক-জাত শ্লথতা".. কি মনে বা দেহে কখনও তাঁর মধ্যে দেখেনি। কাজের জোয়াল কাঁধে নিতে আদো পশ্চাৎপদ নন। রামায়ণ নিয়ে তর্কে তিনি কোমর বেঁধেছিলেন জীবনের শেষ কয়েক মাস।

নানা ধরন, কতো বিষয়ের উপর না মাস্টার মশাই লিখেছেন। ভ্রমণ কাহিনী, কলকাতার হিন্দুস্তানী, আলবেরুণী ও ভারত সংস্কৃতি, সিন্ধু প্রদেশে প্রথম আরবী ভাষার মহাভারত, উর্দু অভিধানের দীর্ঘ ভূমিকা.... এমন তরবেতর ঝলক। ছত্রিশ বছর বয়সে লেখা 'অরিজিন এ্যান্ড ডিভলেপ্‌মেন্ট অব বেংগলি ল্যাংগুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার' মাস্টার মশায়ের মহৎ কীর্তি। অন্যান্য অবদানও প্রচুর। সেগুলোর উৎকর্ষ বা অপকর্মের প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর জ্ঞান-পরিব্রজনার ভূগোল দেখে অবাক হতে হয়। তেইশটি ভাষায় তিনি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ, কুশলাদি জ্ঞাপন করতে পারতেন। এখানে তিনি ক'টা ভাষা জানতেন—প্রশ্ন নয়। তাঁর জ্ঞানানুরোগের দিগন্ত কত দূর দূর প্রসারিত—সেই প্রশ্নই বার বার আলোড়ন তোলে। জীবনের চতুর্দিকে ছিল মাস্টার মশায়ের আকর্ষণ। তাঁর বন্ধু নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর মঞ্চসজ্জা কিম্বা শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনে চারুশিল্পের কোন আলোচনা-সব জায়গায় সমঝদার-রূপে তাঁর হাজিরা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। মানবিক কোন কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়, বরং চুম্বক বিশেষ। উপনিষদের ঐতিহ্য-ধারার তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁকে-হেঁকে ডাক দিয়ে যেতে পারতেন, 'আগতু-আগতু মধুরং মধুরং পার্থিব রজঃ.... এসো... এসো... মধুময়, মধুময় এ পৃথি-বীর ধূলি....। রবীন্দ্রনাথ খামখা জাভা, সুমাত্রা, বালী, শ্যামদেশ সফর-কালে তাঁকে নিজের যাত্রাসঙ্গী করেননি।

খ্যাতিমান ভাষাতত্ত্ববিদ, মাস্টার মশাই শীর্ষ ভারত-তাত্ত্বিকদেরও অন্যতম। চির-সহচর সুঠাম-স্বাস্থ্য, পঞ্চাশের কাছাকাছি তাঁর কপালের নিকটবর্তী দুপাশে কেশ-খসা শিরের আদলটি একদা-মানচিত্রে দাক্ষিণাত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। ভারত-তাত্ত্বিক দেশের অবয়বও যেন অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আবার ভৌগোলিক পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী চিন্তার জমিনে তিনি বিশ্ব-বাসিন্দা। নির্ভাঁজ আড্ডা-প্রেমিক, নিবিড় বাঙালী কোন রকমের প্রাদেশিকতা বা চণ্ড দেশপ্রেম তাঁকে কোনদিন পাছ্‌ড়ে ফেলতে পারেনি। রোমান বর্ণলিপি প্রবর্তনের ব্যাপারে তাঁর সায় মাস্টার মশায়ের বিশ্বগ্রাসী স্বরূপের প্রকৃষ্ট পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিশ্বকোষ প্রণেতাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর সদা-জাগর, বিদ্যোৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু, মানস-বিহার। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এদেশে সকল জ্ঞান-পিয়াসীর চিরকালীন সমসাময়িক বা 'পারপেচুয়্যাল কন্টেম্পোরারি' হয়ে থাকবেন।

১৯৩৯-৪০ সন-বিধিবদ্ধভাবে এই দু'বছর এবং অতঃপর দেশ বিভাগের প্রাক্কাল পর্যন্ত এই বনস্পতির ছায়ায় বর্তমান লেখকের বিদ্যাভাসের সুযোগ ঘটেছিল।

সৌভাগ্যসূত্রে লব্ধ, বিরল এমন চিন্তাকাশগামী নিখাদ সুবর্ণ সোপান—কোন্ মূর্খতায় স্মৃতিচ্যুত হ'তে দেব?

স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায়

ধনীদের খেয়ালবশতঃ বানরের গলায় মুক্তার মালা মাঝে মাঝে শোভা পায়।

এই অভাজনকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে কর্তৃপক্ষ কী করেছেন, সে-বিচারের ভার তাঁদের উপর। অশেষ ধন্যবাদ, সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের অনুরাগের জন্যে। জীবনের এই শাখার কোন উপযোগিতা আছে কিনা তা অনেকের বোধগম্য নয়। সেদিক থেকে ট্রাস্টের উদ্যোক্তারা ব্যতিক্রম। তাঁদের পূর্বাপর আন্তরিকতাময় পদক্ষেপের সাক্ষী বর্তমান আয়োজন।

এইখানে একটা কথা তবু বলতে হয়। সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং সংস্কৃতিসেবীর স্বীকৃতি এক জিনিস নয়। কিন্তু কোন সংস্কৃতিসেবী মারফতই স্বীকৃতি জানাতে হয়। সমস্যা সহজ নয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বহু সংস্কৃতসেবী কবি-শিল্পী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিক স্বৈরাচারী, গণহত্যাকারী এহিয়া খানের সমর্থক ছিল। তাদের কী আপনারা স্বীকৃতি দেবেন?

সমাজ এবং সৌন্দর্যের দুই খোঁট মেলানো অনেক সময় কঠিন।

সমাজে ব্যক্তিগত স্বীকৃতি না পেলে জীবন অর্থহীন, অসার্থক। এই ধারণা বা ব্যাধি বর্তমান গ্রীবাচ্ছেদী প্রতিযোগিতা-লাঞ্ছিত সমাজ-উদ্ভূত। লেখকরা অবিশ্যি অসহায় জীব। তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল অপরের মতামতের উপর। ইউরোপ বা এদেশে প্রাক-যন্ত্রশিল্প যুগে ব্যক্তিগত স্বীকৃতির জন্যে কোন কোন সংস্কৃতি-সেবী হন্যে ছিল না। বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা বহু আশীর্বাদের সঙ্গে নানা যন্ত্রণাদায়ক অভিশাপেরও জন্মদাতা। ব্যক্তিগত স্বীকৃতির জন্যে উন্মাদনা তার অন্যতম। পূর্বে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতামূলক মানস-আবহাওয়া ছিল, তা ধ্বংস হয়ে গেছে যন্ত্র-সভ্যতার প্রসার এবং উন্নতির ভাঁজে ভাঁজে। মধ্যযুগে মানুষ তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বা অন্তরিত (আইসোলেটেড) ছিল না। নিজের অবস্থান সম্পর্কে তারা নিশ্চিত থাকত। যে যেখানে জন্মগ্রহণ করত, সেই সমাজের অঙ্গীভূত সে। নানা বাধা, গণ্ডী তখন ছিল, কিন্তু মানুষ মনে করতে পারত না সে বিচ্ছিন্ন বা অন্তরিত জীব। নিজের পেশায়–যথা কামার, কুমোর, ধোপা, কাজী, আলেম, পণ্ডিত-হাকিম, কবিরাজ প্রভৃতি সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা-বোধ ছিল না। তাদের পল্লীর নামও থাকত : কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, ধোপাপাড়া ইত্যাদি। মুসলমান পাড়া, হিন্দু পাড়া, খ্রীস্টান-পল্লী অগয়রহ আধুনিক কালের সমাজ-শক্তি বা সোস্যাল ফোর্সের অবদান। যন্ত্রশিল্পের যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি বর্তমান অবস্থা।

বাংলা প্রবাদ-বাক্য, প্রবচন ইত্যাদির রচয়িতার নাম কী আপনারা জানেন? আমাদের পূর্বসূরী সেই সব অন্যান্য রচয়িতাদের নিজের নাম টিকিয়ে রাখার জন্যে কোন মাথা ব্যথাও ছিল না। কারণ, তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীব ছিলেন না।

আধুনিক মানুষ পূর্বের চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে ঢের স্বাধীন। কিন্তু মূল্য দিতে হয় ভয়ানক চড়া। আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন, প্রচণ্ড নির্জনতার শিকার। পূর্বেকার গ্রাম-জীবনে তা সম্ভব ছিল না। ইচ্ছে করলেই "এ্যানোনিমাস"–অচেনা, নামহীন হওয়া যেত না, বর্তমানে শহরে যা ঢের বেশী সোজা। ঢাকা নগরীর এক এলাকার পরহেজগার সৎ নাগরিক অন্য এলাকায় বেলেল্লাপনা করে এলে কেউ তার খোঁজ রাখবে না। ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রচুর, কিন্তু সে নিঃসঙ্গ নাগরিক। এই নিঃসঙ্গতা, জল্লাদের কোপ থেকে রেহাই পেতে নানা পন্থার আয়োজন ঘটেছে। অবসর বিনোদনের বহু ঢং সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত-স্বীকৃতি তার অন্যতম। এই মানসিকতা প্রবল উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছে বর্তমান যন্ত্রজাত পারিপার্শ্বিকতার জন্য। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ সম্পদ-অর্জন এবং শোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পদ-সম্পত্তিহীন মানুষ সমাজে হেয়, অবজ্ঞেয়। প্রাক-ইন্ডাস্ট্রিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগে সম্পত্তি-সম্পদের বিষ নুলো সমাজ-জীবনের সব অলিগলি স্পর্শ করতে পারত না। সম্পদের দাপট ছিল না এমন ব্যাপক, জগদ্দল-ভার। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ বর্তমানে টের পাচ্ছে মর্মে মর্ম, মজ্জার ভিতর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের টেকনলজি প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সম্পদের দম্ভের বলে কী নৈতিকতা-বর্জিত নিষ্ঠুর খেলায় না দরিদ্র দেশে অর্থনীতি ও জনসাধারণের জীবন নিয়ে খেলতে মত্ত। একটি দেশের মানুষ বলতে পারে, তাদের মঙ্গলামঙ্গল কিসে এবং কোথায় নিহিত। কিন্তু এই অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের মানুষের হিতাহিতজ্ঞান পর্যন্ত উন্নত সভ্যতার মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদীরা বেমালুম লোপাট করে দেয় নানা ছলনায়, কপট মিত্রতায়। দেখা যায়, বহু উন্নয়নশীল দেশ শেষে নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন না তুলেই পশ্চিমের জীবন-যাত্রার মান এবং পণ্যভোগী (কনজুইমার্স) সমাজের মডেলের মধ্যে নিজেদের আদর্শ এবং জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। এবং তার জন্যে উন্মত্ত, অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে, মূল্য দিতে হয়। প্রখর অগ্নি-মূল্য।

উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বে প্রতিযোগিতা-মুখর অর্থনীতি ক্রমশ দুর্মর ব্যাধিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত স্বীকৃতির উদগ্র পিপাসায় বহু লেখক কবি শিল্পী স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গলের কথা আর স্মরণ করে না। উন্নত সভ্যতার ডানাশ্রয়ী ছলনায় সহজে ময়ূর-পুচ্ছধারী 'কাউয়ায়' (কাক) পরিণত হয়।

বিচ্ছিন্ন আধুনিক মানুষ আপন নিঃসঙ্গতা থেকে রেহাই-প্রার্থী। ব্যক্তিগত স্বীকৃতি তাকে মৃত্যুর পর অমরত্ব দিতে পারে—এমন মানসিকতার দিকে উত্তরোত্তর ঠেলে দেয়।

বিচ্ছিন্ন, অন্তরিত মানুষের সুখসুবিধা, স্বাধীনতা অনেক বেড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে অবিশ্বাস—কোন কিছুতে ঈমান রাখা কঠিন। চন্দ্র-সফরকারী মার্কিন নভোচারী নীল-আর্মস্ট্রং চন্দ্র-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিলে তারা কী মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করতে পারবেন?

ঈমানের ভিৎ-ধ্বসা পরিবেশে আধুনিক মানুষ তাই সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে কিছুটা স্বোয়াস্তি পায়। অমরত্বের পিপাসা সে এইভাবে মেটায়। কিন্তু সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ফল : উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা। তা অত সহজে মুছে ফেলা যায় না।

যতদিন না মানুষ আবার সহযোগিতামূলক অর্থনীতির ভিত্তির উপর সমাজ-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে ততদিন এই দুর্ভোগের জগদ্দল হটানো অসম্ভব। অর্থনীতি যদি প্রাইভেট, ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায়, তখন সমাজও হয়ে পড়ে প্রাইভেট। আর তখন সে-দেশের রাজনীতির নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে যায়। দুর্নীতি, আমলাতন্ত্রের উৎস প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। ব্যাধির গোড়ায় না গিয়ে মাঝে মাঝে হয়ত অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ ড্রিপ (ফোঁটা ফোঁটা পতন) দেওয়া যায়। যথা, দুর্নীতি-দমন বিভাগ বা ঐ জাতীয় বিভাগ সৃষ্টি। কিন্তু ভিতরের

শোথ-ঘা আর সারে না। যৌথ অঙ্গীকার-লব্ধ সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবার সমাজে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও অন্যান্য মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে পারে।

সাহিত্যের সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক যমজ ভ্রূণের মত। আমার এতক্ষণের ভূমিকা তাই অপ্রাসঙ্গিক কিছু ছিল না, যা অনেকের কাছে অসংলগ্নও মনে হতে পারে।

সহজাত ক্ষমতা-বিশিষ্ট, পরিবেশ-সম্পর্কে অচেতন অনভিজ্ঞ মূর্খ সাহিত্যিকের দিন বিগত। সোস্যাল ডাইনামিকস বা সামাজিক কলকব্জা-বিষয়ক জ্ঞান বর্তমান যুগে শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকের জন্যে তাই কম্পালসারি, লাজেমী বা বাধ্যতামূলক। জীবন-যাপনের ধারার মধ্যে চেতনার দ্বীপ গড়ে ওঠে। সাহিত্যিক, কবি-শিল্পী এই চেতনার সদাগর। তাদের পক্ষে সমাজের কলকব্জার হদিস না জানা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, বিশেষতঃ এই জমানায়।

সেই সঙ্গে চোখে গেঁথে রাখা দরকার, মূল্যবোধও সমাজ-প্রবাহের মত চির অস্থির। সমাজের নতুন পদক্ষেপের সঙ্গে মূল্যবোধের রূপেরও পরিবর্তন ঘটে। এবং তা নতুন সংগতি-সাধনের (এডজাস্টমেন্ট) দাবী রাখে। বহু লোকের চোখ এড়িয়ে যায় এই ব্যাপার। সমস্ত সামাজিক অন্তর্বিরোধ, দ্বন্দ্ব এই উৎস থেকেই শুরু হয়। পাকিস্তান পত্তনের সময় অধিকাংশ লোকের বাপ ছিলেন মিয়া, যখন ছেলে মিস্টার। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে উক্ত অনুপাতের হার হয়ত কমে গেছে, তবু আজও বহু মিয়া বাপ এবং মিস্টার-ছেলে মনে করে, সমাজ নাকি বদলায় না।

এই ক্ষেত্রে একটি জ্যান্ত নমুনা দেওয়ার লোভ সংবরণ দায়। সভায় কোন ডিপ্লোম্যাট, কূটনৈতিক বন্ধু থাকলে ক্ষমা করবেন। তারা ভালমত জানেন, বৈদেশিক কূটনৈতিকতার ক্ষেত্রে মিথ্যা এবং ভানের আশ্রয় অনেক সময় গ্রহণ করতে হয় কেবলমাত্র স্বদেশের স্বার্থরক্ষায়। "সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ কুবাক্য বলিবে না।" ছেলেবেলায় এইভাবে নীতি-শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে তা বিসর্জন দিতে হয় কেন? অনেকে তা ভেবে দেখেন না। সহজ-সরল, অকপট, স্ট্রেট-ফরওয়ার্ড একজন নাগরিক দেশের আদর্শ নাগরিক। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে কোন রাষ্ট্র কর্ণধার যদি সহজ, সরল এবং বুলেটের গতির মত স্ট্রেট-ফরওয়ার্ড হন, তা হলে সেই দেশের, দেশের মানুষের এবং নিজেরও সমূহ বিপদ ডেকে আনবেন। সাপ ব্যাঙ পাশাপাশি—শত শত স্ববিরোধী ব্যাপারে সহ-অবস্থান ঘটিয়ে এ যুগে একজন রাষ্ট্রনায়ককে চলতে হয়। চাতুর্য ছাড়া কোন দেশের অস্তিত্ব রক্ষাই দায়। ইন্ডিভিজুয়াল এথিক্স অর্থাৎ ব্যক্তিগত নৈতিকতার কথা মধ্যযুগের মানুষ জানত। কিন্তু রিপ্রেজেন্টশনাল এথিক্স বা প্রতিনিধিত্বমূলক নৈতিকতা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। একটি মানুষ যখন বহু মানুষের প্রতিনিধি, তখন তার নৈতিকতা কোন মাপকাঠি দ্বারা চালিত হবে?

বর্তমানে কী বিচিত্র দুনিয়ায় না আমাদের বাস! পরলোকগত পণ্ডিত জওহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল নেহরু একবার ঝোঁকের মাথায় প্রকাশ্য জনসভায় বলে ফেলেছিলেন, "ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স ইজ এ নুইসেন্স। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এক ধরনের ডাহা নোংরামি।" নুইসেন্স ত বটেই! ভুক্তভোগী মাত্রে টের পান। আদর্শ বিদায় দিয়েই এখন স্বদেশের স্বার্থরক্ষা সম্ভব।

বাস্তব জীবনে এই যুগে মহাপুরুষদের বাণীর অমার্যাদা কেন করতে হয়, তা অতি গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তার ব্যাপার। সকল জাগতিক সমস্যার অতি-সরলীকরণ বর্তমান কালের ইলেকট্রনিক্স খচিত জটিল পৃথিবীতে সম্ভব নয়।

অথচ এক শ্রেণীর লোক খুব সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে সকল জাগতিক সমস্যা সমাধান বাৎলে দেন। তাদের অপটিমিজম বা আশাবাদে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু সন্দেহ করতে হয়, তাদের চটপট, স্মার্ট প্রেসক্রিপশন দেওয়ার স্টাইলকে। যেন বর্তমান দুনিয়ার সমস্যা-সমাধান অতই সহজ। যথাক্রমে ইরান এবং ইরাকের দুই বুজুর্গ খাদ্দাম হোসেন এবং আয়াতুল্লা খোমেনী কেউ নাবালক নন। দুজনেই রসুলুল্লাহের হাদিস জানেন : কুল্লো মুস্‌লমিন এখওয়াতিন। সব মুসলমান ভাই-ভাই। অথচ গত কয়েক বছর ধরে দুই মুসলমান ভাই ভ্রাতৃত্বের কী অপরূপ নরিজ না স্থাপন করছেন। ইসলামী প্রতিষ্ঠানের হাবীব সাত্তি যেন ব্যাডমিন্টন খেলার শাটল কর্ক্‌, বহু আঘাত গায়ে মাখছেন। কিন্তু নতিজা, ফল নদারাৎ। আমাদের মত অসহায় মুসলমানরা দুই দেশের কাণ্ড ফ্যালফ্যাল চোখে দেখছে–নীরব এবং হতাশাক্লিষ্ট। অতি-সরলীকরণের নোসখা-দাতারা কেন নীরব?

যারা জাগতিক সমস্যা অতি সরলীকৃত সমাধান তাড়াতাড়ি মগজ থেকে বের করে দেওয়ার জন্যে ব্যগ্র তাদের দৃষ্টি খণ্ডিত। সমগ্রভাবে জগৎকে দেখতে তারা অনভ্যস্ত। এমনকি তারা আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ আলায়হেস্‌সালাম-কে যখন দেখেন, তাঁকেও সমগ্রভাবে দেখেন না। অলৌকিক শক্তিধর সেই মহান ঐতিহাসিক পুরুষের নেতৃত্বে মরুভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিবিভক্ত এক ভূখণ্ড কী করে পৃথিবীর বুকে মর্মশক্তির দ্যোতনার এমন বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করল? কাঁহা কাঁহা না তাদের বিস্তার। পশ্চিমে মগরেব থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া রুশ চীন, ফ্রান্সের সীমান্ত, গোটা স্পেন... কতো দিকে না এক জাতির সম্প্রসারণ। কিন্তু বিগত দু'শ বছরের মধ্যে সেই জাতিই কেন বহিঃশত্রুর সাংস্কৃতিক এবং সামরিক হামলায় ক্রমশঃ কচ্ছপের মত খোলে গুটাতে লাগল, স্বাধীনতা হারাল, কোথাও নামে মাত্র স্বাধীন রইল এবং পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান দীপ্ত সভ্যতা ও মানুষের গোলাম অনুকারক ব'নে গেল? অতি সরলীকরণের প্রবক্তারা তা ভেবে দেখেন না। বর্তমান অবস্থা। কী? যথাক্রমে সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ–দুই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিনিধিরূপে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের বিরোধের সুযোগে মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহী ও অন্যান্য দেশগুলো নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। নচেৎ যে কোন পরাশক্তি বা 'সুপার পাওয়ার' এককভাবে কয়েক

ঘণ্টার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ জয় করে নিতে পারে। মন্ত্র এবং ইচ্ছাপূরণের সাহায্যে টেকনলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি রোধ করা যায়নি কোন কালে। মোগল-পাঠানেরা এদেশে এসেছিল তাঁদের 'ম্যানুভারে' (যুদ্ধক্ষেত্রে নড়াচড়ার কৌশল) সহায়ক ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া নিয়ে। ব্রিটিশ এলো তাদের 'হর্স-পাওয়ার (অশ্বশক্তি) নিয়ে। অশ্ব-শক্তির কাছে অশ্ব হেরে যেতে বাধ্য। মোঘল-পাঠান কুপোকাৎ হয়ে গেল। অতি সরলীকরণের প্রবক্তাদের নসিহত গ্রহণ করার ফলে মুসলিম বিশ্বের ঐ একই দশা ঘটল। এই প্রবক্তারা রসুলুল্লাহ মোহাম্মদ (দঃ)'-এর ভূমিকাও সমগ্রভাবে, সম্যক দৃষ্টিতে দেখতে পান না। খাবলা-খাবলা খাম্‌চির মত তাদের দৃষ্টি, বাস্তবের ধারে কাছে দিয়ে যেতে সক্ষম। আল্লার হাবীব (সুহৃদ) বহু যুদ্ধ করেছেন নিজ হাতে তলওয়ারসহ। খন্দক, তাবুক, ওহদ, বদরের যুদ্ধ ত কাহিনী বর্তমানে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। অথচ অতি-সরলীকরণের উপদেশদাতাগণ শুধু গায়েবানা জানাজা এবং মোনাজাতের মধ্যে হজরতের মহান ভূমিকা সীমাবদ্ধ করে ফেলেন।

মূল্যবোধ-রক্ষা অত সহজ নয় বর্তমান পৃথিবীতে। ঘরের উচ্চতা চার ফুট রেখে, যদি পাঁচ ফুট ঢ্যাঙা কোন ব্যক্তিকে খাড়া, ঋজু হাঁটার উপদেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয় কুঁজো হয়ে হাঁটলে মেরুদণ্ড বেঁকে নানা রোগ দেখা দেবে–তা যেমন অর্থহীন–সমাজের কাঠামোর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা না রেখে নসিহত উপদেশ আওড়ানো তেমনই ফাঁকা, ভুয়া এবং পরিণাম ফলহীন। সমাজতত্ত্ববিদরা এ ব্যাপারের নাম দিয়েছেন : "এ্যানোমি।" অর্থাৎ, আদর্শ কেতাবে এবং মুখের বুলিতে সীমাবদ্ধ, সমাজের উপস্থিত কাঠামোর মধ্যে রূপায়িত হওয়া অসম্ভব। মূল্যবোধের এই দিক কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। আদর্শের বাস্তব রূপায়ন যদি সমাজের ব্যবস্থায় না থাকে, তা সমাজে প্রচার করা ভণ্ডামির শামিল। সম্রাট এবং স্রষ্টার মধ্যে–"বিটুইন সীজার অ্যান্ড গড"–সাহিত্য শিল্পের দূতিয়ালি চলে। শিল্প-সাহিত্যিকের কাম্য আদর্শ : সম্রাট হবেন স্রষ্টার প্রতিনিধি। নচেৎ সমাজের সুষম বিকাশের আর কোন পথ খোলা নেই। সম্রাট-শব্দ এখানে প্রতীক হিসেবে গৃহীত। দেশ পরিচালনার সকল সংগঠনের চালকদের সমষ্টিই সম্রাট-রূপে কথিত।

সমাজের সুষম বিকাশ। সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ স্বভাবত এসে পড়ে। কারণ, সাহিত্য শিল্পের গন্তব্য সেইখানে নিহিত। কিন্তু জীবনকে ঘিরেই সৌন্দর্য বিকশিত হয়। তাই শিল্প-সাহিত্যের চেয়ে জীবনের আয়তন বড়। ধনুক, ছিলা এবং তীর এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ধনুক যেমন সমাজ-জীবন, আর ছিলা সৌন্দর্যের প্রতীক। তীর যেন মানুষের বাসনা-কামনা। সৌন্দর্য আয়তনে বড় হ'লে ধনুক আর ধনুক থাকে না। কারণ, ঢিলা বা শ্লথ ছিলায় তীর নিক্ষেপ আদৌ চলে না। তীর যোজনা তখন যথাযথ হওয়া দায়। তীর ছোঁড়ার সময় ধুনকের কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশা হয়? ধনুক আর পূর্বের স্বাভাবিক আকারে থাকে না। কিছু এঁকে-বেঁকে যায়। অর্থাৎ জীবন আর পূর্বের আকারে থাকে না সৌন্দর্যের সঙ্গে যোজনার ফলে। আরো লক্ষ্য করা উচিত, ধানুকী ছিলা টেনে যত নিজের বুকের দিকে আনতে পারে, অর্থাৎ মানুষের উপলব্ধি যত গভীর হয় তীরও ততদূর পাল্লায় যায়। অর্থাৎ, বাসনা-কামনা তত দূর পরিধিতে বিস্তার লাভ করে।

জীবন এবং সৌন্দর্যের এই সমন্বয়-সাধন শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সমাজ-সংস্কারকের যৌথ দায়িত্ব। কুৎসিত সমাজের ছিলা অবশ্যই ঢিলা। ঢিলা ছিলা থেকে তীর ছুড়লে তা বেশী দূর যায় না। সৌন্দর্য আয়তনে যদিও ছোট, যুগল-বন্দেশ এই সংগীতের আসরে শিল্পী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্র পরিচালক, সমাজ-সংস্কারকের দায়িত্ব সমান।

উদ্যোক্তা-আয়োজকদের ধন্যবাদ দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম। কিন্তু আর আর সে পথে মন এগোয় না। কারণ এই দীন অভাজনের কাঁধে দায়িত্বের কী জগদ্দল পাথর না আপনারা চাপিয়েছেন, নিশ্চয় এবার বুঝতে পারেন।

বড় দুর্গম, গিরিখাদ-বোঝাই সৌন্দর্য-অম্বেষার পথ। দেশের মানুষের জীবন ধারার রুন্ধ্রে রন্ধ্রে সৌন্দর্যের প্রবাহ বইয়ে দেওয়ার ব্রত রীতিমত কঠিন সাধনার ব্যাপার। রক্তাক্ত আত্মা, ঘর্মাক্ত মগজ এই দুর্গম পথের যাত্রীদের নিত্যসঙ্গী।

নিজের সাধ্য এবং শক্তি-অনুযায়ী এই দায়িত্ব আমৃত্যু পালন করে যাব, এই আশ্বাস আমি আমার তরফ থেকে আপনাদের দিতে পারি, যদিও আট শ' বছর পূর্বে চৈনিক কবি চুই পো সতর্কতার বাঁশি বাজিয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ধৈর্যধারণের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ-প্রদানসহ, লোকান্তরিত শ্রদ্ধেয় কবি বিষ্ণুদে'র তর্জমায় চীন দেশের কবি পো চুইয়ের ক্ষুদ্র কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাষণের ইতি টানব :

আনাম থেকে উপহার এলো
লাল কাকাতুয়া,
আপেলের মত লাল,
জবার মত লাল পালক;
মুখে মানুষের কথা।
চিরকাল যা ঘটেছে পণ্ডিতের আর কবির ভাগ্যে
তা-ই ঘটল
ওরা মোটা তারে ঘেরা খাঁচায়
ওকে পুরে বন্ধ করে দিলে।*

* মাহবুব উল্লা ট্রাস্টের সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাতের কাহিনী, ভাষার লড়াই

তিরিশ বছর পূর্বে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কেন? সেখানে উর্দু ভাষার প্রসারের উদ্দেশ্য কী তাদের প্রধান লক্ষ্য। ভাসা-ভাসা দেখলে তা-ই মনে হয়। আসল ব্যাপার তা নয়। তাদের আসল মতলব কিন্তু অন্য, যা সহজে চোখে পড়ে না।

উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা হয়, তখন স্বভাবতই সুখসুবিধা কারা লাভ করবে? চাকরির কথাই ধরা যাক। স্বভাবত, যারা উর্দুভাষায় পটু তারা রাষ্ট্রের ভাল-ভাল চাকরি দখল করে নেবে। বাঙলা ভাষাভাষী মানুষেরা সহজে বাদ পড়ে যাব, অথবা জায়গা পাবে খুব কম।

রাষ্ট্রের কলকব্জা যদি হাতে থাকে, তখন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উর্দুভাষীদের সুবিধা বেশী। একজন বাঙালী সেখানে একই রাষ্ট্রে বাস করে হয়ে পড়বে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। মানুষকে বাঁচতে হলে তার ভাতের প্রয়োজন হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য যদি অপরের হাতে থাকে, তখন ভাত হয়ত মিলবে, কিন্তু তা দিয়ে পেট ভরবে না। কারণ, অপরের মর্জির উপর ব্যাপারটা নির্ভরশীল।

সুতরাং প্রশ্ন ছিল ভাষার। কিন্তু দেখা গেল তার সঙ্গে ভাতের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। অনেকে তা ভাবতে পারে না। কারণ, কোথাকার পানি কোথা ধায়, অনেকে তলিয়ে দেখতে অক্ষম। সেই জন্যে ভাত যে শুধু বাঁচা নয়, মানুষের মত বাঁচার জন্যে হাজার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত, তা অনেকে এড়িয়ে যায়। এমন এড়িয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ, পৃথিবীর যেখানে যত শোষক আছে, তারা নানা ভাঁওতা সৃষ্টি করে রাখে। সাধারণ মানুষ সেই ফাঁদে পড়ে যায়। তখন তারাও ভাত-কে মনে করে তুচ্ছ জিনিস। 'যার ভাত নেই, তার জাত নেই।' এই হচ্ছে আমাদের বাঙলা প্রবাদ। চমৎকার প্রবাদ। অথচ সাধারণ মানুষ তা ভুলে যায়। ফন্দিতে পড়েই ভুলে যায়, বলা বাহুল্য। পাকিস্তানি শাসকরা ভাষার ওপর কোপ মারতে চেয়েছিল, আসলে সে-কোপ কিন্তু ভাতের ওপর। দেশের মানুষের প্রতিবাদে—এমনকি বহু শহীদের রক্তদানের বিনিময়ে—সেদিন পাকিস্তানী শাসকরা পিছু হটেছিল। কিন্তু তাদের ফন্দিফিকিরের অভাব ছিল না। তাই ১৯৫২ থেকে ১৯৭১—তারা আরও উনিশ বছর এদেশে টিকে রইল। শোষণের জন্যে বহুৎ ফন্দিফিকির লাগে। শাসক যদি শোষক হয়, তারাও জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়ার ভাল ইলেম রপ্ত করে। একটা ফন্দি ত নিশ্চয় এতদিনে সকলের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার কথা। পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়া থেকে পাকিস্তান পত্তনের পরও মুসলিম লীগের নেতারা আল্লাহ-রসুলের দোহাই কম দেননি। কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণের দুর্দশা বাড়ল বৈ ঘুচল না। অনেকে এখানে প্রশ্ন তুলবেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ ধন-দৌলতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আসল কথা, তাদের জন্যেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলবেন, কিন্তু দেশের কৃষক মজুর ও অন্যান্য পেশার সাধারণ মানুষের সমর্থন না থাকলে কী পাকিস্তান সৃষ্টি হোত? ফন্দিটা এতদিনে সকলের কাছে ধরা পড়েছে বলে মনে হয় না। তবে কিছু-কিছু ভুক্তভোগী মানুষের চোখ খুলেছে। এখন যারা ধন-দৌলত আরাম-আয়েশে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের জন্যেই পাকিস্তান হয়েছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ত কিছু করতে পারে না। তাদের জন সমর্থন দরকার। সকল শ্রেণীর মানুষকে দলে টেনে আনা দরকার। এই দলে টানার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল পবিত্র ইসলাম এবং ইসলামের বাণী 'সব মুসলমান ভাই-ভাই।' সাধারণ মানুষ এই ফন্দি-জালে আটকে পড়েছিল বৈকি। তাই দেখা গেল, সেই এক কালের মুষ্টিমেয় ভাইয়েরা দেশের কোটি কোটি ভায়ের কাঁধে চেপে বসল তাদের আরাম-আয়েশের চাকা মসৃণভাবে ছালিয়ে যেতে। ফলে, পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত টিকল না। ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। চব্বিশ বছর লেগে গেল—১৯৭৪-৭১ সাধারণ মানুষের সেই ফন্দিটুকু ধরতে। ভাঁওতাবাজি ধরা সব সময় সহজ হয় না। তবে শোষণ শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখ খুলে দিতে বাধ্য।

বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন বানচাল করতে পাকিস্তানের শাসক-শোষক এবং তাদের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানী দালালেরা ফন্দিফিকির, ভাঁওতা, চাতুরী, চালবাজি, ছলাকলা কম প্রয়োগ করেনি। একথা কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবে যারা তখন ছোট ছিল, তাদেরও জেনে রাখা উচিত, পাকিস্তানের দালালেরা পত্র-পত্রিকা, সভায় ঘোষণা করেছিল : 'বাংলা কাফেরের ভাষা, হিন্দুর ভাষা—মুসলমানের জন্যে হারাম।" নিজেদের কুমতলব হাসিল করতে পবিত্র ইসলামকে তারা টেনে এনেছিল, সত্যিকার ধার্মিকের পক্ষে যা অতি গর্হিত আচরণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজে এক শ্রেণীর আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি পর্যন্ত এই ফতোয়ার সমর্থন দিলেন। আশ্চর্য, যারা আল্লাহর বন্দেগী করেন, তারাও এমন ফন্দি ধরতে পারলেন না, বরং জনবিরোধী প্রচারে সায় দিলেন। জানি না, তারা অর্থের বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করেছিলেন কিনা। কারণ এদেশে এমন ঘটনাও মাঝে মঝে ঘটে। আরাম-আয়েশ এবং ঈমনের দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে নতুন নয়। যাহোক, দেশের সাধারণ মানুষ সেদিন প্রতারিত হয়নি তা আজও প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের নিকট সুসংবাদ। কারণ, ইতিহাস গড়ে সাধারণ মানুষ। '৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের বহু পূর্বেই আমাদের দেশের ভুখা নাংগা, দীন দরিদ্র জনসাধারণের কানে ইতিহাসের পদধ্বনি পৌঁচেছে। অথচ অধ্যাপকেরা শিক্ষার বড়াই করে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর দাস দালাল রূপেও সেদিন বহু অধ্যাপক অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অতীতের কথা স্মরণ এই জন্যে দরকার যেন ভাঁওতা-বাজির ফাঁদে কেউ আবার জড়িয়ে না পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা ধরনের ফন্দি শোষকরা সমাজে ছড়ায়। আরো এক ধরনের ভাঁওতার কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। বড় বড় আদর্শের কথা বা বুলি, অনেক সময় স্রেফ ফাঁকা আওয়াজ। তার পেছনে কোন বাস্তব বা সত্য থাকে না। আদর্শ বাস্তব করার প্রশ্ন তারা শিকেয় তুলে রাখে। শুধু বুলিতে তা সমাপ্ত।

সমাজে কিছু আদর্শ চালু রাখা হয় মানুষকে প্রতারিত করার জন্যে। সকলের জন্যে তা নয়। শুধু এক শ্রেণী সেই আদর্শের সার্থকতা পালন করতে পারে। কিন্তু মনে হয় যেন আমাদের সকল শ্রেণী তার মর্যাদা দিতে সক্ষম। উদাহরণতঃ ধরুন, পরোপকার একটি সদ্‌গুণ বা আদর্শ। কিন্তু পরোপকার কে করতে পারে? একজন ক্ষেতমজুর সারাদিন কাজের পর, উদাহারণত বলছি, নিজের মজুরী নিয়ে বাড়ি ফিরছে। পথে সে দেখল চার পাঁচটি অভুক্ত ভিখিরী ছেলেমেয়ে পথের ধারে শুকনো মুখে বসে আছে। জিজ্ঞাসাবাদে ক্ষেতমজুর জানল, তারা সত্যিই সারাদিন কিছু খায়নি। সে তখন কী করতে পারে? তার বাড়ীতেও সাত-আট জন তার উপার্জনের উপর নির্ভর করে। এই দোটানায় ক্ষেত-মজুরটির পক্ষে কি পন্থা নেওয়া সম্ভব। অনাথ ছেলেমেয়েগুলোর দুঃখ লাঘব করতে গেলে, তার বাড়ীর লোকেরা উপোস করবে। পরোপকার তার জন্যে একটা বিলাস। তা ধনীদের সাজে—যাদের ঘরে বাড়তি ভাত আছে। অর্থাৎ এই ভাতের সঙ্গে একটি মহৎ আদর্শ জড়িয়ে আছে। কিন্তু গরীবের পক্ষে তার হাতে-কলমে পরীক্ষা দেওয়া কঠিন। তার ঘরে ত বাড়তি ভাত নেই। অথচ আদর্শরূপে পরোপকার সমাজে চালু আছে। এসব ফন্দির পর্যায়ে পড়ে। কারণ, যে-আদর্শ সমাজের সকলের পক্ষে পালন সম্ভব নয়, তার মহিমা ফলাও করে ঘোষণা রাখা ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কী? সমাজের সকল সুখসুবিধা-ভোগী, মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে পালন-সম্ভব আদর্শকে কিন্তু সর্বজনীন সর্বশ্রেণীর উপযোগী বলে প্রচার করা হয়। অপরের হক (অধিকার) মেরে যারা খায়, তারা না-হক ব্যবস্থার মহিমা-কীর্তন জোরেশোরে চালায়। ধর্মের নাম নিলে সাধারণ মানুষকে সহজে দলে টানা যায়, তাই অনেক সময় ধর্মের নামে নানা আদর্শ শোষকেরা চালু রাখে। অথচ তাদের মতলব বিলকুল স্বতন্ত্র। পাকিস্তান পত্তনের পর বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে জনসাধারণের দুর্দশা, তার পর্বতপ্রমাণ সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

২

ভাষা প্রসঙ্গে নিবন্ধ শুরু। দেখা গেল, ভাষার সঙ্গে ভাতের প্রশ্ন জড়িত। আর ভাতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের বহু সদ্‌গুণাবলী যে বৈশিষ্ট্যে মানুষ হয় মানুষ—যার ফলে জন্তু থেকে সে আলাদা। কিন্তু সদগুণ অর্জনের ক্ষেত্রে সবার উপর দাঁড়িয়ে আছে : ভাত। ভাতের লড়াই আসলে মানুষ হওয়ার লড়াই।

এখন দেখা যায়, পাকিস্তানের এক খণ্ড ত হয়ে গেল বাংলাদেশ। অন্য খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হয়ে আছে এখনও। কিন্তু সেখানে ভাষা এক নয়। উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী বেলুচ, পশ্‌তু প্রভৃতি ভাষা ওই দেশে চালু আছে। উর্দু শতকরা তিন-চার জন শিক্ষিতের ভাষা মাত্র। পাকিস্তানে এবং সংলগ্ন দেশ ইরানেও ভাষা সমস্যা আছে, একদা আমাদের যেমন ছিল। এখন দেখা যাক, বেলুচি ভাইদের কী দশা। তখন কারো বুঝতে বিলম্ব হবে না যে ভাষা এবং ভাতের লড়াই কীভাবে একে অপরের সঙ্গে লেপ্টে থাকে।

বেলুচিস্তান আজও পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। সংখ্যায় বেলুচিরা মাত্র শতকরা চার। পূর্ব পাকিস্তানের মত তারাও শোষণে জেরবার। কিন্তু নিরুপায়। বাঙলাদেশ হওয়ার পর তারা আরো দুর্বল হয়ে গেছে। অনেকের মনে থাকার কথা, আওয়ামী লীগ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যৌথ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বেলুচী ন্যাপ-নেতা গাউস বখশ বেজেঞ্জো প্রমুখ তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখরের প্রচেষ্টা চালায়। তারপর তের বছর চলে গেছে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নানা পরিবর্তন। বর্তমানে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী আছে। রাজনৈতিক কোন আন্দোলন নেই। কিন্তু বেলুচী নেতাগণ নিষ্ক্রিয় নন। তাদের দুজন নেতা খায়ের বখশ মাআররী এবং আতাউল্লা মেংগল স্বদেশের বাইরে থেকে নিখিল বেলুচ সংস্থা বা "ওয়ার্লড বেলুচ অরগানাইজেশন" গড়ে তুলেছেন। আর এক দল চরমপন্থী নেতা আছেন। তন্মধ্যে আসলাম গিচ্‌কী, মারীর হাজারী রামখানীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা গেরিলা বাহিনী গড়ে জঙ্গলে-পাহাড়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বেলুচিস্তানেও প্রথমে বেলুচি ভাষাকে কোণঠাসা করে ফেলতে চেয়েছিল পাকিস্তান সরকার। কিন্তু সক্ষম হয়নি। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে গাউস বখশ বেজেঞ্জোর মত নরমপন্থী নেতাও মনে করেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু "মাইনরিটিরা" একটি আলাদা জাতি। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতর শোষণ-মুক্ত হয়ে থাকা অসম্ভব। শুধু বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের ডাণ্ডার মহিমায় পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ, যথা–সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি একত্র হয়ে আছে। রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া সুদূর ভবিষ্যতে বাঙলাদেশের মত পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য।

ইরানেও বেলুচী আছে। তাঁরা ইরান সরকারের শাসনাধীন। কিন্তু সেখানেও অবস্থা বড় নাজুক। জালেম ইরানের শাহ দূর হয়ে গেছে এবং একদম পৃথিবী থেকে। এই ব্যক্তিটির ক্রিয়াকলাপ কী ছিল, অনেকে জানে না। বেলুচদের জাতীয়তা বোধ ধ্বংসের জন্য শাহ অত্যন্ত কড়া পন্থা গ্রহণ করে। ভাষা জাতীয়তা বোধের একটি বড় সূত্র। সেই জন্যে শাহের নীতি ছিল ইরানী বেলুচদের মধ্যে যেন রাজনৈতিকবোধ না জাগে এমন পন্থা গ্রহণ। শাহ স্কুল-কলেজে বেলুচী ভাষা একদম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ফারসী ভাষা হয় তদস্থলে বাধ্যতামূলক। তার

জন্যে ফারসী ভাষায় বিকৃত ইতিহাস লেখায় ভাড়াটে অধ্যাপকদের সাহায্যে ইরান সরকার, যেন বেলচুরা নিজেদের অতীত কিছু জানতে না পারে। শাহ বেলুচী ভাষায় সংবাদপত্র, পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেয়। এমনকি বেলুচী ভাষায় লেখা পুস্তকও কাছে রাখা আইনতঃ দণ্ডনীয় ছিল। কারণ, পাকিস্তান থেকে পাচার হয়ে বেলুচী ভাষায় লেখা বই ইরানী বেলুচিস্তানে যেত। এমনকি বেলুচী ভাষায় অনূদিত পবিত্র কোরান পর্যন্ত রাখার জন্যে শাহের গোয়েন্দারা লোককে গ্রেপ্তার করত এবং শাস্তি দিত। বেলুচীরা মুসলমান, ইরানের শাহ্ও মুসলমান। তবু হেন আচরণ কেন? যখন হালুয়া রুটি তথা ভাতের প্রশ্ন ওঠে তখন যে-ভাই সুখ-সুবিধা ভোগ করে, তার আচরণ এমনই হয়। ভাষার বিরুদ্ধে শাহের জুলুম আসলে সেই ভাতের থালার প্রশ্নে। শাহের পতনের পর আয়াতুল্লা খোমেনীর আমলে অবস্থার বেশী কিছু উন্নতি হয়নি। এখনও বেলুচী ভাষা শিক্ষাদানের বাহন হিসেবে নিষিদ্ধ। তবে সংবাদপত্র বা পত্র-পত্রিকা প্রকাশে আর কোন বাধা নেই। উন্নতি এতটুকুই। মূল সমস্যার দিকে দৃষ্টি থাকলে এসব আচরণ কারো কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে না। প্রশ্ন হালুয়া রুটির, সওয়াল ভাতের। আফগানিস্তানেও বেশ কিছু বেলুচ আছে। সেখানে ১৯৭৯ সালে নূর মোহাম্মদ তারাক্কীর নেতৃত্বে বাদশা দাউদের পতন এবং সমাজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বেলুচী ভাষা শিক্ষায় ব্যবস্থা চালু করা হয় মাত্র চার বছর পূর্বে।

AMARBOI.COM

ইংরেজরা কী এই উপমহাদেশের উপর ইংরেজী চাপিয়ে দিয়ে এক'শ আশি বছর রাজত্ব করে গেল না? শোষণের পন্থা বহু।

অনেকের ধারণা ইরানের ভাষা ফারসী। আদৌ না। কোন ভাষা শতকরা কী হারে বলা হয় তার হিসাব দেওয়া গেল ঃ

আজারবাইজানী	২০
গিলানী	৬
লুরি বখতিয়ারী	৫ ১/২
মাজেন্দারানী	৫
কুর্দী	৫ ১/২
বেলুচ	১/২
আরবী	১/২
তুর্কমেনী	১১/২
আরমেনী	১/২
আসিরিয়ান	১/২

দেখা যায়, ইরানে বাকি পঞ্চাশ জন অন্য ভাষাভাষী। ফারসী বলে বাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক লোক। কিন্তু যেহেতু ফারসীভাষী ইরানীদের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ ও শাসনভার–তারা কিছু ছাড়তে নারাজ। ইরানে কিছু খ্রীস্টান ইহুদী আছে। বাকি সবই মুসলমান। কিন্তু তা ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো দূরের কথা, শোষণ এবং নিস্পেষণ বৃদ্ধি করেছে পুরো মাত্রায়। শাহের জুলুমের কাহিনী এখন দুনিয়ার লোক জানে।

শাসক যেখানে শোষক সেখানে এই নীতি ছাড়া তাদের সম্পদ ধন-দৌলত এবং অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা কঠিন। শাহরে বাপ রেজা শাহ পৃথক ছিলেন না। সাধারণত বাপ-কা-বেটা হয়, এখানে বেটা-কা-বাপ–আচরণে সহোদর। রেজা শাহ ১৯৩৬ সালে ঘোষণা করলেন যে ফারসী ভাষায় বহুৎ নকল শব্দ ঢুকেছে। তার কারণ বর্বরদের আক্রমণ এবং অনুপ্রবেশ। সুতরাং বিশুদ্ধ ফারসী ভাষা চালু করতে হবে। বর্বর কারা? আরবরা সমাপ্ত শতকে ইরান জয় করেছিলেন, বোধ হয় ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে। আরব এবং তুর্কীরা বর্বর। এখনও ইরানী যে কোন সরকারী প্রচার-পুস্তিকা খুললেই দেখা যায়... "তারপর আরব বর্বরগণ আমাদের দেশে হামলা চালায়"...। এখানে বর্বর হচ্ছে আরবের অধিবাসী। ইসলামের বিস্তার ইরানীরা এখন এই চোখে দেখে। আরবী বনাম ইরানীদের এই বিরোধ এখন আরো প্রকট। শত শত বছর পবিত্র ইসলামের দোহাই দেওয়ার পর এমন ঘটছে কেন? এমনকি বর্তমান বিশ্বে প্রবল ইসলামী জাগরণ ইরাক-ইরানের ছ'বছরের লড়াই থামাতে পারছে না কেন? বর্তমান দুনিয়া মধ্যযুগের মত অত সরল নয়–তা অনেকে বোঝে না, অথবা বুঝে ভান করে।

AMARBOI.COM

প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রেজা শাহ বিশুদ্ধ' ফারসী প্রচলনের ফরমান দিলেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি নিজেই 'বিশুদ্ধ ফারসী' বলতে অক্ষম। রেজা শাহের ভাষা-সংস্কার শেষে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য, ফারসীভাষীদের আধিপত্য বজায়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ত খোলাখুলি বলা দায়। অতএব, ভাঁওতার আশ্রয়। এই কাজে শোষকশ্রেণীর উদ্ভাবনী শক্তি অপরিসীম। বর্তমানে এক এবং অখণ্ড পবিত্র ইসলামে যে শিয়া, সুন্নী, ওহাবী, কাদিয়ানী ইত্যাদি বাহাত্তর ফেরকা'র (সম্প্রদায়) আবির্ভাব ঘটেছে, তার মূলে আছে, শাসকশ্রেণীর স্বার্থ-অনুযায়ী ইসলামের ভাষ্য বা তফ্সীর রচনা। এমন সব তফসীর-দাতা আলেম-বুজুর্গও পাওয়া যায়। কারণ, শোষকশ্রেণী ধন-দৌলত দিয়ে ওদের কিনে ফেলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় '৭১ সালে বাঙলাদেশে গণহত্যাকারী ইয়াহিয়া খানের সমর্থক ছিলেন না কী অনেক আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ??? পবিত্র ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা অপেক্ষা তারা নিশ্চয় নিজেদের পকেটের পূর্ণতা রক্ষার প্রতি বেশী যত্নবান। নচেৎ ইয়াহিয়া খানের "কতলে আ'ম "(গণহত্যা)-এর সমর্থক কোনদিন কেউ মুসলমান কেউ হতে পারে? পবিত্র কোরানে আছে, এক মুসলমানের অন্য মুসলমান হত্যা 'গোনাহে কবীরা' বা পাপ।

ইতিহাস থেকে প্রচুর আরো নজির দেওয়া যায়–ভাতের সঙ্গে শুধু ভাষা নয়, আরো বহু মানবিক মূল্যবোধ–যথা; প্রীতি, ত্যাগ, মানুষের প্রতি ভালবাসা, দেশপ্রেম প্রভৃতি জড়িত।

ভাষার সঙ্গে ভাত জড়িত। ভাত ফেলনা, তুচ্ছ চিজ নয়। ভাতের লড়াই–মূলে মনুষ্যত্বের লড়াই! এই প্রাথমিক শর্ত পালিত হলে তবে মনুষ্যত্ব অর্জনের অন্যান্য পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। ভাতের সঙ্গে জড়িত আছে অদৃশ্যভাবে মনুষ্যত্বের সকল সোপান। তার প্রথম ধাপ অন্য কিছু নয়–শুধু অন্ন, ভাত, ভাত। যেদিন সব মানুষ, এমনকি গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালও পেট পুরে ভাত পাবে–সেদিন বাঙলাদেশে শুরু হবে মনুষ্যত্বের নতুন সকাল।

অভিধায় আত্মমগ্ন ব্যঞ্জনায় শরণার্থী

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-৮২)

AMARBOI.COM

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদতি বেদ চ।
যো নস্তবেদ তদ্বেদ
নো ন বেদেতি বেদ চ।।

আমি এরূপ মনে করি না যে উত্তম রূপে জেনেছি। আমি জানি–মনে করি না। আবার জানি না, এমনও মনে করি না।

–কঠোপনিষদ

'পদার্থবিদ সাবধান হও পরবিদ্যা হইতে। ফিজিকস্ বিওয়্যার অফ মেটাফিজিকস।' বৈজ্ঞানিক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) তাঁর সমসমায়িকদের নোটিশ দিয়েছিলেন। সতর্কতার এই ক্ষীণধারা কালে কালে স্রোতচ্ছল গঙ্গায় পরিণত হয়। উনিশ শতকের তিনাংশ জুড়ে বিজ্ঞানের বিপুল জয়যাত্রা তার সাক্ষ্য। কিন্তু বিজ্ঞান এবং পরাবিদ্যার মধ্যবর্তী পরিখা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ এবং দুস্তর হতে থাকে। হেগেলের মত মর্যাদায় শালপ্রাংশু দার্শনিককে কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আমল দেননি। হোল্‌মেহোৎস ত বিদ্রূপই করে বসেন। উনিশ শতকের শেষাংশে স্রোত আবার উজান বইতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত দর্শনে প্রয়োগবাদের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ উপনিবেশহীন হয়ে পড়তে লাগল। এবার একদা-মিত্র বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনাই প্রধান অসহযোগী এবং ভিৎ-ধ্বংসী আয়োজন।

পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রিধারী কৃতী ছাত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব অনুসন্ধিৎসার সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাঙ্গণ যৌবনেই বর্জন করেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে। পরবর্তী গন্তব্য দর্শনের অমরাবতী। তাঁর এবম্বিধ প্রবণতার সঠিক হদিস-প্রদান কঠিন। কারণ, তাঁর কোন রচনায় স্বীকারোক্তি-জাত আঁচ মেলে না। তবে কিছু অনুমান করা যায়। এই উপমহাদেশের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক জুড়ে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ইউরোপী লিবার‍্যাল মানবতাবাদের প্রভাব ছিল ব্যাপক, বারট্র্যান্ড রাসেল যেখানে নিমিত্ত। রাসেল বিজ্ঞানে পারদর্শী, কিন্তু মূলতঃ দার্শনিক। তাঁর এই প্রতিমা-বিভূতিতে আইয়ুব সাহেব প্রলুব্ধ হয়ে থাকবেন। লিবার‍্যাল হিউম্যানিজম অনুন্নত দেশে অন্ধ কুসংস্কারের তমসা কাটিয়ে ওঠার হাতিয়ার বিশেষ। বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ সেদিক থেকে আসাও কিছু বিচিত্র নয়।

কিন্তু মূল্যবোধের মূল্য যদি কাঠগড়ায় অপরাধী রূপে দাঁড়ায়?

উৎস-ভূমি ইউরোপেই শুরু হয় লিবার‍্যাল মানবতাবাদের কুশ-পুত্তলিকা দাহ-যজ্ঞ। ঘোষণায় ব্যক্তি-মানুষের অনন্যতা, মহিমা, ঐশ্বর্য এবং সাম্য স্বীকৃত। কিন্তু সামাজিক বাস্তবে দৃশ্য বিপরীত। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি এবং শিল্প-প্রসার অন্য দিকে স্তূপীকৃত করছিল মানবিক অপমান, অমনুষ্যায়ন (ডিহিউম্যানাইজেশন) এবং অর্থনৈতিক অসাম্য। পৃথিবী জুড়ে তার দাপট। স্বভাবতই পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ আসে নানা দিক থেকে লিবার‍্যাল মানবতাবাদের বিরুদ্ধে। ইদানীং কালে এমন কী টি এস এলিয়টের মত কবি পর্যন্ত তিরিশের দিকে বলেন, 'ওই আন্দোলনের লেজ অপেক্ষা মুড়োর কিছু সংজ্ঞার তথ্য থাকতে পারে, এ মুভমেন্ট নট সো মাচ ডিফাইনড বাই ইটস অ্যান্ড আজ বাই ইটস স্টার্টিং পয়েন্ট উৎস-ভূমির আরো দুর্দশা ঘটালেন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণ। ফরাসী গণিতিবিদ পোঁয়েকার ঘোষণা করলেন বিজ্ঞান রিয়্যালিটির কোন পরিচয়-দানে অক্ষম, বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কের কিছু হয়ত জানান দিতে পারে। ইংল্যান্ডে ব্র্যাডলের উচ্চারণ প্রায় সমরূপ। হাঁফ-ফুকার উচ্চারণ করলেন বের্গসঁ'। ফরাসী দার্শনিক : বিচারশক্তি অপেক্ষা বোধি, ইনটুইশানের চেয়ে শ্রেয় এবং তেজস্কর। ফ্রয়েডের 'স্বপ্ন-ভাষ্য' (১৮৯৯ সালে প্রকাশিত) জানিয়ে দিল, ব্যক্তি-মানুষ আর যা-ই হোক, বিচারশক্তি সমপন্ন জীব নয়—যে বুদ্ধির সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-রক্ষায় সক্ষম। তার কর্মকাণ্ডের পটভূমি—'মোটিভ গঠিত হতে পারে এমন সব শক্তি-মারফত, যার সব অবস্থান তার অবগতির বাইরে। নির্জ্ঞান এবং অবচেতনের ক্রীড়নক অনেকাংশে ব্যক্তিমানুষ। কিউবিস্ট পেন্টিংয়ের বস্তুর মত তার তদাত্ম্য—আইডেনটিটি—বহুমাত্রিক, বহুধা, বহু দৃষ্টি বিন্দু উৎসারিত। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কে মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। বহুকালের এই শিক্ষা অচল। পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি চূর্ণ। বিজ্ঞান মরীচিকাময় বহির্জগতের জন্যে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর ছাড়-চিঠি দিল। অন্তর্জগতে আরো অন্ধকার ছিটিয়ে দিলেন ফ্রয়েড : ব্যক্তির পক্ষে সত্তা-অন্বেষণ পণ্ডশ্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ূরোপীয় চিন্তার এমম্বিধ তরঙ্গ-অভিঘাত এ দেশের তট স্পর্শ করেছিল বৈকি।

আবু সয়ীদ আইয়ুব নানা ক্লান্তি-চিহ্ন দেখে হয়ত বিজ্ঞান পরিত্যাগ করে থাকবেন। আবেগের নিরাপত্তা আপন অস্তিত্বের নিরাপত্তার মত ব্যক্তিমানুষকে কম আলোড়িত রাখে না। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলে রাখা ভাল, উদারতাবাদে এ্যাকশানের ক্ষেত্র সংকুচিত। তাই প্রত্যারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং কর্মযোগির আসন সেখানে আসরের পাদপ্রদীপের সম্মুখে নয়। লিবার‍্যাল মানবতাবাদের দুর্দশার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অনেকে মার্কস্‌বাদ অভিমুখী হন। আইয়ুব সাহেব সেখানে উঁকি দিয়ে ফিরে আসেন আপন জায়গায়। বিজ্ঞান-মনা তিনি। কিন্তু ঐ রাজ্যের নাগরিকত্ব আর তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। উদারতাবাদে পক্ষপাতী হওয়া যায়, পার্টিজান হওয়া কঠিন। তাছাড়া প্রত্যেক আদর্শের মধ্যেই স্বাতিক্রমণের (ট্রান্‌সেন্‌ডেন্‌স–পরিভাষাটি আইয়ুব সাহেবের) ঝোঁক বিদ্যমান। তাই যোগাসনে অনড় থাকা সর্বদা সম্ভব নয়।

সত্তর-উর্ধ্ব বয়স, জনাব আইয়ুবের জ্ঞান-সাধনার পটভূমি পাঁচটি দশক জুড়ে। সুদীর্ঘ এই কাল-পরিসরে তিনি নানাভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজীবন পল্‌কা স্বাস্থ্য-বাহী, তবু জ্ঞানের অদম্য তৃষ্ণা-মেটানোর ক্ষেত্রে অনবসর। 'দি স্পিরিট অফ ম্যান উইল সাসটেন ইজ ইনফারমিটি।' সকল দুর্বলতার ধকল সইতে মানুষের সহায় হবে তার মর্মশক্তি।' বাইবেলের এই একটি পংক্তি আইয়ুব সাহেবের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা এদেশী নাগরিকের পক্ষে ভারতীয় হওয়ার পক্ষে দুস্তর বাধা। ভাষার পৌত্তলিকতাও কম আত্মধ্বংসী নয়। জনাব আইয়ুব এই সব অন্তর্ঘাতী জন্মান্ধতার আকৈশোর বৈরী। আর এক দিক থেকে তিনি সৌভাগ্যের অধিকারী। গ্যেটে বলেছিলেন, 'হি ইজ দি মোস্ট ফরচুনেট মান হু ক্যান ব্রিং অ্যান্ড অপ হিজ লাইফ রাউন্ড টু ইটস বিগিনিং।' তর্জমায়–জীবনের শেষ খোঁট যিনি গোড়ার সঙ্গে আবার মেলাতে পারেন, তিনি ভাগ্যবান জন। জীবনের এই প্রান্তে উর্দু কবি তকী মীর, গালিবেরা আইয়ুব সাহেবের হাম-পেয়ালা হয়ে ওঠেন। কেনানে যোশেফের প্রত্যাবর্তন ঘটে। শেষ বাক্যটির মর্মার্থ এই নিবন্ধের যথাস্থানে নিবেশিত।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। একজন মনীষীর মানসপ্রবাহে নানা আবর্তন বিচিত্র কিছু নয়। তার সব ক'টি চোখে পড়েছে, এমন দাবী এই নিবন্ধকার করে না। সহজ দৃশ্যমান পরিণাহ-রাজিই (কন্টুর) ভরসা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব দর্শনের প্রাঙ্গনেও বেশী দিন স্থির থাকলেন না। চারুকলা, সাহিত্যের প্রতি যেন তাঁর আকর্ষণ ছিল সহজাত, এবং বোধ হয় সেখানেই আত্মশক্তি তিনি চরম খুঁজে পেতেন–ফরাসীরা যাকে বলে ফোর্তে। ক্রমে ক্রমে তিনি সেই দিকে ঝুঁকে পড়লেন কারিগর হিসেবে নয়, ভাষ্যকার রূপে। প্রায় চল্লিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর পূর্বে দেখা যায়, তিনি আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনের অন্যতম সম্পাদক। তার পরে অকালে লোকান্তরিত স্বর্গীয় সুরেন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত একটি সংকলনে ই, এম ফর্স্টারের প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করেন, যা তৎকালীন সাহিত্য আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল।

হেগেল কাব্য এবং পরাবিদ্যার মাঝখানে ধর্মের ঠাঁই নির্দেশ করেছিলেন। মানস-লোকের এই ত্রয়ী উপাদান শুধু প্রবণতার আকর্ষণে অনন্য হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র ছাপে। কবি অডেন সন্ত-সন্ন্যাসীদের সংজ্ঞা দিতে লিখেছিলেন 'এমন জন যাদের কাছে নীতিশাস্ত্র প্রায় নন্দনশাস্ত্রে পরিণত। টু হুম এথিকস হ্যাভ বিকাম অলমোস্ট এস্‌থেটিকস।' এই বাচনে কোন অতিশয়োক্তি নেই। সুন্দরের প্রকাশ নানাতর। তাই সৌন্দর্যের সংজ্ঞায় পরম (অ্যাবসলুট) আছে বেশ কিছু। নিশ্চয়তা (সার্টেনটি) একটিও নেই, বললে কোন অত্যুক্তি হবে না। আইয়ুব সাহেবের দর্শন থেকে চারুকলা, সাহিত্যের দিকে অভিসার স্বাভাবিক গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে। অবিশ্যি নিছক দর্শনের উপর তার বেশ কিছু রচনা আছে তা অনেকটা ফ্রীলান্স সাংবাদিকের ব্যাপার। জনাব আইয়ুবের চিন্তায় প্রধান অবদান সাহিত্যের ভাষ্য-যোজনায় এবং আরো সীমিত করে বলা যায়, কাব্যের ক্ষেত্রে। আত্মার পরিব্রজনায় তিনি পান্থজনের সখা পেয়েছেন সুন্দরের এই বিশেষ সড়কে। সখা রবীন্দ্রনাথ।

রাসেল থেকে রবীন্দ্রনাথ—এই বিলম্বিত-লয় যাত্রা-রাগিণীর বিস্তার ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। পূর্বে উল্লেখিত পরিণাহ-ই সম্বল। আদর্শ পাওয়া কঠিন, পরিত্যাগ আরো দুরূহ। মির্জা গালিবের মত সবাই বলতে পারে না, 'পায়ের ফোস্‌কা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে ছিলাম। মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল পথ কণ্টকাকীর্ণ দেখে।'

যদিও উক্ত বিষয়ে ডিগ্রীধারী কৃতী ছাত্র, তবু আবু সয়ীদ আইয়ুব দর্শনও পরিত্যাগ করেন। অবিশ্যি আক্ষরিক অর্থে নয়। অর্থাৎ আনুগত্য ষোল আনা রইল না। তাঁর এই গীয়ার-পরিবর্তনের ফলে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য দীপ্যমান হয়ে উঠল। অবিশ্যি পরিত্যাগের প্রবণতা আইয়ুব সাহেবের ধাতে বর্তমান। আইয়ুবের মাতৃভাষা বাংলা নয়। অনেকের কাছে তা অপরিজ্ঞাত। ইদানীং যোশেফ আবার কেনানে ফিরে গেছেন। প্রিয় উর্দু জবান, মাতৃভাষা তার কাছে আর অবহেলিত আত্মীয় নয়। অন্য ভাষ্য-আগত আগন্তুকই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান কারুশিল্পী। যুগপৎ দর্শন এবং বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে প্রণালী-বিজ্ঞান, মেথডলজি পরিত্যাগ সম্ভব নয়। আইয়ুব সাহেবের রচনা-সৌকর্য এই খোঁট ধরেই সম্যকতা লাভ করে। অতিমাত্রার ফর্ম-সচেতনতার ফলে তাঁর প্রবন্ধ কখনও সৌষ্ঠব হারায় না। তার শব্দচয়ন জানান দেয় প্রখর শ্রবণ-শক্তির অধিকারী তিনি এবং প্রচণ্ড সঙ্গীত-প্রিয়তা ছাড়া তা লভ্য নয়। কয়েক, বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি অবহেলা দেখে এই বয়সেও তিনি রুষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন সংবাপত্রে বিবৃতি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারফত। শোপেনহাওয়ার তাঁর 'ওয়ার্লড এ্যাজ উইল এ্যান্ড আইডিয়া' গ্রন্থের তৃতীয় কি চতুর্থ স্তবকে কাব্যগন্ধী ভাষায় সঙ্গীতের প্রশংসা-কীর্তনে উচ্ছ্বসিত। দর্শন-জগতের বিলাসসামগ্রী বোধ হয় চারুশিল্পেই পরম পাওয়া যায়। আইয়ুব সাহেবের পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত তা-ই প্রমাণ করে। রচনাশৈলী অ্যাকাডেমিক মহলে প্রায় বৈয়াকরণিক ব্যাপার। মানসলোকের অপচ্ছায়াও সেখানে কারো চোখে পড়ে না। আইয়ুব সাহেবের রচনাশৈলীর পটভূমি তাঁর মানসলোক, যেখানে বক্তব্য দিব্যদৃষ্টি যা ভিজন-তাড়িত, ধ্যান-সঞ্চালিত। নিউটনের সতর্কবাণী একদম নিরর্থক নয়। পরাবিদ্যার হাত থেকে অত সহজে রেহাই মেলে না। রবীন্দ্রনাথের শান্ত-সুন্দরের জগতের সঙ্গে আইয়ুব সাহেবের রাখীবন্ধন ঘটে স্বাভাবিক নিয়মে। রোমান্টিক কবির প্রতি অনুরাগী তিনি। কিন্তু তাদের কবিতার মত প্রবন্ধের আকার-শৃঙ্খলার দিকে আদৌ অমনোযোগী নন। অবিশ্যি আইয়ুব সাহেবের গদ্য গীতল এবং মণ্ডন-পদ্ধতির দিকে মাঝে মাঝে ঝোঁক-বিশিষ্ট। প্রবন্ধের ভাষায় এক বচনে ও বহুবচনে উত্তম পুরুষের বেশ যাতায়াত দেখা যায়। রোমান্টিক কবিদের মন্ময়তা তিনি পরিত্যাগ করেননি। আইয়ুবের ইমারত সর্বতোভাবে স্থাপত্য-বিদ্যা সম্মত। বসবাসের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারে ভাড়াটেরা স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী।

আবু সয়ীদ আইয়ুব আনুগত্য বদলেছেন। বিজ্ঞানের পর দর্শন। দর্শনের পর সাহিত্য-চারুকলা। কিন্তু শান্ত-সুন্দরের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সদা-অটুট। কবি বদলেয়ারের আলোচনায় (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ) তা অতি স্পষ্ট। মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নে তিনি কল্যাণের সমর্থক। সৌন্দর্যের ব্যাপারেও তিনি ঐতিহ্য থেকে খুব বেশী দূরে যেতে নারাজ।

শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনায় আইয়ুব লিখছেন, 'কিন্তু শিল্পীরূপে তিনি কর্মজীবনের দায়-দায়িত্বের এবং তার মানসিক পটভূমির উর্ধ্বে দরজায় দাঁড়ানো মানুষ গলির কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে এবং নেড়ি কুত্তা সবই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কিন্তু এসবের পেছনে কোনো বৃহত্তর সত্যের ইঙ্গিত সর্বমানবিক এবং মানবোত্তর কোন রহস্যের কম্পমান যবনিকা যদি দেখতে না পান তাহলে তো তিনি কবি নন, সাংবাদিক মাত্র।'

(আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। ভারবি সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৯৬)

'মানবোত্তর' বিশেষণটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আইয়ুব সাহেবের এই সংজ্ঞায়, অভিনব গুপ্ত থেকে হেগেল–আরো বহু জনকে এক কামরায় জায়গা দিতে হয়। এমন কি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় ধ্যান-নিমগ্নতার পক্ষপাতী কান্ট অথবা বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাসের ক্ষণিক অনুপস্থিতির ওকালত নামাধারী শোপেনহাওয়ার –এবম্বিধ মানস বিহারী কেউ বাদ যাবেন না। ভলটেয়ার রসিকতায় এক বন্ধুকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে সংলাপ-প্রার্থী? তাহলে তৎপূর্বে তোমার শব্দগুলোর যথাযথা অর্থ আমাকে দাও। ডিফাইন ইয়োর টার্মস।' আইয়ুব সাহেব মানবোত্তর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের হদিস পাঠকের জানাননি। গ্রিক প্রজ্ঞা-দেবী মিনার্ভার বাহন গোধূলি-লগ্নেই স্ফূর্ততা পায়। কথাটা হেগেলের। কিন্তু অধম, আমাদের মত সাধারণ জন কতো কাল ছায়াচর হয়ে থাকবে?

আবু সয়ীদ আইয়ুব বোদলেয়ারের আলোচনায় কবির সভ্যতার প্রতি বিবমিষা, নৈরাশ্য, পংকিলতা-প্রীতি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। সামাজিক পটভূমির পরিচয় দেননি। ফ্রয়েড যাকে বলেছেন 'ইউরিনেস অফ সিভিলাইজেশন' বা সভ্যতার ক্লান্তি–এমন পরিবেশে কবি-মানসে উপরিউক্ত হিল্লোল স্পর্শ লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। য়ূরোপীয় সভ্যতা চারশ বছর আর এক লগ্নে উপনীত। স্পেংগলারের সিদ্ধান্ত উড়িয়ে দেওয়া চলে না, তাঁর যুক্তির বুনানি প্রস্তাব যতই শ্লথ থাক। বোদলেয়ারের সমসাময়িক নীৎসে অল্প সময়ের ব্যবধানে আর্তনাদ করে ওঠেন, 'অ-নৈতিকতা নৈতিকতারই আর এক রূপ। চোর বদমাস খুনি গুণ্ডারাই সততায় প্রতিষ্ঠিত। এবং নৈতিকতার গায়েনরা ভণ্ডামির মুখোস-সজ্জিত। প্লেটো থেকে হেগেল সকলেই রিয়্যালিটি, সত্তার ঝুট বয়ান-দাতা। তাঁরা জীবনকে করেছে বে-আব্রু বেইজ্জৎ। নার্থিং হ্যাজ বিন মোর ডেয়ারলি বাট দ্যান লিটল বিট অফ রিজন এ্যান্ড হুইচ ইজ নাউ দি বেসিস এফ আওয়ার প্রাইড। বড় চড়া দামে ক্রীত বিচারশক্তি এবং তা-ই নাকি আমাদের দেমাকের বুনিয়াদ।' বিচার-শক্তির প্রতি পর্যন্ত নীৎসের অমন অনাস্থা। পশ্চিমী সভ্যতার সকল মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নীৎসের জেহাদ। তা বিবমিষার এক ধরনের রকম-ফের। আইয়ুব সাহেব ফোকাস কিছু ব্যাপক করলে, আমরা উপকৃত হতাম। রবীন্দ্র-সমীক্ষায় তিনি কাব্যের অন্তর্শ্বাক্ষীর উপর নির্ভর করেছেন, যদিও বলেছেন, রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশে ভারতীয় ভাবধারার ও সৃষ্টিকর্মের পূর্বাপরতা যতখানি লক্ষণীয়, অপূর্বতা তার চেয়ে ঢের বেশী। তাঁর অপূর্বতা ভুঁইফোড় ছিল না, দেশের মাটির মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত এবং শক্ত তার শিকড়।

(–আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। ভারবি সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১০)

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানলোক ছেড়ে অনুভূতির ময়দানে ছুটে যেতে হয় তাজা বাতাসের জন্যে। রাসেলের সুদীর্ঘ জীবনে আঁকবাঁক অন্তহীন। তাঁর আত্মচরিতের মুখবন্ধ স্মরণীয় যেখানে প্রেমের গলায় তাবৎ অমূল্য মালিকা পরিয়ে দিতে তিনি তৎপর। পোরর্ট্রেট ফ্রম মেমারি অ্যান্ড আদার এসেজ (১৯৫৬ সনে প্রকাশিত) গ্রন্থে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের প্রতি সমীহা-বর্ষণের অভাব বোধ করেছেন রাসেল মানব-কল্যাণে অভিমুখী সম্যক-সচেতন প্রজ্ঞার। ১৯৬৫ সনে ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সম্মুখে জনতার ভিড়ে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে ঐ জ্ঞানযোগীকে দেখার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। আত্ম-অন্বেষণের সততায় চির-পরিব্রাজক শেষে কর্মযোগী। এক যুগে আণবিক বোমা নিক্ষেপের সমর্থক, পরবর্তী কালে সকল মারণাস্ত্র

নিষিদ্ধকরণের আর্জি নিয়ে হন্যে হয়ে ফেরেন দেশদেশান্তর।

মনীষীদের মতে, জাতির গঠনযুগে বিচারশক্তির (সেন্‌স) উপর এবং অধঃপতন যুগে অনুভূতি-প্রবণতার (সেনসিবিলিটি) উপর জোর পড়ে বেশী। কেবল উন্নতি-শিখরে দুই প্রবণতারে ভারসাম্য ঘটে। কাল-ধর্ম কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে।

তাই আইয়ুব-অনুরাগীদের কাছে কিছু প্রশ্ন কিছু অভিযোগ থেকে যায়। ভাষ্য, ধীশক্তির (ইনটারপ্রেটেটিভ ফ্যাকালটি) ক্ষেত্রে যিনি এমন পারঙ্গম, তিনি কেন কেবলমাত্র নান্দনিক কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ রইলেন? এই উপমহাদেশ ত শত অন্ধতার জঙ্গল। সেখানে মশালবাহীর প্রয়োজন সমধিক। জনাব আইয়ুবের ভূমিকায় রসিকজনদের মুনাফা বিস্তার। তবু আক্ষেপ থেকে যায়। অবিশ্যি চিন্ত াবিদ, অথবা শিল্পীর জন্যে কোন আবশ্যিক পথনির্দেশ যুক্তিযুক্ত নয়। আপন মানস গঠন-অনুযায়ী কেউ ক্লেদ পরিষ্কার, কেউ বিকল্প রূপের ঝলক সৃষ্টির জন্য ব্রতী হন। গানের পংক্তিতে রূপ দিয়ে ভোলানোর কথা অস্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথের মহতী বিপুল অবদান ত রূপেরই অনুশীলন।

বিগত চার দশক থেকে অজস্র যন্ত্রণা-বিদ্ধ এই উপমহাদেশ। আত্মহত্যা যজ্ঞের ক্রম-পর্যায়ে শুরু হয় যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস বর্বরতা এবং দেশ বিভাগ। আইয়ুব সাহেবের সংবেদনশীল মানসপটে প্রচণ্ড অভিঘাত স্বাভাবিক। নান্দনিক দ্বিতীয় পথই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রতীচ্যের নাগরিক ইমানুয়েল কান্ট অন্ধকারে অনেক তীরন্দাজির পর তাঁর 'ক্রিটিক অপ পিওর রিজন্‌ গ্রন্থে' একদম শেষ প্রান্তে হেঁকে ওঠেন, 'দি ক্রিটিক্যাল পথে ইজ এ্যালোন ওপেন...বিচারশক্তির পথই একমাত্র উন্মুক্ত সড়ক।'

আবু সয়ীদ আইয়ুব যেন প্রাচ্যের ঐতিহ্যে উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে কণ্ঠ মেলানোর প্রয়াসী–

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শক্তং নিরবদ্যম নিরঞ্জনম
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধন মিবানলম
য়দা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িয়ান্তি মানবাঃ
তদা দেবমাবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।

চামড়া সংকোচন মারফত যেমন গোটানো যায়, আকাশকে মানুষ তেমনি গোটাতে সক্ষম। তখন নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন, মুক্তির পরম সেতু এবং নিরিন্ধন অগ্নি-সদৃশ সর্বোপরি বিবর্জিত জ্যোতির্ময়কে না জেনেও দুঃখের অবসান সম্ভব।

–শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার সিগ্‌ন্যাল সাংস্কৃতিক পটভূমি

ইউরোপে নাৎসী আমলে সুডেটান চেক্-নাগরিকেরা রাতারাতি জার্মান ব'নে গিয়েছিল, বাঙালী মুসলমান রাতারাতি পাকিস্তানী। রাষ্ট্রধুরন্ধরদের খামখেয়ালীপনা ইতিহাস দুই ক্ষেত্রেই সহ্য করেনি। পুরাতন ঘটনা। তবু পর্যালোচনার জন্য আবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

কীভাবে বাঙালী মুসলমানের ক্ষেত্রে বর্তমান ঐতিহাসিক পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠল?

এই প্রশ্ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অনেকের সামনে খাড়া ছিল। জবাবের এক জায়গায় কোন দ্বিমত ছিল না : সাম্প্রদায়িক চেতনার উত্তরণ ঘটেছিল অলক্ষিতে এবং তা জাতীয়তাবাদের উদগ্র আকারে জানান দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র-মারফৎ অন্তর্নিহিত বহু স্ববিরোধের অবসান ঘটল।

এদেশে বিভিন্ন কালের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস নেপথ্যে থাক। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর সাম্প্রদায়িকতার একটা মধ্যবিত্ত রূপ দেখা গেল, যেখানে রাজনৈতিক তাগিদই অঙ্গাঙ্গী ধ্যানাদর্শ-সন্ধানে শূন্যে বা তৎপর। অন্তত মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে তা-ই দেখা গিয়েছিল। কৃষিপ্রধান দেশে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার খানাখোন্দল নানাভাবে জায়গা জুড়ে থাকে। খুব সহজে এই সব প্রবণতা সক্রিয় করে তোলা যায়। দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা, বোধ হয়, আরো সহজ। হিন্দু জমিদার এবং মধ্যবিত্ত সমাজের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে মুসলিম লীগের অপরিণত-মস্তিষ্ক নেতারা তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছিল। তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধি তার চাক্ষুষ প্রমাণ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তনের পরও ধ্যানাদর্শের মধ্যযুগীয় প্রবাহ শাসকগোষ্ঠী সর্বদা জিইয়ে রাখার জন্যে সজাগ ছিল। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে তার জঘন্য রূপ প্রকাশ পেল : কোন অমুসলমান ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না। মধ্যযুগীয় লেজুড় এখানেও খাড়া। প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধার কি পবিত্র চেষ্টা!

সধারণতঃ বলা যায়, আইয়ুবশাহী থেকেই পাকিস্তানে মিলিটারী ডিক্‌টেটরশীপের গোড়াপত্তন। কিন্তু বীজ আরো পুরাতন। একদম জন্মসূত্রেই প্রাপ্ত। গণতান্ত্রিক ভিত্তিহীন বুনিয়াদে আর কোন রম্য ইমারত গড়ে উঠবে? তাই দেখা যায়, যখনই কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন পাকিস্তানে দানা বেঁধেছে, তখনই শাসকশ্রেণী তা নির্মম হস্তে ভেঙে দিয়েছে অথবা পাঁয়তারা কষেছে বানচালের জন্য। ভাষা-আন্দোলনের রক্তাক্ত অধ্যায়ের পর বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব সরকারের শিরঃপীড়া স্বাভাবিক।

ধীরে ধীরে পূর্ব-পাকিস্তান উপনিবেশে পরিণত হয়নি। প্রায় গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিকতার আটঘাট বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার সিমেন্ট তা কংক্রিট করে দিয়েছিল অতি সহজে। অবিভক্ত বঙ্গদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কেন পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়ে পড়ল, একটা গোটা সম্প্রদায় কেন আত্মহত্যা প্রবণতার শিকারে পরিণত–তার হদিস প্রদান সমাজ তাত্ত্বিকের পক্ষেও কঠিন। বড় চড়া দামে এবং জান্-কোরবানী মারফৎ বাঙালী মুসলমান তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। আজও স্বাধীনতার পরে তার জের-বাহী। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক লিখেছিলেন যে অবিভক্ত বঙ্গদেশকে উপনিবেশে পরিণত করতে তাদের একশ' বছর লেগেছিল। বহু লোকক্ষয়, অর্থক্ষয়ের পর। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকবৃন্দের কিছুই ব্যয় হয়নি। তারা কাজটি নির্বিবাদে সম্পন্ন করেছে মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে। শুধু ইসলামের জিগীরের সাহায্য। সংস্কৃতির পলেস্তারা মাখিয়ে সাম্প্রদায়িকতার মারীবিষ পরিবেশন পাকিস্তানী প্রভুদের অন্যতম মোক্ষম কৌশল ছিল।

অনেকের মতে, পাকিস্তানী শাসকদের দূরদৃষ্টি থাকলে বর্তমান ঐতিহাসিক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। কিন্তু তারা ভুল করেন। প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথা চটি জুতার ফিতা। বর্ণবিদ্বেষ ছিল গোটা পাকিস্তান আন্দোলনের পুঁজি। সেখানে গণতান্ত্রিক কি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা অন্যায়। বর্ণবিদ্বেষের মধ্যেই শেষে এখন আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। হিন্দু-মুসলমান থেকে বাঙালী-বিহারী-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ তারা ভুলে যান, এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ খুব সহজে হাত গুটিয়ে নেয়নি। সম্মুখ দরজা দিয়ে প্রস্থানের পূর্বে তারা ট্রোজান ঘোড়া ভেতরে রেখে গিয়েছিল যেন খিড়কী-পথে আবার সহজে ঢোকা যায়। ঘটনাপ্রবাহ সেই খাতেই এগিয়েছে। পাকিস্তানের সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি চুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণ করে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশকরণে পাকিস্তানী প্রভুদের দোসর ছিল। "বড়া তরফ" "ছোটা তরফের" স্বার্থ সম্পর্কে একদম নির্বিকার থাকবে, এমন কখনও হয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে মার্কিন ভূমিকা তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে 'ছোট তরফ' ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সে-ক্ষতি 'বড়া তরফের'-ও। কারণ, পুঁজি ছাড়াও, ভূমণ্ডলিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে নজর রাখতে হয় বৈকি। গরজ বড় বালাই। তাই মার্কিন রাষ্ট্রনায়কেরা পাকিস্তান প্রেমে গদগদ থাকেন। ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলো উপনিবেশে যা-কিছু প্রগতিবিরোধী, উন্নতির অন্তরায়– তারই লালন-পালনে এগিয়ে আসে অতি উৎসাহের সঙ্গে। সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে যুক্তি বিচারহীন ধর্মের জিগীর বড় কার্যকর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জামাৎ-ই-ইসলামীর মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের সঙ্গে তাই নির্বিবাদে হাত মিলাতে পারে। অদ্ভুত এক কূটাভাষ। উন্নত জাতি কিন্তু উপনিবেশে রাজনৈতিক আঁতাত মধ্যযুগীয়তার সঙ্গে। শহীদ বুদ্ধিজীবিদের হত্যার পেছনে সভ্য জাতির পরোক্ষ হাত ছিল, অনেকে তা জানে না। কারণ বর্বর মানসিকতা জিইয়ে রাখার পেছনে তাদের ভাবধারা-গত মদৎ থাকে।

অনুন্নত দেশে সমস্যা নানা। তা সমাধানেরও ক্ষমতা সীমিত। তাই অগ্রগণ্য জরুরী সমস্যার দিকেই প্রথমে হাত বাড়াতে হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সব সময়ই এই দৃষ্টি ঘোলাটে করে রাখে। তাই পাকিস্তানে সহসা টেলিভিশনের আবির্ভাব ঘটে। অনেক উৎকট সমস্যার ভারে যখন জনসাধারণ জর্জরিত তখন অবসর বিনোদন অগ্রগণ্য হতে পারে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পাকিস্তানের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রশাসন ক্ষেত্রে পূর্বেই নাক গলিয়েছিল। তারই জের দেখা যায়, অবসর বিনোদনের ওই রূপে। টেলিভিশনের প্রথম অনুষ্ঠান ধর্মের জিগীর। ইমেজ সহ তা জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তিবিচার পশ্চাতে না থাকলে এই গণমাধ্যমে বা ম্যাস-মিডিয়ার অভিঘাত কত প্রচণ্ড রূপে ক্ষতিকর, তা কাউকে বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রায় পঁচিশ বছর পাকিস্তানী শাসকেরা ধর্মের কীর্তন অব্যাহত রেখে শেষ পর্যন্ত আল-বদর রাজাকারের জন্ম দিতে পারে। কারণ, পেছনে উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই, কায়েমী স্বার্থের বরকন্দাজ-সৃষ্টি। যুক্তিবিচার-হীন ধর্মের জিগীর এমনই ফল ফলে। তার সঙ্গে মানবিক শ্রেয়বোধের কোন সম্পর্ক থাকে না। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের মার্কিন উপদেষ্টারা অমন বিলাস উপকরণ ঢুকিয়েছিল পাকিস্তানে। যুক্তিবাদ তথা আধুনিক বিজ্ঞানের পরম উপস্থির ক্ষেত্রের হেরফের ঘটলে চরম ধর্মান্ধতা এবং বর্বরতা বিস্তারের সহায়ক হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের এমনই মহিমা!

তদুপরি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কংকাল চিরদিনই শীর্ণ। কিন্তু দেশী এবং বিদেশী শকুন নানা স্বত্বভোগে সংখ্যায় প্রচুর। তাদের প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতার ঠাট বজায় রাখতে বেজায় তৎপর। কারণ, সেই অন্ধকারেই বঞ্চনার মস্‌নদ নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন চালাকিই টিকল না। বাঙালী মুসলমানকে তাঁদের দৈনন্দিনতা পরিবেশ-সচেতন করে তুলছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণী অবিশ্যি বেশ স্বচ্ছল। কারণ, উঠ্‌তি পত্তন এবং সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু তারাও যখন জাতীয়তাবাদের জগঝম্প-রবে উত্তাল অস্থিরতায় রণমূর্তি ধারণ করলে, তখন বাঙালী স্বজাত্যবোধের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভাবতে হয়। যুগযুগান্তের সংস্কৃতি-জাত চেতনার চেতিয়ে দেওয়া দাবদাহ যে জানান্ দিয়ে গেছে, পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের জন্মকথায় তা পরিষ্কার। তাই 'কাফের' রবীন্দ্রনাথের আবার প্রত্যাবর্তন ঘটে ইসলামী রাষ্ট্রে। সূর্যসেন আর বিধর্মী থাকেন না, জাতীয় নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হন। গোত্র-পরিচয় সম্পর্কে নানা মতভেদ সত্ত্বেও লালন

ফকীর ফিরে আসেন তাঁর মানবিকতা-মন্ত্রের জন্যই। এমন বহু নজীর সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায়। যেমন প্রখ্যাত শিল্পী রশীদ চৌধুরীর কাছে মা-কালী বা দুর্গার মূর্তি 'মোটিফ' হিসেবে ধরা দেয়, একদা নজরুল যা করেছিলেন, শ্যামাসংগীতের ক্ষেত্রে। জাতীয়তাবাদের বন্যায় এইভাবে দেশ অখণ্ড একাকার হয়ে ওঠে তার সকল ঐতিহ্যসহ।

স্বৈরশাহীর শবাধারে এক একটি পেরেক পোঁতা হয়েছে বাঙালী মুসলমানের এই সাংস্কৃতিক অভিযানে। ফলে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির বিলোপ স্বাভাবিক। এইভাবে তৈরী হয়েছিল বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের সড়ক। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সক্রিয় ছিল। পরিণামে, সাম্প্রদায়িকতার দাঁতাল-মুখ ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যায়।

কিন্তু তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগীয়তার অবসান ঘটেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামাৎ-ই-ইসলামীর মত পার্টি শতকরা আট ভাগ ভোট পায়। আপাততঃ লেজ গুটোলেও তা সুযোগমত ফণা বিস্তার করবে না, এমন ধারণা নিতান্ত আত্মসন্তুষ্টি এবং অন্যায়। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী খর্পর যখন ওই নোংরা প্রবৃত্তির গোপন পালকপিতা পিতা সেজে বসে থাকে প্রত্যেক অনুন্নত দেশে। সাম্প্রতিক ধর্মীয় সম্পর্কজাত পার্টি কর্তৃক বিদ্বেষের হলাহল অনেক জায়গায় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকে, পূর্বোক্ত মন্তব্য আরো দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করা যায়। এই সঙ্গে আরো স্মরণীয়, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী আংশিকভাবে স্বৈরশাহী এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদপুষ্ট ও বৈদেশিক সাহায্যে তহ্‌বিল লালিত। ফলে, নানারূপ দুর্বলতার শিকার। তাদের মেরুদণ্ড সবসময় ঋজু, এমন বলা চলে না।

তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সতর্কতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর হয়ত হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদির জিগীর তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। কিন্তু অন্য দিক থেকে আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। যে-মধ্যবিত্ত নিজেদের সম্প্রসারণের তাগিদে অসাম্প্রদায়িক ভাবাশ্রয়ী, ঠিক ওই কারণে আবার উগ্র দেশপ্রেমের অছিলায় নানা সামাজিক উৎপাতের উৎস হতে পারে। জাতি-বিদ্বেষের নজীরের জন্য ত ইউরোপ সামনে রয়েছে। তার পরিণামও সকলের জানা। সংস্কৃতিসেবীদের এই দিকে বিশেষভাবে সতর্কতা প্রয়োজন। উগ্র স্বাদেশিকতার মোহ শুভ্র-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে। সংস্কৃতি শেষাবধি কোন স্থানকাল পরিবেশ উদ্ভূত হলেও আপন-মাহাত্ম্যে বিশ্বজনীন।

পাকিস্তানী শাসকদের এই জ্ঞান আদৌ ছিল না। তাই অতি সতর্কতার সঙ্গে তারা যে অসংখ্য বেড়া দিয়েছিল, সেই বেড়াই পরিণামে সব ফসল ভক্ষণ করে বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজ্জ্বলিত নিমেষে নির্বাপিত
ফজলুল হক

"এই যে–হক সাহেব!"

পিছু-ডাক।

তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন। তার স্বপ্নিল কালো দুই চোখ আপনার মুখের উপর। অবয়ব শ্যামল, তিনি খড়্গ-নাসা, আদলে চিন্তান্বেষী ছাপ আর চোখে সর্বদা এক রকমের ঢুলুঢুলু আচ্ছন্নতা। ফজলুল হক সাহেবের পারিবারিক ডাকনাম ছিল দুলু। দৃষ্টির ভেতর তারই প্রতিধ্বনি। সম্বোধনের পর আরো দেখার মত ছিল তাঁর ঠোঁটে মিহি হাসির রেশ, যেন মাথার উপর হাজার কাজের তাড়া হটিয়ে তিনি অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে তৎপর। হাঁটার সময় শরীর ঈষৎ সামনে ঝুঁকিয়ে দিতেন ফজলুল হক, ধুতির লম্বা কোঁচা এক হাতে তখন ধরা।

এমন লেবাসে বর্তমানে বাঙলাদেশে মুসলমান কোন উচ্চ বা নিম্নমধ্যবিত্ত আর চোখে পড়বে না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বে বাঙালী শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক পরিচ্ছদ-রূপে পাজামা-পাৎলুন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়নি।

কিছু পাশ কাটিয়ে একটু অতীতের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়। কারণ ফজলুল হকের গল্পগুলোর বয়স পাকাপাকি আটত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর। লেখকের সৃষ্টি-উপভোগ এবং স্রষ্টাকে যথা-মর্যাদা দিতে সেই কালের কিছু আভাস অপরিহার্য।

খুব পুরাতন শরীফ খান্দানী মুসলমান মাত্র পাজামা পরত সেকালে। নচেৎ ধুতিই সাধারণ চালু লেবাস। লোকান্তরিত নজরুল, সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহ্‌মদ প্রমুখদের ধুতির আচ্ছাদনে আমারই স্বচক্ষে দেখা। মৌলানা আকরাম খাঁ পরতেন সাদা খদ্দরের তহ্‌বন্দ, লুঙ্গী। সাবেক কয়েকজন পূর্বসূরীদের নাম করলাম মাত্র কালের ইঙ্গিতটুকু দেওয়ার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্র ধরেই বেশ-পরিবর্তনের কাণ্ড ঘটে। মুসলিম লীগের আন্দোলনে মুসলমানদের স্বজাত্য বা আইডেনটিটির প্রশ্ন সোচ্চার এবং ক্রমশ প্রসারিত হয়। তখন মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ধুতি হটে যেতে লাগল। দেশের আপামর মুসলমান জনসাধারণ ত লুঙ্গিধারী। দরিদ্র জনের লেবাস নিয়ে অত-বাছ-বিচার বা বিলাসিতা পোষায় না। আজও নেই। বর্তমানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সকলেই পাজামা পরে সামাজিকভাবে অথবা ইংরেজদের পাৎলুন জোর চালু। স্বাজাত্যের প্রশ্ন এক কালে কেষ্ট ঠাকুরের মত বসন ধরেও টান দিয়েছিল। অবিশ্যি এখানে গোপ-বস্ত্র। মুসলমান গোপিনীদের বসনে কোন টান পড়েনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জাগতিক ঐশ্বর্য-সম্পদ বৃদ্ধির সমান্তরাল পাজামা, গারারা দোপাট্টা ইত্যাদি এসে জোটে বাঙালির পাঞ্জাবী প্রভুদের অনুকরণে। স্বাজাত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন এইভাবে বসনের দিকেও হাত বাড়ায়। অবিশ্যি মুসলিম লীগের নেতারা জানতেন না, পাজামা পারসিকদের লেবাস। অগ্নিপূজক ইরানীদের সংস্পর্শে আরবরা সভ্যতার দিক থেকে অনুন্নত তাদের সকল খস্‌লৎই পরিত্যাগ করে। এগারো শ' বছর পরে তেল্‌তেলে মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে একই কাণ্ড ঘটছে, পশ্চিমের উন্নত খ্রীস্টান সভ্যতার সঙ্গে মহব্বতের ফলে। প্রিয় নবী মোহাম্মদ (দঃ) পরতেন তহ্‌বন্দ্‌, আজও যা এদেশে দরিদ্র কৃষক-মজুরের কাছ-ছাড়া হয়নি। বহু মূর্খই জানে না, পৃথিবীর যে-কোন সাংস্কৃতিই অন্যান্য বহু সভ্যতার সমাহার।

উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকেই মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে নানা সমস্যার আত্মিক বুদ্বুদ টগ্‌বগ ফুটছিল। কিন্তু তখনও বাষ্পের আকার গ্রহণ করেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে তিরিশ সন পর্যন্ত মুসলমান নব্য ইংরেজী শিক্ষিতদের ভেতর লাভা উত্তপ্ত হতে থাকে, পরে তা সামাজিক অগ্ন্যুৎপাত রূপে ফেটে পড়ে। কবি নজরুলকে এই কালের কালাপাহাড়ী প্রতিধ্বনি বলা যায়। মৌলানা আকরাম খাঁ তখন তাঁকে "কাফের" ফতোয়া দিতে ইতঃস্তত করেননি। মূল তাৎপর্য, সামাজিক শক্তি-সংঘাতের দুই ধারার দুই মুখপাত্রের ডুয়েল বা দ্বৈরথ। ঢাকায় কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন (সৈয়দ পদধারী হয়েও যিনি নামের পূর্বে সৈয়দ লিখতেন না) প্রমুখের (শিখা-গোষ্ঠী নামে অভিহিত) সোচ্চার যুক্তিবাদী জীবনের সঙ্গে রাখী-বন্ধন সামান্য অগ্র-পশ্চাত প্রায় একই সময়ের ঘটনা। মনে রাখা দরকার, এসব সামাজিক টগ্‌বগানির প্রক্রিয়া নৃত্যমান, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্টিল-ফ্রেমের মধ্যে। এক কথায়, একই সম্প্রদায়ভুক্ত দুই শ্রেণীর বৃটিশ গোলামের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এক দল, নব্য মুসলমান, অন্য পক্ষ ঐতিহ্যবাদী সনাতন-পন্থী। মৌলানা আকরাম খাঁ যেমন ইংরেজের দাস, হালচালে নব্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও তেমন দাস। এই দ্বন্দ্ব স্বাধীন মানুষের সঙ্গে স্বাধীন মানুষের নয়। বরং, গোলাম বনাম গোলাম। স্বাধীন মানুষের চেতনা এবং গোলামের চেতনা এক নয়। একথা কারো চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। ফলে, সামাজিক জীবন-প্রবাহ আর স্বাভাবিক পথ খুঁজে পেল না। দেখা গেল সামাজিক প্রশ্নে যারা প্রগতিশীল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারাই সনাতনী ফোর্সের সঙ্গে আপোষ-রফা করে বসল। আবার মৌলানা আকরাম খাঁ গাঁটছাড়া বাঁধলেন তারই একদা ফতেয়া প্রদত্ত "কাফেরদের" সঙ্গে। মধ্যবিত্ত চরিত্রের দোলাচল-ভাবের এমন ঐতিহাসিক নজীর অবিশ্যি প্রচুর আছে। সংখ্যালঘিষ্ঠের আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধিকারের দাবী আধুনিক য়ূরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার ফল। সেই মুসলিম লীগের ধ্যানাদর্শ কিন্তু মধ্যযুগের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। অস্বাভাবিকতার এই গোঁজামিল। তার ফল ত শুভ হোতে পারে না। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্থিব সুখসুবিধা প্রচুর জুটল। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির আর ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল না। পাকিস্তানের মোহে-প্রতারিত জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে বসল একদা-যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান সমাজের খাদেম-রূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল। স্বর্গীয় বিষ্ণুদের ভাষায়, সেবক এমন ঘাতক। গত ছত্রিশ বছরের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা কালের সাক্ষীরূপে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ফজলুল হকের জন্ম ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গল-বাড়ী গ্রামে। পূর্ববর্ণিত সামাজিক পটভূমি এবং ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যেই তাঁর ধরাধামে আগমন। পিতা কোব্বাদ আলি ছিলেন সেটেলমেন্ট অফিসার। বলা বাহুল্য, নব্য মানুষ। মাতা খুরশিদা বেগম। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে লোকান্তরিতা। পিতা অনেক অনেক আগেই পৃথিবী ত্যাগ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ফজলুল হক পাস করেন ম্যাট্রিক এবং পরে কলিকাতা যান ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪০ সনে তিনি দর্শন-শাস্ত্রে এম, এ পাস করেন।

ফজলুল হক ছিলেন আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্প্রতি সদ্য-লোকান্তরিত এক মনীষী মরফৎ, যিনি ছিলেন নেক্‌লেসের মধ্যমণি : আবু সয়দী আইয়ুব। আইয়ুব সাহেব আমার চেয়ে বয়সে দশ, ফজলুল হকের চেয়ে ন' বছরের বড়ো। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের সামাজিক লৌকিকতা-বন্ধন ঘুচে যেতে লাগল। ফজলুল হক ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সুহৃদে পরিণত হন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর আবু সয়ীদ আইয়ুব নাটকীয়ভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন এবং বেশ কিছুদিন স্বাভাবিকতা ফিরে পাননি। ফজলুল হকের সহপাঠী ছিলেন আইয়ুব সাহেবের এক ভাগিনা, হাবিবুর রহমান। সেই সূত্রে ফজলুল হকের ওদের পারিবারিক মঞ্চে প্রবেশ। আমি পৌঁছাই আকস্মিকভাবে। অথবা বলা যায়, স্বতঃই, কলিকাতা তালতলা এলাকার ওয়েলেশ্‌লী পার্কে (বর্তমানে হাজী মোহসীন পার্ক) বৈকালিক ভ্রমণের সুযোগে, আইয়ুব সাহেবও যেখানে নিয়মিত বায়ুসেবী। হাবিবুর রহমান ভারত সরকারের চীফ-আর্কিটেক্ট হয়ে বর্তমানে রিটায়ার করেছেন। দিল্লীর বিজ্ঞান-ভবন, কলকাতর গান্ধীঘাট প্রভৃতি সৌধ, স্মৃতিসৌধ তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয়।

আইয়ুবীয় পারিবারিক চক্র কিন্তু কালে কালে এমন বিপুল-পরিধি হয়ে ওঠে যে আমাদের প্রায় আউট হওয়ার উপক্রম। তাঁর ১৪ নং ওয়ালীউল্লা লেনের বাড়ীতে কতো জনের না সমাগম ঘটত! বাঙলা কাব্যের মাইল-স্টোন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে, সমর সেন; বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু; জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষত বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য হুমায়ুন কবীর, হীরেন মুখোপাধ্যায়। শেষোক্ত জন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে বুহ বছর পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। অকালে বসন্ত রোগে প্রয়াত প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের উদ্যোক্তা, দর্শনবিদ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে আমার এই বাড়ীতেই দেখা। শুধু যুক্তবঙ্গ নয়, ভারতের আরো প্রদেশে আইয়ুবীয় চক্রের প্রসার দেখা যায়। এই

বাড়ীতে আসতেন মারাঠী শিল্পী বিনায়ক মাসোজী, গুজরাটী লেখক-অনুবাদক বাচ্চুভাই শুক্লা, যিনি বরীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র এবং বাঙলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা লেখক-কে গুজরাটী সাহিত্য অঙ্গনে আত্মীয়তার শিরোপা দিয়েছেন তর্জমা মারফৎ। এখানে পৌঁছতেন গুজরাটী কোন এক এস্টেটের সুন্দরী রাজকন্যা সুশীলা আশর, যার রবীন্দ্র সংগীত গুজরাটী তর্জমায় শোনার সুযোগ আমার হয়েছিল। নিখুঁত বাঙলা উচ্চারণে রাজকন্যা যে-রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতেন, তাও হৃদয়-হরণ। সুদক্ষ জকির মত পিঠে সওয়ার, সুরের ঘোড়াকে বিরল দরাজ কণ্ঠে বাতাসে হাঁকিয়ে বেড়াতেন যে-গায়ক, বরোদার অধিবাসী ফৈয়াজ খাঁও আইয়ুবীয় বেষ্টনীর মধ্যে বাঁধা পড়তেন মাঝে মাঝে।

তিরিশের সেই আইয়ুবীয় চক্র মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বড় গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিবাদী মানবতাবাদের পতাকা হাতে থাকবে, সম্মুখ পদক্ষেপের প্রতীকরূপে। এমন মন্ত্রে ধ্বনিত এই আসর। সুতরাং নিছক সাম্প্রদায়িকতার স্থান সেখানে ছিল না। হিন্দু-মুসলমান অভ্যাগতদের তালিকা থেকে তা আঁচ করা যায় সহজে। সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী, ঠিক তারিখ মনে নেই, বোধ হয় ১৯৩২ সনে, আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ডক্টর হয়ে ফিরে এলেন। বরোদায় চাকুরী নিলেও ছুটিতে তিনি কলকাতায়। টগবগ গৌরাঙ্গ যৌবনের অগ্রদূত চোখেমুখে তপ্ত কটাহ-জাত খৈয়ের মত বাক্যচ্ছটার স্ফুলিঙ্গ সদা নির্গত। একাই আসর-মাৎ কীর্তনীয়া, বয়ান, কথকতা, অভিনয়, আখরদানে উপবিষ্ট নটরাজ। তখনও তিনি লেখক হননি। আরো বারো-তের বছর পরে তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি-শীর্ষে নিক্ষেপের ক্যাটাপুল্‌ট্‌ 'দেশে-বিদেশে'র পাণ্ডুলিপি আকারে শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আরো আসরী ছিল, আজ সকল মুখ মনে পড়ছে না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন কনিষ্ঠতম কিন্তু খ্যাতিমান কবি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আইয়ুব ভবনে প্রথম।

১৪ নং ওয়ালীউল্লা লেনের বাড়ী আবু সয়ীদ আইয়ুবের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, অন্যান্য শরীক ভাইবোনের সঙ্গে। দোতলায় উঠতে বাইরের দিকে থেকে দক্ষিণমুখী সিঁড়ি। তারপর সামান্য চারকোণা খালি জায়গা। তা বারান্দার মত ব্যবহৃত হোতো গরমের দিনে সন্ধ্যায় চেয়ার পেতে। পরে একটি বড় কামরা, যার উত্তর-পূর্ব কোণে ছোট বাথরুম। কামরার সঙ্গে পশ্চিমে সংলগ্ন আর একটা ছোট কামরা। আইয়ুব সাহেবের নিজস্ব বেড়রুম, পাঠকক্ষ সব এই স্বল্প আয়তনের মধ্যে। তার পেছনে দরজা ছিল পুরবাসিনীদের সঙ্গে অন্দরে যোগাযোগের জন্য। মুজতবা আলী বা কোন অতিথি এলে তাঁদের জন্যে বরাদ্দ ছিল পূর্বোক্ত বড় কামরা। এক সময় আইয়ুব সাহেব এখানে ছোট বিলিয়ার্ড টেবিল কিনে এনে খেলার আয়োজন করেন। আমরা আড্ডা ছেড়ে বিলিয়ার্ড খেলতাম। ফজলুল হক প্রথমে বেকার হস্টেল, পরে কলেজ স্ট্রিট ওয়াই, এম, সিতে চলে যান–যেহেতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকট। ওরা দুজনে বেশ সৌখীন দক্ষ বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯০৪-৪২ সনে আইয়ুব সাহেব ওয়ালীউল্লা লেনের বাড়ী বিক্রি করে তার বোনের বাড়ী (স্থপতি হাবীবুর রহমানের মা) পার্ক সার্কাস, পাঁচ নম্বর পার্ল রোডে চলে আসেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ। আমরা আসর থেকে খসে পড়লাম। অবিশ্যি ক্ষীণধারায় যোগাযোগ রইল। ফজলুল হক ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে ফিরে আসেন। আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৪৩ সন থেকেই ফজলুল হক সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হন দ্বিধান্বিত চরণ। সুধীন্দ্রনাথ তখন "পরিচয়" সম্পাদক। উন্নাসিক রূপে দত্ত-সাহেব গোটা কলকাতায় খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বৈদগ্ধ সম্পর্ক কোন প্রশ্ন তুলত না কেউ। তাঁর জহুরী-নয়নও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। উইলিয়াম ফক্‌নারের নাম তাঁর স্বদেশে আমেরিকায়ও তেমন পরিচিত ছিল না ১৯৩২ সনে। অথচ, তাঁর প্রথম উপন্যাস "সাউন্ড এ্যান্ড্ ফিওরী" তখনই "পরিচয়ে" সমালোচিত হয় উচ্চ প্রশংসায়। এবং সমালোচক স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আরো তিরিশ-বত্রিশ বছর পরে ফক্‌নার বিশ্ববিশ্রুত হয়ে ওঠেন এবং নোবেল প্রাইজ পান। ফজলুল হকের গল্প "মাষ্টার" প্রথমে "পরিচয়ে" বেরিয়েছিল। সম্পাদক খামখা প্রকাশ করেননি। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে-এই চর্তুমোহনা উৎসারিত আর এক বেগবান-স্রোত কবি স্নেহাস্পদ শামসুর রাহমান ফজলুল হককে কখনও দেখেনি কোনদিন। স্রষ্টাকে দেখেনি কিন্তু সৃষ্টি-বিমোহিত। স্বতঃপ্রবৃত্ত নিজের মন্তব্য সংযোজন করেছে স্বতন্ত্র রচনায়। ফজলুল হকের প্রতিভার ঝলক ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই অনেকের কাছে দৃষ্টিসুধা-রূপে দেখা দিয়েছিল। আরো দুই-তিনটি গল্প ফজলুল হক লেখেন। 'পরিচয়ের' মতই অভিজাত ত্রৈমাসিক হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গে' বেরোয় অল্প ব্যবধানে। অর্থাৎ, তাঁর প্রথম প্রকাশই যাচায়ের প্রধান কার্যকর কষ্টিপাথরে। তারপর চল্লিশ বছর অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেখকও নিজকে ধরাধাম থেকে অন্তর্হিত করে ফেললেন। ১৯৪৯ সনের ২৯ ডিসেম্বর ফজলুল হক প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ঢাকার নীলক্ষেতের নিকট নিজেকে চলন্ত ট্রেনের সামনে বিসর্জন দেন। এই আত্মাহুতি আজও রহস্যময় থেকে গেছে। বন্ধু-বান্ধব কিছু বলতে পারে না। এমনকি বর্তমানে স্কটল্যান্ড প্রবাসী তাঁর কনিষ্ঠ সোদর ডক্টর মোজাম্মেল হক কি ছোট বোন জাঁহানারা জিয়াউদ্দীন এবং সেলিমা হক কোন শুলুক দিতে অপারগ। দীর্ণ বঙ্গদেশ? সুহৃদ আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে থেকে বিচ্ছিন্নতা? জীবিকার সমস্যা বা হৃদয়ঘটিত কোন কিছু? কোন্ সমস্যায় জর্জরিত তাঁর অমূল্য প্রতিভাময় এমন জীবন তিনি স্বহস্তে বলি দিলেন? সবই অনুমানের ব্যাপার। কিনারা পাওয়া দায়। ফজলুল হকের অকাল মৃত্যুর জন্যে অনেকেই

আফশোষ করেন। কবি জসিম উদ্‌দীন ত শোনামাত্র কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন! অনেক জায়গায় কবি এই ট্র্যাজেডি-মুখর কাহিনী উচ্চারণ করতে পারতেন না, যুগপৎ দীর্ঘশ্বাস না মিলিয়ে। কবি জসিম উদ্‌দীন তাঁর "চলে মুসাফির" গ্রন্থে (১৯৫১ সনে প্রকাশিত্ পৃষ্ঠা ৭১) লিখছেন, "মুসলিম বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ফজলুল হক, যার ছোট গল্প যে-কোন নামকরা হিন্দু লেখকের লেখা ছোট গল্পের সমপর্যায়ে দাঁড় করানো যায়, বেকার জীবনের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া চলন্ত রেলগাড়ীর সামনে ঝাঁপাইয়া আত্মহত্যা করিলেন।" এই মন্তব্য অবিশ্যি জনশ্রুতি। কারণ, ফজলুল হক ধনী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের পরিবার প্রায় উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরে পড়ে। অহেতুক নয়, বিলাপের আবহ। চার বছর পূর্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত। টাট্‌কা ধ্যানাদর্শ। কিন্তু ফজলুল হক অমন হীনমন্যতা বোধে সায় দিতেন না, কবি যা করছেন। প্রতিভার অকাল-প্রয়ান সর্বতোভাবে মর্মদাহী। জহুরী আবু সয়ীদ আইয়ুব বা কবি জসিম উদ্‌দীন (উভয়ে আজ পরলোকে) জহরৎ চিনেছিলেন বৈকি। বিদগ্ধ পুরুষ, পরিশীলিত মননের অধিকারী ফজলুল হক দেশবাসীর কাছে অতি সামান্য পরিচয় রেখে গেছেন নিজের অসামান্য গুটি কয় রচনার আকারে। কালের থাবা পেছনে। ফজলুল হকের পাঁচটি গল্পের তিনটি মাত্র উদ্ধার করা গেল। আরো দুটি গল্পের কোন হদিস করা গেল না। তবু যা তিনি রেখে গেছেন, তা বহুকাল পরে জনসমক্ষে তুলে ধরার দীন প্রচেষ্টা যৌক্তিকতার গণ্ডীতে পড়ে কি না, তার বিচার-ভার পাঠকের উপর ন্যস্ত রইল।

ফজলুল হকের অন্যতম গল্প "মাছ ধরা"। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার চৈত্র-সংখ্যায় (১৩৫১ সাল) প্রকাশিত। গল্পের নামও অতি সাদামাটা। সমস্ত গল্পটিও একদম অলঙ্কার শূন্য। পাঠক ভোলানো কোন কৌশলের চেষ্টা পর্যন্ত নেই। স্টান্ট্-বিবর্জিত সমস্ত গঠন-প্রণালী। অথচ মানব-অস্তিত্বের অতি জটিলতম প্রশ্ন বিষয়বস্তু গল্পটির প্রাণকেন্দ্র। নানা মোহ মরিচীকার মধ্যে মানুষ বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পায়। নচেৎ আবেগ-রাজ্যে কোন স্থিতি পায় না। এক একজন অন্বেষক স্ব-স্ব ভাবে। গল্পের আলতুর কাছে বড়শীতে মৎস্যশিকার চরম সার্থকতা। কিন্তু ফরিদের কাছে তা ছুতো মাত্র। তার চোখে থাকে ঘাটের পানে তার প্রিয়তমা সোনাবীকে এক লহ্‌মা দর্শনের জন্য। এক দিক থেকে এই গল্প মোপাসাঁর বিশ্ববিশ্রুত কাহিনী "নেকলেস" এর চেয়ে গঠন-প্রণালীর দিক থেকে উজ্জ্বলতর। ফরাসী গাল্পিকের রচনায় কিছু অলঙ্কার আছে। এখানে তা অনুপস্থিত। মিথ্যা-মোহে জীবন-খোয়ার এক রমণীর ছবি এঁকেছেন মোপাসাঁ। জটীল জীবনধারা পটভূমি। কিন্তু ফজলুল হকের গল্পের পটভূমি নির্বিকার প্রকৃতি, মানুষের অস্তিত্বের পেছনে বা স্বপ্নালু পর্দার মত বিরাজ করে। গল্পে তারই ছোঁয়াচ ছড়িয়ে রাখেন ফজলুল হক। আল্‌তু পানিতে দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলে। কিন্তু এক ঘটি জলে পা ধুতে সে নারাজ। অসংগতিময় মানব-জীবন ধারার ইংগিত দিতে লেখক ভোলেন না। বাস্তব এবং স্বপ্নের সংক্রমণে গাঁথা সহজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরল সাধু গদ্যে লিখিত এই গল্প রসিক-জনের জন্যে মনোলোভা। ফজলুল হক দর্শন-শাস্ত্রে এম, এ ডিগ্রীধারী। বাঙলা সাহিত্যে 'মেটাফিজিকাল' বা অধিবিদ্যাগত এ-পর্যন্ত কোন গল্প লেখা হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর–এই ত্রিবেণী সঙ্গমের সম্পর্ক বাঙালী কোন গাল্পিককে ভাবিয়েছে কি না সন্দেহের ব্যাপার। ফজলুল হকের গল্পে যে-আভাষ মেলে, জীবিত থাকলে সাধনার পথে অনবদ্য কোন অবদান রেখে যেতে পারতেন : অধিবিদ্যা-ছায়াক্রান্ত কাহিনী। বাংলা সাহিত্যের এক দিকের দৈন্য ঘুচত।

দর্শনের ছাত্র কাল বা টাইম সম্পর্কে ফজলুল হকের কৌতূহল ছিল, স্পষ্ট ধরা যায়। "বুড়ী-মা" গল্প (১৩৫০ সালের পৌষ-সংখ্যা চতুরঙ্গে প্রকাশিত) কালের বহমানতার এক অদ্ভুত আভাষ দিয়েছেন তিনি। অতীত-বর্তমানে দ্বন্দ্ব থাকে। কিন্তু এক মুহূর্ত চলে গেলে বর্তমানও অতীত হয়ে পড়ে। তাই বর্তমান অতীতের অভিঘাত অনুভব করে, কিন্তু তা স্বীকার মারফৎ আমল দিতে নারাজ। গল্পের ছোট-বৌ তাই "মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসে।" কালের এক আশ্চর্য বিনুনি ছাড়াও ষাট-সত্তর বছর আগেকার যৌথ-পরিবার মুসলমান-অন্দরের নিখুঁত ছবি মেলে গল্পটিতে।

কিন্তু একই গ্রন্থকার আবার কঠিন দৈনন্দিনতার মুখোমুখি হন। তখন তিনি শক্ত মাটির উপর খাড়া সমস্যার শিং পাকড়ে ধরেন, যেখানে মানব-অস্তিত্ব বেষ্টনকারী স্বপ্নাচ্ছন্নতার নাম-গন্ধ থাকে না। "মাষ্টার" গল্পটি নানা দিক থেকে স্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) এদেশের তদানীন্তন প্রভু ব্রিটিশ সরকার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রসদ চাউল সংগ্রহ-সঞ্চয় করতে থাকে। ফলে, বাঙলাদেশব্যাপী খাদ্যের অনটন। প্রচণ্ড ধাক্কায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। ষাট লক্ষ বাঙালী এক বছরে প্রাণ হারায়। গ্রামে-গঞ্জে পথে-ঘাটে তখন কতো লাশ না পড়ে থাকত। "তেতাল্লিশের মন্বন্তর" নামে খ্যাত সেই ট্র্যাজেডি-দীর্ণ দিনের কথা আজও বিভীষিকা মনে হয়। এই দুর্ভিক্ষ, মহামারী। অন্য দিকে রাজনৈতিক ঘনঘটা। মুসলিম লীগের পাকিস্তান-প্রস্তাব পাস হয় ১৯৪১ সনে। মুসলিম লীগ তখন মুসলমান জনসাধারণের এক উত্তাল-তরঙ্গ রাজনৈতিক হৃৎপিণ্ড। অন্য দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও বিরোধ তখন তুঙ্গে। বামপন্থী আন্দোলন–সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী ধ্যানাদর্শের প্রসারও ঘটে এই কালে। ফজলুল হক এই পটভূমিকায় নির্বিকার দর্শক ছিলেন না। 'মাষ্টার' গল্প তার সাক্ষী। গল্পটি প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকার ১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। ইংরেজী সন ১৯৪৩। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতির সমাহার মেলে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে। ফজলুল হকের তা চোখ এড়িয়ে যায়নি। গল্পের নায়ক গ্রামের গরিব স্কুল মাষ্টার। সংসারে শুধু মা আছে। বৌ এলে ঘরে কুলোবে না। মাষ্টার তাই চৌচালা একটা ঘর তৈরী করতে চায়। কিন্তু "চৌচালা আর ওঠে না। কথায় কোন মুল্লুকে যুদ্ধ বাধিয়েছে। জিনিষপত্র কেনা হইয়া উঠিল দায়।" বিশ্ব-

AMARBOI.COM

অর্থনীতির এই পরোক্ষ উৎপাত। য়ুরোপে যুদ্ধ তার খেসারৎ টানে যুক্তবঙ্গের মানুষ। মাষ্টার গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে মাষ্টারি করতে গিয়ে উন্নত জীবন-যাপনের ধারা দেখে। এখানে সে তার 'অল্‌টার ইগো'র (বিকল্প অহম) সাক্ষাৎ পায় জমিদার বাড়ীরই ছেলে পঞ্চাননের মাধ্যমে। তার মুখে মাষ্টার শোনে–

মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট
শুকায়েছে কালস্রোত
কর্দমে মেলে না পাদপীঠ।

মাস্টার আরো শোনে, একদিকে ভোগের পাহাড়, অন্য দিকে চরম দুর্দশা, অকাল মৃত্যু, কোটী কোটী মানুষের জন্যে দুঃসহ দারিদ্র্য। মুক্তির কী কোন পথ নেই? অল্‌টার ইগো তারও জবাব দেয়, "উপায় সহজ। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান এ-টা নয়। এ হচ্ছে নির্বোধ অব্যবস্থা মানুষের গড়া। উৎপাদনকে প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগাও, লাভের যন্ত্রটাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দাও। ঘুণ-ধরা সমাজ দেখবে আপনা থেকেই সতেজ হয়ে আসছে।"

মাষ্টার গল্পের আধেয় থেকে ফজলুল হকের মানস-জগতের হদিস মেলে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতার বিষ কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করেনি। আবু সয়ীদ আইয়ুব ছাড়া ফজলুল হকের আমৃত্যু বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক প্রীতীশ দত্ত। উভয়ে এক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন, প্রেসিডেন্সী এবং ইউনিভার্সিটিতে সহপাঠী। অবিশ্যি বিষয় আলাদা। প্রীতীশ দত্ত অর্থনীতি এবং ফজলুল হক দর্শনের ছাত্র। সুখের বিষয়, দত্ত মহাশয় আজও জীবিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন, কিছুকাল পূর্বে অবসর-প্রাপ্ত। প্রীতীশ বাবুর সহায়তা ছাড়া ফজলুল হকের লুপ্ত গল্পগুলো চল্লিশ বছর পরে উদ্ধার সম্ভব হোত না।

সুস্থ জীবন বোধে অনুপ্রাণিত ফজলুল হক। তার মানস-প্রতিধ্বনি গল্পে নয় শুধু মৌখিক উচ্চারণেও তিনি দ্ব্যর্থহীন ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ফজলুল হক একবার চাটগাঁ আসেন। আমিও তখন ওই শহরের অধিবাসী। ট্রেনে ফজলুল হক দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কামরার দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু জানালা আর বন্ধ করেননি। সকালে ঘুম ভাঙার পর তিনি দেখেন সুটকেস গায়েব, তার অনুসারী জুতা পর্যন্ত। তিনি সোজাসুজি আমার ফিরিঙ্গী বাজারের বাসায় চলে আসেন। আমাদের বাড়ীর নাম ছিল 'মিলন মন্দির।' শুল্ক-বিভাগের সৈয়দ মুজিবুল হক, বোরহান উদ্দীন আহমদ (তখনও পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেননি) আমরা একসঙ্গে থাকতাম। 'মিলন মন্দির' নাম সার্থক এবং চতুরঙ্গ পূর্ণ করতে ফজলুল হক এসে পৌঁছালেন। এক সঙ্গে টানা তিন দিন তাঁর সাহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ফজলুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হকের মানবতাবাদী মানসের সোচ্চার প্রতিধ্বনি 'মাষ্টার' গল্পে আজও পাওয়া যায়। গল্পের মসজিদের ইমাম কাজি সাহেব এক গ্রামে পঁচিশ বছর থাকার পর হঠাৎ চলে যাচ্ছেন। যেহেতু, তার ধর্মানুভূতি আহত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় চাউল নয়, কাপড়ও পাওয়া যেত না। লাশের কাফন ঠিকমত দেওয়া হয় না। কোন রকমে মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া বেদাৎ। তাই তিনি গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন। মাষ্টারের অল্‌টার-ইগো প্রতিধ্বনি তোলে, "প্রচলিত ধার্মিকতা কায়েমী স্বার্থের ব্রহ্মাস্ত্র। ওর আসল রূপ বুজরুকী আর আত্মপরতা।"

এই গল্পের মধ্যে মম্বন্তর-আক্রান্ত বঙ্গের সাধারণ মানুষের মর্মন্তুদ ছবি পাওয়া যায় কালু ধোপার মধ্যে। সমাজের উচ্চস্তরের প্রতিনিধি রায় বাহাদুর। শহরে জাপানী বোমার ভয়ে গ্রামে আসেন "বৃহৎ আদর্শ লইয়া।" কয়েক দিনে সখ মিটে যায়। কথাশিল্পী ফজলুল হক বর্ণনা দিয়েছেন, 'কিন্তু বাসের অযোগ্য জায়গায় বাস করা যায়, কি করিয়া। আদর্শ লইয়া বাঁচিয়া সুখে আছে। আদর্শ শুদ্ধ মরিয়া লাভ কী?

নানা দিক থেকে মাষ্টার গল্প ১৯৪৩ সনের নির্মম প্রামাণ্য চিত্র। ফিল্মের ট্রাক-শটের কায়দায় কথাশিল্পী একের পর এক দৃশ্যের শট নিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের, নানা পরিবেশের। এই বর্ণালী সমারোহে গল্পের প্রাণবস্তু। তাই মনে হয়, গঠন-শিথিল। ফজলুল হক শুধু সমস্যা উত্থাপন করেননি, সমাধানেরও ইংগিত রেখে যান বৃটিশ আমলের পটভূমিকায়। "মাষ্টারকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।" আর গ্রাম-বাঙলার বক্ষদীর্ণ হাহাশ্বাসের প্রতীক বৃদ্ধা রঙীর মা বলে, "মাষ্টারে উপর টগ্‌গায়। অর্থাৎ ভূতে ধরিয়াছে।"

AMARBOI.COM

শিল্পোত্তীর্ণ সদর্থক পেশল জীবন-বোধের এমন কাহিনী, বাঙলা সাহিত্যে খুব বেশী মেলে না। চল্লিশ বছরে জনজীবনে মৌলিক পরিবর্তন অনুপস্থিত। দুঃখের দরিয়া আজও পূর্বের মত বলবান এবং বহমান। আমার ধারণা গল্পের আবেদন সহজে ফিকে হওয়ার নয়।

"এই যে—হক সাহেব।"

আজও পিছু ডাক দেওয়া যায়।

কিন্তু অনন্তের যাত্রী, লোকালয়ের আড়াল পথিক আর ফিরে চাইবেন না, শোকান্বিত উদ্‌গ্রীব চোখের দৃষ্টি যতই অপলক থাক। ফজলুল হকের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ আর কেউ পাব না। তিনটি গল্প শুধু অভিজ্ঞান হয়ে রইল—তাঁর উত্তর-সুরিদের জন্য, যেখানে শাশ্বত বৃহত্তর মানবতার পটভূমিকার মধ্যেই দুঃসহ সাময়িক জীবনযাপন-জাত প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ইঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন, শিল্পীজনোচিত সংবেদনশীল দক্ষতায়। তাই তাঁর শারীরিক অন্তর্ধান অস্বীকার করা যায়। সেখানেই এখন সঞ্চিত রইল সকল সান্ত্বনা।

ইতিহাসে বিস্তারিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৫, চৈত্র ১৩৯১
প্রকাশক : তুরহান স্মৃতিলোক, ৭ মোমেনবাগ, ঢাকা।

উৎসর্গ

মাদ্রাসা আলিয়ার মোদাররেস থাকা-কালীন অকালে জান্নাৎবাসী বন্ধু
মৌলানা মোস্তাফিজুর রহমান
সাহেবের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত
এবং
মাদ্রাসা আলিয়ার অবসর-প্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল বিদ্বান মিত্রজন
মৌলানা জালাল উদ্দীন
সাহেবের
করকমলে কৃতজ্ঞতাসহ উৎসর্গীত
যিনি ধর্মের প্রকৃত পরিচয়-দানে এবং 'ক্রীতদাসের হাসি'
উপন্যাস-রচনায় আমাকে একদা প্রভূত সাহায্য করেছিলেন

AMARBOI.COM

সূচীপত্র

ইসলামী নবতরঙ্গ
মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদের সমস্যা
দাসত্বের খোঁয়ারি
ঝুটা চেতনার ফাঁদ
কোম্পানি আমল :
দফা দুই
স্বপ্নচারীর অন্তর্ধান
গণতান্ত্রিক শিকড়ের অভাব
চৌ এন লাইয়ের নিকট খোলা চিঠি
রাজনৈতিক কার্বাঙ্কল

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

অশ্রুপাত-সহ কখনও বইয়ের ভূমিকা লিখতে হয়নি। জীবনের এই প্রান্তে তা-ও ঘটল।

আরামবাগ এলাকায় ছোট্ট প্যাপিরাস প্রেস। অপ্রতুল তাদের উপকরণ। কিন্তু রুচি ও সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য থাকায় তাদের ছাপা বড় মনোরম। প্রেসের তিন সেনাপতি হেলালউদ্দিন, মোতাহার হোসেন ও নিরঞ্জন দত্ত। তাদের রেজিমেন্টে আছে আবদুল হান্নান, জাকির হোসেন, জামশেদ আলম, মোঃ মহসিন, হুমায়ুন কবির, দুলাল চন্দ্র দাস, পল আনিস, আমিনুর রহমান এবং দুই দক্ষ মেশিনম্যান আবুল হোসেন ও হাসমত উল্লাহ। এই বাহিনী নিয়ে অনুন্নত দেশে রুচি-বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় প্যাপিরাস।

আমার এই পুস্তক ছাপার ব্যাপারেই এদের সঙ্গে ঘন-ঘন সাক্ষাৎ–যদিও পরিচয় আগে থেকে। হেলালউদ্দিন বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ পরিচিত। গত বিষ্যুৎবার ১৪ মার্চ তারিখে সন্ধ্যায় প্রুফ দেখে এসেছি। পরদিন শুক্রবার সাড়ে ন'টায় আবার পৌঁছলাম। হেলাল–যে হেলাল-কে গত সন্ধ্যায় দেখে গেলাম, সে আর ইহলোকে নেই। রাত্রে আকস্মিক মৃত্যু। বিশ্বাস করাও দায়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বয়স। উচ্চ ডিগ্রিধারী, বয়সের তুলনায় প্রচুর পড়াশোনা ও অত্যন্ত অকপট হৃদয়ের অধিকারী; এদেশে নৈতিকতার শ্মশানে হেলাল একজন নিষ্ঠাসক্ত সৎ নাগরিক। তাকে হারানো পারিবারিক নয় শুধু, সামাজিক দুর্ভাগ্য বৈকি। হঠাৎ হারিয়ে গেল হেলাল। আমৃত্যু তার শুভ্র স্মৃতি আমার সামনে ঝল্‌মল করবে, যদিও পটভূমি এমন বিষাদের। প্যাপিরাসের সকল কর্মীর নিকট তাঁদের দরদের জন্য আমি ঋণী রইলাম। একজন আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেল শুধু। তা-কে কিছু জানানোর সুযোগ দিল না। কর্মবৈরাগীরা তা-ই হয়।

বিগত দশ-পনর বছরে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। বইয়ের আকারে তা আর বেরোয়নি। অনুরাগী পাঠক হিসেবে অনেকে তাগিদ দিয়েছেন। আমার গড়িমসীর ফলে এত বিলম্ব। আরো দেরি হোত। আমার প্রাক্তন প্রিয় ছাত্র ইউনুস চৌধুরী ও তার সহধর্মিনী (যিনি পেশায় চিকিৎসক) ফাতেমা চৌধুরীর আন্তরিক তাগিদে এবার না নড়ে উপায় ছিল না। আরো এগিয়ে এলো স্নেহাস্পদ মফিদুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক–জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর কর্ণধার। বই ছাপার পর আরো বহু কাজ বাকি থাকে, প্রসবের পর প্রসূতির-শিশু পরিচর্যার মত। সেই ভার মফিদুল নিতে গড়িমসী দেখায়নি। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে আমার কুণ্ঠা। শত কারণ, সে-অস্বোয়াস্তি বোধ করবে, আনন্দিত হবে না। একই কারণে, বহু শুভাকাঙ্ক্ষীর নাম উহ্য রইল।

বাংলা একাডেমির প্রেসের অধ্যক্ষ স্নেহাস্পদ ওবায়দুল ইসলাম ও তার দুই সুদক্ষ সহযোগী আফজাল হোসেন এবং শাকিল উদ্দীন কারো ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা রাখে না, নিজেদের দায়িত্ব-পালনের প্রতি সহজাত অনুরাগের জন্যে। লৌকিকতা থেকে তাই তাদের বাদ রাখলাম।

এই বইয়ের প্রচ্ছদ-শিল্পী জিলানী ওসমান। বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট। সতর বছর সে তুলি স্পর্শ করেনি। এবার আমার অনুরোধ তুলি হাতে তুলে নিয়েছে। তাকেও ধন্যবাদ দিতে পারলাম না। সম্পর্কের জন্যে। সে আমার সহোদর ছোট ভাই।

কোন কোন প্রবন্ধে পবিত্র কোরানের উদ্ধৃতি আছে। তার তর্জমা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত কুরআনুল করীম থেকে গৃহীত।

স্থানীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকগণ আমার রচনাকে কদর দিয়েছিলেন সকলের পূর্বে। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিগত তিন-চার দশকের সামাজিক পরিস্থিতির উপর রচনাগুলো লেখা। পুস্তকের নামকরণে আমার সাফাই সেইখানে।

শ.ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামী নবতরঙ্গ

ওয়া এজা কিলা লা-হুম লা তোফসেদু ফিল আর্দে কালু ইন্নামা নাহ্নো মোসলেহুন।

–কোরান : সূরা ২-১১ আয়াত

বাংলা তর্জমা : যখন তাহাদের বলা হয়, "তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ করিও না, তাহারা বলে, আমরাই অবশ্য শান্তি স্থাপনকারী।"

ইয়া আইয়োলাহাল্লাজিনা লাতাত্তাখেজুল ইয়াহুদা ওয়া ন্নাসারা আউলিইয়া বাদোহুম আউলিইয়া উ বা'দ্ব ওয়া মাই ইয়া তাওয়াল্লাহুম মিন্কুম ফাইয়াহু মিন হুম।

–কোরান : সূরা ৫-৫৪ আয়াত

বাংলা তর্জমা : হে বিশ্বাসীগণ। ইহুদী খ্রীস্টানদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ তাহাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরই একজন [রূপে গণ্য] হইবে।

বিগত পনর-ষোল বৎসর মুসলিম রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মের এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য, উদ্দীপনা এবং স্পন্দন অনুভূত হয়। ইসলামী মৌলতন্ত্র বা ফান্ডামেন্টালিজম, জঙ্গীমনোভাবী বা মিলিট্যান্ট ইসলাম, ইসলামী রিভাইভ্যাল বা পুনরুজ্জীবন, ইসলামী বিপ্লব, ইসলামী স্বাজাত্য বা আইডেনটিটি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তা পরিচিত। কয়েক বছর পূর্বে ইরানে আয়াতুল্লা খোমেনীর নেতৃত্ব শাহ-বিরোধী বিপুল জনউত্থান এবং নজির স্বরূপ আরো ঘটনা খাড়া করা যায়।

সামাজিক এমন দৃশ্যপট সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই কৌতূহলী হয়ে উঠবেন। সহসা এই ইসলামী নবতরঙ্গের উৎস কোথায়? তা কী বহুকালের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ? অথবা তা আর্থ-সামাজিক, আরো সরল কথায়, মানবিক জীবনধারার নানা উপাদানের ফলশ্রুতি?

সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ পর্যন্ত বর্তমান আন্দোলনের মধ্যে ইসলামের সার্বজনীন অনন্যতা খুঁজে পেয়েছেন। আঠার-উনিশ এমন কী বিশ শতকে, সাম্রাজ্যবাদের পত্তম-কাল থেকে পশ্চিমের প্রাচ্যবিদেরা ইসলামকে অবজ্ঞেয়, হীন ধর্মরূপে প্রতিপন্ন করার জন্যে তৈরী ছিল, সেখানে হঠাৎ এত প্রশংসাকীর্তন! তার মূলে কী কোন অভিসন্ধি আছে? অথবা এনার্জি সংকটের যুগে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদের দিকে চোখ রেখে আকস্মিক এমন অতি ভক্তির প্লাবন? এই জাতীয় প্রশ্নেরও বিস্তারিত জবাব থাকা দরকার। আপাততঃ তা ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবি রইল। নিরীক্ষা মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক। স্বল্প পরিসরে সব আলোচনায় যাওয়া সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামের কোন অনন্যতা বা বৈশিষ্ট্যের ফলে বর্তমানে সার্বজনীন চাঞ্চল্য দেশে দেশে শুরু হয়েছে? তার জবাব এক কথায় দেওয়া কঠিন। কারণ, প্রবক্তাগণ কেউ সঠিক, কংক্রিট বাস্তব কিছু বলতে পারেন না। ইরানে শাহের মত নৃশংস, রক্তপিপাসু ফেরেববাজ এক শাসকের উৎখাত-সাধনে অশীতিপর বৃদ্ধ আয়াতুল্লা খোমেনী ইসলামের আদর্শ প্রয়োগ করেন। সেই আদর্শ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক কর্তৃক নিয়োজিত হয় এক স্বৈরশাহী বুনিয়াদ আরো মজবুত করতে। উক্ত জনাব তাঁর "নেজামে মুস্তফার" কোন নীল-নকশা দেননি। তা আপাতত ঃ চোরের হাতকাটা, ব্যভিচারে সংগেসার করা এবং অন্যান্য অপরাধে "দোররা, বেত্রাঘাত" মারার মধ্যে নিবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট সাহেবের উপদেষ্টা পরিষদে যারা জায়গা পাবেন তাদের বংশ পরিচয় বিচার করে দেখা হবে। 'কুল্লো মুসলেমিন এখুয়াতুন–সব মুসলমান ভাই-ভাই' ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তক জিয়াউল হক এই বহু কথিত উদ্ধৃত হাদিস জানেন না, আশ্চর্যের বিষয়। নচেৎ বংশ-মর্যাদার প্রশ্ন কেন তুলবেন? জনাবের ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তনা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডির দু'টো ছোট শাখা ব্যাংক থেকে দশ লাখ টাকা ডিপোজিট (জামানত) তুলে নেয়া হয়। সোনার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যায়। আর শহরে জমির দাম এক বর্গগজ পাঁচশ' টাকা পৌঁছায়। ইকনমিক ফোর্সের (সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি) নিজস্ব হালচাল, আইন আছে, তা তুকতাক, ওঝালি মন্ত্র দিয়ে শায়েস্তা করা যায় না। তিনি এতদিন হয়ত উপলব্ধি করেছেন।

মিসরে নিহত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাদাত "এখওয়াতুল মুসলেমিন" (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ) পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেন। সংঘের লক্ষ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন। এই ব্যাপারে তারা কিছু জঙ্গী, মিলিট্যান্ট মনোভাব পোষণ করেন। কাজ ত্বরান্বিত করতে, ফরসেপ ডেলিভারীর মত, তেমন মনোভঙ্গী পোষণ অপরাধ কিছু নয়। অথচ সাদাতের চোখে তারা অপরাধী। অন্য পক্ষে, তিনিই আবার ঘোষণা করেন যে, ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা এবং নাস্তিকতা প্রচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বড় জটিল পরিস্থিতি। আদর্শে আদর্শে সংঘাত। এখ্‌ওয়ানরা সাদাতকে মুসলমান মনে করত না নিশ্চয়। নচেৎ তারা সাদাত-কে ষড়যন্ত্র যোগসাজশে হত্যা করত কী? পবিত্র কোরানে আছে–এক মুমেনের কখনই আর একজনকে হত্যা করা সংগত নয়–৪র্থ পারা-৯২ আয়াত। ইসলামের সাচ্চা পাবন্দ এখ্‌ওয়াতুল মুসলেমিন তাদের ঘোষণা অনুযায়ী। অথচ কোরানের বাণী লঙ্ঘন করে বসে রইল। কোরানের অন্যত্র আছে, (৪র্থ সুরা-৯৩ আয়াত) স্বেচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি জাহান্নাম ও আল্লার লানৎ অভিশাপ। এখানে দুই ইসলামী ভাষ্যের বিরোধ জটিল সমস্যা এনে হাজির করে। কারণ উভয় পার্টি পাক্‌কা মোমেন।

রাজতন্ত্র উচ্ছেদ বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয় রুশ বিপ্লবের সময় থেকে। ১৯১৭ সনে রাশিয়ার জার, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের সনাতন খেলাফৎ। উচ্ছেদকারক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুস্তফা কামল আতাতুর্ক। ১৯৫২ সালে মিসরের রাজা ফারুক, ১৯৫৮ সালে বাগদাদে রাজা ফয়সল, ১৯৬৯ সনে রাজা ইদ্রিস সনৌসী। উচ্ছেদকারক মুয়াম্মার গাদ্দাফী। ১৯৭৩ আফগানিস্তান্। ১৯৭৯ ইরানের শাহ। ইসলাম, গণতন্ত্রের ধর্ম, গণতন্ত্র দিয়েই হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত। অথচ বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহীগুলো ইসলামী ঐতিহ্যের সোচ্চার দাবীদার। ইসলামের অনুশাসনে বাদশা এলো কোথা থেকে?

তাই উল্লিখিত, নবতরঙ্গের প্রবক্তারা ইসলামের সঠিক কোনো স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। অনেকে আধুনিক যন্ত্রশিল্প-আকীর্ণ জগতের জটিলতার মধ্যে খুব সরলীকৃত সমাধান খোঁজেন। আলজিরিয়ায় মদ বিক্রি হয়, এমন অভিজাত হোটেলগুলোর জানালা দরজার কাচ ভাঙার মধ্যে ইসলামের পরাকাষ্ঠা দেখতে পান। তুরস্কে রক্ষণশীল রাজনীতির পার্টিগুলো স্রেফ পার্টি-স্বার্থে ইসলামের দ্বারস্থ হন।

প্রত্যেক দেশেই ইসলামের "স্বরূপ" বিভিন্ন। তাই ধাঁধা সৃষ্টি হয় সহজে। আবার প্রত্যেকেই দাবী করেন তারা "আসল" ইসলাম। বাকী পাগলা মেহেরালির আর্তনাদ "সব ঝুটা হ্যায়।" বিশুদ্ধতার লড়ায়ে আমার মত আনাড়ী কেন আলেমও সঠিক জায়গায় খাড়া থাকতে পারবেন না।

তাছাড়াও, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে নানা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি চালু আছে। শিয়া-সুন্নীর বিরোধ চৌদ্দশ' বছরেও মিটল না। কোন দেশেই ইসলাম সমরূপা বা 'হোমোজিনিয়াস' নয়। তাদের সাংস্কৃতিক কাঠামো আলাদা, রেস বা বর্ণে গরমিল, ভাষা স্বতন্ত্র। ভাষার মিল যদি থাকে, অন্য ব্যবধান দুস্তর। এক ইরানেই ফার্সি ছাড়া পাঁচ-ছ' রকমের ভাষা আছে। ফার্সিভাষী মাত্র শতকরা ৪৮, বাকী আরবী, কুর্দী, তুর্কী, লুরি-বখতিয়ারী ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

বর্তমানে জাতিরাষ্ট্র বা 'নেশান-স্টেট' হওয়ার ফলে ব্যবধান-ই সংকটকালে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বড় বাহন হয়ে দাঁড়ায়। আরবী ও ইরানী মুসলমানের বিরোধ হালফিল ব্যাপার নয়। তেমনই আছে, তুর্কী বনাম আরবি মুসলিম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেই বিরোধ পুঁজি করেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কেল্লা ফতে করেছিল, ইতিহাস সাক্ষী। তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যের আধিপত্য খুইয়ে বসল। আরো আছে কুর্দী বনাম ইরানী মুসলিম সুদানী কাফ্রি-মুসলিম বনাম সুদানী আরবী মুসলিম। এমন আরো নজির বাড়ানো যায়। বাঙালী-পাঞ্জাবীর পুরাতন ঘা না উল্লেখ করাই মঙ্গল। বর্তমান ইরাক-ইরানের ভ্রাতৃঘাতী, আত্মক্ষয়ী যুদ্ধে ইরাকীরা ভেবেছিল, দক্ষিণ ইরানের আরবী ভাষী মুসলমানেরা তাদের পঞ্চম বাহিনী হয়ে পড়বে। বস্তুতঃ তা ঘটেনি। ইরানের শিয়া সম্প্রদায় শতকরা ৯০, ইরাকে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। ইরানীরা ভেবেছিল কওমী শিয়ারা তাদের দোসর হয়ে পড়বে। ইরানের প্রপাগান্ডার নমুনা স্মরণীয়। ইরানী বেতার চীৎকার তুললো কতকটা এই ভাবে : "এজিদ ছিলেন ইরাকের খলিফা। তিনি হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতল করেন কারবালার যুদ্ধে।" ইমাম হোসেন শিয়াদের বিশিষ্ট ইমাম। কওমীচেতনা জাগানোর জন্যে এমন প্রচার। আর ইরাক ঘোষণা করল যে তাদের পূর্বপুরুষ সাদ-বিন আক্‌কাস ইরানে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলেছিল, এবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু সে ত অষ্টম শতাব্দীর ব্যাপার। তখন অগ্নিপূজক ইরানের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা পোঁতা হয়েছিল। ইরাকীরা ভেবে দেখেনি, এবার কী হবে? এবার ত ইসলামের এক ঝাণ্ডা তুলে আর এক ঝাণ্ডা পোঁতার সমস্যা। বর্তমান জাতি-রাষ্ট্রে জাতীয়তা শুধু ধর্ম বা ভাষার ব্যাপার নয়—বরং যুগযুগান্তের মানসিক রসায়নের ফলশ্রুতি। ইতিহাসের এই রায় আজও অনেকে বুঝতে অক্ষম।

বর্তমান যুগে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে রাজনীতিই ধর্মের অর্থ স্থির এবং নির্ধারণ করে। রাজনীতির রূপ বা কাঠামো আর ধর্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। তবে দেশের অভ্যন্তরে যেসব সোশ্যাল ফোর্স বা সামাজিক শক্তি ক্রিয়াশীল সেগুলোর দ্বারাই ইসলামের অভিঘাত, ইমপ্যাকট বা চাপ কী রূপ নিবে তা নির্ধারিত হয়। সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাষ্য বা ভাষ্যে ভাষ্যে বিরোধিতার নকশা পাওয়া যাবে সোশ্যাল ফোর্সের অবস্থান বা পজিশন থেকে। নিহত আনোয়ার সাদাত ছিলেন ইরানের শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আয়াতুল্লা খোমিনীর কট্টর সমালোচক। জনাব খোমিনী সারাজীবন কাটিয়েছেন এবাদৎ-বন্দেগী ও ইসলামী শাস্ত্রের চর্চায়। আর আনোয়ার সাদাত পশ্চিমী সভ্যতার কেতায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় হালচাল ও জীবন-ধারায় অভ্যস্ত। এমন ব্যক্তিও ইসলাম সম্পর্কে মতামত দিতে পারে বিশেষজ্ঞের মত। এই উপমহাদেশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখা গিয়েছিল একই দৃশ্য। মক্কায় তাঁর জন্ম এবং বিগত চৌদ্দশ' বছরের যে পাঁচজন কোরানের তফ্‌সীরকার-ভাষ্যকার-রূপে বিশ্ববরেণ্য, তাঁদের অন্যতম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অবিভক্ত উপমহাদেশে মুসলমানদের নেতা হলেন না, নেতা হলেন হালেচালে, মদ্যপানে, রুচিতে, লেবাসে ইউরোপীয়—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ইসলাম রাজনীতি অনুযায়ী দুই রকম রূপ গ্রহণ করল, তা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। দুই নেতার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, যেহেতু রাজনীতি আলাদা। সেই রাজনীতি অন্যান্য সোশ্যাল ফোর্সের অবদান হিসেবেই দুই রূপে প্রতিভাত।

এই সিদ্ধান্ত হালফিল ইরানের ঘটনা-প্রবাহ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। শুধু ইসলামী নবতরঙ্গের মুখে শাহ-তন্ত্রের পতন ঘটেনি। অন্যান্য সোশ্যাল ফোর্স—যার প্রকাশ ইরানের শাহের সন্ত্রাস ও নিপীড়নের যন্ত্রে বিশেষ উপাদান হিসেবে বাদ দেয়া চলে না। মুসলমানের রাজ্যে যদি প্রতিবাদের ভাষা ইসলামী ইডিয়ম বা বাগ্‌বিধির রূপ পায়, তা কী অস্বাভাবিক কিছু?

শাহের অর্থনৈতিক পলিসি দেশকে ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শাহের তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব' হয়ে পড়ল তৈলাক্ত শিরে আরো তৈল বর্ষণ। জমিসংস্কার নীতির ফলে লাভবান হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের বিত্তশালী কৃষক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্ত। দেশের শতকরা তেত্রিশজন ভাগচাষী হয়ে পড়েছিল ভূমিহীন। জমির মালিক এমন কৃষকের শতকরা নব্বইজন পেটেভাতে কোন রকমে চলতে পারত। অর্থনীতির ভাষায় 'সাবসিসটেন্স লেভেল' বা জঠরান্ন পর্যায়ভুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাটিয়ালরূপে আত্মনিয়োজিত ইরানের শাহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনেছিল (পরিসংখ্যান বাদ দিলাম) কেবলমাত্র তেলের টাকায়। ফল : মুদ্রাস্ফীতি। তার শিকার হয়েছিল শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী, স্বল্প বেতনের চাকরিজীবী, দোকানদার প্রভৃতি। অন্য দিকে বাস্তুচ্যুত গ্রামের সর্বহারা দলে দলে শহরে এসে ভিড় করছিল, জীবন সংগ্রামের আর এক অধ্যায় রচনায়। হিসাবে দেখা যায়, বছরে পাঁচ লাখ মানুষ শহরের দিকে ধাইত। শাহের ভূমিসংস্কারের ফলে, ভূমিত্যাগে বাধ্য হয় গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। এ সব শ্রেণীর উপর ইরানের উলেমাদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। শাহের সন্ত্রাসবাদ এইসব সর্বহারাদের আরো জঙ্গী মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। দেশকে "আধুনিক" করে গড়ে তুলতে গিয়ে শাহ বহু লোককে সনাতন পেশা থেকে খারিজ করে ছেড়েছিল। আবার উপরতলার শরীফেরা, তেলের সম্পদে রাতারাতি ধনীকুল মদ, মাংস, মৈথুনের ক্রীতদাসে পরিণত। এদের হালচালও সাধারণ মানুষকে অতীতের দিকে, রিভাই-ভ্যালিজমের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দেশের যন্ত্রশিল্প মুষ্টিমের ইরানী বিত্তবানদের চাহিদা মেটাত মাত্র। শোষণ, ত্রাসনের এই ভয়াবহ গোরস্তানে আয়াতুল্লা খোমেনীর ইসলাম আহ্বান একমাত্র প্রতিবাদের ঢেউ তুলেছিল, এমন কথা বলা পুরোপুরি সত্য নয়। আরো সোশ্যাল ফোর্সের অবদান অনস্বীকার্য। দেশপ্রেমিক উলেমা, শিক্ষক এবং ফেদাইনে খাল্‌ক, ফেদাইনে মুজাহিদ, তুদেহ প্রভৃতি রাজনৈতিক পার্টির অনেকদিনের সাধনা জন-উত্থানের বুনিয়াদ তৈরী করেছিল বৈকি। তা অস্বীকার বাস্তবের বিকৃতি মাত্র।

amarboi.com

নানা ধরনের সোশ্যাল ফোর্স ইসলামের অভিঘাত কী রূপে নেবে তার ছাঁচ তৈরী করে। তাই দেখা যায়, আয়াতুল্লা খোমেনী বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে লিবিয়া, সিরিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেন ছাড়া আর কোথাও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নন। কারণ রাজনীতি স্বতন্ত্র বিধায় তাদের ইসলাম আর সমপর্যায়ে নেই। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বর্তমান যুগে ধর্মের অর্থ নির্ণিত হয় নাকি?

আধুনিক মানবজীবন ও ইতিহাসের জটিল-কুটিল ঘূর্ণীপাকের হদিস সম্পর্কে তেমন সুষ্ঠু পরিচয় না থাকার ফলে, আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে গত দেড়শ' বছরের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ক্রমশ শুধু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের গোলাম বা তাঁবেদার হয়ে পড়ল না, তাদের চেতনায় ইসলামের মহান ঐতিহ্যও যেন নিশ্চিহ্ন বা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। মজা নদীর শ্যাওলা এবং পাঁকের মধ্যে তখন বিচরণ। ইসলামের বিকৃত ভাষ্য অবশিষ্ট রইল শোষকদের অস্তিত্ব জীইয়ে রাখার দোসর রূপে।

কিন্তু যুগ-বাস্তবের পদাঘাত বড় নির্মম। তার লজিক অবশ্যম্ভাবী। সমাজ-প্রবাহের জ্ঞান অন্ধ আবেগের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রিয় নবী মোহাম্মদ (দঃ)

অপেক্ষা কে আর বেশী তা হৃদরঙ্গম করেছেন? সংক্ষেপে দু' একটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ-সম্বরণ দায়। দুশমনের সঙ্গে লড়তে গেলে নিজের তাগদের হিসেবও ত নিতে হয়। ইসলামের পত্তনকালে মুসলমানদের দুই প্রধান শত্রু ছিল ইহুদী এবং কোরেশগণ-যে গোষ্ঠীর সন্তান রসূলুল্লাহ স্বয়ং। ইহুদীদের সঙ্গে অনেক মিল ছিল সামাজিক আচারে। তারা সালেম লাকেম বলে সম্বোধন করে। মুসলমানেরা বলে, আসসালামো আলায়কুম। ইহুদিরা কাজ শুরুর পূর্বে উচ্চারণ করে : বা'স মালা। মুসলমানদের বিসমিল্লাহ। আবার উভয় সম্প্রদায় জেরুজালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। শত্রুকে বসতে উঁচু পিঁড়া দিতে হয়, তা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মুসলমানদের সংখ্যা তখনও অল্প, প্রতিরোধ-ক্ষমতা তেমন জোরদার নয়। হযরত মোহাম্মদ ইহুদীদের সঙ্গে বিরোধিতার তাপ তেমন বৃদ্ধি করেননি। কিন্তু কাবা-বিজয়ের পর স্রোত উল্টে গেল, যে কাবা-পানে মুখ ফিরিয়ে বর্তমানে বিশ্ব মুসলিম নামাজ আদায় করে। আর জেরুজালেমের দিকে নয়। কোরেশরা তখন মিত্র। মোমেনদের শক্তি প্রবল বর্ধিত। ইহুদীদের মোকাবিলা কিছু কঠিন নয়। কেবল অন্ধ আবেগ কর্তৃক পরিচালিত হননি রসূলুল্লাহ। তাই তিনি সফল নবী। যীশুখ্রীস্ট ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন এবং খ্রীস্টধর্মের বুনিয়াদ পাকা হতে আড়াইশ' বছর লেগেছিল। তা-ও ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে নয়। পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কাবা বিজয়ের পূর্বে "হুদায়বিয়ার সন্ধি" লগ্নে আর এক নবী মোহাম্মদের পরিচয় মেলে। কোরেশদের প্রতিনিধি শোহেল-বিন-আমর। বলা বাহুল্য, অন্য পার্টির প্রতিভূ হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। সন্ধির খসড়া-পত্তনে মত-বিরোধ। একদিকে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ। শোহেল-বিন-আমর আপত্তি তুলে বললেন, "যদি আল্লাহর রসূলরূপে আমরা আপনাকে মেনে নিব, তাহলে যুদ্ধ হচ্ছে কেন? আপনার পিতার নাম দিন: মোহাম্মদ-বিন-আবদুল্লা।" হযরত মেনে নিলেন। আরো কয়েকটি অবমাননাকর শর্ত। হযরত ওমর (রঃ) রীতিমত ক্রুদ্ধ এবং হযরতকে বলেই বসলেন যে একশ' সঙ্গী পেলে তিনি অকুস্থল ছেড়ে তখনই চলে যেতেন। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ অনড়। শুধুমাত্র আবেগকে প্রাধান্য দিতে তিনি নারাজ। ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে তিনি পিছু হটলেন। কোরেশদের সঙ্গে আরো ইহুদীগোষ্ঠীর মৈত্রীবন্ধন আছে, সন্ধির ফলে তা শিথিল হতে বাধ্য। নতুন সমাজ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার জন্যে পরিস্থিতি-সচেতনতা নিষ্প্রয়োজন, কে বলবে? আবেগ সম্বল করে বেশী দূরে যাওয়া যায় না। নতুন ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, রাজনীতিবিদ, ডিপ্লোম্যাট (কূটনীতিবিদ), যোদ্ধা, গৃহী এবং সিদ্ধপুরুষ—একাধারে এত গুণের সমাবেশ। সেদিক থেকে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সত্যি বেনজির, অতুলনীয়।

প্রথম যুগের ঝলকের পর উত্তরকালে ক্রমশ হযরতের কর্মক্ষেত্রের আদর্শ নিষ্প্রভ হতে লাগল। কায়েমী স্বার্থ তন্ত্রের গর্তে মোজেজা (অলৌকিক কাণ্ড)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে লাগল এবং কর্মহীন তত্ত্বের যে দুর্দশা ঘটে তারই বিকৃত পচনদৃশ্য এখন মুসলিম জাঁহানে। যুগের কশাঘাত বা পদাঘাত তাদের গর্তচারী করে দিয়েছে। মোহ-গর্ত সব সময় আরামদায়ক। কারণ, তা মানস-বিলাস। কাঠের হাতি তখন যদৃচ্ছাগামী ঐরাবত মনে হয়।

কিন্তু ইতিহসে যেন দাবার ছকের সমতল। তার একটা ঘুটি জায়গা বদলালে খেলার সমস্ত কলাকৌশল বদলে যায়–যদিও অন্যান্য ঘুটি তখনও যথাস্থানে অনড়। ইতিহাসে এই অদৃশ্য পরিবর্তন সহজে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ফলে সমাজের অভ্যন্তরে নানা ফোর্সের গাঁজানি অন্য কথায় অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। কারণ, নতুন সংগতি-সাধনের সঠিক পন্থা সকলে ধরতে অক্ষম। পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ, কি দৈহিক বা মানসিক কখনই সহজ নয়।

শাহের নিপীড়নের শিকার, বিখ্যাত ইরানী চিন্তাবিদ এবং কবি আলী শরিয়তী সময়কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক. পঞ্জিকা-কাল, দুই. সমাজ-কাল। তিনি লিখেছেন যে, কোন ব্যক্তি পাঁজি অনুযায়ী বর্তমানে বাস করেন। কিন্তু তার সমাজকাল হয়ত শত শত বছর পিছনে। মধ্যযুগ বা আরো অতীত কালের প্রতিধ্বনি তাই তাদের মানসিকতায় সাড়া জাগায়। মাঝে মাঝে ইতিহাসে যে রিভাইভ্যালিজম বা পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত্র ঘটে, তার হদিস ওই কাল-বিভাগের মধ্যে নিহিত। নিজের বর্তমান ভিটা বা বাসস্থান থেকে যেমন মানুষ উচ্ছেদ হতে নারাজ থাকে এবং তার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়ে, মানস-ভিটার ক্ষেত্রেও তেমন জান-কবুল সে দাঁড়িয়ে যায় জঙ্গী মনোভাবসহ। নিজের চারিপাশে মরীচিকার ঝালর টানিয়ে তখন সে স্বস্তি পায়। বাইরের জগৎ ও বাস্তবতা তার চেতনার আর কোন আঁচড় কাটতে পারে না।

অনেকের স্মরণ আছে, ষাটের দশকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই প্রার্থী ছিলেন। আইয়ুব খান এবং মিস জিন্না। মিস জিন্নাকে সমর্থন দিয়েছিলেন জামাতে ইসলামীর খ্যাতনামা নেতা মওলানা মওদুদী, যিনি বর্তমানে মরহুম। মওলানা সাহেব তাঁর বিবৃতির মধ্যে বলেন, "…..আমরা মেনে নিচ্ছি যে, ধর্মের দিক থেকে একজন রমণীকে রাষ্ট্রের প্রধান করা না-জায়েজ (অসিদ্ধ)। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আর একদিক এড়িয়ে যেতে পারে না যে, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করার চেয়ে একজন নিপীড়ক স্বৈরাচারীর অস্তিত্ব কায়েমী জিইয়ে রাখা শরীয়ৎ অনুযায়ী ঢের বেশী বড় গুনাহ (পাপ)।" সেদিন মরহুম মওলানা মওদুদীর নিকট এক আশ্চর্য কাল-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ধর্মের আইনকে তিনি পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু পরিস্থিতি অনুযায়ী তা অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ। এটি তাঁর জীবনে বিরল নজীর মাত্র। সাধারণতঃ সামাজিক ইস্যুর ক্ষেত্রে এদেশের উলেমা ও নায়েবে-নবীগণ এমন পরিচয় খুব অল্প দানে সক্ষম। তাই ধর্মের নামে বাহ্যিক জৌলুস বেড়ে যায় এবং অন্যদিকে সমাজের অনাচার পাল্লা দিয়ে দৌড়ায়।

জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সামনে রয়েছে এদেশে : নবী-দিবস। এই পবিত্র দিনটি বর্তমানে বাংলাদেশে (এবং প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে) জাতীয় ইনস্টিটিউশানে পরিণত। সেদিন মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ-নসিহৎ, মনীষীদের বক্তৃতা, রাত্রির আলোকসজ্জা ইত্যাদির ফলে জাতীয় উৎসবের রূপ ধারণ করে। ধর্মীয় চেতনার বিস্তারের জন্যে এমন পন্থা অবিশ্যি দরকার। কিন্তু এই পাক-দিবসের ইতিহাস অনেকে লক্ষ্য করেছেন। আদি যুগে ১৯৩০ সনে খুব স্বল্প সংখ্যক গৃহস্থের বাড়ীতে মিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই দিনটি। মুসলিম লীগ রাজনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩০-৩২ সন থেকে জৌলুস বাড়তে লাগল। বর্তমানে ইনস্টিটিউশান। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরে নবীদিবসের ফলশ্রুতি কী? ইসলাম ধর্ম ভাবাদর্শ (আইডলজি) করে পাকিস্তান গড়ে উঠেছিল, সেই পাকিস্তান দু'টকরো হয়ে গেল চব্বিশ বছরের মাথায়। ধর্মীয় চেতনার বিস্তার ঘটলে তা এককালের পাঞ্জাবী ভাই পরবর্তীকালে বোহ্নাই (ভগ্নীপতি)-তে পরিণত হত না। আর সামাজিক স্বাস্থ্য? দুর্নীতির প্লাবন এমইন যে দুর্নীতি দমন বিভাগ চালু করেও থ' পাওয়া বিষম দায়। বহু বছর পরে আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, উৎসবের জৌলুস ফাঁপা পতিপন্ন। অর্ধ শতাব্দী—পঞ্চাশ বছরের ওয়াজ নসিহৎ, রাষ্ট্রের মদদপুষ্ট এক আন্দোলনের স্রোত কেন বালুচরে হারিয়ে গেল, কেউ ভেবে দেখছেন কী? কেন? কেন? আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা—এই দ্বৈত জড়িত চেতনা-বিস্তারের পথ তা'হলে কোথায় নিহিত?

ধর্ম যখন দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় না তখন তা নিতান্ত বাহ্যিক খোলসের রূপ পায়। আর ত অন্তরের জিনিস হয় না। এই জন্যে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ও পার্টিগুলো কোথাও বিকল্প শক্তি হিসেবে অপজিশান বা বিরোধী দলের ভূমিকার স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। কি তুরস্ক, কি ইন্দোনেশিয়া, কি অন্যান্য দেশে কোথাও তারা কোন নির্বাচনে শতকরা বারো-তের অথবা জোর পনের ভোট পায়।

ধর্মভিত্তিক নয় এমন পার্টিরই বরং শক্তি বেশী। সাধারণ মানুষের উপর উলেমা সম্প্রদায়ের প্রভাব সীমাহীন। নির্বাচনের ফল ত অমন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, নির্বাচন ইহজাগতিক ব্যাপার। ধর্মভিত্তিক পার্টিগুলো সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিকভাবে প্রতিফলনে অসফল। তাই ফল ঐরূপ। আধুনিক যন্ত্রশিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের সমস্যাবলী, দৈনন্দিনতার অন্ধিসন্ধি, অর্থনীতির প্যাঁচাল পাপচক্র এমনই যে, সেই ঘূর্ণীপাকের শিং পাক্ড়ে মোকাবিলা করার জন্যে, গভীর অনুপাতের সঙ্গে বলতে হয়, ধর্মভিত্তিক পার্টির প্রবক্তাদের তেমন ইলেম ও অকুতোভয়তা আজও দেখতে পাওয়া যায় না। তাই এই ধরনের পার্টিগুলোর ভূমিকা হয় নেতিবাচক বা নেগেটিভ বা সংহতি-নাশী। অজানিতভাবে এমন সব পার্টি শাসকশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত হয়। ইসলামের এত প্রচার সত্ত্বেও পাকিস্তান ভেঙে গেল। শোষকদের ইহজাগতিক সকল ফায়দা লুণ্ঠনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কোন ছেদ পড়েনি। ধর্মভিত্তিক পার্টিগুলোকে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী দাবার বোড়ের মত কাজে লাগিয়েছে। আজও যদি এদেশের ঈমানদার উলেমারা না বুঝে থাকেন, আর কবে তারা প্রকৃত বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করবেন—তা আলেমুল গায়েব আল্লাহতা'লা জানেন। অন্ধ আবেগ জীবনের সড়ক আলোকিত করে না। আয়াতুল্লা খোমেনির নজির আরো প্রমাণ করে শুধু ধর্মভিত্তিক গণ্ডীর মধ্যে এ যুগের জীবনকে বাঁধা দায়। তাই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের শরীকরূপে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং মানবপ্রেমিক সেক্যুলার পার্টির সদস্যদেরও কাফের জ্ঞান করেননি। তাইত গোটা ইরানের কণ্ঠস্বররূপে জালেমের মোকাবিলায় সাফল্য দেখিয়েছিলেন আয়াতুল্লা খোমেনী।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজের জীবনেতিহাসে ইসলামের মর্মশক্তির যে আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন, তা আজ নানা গোমরাহিতে ম্লান। নচেৎ মুসলমান সমাজে "বাহাত্তুর ফের্কা" কোথা থেকে গজায়? ইসলাম ত এক অখণ্ড রূপে পত্তন লাভ করেছিল। আজ কেউ গুরুত্বের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে না বা এই প্রশ্নের জবাব খোঁজে না। প্রিয় নবী হেরা পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মানবতার ময়দানে। আর আজ অনেকে গুহায়, হুজরায় বসে থাকেন দেশবাসীর সুখ-দুঃখের সমস্যা এড়িয়ে, আধ্যাত্মিক, ঐশী জীবনের সন্ধানে। যাঁরা ময়দান এবং মাকান অর্থাৎ ব্যক্তির সুখ-দুঃখ ও সমাজের সুখ-দুঃখ এক করে দেখতে অসমর্থ, তারা হযরত নবী মোস্তফার পথ অনুসরণ করেন কিনা, সন্দেহের অবকাশ আছে।

এদেশের দেশপ্রেমিক মাটির সন্তান উলেমা বুজুর্গদের নিকট তাই আরজ, সমাজের মানুষের ব্যাপক অংশের উপর তাদের প্রভাব যখন এত অপরিসীম—তারা এগিয়ে আসুন আধুনিক জীবনের সমস্যা উত্তরণের হালফিল জ্ঞানসহ, এই ভাগ্যাহত দেশের মানুষকে ইসলামের মানবতার মহান ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিতে। এই দরিদ্র দেশে গত হাজার বছর ধরে এক মুঠো অন্ন, মাথা-গোঁজার এক ফালি ঠাঁই যখন মানুষের কাছে পরম আরাধ্য বস্তু হয়ে রয়েছে, সেখানে নিছক আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্যজ্ঞান ইত্যাদির বুলি পরিহাসের মত ঠেকতে পারে। পথেঘাটে প্রতিদিন দারিদ্র্যের ভয়াল-ময়াল বেষ্টনী এবং যে মর্মন্তুদ দৃশ্য চোখে পড়ে তা দূরীকরণে বুজুর্গদের প্রথম কাতারে এগিয়ে আসার কথা। কারণ, তাঁরা ইসলামের মহান ঐতিহ্য বহন করেন।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে শুধু আদর্শের কথা বলা নয়, জীবন ও দৈনন্দিনতায় রূপায়ন যেন সর্বদা মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু বস্তির অধিবাসী (ঢাকা শহরে এক একর জমিতে দু'হাজার বাস করে, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই) কী স্বেচ্ছায় ঈমান ত্যাগ করে? ভুখা, নাংগা ত ছতর ঢাকতেই অপরাগ। বাড়তি কাপড়, পানি, সাবান, আবাল্যের শিক্ষা, স্থায়ী মাথা গোজার ঠাঁই—এমন বহু উপাদান লাগে পরিচ্ছন্নতার রুচি গড়ে উঠতে। সুতরাং সে-সবের

ব্যবস্থা ছাড়া নসিহৎ আওড়ানো অরণ্যে রোদন। ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলমানদের সংস্পর্শে ইউরোপীয়রা সাবান ও তোয়ালের (টার্কিস টাওয়েল তাই খ্যাত) ব্যবহার শিখেছিল। শেষ ক্রুসেড হয় তের শতকে। তার সাড়ে ছয়শ' বাদ ১৯৫৩ সনে ইব্রাহিম খাঁ (প্রিন্সিপাল নামে সুপরিচিত) তার "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্রে" লিখছেন যে কাবা শরীফের প্রাঙ্গনে ওজু করতে গিয়ে প্রস্রাবের গন্ধে উক্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই অবস্থা কী একদিন হয়েছে? ঈমান কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয় না।

বর্তমানে ষাটের দশকে হঠাৎ তেলের সম্পদে ধনী মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাতেরা ক্যামেল (উট) থেকে ক্যাডিলাকে (দামি গাড়ি) উঠেছেন, মরুভূমির জাহান্নাম-সদৃশ তপ্ততার মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় বসবাস করেন। কিন্তু তেল ত আবহমান কাল মরুভূমির বুকে ঘুমিয়ে ছিল, এত দিন তারা খোঁজ পাননি কেন? সেই ইলেম থেকে মুসলমানেরা বঞ্চিত ছিল কেন? অনেকে বলেন, ইসলামের পথ থেকে বিপথে যাওয়ার ফলে এই দুর্দশা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া–সব জায়গায়, মুসলিম শাসকবৃন্দ যুগে যুগে প্রতি দশকে, শতকে নিজেদের ইসলামের মোহাফেজ কেয়ার-টেকার, সাচ্চা পাবন্দ (অনুসারী) বলে দাবীও ঘোষণা করে এসেছেন। তাহলে বিপথগামী ছিল কারা? দেশের মানুষ না শাসকশ্রেণী? ইতিহাস আজও সাক্ষী। আজও তারা নিজেদের ইসলামের সাচ্চা সেবক বলেন, অতীতে যা করে এসেছেন। গোটা দেশের মানুষ যদি বিপথগামী হয়ে যায়, তাদের হাতে শাসন-ক্ষমতা ছিল কেন? আর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে ত বেশী লোক লাগে না। এমন গুটি কয় মানুষও তাদের তাঁবে ছিল না, বা অনুপ্রাণিত হয়নি, শাসন-প্রথার এমনই কুদরৎ বা মহিমা!

বর্তমানে কেন এই দুর্দশা?

তার একমাত্র জবাব : মুসলিম রাষ্ট্রের শাসককূল শত শত বছর ধরে নিজেদের বর্তমান জাগতিক সুখ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ–এক কথায় নিজেদের আশু-সাময়িক স্বার্থ রক্ষার জন্যে মুসলমান কওমের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়েছেন; ইসলাম ধর্মের বিকৃত ভাষ্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশকে রোধ করে; যখন আঠার শতক থেকে ইউরোপ অন্যদিকে ধীরে ধীরে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অগ্রসর হচ্ছিল। কয়েক শতাব্দীর সঞ্চিত গুনার (পাপ) কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) তাই সুদে-আসলে প্রতিশোধ নিতে তৎপর। মধ্যপ্রাচ্যে তেল এত বিপুল সম্পদ এনে দিয়েছে যে, আমিরশাহীগুলোর ব্যাঙ্কের গচ্ছিত পুঁজি তুলে নিলে ইউরোপের বহু ব্যাংক ব্যবসা পাত্‌তাড়ি গুটাতে বাধ্য হবে। তবু সকলে হীনমন্যতা বা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের শিকার। কারণ, সম্পদই তো সব নয় দেশের জন্যে। সাংস্কৃতিক দৈন্য কী রাতারাতি দূর করা যায়? বিজ্ঞানের প্রতি অবহেলার ফলে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সরঞ্জামের জন্যে তো ইউরোপ-আমেরিকার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আধুনিক অস্ত্রসম্ভার ছাড়া কোন রাষ্ট্র নিরাপত্তা অনুভব করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহীগুলো তাই বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়। মোসাহেবের কী স্বাধীনতা বিবেক থাকে? বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে মুসলমান রাষ্ট্রের অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদের 'ছোট তরফ' জুনিয়র পার্টনার। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ঔরসজাত এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লালিত-পালিত ও অস্ত্রপুষ্ট হঠাৎ-উড়ে-এসে-জুড়ে বসা ইসরাইল রাষ্ট্র তাই ওদের চোখের সামনে ভ্রুকুটির ছড়ি ঘোরায় বিনা সঙ্কোচে, জেরুজালেম মসজিদে আক্সা দখলের পরেও। পত্তনকালে ইসরাইলের লোকসংখ্যা ছিল পঁচিশ লাখ। বলা বাহুল্য, ইহুদী নাগরিক। বর্তমানে তা ৩৬ লাখ। মধ্যপ্রাচ্য বারো কোটি মুসলমানের বাসস্থল। অঢেল সম্পদ। তবু স্বদেশে প্রবাসী, খেদানো জন্তুর মত দিগ্বিদিক যাযাবর প্যালেস্টাইনের মুসলমান-খ্রীস্টান ভাই-বোনেরা দৈনন্দিনতার নির্মম জাঁতার নিষ্পিষ্ট, গত চার দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে ধুঁকে ধুঁকেও লড়ছে, 'শির দেগা নেহি দেগা আমামা' মন্ত্রে বলীয়ান। আর চারপাশে বিত্তশালী আমিরশাহী ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নমুনা দেখায় নিষ্ক্রিয় সহানভূতির বন্যা বইয়ে। এই পটভূমিকায় প্যালেস্টাইন লিবারেশন সংগঠনের মুখপাত্র ইয়াসির আরাফাতের ত্যাগ, তিতিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, কূটনৈতিক নৈপুণ্য ইসলামের আদি যুগের মহান ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে আমিরশাহীগুলোর নিকট ইসলামের মর্যাদা-রক্ষা অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাদের তোষণ ঢের বেশি শ্লাঘার ব্যাপার। মার্কিন মুরব্বীদের জোরে ইসরাইল যে টিকে আছে তার শত-সহস্র প্রমাণ দেয়া যায়। ইসরাইলের এক চক্ষুবিশিষ্ট জেনারেল এবং প্রথম সারির নেতা মোসে দায়ানের আত্মচরিতের মধ্যেও তার শত বয়ান রয়েছে। আপাততঃ একটি লাইন উদ্ধৃতি দেয়া গেল, "ইসরাইল হুজ মিলিটারী পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক স্ট্রেংথ ওয়ার ডিপেনডেন্ট অন এ্যামেরিকান এইড, কুড নট ইগনোর ওয়াশিংটনস ডিমান্ড" অর্থাৎ, ইসরাইল যার সাময়িক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি আমেরিকার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, তার পক্ষে ওয়াশিংটনের দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।" (স্টোরি অব মাই লাইফ ৬২৫ পৃষ্ঠা ১৮ লাইন, স্ফিয়ার বুকস লিমিটেড লন্ডন, ১৯৭৬ সংস্করণ)।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার যুগপৎ মধ্যপ্রাচ্যের বিত্তবানদেরও রক্ষাকর্তা। তাই ইসলামের আবাহনী শেষ পর্যন্ত কণ্ঠে শ্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকে। আর অন্য দিকে লাখ লাখ স্বাধিকারচ্যুত প্যালেস্টাইনী ভাইবোনেরা অস্তিত্বের জেহাদে হাজার রকম দুঃখ-দারিদ্র্যের মোকাবিলা করেন প্রতিদিন জান-কবুল। তখন ছত্রিশ লাখ ইহুদীদের প্রায় সোয়া তেত্রিশ গুণ মুসলমান (যেহেতু সংখ্যা বারো কোটি) চতুর্দিকে নিষ্ক্রিয়, নীরব দর্শক। অথচ এক তেলের অস্ত্র (রপ্তানি বন্ধ) মারফত মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো ইসরাইল কেন, তাদের মুরব্বীদেরও শায়েস্তা করে দিতে পারে। রপ্তানীকৃত অন্য দেশের তেল ইসরাইল আবার আমদানি করে। তারা অস্ত্রও যোগায়। ওই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আস্পর্ধার উৎস সেইখানে নিহিত। ইরানের শাহ

অবিশ্যি সোজাসুজি ইসরাইলকে তেল যোগাত। ইরানের শাহ্ মুসলমান ঠিক। কিন্তু তিনি ইরানীও, অবস্থা অনুযায়ী, সুতরাং আরব জাতীয়তার বিরোধী। ইসরাইলের গোয়েন্দা বিভাগ "মাসাদ" শাহের "সাজেমানে এত্তেলাৎ ওয়া আমজানিয়াতে কেশোয়ার" (সংক্ষেপে "সাভাক")-গোয়েন্দা বিভাগ-কে ট্রেনিং দিত। ১৯৬৭ সনে ইসরাইল-আরব যুদ্ধের পর ইসরাইল লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এলিয়াৎ নামক জায়গা থেকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ আসকেলন পর্যন্ত ১৬২ মাইল রেললাইন তৈরী করল ইরানী তেল ইউরোপীয়ান বাজারে সরবরাহ দিতে। রেললাইন তৈরীর সব খরচ বহন করে ইরান তথা শাহ্। এমন কাণ্ডে বহু মুসলমান ভাইয়ের বুকে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগতে পারে। সরল-প্রাণ হওয়া সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু সরল বুদ্ধি দিয়ে বর্তমান বিশ্বরাজনীতির প্যাঁচাল জটিলতা বুঝা দুষ্কর।

ইসলামী নবতরঙ্গ শোষকদের নিকট জনগণকে বিভ্রান্ত করার চিরাচরিত হাতিয়ার থেকে যাবে না, আবার বন্যার সলিলের মত মানবতার জমিন নতুন আবাদ ও নানা শ্যামলিমায় ভরে তুলবে, ভবিষ্যতে নয় বর্তমানেই তার পরিচয় মিলে গেছে।

পরিশেষে আরো একটি কথা। সকল ধার্মিক, মানবকল্যাণকামী মানুষের নিকট আবেদন, তারা যেন আদর্শের মন্ত্রনিনাদেই না মগ্ন থাকেন। এই যুগে "ঈমান-ঈমান, ঈমানের প্রতিষ্ঠা চাই"—এই রবই যথেষ্ট নয়। ঈমান-প্রতিষ্ঠার হিকমত জন-জীবনধারার সঙ্গে জড়িত। সেই হিকমতের সাধণা যেন তারা চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে না রাখেন। মিসরের অমর-সন্তান পরলোকবাসী জামাল আব্দুল নাসের তার 'ফালসাফাউল বাগাওয়াত' বা 'বিপ্লবের দর্শন' গ্রন্থে (ফিলোসফি অফ রেভ্যুলেশন) এক অপরূপ পাথেয় রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সমাজ-সংগঠনে নৈতিকতা অবিশ্যি অপরিহার্য। কিন্তু নৈতিকতাই সবকিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার জ্ঞানও লাজেমী—বাধ্যতামূলক। যেমন—ফুটবল খেলায় নৈতিক আদর্শ অবিশ্যি দরকার। নচেৎ নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে? কিন্তু খেলার কায়দা কসরৎ শিক্ষা ছাড়া ত প্রতিযোগিতায় জেতা যাবে না। শুধু ঈমান সেখানে 'থ' পেতে অক্ষম। মানবপ্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে নাসের-প্রদত্ত এই উপমা সত্যি উপমাবিহীন। পবিত্র কোরান বহু পূর্বে সেই আহ্বানেই মুখরিত : লা ইয়াসতাবিল কায়েদুনা মিনাল মুমেনীনা গাইরালিদ্বারারি ওয়া মুজাহেদুনা ফী সাবিলিল্লাহ বেআমওয়ালেহিম ওয়া আন্‌ফোসেহিম— । *পবিত্র কোরান, সূরা ৪৯৫ আয়াত।*

ভাবার্থ—যে-বিশ্বাসিগণ আল্লাহর পথে (সত্যের পথই আল্লার পথ) ধনে-প্রাণে মুজাহিদ, গৃহে অবস্থানকারী কোন বিশ্বাসী তাহার সমান হতে পারে না।"

সংবাদ, ১২ জুন, ১৯৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদের সমস্যা

উপরোক্ত শিরোনামা নতুন কিছু নয়। তবু আবার নতুন করে উত্থাপনের হেতু দেখা দিয়েছে। ক্রনিক রোগ গা-সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু তা যখন উৎকট রূপে দেখা দেয়, তখনই শুধু রোগী আবার চিকিৎসার কথা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করে।

বর্তমান নিবন্ধের পিছনে লেখকের এই সাফাই প্রয়োজন ছিল।

বলা বাহুল্য, নেশান, ন্যাশনালিটি-জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি ধ্যানাদর্শ ইউরোপের রপ্তানী। মানুষকে একই ভৌগোলিক সীমানা, বর্ণ (রেস), ভাষা সংস্কৃতি অথবা আবহমান ঐতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে ফেলে দেখার প্রবণতা পশ্চিমের ব্যাপার। কিন্তু নেশান-স্টেট বা জাতিক-রাষ্ট্র আর ইউরোপে আবদ্ধ নয়। পৃথিবীময় সেই ধারা অব্যাহত। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সমান্তরাল বর্তমান পরিস্থিতি জড়িত। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্র মানেই জাতিক রাষ্ট্র বা নেশন-স্টেট। সেখানে জনসাধারণ এক ভৌগোলিক সীমানাবদ্ধ। রাষ্ট্রের সীমানাও সেই ভাবে নির্ধারিত। স্থানীয় অধিবাসীদের বর্ণ, ভাষা—আরো নানা ধরনের প্রভেদ থাকতে পারে। কিন্তু একই আবহমান ঐতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে সকলে বিধৃত।

বর্তমানে পৃথিবীতে কয়েক ডজনের মত মুসলিম রাষ্ট্র আছে। তার মধ্যে ভাষা, বর্ণ, ঐতিহ্যের নানা প্রভেদ। কিন্তু ইসলাম ধর্মের এক অদৃশ্য বন্ধন সেখানে অনুভূত। এক মুসলিম রাষ্ট্র বিপন্ন হলে, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র এবং অ-মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীগণ মানসিকভাবে বিপন্ন হন আর বহু সময় যথাসাধ্য, যথা-সম্ভব সাহায্যে এগিয়ে যান। বল্কান যুদ্ধের সময় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী মুসলমানদের সাহায্যে তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য মিশন প্রেরিত হয়েছিল। হাল ফিল ঘটনা : সর্বদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মদৎপুষ্ট ইসরাইলী রাষ্ট্রের হামলার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী মুক্তিবাহিনীর (পি.এল. ও) পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের চার শ' নওজওয়ান। এমন বহু অতীত ঘটনার মধ্যে দুটো উল্লেখ করা গেল নমুনা স্বরূপ। অর্থাৎ, পৃথিবীর আর কোথাও কোন মুসলিম রাষ্ট্র বিপন্ন হলে অন্য দেশের মুসলমানের বুকে তা আলোড়ন তোলে। যখন কোন সাহায্যে তারা এগোতে পারে না, নিজ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চালবাজির মত প্রতিবন্ধকতা হেতু, তখন তারা অসহায়, অন্ততঃ ইহকাল-পরকালের মালিকের কাছে প্রার্থনা জানায়, মোনাজাত করে মসজিদে-মসজিদে ময়দানে-ময়দানে। অথবা, গায়েবী জানাজা পড়ে যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্য।

এখন সমস্যা, এমন ভৌগোলিক সীমা-বহির্ভূত অনুভূতি জাতীয়তাবাদী চেতনা দৃঢ়মূল করার অনুকূল না অন্তরায়?

জবাব এক কথায় সহজে দেওয়া অসম্ভব। কারণ অনুভূতি ব্যাপারটি বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিল। ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইসরাইলী রাষ্ট্রদূতী গোল্ডা মায়ারসন (পরে মায়ার) ইহুদী নওরোজ, নববর্ষ উপলক্ষে মস্কোর এক সিনাগগে প্রার্থনা করতে যান। এই কট্টর জায়নবাদী অবলা হাজার হাজার আরবদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদকারী ঘাতিনী জল্লাদিনীদের অন্যতম। এক কথায়, এমন মহিলাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, স্বহস্তে আরব নিধনকারী মেনাচিম বেগিনের পত্নী বা উপপত্নী হলে আরো বেশী মানাত। অবলা গিয়েছিলেন প্রার্থনা করতে। মস্কোর তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ইহুদী তাকে সংবর্ধনা-জ্ঞাপনে ঘিরে ফেলে। স্ট্যালিন তখন জীবিত। বলা বাহুল্য রুশ নেতৃবৃন্দ বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাই উল্লিখিত চেতনার শিকড় কোথা দিয়ে কোথা ঠেকে বলা মুশ্‌কিল।

তবু ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়।

সকল জাতিক-রাষ্ট্রই ভৌগোলিক। তার নাগরিকদের চেতনা যদি ভূগোলে আটক না থাকে এবং বিশেষ এক ধারায় প্রবাহিত হয়, অন্য রাষ্ট্রের এক সম্প্রদায়ের দিকে–তাহলে সার্বভৌম জাতিক রাষ্ট্রের বুনিয়াদে খুঁৎ থেকে যায়। এমন চেতনা ত কোন রাষ্ট্রের পক্ষে শুভ নয়। নানা সামাজিক ফোর্সের মধ্যে এমন অনুভূতির ভূমিকা অবহেলার যোগ্য, তা কেউ বলতে পারে না, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে। পাকিস্তানের উদ্ভব তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কারণ, অবিভক্ত ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের চেতনা কোন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ছিল না। তাই তাদের নতুন আবাস ভূমির প্রয়োজন দেখা দিল। পরে বাংলাদেশের পত্তন, যখন দেখা গেল, ধর্মীয় চেতনার বন্ধন শেষ পর্যন্ত তেমন দৃঢ় নয়–পূর্বে যা কল্পিত হয়েছিল। অন্যান্য সোশ্যাল ফোর্সের হেঁচকা টান জিতে গেল।

গত সাড়ে তিন বছর ইরাক এবং ইরান লড়ছে আত্মঘাতী যুদ্ধ। দুই-ই মুসলমান রাষ্ট্র। এখানেও স্পষ্ট, ধর্মের বন্ধন দৃঢ় দূরের কথা, বরং অসম্ভব ঢিলা। অর্থাৎ অন্যান্য সকল সোশ্যাল ফোর্সের সঙ্গে জাতীয়তাবাদ আর এক হেস্তনেস্তর বিরাট ফোর্স। আয়াতুল্লা খোমেনী ধার্মিক বুজুর্গ লোক। ইরাকের তথাকথিত সমাজতন্ত্রী নেতাদের ভূমিকাও ন্যাক্কারজনক। দুই মুসলিম রাষ্ট্র কিন্তু কঠিন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত। ইসলামের বাঁধন কোথায় গেল? আয়াতুল্লা খোমেনী বুজুর্গ অথবা মুসলমান সন্দেহ হয়। যদিও তাঁর ভূমিকা কয়েক বছর পূর্বে ছিল মহান যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

বর্তমান যুগে সমস্যার জটিলতা যারা অতি সরলীকরণে পটু সেখানে এমন স্ববিরোধিতার আবির্ভাব স্বাভাবিক নয়। অথচ জাতীয়তাবাদ ছাড়া অনুন্নত দেশের জীবন-প্রবাহ বিশ্বের সামিল করার অন্য পথ আপাততঃ নেই। এই বাংলাদেশে জেলায় জেলায় যে রেষারেষি আছে–গ্রামাঞ্চলে এক এলাকার অধিবাসী অন্য এলাকার লোকদের সদয় চোখে দেখে না–এই সব কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা কী দিয়ে দূর হবে? জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর চেতনা-প্রবাহ ছাড়া? সাম্রাজ্যবাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতনভূক ঢ্যাঁড়াদার, যথা মৃত আর্নল্ড টয়েনবী ত গত চল্লিশ বছর ধরে সেই জন্যে জাতীয়তাবাদের অপকীর্তনে পঞ্চমুখ ছিলেন। বাংলাদেশের বহু রাজনৈতিক নেতাই যে এলাকা থেকে আইন পরিষদের পদপ্রার্থী, তার বাইরে গোটা বাংলাদেশ দেখেন কী?

অবস্থাভেদে জাতীয়তাবাদ, বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বে, এখনও প্রগতিশীল ফোর্স। সমস্যা, মুসলিম রাষ্ট্রে তা কীভাবে অঙ্গীভূত হবে?

মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদের কথা শোনা যায়। কিন্তু তার বাস্তব প্রতিফলনের আজও দেখা মেলে না। মাঝে মাঝে ইসরাইল বা সাম্রাজ্যবাদী হামলার মুখে আরব-লীগের সদস্যগণ সক্রিয় হয়ে ওঠেন কেবল বাক্যব্যয়ে, সভাসমিতিতে। কিন্তু তাদের হস্তদ্বয় আস্তিনের ভেতরে গুটোনো থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি ইসরাইলের মোকাবিলায় কিছু আর্তনাদ ওদের শোনা যায়, কিন্তু কেউ তার পেছন-পেছন কোন কার্যকর পন্থা অনুসরণ করে না। কারণ, জাতিক রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা সেখানে আসল পরিচালক শক্তি। ফলে, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে নানা বিভেদের জালে জড়ানো। তারা এক কাতারে নামাজ পড়তে পারেন, কিন্তু বিশ্ব-মুসলিমের মঙ্গল ত দূরের কথা, নিজ বাসভূমি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদিত কয়েক লক্ষ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের দাবী নিয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে অক্ষম। আসল কারণ, আরব জাতীয়তাবাদের পাশ কাটিয়ে তারা নিজ নিজ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং বুচ্‌কি-সামাল তৎপরতায় অহরহ ব্যস্ত। অথচ ইসলাম ধর্মে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের কোন স্থান নেই।

কোন ধার্মিক মুসলমান পবিত্র কোরান হাদিসের বাইরে যেতে পারেন না। অনেকের মনে থাকতে পারে, পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়ায় মৌলানা মওদুদী তা সমর্থন করেননি। পাকিস্তান পত্তনের পর তা মেনে নেন। একজন আলেম বুজুর্গের পক্ষে এমন কাজ স্ববিরোধী। কিন্তু মৌলানা মওদুদীর জীবনে এমন স্ববিরোধের বহু নজীর আছে। ১৯৫৩ সনে পাঞ্জাবে আহমদিয়া বিরোধী দাংগায় উত্তেজনা-সৃষ্টিকারীর ভূমিকা ছিল তাঁর। পাঁচ হাজার লোক নিহত। বিচারে মওদুদী সাহেবের ফাঁসির হুকুম হয়, পরে ক্ষমা পান। যে-পশ্চিমী সভ্যতাকে তিনি জড়বাদী বলে সারা জীবন উপহাস করেছেন, সেই সভ্যতাপ্রসূত উন্নততর চিকিৎসার জন্যে মৌলানা মওদুদী মার্কিন দেশে যান এবং পঁচাত্তর বছর বয়সে বোস্টন হাসপাতালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মওলানা মওদুদী তাঁর "ভারত ও জাতীয়তাবাদ" গ্রন্থে লিখেছিলেন (বাঙলা তর্জমায়), "স্পিরিট এবং লক্ষে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ একে অপরের পুরোপুরি উল্টো।" (ঐ পুস্তক করাচী ২য় সংস্করণ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পৃষ্ঠা ১০)।

মরহুম মওদুদী কেন, কোন ধার্মিক মুসলমানই ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন না। আল্লাহর দু'টি কালাম অনুধাবন-যোগ্য, পবিত্র কোরান

থেকে গৃহীত। তর্জমা দু'টিই ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশান থেকে প্রকাশিত কোরান থেকে।

১. "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

কোরান-সূরা ৩৪/আয়াত ২৮/পৃষ্ঠা ৮২৪

২. তিনিই রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীন-সহ সকল দ্বীনের উপর উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও অংশীবাদীগণ উহা অপছন্দ করে।'

কোরান-সূরা ৬১/আয়াত ৯/পৃষ্ঠা ১০৭১:

যে-কোন মোমেন মুসলমান পূর্বোক্ত আয়াতের জোরে বলতে পারেন। আল্লাহর বাণীতে সোজা স্পষ্ট যে মানব-জাতিকে আরো ছোট-ছোট এবং পরস্পর-বিরোধী ভাগে বিভক্ত করা মানে সমগ্র মানবজাতির অখণ্ডতাও সার্বজনীনতা অস্বীকার। তা পবিত্র কোরানের বিরোধী। আল্লাহ্ এক এবং তেমনই তাঁর সৃষ্ট বান্দাগণ। তিনিই নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা রঙের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার উপর মানুষ যদি কৃত্রিম ভাগ করে তা অন্যায়, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং জাতি হিসাবে মানুষকে আলাদা করা যেতে পারে ন। আর এমন ভাগ আর এক দিকে ক্ষতিকর। বিভিন্ন দেশে মোমেন (বিশ্বাসী) মুসলমান আছেন। বিভিন্ন জাতির আওতায় নিয়ে গেলে বিশ্বময় তাদের ঐক্য-সংহতি ক্ষুণ্ন হয়। হজের উদ্দেশ্য ত বিশ্ব-মোমেনের সংহতি প্রকাশ। তাছাড়া, আরো মহা ক্ষতিকর অন্যদিক কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলে, ধর্মীয় চেতনার আর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চেতনার জন্ম হয়। তা জাতীয়তাবাদ। ফলে, ধর্মীয় চেতনা ক্ষুণ্ন, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রেষারেষি ও বিভেদের উৎপত্তি সেখান থেকে উৎসারিত। তাই এমনকি তারা মুসলমানের পরম শত্রুর মুখোমুখি মোকাবিলায় জোট বেঁধে দাঁড়াতে পারে না। লোকসংখ্যার অনুপাতে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান চৌত্রিশ : ইহুদী এক। অথচ, বিপুল সংখ্যক বার কোটি হয়েও ওরা পরাজয় ছাড়া আর জয়ের মুখ দেখে না।

পবিত্র কোরানে যে জাতীয়তাবাদের কথা আছে তা আধুনিক জাতীয়তাবাদ নয়। শুধু মরহুম মওদুদী নয়, সকল মুসলমানই নিজ সমর্থনে পূর্ব বর্ণিত যুক্তি খাড়া করতে পারেন। তা খণ্ডন অত সহজ নয়।

বর্তমান যুগে এই সমস্যার সমধান কঠিন। কারণ, বাস্তবে জাতিক রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদের প্রবণতা প্রবল বেগে ধাবিত। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ইকবাল খুব গর্বের সঙ্গে ফলাও প্রচার করতেন, তিনি ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক নন। তিনি লিখেছেন, "আমি যে ফারসী ভাষায় কবিতা লিখেছি তা ইসলামের ওকালতি করার জন্য নয়। আমি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার অন্বেষায় আছি। আমার অন্বেষা : আরো উন্নততর সমাজব্যবস্থা যেখানে সমস্ত জাতি, বর্ণ এবং রঙের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্থক্য উচ্ছেদই মূল লক্ষ্য।" [খাজা গোলাম সাইয়েদীন প্রণীত ইকবাল্স্ এডুকেশনাল ফিলজফি দ্রষ্টব্য]

এখানে জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পর্কে ইকবাল দ্ব্যর্থহীন। তা আর যাই হোক ইউরোপীর ন্যাশনালিজ্‌ম নয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কের নিকট সমস্যাটি ধীরে ধীরে প্রকট হয়। ইসলাম ধর্মের জিগীর তুললেও অনেকে অজানিতে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। কিন্তু শেষে আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকে না।

বঙ্গদেশ বিভাগের যথা-পূর্বে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে এক ট্র্যাজিক নাটক অভিনীত হয়। মুসলিম লীগের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাসেম (দুই মরহুম) কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর সঙ্গে মিলিত হন বঙ্গবিভাগ রোধ-কল্পে। কিন্তু আর ফিরে যাওয়ার পথ কোথায়? আবুল হাসেম শারীরিকভাবে অন্ধ ছিলেন, তেমনই রাজনীতি এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে। নচেৎ যে দানব তাঁরা সৃষ্টি করেছেন তা আবার বোতলে বন্দি করতে যান কেন? সাম্প্রদায়িকতাবাদীর মধ্যে শেষ মুহূর্তে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার সহসা-ঝলক গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে এখন এই সমস্যা বিকটভাবে প্রকট। ধর্মের নির্দেশ আন্তর্জাতিকতার দিকে; সমাজ টানে জাতিক রাষ্ট্রে পানে। মিশরের মরহুম নাসের "সংযুক্ত আরব রিপাবলিক" গড়লেন, কিন্তু টিকল না। সেই উৎসাহ-তরঙ্গে পাকিস্তান অর্থনীতি-রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠন তৈরী করে। কিন্তু তা হামাগুড়ি দেওয়া পর্যন্তই। আর খাড়া হোল না। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে করাচীতে নাসের বলেছিলেন, "আওয়ার কান্ট্রি ডাজ নট ফেভার দি ক্রিয়েশান অফ এ্যান ইসলামিক ফেডারেশন। আমার দেশ ইসলামী রাষ্ট্রজোট বাঁধার দিকে তেমন আগ্রহী নয়।" এই উচ্চারণ জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিধ্বনি।

ইন্দোনেশিয়ার মরহুম প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্ণো নাহ্‌দাতুল মুসলেমীন, মসজুমী প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক পার্টির সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে বলেন যে জাতীয়তাবাদ ইসলামের পরিপন্থী নয়, ভাবাদর্শ হিসেবে। মরহুম সোয়েকার্ণোর জবানবন্দি এরূপ, "....আমার মতে জাতিক্ রাষ্ট্র স্থাপনে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা নেই। অনেকে ভাবে, জাতীয়তাবাদী হওয়া মানে নিজের দেশকে পূজা করা। না, তা না। আমার দেশকে আমি ভালবাসি মানে আমি তার পূজা করি না।" স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর-নায়ক আরো বলেন যে দেশের বহু খ্রিস্টান তাঁর পাশে থেকে সংগ্রাম করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র করলে তারা ভাববে এই অবমাননার জন্যে কী জান-কবুল লড়াইয়ে যোগদান করেছিলাম?

একই চত্বরে হাল্‌ফিল মরহুম আইয়ুব খানকে স্মরণ করা যায়। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তিনি কম বিচলিত ছিলেন না।"দি উলেমা' থট, ইন টার্মস্

অফ এ গে-রিয়াস দো নেবুলাস পাস্ট্ অ্যান্ড এ ডাস্ট্ বাট আন্-আইডেন্টিফাইড ফিউচার অফ মুসলিম ব্রাদারহুড। অ্যান্ড দিস মোর দ্যান এনিথিং এল্স ড্যামেজ্ড দি গ্রোথ, অফ মুসলিম ন্যাশ্নালিজম অ্যান্ড রিটার্ডেড দি প্রগেস অফ মুসলিমস্ ইন দি সাবকন্টিনেন্ট, ... ইন দি মিড্ল ইস্ট।" [ফ্রেন্ডস্ নট মাস্টার্স–মোহাম্মদ আইয়ুব খান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লাহোর-করাচী-ঢাকা ১৯৬৭। পৃষ্ঠা ২০০-২০১]

এবার বাঙলায় তাঁর "প্রভু নয় বন্ধু" গ্রন্থ থেকেই সাফাই শুনুন, "উলেমারা অস্পষ্ট অতীত এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বিশাল ভবিষ্যতের কথা বলেন। অবিশ্যি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা স্পষ্ট কোন ধারণা দিতে অক্ষম। এমন পদক্ষেপের ফলে, আর যাই হোক, এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী বিকাশের ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রগতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত। যারা মনে করে, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভাবাদর্শ খাপ খায় না, তারা বলতে চান যে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের কোন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায় ঢের-ঢের আবাসভূমি আছে। মধ্যপ্রাচ্যে এত আবাসভূমি আছে, তোমাদের আবার আবাসভূমির দরকার কোথায়?"

আইয়ুব খান এখানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেছেন। সমস্যার গোড়ায় যাননি। তার প্রমাণ, তিনি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল নীতির কথা উল্লেখ করেন। পূর্বোক্ত একই গ্রন্থে তিনি শাসনতন্ত্র নীতি সম্পর্কে বলেন যে সেখানে প্রথম দরকার : তৌহিদ, আল্লা এক, এই মূলমন্ত্র। আর প্রয়োজন : আল্লাহর নিকট সকল মানুষ সমান। আবার একই নিঃশ্বাসে তিনি উচ্চারণ করেছেন, "এটা ঠিক, এমন সমাজে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের কোন জায়গা নেই। তবু দেশের সীমা রক্ষা, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের দায়িত্ব সকল স্থানীয় অধিবাসী।"

অর্থাৎ, আইয়ুব খান মচ্কালেন, কিন্তু ভাঙলেন না। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু সমাধান দিতে দ্বিধান্বিত। তাই মাটিতে পা রাখার ভান করেও তিনি নিজে ত্রিশঙ্কু ঝুলে রইলেন।

পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের নিকট জাতীয়তাবাদের সমস্যা আজ বিশেষভাবে প্রকট। সকল রাষ্ট্রই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। ফলে, জাতীয়তাবাদী না হয়ে গতি নেই। আবার পবিত্র কোরানের বাণী পালনও তার কাছে বাধ্যতামূলক। এই দোটানায় সকল মুসলিম রাষ্ট্র ফন্দী ফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করে। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যের হালচালে তা পরিষ্কার। তাই ফিলিস্তিনী মজলুম ভাইদের তারা পুরোপুরি গ্রহণ বা বর্জন করতে অক্ষম। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী অস্বীকার করলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ আর শান্ত থাকবে না। তা শাসকগোষ্ঠী ভালমত জানে। এবং তাই 'ধরি-'মাছ-না-ছুঁই পানি" নীতির আশ্রয়ে গিয়ে চামড়া বাঁচায়। তাঁরা ইসলামের মহিমা-কীর্তন এবং ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে সর্বদা সক্রিয়। এই ভাবে প্রতিদিন ইসলামের এই সব রক্ষক তথা শাসকেরা ধূর্তামির আড়ালে লুকায়। আল্লাহর নির্দেশ আদৌ পালন করে না।

পবিত্র কোরানে আছে, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যাহা কর না তাহা কেন বলো? তোমরা যাহা কর না, তোমাদিগের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অসন্তোষজনক।" কোরান-সুরা ৬১-আয়াত ২-৩।

মুসলিম রাষ্ট্রে এই মুনাফেকী বা ভণ্ডামী অব্যাহত আছে দশক-দশক ধরে। কারণ, জাতীয়তাবাদের সমস্যার আজও কোন ফয়সালা হয়নি। তাই সেখান ইসলামী ভ্রাতৃত্ব হয় নরঘাতী, নারীঘাতী, আত্মঘাতী এবং জাতীয়তাবাদ বিকৃত সাম্প্রদায়িকতা। ইরাক-ইরান লড়েই চলে। বছরের পর বছর।

পরিবর্তন ১৫ই জুন, ১৯৮৪

দাসত্বের খোঁয়ারি

AMARBOI.COM

পুরাতন অভ্যাসের মত দাসত্বের খোঁয়ারি খুব সহজে মুছে যায় না। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে তা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়।

মধ্যযুগে এমন কি উনিশ শতকেও কোন দেশ স্বাধীন হলে, শুধু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে গোলামীর চিহ্ন মুছে ফেলতে পারত। বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়। উদাহরণতঃ পনের শতকের স্পেনের কথা ধরা যাক। অষ্টম শতাব্দীর কোন এক সময় স্পেন আরবদেশী মুসলমানদের করতলগত হয়। প্রায় সাত শ' বছর মোটামুটি এই আধিপত্য বজায় থাকে। তারপর স্থানীয় খ্রিস্টান অধিবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইউরোপ রেনেসাঁসের বদৌলতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে স্বাদেশিক চেতনা তীব্রতা লাভ করে। অন্যদিকে মুসলমান শাসকেরা জ্ঞান-বিমুখ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হীনবল হতে থাকে। উম্মাইদ এবং আব্বাসীয় কলহ স্পেনেও গিয়ে পৌছায়। যদিও ধর্মীয় খোলসে আত্মকলহ, কিন্তু তার মূল উৎস ক্ষমতা-দখলের লড়াই। মুসলমান শাসকদের শেষ ঘাঁটি গ্রানাডার পতন ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক, তবু জেনে রাখা ভাল, গ্রানাডার পতনের পর স্পেনের খ্রীস্টান বিজয়ী শাসক-গোষ্ঠী মুসলমানদের সামনে দুই বিকল্প খাড়া করে : ধর্মান্তরিত হও অথবা বহিস্কৃত হও। সাতশ' বছর পর ঈমানের জোর মূলের মত অটুট থাকার কথা নয়। বলা বাহুল্য, বহু মুসলমান খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচায়। অনেকে স্পেন ত্যাগ করে ভবিষ্যতের সকল ঝুঁকি সহ। স্বাধীন স্পেনে মুসলমান শাসকদের কোন যো রইল না সদর-পথে বিদায় নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার খিড়কী পথে ফিরে আসার। অবিশ্যি মুসলমান খলিফাদের আমলের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যাদির প্রভাব রয়ে গেল। রেনেসাঁসের উন্মেষ বলে নয়, কোন জাতির মানব-জগতের এই সব অবদান বিশ্বে সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, ইউরোপের সেই চেতনা তখন জাগ্রত। কিন্তু সাবেক মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক আধিপত্য বা শোধনের চিহ্ন স্পেনে কোথাও রইল না।

যন্ত্রশিল্পাকীর্ণ আধুনিক যুগের সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপে সম্পূর্ণ আলাদা। মধ্যযুগে বিজয়ী কোন শাসক-গোষ্ঠী কালে কালে সে দেশের বাসিন্দা হয়ে পড়ত। মোগল-পাঠানদের ইতিহাস ত জানা। কিন্তু ইংরেজের বেলায় আর তা খাটল না। উপনিবেশে জন্মালেও তাদের শিশু ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে যায়।

তার কারণ, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সংকুচিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বিজয়ী দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তিধারায় কোন শাসক গোষ্ঠীকে আর সেই দেশের অধিবাসী হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। প্রয়োজন হয়, অর্থনৈতিক শোষণ এবং তা বজায় রাখার জন্যে শাসন-বিন্যাস। উপনিবেশবাদ বা কলোনিয়ালিজমের মূল সূত্র এইখানে নিহিত। উপনিবেশবাদী দেশকে বলা হয় মেট্রোপলিস। এই মেট্রোপলিসের স্বার্থেই পদানত দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বর্তমানে শাসন-বিন্যাস ক্রমশঃ ভয়ানকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, পূর্বে যা ছিল বহুলাংশে বিকেন্দ্রিত। এমন কাঠামোর জন্যে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপও বদলে গেছে। অবিশ্যি অর্থনীতির লজিক সেখানে মূল নিয়ন্ত্রক। উনিশ শতক, এমন কী বিশ শতকের প্রথমাংশে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা ছিল খুব সহজ : লগ্নী পুঁজির মুনাফা সর্বোচ্চ সীমায় রক্ষার উদ্দেশ্যে এক দেশ কর্তৃক অপর দেশের উপর শাসন এবং অন্যান্য রকম আধিপত্য বজায়। কিন্তু বর্তমানে সংজ্ঞা আর অত সংকীর্ণ এবং সরল নয়। এখন সাম্রাজ্যবাদকে ঘিরে নানা ধরনের ইনস্টিট্যুশান গড়ে ওঠে এবং তার ব্যাপকতা সারা দুনিয়া জুড়ে। এই সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কেন্দ্রে জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ আবর্তিত হয়। যদিও তার মূল লক্ষ্য অনুন্নত দেশগুলো। কিন্তু যেহেতু পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, মেট্রোপোলিসের উপরও তার প্রভাব গিয়ে পড়ে, সেখানেও তখন নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদে তাই এযুগে গোটা বিশ্বজুড়ে ক্ষমতা ও প্রভাব রক্ষার এক ব্যবস্থা-বিন্যাস। কোন এক অনুন্নত এলাকার বিচার-বিশ্লেষণ মারফৎ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বুঝা যুক্তিযুক্ত নয়। তামাম দুনিয়ায় তার অক্টোপাশী নুলোর গতিবিধি বরং লক্ষ্য করা দরকার, সম্যক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে। সেই জন্যে 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ' কথাটা এককভাবে নেহায়েৎ বাগাড়ম্বর। সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে বহুজাতিক ব্যাপার। তার বিভিন্ন জটাজাল সমাজ-তাণ্ডব-নৃত্যেরই এক ভয়ঙ্কর প্রকাশ।

মেট্রোপোলিসে শক্তি-আধিপত্য অটুট রাখতে তাদের নীতি নির্ধারকগণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারস্পরিক সমঝোতায় কাজ করে, যেন একের নীতি অপরের সহায়ক হয়। এমন সব মূল্যবোধ অনুন্নত দেশে পাচার করা হয় যেন শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রভুত্ব যথাযথ থাকে এবং শক্তি সঞ্চয় করে। সাংস্কৃতিক নানা রকমের পাঁয়তারা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব বা অনুন্নত দেশের জন্যে তাই তৈরী হয়। উন্নত সভ্যতার ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া ফন্দি তার মধ্যে অন্যতম। বিলাস-বহুল, আরামদায়ক আস্‌বাবে তৈরি, আয়েশের সুড়সুড়িদাতা ওদের ইন্‌ফরমেশন সেন্টার বা তথ্য কেন্দ্রগুলো কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। শত শত রকম প্রচার-পুস্তিকা, পুস্তক; উন্নতমানের ছাপা, প্রচ্ছদ, কাগজ বাঁধাই। ভেতরে মাল যত পচাই হোক, কিছু আসে যায় না। আপিমের নেশা কাটিয়ে বহু দশকের ভুল ভাঙার পর সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর জন্যে বিশেষ বিপদ, উন্মত্ত সভ্যতার এই হাতছানি। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, যাদের সামনে ভবিষ্যৎ নানা স্বপ্ন নিয়ে ভিড় করে। তাদের কাছে স্বদেশের প্রতিমূর্তি ও মূল্যবোধ ঝাপসা থাকার দরুণ, পতঙ্গের মত তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-ভিত্তিক সংস্কৃতি-প্রদীপের দিকে দলে দলে ধেয়ে যায়। ফন্দীবাজদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কিন্তু অনুন্নত দেশ তার দাম দেয়, অতি চড়া। অপ-সংস্কৃতির বন্যায় যুবসম্প্রদায়, নব্য বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় স্বাজাত্যের চেতনা হারিয়ে স্বদেশে ভাসমান আগাছায় পরিণত হয়। তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া নানা অনাচারের উৎস। উন্নত যন্ত্রশিল্প-জাত সভ্যতার এই অভিঘাত কোন সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টি থেকে সরে থাকা অপরাধ। কতো রকমের ভেল্কি না তথাকথিত সভ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছড়িয়ে রাখে অনুন্নত দেশের পথে-ঘাটে। বিনা টিকেটের ফিল্ম শো ত সাধারণ ব্যাপার। কোথাও ডুপ্লিকেটিং মেশিন খয়রাৎ দেওয়া হোলো, কোথাও ফিল্ম প্রজেক্টার, লাউড স্পীকার, ভ্যান। তাছাড়া আছে বাছা-বাছা লোক বা ছাত্রকে বৃত্তিদান, বিদেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা। উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের অফিসারদের অনুদানের সুযোগ। সাংস্কৃতিক গ্রুপের সঙ্গে তথাকথিত ভাব-বিনিময়ের নামে আমন্ত্রণে বিনিময়। এই ধরনের 'নাইওর' এন্তেজাম করা হয় যেন তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশ্বে অনুপ্রবেশের সুবিধা ঘটে বা অব্যাহত থাকে। তৃতীয় বিশ্বের এই 'এলিটরা' সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিভাগের মিত্র হয়ে ওঠে। প্রায় অধিকাংশ জনই উন্নতমানের জীবন-যাপন ধারার মধ্যে সব-পেয়েছির-দেশ খুঁজে পায়। বিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকতার খপ্পর থেকে রেহাই তাই অত সহজে পাওয়া যায় না।

রাজনৈতিক ফ্রন্টে পরিবেশ আরো জটিল এবং গোলক ধাঁধাময়। স্বাধীন হলেই সব সমস্যা মিটে যায় না, বরং আরো বিপুল সংখ্যায় ধেয়ে আসে এবং ঘিরে ধরে।

কংগোর স্বাধীনতা ঘোষণার দিনে, ঠিক তেইশ বছর পূর্বে, রবার্ট, রুয়ার্ক নামক ঔপনিবেশিকতার এক ঘোর সমর্থক যে-কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, তা আজও বাসি হয়ে যায়নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশপ্রেমিক নেতাদের অন্ততঃ তা বার

বার স্মরণ করা উচিত। মিঃ রুয়ার্ক বলেছিলেন, "দি গ্রেটেস্ট হোপ অফ দি মানীড় ইন্টারেস্ট ওয়াজ দ্যাট ইন্‌ডিপেনডেন্স উড ব্রিং সাচ কেয়স দ্যাট এ কাইন্ড অফ নিউ ইকনমিক কলোনিয়ালিজম মাইট বি ইমপোজড়, উইথ দি হোয়াইট ম্যান রানিং দি থিং বাট আন্ডার এ ব্ল্যাক-ফিগার হেড, হুজ ম্যাটেরিয়াল ওয়ান্টস্‌ মাইট ইজিলি বি এ্যাপিজড় ইন ওয়াইন, উইমেন অ্যান্ড ফ্ল্যাশী কার্স, প্লাস এ সুইস ব্যাঙ্ক একাউন্ট।" [নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড় টেলিগ্রাম অ্যান্ড সান, জুন ৩০, ১৯৬০ দ্রষ্টব্য]

মোটামুটি বাঙলা তর্জমায় দাঁড়ায়, রুয়ার্ক সাহেব বলেছিলেন, "আর্থিক সুবিধা ভোগের দিক থেকে সবচে বড় আশা [ওদের] স্বাধীনতা গোলতাল পাকিয়ে আসবে যে তখন নতুন ধরনের অর্থনৈতিক উপনিবেশিকতা চাপিয়ে দেওয়া যাবে, যেখানে ব্যবস্থা চালু রাখবে ধলা আদ্‌মী, কিন্তু সাক্ষী গোপাল কালা আদ্‌মীর তাঁবে, যাদের জাগতিক খাঁই-খাহেশ সহজেই মেটানো যাবে মদ, মেয়ে-মানুষ, চোখ-ধাঁধানো। ঝক্‌মকে গাড়ী এবং তার সঙ্গে এটা সুইশ ব্যাঙ্কের একাউন্ট জুড়ে দিয়ে।"

প্রায় তেইশ বছর পূর্বে খোলাখুলি প্রকাশ্য ঘোষণা। কিন্তু দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বে রুয়াক সাহেবের আশা আদৌ দুরাশা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ভোল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই পাল্টে ফেলেছিল। আধুনিক যুগে সরাসরি শাসন বা আধিপত্য বজায় রাখা কঠিন। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় জাগরণ এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব তার জন্যে বড় বাধা। তাই সোজাসুজি চোখ-রাঙানো আধিপত্য অচল। অতএব, সদর দিয়ে বেরিয়ে যাও এবং খিড়কী পথে ঢোকো। সাম্রাজ্যবাদ সেই খিড়কী পথ আবিষ্কার করছে। প্রাক্তন উপনিবেশের 'এলিটবৃন্দ' সেখানে বড় সহায়। তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এখনও বজায় আছে। অনুন্নত দেশে গোলামির খোঁয়ারি তাই সহজে কাটতে চায় না। প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক স্বার্থ জড়িত যে বিভেদ আছে বা অন্যান্য ধরনের ব্যবধান–সে-ই সব বিভেদের উপরই সাম্রাজ্যবাদের নীতি ও কৌশল রচিত হয়। কোথাও ধর্মের ব্যবধান যেমন আফ্রিকায়–ট্রাইবে-ট্রাইবে, কৌমে কৌমে ব্যবধান। এই সব আদিম প্রবৃত্তির মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের টেক্কা-তুরুপ জমা থাকে। তাই সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে কোরিয়া পর্যন্ত অবলোকন করলে চোখে পড়বে সাম্রাজ্যবাদের 'ভাগ করো অথবা ভাঙো।' মন্তরের তেলেস্‌মাতী খেল। কোরিয়া দু-টুকরো। ভিয়েৎনাম দু'টুকরো, ভারত দু'টুকরো, কাম্পুচিয়া দু'টুকরো। ভিয়েৎনাম জোড়া লেগেছে অনেক রক্তক্ষয়ের পর। সেখানে টুকরো হয়নি, সেখানে অন্তর্ঘাতী ভগ্নদশা। যেমন, লেবানন। যেহেতু গোটা বিশ্বে সব জায়গায় এককভাবে আধিপত্য রক্ষা সম্ভব নয়, সাম্রাজ্যবাদ তাই স্থানীয় এজেন্ট সৃষ্টি করে বিভিন্ন এলাকায়। ইসরাইল, ইরানের শাহ সাম্প্রতিক ঘটনা। শাহ নেই বর্তমানে। ইসরাইল আছে। মোদ্দা কথা, সবই এক উৎস থেকে বহির্গত। প্যালেস্টাইনের হতভাগ্য অধিবাসীরা বর্তমানে স্বদেশ-চ্যুত। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিশ্লেষণ করলে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসরাইল রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কেউ প্রশ্ন তোলেনি যে প্যালেস্টাইনে অধিবাসী আছে–সেখানে মানুষ আছে। এই মানসিকতা থাকলে ত সাম্রাজ্যবাদ চালানো যায় না। অপর দেশের মানুষ যে মানুষ এবং মানবিক আচরণের হক্‌দার, এমন মনোবৃত্তির অধিকারী হলে ত আণবিক বোমা বানানো চলে না। মার্কিন দেশেই প্রথম আণবিক বোমা প্রস্তুত হয়। তার প্রতিক্রিয়ায় পরে অন্যান্য দেশে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ত মানুষ নয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের নিকট। রাজনৈতিক যোগসূত্র আলাদা কথা। কিন্তু ওদের মানসিক পটভূমি ক্লেদাক্ত উন্নত সভ্যতার অভিমানে তৃতীয় জগতের বেলা অন্ধ। গরজ ও স্বার্থে তৃতীয় জগতে তারা এজেন্ট সৃষ্টি করে। সেই দেশের আর্থিক স্বার্থভোগী এলিটরা তাদের মিত্র হয়ে পড়ে। তাই বর্তমান যুগে জাতি-কে ব্যষ্টি রূপে ধরে ঔপনিবেশিকতার চিহ্ন তেমন মিলবে না। অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যষ্টিরূপে গ্রহণ করলে সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারা চোখে পড়বে।

এহেন কলা-কৌশলে প্রাক্তন উপনিবেশে জাতীয়তার ভাবধারাও স্তিমিত হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিন-যাপনে প্রয়াসী সামাজিক নেতৃত্ব-দানে এলিটরা সাম্রাজ্যবাদীদের মত–যেহেতু ছোট তরফদার–স্বদেশের মানুষকেও আর চোখে দেখে না। তাদের ত উপনিবেশ নেই। সুতরাং নিজের দেশকেই উপনিবেশিক সুলভ কাঠামোয় ঢালতে হয়। কিন্তু স্বদেশ ত শত শত বছরের শোষণে অস্থিসার। তখন তারা এই শীর্ণ কংকালের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে শকুনের মত। অস্থিসার কংকাল। কিন্তু শকুনের সংখ্যা বহুৎ। অতীতের জের অব্যাহত থাকে। রোগশোক, জরা, ক্ষুধা, অপমৃত্যু, অশিক্ষা, সামাজিক অনাচার দৈনন্দিনতার প্রবাহ হয়ে ওঠে। দাসত্বের জের আর স্তব্ধ হয় না।

তার কারণ, বিদেশীদের অর্থনৈতিক নিগড়ে এলিটরা বাঁধা। পদে পদে তাদের মুখাপেক্ষী। ঔপনিবেশিকতা আবার ফিরে আসে নতুন পর্যায়ে।

জাতীয় ভাবধারা দূরের কথা, এই পথে মনুষ্যত্ব খোয়ায় আত্মসম্মান, অসম্মানের জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে বসতে হয়, মধ্যযুগে যা সম্ভব ছিল না। তাই রক্তের দরিয়াস্নাত 'বাংলাদেশ বেতার' আবার 'রেডিও বাংলাদেশ' হয়। বিগত '৭৬ সনে জীবিত, জুলফিকার আলি ভুট্টো বাংলাদেশের অধিবাসীদের জন্যে কিছু চাল ও কাপড় পাঠিয়েছিলেন। সেই জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি এবং পটকা-বাজির আওয়াজ দ্বারা অভ্যর্থিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের হাহাশ্বাস এখনও বাংলাদেশের বাতাস মুছে দিতে পারেনি। 'স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' (হাব্বুল ওয়াতান মিনাল ঈমান'–হাদিস)। তবু মানবিক আত্মসম্মানের এই অবমাননা! যেন বাঙলাদেশের মা-বোনকে বেইজ্জৎ করার জন্যে কয়েক গজ কাপড় ও এক-আধ সের চালই যথেষ্ট।

ঈদ সংখ্যা সন্ধানী, ১৯৮৩

ঝুটা চেতনার ফাঁদ : সাম্প্রদায়িকতা

দহগ্রাম.........

তালপট্টি ....

ফারাক্কা..........

মাঝে মাঝে এই রকম হট্টগোল চীৎকারে বাংলাদেশের বাতাস আন্দোলিত হয়ে ওঠে। শুধু বাতাস নয়, সভা-মিছিল, শ্লোগান-বাহী জনতার ঘূর্ণী পৌঁছায় হিস্টেরিয়া, মৃগী উন্মাদনার পর্যায়ে। অনেকের কাছে মনে হতে পারে, জাতীয়তাবাদীদের তাগিদে এমন পরিস্থিতির অভ্যুদয় ঘটে থাকে। জাতীয় স্বার্থ এবং সম্মানের আসন অটুটু রাখতে দেশপ্রেমের প্রেরণায় মানুষ দাবী নিয়ে ময়দানে জমায়েৎ হয় এবং এগিয়ে যায় কোন সড়ক ধরে বিশ্ববাসীকে এবং দেশের সকল মানুষকে সচেতন করতে।

কিন্তু এদেশে সহজে কারো এমন সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত নয়। বিগত পঞ্চাশ বছরের পটভূমি থেকে তা প্রত্যেকের শেখা উচিত। সাম্প্রদায়িকতাকে কি জাতীয়তাবাদরূপে এদেশে একদা চালু করা হয়নি? নচেৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব কী করে হোল? চব্বিশ বছরে সেই সাম্প্রদায়িকতা নামে জাতীয়তাবাদ দেখা গেল ভূয়া। অথচ কোটি কোটি মানুষ একদা এই মরীচিকার পেছনে ছুটেছিল। ভূত-ভবিষ্যৎ কাল তাদের সামনে ছিল না। ছিল শুধু বর্তমান। এই ভূখণ্ডের মুসলমান সেদিন প্রতারিত হয়েছিল, অথচ বুঝতে পারেনি। বুঝতে দুই দশক লেগে গেল। ভুল সংশোধন করতে স্বভাবতঃই দাম দিতে হলো এবং বড় চড়া দাম : তিরিশ লক্ষ প্রাণের বলি, মা-বোনের অবমাননা এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস। একাত্তুর সনের মুক্তি-সংগ্রামের স্মৃতি কি কোন বাঙালী মুসলমান এত সত্বর ভুলে যেতে পারে? একদা-পূর্বপাকিস্তান আজ মানচিত্র থেকে কোথায় উবে গেল, কেন গেল—এই প্রশ্ন দেশ-প্রেমিক প্রত্যেক মানুষের বুকে জাগা উচিত। রাজনৈতিক পদক্ষেপে গল্‌তি থাকলে, তার সংশোধনী মূল্য সস্তা হয় না আদৌ। তাই যখনই কোন শ্লোগান ওঠে তার তাৎপর্য তলিয়ে দেখা উচিত। একদা পাকিস্তান-মরীচিকার পেছনে ছুটেছিল এই ভূখণ্ডের মুসলমান, তাদের বাছ-বিচারের সময় ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনকে মনে করা হোত হিন্দু-শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মুসলমানের আন্দোলন। তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতাদের প্রচার-তূর্ণে এই একটা মাত্র ছিল মোক্ষম বাণ। আর তা-ই তারা নিক্ষেপ করতেন সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকায়। মিছিলে, শ্লোগানের মুখ্য ভাষা ছিল : হিন্দু বনাম মুসলমান। এক কথায়: সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মের দোহাই হয়ে উঠেছিল রাজনীতির প্রধান বাহন। ইহলৌকিক সমস্যার সমাধানে পারলৌকিক দাওয়াই। জনসাধারণ, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রত্যেকেই সেদিন লীগ নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। কারণ, ধর্ম মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানস-লোকে বিভিন্ন শিকড়ে প্রসারিত এক বিশাল মহীরুহ। সহেজ প্রতারিত হয় মানুষ এমন ক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার, সেখানে বিচার-বিশ্লেষণ বড় গৌণ এবং কেউ সহজে সেই পথ মাড়ায় না। সুতরাং বাতাসের উপরই মানুষ তখন তার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি গড়ে তোলে। অথচ বিচার-বিশ্লেষণ দরকার। নচেৎ আখেরে ঠকতে হয়। বাংলাদেশের মুসলমানকে আজ তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। "পাকিস্তান"—শুধু এই শ্লোগানেই অনেকে তখন তার ভবিষ্যৎ মনোরম জীবনপর্ব দেখতে পেয়েছিল। কোন বিচার-বিশ্লেষণের কথা উঠলেই মুসলিম লীগ নেতাগণ পর্যন্ত তা চালাকির সাথে এড়িয়ে যেতেন। হিন্দু কর্তৃক মুসলমান শোষিত। সুতরাং মুসলমানের নয়া আবাসভূমি প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ হিন্দু চাষী মজুর কামার কুমোর চামার প্রভৃতি কোন্ মুসলমানকে শোষণ করছে? আর ব্রিটিশ আশ্রিত অঙ্গরাজ্য... জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, চিত্রল প্রভৃতির শাসক যদিও মুসলমান—তারা কী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে শোষণ করছে না? এমন প্রশ্ন তুললে লীগ নেতারা পাশ কাটাতেন। পাকিস্তান হোলে, তার রাজনৈতিক কাঠামো কী হবে? তা কী গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, না সামন্ততান্ত্রিক হবে? এমন প্রশ্নের জবাব দিতে কোন নেতা রাজি ছিলেন না। খোদ জিন্না সাহেবের বহু-উদ্ধৃত বাক্য আবার সকলের অবগিতর জন্যে তুলে ধরা দরকার। তা বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা। অতীতের ব্যাপার মনে হোতে পারে। কিন্তু, তা নয়। কারণ, সাম্প্রদায়িকতা মরেও মরে না, প্রেতাত্মা লাভ করে। জিন্না সাহেব পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর প্রশ্নে কিছু তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন, "....দেয়ার ফর আই সে টু দি ইমপেশেস্ট ইয়োথ, বি নট কন্‌সার্নড্ উইথ ডিটেল্‌স্ অফ দি স্কিম ..... হু নোজ হোয়াট শেপ পাকিস্তান উইল ফাইনালি টেক অ্যান্ড ইন হোয়াট ফর্ম উইল এমার্জ ফ্রম দি টারময়েল অফ দি ইয়ার্স?—বাঙলা তর্জমায়—সে জন্যে আমি অধৈর্য যুবকদের বলি, পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামিও না... কে জানে শেষ পর্যন্ত কালের প্রচণ্ড কোলাহলময় আলোড়ন থেকে পাকিস্তান আখেরে কী রূপ নেবে, কী হবে তার গঠন।" (২০ এপ্রিল, ১৯৪১ সন, স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা, দিল্লি সংস্করণ)।

বক্তব্য স্পষ্ট। অর্থাৎ খোদ নেতাই জানেন না, পাকিস্তানের কাঠামো কি হবে। কারণ, বাতাসের উপর ভর করেছিলেন তিনি। শুধু মুসলমান জনসাধারণের মধ্যযুগীয় আবেগই ছিল তাঁর পুঁজি। আটঘাট ঠিক মত না বাঁধার ফলে, পাকিস্তানের ভিতর থেকে বহু রক্তস্নানের পর আবার বাংলাদেশ বেরিয়ে আসে। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একত্রে শুধু টিকে আছে স্বৈরাচারী শাসনের মহিমায়।

ইতিহাস থেকে তাই নতুন করে সবক নেয়া আবার প্রয়োজন। কারণ, যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল মুসলিগ লীগের একমাত্র পুঁজি, অনেকের ধারণা, পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠার পর তার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। পাকিস্তান হলে, সাম্প্রদায়িকতা চিরতরে মুছে যাবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে লীগ নেতাগণ তা জোরেশোরে প্রচার করতেন। কিন্তু দেখা গেল, অল্প দিনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সরীসৃপ আবার ফণা তুলে খাড়া। বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। তার মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি মুসলমান রয়ে গেল। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে অমুসলমান মুষ্টিমেয়। কিন্তু পূর্বাংশে এক কোটি অমুসলমান আপন স্বদেশ আঁকড়ে রইল। সুখের বিষয়, ইংরেজী চৌষট্টি সনের পর পাকিস্তানের পূর্বাংশে এবং বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলে সাম্প্রদায়িকতা চিরতরে দূর হয়ে গেছে বলা কঠিন। পশ্চিম পাকিস্তানে ত মাইনরিটি ছিল না বললেই চলে। তার ফলেও কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মরে যায় নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লীগ-ধুরন্ধরদের নতুন নাম-আবিষ্কারে বেশ ক্ষিপ্র-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং যেহেতু বাংলাদেশ একদা-পাকিস্তানের অংশ ছিল, এই ভূখণ্ডে তার জের আজও চালু আছে। পাকিস্তানের নেতারা জানতেন, ভারতবর্ষের নামে সাধারণ নাগরিকদের উত্তেজিত করা খুব সোজা। কারণ, দেশ-বিভাগের সময়কার দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক শত্রুতা এবং তিক্ত স্মৃতি সহজে মুছে যায় নি। পূর্বে "হিন্দু" শব্দ উচ্চারণ করলে বহু মুসলমানের মনে যে-মধ্যযুগীয় বৈদ্যুতিক প্রবাহ বয়ে যেত এখন "ভারত" উচ্চারণ করলেই সে-ফল অতি আশু পাওয়া যাবে। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তা জানতেন। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটানোর একটি উপায়, সংকট কালে কোন কল্পিত শত্রু সৃষ্টি। স্বভাবতঃই দেশের অস্তিত্ব যেখানে বিপন্ন সেখানে অন্য সমস্যার আর কোন গুরুত্ব থাকে না। পাকিস্তানের নেতাগণ এই ইলেম চমৎকার রপ্ত করেছিলেন। কাশ্মীর সমস্যা আজও মেটেনি, পাকিস্তান সৃষ্টির ছত্রিশ বছর পরে। কিন্তু 'কাশ্মীর' 'কাশ্মীর' ছুতো পাকিস্তানের নেতাগণ কতবার তুলেছেন রীতিমত হিসাবের ব্যাপার। 'ভারত', 'কাশ্মীর' ইত্যাদি শব্দের মাহাত্ম্য মরহুম জুলফিকার আলী ভুট্টো সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ঘাস খেয়েও ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর লড়াইয়ের শপথ নেন। তাই পূর্বেই উল্লিখিত, সাম্প্রদায়িকতা সহেজ মরে না। তার প্রেত আজও এই উপমহাদেশের কাঁধে ভর করে আছে। একদা-পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে সেই প্রেত মাঝে মাঝে দেখা দেয়। তার কারণ, হিন্দু-মুসলিমের জিগীর আর ধারে কাটে না। দেশের মানুষ এই ভেল্কি ধরে ফেলেছে। তা না হোলে বাংলাদেশের জন্ম হোত না। তাই নতুন ভেল্কির প্রয়োজন হয়। এ দেশের জনগণের শত্রুরা ভোল, কৌশল দুই-ই পাল্টিয়েছে। তা প্রত্যেকের জানা উচিত। হিন্দু-মুসলমান শব্দ আর তারা ব্যবহার করে না। দুর্জনের বাহানা হাজার রকম হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে ছুতো-নাতা নিয়ে শুরু হয়। যেহেতু বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে 'ভারত' শব্দ সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের টার্গেট ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকে এবং জনসাধারণের মন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন বিদ্বেষ-বিষ এখনও মুছে যায়নি, ষড়যন্ত্রকারীরা এই রিপু নিয়ে সহজেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আরো দেখা গেছে, সাময়িক কোন আশু স্বার্থ-উদ্ধার তখন বড় হয়ে দেখা দেয়, ভবিষ্যতের ফলের কথা কেউ ভাবে না। অর্থাৎ, পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের মানসিক অভ্যাস পুরোপুরি রয়ে গেছে। এখানে একটা কথা আরো বলা দরকার। বাংলাদেশ–এই ভূখণ্ড–বিগত সাত শ' বছর বহিরাগত দ্বারা শাসিত। মোগল, পাঠান, ইংরেজ কেউ-ই এ দেশের মাটির সন্তান নয়। পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পড়ল উপনিবেশ। বাঙালী মুসলমানের হীনমন্যতা-বোধের (ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স) উৎস এখানে নিহিত। আর তাদের রাষ্ট্রদণ্ড-পরিচালনার ভারতে সে-দিন মাত্র পাওয়া। বারো বছর এখনও পূর্ণ হয় নি। ফলে, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশবাসীর নবিশ কাল পেরোয়নি বললেও চলে। তাই অনেক সময় বিচার-বিবেচনা সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় কী? দেশ ও রাষ্ট্রের দুই রকম স্বার্থ থাকে। স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘ-মেয়াদি। এবং তা সামনে রেখেই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অনেক সময় আশু স্বার্থের দিকে শুধু নজর রাখলে ভবিষ্যতে ঠকতে হয়; কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে ত আরো গভীর বিবেচনা অপরিহার্য শর্ত। পাশাপাশি থাকলে, লেনদেনের কারবারের প্রশ্ন আসে। অনেক সময়, স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ বিসর্জন হয়ত দেওয়া যুক্তি-যুক্ত, দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থী-লাভের জন্যে। দাবার চাল স্মরণীয়। ভবিষ্যৎ লাভের জন্যে কোন ঘুঁটি বিসর্জন দিতে হোলো। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তা ঘটে। কিন্তু যেখানে সাম্প্রদায়িকতা একমাত্র পুঁজি, সেখানে শুধু আবেগই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং যুক্তি-বিশ্লেষণ গৌণ বিধায় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ব্যাহত হয়। দেশের অগণন মানুষের উপর দিয়ে বয়ে যায় তার দুর্ভোগ। তাই এদেশে জাতীয় স্বার্থে উত্তেজিত হওয়ার পূর্বে যুক্তি-বিচার সহ পরিস্থিতি তলিয়ে দেখা উচিত। আর যারা উদ্দীপনা যোগায় তাদের জন্যও গভীর চিন্তা অপরিহার্য শর্ত। রাষ্ট্রদণ্ড পরিচালনা কোন শিশু-ক্রীড়া নয়।

অনেকে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির সম্যক ছবি দেখার ব্যাপারে অজ্ঞ। সব দেশই অবিশ্যি যন্ত্রের কল্যাণে পরস্পরের প্রতিবেশী। বিশ্ব-রাজনীতি বর্তমান যুগে কেউ সরিয়ে রাখতে পারে না। তাই দেখা যায়, যেহেতু ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা বর্তমানে বজায় আছে, বিশ্ব রাজনীতির চক্রান্ত চরিতার্থ করতে ভারতবর্ষের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়াকেও জুড়ে দেওয়া হয়। এক ঢিলে দুই পক্ষী-বধের নীতি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঝুলিতে তাই বর্তমানে অহরহ মজুদ থাকে। মুখোসধারী জাতীয়তাবাদ যে সাম্প্রদায়িকতার আর এক রূপ হতে পারে, তার চমৎকার নজীর বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। অবিশ্যি পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রেতই এই প্রেরণার উৎস। একটি ধ্যান-ধারণা বিশেষ পরিস্থিতিতে জন্মলাভ করে। তারপর পরিস্থিতি হয়রত উবে যায়, কিন্তু ধ্যান-ধারণা অত সহজে নিশ্চিহ্ন হয় না। ধ্যান-ধারণা নিজেই একটি সামাজিক ফোর্স হয়ে দাঁড়াতে পারে। একথা বারবার স্মরণ করার

দিন বর্তমানে পুনর্বার আগত।

সাম্প্রদায়িকতার নানা রূপ আছে। তা জাতীয়তাবাদের মুখোস পরেও সমাজ-জীবনে দেখা দিতে পারে, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকা উচতি নয়। এইখানে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িকতা শব্দ উচ্চারণ করলেই বর্তমানে দুই ধর্মীয় গ্রুপের বিরোধ বলে অনেকে ধরে নিয়ে থাকেন। একই ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যেও বিরোধ এবং সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু তা সাম্প্রদায়িকতা বলে গণ্য করা হয় না। যখন হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ বাধে, তা এদেশে সাম্প্রদায়িক দাংগা—এমন কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভাষা এখন দেশী শব্দে পরিণত—'রায়ট'-নামে পরিচিত হয়। কিন্তু শিয়া-সুন্নী বা সুন্নী-আহমদীয়ার (উভয়ে মুসলমান) মধ্যে রায়ট বাধে, তা কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাংগা নামে কথিত হয় না। অথচ দুই সংঘর্ষ একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ।

সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, যেন তার গতিবিধি কারও চোখ এড়িয়ে না যায়।

সাম্প্রদায়িকতা কি? খুব সংক্ষেপে জবাব দেয়া কঠিন। তবু সংজ্ঞা একটা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িকতা এক রকমের বিশ্বাস। এমন বিশ্বাসীরা মনে করে যে, যেহেতু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রুপ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে একই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ, সেই জন্য তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে পৃথক। অর্থাৎ, ধর্ম এক হলেই অন্যান্য ইহজাগতিক স্বার্থও এক হতে বাধ্য। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তা-ই বিশ্বাস। কথাটা জনসাধারণের নিকট আরো পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যে এদেশের সাম্প্রতিক অতীতের নজীর তুলে ধরা যায়। মুসলীম লীগ, পাকিস্তান এসব শব্দ তো এখনও পুরাতন হয়নি। মুসলিম লীগের প্রোগ্রাম-কর্মসূচির পেছনে ধ্যান-ধারণা কী ছিল? তারা বলতেন, যেহেতু মুসলমানেরা এক আলাদা ধর্মে বিশ্বাসী সুতরাং, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থও অন্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে কী এই ধ্যান-ধারণা, ধ্যানাদর্শ কার্যকররূপে বলবৎ ছিল না? যেহেতু ধর্ম আলাদা, ইহজাগতিক সকল স্বার্থই মুসলমানের আলাদা।

ইতিহাস কালের সবচেয়ে মোক্ষম মুদ্দফরাস—সব জঞ্জাল সাফ করে দিয়েছে। একদা পূর্বপাকিস্তানের লাশের উপর নির্মিত ইমারত বাংলাদেশের বুকে বসে তা হাঁক-ফুকার তারস্বরে রায় দেয়া যায়। জিন্না এভিনিউ এখন বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। ইতিহাসের রায় নির্ভুল হয়। কিন্তু তা আসে বড় বিলম্বে। এবং ইতোমধ্যে সামাজিক অনাচার-অত্যাচারের ঝড়ের মুখে শত শত মানুষ বলি হয়ে যায়। নির্বিকার ইতিহাসের চাকার ঘূর্ণি বড় নির্মম। বাংলাদেশ ইতিহাসেরই রায়। অর্থাৎ, ধর্ম পৃথক হলেই যে অন্যান্য স্বার্থ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থ আলাদা হবে, এই ধারণা ঝুটা। অথচ এমন ঝুটা চেতনার বন্যা। এই ভূখণ্ড জুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন রয়ে গিয়েছিল। দূরদৃষ্টি না থাকলে আখেরে অনুতাপ এসে জোটে। তাই প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেকের হুঁশিয়ার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিকভাবে মৃত্যু ঘটলেও তার প্রেত নানা ছদ্মরূপে উৎপাত সৃষ্টি করতে সক্ষম। উপরের খেল্‌কা লেবাস দেখেই ধার্মিক পরহেজগার সনাক্ত করা দায়। শিশির লেবেল এক, ভেতরের আধেয় আরেক চিজ হতে পারে।

ইতিহাসের সবক ভুলে গেলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ধর্ম পৃথক হলে তার অন্যান্য স্বার্থ পৃথক হবে, এমন বলা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ধর্ম ছিল এক। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ যে এক ছিল না, তা কী বাংলাদেশের অধিবাসীদের নতুন করে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে? তা এক হলে বিরোধ বাধত না, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবই প্রয়োজন হত না। যারা অনুসন্ধিৎসু, তাদের কাছে আরজ, তারা যেন ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের ইলেক্‌শান ম্যানিফেস্টো আবার খুলে দেখেন। সেখানে দেখা যায়, দু'টি স্বার্থ ছিল শুধু মুসলমানদের এককভাবে। একটি : ধর্মীয় অধিকার রক্ষা। দ্বিতীয় : মুলমানদের দুর্দশা লাঘবের দাবী। বাকি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য তালিকায় যেসব দাবী-দাওয়ার উল্লেখ আছে, তা যেকোন তদানীন্তন ভারতবাসীর দাবী-দাওয়া থেকে কিছু পৃথক নয়। ব্রিটিশ দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার উল্লেখও ছিল। সে যুগে কোন্ ভারতবাসী, ধর্ম নির্বিশেষে, এমন দাবির পেছনে জমায়েত হত না? কিন্তু লীগ নেতাদের কাছে আবেগই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নানা কারণে, যুক্তির কোন বালাই তারা রাখেননি। মুসলমান সমাজের একমাত্র হিতৈষী মুখপাত্র হিসাবে তাদের পরিচয় সেদিন প্রতিভাত হয়েছিল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কী সত্যি তাদের নিজেদের কওমের (সম্প্রদায়ের) সাচ্চা খিদ্‌মতগার? আজ বলা যায়, আলবৎ না–না, না। আসলে, সাম্প্রদায়িকতা কোনদিন সমাজ-বাস্তবের সঠিক প্রতিফলন নয়। এমন কী তাদের নিজেদের কওমের স্বার্থও ঠিকমত প্রতিফলিত হয় না। সাম্প্রদায়িকতার ভেতরে থাকে সচেতন অথবা অচেতন প্রতারণা। একদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নিজেকে ঠকায়। কারণ, যেভাবে সে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা বলছে, তা বাস্তব জীবনে নেই। আর দাবী পূরণের জন্য যে পন্থা তারা গ্রহণ করতে তৎপর, সে পন্থা পূরণ হওয়ার আশাই নেই। অর্থাৎ, ঝুটা চেতনা নিয়ে কারবার। জিন্না সাহেব বহুবার বলেছেন নানা সভায় যে পাকিস্তানে কোন শোষণ থাকবে না, যেহেতু পবিত্র ইসলাম শোষণ–বিরোধী। পাকিস্তান হওয়ার পর ছত্রিশ বছর চলে গেছে, জনসাধারণের শোষণ-জাত দুঃখ-দারিদ্র্য কী লাঘব হয়েছে কোথাও? অর্থাৎ, সাম্প্রদায়িকতাবাদী নিজেদের কওমেরও বন্ধু নয়। সাম্প্রতিক একটি দৃষ্টান্ত দেয়ার লোভ সংবরণ করা দায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত। কিন্তু তাঁর কবর তো এখানে হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা নয়। তাঁর পুত্র কাজী সব্যসাচী পরে বিবৃতি মারফৎ জানান যে, তাঁর মহান পিতৃদেবকে দাফনের পূর্বে শরীয়ৎ অনুযায়ী তার অনুমতির অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি কর্তৃপক্ষ। পিতার মুখ শেষবার দেখা থেকে বঞ্চিত বলেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গে কবির স্ত্রী মরহুমা প্রমীলা নজরুলের পাশেই রাখা ছিল কবির সমাধির জায়গা। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু কবির অনুরাগী তো অসংখ্য হিন্দু। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা এখন দেড় কোটি। এই দেড় কোটি মুসলমানের রক্ষা-কবচ হিসেবেই কবির সমাধি হওয়া উচিত ছিল তাঁর স্বগ্রামে, তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে। কিন্তু এখানকার সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তা হতে দেয়নি। নজরুলের ভাষায় বলা যায়, "জাতের নামে বজ্জাতি"র এমন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া ভার। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বোধ হয় মুসলমান নয়, অথবা মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের কোন দায়িত্ব নেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কওমী ভাইদের প্রতি। নচেৎ এমন কাণ্ড ঘটবে কেন? মুসলমানদের মঙ্গল করতে ত হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে নজরুলের মাজার থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা হলো না। কওমের প্রেমিকরা কওমের জন্যে আদৌ বর্তমান জটিল বিশ্বে কোন মাথা ঘামান না। ঝুটা চেতনা সর্বদাই সঙ্কীর্ণ। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জীবনপ্রেমিক নয়, মৃত্যুবোধ জাগানিয়া শাহী ঢ্যাঁড়াদার। তারা নিজ কওমের বন্ধুত্ব তো নয়ই, বরং এই উপমহাদেশের অমঙ্গল।

সাম্প্রদায়িকতার বিগত একশ বছরের ঠিকুজীর আলোচনা করে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ছিল ক্রিয়াচারে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে। কিন্তু তা কখনও বিভেদের বিরাট ফোর্স হয়ে দেখা দেয়নি। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার যে-রূপ চোখে পড়ে, তা নিতান্তই বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সূত্র ধরেই তার বিকাশ। এবং দেখা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে শুধু সেই গ্রুপের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা তখন ধর্মের রূপ নিয়েছে, তাদের কাছে যা পূর্বেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার, যদিও ইতিহাসের ঘূর্ণিময় এই পর্যায়ের ভেতর দিয়েই চল্লিশ বছর বয়স্ক যেকোন মানুষের দিন অতিবাহিত হয়েছে, তবু এ যুগের তরুণদেরও ব্যাপারটা ভালরূপে বুঝা কর্তব্য। কারণ, তাদের সামনেও ইতিহাসের সেই মোহ-কুয়াশা হাজার রক্তপাত, দুঃখ-দুর্দশা, মানসিক অশান্তির পরও এখনও দূরীভূত হয়নি। ব্রিটিশ দাসত্ব ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের অন্যতম উপাদান। ভেদনীতির কৌশলে ব্রিটিশ প্রথমে সামাজিক সুখ-সুবিধা হিন্দু এক শ্রেণীর উপর বর্ষণ করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দু এক শ্রেণীর উপর। সমস্ত হিন্দু সমাজের জন্য নয়। এই শ্রেণী প্রথম যুগের ইংরেজী-শেখা চাকুরে এবং ব্যবসা-সূত্রে ঘনিষ্ঠ হিন্দু। চাষী মজুর বা অন্যান্য 'নীচ' শ্রেণীর হিন্দুর জন্য নয়। মুসলমান সম্প্রদায় তখন রাজকৃপা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যবাদী আমলে ব্রিটিশের নীতি পরিবর্তিত। এবার মুসলমান সম্প্রদায় তাদের সুয়োরাণী। এবং এখানেও মনে রাখতে হবে, মুসলমান সম্প্রদায় অর্থ গোটা মুসলমান সমাজের এক শ্রেণী। ঠিক হিন্দুদের মতই, চাকরিজীবী ও ব্যবসা-সূত্রে ঘনিষ্ঠ কিছু মুসলমান। মুসলমান চাষী মজুর সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ, 'নীচু' শ্রেণীর মুসলমানের সেখানে কোন জায়গা ছিল না। অনেকের জানা নেই, তবু ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করতে হয় যে, পূর্বে অর্থাৎ উনিশ শতকে মাদ্রাসা আলিয়ায় (দেশ বিভাগের পর যা এখন ঢাকায়) ভর্তি হতে গেলে সার্টিফিকেট লাগত। এই সার্টিফিকেটের নাম : শরাফৎ-নামা। ভর্তি হতে গেলে কোন গণ্যমান্য লোক সার্টিফিকেট দেবে যে ছাত্রটি শরীফ ঘরের ছেলে, সুতরাং মাদ্রাসা আলিয়ায় ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত। 'নীচু' ঘরের ছেলে হলে, মাদ্রাসা আলিয়ার দরজা বন্ধ। এই নিয়মের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি তোলেন (অবিশ্যি বহু বছর চালু থাকার পর) যে 'শরাফৎ-নামা' প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। তখন দুই দল দেখা যায়, কমিটির মধ্যে। এক দল উচ্ছেদের পক্ষে, অন্য দল বিপক্ষে। অনেকে এখন প্রাণে দুঃখ পেতে পারেন যে, মুসলমানদের একজন বড় চিন্তানায়ক, সমাজ-দরদী এবং যাঁর 'স্পিরিট অফ ইসলাম' ইত্যাদি গ্রন্থ পড়ে বহু মুসলমান মুর্ছা যান এবং যাঁর নামে কলকাতা শহরে একটি সুন্দর রাস্তা আছে (আমির আলি এভিনিউ) সেই জাস্টিস আমির আলি ছিলেন শরাফৎ-নামা তুলে দেয়ার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ 'নীচু' ক্লাসের মুসলমানের কোন জায়গা ছিল না তাঁর ইসলামী চেতনায়। প্রত্যেকের আজ বুঝা উচিত যে, শুধু ধর্ম নয়, সবকিছুই শ্রেণীরঞ্জিত। হিন্দু-মুসলমান শব্দ দু'টি নিরর্থক, তবে প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে জানা উচিত, কোন্ শ্রেণীর হিন্দু, কোন্ শ্রেণীর মুসলমান? আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিশ্লেষণে তার জবাব মিলবে।

আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে, একদা হিন্দু এক শ্রেণী ছিল সুয়োরাণী। পরে মুসলমান এক শ্রেণী সুয়োরাণী হয়ে এল। এবার দুই সুয়োরাণীর কোন্দলের সূত্রপাত। একজন, ঈষৎ উন্নত, শিক্ষা-দীক্ষায়, পেশাদারী ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। অন্যজন অনুন্নত, কিন্তু সুখ-সুবিধার তাগিদে একইভাবে হন্যে। বিশেষতঃ চাকরীর ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব প্রথমে বেশ প্রকট হয়। মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা কম নয়। দুই শ্রেণীর মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার জন্মের এই পটভূমি এবং আসল পটভূমি এখানে নিহিত। তৃতীয় পক্ষে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব এই কোন্দলের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দেখা যায়, সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় লেবাস পরিধানের পূর্বেই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক লেবাসে ভূষিত হয়ে উঠেছিল। ধর্ম আলাদা হলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থ আলাদা হবে—সাম্প্রদায়িকতার এই শ্লোগানের জন্ম মূলতঃ অর্থনৈতিক পটভূমি থেকেই নিঃসৃত। কিন্তু তার সমাধান যে ধর্মীয় হতে পারে না, তা পাকিস্তান সৃষ্টি এবং তারপর আরো

ছত্রিশ বছর জ্বলন্ত সমস্যাকীর্ণ বাংলাদেশ প্রমাণ স্বরূপ খাড়া হয়ে রয়েছে।

পরস্পর গুঁতাগুতি-রত হিন্দু-মুসলমান দুই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কোন যুক্তির ধর ধার সেদিন ধারেনি। কটা চাকরী বা ঈষৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা যে পুঁজিবাদী সমাজে সকল স্তরে দূরের কথা, সকল মধ্যবিত্ত স্তরেও পৌঁছানোও সম্ভব নয়, তা তাদের চেতনার বাইরে থেকে গেছে। এক শ্রেণী যত সাম্প্রদায়িক হয়েছে, প্রতিক্রিয়ার অপর শ্রেণী ততই অন্য শ্রেণী বিদ্বেষ-বিষে ডুবেছে। এই এক পাপ-চক্র এই উপমহাদেশে এখনও ঘূর্ণ্যমান। সকলের জানা উচিত, পুঁজিবাদ যদি দ্রুত বিস্তার লাভ না করে, তা চেতনার ক্ষেত্রে জন্ম দেয় ভারসাম্যহীন আবেগ, অবিশ্বাস, ভয়, ঘৃণা, নিঃসঙ্গতা এই জাতীয় নানা মানসিক বিকৃতি। তার কারণ, মাথার সংখ্যা অনেক, কিন্তু টুপির সংখ্যা সীমিত। সব মাথায় টুপি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে, তিক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একজন চাকরি পেলে আর একজন পায় না। ব্যবসার ক্ষেত্রে, সামান্য মুনাফার জন্যে লাগে প্রচুর মেহনৎ। কারণ, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা নচেৎ দায়। ফন্দী, চাতুরী, প্রতারণা এবং এই জাতীয় পন্থা অস্তিত্বের সংগ্রামের পথ ধরেই আসে। এমন ক্ষেত্রে বিভেদ বিরোধ সৃষ্টি খুব সহজ। কারণ সমস্ত বাঁচার পন্থা হয়ে পড়ে কুৎসিত কোলাহলময় এবং জীবনই এক বিরাট অর্থহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আত্মহত্যার সংখ্যা এমন পরিবেশে প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

ছোট ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, দোকানদার এবং এই জাতীয় স্বল্প আয়ের মানুষ পুঁজিবাদের অভিশাপ কম বহন করে না। নিরাপত্তার অভাবে, বড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে অস্তিত্বের জন্যে এই শ্রেণী সদা ভীত। এমন ক্ষেত্রে আবেগের ভারসাম্য থাকে না। তখন পুঁজিবাদের আতঙ্ক থেকে রেহাই পেতে যেকোন বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। বাছ-বিচার, যুক্তি সেখানে থ' পায় না। প্রত্যেকেই গ্রুপ খুঁজে বেড়ায় নিঃসঙ্গতার থাবা এড়াতে। বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক স্রোতে তারা ভেসে যায়। সত্য-মিথ্যা, আখেরে নিষ্ফল কিনা—এ সব বিচারের ধার ধারে না।

এমন কী ধনী ব্যবসাদারও উপার্জনের কুৎসিত গলি-পথে আবেগের দিক থেকে পরিতৃপ্তি লাভ করে না। ফলে, এমনই জীবনের মুখোমুখি হয়, যা তাদের মানেস প্রশান্তি দিতে অক্ষম। প্রতিযোগিতার খাঁড়া তার ব্যবসা জগতেও ত বিদ্যমান। এই শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপানের মাত্রা যে অধিক দেখা যায়, তার অন্যতম হেতু কিন্তু তার উপার্জনের সড়কই যুগিয়ে রাখে। তা ছাড়া, এমন পরিবেশে এই শ্রেণীর নিঃসঙ্গতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। ক্লাবে মদের টেবিলে তারা যায় শুধু সঙ্গলাভের সন্ধানে। যে তাদের সঙ্গে দেবে, সমর্থন দেবে এবং সংলাপের ভেতর অন্ততঃ জাগতিক সকল কুশ্রীতার বিরুদ্ধে বলার সুযোগ দেবে। কখনও তাদের হামলা সমাজের উপর, কখনও ব্যক্তির উপর। অবিশিষ্ট কেবলমাত্র আবেগের প্রাঙ্গণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে তাদের আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির একটি নিকেশ ঘটে। সামাজিক এমন পরিবেশে অচেতনভাবে ভীতি তাদেরও ঘিরে রাখে। তাই কোন বিভেদ সৃষ্টি তখন সহজ হয়ে পড়ে। কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান বা আর কিছু। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যত তীব্র হয় এই জাতীয় গ্রুপে গ্রুপে বিভাগ বিভেদ বাড়ে। পূর্বে উল্লিখিত সীমাবদ্ধ পুঁজিবাদী বিকাশের মধ্যে মাথা অনেক, টুপির সংখ্যা কম। তাই বিভেদের ছুতো একটা পাওয়া যায়ই। বর্তমানে বাংলাদেশে জেলাওয়ারী চাকরি বণ্টনের ব্যবস্থা আছে। রাজশাহী, দিনাজপুর, নোয়খালী, সিলেট প্রভৃতি জেলাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বর্তমান। তা থেকে জেলাভিত্তিক মানসিকতা গড়ে উঠবে, গোটা দেশ, বাংলাদেশ আর কেউ চোখে দেখবে না। জাতীয়তাবাদ বিকাশের পথে তা এক বিরাট অন্তরায়। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে এই জেলাও বিভেদের বাহন হয়ে দাঁড়াতে পারে। মোদ্দা কথা, অর্থনৈতিক বিকাশ ও বিস্তারের পথ সীমিত হলে, বিভেদ সৃষ্টি কঠিন কিছু নয় পুঁজিবাদী সমাজ-কাঠামোর মধ্যে। হিটলার শিল্পোন্নত দেশে ইহুদী বনাম আর্য—এই বিভেদের উপর দাঁড়িয়েই বিশ্বময় মৃত্যু তাণ্ডব চালিয়ে গেল। আফ্রিকায় বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে বিভেদ খাড়া করেই সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও কোথাও কোথাও টিকে আছে, একদম সরাসরি শোষণের পন্থা হয়ত নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে মিটবে কি না সন্দেহ। ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একই কৌশল প্রয়োগের ঝানু মাদারী অর্থাৎ, পুঁজিবাদী সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে তার অস্তিত্বের কাঠামোর মধ্যেই বর্তমান। এদেশে সাম্প্রদায়িকতা একই প্রক্রিয়াপ্রসূত। ইংরেজ চলে গেলেও, এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ত সাম্রাজ্যবাদেরই তৈরী, তা এখনও দূর হয়ে যায়নি। কিন্তু একদা এই উপমহাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমান হিন্দুর কাছে এসব অপরিজ্ঞাত ছিল বলতে হয়। নচেৎ আজও সেই মারী-বীজ বর্তমান থাকবে কেন?

সীমিত পুঁজিবাদের মধ্যে বিভেদের কত কৌশল না বর্তমান। উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আরম্ভ করে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইল-আরব নয় শুধু খোদ ইংল্যান্ডের বুকে আইরিশ ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্টের সংঘর্ষ দেখলে তা বুঝা যায়। অনেকের দৃষ্টি এতদূর গড়ায় না, ফলে সম্যক উপলব্ধি অপরিজ্ঞাত থাকে। তখন সমস্যার সমাধানও সীমাবদ্ধ চেতনায় যা আসে, তাই আঁকড়ে ধরে। এই যুগে একই ধর্মের নানা গ্রুপ এবং গ্রুপের মধ্যেও বিরোধ সংঘাত দেখা যায়। সিয়া-সুন্নী, আহমদী-কাদিয়ানী প্রভৃতির কোন্দলের পটভূমি কিন্তু এই সমাজ-কাঠামো। সকলেই আবেগ ও অস্তিত্বের নিরাপত্তার খোঁজে হন্যে। সমাধানের জন্যে প্রত্যেকেই শোষক-শ্রেণীর ফন্দীর শিকার হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদের এই পর্যায়ে বহুজাতিক (মাল্টি-ন্যাশনাল) কর্পোরেশনগুলো পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো আরো কর্দমাক্ত, জটিল করে তুলেছে। সরল ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষের কাছে তার কোন খোঁজ পর্যন্ত থাকে না। এমন ব্যক্তিগণ সহজে তাদের ফাঁদে পড়ে যায়।

কারণ যন্ত্রশিল্পে উন্নত সভ্য দেশগুলো তাদের প্রাক্তন উপনিবেশে সকল রকম অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন বিভেদমূলক যত আন্দোলন গড়ে ওঠে তার পেছনে তারা অলক্ষিতে এসে দাঁড়ায়। অনুন্নত দেশের–তা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গ্রুপের যাই হোক, তাদের আর্থিক উৎকোচ ও অন্যান্য লোভ দেখিয়ে আখেরে নিষ্ফল ও সমাজের প্রগতি-বিরোধী আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান বিশ্বে এই সব কারসাজি, ফন্দী-ফিকির আওতার খেল, সরল মানুষের পক্ষে ধরাও দায়। বিভ্রান্তি আসে অতি সহজে। সাম্প্রদায়িকতা এমন বিভ্রান্তির অঙ্গ। তার প্রয়োগও অনেক সময় অবস্থা-অনুযায়ী রূপ পরিবর্তন করে। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান দুই শব্দ কী রূপে সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে, তা গোড়ার দিকে উল্লিখিত।

ইতিহাসে অজ্ঞতা মহাপাপ। কারণ, ভুল পদক্ষেপের মাশুল দিতে হয় যুগ যুগ ধরে। হয়ত পুরুষানুক্রমে, তবু দুর্ভোগের জের মেটে না। তাই বাংলাদেশের অধিবাসীদের অধিক সচেতন হওয়া উচিত। নচেৎ আদিম রিপু ও প্রবৃত্তি তাড়নাই কানে সদা ঝনঝনা বাজিয়ে যেতে পারে বিভেদের যে-কোন ছুতোনাতা ধরে :

.... দহগ্রাম

.... তালপট্টি

...... ফারাক্কা

পরিবর্তন জুন, ১৯৮৩

AMARBOI.COM

কোম্পানী-আমল : দফা দুই

এই উপমহাদেশের ইতিহাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শুধু একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নাম নয়। আরো অনেক কিছু বেশী। কারণ, এই কোম্পানীরূপী সূচই উত্তারকালে লাঙলের ফলার মত সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জমিন ফালা-ফালা করে ফেলেছিল। এক কথায় বলা যায়, ওই প্রতিষ্ঠান মারফত আধুনিক ইউরোপের শিল্প সভ্যতার সমস্ত চাপ এবং দব্‌দবা এই ভূখণ্ডে এসে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে আছড়ে পড়ে। সেই আঘাতের দাগ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরে শোষ বা পচনমুখী ঘায়ের যন্ত্রণা থেকে কোন অনুন্নত দেশই আজও রেহাই পায় নি। কোম্পানী বাণিজ্য করতে এসেছিল। তা বাদশাহীতে পরিণত হলো। মাত্র সত্তর-আশি বছরের মধ্যে গোটা অবিভক্ত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ দাসত্বের জিঞ্জিরে বাঁধা পড়ল। তারপর একটানা এক শ' বছর গেল শুধু গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয় শুধু, আগে-পরে ফরাসী, পোর্তুগিজ, দিনেমার, স্পেনীয়–এক কথায় ইউরোপীয় তাবৎ লুণ্ঠনকারীরা এই ভূখণ্ডকে বানিয়ে তুলল তাদের মুনাফা শিকারের ময়দান। সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যের অপর নাম সভ্যতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোশ-পরিহিত দস্যুবৃত্তি। তখন দস্যুদের মধ্যেও বখ্রা নিয়ে বিরোধ বাধে। তাগিদ, ধূর্ততা এবং দাগাবাজির জোরে টিকে রইল শুধু ইংরেজ। দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবিশ্যি থামেনি। তার তাল-লয় কখনও ঢিমা, কখনও দ্রুত। কখনও নীরব কখনও সরব। তবে ফল্গুধারার মত তা বহমান ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ পরে সংঘবদ্ধ হয়। তারপর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের পালা। মুখোমুখি মোকাবিলায় জমিন অবিশ্যি স্তরে স্তরে তৈরি হয়। হয়-ই। না হয়ে পারে না। কারণ, গোড়ায় গলদ থাকলে জুলুম এবং ভাওতা দিয়ে কখনও স্থায়ী সমাজ বা রাজত্বের বুনিয়াদ গড়ে তোলা যায় না। তাই ইংরেজদেরকে একদিন বিদায় নিতে হলো। কিন্তু তার বাণিজ্য কি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল?

না। কোম্পানীর ভূত একবার ঘাড়ে চড়লে তা সিন্দবাদের বুড়ো হয়ে বসে। অনুন্নত দেশের মানুষ সহজে তা ঠাহর করতে পারে না। ভূত-প্রেত অশরীরী। তার অস্তিত্ব অনুভবের ব্যাপার। তাই এদেশে অনেকে মনে করে কোম্পানির আমল আর নেই। ভূতের নাম থাকে না। যার উপর ভর করে, ওঝার মন্ত্রে তার মুখ দিয়ে সে আর এক মৃতজনের নাম বলে। সেখানেও ঝুটের তেজারতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নাম মুছে গেছে। কিন্তু অদৃশ্য প্রেত-নৃত্য আজও থামেনি।

বাংলাদেশী উপকথায়, ভূতের বাড়া আর এক ধরনের প্রেতের উল্লেখ আছে। তাদের বলা হয় 'মামদো'। তা আরো ধূর্ত, জবরদস্ত ভূত। মাম্দো প্রেত-ভূমিতে রাজত্ব করে এবং আরো অন্যান্য ভূত পোষে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সেই অদৃশ্য প্রেত-নৃত্য দেখা গেল।

নতুন রঙ্গমঞ্চে মাম্দো প্রধান অভিনেতা।

ব্রিটিশ ভূত পরাস্ত। এবং মামদোর মাদবরী মেনে নিলে। নচেৎ প্রেত-ভূমে থাকা চলে না।

এই হেয়ালিটুকু নিরসনের জন্যে দরদী পাঠকের দৃষ্টি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে ফিরাতে চাই। বিনীত অনুরোধ।

মধ্যপ্রাচ্যের ম্যাপের দিকে তাকান। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দেও দেখবেন মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ আমিরশাহী নামে মাত্র স্বাধীন, নচেৎ সোজাসুজি পরাধীন। সকলে ফরাসী ব্রিটিশের আওতার নিচে বিদ্যমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল, ব্রিটিশ পাততাড়ি গুটাতে ব্যস্ত আর স্বাধীনতা 'প্রদান' করছে, যেন তা কোন ভিক্ষের সামগ্রী। প্রচণ্ড মহানুভবতা! স্বেচ্ছায় নিজ রাজ্য থেকে বনবাস যাওয়ার উদ্যোগ। ব্রিটিশ লেবার পার্টির বহু প্রচারপুস্তিকা সে যুগে ভারত পাকিস্তানকে স্বাধীনতা-দানের মোচ্ছব-কাহিনী খুব ফলাও জাহির করত, প্রচুর আত্মপ্রশংসা এবং আত্মশ্লাঘার ঝড় তুলে। কিন্তু সত্যিই কি মহানুভবতা আসল মতলব? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত, উপনিবেশে স্বাধীনতা-আন্দোলনের রক্তমুখী পরাক্রমের নিকট পর্যুদস্ত নিজেদের এই হারেম-কাহিনী তারা চেপে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর চেপে গিয়েছিল 'মামদোর' কথা, যার কনুয়ের গুতো খেতে খেতে কাহিল গতর নিয়ে আর সমান শরীকের মত পাশে থাকা স্বাস্থ্য এবং জানের পক্ষে বিপজ্জনক। অথচ মুখে অন্য কাহিনী। জেনারেল ইলিকট্রেসিটি ইউনিয়ন ব্রিটিশ লেবার পার্টির আওতাভুক্ত। বৃহত্তম এই ইউনিয়নের কোটি কোটি পাউন্ড এখনও বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায় সুদে খাটে। বিশ্বাসঘাতক র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের ঐতিহ্য ব্রিটিশ লেবার পার্টির কোন নেতা–তিনি বেভিন, বেভান, হ্যারোল্ড উইলসন–যেই হন না কেন, কেউই ছাড়তে পারেন নি। ওরা ঘরে সোশালিস্ট, বিদেশে ইম্পিরিয়ালিস্ট (সাম্রাজ্যবাদী)। ইংরেজ স্বাধীনতা কাউকে দেয় না, কোনদিন দেয়নি। ওদের লেবার এবং কনজারভেটিভ দুই-ই এক হারামী রক্তের দুই শাখা। সম্প্রতি ফকল্যান্ডের যুদ্ধ তার জ্বলজ্বলে দলিল। নানা ফেরে পড়ে ওরা বাদশাহী ছাড়ে, বাণিজ্য সহজে ছাড়ে না। কেবল মামদোর ভয়ে ডুবো-কড়ির মুষ্টিলাভ নীতি অনুসরণ করে।

অনেকেই মামদোর ব্যাখ্যার জন্যে অধৈর্য হতে পারেন। তা পরবর্তী বাক্যে স্পষ্ট।

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাদের বিরাট শূন্যতা এখন দখল করে বসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মাম্‌দো আর অন্য কেউ নয়: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সাবেক ভূত এখন তার ছোট শরীক, অথবা বখরার ছিটেফোঁটা পেয়ে ভেতরের অসন্তোষসহ খুশী। ধনী মানুষ অনেকে বড় সাইজের কুত্তার সঙ্গে স্পুডল (খুব ছোট সাইজের কুকুর) পোষে। মনিব দুই প্রাণী নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। এই দৃশ্য থেকে মার্কিন-ব্রিটিশ সম্পর্ক কল্পনা করতে পারা সহজ। দুই কুত্তা একসঙ্গে আছে। না থেকে উপায় নেই। কারণ, মনিব। এবং এখানে মনিব আর্থিক স্বার্থ, বাণিজ্যিক স্বার্থ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর নেই। কিন্তু কোম্পানী রাজত্ব শেষ হয়নি। নতুন কোম্পানী এখন নতুন যুগের। কিন্তু পুরাতন খসলৎ এতটুকু বদলায়নি এই কালেও। ধনী শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'রিচ'। বানান–আর, আই, সি, এইচ। এই আদ্যাক্ষরগুলোর সংকেত উনিশ শতকে উদ্ধার হতো এইভাবে, "রব ইন্ডিয়া কাম হোম" (অর্থাৎ ভারতে লুটপাট সেরে বাড়ি ফিরে এসো)। কোম্পানীর চেহারা বদলে গেছে, কিন্তু লুটপাট আজও অব্যাহত। অবিশ্যি নানা ফন্দি-ফিকির মারফত। আর বাদশাহী নেই, কিন্তু বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে হবে। সঙ্গে আবার এক আটলান্টিক পার ডালকুত্তা জুটেছে। সে মাংসের বড় বড় টুকরো খেয়ে যায়। ছোট কুত্তা ফ্যালফ্যাল চেয়ে দেখে, মাঝে মাঝে গরগর শব্দে ভেতরের অসন্তোষ ঝাড়ে যেমন, সম্প্রতি যথাক্রমে দুই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব এবং বৈদেশিক মন্ত্রী–আলেকজান্ডার হেগ এবং লর্ড ক্যারিংটনের ছোটখাট কাইজ্যা-কোন্দল। কিন্তু উভয় পার্টির কারো কিছু করার থাকে না। ক্ষেত্রবিশেষে ছোট কুত্তা বড় কুত্তার তোয়াজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে অথবা বড় কুত্তা ছোট কুত্তার লেজ শোঁকে। গরজ বড় বালাই।

নতুন কোম্পানীর আমল শুরু হয়েছে তাবৎ দুনিয়ায়। এই মহাদেশেও। এই নয়া কোম্পানী পূর্বের ন্যায় আর কোন এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ জয়েন্ট স্টক বা যৌথ অংশিদারী কোম্পানী নয়। এই কোম্পানী বহুজাতিক। ওদের ভাষায় : মাল্‌টি-ন্যাশনাল। যদি এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে দেখা যাবে সেই দেশের বৃহত্তর বৃহত্তর কোম্পানী একসঙ্গে জোট বেঁধেছে। বিভিন্ন এলাকার দস্যুগণ যদি দেখে যে তাদের ব্যবসায় 'সেম-সাইড' হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা এমন ভুলের সংশোধন করে নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শসহ এবং পন্থা বের করে নেয়। পৃথিবীর বর্তমান অর্থনৈতিক জগতে সেই সমাধান-রীতি এখনও বন্ধ হয়নি। উনিশ শতকেই তামাম দুনিয়া বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। স্বার্থের দ্বন্দ্বে নানা আত্মক্ষয়ী যুদ্ধ। এখন সাম্রাজ্যবাদীরা সেয়ানা এবং সেয়ান হয়েছে। তাই তারা প্রাক্তন উপনিবেশ লুণ্ঠনের জন্য নয়া সংস্থা বানিয়েছে। কিন্তু গত তিরিশ বছরের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ৮৫ কোটি লোক স্বাধীন হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে গোলামীর জিঞ্জির ছেঁড়ার এমন কাহিনী আর ঘটেনি। প্রাক্তন দস্যুদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তা পরিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রাচীন স্বার্থ বজায় রাখার ফন্দি আবিষ্কারে ওরা সিদ্ধহস্ত। কবি ইকবালের দু'টি পংক্তি মনে পড়ে যায় :

চান্দ্ কাফন্-দোজ্দ আজ তক্সীমে কবূর।
আঞ্জুমান সাখ্‌তা আন্দ্।

কতগুলো কাফন-চোর নিজেদের মধ্যে কবর বাটোয়ারা করার জন্যে সমিতি বানিয়েছে।

মালটিন্যাশনাল করপোরেশানগুলো আর কিছু নয়, ওই কবর বাটোয়ারা করার নয়া ফিকির।

পূর্বের মত সোজা জবরদস্তি দ্বারা আর এ যুগে লুণ্ঠন সম্ভব নয়। তাই এখন কৌশলের প্রয়োজন।

প্রাক্তন আধা বা পুরো উপনিবেশ এবং শিল্পে অনুন্নত দেশগুলোর ওরা নাম দিয়েছে 'তৃতীয় বিশ্ব'। আমরা এতদিন জানতাম, বিশ্ব একটাই। এখন সাম্রাজ্যবাদীরা আরো দুটো যোগ করেছে। কিন্তু আমরা ত এই বিশ্বের অধিবাসী। ওদের আর দুই বিশ্ব তাহলে তার বাইরে। জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা বলেন, এই পৃথিবীর বাইরে মানুষ অন্ততঃ নেই, আমাদের মত মানুষ, জীবজন্তু হয়ত থাকতে পারে এবং তার ধারণাও নিশ্চিত কিছু নয়। তবে 'তৃতীয় বিশ্ব' নামকরণে একটা নৈতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা যে, ওরা যাই হোক মানুষ নয়। কারণ, সাম্রাজ্যবাদীদের নৈতিকতা আর কোথাও দেখা যায় না। অবরুদ্ধ পশ্চিম বৈরুত শহরের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সভ্যজাতিরূপে দাবী করলেও ওদের কাজের

WWW.AMARBOI.COM

নিয়ন্ত্রক বা চালকশক্তি পশুসুলভ গায়ের জোর অর্থাৎ অস্ত্রের জোর। ছাগ-শিশুর মত যেন অসহায় দুর্ভাগা ফিলিস্তিনী যোদ্ধা ভাইবোনেরা। তাদের ঘিরে রয়েছে সভ্য কসাইয়ের দল। ইসলামের চ্যাম্পিয়ন মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহীগুলো পর্যন্ত মুসলমান ভাইবোনদের দুর্দশা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতিযোগে অবলোকন করছে না শুধু, কসাইদের হাতে ছুরিও যুগিয়ে দিচ্ছে। ওদেরই তেল ইসরাইলের কাছে পৌঁছায় সেই তেল ইসরাইলীদের সাজায়ো গাড়ী, অন্যান্য যন্ত্র চালু রাখে এবং ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ধ্বংস করে।

য়ুরোপ, আমেরিকার বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত পৃথিবীকে মনোরম বাসযোগ্য করে তোলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা আজ মনে হয় কোন নিছক জন্তুত্বের অবদান। ওরা আর দুই স্বতন্ত্র বিশ্বের অধিবাসী। সেখানে আর যা-ই থাক, বিবেক থাকে না। কারণ জন্তু-জানোয়ারের নিকট অমন চিজ নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীর বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোম্পানীর আমল শেষ হওয়ার লক্ষণ অনুপস্থিত।

তার ফলে অনুন্নত দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে। নিজ দেশের রাজনীতিও আর তাদের অনুকূলে থাকে না।

সাম্রাজ্যবাদী নামই চালু রাখা যাক। কারণ, পূর্বে বর্ণিত তৃতীয় বিশ্বে যন্ত্র শিল্প যুগের প্রভাব স্বাভাবিক। কিছু ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে, যত ঢিমেই হোক তার গতি বা বিস্তার যত স্বল্পই হোক। কিন্তু তখন এই দেশের মধ্যে এক অর্থনৈতিক দ্বৈততার জুলুম বাড়ে। আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ। কয়েকটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বে নগর এবং গ্রামাঞ্চলের জীবন-যাপনের মান বিসদৃশভাবে অসমান। কোন তুলনাই চলে না। নগরের সুরম্য ইমারতের পাশে গড়ে ওঠে ঘিঞ্জি বস্তির সারি। চাষবাসে বা মজুরীতে লিপ্ত মানুষের আয়, আশা-প্রত্যাশা, জীবন-যাপনের ভঙ্গির সঙ্গে বিদেশী ফার্মের দেশী পরিচালকের তুলনা স্রেফ পরিহাস। সমাজের উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে ফারাক এত বেশী বিধায় যারা উপরে উঠে যায়, তারা আর সহজে নামতে নারাজ। নিচে নামা মানে একদম গভীর গর্তে। বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত এমন ব্যক্তিরা ঠিকও করতে পারে না, তারা নাগরিক ওই ফার্মের না স্বদেশের?

তবু অনেকের ধারণা কোম্পানীর আমল খতম হয়ে গেছে। দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্ব দিতে পারত তাদের অনেকেই কোম্পানীর ডাগর বেতন ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার জন্যে আত্মসমর্পণ করে। আবার জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেখা যায়, অর্থনৈতিক সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোমুখি তারা তেমন দৃঢ়তা দেখাতে অসমর্থ। সদ্য-স্বাধীন দেশে প্রায় চোখে পড়ে, যেসব নেতারা সংগ্রাম মারফত দেশের মুক্তি এনেছে, পরবর্তী পদক্ষেপে তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করতে উদগ্রীব। রাষ্ট্রের হাতিয়াগুলো আর তাদের হাতে থাকে না। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে, তার সঙ্গে দড়ি বাঁধা এবং দড়ি বিদেশীদের হাতে। এমন ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সবই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ভেতরে ফাঁকা, স্বাধীনতার খোলসটুকু শুধু উপরে থাকে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসংগতি আরো প্রকট। শিক্ষাব্যবস্থায় উপনিবেশ যুগের ছাপ ত পরিষ্কার চোখে পড়ে। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে যেসব বিষয় সাবজেক্ট সমাদর পায়, স্বাধীন দেশগুলো তারই অনুকরণ করে। তার পরিণাম, তৃতীয় বিশ্ব থেকে 'মগজ-পাচার' ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির কাহিনী সকলে জানেন। পুরাতন কায়দায় আধুনিক 'জেন্টেলম্যান' তৈরীর এমনই অভিশাপ। কিছুদিন পূর্বে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহুতল-বিশিষ্ট স্কাইস্ক্রেপার-স্থপতি এই দেশের সন্তান ফজলুর রহমান খানের মৃত্যু তৃতীয় বিশ্বের আত্মশক্তির এক বিষাদময় বিনষ্টি কাহিনী। ইংরেজী ভাষা মারফত পৃথিবীর ব্যাপক আরো সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কিন্ত ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ওই ভাষা দেশের সাবেক মনিবদের সঙ্গে সুবাদ-রক্ষারও সেতু বটে। যারা ইংরেজি জানে তারা সমাজে শরীফ এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগের সুযোগও তারা পায়। যুগপৎ জাতীয় সাংস্কৃতিকে হীন চোখে দেখা বা তার প্রতি অবহেলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এক ইংরেজ চিন্তাবিদ লিখেছেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ব্রিটেনকে হটিয়ে দিল তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজি ভাষার যোগসূত্র।

ইংরেজের প্রাক্তন উপনিবেশের সমাজ-তিলকেরা (এলিট) সকলে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তাদের মধ্যে শিকড় পুঁততে বেশী বেগ পেতে হয়নি।

আন্তর্জাতিক ফেরে পড়ার ফলে তৃতীয় বিশ্বের সরকারী কর্তৃত্ব সব জায়গার বড় নাজুক। যেসব শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য দাবী করতে পারে-এমন পদ্ধতি-বিন্যাস আছে, তাদের ধাক্কায় সরকার ধসে পড়ে। সামাজিক স্থায়িত্বের দিক থেকে তা হিতকর হয়।

দেশের অভ্যন্তরে পূর্ববর্ণিত অর্থনৈতিক দ্বৈততার ফল এমনই বিষময়। সবই কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অনুসৃতি। ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখতে বর্তমান যুগে বাদশাহী আর প্রয়োজন হয় না। ল্যাটিন আমেরিকার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য রক্ষার ধরন-ধারণ থেকে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরাও ভাল সবক নিয়েছে। ইংরেজদের বিভিন্ন স্বাধীনতা-'প্রদানের' ইতিহাস সেইখানে খুঁজে পাওয়া যায়। 'ঘর-সর্বস্ব তোমার, চাবিকাঠি আমার', এই বাংলা প্রবাদ ওরা ভাষা না জেনেও শিখে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ বহুজাতিক করপোরেশনগুলো। তাদের আর্থিক স্বার্থে বিশ্বের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। "ইন্টারন্যাশনাল মানিটারী ফান্ড", "ওয়ার্লড ব্যাংক". "গ্যাট" (গাঁটই বটে) বা "জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড এন্ড ট্যারিফ" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ওদের আর্থিক

হাতিয়ার।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইতি ঘটেছে; কিন্তু কোম্পানীর আমল চলছে : দ্বিতীয় দফা।

এই দফা রফা করাই এখন তৃতীয় বিশ্বের আশু কর্তব্য, বাঁচার জন্যে, স্রেফ অস্তিত্বের জন্যে।

সংবাদ ঈদ সংখ্যা : ১৯৮২

স্বপ্নচারীর অন্তর্ধান

Then came new king over Egypt who knew not Joseph

– Bible, Exodus : 1 : 8

তারপর মিশরে নতুন রাজা (ফেরাউন) এলো, তারা হযরত ইউসুফ-কে চেনে না।

বাইবেল : দেশত্যাগপর্ব ১ : অনুচ্ছেদ ৮

AMARBOI.COM

দ্বিজাতিতত্ত্বের কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যের সাক্ষীরূপে আজ তা বিশ্বের মানচিত্রে দীপ্যমান। স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানী 'কোলাবোরেটর' বা দালাল-রূপে যারা সক্রিয় ছিল তারাও এই সত্য আজ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দাসত্বের খোঁয়ারি, নেশা অত সহজে কাটে না। তাই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অসাফল্যের বয়ান পুঁজি করে তারা ইতিহাসের চাকা আবার উল্টো দিকে ঘোরাতে ব্যস্ত। কিন্তু কেবলমাত্র সফলতা দিয়েই সব সময় বিচারের নিরিখ ঠিক হয় না। দায়িত্বের স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে ওজন করে দেখা উচিত।

প্রথমে বলে রাখা ভাল, বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ছিল আত্মদ্বন্দ্ব। এই লড়াইয়ে তিনি পরাজিত হন। তাঁর রাজনৈতিক ব্রতের অসমাপ্তির হেতু সেখানেও স্পষ্ট ধরা যায়। ঐতিহাসিক পুরুষ তো আবার ব্যক্তি পুরুষও বটে! কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি ব্যক্তি হিসেবে একক বা একজন মাত্র। ওই দুয়ের মধ্যে বিরোধ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঐতিহাসিক দায়িত্ব সব সময় ব্যক্তিগত আবেগ ও যুক্তির অনুকূল না-ও হতে পারে। এই দ্বন্দের সমাধানের ভুল-ত্রুটি হলে, ঐতিহাসিক পুরুষের বিনষ্টি ঘটে না, কিন্তু ব্যক্তি-পুরুষ ধ্বংস হয়ে যান। বক্তব্য সহজের জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া চলে। স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানী 'কোলাবোরেটার'দের মধ্যে বহু দুর্নীতিবাজ, খুনী, বদমাস ছিল। বঙ্গবন্ধু তাদেরও ঢালাও পাইকারী ক্ষমা করে দিলেন। একদিকে ব্যক্তি হিসেবে তিনি করুণাময়, মহৎ ঔদার্যের অধিকারী;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে, ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি অবহেলার দায়মুক্ত নন। এমন বহু ত্রুটির তিনি চড়া দাম দিয়ে গেছেন। তিরিশ লক্ষ প্রাণ বিসর্জনের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক পুরুষের-ব্যক্তি পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ–এখন প্রমাণিত–যুক্তিযুক্ত নয়। মানবতার স্বপ্ন আদর্শ হিসেবে মনোরম। কিন্তু তা বাস্তবায়নের পথে ত্রুটি ঘটলে প্রতারিত হতে হয়।

স্বপ্নচারী বঙ্গবন্ধু। দিবাস্বপ্ন দেখতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তার প্রমাণ, যথাস্থানে বর্ণিত।

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র। এই একটি বিষয়, বোধ হয়, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে ভুল বোঝাবুঝির বিশেষ একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডান, বাম–দুই তরফের রাজনীতিবিদগণ হট্টগোল বাঁধিয়েছিল। ব্রিটিশ দাসত্বের খাতে আমদানিকৃত এই বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতি মোহ বহুজনের আজও যায় নি। বহু পার্টি দেশে থাকলে দেশে সাচ্চা গণতন্ত্র থাকে, অন্যথায় নৈব নৈব চ। এই ধারণা থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক পদক্ষেপের প্রতি অনেকেই সন্ধিগ্ধ হয়ে গড়েন। অথচ যে-দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের জন্ম সে দেশেই এখন তা অবজ্ঞার পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত।

তিন বছর অন্ধকারে অনেক হোঁচট খাওয়ার পর শেখ মুজিব 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধি বিশিষ্ট দেশে একটিমাত্র পার্টি। এক-পার্টির আতঙ্কে এমন কি বহু বামপন্থী রাজনীতিবিদও গণতন্ত্র হত্যার আলামত দেখতে পেলেন। কারণ চীন ও রাশিয়ার চৌদ্দটা পার্টি আছে।

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা চালু হলে, হয়ত গোটা এশিয়ার ভূখণ্ডে এক মহতী সামাজিক পরীক্ষার ভুল-ত্রুটি বা সাফল্য যাচাই হতে পারে। কিন্তু তার কোন সুযোগ তিনি পেলেন না। অথচ 'বাকশালী' আমলের অপবাদ কীর্তন ডান, বাম উভয় দিক থেকে আজও শোনা যায়। গর্ভস্থিত ভ্রূণের পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে তারা বিশেষ সিদ্ধহস্ত–তা বুঝতে কারো ভুল হওয়া উচিত নয়। 'বাকশালে'র অন্যতম রাজনৈতিক তাৎপর্য কি ছিল–যা সহজে চোখে পড়ে?

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ মারফত জনগণের আরো নিকটে পৌঁছানোই সেখানে মূল উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভেবে দেখেন নি তাঁর এই পদক্ষেপের রাজনৈতিক ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। স্বপ্নচারীর নিকট স্থান-কাল মুছে যায়। অথবা, শেখ মুজিবের মত হৃৎযোগী (কারীস্‌মা) নেতাদের নিকট জনগণের উপর আস্থা এমনই সম্বল হয়ে দাঁড়ায় যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর হালচালের বিচার, বাহুল্য মনে হয়।

একটি উদাহরণ, আশা করি, অনেকে আজও ভুলে যাননি। ১৯৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় সোনার বাংলা গড়ার জন্য ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশের গ্রামে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রামের মধ্যবিত্ত কৃষকও আওয়ামী লীগের সমর্থক। জমির জন্যে হন্যে দেশে অমন ঘোষণার ফল কী? সমর্থকরাই নীরবে অথবা সরবে চীৎকার দিয়ে বলবে, 'লোকটা আমাদের জমি নিয়ে যাবে।' নিজের পার্টির কি দশা হবে শেখ মুজিব ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। স্বাপ্নিকের স্টাইল তাঁর নিজস্ব। তখনই আওয়ামী লীগের মধ্যে গুঞ্জরণ উঠেছিল। স্বপ্নচারী পিছু হটলেন। বঙ্গবন্ধু আবার ঘোষণা করলেন, তিনি মহকুমা-মহকুমায় মডেল ফার্ম বা আদর্শ খামার গড়বেন। নিজের রাজনৈতিক ক্ষতি-সাধন পূর্বেই করে বসেছিলেন মেরামতে দাগ সহজে নিশ্চিহ্ন হয় না।

ব্রিটিশ আমলের প্রশাসন-যন্ত্র আজও অটুট আছে। তাঁর গায়ে হাত দেয়ার মত সাহস অন্তত এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের ভেতর মেলে না। পশ্চিমবঙ্গে এক মার্কবাদী সরকার আছে। তিন চার বছর পূর্বে শাসক-নেতারা প্রশাসনে খোল-নৈচ্য পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পুলিসের গায়েও তারা হাত দেন। কিন্তু আঙ্গুল বাড়ানো মাত্র নেতাদের হাতে এমন ছ্যাঁকা লাগে যে আর এগোতে সাহস করলেন না। ফলে, প্রশাসনের খোল-নৈচ্য মেড-ইন-ব্রিটেন এবং শাসক 'নেটিভ' যদিও মার্কসবাদের জলে চুবানো। এমন জগা-খিচুড়ির পরিণাম কল্পনা করা যায়। ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বিরোধ অত সহজ নয়।

শেখ মুজিবের অকুতোভয়তা, দুঃসাহসের বহু কিংবদন্তী আছে এদেশে। 'বাকশাল' আর এক সংযোজন। মহকুমাগুলো জেলায় পরিণত হত। রাজধানীর বুক থেকে আমলাতন্ত্রের ভার যেত কমে। রাজধানীর বিদেশী আরাম-আয়েশের গ্যাজেট-আকীর্ণ জীবন থেকে কে-ই বা মফস্বলে ছিটকে পড়তে চায়? বাকশালের ফলশ্রুতি, আমলাতন্ত্রের আর এক পুনর্জন্ম : সাধারণ মানুষের কাছাকাছি তাদের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়ার নতুন সবক। অনভ্যস্ত জীবন কে-ই বা আনন্দের সঙ্গে বেছে নিতে পারে? এই দুঃসাহসের পথে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সচেতন বা অচেতনভাবে শত্রু সৃষ্টি করছিলেন। আঁট-ঘাঁট বাঁধেননি। তাঁর নেতৃত্বের অপূর্ব ঝলক হয়ত এমন সতর্কতার পথে বাধা ছিল।

বিকেন্দ্রীকরণের পথে দেশের মিলিটারী পরিণত হত শান্তিরক্ষী বাহিনী বা মিলিশিয়ায়। সাধারণতঃ অনুন্নত দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র নানা ফাটল সৃষ্টি করে। এই ফাটল-পথে আসে সামরিক শাসন। বাংলাদেশের মত জনসংখ্যাকীর্ণ গরীব দেশে আধুনিক প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ সমরসজ্জা ঝুটা বিলাস মাত্র। অনুৎপাদনমূলক বা নন্‌প্রডাকটিভ খাতে অনর্থক ব্যয় দেশের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী মিলিটারী বাজেট ছিল ২৫০ কোটি টাকা। বলা যায়, এই অঙ্কই হল পাকিস্তান ধ্বংসের মূলসূত্র। তা অত্যুক্তি কিছু নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারী প্রভুদের স্বার্থে ঘা লাগবে এই আশঙ্কার পরিণাম হ'ল ইয়াহিয়া খান-শেখ মুজিবের শেষ বৈঠকের পণ্ডশ্রম। সব সমঝোতা বানচাল হওয়ার আবহে ছিল ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়াই শো কোটি টাকা। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা বঙ্গবন্ধু বিস্মৃত হননি। তাছাড়া, বাংলাদেশ কার বিরুদ্ধে লড়বে? প্রতিবেশী ভারত, বার্মার বিরুদ্ধে? সামরিক আয়োজন দেশের মানুষের আস্থার উপর ভিত্তি না পেলে কোন কাজে আসে না। প্রচুর সমরসজ্জায় সজ্জিত ছিল ফ্রান্স। হিটলার বাহিনীর মুখে দু'হপ্তা টিকল না। অথচ নিরস্ত্র ভিয়েতনাম তিরিশ বছর ধরে দানবীর কায়দায় সজ্জিত হিংস্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে রইল। জনগণের জীবনের শ্রীবৃদ্ধির উপর আস্থা রেখেই শেখ মুজিব মিলিটারী বিকেন্দ্রীকরণের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর আধুনিককালে ক্ষুদ্র দেশের অস্তিত্ব উনিশ শতকের মত অত নাজুক নয় যে শুধুমাত্র গায়েব জোরে কোন শক্তি জিতে যাবে।

স্বপ্নচারী বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের দ্যোতনায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। আপন সদিচ্ছার পথে দেশের আর এক শ্রেণীর মধ্যে তিনি শত্রুবীজ বপন করলেন। দেশের অভ্যন্তরে হেন চিত্র। আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে?

সেখানেও তিনি শত্রু সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেন। ১৯৭৩ সনে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা স্মরণীয়। খোলাখুলি তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উচ্চারণ–কোন প্রচ্ছন্নতা ছিল না কথার মধ্যে। বঙ্গবন্ধুর গতিবিধি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নিঃসংশয় করেছিল তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ সম্পর্কে। শোনা যায়, উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতার পর ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন শেখ, পৃথিবীময় আপনি শত্রু সৃষ্টি করলেন, এমন-কী আমাদের মধ্যেও। অনেক দেশ নাম-কাওয়াস্তে জোটনিরপেক্ষ, আসলে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়। ফিদেল ক্যাস্ট্রো অপেক্ষা কে আর সে ব্যাপারে অধিক সচেতন?

স্বপ্নাচারী আদর্শের গন্তব্যে হৃদয় পূর্বেই বন্ধক দিয়ে বসে থাকে, পথের কাঁটার হিসাব রাখে না।

ঘরে,বাইরে শত্রু!

চিরদিন অকুতোভয় এবং আপন নেতৃত্বে অটল প্রত্যয়বান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শত্রুর অবয়বের মাপ আর নিলেন না। স্বাধীনতার প্রাক্কালে জনশক্তির বলে তিনি শত্রুকে হীনবল মনে করলেন। পাকিস্তান, ভারতের পথ রুদ্ধ বিধায়, শ্রীলঙ্কার পথে বিমানে সৈন্য আনতে লাগল, বঙ্গবন্ধু নির্বিকার রইলেন। স্বাধীনতার পরও দেখা গেল, অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি! স্বাপ্নিকের পক্ষে এমন আচরণ স্বাভাবিক। তাছাড়া, সমস্যা-জর্জরিত বাংলাদেশের নেতাদের পক্ষে বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন সতর্ক পা ফেলতে হয় যে বহু সময় সংগতি রক্ষা দায় হয়ে পড়ে। এই জন্যে দক্ষ সাপুড়ের মত নানান ধরনের সাপ নিয়ে খেলায় বঙ্গবন্ধু অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর তুপড়ি-বাঁশির আওয়াজে এইসব হিংস্র প্রাণীদের বশীভূত রাখবেন। দেশী এবং বিদেশী এই সরীসৃপেরা শুধু ছোবলের অপেক্ষায় ছিল। বাকশাল-পরিকল্পনা চালু হলে পঁয়ষট্টি জেলার ৬৫টি মস্তক চূর্ণ করতে হত।

সেই জায়গায় একটি মস্তক–বিরল ও মূল্যবান–মস্তকে মোক্ষম আঘাত হানা ঢের বেশী সস্তা এবং সহজ। হিংস্র সরীসৃপেরা হিসেবে ভুল করেনি।

স্বপ্ন অবাস্তব রয়ে গেল। কিন্তু এই সহসা অন্তর্ধান নিষ্ফল কিছু নয়। স্বাজাত্য-সন্ধানী বাঙালী মুসলমানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাজনৈতিকভাবে আবেগের শিকড় দিয়ে গেছেন। তার ফল সুদূরপ্রসারী বৈকি। আবার বাইবেল স্মরণীয় : Men look at out success. God sees our striving–মানুষ আমাদের কামিয়াবী (সাফল্য) দেখে, আল্লা দেখেন কেশেশ (প্রচেষ্টা)।

চিত্রবাংলা, ১৯৮৩

গণতান্ত্রিক শিকড়ের অভাবে

বিখ্যাত চৈনিক ঋষি কনফ্যুসিয়াস সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব বাণী দিয়ে গেছেন, তা সকল সভ্য দেশেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। কারণ উন্নতি-মুখর সমাজে দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের উপর নির্ভর করে সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের উপর। আদর্শ সামনে তুলে ধরলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার রূপায়ণ রীতিমত কঠিন ব্যাপার। তাই প্রয়োজন হয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিট্যুশান যার ছত্রচ্ছায়ায় কাজের প্রবাহ ঠিক থাকে এবং নীতির উপর কোন আঘাত যেন না পড়ে। এই ব্যবস্থা ছাড়া আদর্শের বুলি প্রচুর আওড়ানো যায় জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আখেরে ফাঁকি ধরা পড়ে। এমন পরিবেশে সমাজের অগ্রগতি হয় না, তা বলা বাহুল্য। দেশের জনগণের দুঃখ অনর্থক বাড়ে এবং একই সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সর্বনাশের পথ পরিষ্কার হয়, যদিও তারা টের পায় না।

বর্তমান যুগে কনফ্যুসিয়াসকে আবার স্মরণ করতে হয়।

একদিন কনফ্যুসিয়াসের কোন সাগ্রেদ তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, রাষ্ট্রব্যবস্থা কি কি অপরিহার্য শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত? জবাবে তিনি তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন।

১. জনসাধারণের কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না।

২. দেশের সৈন্যবাহিনী খুব শক্তিশালী।

৩. সরকারের উপর জনগণের আস্থা থাকবে ষোল আনা।

সাগরেদ আবার প্রশ্ন করেছিল, বেগতিক অবস্থায় পড়ে যদি তিন শর্তের কোনটি জলাঞ্জলি দিতে হয়, তা হলে কি পন্থায় তা ঠিক হবে?

কনফ্যুসিয়াস তারও জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বেগতিক অবস্থায় তিনি প্রথমেই বাদ দিবেন সেনাবাহিনী। তারপর খাদ্য। কারণ আবহমান কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে খাদ্যের অভাব চলে এসেছে। বেগতিক ব্যবস্থায় সে দিক বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় শর্ত : জনগণের আস্থা, কোন ক্রমেই জলাঞ্জলি দেওয়া চলবে না। তা চলে গেলে মানুষের পায়ের নিচে আর মাটি থাকবে না। কিসের উপর দাঁড়াবে তারা? দেশ দ্রুত ধ্বংসের পথে এগোবে।

কনফ্যুসিয়াসের মূল্যবান কথাটি বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই নতুন ভাবে অনুধাবন করা উচিত। কারণ গণতন্ত্র নির্ভর করে, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থার উপর।

এই বাণী সম্পর্কে হয়ত কোন দেশেই কেউই ভিন্নমত পোষণ করবে না। কিন্তু সমস্যা ওঠে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে। কি উপাদান থাকলে একটি সরকার গণতান্ত্রিক, অন্যথায় স্বৈরাচারী? তার নির্দিষ্ট কোন নিরিখ অন্ততঃ এখনও আবিস্কৃত হয়নি। কারণ, দেখা যায়, স্বৈরাচারীও নিজের সমর্থনে যুক্তি প্রয়োগ করে এবং তাল ঠুকে, তার প্রদর্শিত পন্থাই গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা—এমন জোরশোর জিগির চালায়। বর্তমানে মাসমিডিয়া বা গণমাধ্যমের যুগে স্বৈরাচারীও নিজের স্থান করে নিতে পারে সহজে। প্রচারণার ফলে মানুষের পক্ষে সত্য বা ঝুটের আদল বুঝে ওঠা দায় হয়। এই যুগের জটিলতা অনেকেই ধরতে অক্ষম। প্রাক-যন্ত্রশিল্পের যুগে ব্যাপারটা এমন ঘোরালো ছিল না। আজও প্রাচীন গ্রীসের শহরে চালু গণতন্ত্রের মহিমা অনেকে প্রচার করে, তা নাকি এক রকমের গণতান্ত্রিক পরাকাষ্ঠা, এমন কাহিনীও কিছু কিছু মনীষী বলে থাকেন। কিন্তু পণ্ডিত প্রবরগণ জানেন না এবং জানলে ভাণ করে থাকেন যে, গ্রিসের সব নাগরিক নাগরিক বলে গণ্য হোত না; প্রশাসনে তাদের অধিকারের প্রশ্ন তো দূরের কথা। অধিকাংশ অধিবাসী ছিল দাস—প্রভুর মর্জির উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। মানুষ রূপেই তারা গণ্য হোত না। বাকশক্তি সম্পন্ন জন্তু যেন তারা। মনিবের আদেশ মত মেহনত করে যাওয়াই ছিল তাদের দৈনন্দিনতা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই কলঙ্ক সহজে মোছা সম্ভব হয়নি। সামাজিক আদর্শে দাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের বহু অনুশাসন ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা আদৌ প্রতিপালিত হোত না। আরব দেশে এমন কি ইসলামের আবির্ভাবের পরেও দাসদের সামাজিক চিত্রে তেমন বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। কেতাবের আদর্শ কেতাবে থেকে যায়। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার গোলামেরা আশা করতে পারত না। উন্মায়েদ শাসনের ইতি ঘটায় আব্বাসীয় নেতৃত্ব। তার মূলে ছিল দাস-বৃন্দ। উম্মায়েদদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় চ্যালেঞ্জের মুখে সমস্ত নিপীড়িত দাসশ্রেণী আবু মুসলিমের পিছনে এসে দাঁড়ায়। অনেকে স্তম্ভিত হতে পারেন, দাসদের সামাজিক মর্যাদার কথা শুনলে। এগারো শতকের আরব ঐতিহাসিক ইবনুল আসির লিখছেন যে তখন একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল। প্রবাদটি এই : তুমি তোমার নামায ছেড়ে দিতে পারো, যদি নামায পড়ার সময় তোমার সামনে দিয়ে তিনটি প্রাণী চলে যায় : কুকুর, গাধা ও গোলাম।

গোলামদের বলা হত আরবী ভাষায় "মাউলা"। অন্যান্য দুরবস্থার কথা এখানে আর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। মোদ্দা কথা, গোলামদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই জীবন-যাপন করতে হোত। দাস ক্রয়-বিক্রয় ত সে যুগে সামাজিক অপরাধ ছিল না, বর্তমানে যা অপরাধ রূপে গণ্য।

গ্রীক সভ্যতার অবদান বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে অপরিসীম। জীবনকে জানার এমন কৌতূহল সেই প্রাচীন যুগে আর কোথাও মেলে না। বিজ্ঞান, দর্শন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য নানা সাংস্কৃতিক প্রান্তরে গ্রীকদের অনন্ত-সন্ধানী মনের ছাপ পাওয়া যায়। তবু গ্রীক সভ্যতা টিকল না। অপরের মেহনতের উপর জবরদস্তি খাটিয়ে যে সভ্যতার পত্তন তা অবিনশ্বর আয়ু-লাভের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে রোমক সভ্যতার একই দশা ঘটেছে। কারণ সমাজ-ভিত্তির বাঁধন ছিল শ্লথ। সেখানেও একই চিত্র : অপরের শ্রমের উপর ন্যায়হীন–অন্যকথায়, অন্যায়-নিয়ন্ত্রিত সমগ্র সমাজের বুনিয়াদ। এমন পরিবেশে মানুষ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। এড্‌ওয়ার্ড গীবন (রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন গ্রন্থ) তার বাস্তব ছবি অমর কথায় গেঁথে রেখে গেছেন। রোমের শাসকশ্রেণী সেই যুগে স্বাভাবিক আনন্দ-বোধ হারিয়ে অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নিত যা মানুষের মর্যাদার পক্ষে ঘৃণা, অবমাননাকর। একঘেয়েমিজাত জীবন ক্লান্তি বা "বোরডম" উচ্চ শ্রেণীর মানুষগুলোকে পাঁকের দিকে ঠেলে দিত। তাই দেখা যায়, গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রতিযোগিতা কে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে পারে। এই পৈশাচিক তামাশা গ্যালারিতে বসে-বসে দেখতো অভিজাত শ্রেণীর নর-নারী, অবলা-কথিত নারীকুল পর্যন্ত অমন খুনখারাপি দেখে উল্লাস-আনন্দে চীৎকার দিয়ে উঠত। সিংহের মুখে খ্রীস্টানদের ফেলে দিয়ে তাদের মৃত্যুদৃশ্য অবলোকন ছিল সেই সব "বোরড" পুরুষ রমণীদের ফূর্তি লুণ্ঠনের উপায়। অপরের মেহনতের উপর যারা পার্থিব ভোগের সন্ধান পায় তারাই আসল ক্রীতদাস। কিন্তু ইতিহাসে তা ঘটেনি। মেহনৎ দ্বারা জীবিকা-সন্ধানীরাই যুগে যুগে গোলাম নামে অবজ্ঞাত এবং কলঙ্কিত হয়ে এসেছে। রোমক সভ্যতার পতনের মূলে ছিল সমাজ কাঠামোর সেই পরিখা, যার মধ্যে একদিন শাসক শ্রেণী তলিয়ে গেল। বলা বাহুল্য দেশের জনগণের আস্থা রোম সরকার হারিয়ে বসেছিল। এক কথায়, গণতান্ত্রিকতার শিকড় ছিল না তদানীন্তন রোমীয় সমাজে।

আধুনিককালে ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার গত দেড়শ' বছর ধরে পৃথিবীময় চালু হয়েছে। এখানেও দেখা যায়, সেই একই গুঞ্জন।

বৃটিশ দাসত্বের ইতিহাস এদেশে কারো কাছে অবিদিত নয়। সাধারণ মানবিক অধিকারের জন্য মানুষ যখন সোচ্চার হয়েছে, তখনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আদর্শ বলি দিতে এতটুকু বিলম্ব বা দ্বিধা করেনি। অথচ, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শ্লোগানের উৎসভূমি ইউরোপ। এ দেশের শত শত শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ থেকে তল্পি গুটোতে হয়েছে। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতি অভিমানী এই সভ্য জাতি এখনও সম্পদ খোয়ানোর শোকে অনুন্নত দেশের মানুষের মিত্র সাজে স্রেফ শোষণের পাতকা বিগত শতাব্দীর মত উঁচিয়ে রাখতে। তার বহুৎ প্রমাণ দেওয়া যায়। শুধু মুখোমুখি চোখ রাঙানো এবং খুন-খারাবির পুনরাবৃত্তি ওদের দাপটে আর ঘটে না। কারণ, বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের কোমর ভেঙে গেছে। খসলৎ যায়নি। বরং যাদের কোমর শক্ত আছে তাদের ফেউগিরীতে যথা-সিদ্ধহস্ত।

পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ এখন মার্কিন দেশ। পশ্চিমী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই সভ্য জাতির পক্ষে কোথাও দেখা যায় না, মানবিক অধিকারের লড়াইয়ে আমরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোন জাতির পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে সামান্যতম মদৎ দিতে। বরং দেখা যায়, যে-সব দেশের শাসক স্বৈরাচারের ধারক ও বাহক সেখানেই মার্কিন শাসক শ্রেণী এগিয়ে আসছে। এবং স্বৈরাচার সমর্থনে প্রবক্তারা যুক্তি আবিষ্কার করেছে অভিনব ধারায়। আর যেখানে দৃশ্যমান সমর্থন নেই, সেখানে আছে অদৃশ্য অগোচর মদৎ। "চোরকে বলে চুরি করতে এবং গেরস্থকে বলে সজাগ হতে," এই নীতির সার্থক প্রতিফলন যদি কেউ দেখতে চায়, তার জন্যে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সামান্য তলিয়ে দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইসরাইল প্যালেস্টাইনের ন্যায্য অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে রাজ্য বিস্তার করছে। সবই মার্কিন ধনকুবের এবং মার্কিন সরকারের অকুণ্ঠিত অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে। সেখানে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন তোলা অবান্তর। যেহেতু, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। স্বৈরাচারী ইরানে শাহ ছিল মার্কিন বন্ধু। এমন কী আস্থা হারানোর পর এবং আরো গভীর পর্যায়ে রক্ত ঝরিয়ে যখন ইরানের জনগণ শাহকে বিতাড়িত করেছে দেশ থেকে, তখনও মার্কিনী বিবেক জাগ্রত হয় নি। যে জেগে ঘুমায়, কে তা-কে জাগাতে পারে?

সভ্য জাতির তরফ থেকে এমন আচরণের পটভূমিকায় সোজা জিজ্ঞেস করা যায়, 'হেঁয়ার-লাইজ দি রাব'—বাগড়া কোথায় বেধে আছে?

সেই প্রশ্নের জবাবে আরো দূরে যেতে হয়। যন্ত্রশিল্পে উন্নত দেশগুলোর শ্রীবৃদ্ধি অত্যাচার এবং শোষণের উপর দিয়েই সম্ভব হয়েছে। ইংরেজের প্রথম উপনিবেশ, তাদের প্রতিবেশী আয়ারল্যান্ড। যার জের আজও তিনশ' বছর ধরে টেনে চলেছে আয়ারল্যান্ডের ভাগ্যহত অধিবাসীবৃন্দ। মার্কিন পুঁজিবাদের ক্রমোন্নতি একই ধারায় এগিয়েছে। তার আর্থিক কাঠামো বজায় রাখতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য লুণ্ঠন ছাড়া উপায় ছিল না। মার্কিন দেশ পাঠ্যপুস্তক নয় শুধু বিভিন্ন উপায়ে নানা মীথ্ বা কল্পকাহিনী সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ একজনের নাম করা যায়। গণতন্ত্রের পূজারী হিসাবে প্রচারিত একটি নাম, অব্রাহাম লিংকন—সাদরে 'এ্যাবি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিংকন। মার্কিন পুঁজিবাদের প্রসারে ইংরেজদের আইরিশ- উচ্ছেদের মত, আমেরিকায় রেড-ইন্ডিয়ান উচ্ছেদ একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। জীব-জন্তুর মত অনুন্নত এই মানুষদের শিকারে অভিযান চলত। শ্রীযুক্ত 'এ্যাব' লিংকন এমন অভিযানে শরীক হতেন যৌবন কালে। নিজে ক'টা রেড-ইন্ডিয়ান হত্যা করেছিলেন, তার রেকর্ড ভদ্রমহোদয়ের জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহক বলেছিলেন, "এ্যামং ফ্রি মেন দেয়ার কুড বি নো সাক্সেস্ফুল এ্যাপিল ফ্রম্ ব্যালট টু বুলেট। স্বাধীন মানুষদের মধ্যে ব্যালট (গুপ্ত ভোটদান পদ্ধতি) থেকে বুলেটের নিকট কোন সফল আপীল হতে পারে না।" কিন্তু রেড-ইন্ডিয়ানদের ত ভোট নেই, 'ফ্রি-ম্যান নয়।' অতএব সেখানে বুলেটই সফল আবেদন বা আপীল। আমেরিকায় আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ-কাহিনী মানব-সভ্যতার এক জঘন্য অধ্যায়। বেশী দিনের কথা নয়। উনিশ শতকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে "স্যান্ড ক্রীক, হত্যাকাণ্ড" কিন্তু, মার্কিন সৎ নাগরিকদের বিবেক পর্যন্ত নাড়া দিয়েছিল। ফলে তা ধামা-চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক সেনাবাহিনীর এক কর্ণেল, নাম জে, এস, সিভিংটন। ভদ্রলোক আবার ছিলেন মেথডিস্ট গির্জার পাদ্রি। কলোরেডো এলাকায় ঘুমন্ত রেড-ইন্ডিয়ানদের উপর সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃতের সংখ্যা ৪৫০—সাড়ে চার'শ। পাদ্রি সিভিংটনের সৈন্যরা রেড-ইন্ডিয়ান মেয়েদের যোনি কেটে লাঠির আগায় বেঁধে দিত অথবা নিজেদের হ্যাটে গেঁথে রাখত। তখনকার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে পাওয়া যায়, শিশু এমন কী দুই-তিন মাসের বাচ্চা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। বাচ্চাদের হত্যার পেছনে যুক্তি ছিল। পাদ্রি কর্ণেল সিভিংটনের মন্তব্য শুনুন। "নিটস মেক লাইস। ডিম থেকেই ত উকুন জন্মায়।" উকুনের ডিম থেকেই উকুন হয়। কথা সত্য। মানুষের উপরও তা প্রযোজ্য। এবং এই মন্তব্য করছে যীশুখ্রীস্টের এক সেবক। মার্কিন দেশের পাদ্রিগুলো যদি মানুষ হোতো তাহলে তিরিশ বছর ধরে ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলতে পারত না। সিভিংটনের ভূত ওদের প্রত্যেকের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। চার্চ থেকে শোষণের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় প্রতিবাদ ওঠে না কোন দিন। গণতান্ত্রিক শিকড়ের অভাবে মার্কিন শাসক শ্রেণীর আচরণ এমন ভয়ঙ্কর হয়। কারণ, ঐতিহ্য ত রক্তাক্ত এবং কলংকিত। আব্রাহাম লিংকনকে বর্ণ-বিরোধী মহাপুরুষ রূপে প্রচার করা হয়। এখন এই মহাপুরুষের বাণী শুনুন। তিনি ইলিয়নিস রাষ্ট্রের চার্লস্টন শহরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে (যখন ব্রিটিশরা এদেশে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করছিল) এক বক্তৃতা করেন। জায়গার অভাবে সকলের অবগতির জন্যে ইংরেজী উদ্ধৃতি না দিয়ে বাংলা তর্জমায় কিয়দংশ পরিবেশন করা গেল, "..... আমি বলছি আমি কালা এবং ধলার সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য আনয়নের পক্ষপাতী নই। এবং কোন কালে ছিলাম না। নিগ্রোদের ভোটার, জুরি করার পক্ষে আমি নই এবং কোন কালে ছিলাম না। ওরা কোন সরকারী পদ লাভ করুক কি

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদা বর্ণের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক তার পক্ষপাতী আমি নই এবং কোন কালে ছিলাম না।"

"তা-ছাড়া এর সঙ্গে আমি আরো সামান্য কথা যোগ করব : কালা এবং ধলা বর্ণের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য রয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই পার্থক্য চিরদিনের জন্য উভয় দিক থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের পক্ষে বাধা হয়ে থাকবে।

"একসঙ্গে আছি, কিন্তু একসঙ্গে বসবাস করতে পারব না। এই হচ্ছে অবস্থা। তখন ছোট এবং বড়-র ব্যাপারটা থাকবেই। তাই আমি অন্য যে-কোন মানুষের মত, সাদা বর্ণের অধিকারীগণ যেহেতু পর্যায়ভুক্ত, তাদের সামাজিক অবস্থানও উঁচুতে রাখার পক্ষপাতী।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী, মৃত হিটলার এবং ফৌত আব্রাহাম লিংকনে পার্থক্য আছে বলে ধারণা করা দায়।

লিংকনের পূর্বোক্ত মন্তব্যের পর একটি বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে যায়। "মৃধাদের (পদবি বিশেষ) কোন ছেলেটা ভাল? যে-টি গাছে চড়িয়া মোতে।"

রেড ইন্ডিয়ান-শিকারী, বর্ণ-বিদ্বেষী আব্রাহাম লিংকন নাকি একজন মহান প্রেসিডেন্ট ওই দেশে!

কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানে উন্নত সভ্য জাতি পলেস্তারা লাগাতে সিদ্ধহস্ত। হিরোসিমার উপর আণবিক অভিযানের সংকেত বাক্য ছিল, "লিট্‌ল বয়। বাচ্চা ছেলে" এবং নাগাসাকির ক্ষেত্রে সংকেত-বাক্য, "ফ্যাট বয় নাদুসনুদুস বালক।" প্রেসিডেন্ট ট্র্যুমান সেই ভয়াবহ বর্বরতা অর্থাৎ দুই দ্বীপের উপর আণবিক বোমা-বর্ষণের পর বলেছিলেন, "আই উড ডু ইট এগেন, ফই আই হ্যাভ টু–যদি আবার এই করতে হয়, আমি আবার এই কর্ম করব।"

রক্তপিপাসু দানব বেরিয়ে আসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভেতর থেকে।

তিরিশ বছর-ব্যাপী ভিয়েতনামের অমর আত্মত্যাগের কাহিনী এখন বিশ্ববিদিত। একের পর এক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বর্বর অভিযান চালিয়ে গেছে। কিন্তু গণতন্ত্রের এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের দোহাই দিতে কারো কার্পণ্য ছিল না। নিরস্ত্র ভিয়েতনামীদের উপর ন্যাপাম বোমা-বর্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের দোহাই দেওয়ার কাহিনী এখানে বিবৃত করা যেতে পারে।

আমেরিকার "ডাউ কেমিক্যাল" এই বোমা প্রস্তুতের অর্ডার পায়। এক সাক্ষাৎকারে তাদের প্রতিনিধি হেনরী বুরোভিকের মুখ-জবানি আবার বাংলা তর্জমায় শুনুন : "অনেকে আমাদের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট আমলে হিটলারের সেনাপতিরা যা করেছিল তার একটা সমান্তরাল তুলনা চালাতে পারে। কিন্তু এই সাদৃশ্য-তুলনা একদম ডাহা কাণ্ডজ্ঞান-হীন ব্যাপার। হিটলারের সেনাপতি যারা আগুনে চুল্লীর ভেতরে মানুষ পুড়িয়েছিল তারা বাস করত টোটালিটেরিয়ান বা সর্বাত্মক শাসনতন্ত্র-গ্রাসী রাষ্ট্রে। যদি ইচ্ছা হয়, আপনারা বলতে পারেন, তারা স্রেফ হুকুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালন করেছিল। কিন্তু আমাদের বাস গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। আমাদের স্বাধীনতা আছে বেছে নেওয়ার। গভর্নমেন্ট অবিশ্যি ডাউ কেমিক্যাল-কে বোমা [ন্যাপাম বোমা] তৈরীর প্রস্তাব দিয়েছিল। তা কোন অর্ডার-হুকুম নয়। আমরা বলতে পারতাম, না, বানাব না।"

'কেমিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনীয়ারিং নিউজ'এ প্রকাশিত ১৪ মার্চ, ১৯৬৬ সংখ্যা থেকে আবার তর্জমায় অনুসরণ করুন : হেনরিক বুরো-ভিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর আরো সংলাপ।

"কিন্তু আপনারা বললেন, হ্যাঁ, বানাব।"

"আলবৎ বলেছি, হ্যাঁ।"

"তা কী স্বদেশ-প্রেমের ভিত্তির উপর?"

"সেই জন্যেই হিটলারের সেনাপতির সঙ্গে আমাদের তুলনা একদম ফাহ্‌সা, বাজে কথা। নন্‌সেন্স! আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিশ্বাসের ফল, কোন হুকুম তামিল নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের ফল, জুলুমের পরিণাম নয়। তা হচ্ছে, মানবিক সম্পর্কের উচ্চতার মাপকাঠি।"

মানবিক সম্পর্কের উচ্চতর মাপকাঠি!

অন্য মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলা যায় খ্রিস্টানদের ভাষায় : শয়তানও দরকার মত বাইবেল আওড়ায়।

মোদ্দা কথা, বুনিয়াদে গণতন্ত্রের শিকড় আল্‌গা হোলে এক সভ্য জাতির আদর্শ এইভাবেই মোড় নেয়। অস্ত্র নির্মাণের উপর এখন সমস্ত মার্কিন শিল্প জড়িত। কাজেই হত্যাকাণ্ডের প্রেরণাও যুগিয়ে যেতে হয়। টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি গণ-মাধ্যমও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক কথায়, মার্কিন সমর-বিশারদগণ—সোজা ভাষায়, পেন্টাগণ এখন মার্কিন জাতির বিবেকের দরওয়ানী করে। অনুন্নত দেশে বৈদেশিক সাহায্য তাদের নির্দেশ মতই রূপ পায়। সম্প্রতি মার্কিন ত্রৈমাসিক (ওয়াশিংটন কোয়াটারলি ১৯৮৩ শীত-সংখ্যা) দেখা গেল, বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি করছেন। কিন্তু তা সামরিক খাতে প্রবাহিত। বিরোধী দলের মতে অনুন্নত দেশে উন্নয়ন খাতেই সাহায্য যাওয়া উচিত। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টারও সেই মত পোষণ করতেন। কিন্তু খামাখা। কারণ, স্টেট্‌ ডিপার্টমেন্ট তা বানচাল করে দেয়।

এই সব টানা-পোড়েনের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভরশীল। বৈদেশিক সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভর হলে, আখেরে যে কোন দেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খোয়াতে বাধ্য। তার অনুষঙ্গ হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতায় টান পড়ে। দেশের মঙ্গলের ভার তখন আর সেই দেশবাসীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের তা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

একই সঙ্গে স্মরণীয়, গণতন্ত্রের মহিমা যারা অহরহ প্রচার করে, সেই সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশেই গণতন্ত্র স্বৈরাচারের শিকার। কাঠামো নামে গণতান্ত্রিক, যেমন, গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলো ছিল। কিন্তু মূলতঃ শোষণের উপর তাদের ভিত্তি। এই নৈতিকতা-শূন্য আবহাওয়ায় মানব-কল্যাণের প্রত্যাশা অমূলক। শুধু টেকনলজী ছাড়া পশ্চিমের নৈতিক নর্দমা থেকে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের শিক্ষা-গ্রহণের আর বিশেষ কিছু নেই। দুঃখ হয়, কী মহান সভ্যতার স্থপতি মার্কিন দেশ। নৈতিকতার ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশে যারা ইমামের, পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিতে পারত অথচ সেখানে দুঃশাসক ভিলেন-রূপে তাদের দেখা মেলে। এক মহান জাতির অস্তিত্বসত্তা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত। সমাজ-জীবনে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। পনর-ষোল বছর পূর্বে মার্কিন মনীষী ভ্যান্স, পাকার্ডের একটি বই "নেকেড্ সোসাইটি–বিবস্ত্র সমাজ" গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে এক জাতি চাঁদে লোক পাঠায়, অথচ সেই দেশে নীচে বাড়ীর কাছে বা পার্কে বা নির্জন রাস্তার কোনায় হাঁটা বিপজ্জনক; ব্যাপারটা আত্মবিরোধী কিন্তু সত্য। প্যাকার্ড সাহেবের অন্যান্য আশঙ্কার স্তর আরো ঘনীভূত হয়েছে।

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের আইন উপদেষ্টা রায় মিলারের বিশ বছর বয়সী যুবক-সন্তান তার আপন মা মার্গারিটাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে। ঈমানহীন একটা জাতির যুব-সমাজের পক্ষে তা অস্বাভাবিক কী? তৃতীয় বিশ্ব অনুন্নত। এখানে লোমহর্ষক বর্বরতার নজীরও কম নয়। তবু আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ, আল্লাহর কাছে হাজার শোকর, যুগপৎ মাতৃ-ধর্ষণ ও মাতৃহত্যার কাহিনী এখনও তৃতীয় বিশ্বে কোথাও শোনা যায়নি।

পরিবর্তন, ১৩ মে, ১৯৮৩

AMARBOI.COM

চৌ এন লাইয়ের নিকট খোলা চিঠি

প্রিয় মহাশয়,

আমার দেশবাসীর নিকট না হোলেও আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমি ভাগ্যহত বাংলাদেশ-আগত একজন দীন সাহিত্য সেবক বা লেখক। আপনি বহুমুখী প্রতিভাধর, বিশ্ববরেণ্য নেতা আপনার দায়িত্বের বোঝা অশেষ। তাই আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা আমার কাছে একান্ত অনভিপ্রেত এবং বিশেষ পীড়াদায়ক।

চৌদ্দ বছর পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ইংরেজি ভাষায় লিখিত পত্রটির বাংলা অনুবাদ।

তবু আমি নাচার। কারণ, সমাজতন্ত্র তথা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে আমার মনে নানা প্রশ্ন এবং সন্দেহ জেগেছে। আপনি সমাজতন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন বিশিষ্ট কর্ণধার। তাই এই অনধিকার প্রবেশ।

বিগত পঁচিশে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর পাক-সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অমন নৃশংসতা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নৈতিক সমর্থনের আশায় আপনাকে এক পত্র লেখেন। জবাবে আপনার লেখা চিঠির বক্তব্যের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি লিখেছিলেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান গোলযোগ মুষ্টিমেয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনার এই মন্তব্য সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশবাসীর পক্ষে নিদারুণ অপমানজনক। তাছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? রাজনৈতিক দিক থেকেও আপনার উক্তি ধোপে টেকে না। এক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিচ্ছিন্নতাবাদী হয় কীভাবে? বোঝা যায়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে তেমন মনোনিবেশ সহকারে আপনি ভেবে দেখেন নি।

বিগত তেইশ বৎসরব্যাপী এক বর্বর সংখ্যালঘু-গোষ্ঠী ঔপনিবেশিক কায়দায় সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রচণ্ড শাসন এবং শোষণ চালিয়ে এসেছে কেবল মারণাস্ত্রের দাপটে। তবু বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবেই নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে এতদিন তৎপর ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শুধু প্রাদেশিক পরিষদে নয়, জাতীয় পরিষদেও অদম্য সংখ্যায়, দু'একটি বাদে, সমস্ত আসন লাভ করে। তখন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে "ছয় দফা'র ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হন, যেন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারে। কিন্তু সামরিক চক্র ওই সময়ের মধ্যে নানা টালবাহানা খাড়া মারফত, গোপনে গোপনে অসংখ্য সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে সমাবেশ এবং আলোচনা চলাকালীন আবহাওয়ার ভেতরই নিজেদের তাণ্ডব-লীলা, শুরু করে—যার মর্মবিদারী কাহিনী আজ বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত। তখন নিরুপায় বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অতঃপর, ইতোমধ্যে যা ঘটে গেছে, তার ফলে বাংলাদেশের পক্ষে পেছনে ফেরার আর কোন রাস্তা নেই।

কোন গত্যন্তর না দেখেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নিজেদের ন্যায়নিষ্ঠ মুক্তির জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারই অপর নাম বিচ্ছিন্নতাবাদ। ন্যায়ের সৈনিকেরা এখন সামরিক চক্র কর্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে উপহাসিত।

দুঃখের বিষয়, আপনিও তাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন। বাংলাদেশবাসীর কাছে তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। কারণ, মহাচীন প্রত্যেক অনুন্নত দেশের চোখে শ্রদ্ধার বিরাট আসন অধিকার করে আছে। সকলেই মনে করে, মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি মহাচীন বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর বিবেকবিশেষ। সেই বিগ্রহের উপর যখন মালিন্যের ছাপ পড়ে তখন বর্তমান কালের মাংসাশী, সগোত্র-ভূক জগতে সান্ত্বনার আর কি থাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি উক্ত পত্রে আপনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি দেশের অখণ্ডতার উপর নির্ভরশীল।

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি 'অখণ্ডতা' শব্দটি সম্পর্কে সুচারু বিবেচনা করে দেখেছেন? পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা কার্যতঃ সম্ভব কি না, পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ওই এক ধূয়া ধরে বাসে আছে। রাজনৈতিক দিক থেকে কেউই শব্দটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। অথবা তা করলেও আসল মতলব চেপে গেছে। চীন স্ব-মাহাত্ম্যে মহান, যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নয়। যে কোন ভাঁওতা চীনের কাছে ঘৃণ্য। মহাচীন সেই আদর্শই প্রচার করে, বা এই পৃথিবীতে রূপায়িত হওয়া সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার এই এক মূল বুনিয়াদ।

অখণ্ড পাকিস্তান। তা কি এই দুনিয়ায় সম্ভব? পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইহলৌকিক সমস্যার পারলৌকিক সমাধান হামেশাই জনসাধারণের নিকট খয়রাত করে থাকে। মহাচীন নিশ্চয় এমন প্রতিষেধে বিশ্বাসী নয়।

প্রশ্নটা আমি আবার তুলছি। অখণ্ড পাকিস্তান কি সম্ভব?

তার জবাবে আমাদের কিছুটা অতীত ইতিহাস খুঁড়ে দেখা আবশ্যক।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়। মুসলমানরা এক জাতি। কারণ তারা সমধর্মাবলম্বী। এই হচ্ছে, দ্বিজাতি তত্ত্বের মোদ্দা কথা। অর্থাৎ ভারত বিভাগের ভিত্তি ছিল ধর্ম। সেই মোতাবেক পাকিস্তানের জন্ম। অবিশ্যি গোড়তেই একটা খুঁটো বা গোঁজ মুণ্ডু তুলে খাড়া হোলো। পাকিস্তানের দুই অংশ ১২০০ মাইলের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী তখনই এক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আধুনিক চিন্তা-বিবর্জিত মুসলিম লীগের অশিক্ষিত নেতৃবৃন্দ তখন নিজেদের সাফল্যে ধেই-ধেই নৃত্যোম্মাদ, আর লেজ তুলে দেখলে না : বক্না, না বৃষ। কিন্তু ইতিহাস জবর নাছোড় মনিব। কড়ায় গণ্ডায় কাজ বুঝে নিতে ওস্তাদ। শুধু ধর্ম যে জাতীয়তার ভিত্তি হতে পারে না, তা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ ভেতরে ভেতরে গেঁজে উঠছিল। তাই আজ বিষ-ক্রিয়া ফোঁড়ার মত পুঁজক্লিষ্ট নানা মুখ নিয়েছে। পাকিস্তানের দুই অংশে কোন মিল ছিল না। বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা এমন কি আবহাওয়া পর্যন্ত আলাদা। একমাত্র যোগ সেতু ধর্ম–যা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব-অনুযায়ী জনসাধারণের জন্য আফিম বিশেষ।

সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি মনে করেন, "আফিম"ই একটা দেশকে অখণ্ড রাখার জন্যে যথেষ্ট? এমন ধারণা কিভাবে মার্কসবাদের সঙ্গে এক করে দেখা যায়, তা আমার পক্ষে বুঝে ওটা মুশকিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি, ভূস্বামী, আমলা, ব্যবসায়ী এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ গোড়া থেকেই অতি নির্মমভাবে শোষিত। একটি ছোট, সহজ-সজল পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে পরিস্থিতি বুঝতে কারো বিলম্ব হওয়ার কথা

নয়। ১৯৪৭ সন অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৬ সন পর্যন্ত এই ন'বছরে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ৪২ কোটি আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৯০ কোটি টাকা। পূর্ব-পশ্চিম অনুপাত ৬ ঃ ৭০!!! বাকি চৌদ্দ বছরের হিসাব তার চেয়ে কিছু বেশী জেল্লাদার নয়। এমন পরিস্থিতি থেকে আইনসম্মত পথও যখন রুদ্ধ, রেহাই পাওয়ার জন্যে অস্ত্র ধারণ ছাড়া বাংলাদেশবাসীর পক্ষে আর কোন রাস্তা উন্মুক্ত থাকবে? তাও সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা আরম্ভের পর বাঙালীদের নাচারে গ্রহণ করতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা সামরিক জাতি নই। রাজনীতি এবং কাব্য সংগীত–আমাদের প্রধান অবসর বিনোদনের বাহন। আড্ডা তার চাট। আপনি ১৯৫৬ সনে ঢাকায় পদধূলি দিয়েছিলেন। আপনি বাঙালী ও তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য দেখে থাকবেন। আপনাদের মত ভাতই এখানে প্রধান আহার-সমাগ্রী। কামান অপেক্ষা চারুকলার দিকে আমাদের বেশী ঝোঁক। আমাদের মুক্তিফৌজ নতুন পরিবেশগত সৃষ্টি, আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে শামিল নয়। এইদিকে অবিশ্যি আমরা চীন দেশের নিকট ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। গেরিলা-যুদ্ধে আপনারা পথিকৃৎ। চীনের সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে আজ অতি মূল্যবান। এক দিক থেকে বলা যায়, চীন দেশ আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের অনুপ্রেরণাদাতা।

কিন্তু যখন 'আফিমের' সাহায্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায়ের কথা আপনি বলেন, তখন বাংলাদেশবাসীর আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার–এই মার্কসবাদী রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্বে এক মূল্যবান অবদান। চীন এবং রাশিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার একটা কার্যকরী কাঠামো নির্মাণ করেছে। পাকিস্তানও বহু জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র। কিন্তু তার শাসকবর্গ একথা মানতে সর্বদা নারাজ। কারণ তাহলে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ মুড়ঞ্চ পোয়াতির গর্ভের মত খসে বা ধ্বসে যায়। দ্বিজাতি তত্ত্ব আর টেকে না। আপনার দেশের রাজনৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক বিধায় (আপনিই যার আসল কারিগর) বিভিন্ন জাতিভিত্তিক স্ববিরোধ একটা সুসামঞ্জস্য-রূপ লাভ করেছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার রাষ্ট্রের জাতিবর্গ একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী। আদৌ আমাদের মত নয়। স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সীমার বাসিন্দা বিভিন্ন জাতি নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি একটা জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের সক্ষম হবেন? সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চৈনিক নেতাদের সাফল্য অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয়। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, পাকিস্তানে তারা সবাই ডাহা 'ফেল' করবেন। কারণ, প্রকৃতি এবং সমাজ-বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গিয়ে কি সাফল্যের নাগাল পাওয়া যায়?

তবু আপনি এমন সব মানুষকে আপনার নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন যাদের দুই হাত নিরীহ কৃষক এবং শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত। ওই দস্যুদল এ পর্যন্ত বাংলাদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় কুড়ি লাখ লোক হত্যা করেছে এবং গ্রাম পুড়িয়েছে আট হাজার। ভারতে আশি লক্ষ শরণার্থী ছাড়া শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাস্তুভিটাচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা আরো দুই কোটি।

ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি আপনার নৈতিক সমর্থন দানের সংবাদ পাওয়ার পর কি মর্মদাহী স্তব্ধতা বুকে পুষে আমাকে হপ্তার পর হপ্তা কাটাতে হয়েছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা কথায় আপনাকে বোঝাতে পারব না। কি করে এমন কাজ আপনার পক্ষে সম্ভব হোলো? পূর্বে উল্লিখিত, রূপায়ণ-অসম্ভব আদর্শ ভাববাদী ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অখণ্ড পাকিস্তান একটা অসম্ভব ব্যাপার। চীন দেশ হবে মানব গোষ্ঠীর বিবেক। সাময়িক রাজনৈতিক মুনাফার সঙ্গে এমন মহান দেশ কখনও নৈতিকতার বিনিময় করতে পারে না। "বরং কৃশ এবং সৎ হও, মোটা এবং অসৎ হয়ো না, "বলেছেন ঋষি কনফ্যুসিয়াস।

অবিশ্যি অখণ্ড পাকিস্তান সম্ভব। তার একটি মাত্র শর্ত : রাজনৈতিক কাঠামো হবে সমাজতান্ত্রিক। যদি জঙ্গীশাহী যুক্তির কোন ধার ধারত এবং দেশ অখণ্ড রাখার কথা ভাবত, তাহলে তারা রক্তস্নানে অগ্রসর হ'ত না। কিন্তু যে-জানোয়ার মাইনরিটি দেশের আর্থিক সম্পদের সিংহভাগ ভোগকারী, তার পক্ষে কি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা সম্ভব? শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে আলোচনা শেষ পর্যন্ত[1] ভেস্তে যায় বৈদেশিক ঋণ এবং সাহয্যের প্রশ্নে। গোটা ব্যাপারটা অর্থনৈতিক। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী নিজেদের কুৎসিৎ মতলব ঢেকে রাখার জন্যে স্বার্থে ঘা পড়লেই 'ইসলাম বিপন্ন, দেশের সংহতি বিপন্ন', 'অখণ্ড পাকিস্তান' ইত্যাদি জিগির তোলে দিনের পর দিন। এইসব ভাঁওতা ওই সব নরাধম এমন মাদারী কৌশলে ব্যবহার করেছে যে আপনার মতো বহু অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী জননেতার চোখেও তারা ধুলো দিতে সক্ষম। ওদের মতলব বুঝতে জনসাধারণের ২৩ বছর সময় লেগে যাবে, তা বিচিত্র কি?

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি বিশ্বাস করেন, জাপানী সামুরাইরূপী এক সামরিক শাসক-গোষ্ঠীকে সমাজতান্ত্রিকে পরিণত করা যায়? এক মুহূর্তের জন্যেও আমি মনে জায়গা দিতে পারি না যে, আপনি এমন আস্থার পৃষ্ঠপোষক। "ফিনিক্স থেকে ফিনিক্স জন্মায়, ড্রাগন থেকে ড্রাগন।" এই অমূল্য চৈনিক প্রবাদ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কারণ, চীন আপনার প্রিয় মাতৃভূমি, যেমন বাংলাদেশ আমার।

অশেষ মানষিক যন্ত্রণাভোগের পর আমি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাই, যখন ইয়াহিয়া খানকে লিখিত আপনার পত্র আবার পাঠ করি। আপনি ওই প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানী রাজনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে বিবেচনার সময় ইসলামাবাদে নিয়োজিত চৈনিক রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট আপনার সম্মুখে রক্ষিত ছিল। উক্ত রাজদূত সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। কিন্তু এক ব্যাপারে আমি স্থির-

মন যে, রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট আপনাকে ভুল সিদ্ধান্তের পথে নিয়ে গেছে। চৈনিক প্রতিনিধি, ধরে নিতে পারি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রাগত বিধায় মার্কসবাদী। এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রবাহ সূচারুরূপে অনুধাবন করে দেখেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রেণী-কাঠামো, সামাজিক স্তর তিনি কি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন? সেখানেই তো বাংলাদেশ উপনিবেশের যত হত্যাকর্তা জীব-জন্তুদের অধিবাস। পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরাই নিজেদের শিল্পপতির পর্যায়ে প্রমোশন দিয়েছে। যন্ত্রশিল্প আধুনিক কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণা মধ্যযুগীয়। পশ্চিম পাকিস্তানে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। গত পনের বছরে শিল্প-প্রসারের সাথে সাথে ওই শ্রেণীর কিছু অঙ্কুর-অভ্যুদয় ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আপনি জানেন, শ্রেণীচ্যুত মধ্যবিত্তই যে-কোন শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে শ্রমিকের সংখ্যা বাংলাদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। তবু শ্রমিক আন্দোলন সেখানে তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কারণ শাসকগোষ্ঠী সামরিক চক্রের সহযোগিতায় সব সময় সে মাথা থেৎলে দিয়েছে অতি নির্মমভাবে। পশ্চিম পাকিস্তানে শ্রমিক নেতার অভাবও বেশী। একজন বিদায় নিলে তার জায়গা সহজে পূরণ হয় না। কারণ পূর্বে কথিত মধ্যবিত্ত এখনও অঙ্কুর অবস্থায়।

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি জানেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতী জনসাধারণের নয়নমণি শ্রমিক নেতা হাসান নাসিরকে ১৯৫৯ সনে লাহোর দুর্গে কী নির্মমভাবে নিপীড়ন মারফত হত্যা করা হয়! আইয়ুবী আমল, তখন জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বহাল তবিয়তে গদিনসীন ছিলেন। প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি বর্তমানে সামরিক চক্রকে মদত দেওয়ার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে শ্রমিক আন্দোলনের গলা আরো টিপে ধরা হবে মাত্র। আগামী দশ-পনের বছরে ওই অঞ্চলে শাসকগোষ্ঠীর মোকাবিলা-সক্ষম জোরদার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার কোন আশা আমি অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি না।

আর বাংলাদেশ অর্থাৎ বিগত পূর্ব পাকিস্তানে? যেখানে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব দেওয়ার মত শক্তি যথেষ্ট বর্তমান, আপনি সেই শক্তিকে আজ নেক্ড়ের মুখে নিক্ষেপ করছেন। পাইকারী গণহত্যা এবং বর্ণ-বিলোপ Racial extermination- এর মুখে কে মৃত্যু এড়িয়ে যেতে পারে? আপনার মিত্র রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী এক কাতারে, হাজারে হাজারে নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে। শুধু বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ ছাড়া, তাদের আর কোন অপরাধ ছিল না। আর কোন কসুর তারা করে নি।

জনাব প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম পাকিস্তানে আপনি ভ্রূণ-হত্যার সহযোগিতা দিয়েছেন। আর বাংলাদেশে ভূমিষ্ঠ বলবান শিশুকে আপনি নিক্ষেপ করেছেন মৃত্যুকুণ্ডে। অবস্থাটা আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই। অবশ্য আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি মনে করেন, সমাজতন্ত্র রপ্তানিযোগ্য এক ধরনের মাল-বিশেষ, তাহলে আমার আর বলার কিছুই নেই।

চিঠির দীর্ঘতার দিকে চোখ রেখে বিস্তারিতভাবে আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হল না, কেন অখণ্ড পাকিস্তান একটা মীথ-myth মাত্র। অখণ্ড পাকিস্তান গড়ার জন্যে জাতীয় ভিত্তির উপর গঠিত একটা প্রকৃত কার্যকরী রাজনৈতিক পার্টি অন্ততঃ দরকার। মনে রাখবেন, দুই অঞ্চলের ব্যবধান ১২০০ মাইল। যোগাযোগ ব্যবস্থার ফিরিস্তি শুনুন। জলপথে লাগে দশ দিন। স্থলপথ নেই। হাওয়াই পথ অতি বায়সাপেক্ষ। যখন ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বিমান চলাচল সম্ভব ছিল তখন একজনের যাতায়াতের ভাড়া লাগত ছ'শ টাকা। বর্তমানে ১০০০ টাকা। এই ভাড়াও সরকারী সাহায্যে থাকার ফলে এত কম। সাধারণভাবে প্রায় দ্বিগুণ। আপনাকে আরো মনে রাখতে অনুরোধ জানাই : বাংলাদেশে মাথাপিছু গড়ে বার্ষিক আয় ৩৭৫ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৫০ টাকা। সামাজিক যোগাযোগ, মেহনতী জনসাধারণের চলাচল (mobility of labour)—এসব বাদ দিলেও সামাজিক কাঠামোর ব্যবধান আরো দুস্তর। অঢেল তহবিল, সামরিক বাহিনীর ঠেক্‌নো-দত্ত রাজনৈতিক পার্টির পক্ষেই কেবল জাতীয় ভিত্তির উপর টিকে থাকা সম্ভব। সাংস্কৃতিক গোয়েন্দাগিরি এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ ধ্বংসের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় পনুর্গঠন সংস্থা' কেবল বাংলাদেশে বার্ষিক ব্যয় করে ৩৩,০০,০০০ তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

চীন দেশে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বীর নেতা শেখ মুজিব সম্পর্কে ভুল ধারণা আমার মনে হয়, রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট উৎসারিত। শেখ মুজিব শ্রমিক শ্রেণীর নেতা নন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। বর্তমানে জাতীয়-সংকট মুহূর্তে যে ঐক্যের প্রয়োজন ছিল শেখ মুজিবই তার প্রধান স্থপতি। কিছু কিছু বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ সেখানে আমাদের নিরাশ করেছেন। জাতীয়তাবাদ এড়িয়ে তাঁরা অন্যান্য বিপ্লবের খোয়াব দেখছিলেন। আশা করি, সেই ভুল এতদিনে তাদের চোখে ঠেকেছে। একথা সত্য, মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব বর্তমানে কেন্দ্রপন্থী বা Centrist-দের হাতে। কিন্তু লেবেল দেখে কারো ভড়কে যাওয়া উচিত নয়। বিগত জাপানী আক্রমণের সময় চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আদৌ ইতস্তত করেনি। প্রত্যেক দেশের অবস্থার নিজস্ব ধারা আছে। বাইরে থেকে কর্মপন্থা নির্দেশ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মাও-সে-তুং এবং চৌ-এন-লাইনের পূর্বে চীন দেশে কী সুন-ইয়াৎ সেনের প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশ বর্তমানে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে চলেছে। মুজিবের নেতৃত্ব সেখানে অপরিহার্য। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের ব্রতী হওয়ার পূর্বে ওই স্তর আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।

শেখ মুজিব বর্তমানে তাঁর প্রাক্তন জীবনের অ্যান্টিথিসিস। তিনি মুসলিম লীগ কর্মী ছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেন, যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ সাবেক উপনিবেশের সামরিক কর্মচারী হিসেবে বৃটিশ প্রভুদের বুট-লেহনে বুঁদ ছিলেন। জনগণের জন্য নিজেকে কিভাবে অতিক্রম করতে হয়, সময় তা মুজিবকে শিক্ষা দিয়েছে। তাছাড়া অনুন্নত দেশের জাতীয় নেতারা আর প্রাক্তন বুর্জোয়াদের চরিত্রে ভূষিত হতে পারে না। নাসের সমাজতন্ত্রীদের হন্তারক হিসেবে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কি উত্তরোত্তর মহান জাতীয় নেতা হিসেবে মানুষের বুকে জায়গা পাননি? শেখ মুজিব সম্পর্কে ভুল ধারণা অনড়বাদ বা স্ট্যাটিসিজমের ফল। যেন বাংলাদেশ অনড় বসে থাকবে। রাষ্ট্রদূতের রিপোর্ট আপনার মত পুরাতন অভিজ্ঞ একজন দ্বান্দ্বিকতাবাদীকে পর্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তের পথে ঠেলে দিয়েছে, এখন বেশ দেখা যায়।

এমন কী সন্দু সম্ভব, আপনার রাষ্ট্রদূত জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন উক্ত সিন্ধী শরীফের ঘেয়ো ভারত-বিদ্বেষের জন্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং পরিতাপের বিষয়, ভারত এবং চীনের মত দুই মহান দেশ আজ গভীর আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রদূত হয়ত নিজের আবেগের স্রোতে ভেসে গেছেন। তাই মুজিব তার কাছে অস্পৃশ্য এবং ভুট্টো নন্দদুলাল। স্টেশনের ব্যাটা (আমি লারকানা শহরের কাছে এবং রেলওয়ে স্টেশন দেখেছিলাম। নাম : শাহ নওয়াজ ভুট্টো, জুলফিকারের পিতা) এবং বাংলাদেশের সংহারকদের দোসর, শেষোক্ত ব্যক্তিটিকে রাষ্ট্রদূত ঠাউরেছেন সমাজতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন এবং চীন-প্রেমিক। একটু অপ্রসাঙ্গিক, তবু বাংলাদেশের একটি লোককাহিনী শোনানোর অনুমতি আমাকে দিন, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়। দেশের রাজার মৃত্যুর পর তার পোষা হাতীকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হ'ত। উক্ত জীব শুঁড়ে জড়িয়ে যাকে সিংহাসনে এনে বসিয়ে দিত, সেই হত পরবর্তী রাজা। কোটিপতি পিতার ওই নাড়ুগোপাল-কে ঠিক একই কায়দায় আইয়ুব খান যোগাড়ের পর মন্ত্রিসভায় স্থান দেন। সুদীর্ঘ আট–আট বছর এই ফ্যাসিস্ট রাজত্বের সঙ্গে ভুট্টো নিজেকে জড়িত রাখে, যখন বাংলাদেশের অধিবাসীদের দুঃখ এতটুকু লাঘব হয়নি। একটা দৃষ্টান্ত দিই, যদিও সংখ্যা অফুরন্ত ১৯৬১ সনে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয়-সংহতির উদ্দেশ্যে দু'শ পূর্ব পাকিস্তানী পরিবারকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় পুনর্বাসন-কল্পে। দু'শ পরিবার। একুনে শিশু-নর-নারীসহ তিন শ' পঁচাত্তর জন। ছ'বছর পরে ফৌতের সংখ্যা দাঁড়ায় দুশ' পনর। ফেরতের সংখ্যা একশ'ষাট। তারা ফিরে আসে প্রায় উলঙ্গ, রোগে-শোকে জীবন্মৃত। কর্তৃপক্ষের অবহেলার বর্ণনা দেওয়াও লজ্জাকর। এই হচ্ছে বারো শ' মাইল দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের চেহারা, যা প্রতিদিন নয়, প্রতি মুহূর্তে ইসলাম এবং অখণ্ড পাকিস্তানের দোহাই পেড়ে শপথ নিয়ে থাকে। আল্লা-রসুলের নামে কসম খায়। দবদবার ডুগডুগি বাজিয়ে ভুট্টো সাহেব তখন গদিনসীন ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু একটি বারও রা করেননি। সরীসৃপের কাছ থেকে ঋজু মেরুদণ্ডের প্রত্যাশা বাতুলতা। যখন পেয়ারের পালিত পুত্রকে আইয়ুব খান ল্যাং-যোগে গদি থেকে ফেলে দিলে, তখন রাতারাতি সেই হয়ে উঠল নিপীড়িত জনগণের চ্যাম্পিয়ান। গায়ে লেবেল জুড়লে : সমাজতন্ত্রী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ফিউডাল ভূস্বামী এবং তাদের অন্নপুষ্ট মোল্লাবৃন্দ যখন চাপ দিলে, ভুট্টো সাহেব একটা উপসর্গ আগে জুড়লেন : ইসলাম। এবার হলেন : ইসলামী সমাজতন্ত্রী। এই ব্যক্তির সাম্প্রতিক গতিবিধি অন্ধেরও চোখ খোলার পক্ষে যথেষ্ট। পাকিস্তানে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি জুড়লেন এবং ধীরে ধীরে তাদের ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু থাকলেন না। ঠিক মাও সে-তুংয়ের মত শেখ মুজিবের শ্রেণীভিত্তি : মধ্য কৃষক। তিনি চৈনিক রাষ্ট্রদূতের কাছে হয়ে রইলেন অপাংক্তেয়। অন্য পক্ষে, এক মুখোশধারী অভিনেতার উপরকার চাকচিক্যে তিনি প্রতারিত হলেন।

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আমার স্বদেশের ট্র্যাজেডি কোথায় জানেন? পাকিস্তান প্রতষ্ঠার জন্যে যারা একদিন প্রাণপাত মেহনত ঢেলেছে, আজ দেশ সম্পর্কে তাদের উচ্চবাচ্য করার কোন অধিকার নেই। অন্যপক্ষে বৃটিশ রাজত্বের সামরিক গোলাম (ইয়াহিয়া খান অগরয়হ), নিজের উদর এবং তন্নম্নস্থ এলাকা ছাড়া আর কোন কিছু যাদের চিন্তা-ভাণ্ডে ছিল না, বর্তমানে তাদেরই দেশের ভাল-মন্দ নিয়ে গলাবাজি করার অধিকার ষোল আনা।

এখন বাংলাদেশের উপর দিয়ে কি অমানুষিক জুলুম চলেছে, তার ফিরিস্তি আপনার কাছে নাকী কান্না মনে হতে পারে। এই ভয়ে তার ফিরিস্তি দান থেকে বিরত থাকলুম।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে এমন বিস্তারিত পত্র লিখতে হচ্ছে, কারণ আমার জন্মভূমি যে দুঃখদুর্দশার কবলে পতিত, পৃথিবীর আর কোন দেশকেই কখনও তেমন নরক অতিক্রম করতে হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সমগ্র বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে বর্তমানে বদ্ধপরিকর। নচেৎ গণহত্যা আর কিসের জন্য প্রয়োজন? শত শত মাইলাই ট্র্যাজেডি আজ বাংলাদেশে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত। আপনার সমর্থনপুষ্ট ওইসব জল্লাদেরা বেপরোয়া, সভ্যতার লেশমাত্র চিহ্নেরও তোয়াক্কা রাখছে না। আমি আগেও বলেছি, মহাচীনকে আমরা বিশ্বমানব-গোষ্ঠীর বিবেক-রূপে দেখতে চাই। সেই দেশ মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি এমন নিঃসাড় তা ভাবতেও রীতিমত কষ্ট হয়। প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, মানবতার নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার মতামত পুনর্বিবেচনা করে দেখুন। আমরা বাঙালীরা মানুষ হিসাবে দীল-খোলা। এই দুর্বলতাই আমাদের বর্তমান দুর্দশার হেতু। একদিকে মীমাংসার জন্যে আলোচনা, অন্যদিকে তলে তলে সৈন্য সমাবেশের মত

বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের কোনদিন পেয়ে বসবে না। আমাদের জাতীয় মিরাসে তা নেই। আপনাকে আগে থেকে কথা দেওয়া যায়, বাংলাদেশ কখনও মহাচীন বা কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুশমন হবে না কোনদিন।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আমি জানিনে ভবিষ্যতের অন্ধকারে কী সঞ্চিত আছে। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি পশ্চিম পাঞ্জাবি মুসলমান (?) জঙ্গীচক্রের নিকট আনুগত্য স্বীকারের পূর্বে বাঙালী শেষ ব্যক্তিটি সানন্দে মৃত্যুবরণ করবে, শুধু একটি মাত্র পরিতাপ-সহ যে, সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী চীনের মত এক মহান দেশ ধর্ষণকারী, লুটেরা, পাশব, হত্যা-উন্মাদ এক সামরিক দঙ্গলের সঙ্গে নৈতিকভাবে নিজেদের সামিল রেখেছিল।

কালান্তর, আগস্ট, ১৯৭১

রাজনৈতিক কার্বাঙ্কল

সাম্প্রদায়িকতার পরিণাম সম্পর্কে আজও কোন বাঙালীর কোন মোহ থাকতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যচ্ছে, অন্ধত্ব অত সহজে ঘোচে না।

পূর্বে মুসলিম লীগ বর্ণবিদ্বেষ তথা হিন্দু সম্প্রদায়কে সামনে রেখে রাজনৈতিক তুরুপ মারত এবং মূলতঃ তাদের তাস ছিল একখানা-ই। তেইশ বছর পর স্পষ্ট হয়ে গেল, মুসলমানও মুসলমানকে শোষণ, বঞ্চনা অব্যাহত রাখতে হত্যা করে এমন সংখ্যায় ও নৃশংসতায় যে তা পৃথিবীতে রেকর্ডে পরিণত হয়। এসব বাংলাদেশে কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে কী? সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের নয়। সমস্যা মানুষের। সমস্যা গোটা জীবনের।

তবু যদি দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতার মত মধ্যযুগীয় মারীবিষ আবার রাজনৈতিক বেসাতির পণ্য, তখন স্তম্ভিত হতে হয়। আর তা যদি কোন সর্বজনবরেণ্য মহাপুরুষপ্রতিম মানুষের কাছ থেকে আসে, তখন চরম হতাশায় কান্না ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। এসব কী ঘটছে? তবে কী দ্বিজাতিতত্ত্ব-জাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই দেশে এখনও বাকি আছে? এমন প্রশ্নের সম্মুখে বোবা হয়ে যাঁওয়াই যেন শ্রেয়তর মনে হয়।

কয়েক বছর পূর্বে আমি এমনই বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। পরম শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী এবং সাম্প্রদায়িকতা—পাশাপাশি মেলানো কঠিন। কিন্তু 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে'? তাই দায়িত্বের তাগিদে নিজের বিবেকের এবং বুকের ভার নামাতে সংবাদপত্র মারফত মওলানা সাহেবের কাছে খোলা চিঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলাম। সাধারণ অর্থে তিনি রাজনীতিবিদ নন। তিনি মানবপ্রেমিক, বিবেকের কণ্ঠস্বর। কখনও কখনও কোন পার্টির কণ্ঠস্বর। মওলানা সাহেবের তখন জোর সাম্প্রদায়িক উচ্চারণে মর্মাহত, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার বেশ বিলম্ব ঘটেছিল। তিনি মহতী বাণীর উৎস। তিনি যখন সর্বজন-সমক্ষে বলেন, "হিন্দু মন্ত্রী থাকার ফলে খাদ্যশস্য ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে" অথবা, 'হিন্দুরা, তোমাদের দশা বিহারীদের দশা হবে"–তখন বার বার কান রগ্ড়াতে হয়। সেখানে কোন ব্যাধি-বিভ্রাট ঘটেনি তো?

আমার খোলা চিঠি নয় মাস আগে লেখা। আমার আশা ছিল, পার্টির তো বাহু আছে–যা কাজের কাজ করে। মওলানা সাহেবের আশেপাশে নাকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের অবস্থান। তারা ব্যাপারটা মানিয়ে নেবেন এবং আর গড়াতে দেবেন না। আবেগের বশে হয়ত মওলানা সাহেব কিছু বলে থাকবেন। উত্তর-নব্বুই বয়সে তিনি যে এখনও এত সতেজ দেহ, সতেজ মস্তিষ্ক, এ-ই ত আশ্চর্য ব্যাপার। এমন বয়সে হঠাৎ ভুলচুক হয়ে গেলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নেয়া চলে না।

কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সাম্প্রদায়িকতার লাভা প্রবাহ অব্যাহত রইল। একবার শুধু পার্টির সেক্রেটারি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ওসব কথা মওলানার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পার্টির প্রেসিডেন্টের এক নীতি, সচিবের আর এক। এ কী রকম রাজনৈতিক সততা?

আশ্চর্য লাগে, যারা নিজেদের মার্কসবাদীরূপে দাবী করেন, তারা কিভাবে দেশময় মধ্যযুগীয়তার কালো পাঁক ছিটিয়ে মানবকল্যাণ-সাধনের কথা ভাবেন? বঙ্গবন্ধুর যত রকম রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাক না কেন, ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনার জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তার জন্যে ইতিহাসের শিরোপা তাঁর যথা প্রাপ্য। আবার পরবর্তীকালে ইতিহাসের কাছেই তার বিচার হবে, যদি ভুল-ত্রুটি করেন। কিন্তু ১৯৭০-৭১ মধ্যযুগীয় চেতনার খপ্পর থেকে যে তিনি দেশবাসীকে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বিস্ময়কর। কারণ, তেইশ বছর ধরে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী সেই মোহগর্তে সকলকে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সাম্প্রদায়িকতা সেখানে সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। জনসাধারণ তার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। জনগণ-পরিত্যক্ত শাসকগোষ্ঠীর সেই অস্ত্র যখন সমাজতান্ত্রিক ইলেমের ওস্তাদেরা হাতে তুলে নেয়–তখন কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছব? তার জবাব তারাই দিন্। সমাজ পরিবর্তনের পরিবেশ যতই অনুকূল হোক, তার অঙ্গাঙ্গী চেতনার বিকাশ ছাড়াই নতুন সমাজ গঠনের চিন্তা আকাশ-কুসুম। সাম্প্রদায়িকতার পথে সমাজতন্ত্র আসবে? রাজনৈতিক দেউলেপনারও একটা সীমা থাকা উচিত।

অন্যদিকে, ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক কারণেই গ্রন্থি-বহুল। ঐতিহ্যগত বহু সমান্তরলতার কথা এখানে থাক। রাজনৈতিক আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে বিধেয়। দ্বিজাতি-তত্ত্বের সড়ক ধরে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান সৃষ্টি। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী মধ্যযুগীয় ভাবধারা অব্যাহত রাখলে, হালেচালে যতই আধুনিক হোক, জনসাধারণের নিকট ধর্মের আফিম পরিবেশনে তাদের কখনও কার্পণ্য দেখা যায় নি। তার সামাজিক প্রকাশ সাম্প্রদায়িকতায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই এক কার্বাঙ্কল। হ্যাঁ, কার্বাঙ্কল, বলাই বিধেয়। কারণ, মুখ বহু। কেতাবী সমাজতান্ত্রিকেরা কী ভেবে দেখেছেন, পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর কাছে ভারতবর্ষ এবং হিন্দু সমার্থবাচক ছিল? ভারত-বিরোধিতার পরিণাম হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতার পরিণাম ভারত-বিদ্বেষ। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতি। জীবন্ত বাস্তব থেকেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তব্য। কেতাবী মার্কসবাদীরা ভুলে যান Theory is grey, eternally green is the tree of life. তত্ত্ব কাল্‌চে ব্যাপার, অনন্ত সবুজ জীবন-বৃক্ষ।" শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেব তাঁর চুরানব্বই বছর বয়সের গত পঁচিশ বছর বাদ দিলে উনসত্তর বয়স পর্যন্ত মুসলিম লীগ তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার ছিলেন। তিনিই একমাত্র মহৎ প্রাণ যিনি আত্মপ্রেরণা-বলে, দেশপ্রেমের অহর্নিশ বহ্নিমান তাগিদে সেই মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। হঠাৎ কেন যে তিনি আবার ভুল করে সেই খোন্দলে পা দিয়ে বসলেন, আমার মত নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে বোঝা দায়।

কিন্তু ইতিহাসে ভুলের মাশুল দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক সময় চরম দাম দিতে হয়। নচেৎ ইউরোপের বুকে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো আজও কি করে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে? একদা '৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধকে যারা "জনযুদ্ধ" লেবেল দিয়েছিলেন, সেখানেও সেই হিসাবের ত্রুটি। কারণ, পায়ের তলায় মাটির অভাব। আর তা ঘটলে মাথা সেখানে যেতে বাধ্য। বাংলাদেশের ওই কেতাবী সমাজতন্ত্রীরা কবে সাবালক হবে, আল্লাকে মালুম। ভারত এবং চীনে যুদ্ধ লাগে বাষট্টি সালে। তারই জের হিসেবে, যা ভারত-বিরোধী তা চীনের পক্ষে মঙ্গল, তথা বিশ্বমঙ্গল। কামাল আতাতুর্ক বলেছিলেন, "চান্‌দা সুল্‌হে ইয়ার্তা সুলহে–বিশ্বে শান্তি, স্বদেশে শান্তি" তখন 'পূর্ব পাকিস্তানী' বামপন্থীদের কাছে চীনের মঙ্গলই বিশ্বমঙ্গল। স্বদেশ জাহান্নামে যাক্‌। এমন কি বুদ্ধ ও লেনিনের সমাহার চিরস্মরণীয় হো চি মিন '৪৬ সালের দিকে একবার বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, It is better to sniff France's dung for a while than eat China's all our lives. সারা জীবন চীনের গোবর খাওয়ার চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফ্রান্সের গোবর শোঁকা ভাল।" (Paul Mus রচিত ভিয়েতনাম গ্রন্থ)। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক কেতাবী সমাজতন্ত্রীরা তো আজন্ম আন্তর্জাতিক। স্বদেশের দিকে তাকানোর সময় কোথায়? প্রবণতা সহজে নষ্ট হয় না, অতিমাত্রার সচেতনতা না থাকলে। উনসত্তর এবং একাত্তরের গণআন্দোলনে তার জের স্পষ্ট দেখা গেল। জাতীয়তাবাদেরও প্রগতিশীল ভূমিকা আছে ক্ষেত্রবিশেষে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ানে তো ছিল-ই। তবু বামপন্থী এক সাপ্তাহিকের বিদ্যাদিগ্‌গজ সম্পাদক উক্ত পত্রিকার ২৪ মার্চ (১৯৭১) সংখ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন যে, আওয়ামী লীগ আপোষ করে ফেলেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সমর্থক, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্যযুগীয় কি লোভ! ২৪ মার্চেও দলীয় সংকীর্ণতা প্রকট। অর্থাৎ তাল ঠুকে, বগল বাজিয়ে বলা, 'আমরা যা করি তা প্রগতিশীল, আর যে-যা করে তা প্রতিক্রিয়াশীল।" অনুন্নত দেশে কোন রাজনৈতিক পার্টিরই নিজেদের দেশপ্রেমের মনোপলিস্ট বা আড়ৎদার বলে ঘোষণা করা উচিত নয়, সৎ কর্মী মানুষের সংখ্যা যেখানে এত কম। ভিয়েতনাম সামনে দৃষ্টান্ত। কিন্তু আড়তদারেরা তো রাজনীতি করে না। অবসর-পুষ্ট শ্রেণী থেকে কিছু তরুণ আসে–যাদের কাছে রোমান্টিক কল্পনা এবং নিজেকে সমাজের চোখে কেউ-কেটা প্রতিপন্ন করার প্রেরণাই সম্বল। নিজেদের জীবিকা উপার্জনের কথাও তারা ভাবে না। পরান্নভোজী এবং সেই অন্ন বিত্তবানের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ হোক, কোন ক্ষতি নেই। কৃষক-শ্রমিকের প্রবক্তাদের এই এক বৈশিষ্ট্য। এমন নৈতিকতাহীনতা শেষ পর্যন্ত কাউকে মানুষের কাছে নিয়ে যায় না। মগজের মধ্যেও প্রচুর ধোঁয়া ঢোকে। সেই পথে দলীয় সংকীর্ণতা জেঁকে বসে। তাই ভুলের পর ভুল এবং দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্নতা। শেষে লেজুড় হতে হয় মুরুব্বী পাক্‌ড়ে। নাবালক পুত্রদের পিতা না থাকলে চলে না। রাজনৈতিক কাফেলার পেছনে পড়ে থাকাও অস্বোয়াস্তিকর। এই চেতনা তাদের খেদিয়ে নিয়ে যায় প্রথম সারিতে পৌঁছানোর দিকে। তখন শর্ট কাট্ বা সস্তায় কিস্তিমাতের পানে ঝোঁক বেড়ে যায়। রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির খতিয়ান তাদের ঠিকুজির বাইরে। সাম্প্রদায়িকতার পচা ঘা বহু পুরাতন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতীয়তাবাদের মলমে কিছুটা শুকিয়েছিল। সেই ঘা তারা খুঁচিয়ে দগ্‌দগে করলে। কাজটা সোজা। দেশে নানা অভাব। ক্ষুধার্ত মানুষ সব সময়ই ক্ষুব্ধ মানুষ। আশু প্রতিকারের শ্লোগান যাচায়ের ধৈর্য তাদের নেই। আত্মধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতার টোপ গিলতে বেশী দেরী লাগে না। একেই বলে রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে বিরোধিতা। তলিয়ে দেখার ব্যাপারে অসহিষ্ণু, যেহেতু মূল লক্ষ্য তো রাজনৈতিক মঞ্চের প্রথম কাতারে বসা। এই পথেই তারা নানা মানস-কূট বা কমপ্লেক্সের শিকার হয়। কৃষক-মজুরের শিক্ষকরূপেই তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। কৃষক-মজুরকে বোঝার চেষ্টা বা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মনোবৃত্তি বা ধৈর্য এদের নেই। এই জন্যে চালু আছে : হেলিকপ্টার পলিটিক্‌স। কথাটা আমার। তাই একটু খোলাসা করা দরকার। উক্ত বায়ুযানে হঠাৎ-হঠাৎ কোথাও যাওয়া-আসা করা যায়। কৃষক মজদুরের এই হিতাকাঙ্ক্ষীরা হঠাৎ-হঠাৎ গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় পৌঁছে ওয়াজ নসীহৎ সেরে দু-চার দিনের মধ্যেই আবার শহরে ফিরে আসেন। একটানা ছ'মাস গ্রামে থাকতে কাউকে দেখলাম না বা পূর্বে এই নবিশী কাল কেউ কাটিয়েছে–জানা যায় না। বাংলাদেশে নিছক শ্রমিক হাজারে একজন ও পাওয়া

দুষ্কর। সবই আধা-শ্রমিক আধা-কৃষক। গ্রামের টান এখনও ষোল আনা। অথচ সেই গ্রাম নেপথ্যে থাকে। হো চী মীনের পঁচিশ বছর কেটেছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সবক জনতার প্রাঙ্গণে। এখানে হেলিকপ্টার-রাজনীতি মারফত রাজনৈতিক শিক্ষা। কেউ নবিশী থাকতে নারাজ। এমন কি এদের তত্ত্বগত জ্ঞানের বহর দেখে হেসে খুন হতে হয়। সম্প্রতি এক কেতাবী সমাজতন্ত্রীর "ঐতিহাসিক রিপোর্ট" দেখার সুযোগ পত্রিকা-মারফত পেয়েছিলাম। বাংলাদেশে নাকি এখন দুই শ্রেণী আছে : শোষক এবং শোষিত। কি অপূর্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত! কি অদ্ভুত প্রজ্ঞা! হায়, ব্যাপারটা যদি এতই সোজা হয়ে থাকত, তা হলে তো মঙ্গলই ছিল। বড় চাকার ভেতরে আরো এত ছোট ছোট চাকা! তাদের ভেঙে ভেঙে মাত্র দুটি বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে যাওয়া কতো কঠিন ভুক্তভোগীরা জানেন। সেই জন্যে রাজনৈতিক বিবর্তনের স্তর আগে থেকে স্থির প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী সংগঠন। এক এক ধাপে পৌঁছে আবার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত। অথচ কি অতি সরলীকরণের মোহ না পেয়ে বসেছে। এই বালক-সুলভ প্রজ্ঞার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত অন্ধ গলিতে ঠেকে। গোটা রিপোর্ট একগাদা (নেগেটিভ) নঙর্থকতার ফিরিস্তি মাত্র।

আসল কথায় ফিরে আসা যাক।

১৯৭১ গণ-আন্দোলনে সংকীর্ণ দলীয়তার ফলে এরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। অবিশ্যি বাঙালির এই ঐতিহ্য মুসলমানদের অচেতনতার পেছনে সক্রিয় থাকতে পারে। চিরাচরিত হীনমন্যতার শিকার বাঙালী মুসলমান পূর্বে ইরান-তুরান করত। তাদের মোক্ষ স্বদেশ নয়, বিদেশ। হয়ত বর্তমানের সাংহাই-ক্যান্টন-পিকিং তারই জের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানি ফ্যাসিস্টদের গণহত্যার প্রেরণা যুগিয়ে চৈনিক নেতাগণ মার্কসবাদের মুখে যে থুথু নিক্ষেপ করেন, তা সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

AMARBOI.COM

নেতারা নৈতিকতার যে ক্ষতিসাধান করেছেন তা ধিক্কার-যোগ্য। বিখ্যাত বিপ্লবী পরলোকগত মানবেন্দ্র রায় ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে মাও-সে তুং সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

"যদিও এশিয়ার দিকচক্রকালে তিনি কমিউনিজমের ছায়ামূর্তিরূপে অস্পষ্ট প্রতিভাত, তবু এখনও আশা করা যায়, জাতিয়তাবাদী কমিউনিজমের পয়গম্বর হিসেবে হয়ত তার রূপান্তর ঘটতে পারে।" (বাইশ বছর পূর্বে লেখা মৃত্যুর পর বর্তমানে প্রকাশিত 'Men I Met'- গ্রন্থ : ১২৪ পৃষ্ঠা।) আশ্চর্য দূরদৃষ্টি!

ইরান-তুরাণ চীৎকারের মুখে ফেনা তোলা বাঙালীই শুধু স্বদেশের স্বার্থের দিকে অমনোযোগী। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী এক মিশনে তুরস্ক যান। তাঁর মোহমুক্তি ঘটে সহজেই। তিনি ফিরে এসে লেখেন যে, যদিও বাইরের মুসলমানের জন্য আমাদের প্রেম অঢেল, বাঙালীদের কেউ পুছেও দেখে না। বাইশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর চীন জাতিসংঘের গেটের বাইরে থাকার ব্যাপারে আমেরিকা যে যুক্তি দেখাত, সে যুক্তিই এখন চীনা সাম্যবাদীদের মুখে বাংলাদেশের প্রশ্নে। তা কোন মার্কসীয় নীতি প্রসূত, তাঁরাই জানেন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী শিবিরে নৈতিক অধঃপতন প্রসঙ্গের কি ব্যাখ্যা দিবেন চীনা নেতারা? বাঙালী হিসেবে মার্কসবাদের সঙ্গে ব্যাপারটা মেলানো, আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

বিদেশীরা যাই করুক, স্বদেশের প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম আনুগত্য থাকা উচিত।

অন্যপক্ষে, সত্যিকারের সমাজতন্ত্রী হওয়ার জন্যে নেতাদের ন্যূনতম ইলেম লাগে। একাধারে দর্শনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাস-বেত্তা, বাগ্মী সাংবাদিক, তৎসহ সৃজনশীল মন, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম এবং সততা। বাংলাদেশী কেতাবী সমাজতন্ত্রী নেতারা নিজেদের হাত-পা, চেহারামগজের সঙ্গে মাপকাঠিটা মিলিয়ে দেখবেন কি? অন্যথায় সাম্প্রদায়িকতার মত কার্বাঙ্কল সর্বদাই মনে হবে রাজনৈতিককুঞ্জ-কুসুম।

জনপদ ৬ই আষাঢ়, ১৩৮০

AMARBOI.COM

পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, ফাল্গুন ১৩৯৬
প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং উত্তরকালীন রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা আন্দোলিত
দুর্যোগময় রাত্রির দুই সহযাত্রী
প্রিয় ভ্রাতা মোনায়েম সরকার
প্রিয় ছাত্র আবদুল আজিজ বাগমার

দুই দশক জুড়ে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলো লেখা। পাঠকদের সে কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। উদাহরণতঃ মাওলানা ভাসানীর নিকট খোলা চিঠি রচনাটি তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত, তা না বললেও চলে। এইসব কারণে বইটি তিন ভাগে বিভক্ত।

১. প্রাগুষা ২. ভোর ভয়ি ৩. স্মৃতি-সমুদ্র।

প্রকাশক মফিদুল হক বহু সম্পর্কের ভাগীদার। ফলে, একক ধন্যবাদ দেওয়া অসম্ভব। এই পরিস্থিতি-জাত অস্বোয়াস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন আশা আমি সুদূর ভবিষ্যতে দেখছি নে। মফিদ দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী হোক এই শুভ কামনা রইল।

শ. ও

'পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা' পুস্তকে তিন রকমের প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট।
১. ঠিক স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বকালীন বিষয়
২. স্বাধীন আন্দোলন চলাকালীন বিষয়
৩. এবং আরো অতীত বা পরবর্তীকালের ওপর। সেই হিসবে বইটির তিন অংশের
নাম :
১. প্রাগূষা
২. ভোর ভয়ি
৩. স্মৃতি-সমুদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

প্রাগুক্ত

নীরব বক্তৃতা : ফারুক ইকবালের কবরের পাশে
খণ্ড অখণ্ড পাকিস্তান
বাংলাদেশ, মুজিব এবং মহাচীন

ভোর ভয়ি

ভোর ভয়ি
সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
জাতিপুঞ্জের জাঁতিকল
উলঙ্গরূপে সাম্রাজ্যবাদ
কালের চেতনা
আরো নিঃস্ব তৃতীয় বিশ্ব
মহাত্মা গান্ধী : বর্তমান বিশ্বে
অক্টোবর বিপ্লব : তৃতীয় বিশ্বে
জিন্দানখানার বাইরে

স্মৃতি-সমুদ্র

অতঃপর মাতৃভাষা বজ্রস্বর
কাঠামোর এক অংশ
অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা
ঈদের জামাত কেন জানাজার ভিড়
মাওলানা ভাসানীর নিকট খোলা চিঠি
পূর্ণ স্বাধীনতা : চূর্ণ স্বাধীনতা
আমি সালাম বলছি, আমি বরকত বলছি
শ্রান্ত দিগভ্রান্ত, তবু পান্থ ব্রতচারী

পরিশিষ্ট

ফারুক ইকবাল : রশীদ হায়দার

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরব বক্তৃতা : ফারুক ইকবালের কবরের পাশে

সমবেত দেশবাসী আমার,

আমিও আপনাদের কাতারে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি। একই উদ্দেশ্যে।

এদেশে জন্মাবধি চোখের পানিই আমাদের একমাত্র সম্বল। কতো না ভাবে আমরা অশ্রুপাত করি।

অনাহারে, অপমানে, বাঁচার অতি নগণ্য উপাচারের অভাবে, রোগেশোকে, অপমৃত্যু অকালমৃত্যুর থাবার নিচে, দুর্জনের প্রতিকারহীন জুলুমের তলায়।

আমরা চিরাচরিত চোখের পানি নিয়েই এসেছি আজ, ওই মাটির স্তূপটুকু ভিজিয়ে দিতে।

আমাদের এই আর্ত-কান্না কিন্তু তাঁকে আর জাগিয়ে তুলতে পারবে না, ওই মাটির স্তূপের নীচে, যে ঘুমিয়ে গেছে। তার দুই ঠোঁট একত্রে মিশে আছে শপথ কঠিন দৃঢ়তায়। তাই ত সে আর কথা বলতে পারে না। মাতৃক্রোড় শূন্য করে, দেশ জননীর পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল বিশাল বুক জুড়ে সে শুয়ে আছে। তাই নীরব, পরম নিশ্চিন্ত।

তাই ওকে আমরা জাগাতে পারব না।

মানুষের পরম সম্পদ : দেশ এবং স্বাধীনতা। সেই সম্পদ পুনরুদ্ধারে ফারুক বেরিয়েছিল আততায়ীর সন্ধানে, প্রয়োজনমত সংগ্রামে। তারই মোকাবেলায় ইস্পাতের মুখে সে নিজেকে অকাতরে সঁপে দিয়ে গেছে।

আমরা যারা এখানে সমবেত, আমরা আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেছি বহুদিন। শত শত বছরের পরাধীনতা মানুষকে আর মানুষ রাখে না।

প্রথমে সেই দেশের যুবশক্তি তাদের স্বাজাত্যবোধ হারিয়ে ফেলে। তখন দেশের প্রাণভূমিতে নানা আগাছা জন্মায়। টেডী, হিপ্পী ইত্যাদি তারই ফল। দশা যেভাবে ফেরে, দিশা সেভাবে ফেরে না। এদেশের নয়া ধনীর সন্তানদের দিকে তাকান। তারা দু'টি জিনিস খুব ভালমত রপ্ত করে : বড়াই এবং ঘৃণা।

কাপড়-চোপড় এবং লেবাসের চাকচিক্যে, তারা মনে করে, ব্যক্তিত্বের শোতাবর্ধন হয়। কিন্তু ভেতরের শূন্যতা তাদের অত সহজে রেহাই দেয় না। ফলে, বড়াই দিয়ে তা ঢাকতে হয়। আর ওই পথেই তারা শেখে : ঘৃণা। আপামর জনসাধারণের প্রতি ঘৃণা।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ফারুক ইকবালকে স্বাজাত্যহীনতার ব্যাধি স্পর্শ করেনি। আজ তার প্রমাণের প্রয়োজন নেই। নিজে সে আপনাদের সামনে নীরবে শায়িত কেন, তা আপনারা জানেন।

স্বাধীনতার স্বপ্ন এইভাবে সকলকে শেখায় দেশের সকল মানুষকে আলিঙ্গন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে। এই চেতনার বিস্তার এবং প্রবাহই সংস্কৃতি। ফারুক ইকবাল চিরদিন বাংলার যুবশক্তির দর্পণ হয়ে থাকবে। ওই মাটির স্তূপ সমাধিভূমি নয়। উজ্জ্বল, দীপ্ত আরশীর সমতল– যেখানে দেখা যায় : গোটা বাংলার মুখ।

আগেই বলেছি, পরাধীনতার চাপে মানুষ প্রথমে হারায় : আত্মসম্মান-জ্ঞান। এদেশের ইতিহাসে তার প্রমাণ একটি নয়– বহু।

আমাদের প্রাচীন অভিজাত সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। জন্তুর মত কেবল প্রচুর আহার ও বিহার এবং খেতাবের লোভে ইংরেজদের কাছে তারা দেশকে বন্ধক, বিকিয়ে দিয়েছিল। পরাধীনতার বিরুদ্ধে কোনদিন প্রতিবাদ করেনি। আত্মম্ভরিতা, দম্ভ প্রকাশে তারাও বিলাসব্যসনের মোড়কে নিজেদের ঢেকে রাখত এবং বুড়িগঙ্গা বা অন্য নদীর ধারে ধারে ঝকমকে প্রাসাদ মঞ্জিল তৈরী করত। দেশের স্বাধীনতার কথা কোনদিন ভাবেনি। এমন কি তারা পারিবারিক ভাষা পর্যন্ত বদলে ফেলেছিল, বাংলা জবানই উচ্চারণ করত না।

সমাজের নীচের দিকে পরাধীনতার অভিশাপ আরো ভয়াল। আত্মসম্মান-জ্ঞান হারিয়ে অসহায় জনসাধারণ উপরতলার জুতোপেটা নীরবে সহ্য করত না শুধু, তা ঠাউরাত, বুঝি আর এক ধরনের বখশিশ। হাজার দুঃখ, অপমান, অত্যাচার তারা মুখ বুজে মেনে নিত।

এই চেতনা বলবৎ রাখার জন্য দাস দেশের মোল্লা পুরুৎ জাহির করত : এই ত বিধাতার নিয়ম। আজও দেখা যায়, বহু ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী হালফিল কায়দায়, ধর্মের নামে বেসাতি এবং জানিত অজানিতভাবে বুট বন্দনায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে আসছে। তাই বহু বুদ্ধিজীবী আর বিশুদ্ধ চেতনা বা বিশ্ববীক্ষার সন্ধানী নয়।

আত্মসম্মান হারিয়ে ফেললে এমনই দশা হয়।

ফারুক ইকবাল আত্মসম্মান-জ্ঞানের বীজ। তাই ত মাটির কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

আপনারা জানেন, যে বিরাট বিরাট গাছ আজ রাজপথে ছায়া, ফুল বিতরণ করে, তা একদিন বীজ ছিল। আর বীজের বিকাশভূমি হচ্ছে মাটি। তাই ফারুক ওইখানে শুয়ে আছে, যেন একদিন তার দেশবাসী সকল মানুষ মানবিক সম্মান নিয়ে খাড়া শিরদাঁড়া, বাংলার আকশের নিচে বাঁচতে পারে, হাঁটতে পারে।

আমরা ওর ঘুম ভাঙাব না। অমন নাড়াচাড়ায় বীজের ক্ষতি হয়।

প্রিয় শহীদ সন্তান, ঘুমাও ...... ঘুমাও ....। *

---

* ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ, রামপুরা টেলিভিশনের কেন্দ্রে পাকিস্তানী মিলিটারীদের গুলিতে নিহত আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র ছিলেন। একদিন পরে এই লেখাটি তখন সংবাদপত্রে ছাপা হয়। ফারুককে আমি দেখিনি বা চিনতাম না। কথাশিল্পী স্নেহাস্পদ রশীদ হায়দার ফারুকের পরিবারের সহিত পরিচিত। পরিশেষে রশীদের মুদ্রিত লেখাটি পড়ে দেখার অনুরোধ জানাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খণ্ড অখণ্ড পাকিস্তান

পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে পৃথিবীর মহাশক্তিবর্গের উৎসাহ ক্রমশ প্রকট। চীনও তার রায় প্রথমেই জোরেশোরে জাহির করেছে।

তেইশ বছর পূর্বে এই উপমহাদেশকে নিয়ে একই সমস্যা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ খণ্ড না অখণ্ড থাকবে?

সেই সমস্যার সমাধানরূপেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।

ইতিহাসের এই কাসুন্দি ঘাঁটতে হচ্ছে। কারণ, বর্তমান সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অতীতের জের টানা ছাড়া উপায় নেই।

তখন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিতরূপেই জন্মলাভ করে। তার দুই অঙ্গের মধ্যিখানে বারোশ' মাইলের ব্যবধান, দুই অঞ্চলের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো প্রভৃতি এমন কী আবহাওয়া পর্যন্ত আলাদা। এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যুগল এলাকা কী এক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে? সেদিন কেউ কোন যুক্তিযুক্ত জবাবের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি।

পৃথিবীর মহাশক্তিবর্গ পাকিস্তানের বর্তমান উপদ্রুত অবস্থার জন্য রাজনৈতিক সমাধানের উপর খুবই জোর দিয়েছে। অবিশ্যি সমাধানের কী রূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে কেউ স্পষ্ট কিছু বলেনি। কিন্তু অখণ্ডতা সম্পর্কে সকলে এক রব। মনে হয়, তাদের চিন্তার পেছনে আর যাই থাকুক, কোন যুক্তিবিচারের বালাই অন্তত নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী, দুই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ দেশ এক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে না। ভৌগোলিক সমাবস্থান রাষ্ট্র গঠনের একটি বাধ্যতামূলক শর্ত। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ধর্মান্ধতাপরবশ এই কিম্ভূতকিমাকার চিজটি শুধু স্বীকার করে নিলেন না, বরং আরো গলা ফাটিয়ে জাহির করলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র মুসলমানের ক্ষেত্রে অচল। কারণ, ইসলাম এমন ধর্ম—যেখানে প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই, সেখানে ভাষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য উপাদান সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

তেইশ বছর পরে আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট— রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র ঠিকই আছে। ভুল করেছিলেন মুসলিম লীগের মধ্যযুগীয় মানসিকতা আচ্ছন্ন, অর্ধশিক্ষিত পরিচালকবর্গ।

অতীতের ব্যবচ্ছেদ ওইটুকু প্রয়োজন ছিল। যেহেতু মহাশক্তিবর্গ পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পর্কে বর্তমানে খুব উৎসাহী।

এখন দেখা যাক, পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায়ের জন্য কী কী শর্ত দরকার?

ঐ দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র (পাকিস্তান এয়ারলাইন বাদে) ইসলাম যা থেকে দ্বিজাতি-তত্ত্বের উদ্ভব। সুতরাং পাকিস্তানের অখণ্ডতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষার জন্য ইসলামের উপর জোর দিতে হয়। ইসলামী মানসিকতায় যেন দুই অঞ্চল হাবুডুবু খায়। পাকিস্তানের সাবেক শাসকগোষ্ঠী ঐ প্রচেষ্টার কসুর করেননি। ইসলামী অ্যাকাডেমি, ইসলামী উপদেষ্টা বোর্ড— এমন মোল্লাতোষ ডজন ডজন প্রতিষ্ঠান সব খান, বিশেষত আইয়ুব খান পয়দা করেছিলেন। দেখা গেল, দুই অঙ্গের মধ্যে ফাটল ক্রমশ বাড়তেই লাগল। বর্তমানে চৌচির হওয়ার অবস্থা।

বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ নিশ্চয় এই কায়দার উপর জোর দেবেন না। দেশ বিভাগের সময় রাশিয়া থেকে কে যেন মন্তব্য করেছিলেন বোধহয় স্ট্যালিন, "কুড়ি বছরের গৃহযুদ্ধ এর চেয়ে ঢের ভাল।" কাজেই আশা করা যায়, ফাটল রোধকারী ইসলামী প্রলেপ সম্পর্কে নিশ্চয় মহাশক্তিবর্গের কোন মোহ নেই।

ইসলাম ধর্ম যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার কোন উপাদান হতে পারে না, বর্তমান উপদ্রুত পরিস্থিতি তার চাক্ষুষ প্রমাণ। তেমন সম্ভাবনা থাকলে মধ্যপ্রাচ্যের এক ভাষা এবং ধর্মবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ কবেই অখণ্ড দেশে পরিণত হত।

এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির অন্যতম কারণ এক অঞ্চল কর্তৃক অপর অঞ্চলের উপর শোষণের নাগবেষ্টন। এক কথায়, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ মাত্র। এই দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যই বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম।

সুতরাং পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায়ের বিশেষ এবং প্রধান শর্ত হতে পারে : দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ।

মহাশক্তিবর্গের প্রচেষ্টা এদিকে অতি সাধু বলে গণ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব, পরীক্ষা করে দেখা যাক।

তেমন সম্ভাবনা থাকলে বাংলাদেশে এত প্রাণের বলি দিতে হত না। সকলেরই জানা আছে, বৈদেশিক ঋণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রশ্নেই আলোচনা শেষ পর্যন্ত সামরিক ষড়যন্ত্রে এবং পরে সামরিক তৎপরতায় পর্যবসিত হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ কি কূটনৈতিক চাপ দ্বারা ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সরকারকে ন্যায়ের পথ দেখাবেন বা বাঘকে তৃণভোজী জীবে পরিণত করবেন? তার সম্ভাবনা নেই। একটি হেতু প্রদর্শনই যথেষ্ট।

অদূরদর্শিতা, বর্ণবৈষম্য, পক্ষপাত বা যে কোন কারণেই হোক পশ্চিম পাকিস্তান যন্ত্রশিল্পে শুধু অগ্রসর নয়, সর্বেসর্বা। আর পূর্ব পাকিস্তান কৃষিপ্রধান এবং ঐ সব শিল্পের উৎপাদনজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র মাত্র। অখণ্ডতা বজায়ের জন্য বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হয়। সুতরাং সমাধানের পথ আর এগোচ্ছে না।

অন্য আর একটি বিকল্প থাকে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব, যদি দুই অঞ্চলের সমস্ত সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি রাষ্ট্র করায়ত্ত থাকে এবং তা ন্যায়মত দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করা হয়।

মহাশক্তিবর্গের দায়িত্ব এখানে লক্ষণীয়। একটা ফ্যাসিস্ট সরকারকে তাদের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। জানোয়ার হবে যোগী। বেশ গুরুদায়িত্ব। জানোয়ারের যদি যোগী বনার সম্ভাবনা থাকত, তা হলে বাংলাদেশে গণহত্যার কি প্রয়োজন ছিল?

এখানেও সমস্যা আছে। চীন এবং রাশিয়া সমাজতন্ত্রী দেশ। তারা হয়ত অমন ব্যবস্থায় ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করতে পারে। বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ নিশ্চয় পাকিস্তানের সমাজতন্ত্রী বেশ পছন্দ করবে না। এমন ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু সমাধানে আসার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। শেষে হয়ত রাজায় রাজায় যুদ্ধে বাংলাদেশ উলুখড়ে পরিণত হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা শেষ পর্যন্ত বাৎ কা বাৎ বা আন্ত র্জাতিক রাজনীতির খেলামাত্র।

ইয়াহিয়া সরকার ত প্রহরে প্রহরে সোচ্চার : পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিপন্ন অথবা ইসলাম বিপন্ন। বাংলাদেশে বর্তমানে যে লুঠতরাজ-বর্বরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা সবই ঐ মহান পবিত্র দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে। অখণ্ডতার মধ্যে পাকিস্তানের মঙ্গল নিহিত। এখানে মহাশক্তিবর্গ এবং ইয়াহিয়া খান আত্মিক সহোদর।

অথচ সকলেই জানে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শ্লোগান জঙ্গীশাহীর ভাঁওতামাত্র। এই প্রবঞ্চনার রীতি নতুন কিছু নয়। জিন্না সাহেব থেকে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান একই চীৎকারে গলা ফাটিয়েছেন। এমন দাগাবাজির আখড়ায় জুলফিকার আলি ভুট্টো নবাগত, তবে বিষে বাচ্চা সাপ।

আশ্চর্য, পৃথিবীর মহান দেশগুলো কীভাবে পাকিস্তানের ধুয়ায় গলা ছেড়ে দিলে?

আরো অবাক লাগে, সমাজতন্ত্রী দেশ নামে খ্যাত শক্তিবর্গও 'অখণ্ডতা' মরীচিকার পশ্চাদ্‌গামী? সমাজতন্ত্রীরা বলেন যে, শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ অব্যাহত রাখতেই প্রায়ই শাশ্বত, চিরন্তন নানা আদর্শের আড়ালে আত্মগোপন করে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা, বিপন্ন ইসলাম, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি জিগীর কি তেমন অসাধু প্রচেষ্টা নয়? অথচ সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত এখানে প্রতারিত।

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রীরাই মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানের শেষ কথা এবং যুক্তি তাদের করায়ত্ত। ভাববাদী দার্শনিকদের মত তাঁর কল্পনা-রাজ্যে ছোটাছুটি করেন না। যে আদর্শ রূপায়ণ সম্ভব, শুধু তেমন আদর্শের কথাই তাদের মুখে উচ্চারিত হয়।

অথচ আজ চীনের মত দেশও "পাকিস্তানী অখণ্ডতা" নামক অসম্ভবের পিছনে ধাবমান। বাংলাদেশের সমস্যা জাতীয়তার সমস্যা। ধর্ম জাতীয়তার উৎস নয়। একথা সমাজতন্ত্রীদের চেয়ে কে আর ভাল করে বোঝে?

এখন হাঁক-ফুকার বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র ইতিহাসের স্রাবমাত্র। দুই দশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন স্ববিরোধিতার চাপে তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। চীন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশ মুক্তিকামী জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াবে– এই ছিল সকলের স্বাভাবিক আশা। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত ঘটছে। সোজা অভিযোগ করা যায় : হয় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে অথবা তারা স্ব-স্ব জাতীয় স্বার্থে এমন পথ নিয়েছে। নচেৎ ইউরোপিয়ার পশ্চাতে কেন তারা তৎপর?

স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনই জন্মসূত্রে ব্যাধিগ্রস্ত পাকিস্তানের নিরাময়ের একমাত্র আশু কার্যকর উপায়।*

---

* রেজা আলি-এই ছদ্মনামে পশ্চিমবঙ্গের "আনন্দবাজার" পত্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ২২ জুন, ১৯৭১ তারিখে প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

বাংলাদেশ, মুজিব এবং মহাচীন

এই দেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলায় শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ নিয়ে অনেক রকমের ভুল বুঝাবুঝি এখনও বর্তমান। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্রের প্রতি মহাচীনের সমর্থন তা আরো জটিল করে তুলেছে। অনেক সময় স্বতন্ত্র পরিবেশের মানুষ আর এক আবেষ্টনীর পরিচয় ঠিকমত ঠাওর করতে পারে না। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের চেহারা কোন ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে সঠিক বুঝে ওঠা কঠিন। কারণ, সে ত কোনদিন অমন শাসনের আওতায় বাস করেনি। নক্সালপন্থী নেতা কানু সান্যালের বিচার হল প্রকাশ্য আদালতে। পাকিস্তানে তিনি কবেই খতম হয়ে যেতেন, অপরে কি, তিনি নিজেও টের পেতেন না। বিচার ত বহু দূরের কথা। ১৯৬৪ সন পর্যন্ত কারো কাছে মার্কসবাদী সাহিত্য পাওয়া গেলে, তার জেল না হোক, হয়রানির অন্ত থাকত না। এখানে কার্জন পার্কে লেনিনের প্রস্তর-প্রতিমা তাঁর প্রতি নাগরিকদের শ্রদ্ধার পরিচায়ক। ভারতীয় নাগরিক যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করেন তা পাকিস্তানে অচিন্তনীয়। অথচ দেশের নাম পাকিস্তান অর্থাৎ ঈমানদার এবং আধ্যাত্মিকভাবে খাঁটি মানুষের আবাসভূমি। ধর্মীয় গোঁড়ামি গোটা ভূখণ্ডের আবহাওয়া শ্বাসরোধী করে রেখেছিল। জননীর জঠর থেকে গোরস্থান পর্যন্ত সারা জীবন তোমার মনে হবে, ডাণ্ডাধারী এক দৈত্য যেন তোমাকে চোখে চোখে রেখেছে অষ্টপ্রহর, অহর্নিশ।

শেখ মুজিবের ভূমিকার যথাযথ বিচারে পাকিস্তানের এই পটভূমি মনে রাখা দরকার। মধ্যযুগীয় তন্দ্রাচ্ছন্নতায় নিঃসাড় সাড়ে সাত কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি জাগরণের মুক্তিমন্ত্রে। রূপ বা কাঠামো যা-ই হোক ভারতীয়

www.amarboi.com

গণতন্ত্রের আওতায় বাস করে কারো পক্ষে মুজিবের ভূমিকার পুর্ণ পরিমাপ অত সহজ নয়। ধর্মসর্বস্বতা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা— এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের রাজনীতি ও মানস-ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। সাম্প্রদায়িকতার মারী-বীজে যে রাষ্ট্রের জন্ম এবং অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেখানে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনাবন্যা বইয়ে দেওয়া কোন সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। এই একটি কাজের জন্য শেখ মুজিব বঙ্গজননীর অমর সন্তানদের অন্যতম পরিগণিত হবেন। তাঁর অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু সে-জন্যে তাঁর এই কীর্তি কোনদিন নাকচ হয়ে যাবে না।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক কর্মসূচী খুব স্পষ্টভাবে লিখিত। তা মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক। পাট, পাটশিল্প, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ ইত্যাদি। এখানে অনেকে মনে করেন, মুজিবের বুঝি কোন প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেই। সেই জন্য শুধু শুধু নিন্দিত হন। সাধারণ জ্ঞান দিয়েও ত কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। এমনভাবে কোটি কোটি লোক কেন মুজিবের অনুসারী? নিশ্চয় তাঁর মুখ দর্শনের জন্য নয়। তিনি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। অর্থনৈতিক কর্মসূচী থাকার ফলে শ্রমিক-কৃষক তাঁর দিকে আকৃষ্ট, তাঁর ডাকে অমন সাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের চেতনায় মুজিব বিশেষ আঘাত দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ বা আত্মরক্ষী বর্ম। যারা প্রগতির কথা বলেন, তাদের নিশ্চয় জানা আছে, মধ্যযুগীয় চেতনার অরণ্যে সমাজতন্ত্র দূরাগত প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই চেতনা হটে গেছে। তার জায়গা নিয়েছে বাঙালী জাতীয়তাবাদ। যারা মুজিবের ভূমিকার বিচার করেন, তাদের চোখ যেন এই দিক এড়িয়ে না যায়।

যদি ন্যূনতম বিশেষণটি ব্যবহার করা যায়, এক ইতঃক্ষিপ্তভাবে ছাড়া, পাকিস্তানের বামপন্থীরা সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম কাজটুকু করতে সক্ষম হয়নি। কারণ, তারা কখনও নিজেদের আক্কেল প্রয়োগ করেন না। যখন করেন, তা নিতান্ত তাদের "আন্তর্জাতিক বড়দা"দের কাছে ভুল প্রতিবেদন বা রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে। অশুদ্ধ যুক্তি থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গজায় না। ফলে ভুল কর্মনির্দেশই এসে পৌঁছায়। অগ্রজের আওতায় মানুষ বালকেরা চিরদিন অপরিণত মস্তিষ্কই থেকে যায়।

বাংলাদেশের হাড় মাংসে স্ফীতি উদর পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি গোষ্ঠী যখন সাবালক হয়ে উঠল, তখন তারা বড় তরফ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের কনুই ধাক্কা দিতে সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে আশ্নাইয়ের জন্যে ফষ্টিনষ্টি শুরু করল। আসল মতলব অবিশ্যি আরো টাট্কা পুঁজি সংগ্রহ। পুঁজিবাদের সচলতা রক্ষার জন্যে যে সূত্র চালু তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরূপ আছে বৈকি। আইয়ুব খান চীনের সঙ্গে পীরিতের জন্যে রোমিও সেজে বসলেন। পাকিস্তানের বামপন্থীবর্গ আইয়ুব খানের ফ্যাসিস্ট শাসনকে সমর্থন দিলে, একদম পাৎলুন খুলে। যুক্তিটা এই : যা চীনের জন্য ভাল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা দুনিয়ার পক্ষে, সুতরাং পাকিস্তানের পক্ষে। পাকিস্তানের বামপন্থীরা পায়ের তলার মাটির খোঁজ রাখে না। ফলে মাথা সেখানে গিয়ে ঠেকতে বাধ্য।

জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে মুজিব নিজের কার্যক্রমে অন্তত : সঙ্গতি হারাননি। ফলে, তার প্রভাব উত্তরোত্তর জনমনে জায়গা পেয়েছে। অন্যপক্ষে, বামপন্থীদের দু'বছর আইয়ুব খানকে অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদানের পর ভীমনিদ্রা ভঙ্গ হলো। তখন লেজুড়ের ভূমিকা ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকবে? বাংলাদেশ যখন পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ, তখন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ কে ডিঙিয়ে যেতে পারে? হয়ত তার মেয়াদকাল হ্রাস করা যায়। কিন্তু ঐ পদ্ধতিক্রম থেকে কারো রেহাই নেই। বামপন্থীরা ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এখন তাদের একাংশ মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা না দিয়ে, শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করেছে। 'শ্রেণী সংগ্রাম' শব্দটা অবিশ্যি অতি প্রচলিত এবং সস্তা, 'ক্লিশেই' (cliche) বা বাৎ কা বাতে পরিণত, যা সমাজতন্ত্রের যে-কোন অ-আ ক খ-এর বইয়ে পাওয়া যায়। একদিকে যান্ত্রিক কায়দায় সজ্জিত জংলী জঙ্গীচক্রের বিরুদ্ধে, অন্যপক্ষে দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের বিপক্ষে— দুই ফ্রন্টে ওই বামপন্থীরা লড়বেন। সাধারণ যুদ্ধেরও ত কিছু নীতি ও কৌশল আছে। নিজের শক্তির হিসাব-নিকাশ ভাল রকমের নিতে হয়! অথচ মুষ্টিমেয় লোক, দেশের জনসাধারণের উপর প্রায় প্রভাবহীন, অমন উন্মত্ত দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর। তার পরিণাম নিষ্ফলতাবোধ বা ফ্রাসট্রেশান। অথবা, ফলহীন হিংস্রতায় অমন অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে। তার জন্যে খুব বেশী ঐতিহাসিক হিসাব-নিকাশ লাগে না। বাংলাদেশে বামপন্থীদের এমনই দুঃখজনক হাল।

আমার মনে হয় কেন, আমি নিশ্চিত যে ওই শ্রেণীর নেতাদের ভুল রিপোর্টের ফলে চীনের নীতি অমন গোলমেলে। নচেৎ সমাজতন্ত্রের এক মহান দেশ কীভাবে বর্বর নৃশংস গণহত্যা সমর্থন যোগায়? এমন ক্ষেত্রে, "আন্তর্জাতিক সর্বহারাবাদের" মশাল সামনে রয়েছে কর্মপন্থা নির্দেশ স্থির করার জন্যে। যে নীতি পালনের ফলে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মঙ্গল হবে, তাই গ্রহণযোগ্য সঠিক কর্মপন্থা।

দেখা যাক এমন অবস্থায় মহাচীনের ভূমিকা কী?

পশ্চিম পাকিস্তানে শ্রমিক আন্দোলন কোনদিন তালঠোকা, আস্পর্ধাসহ দাঁড়াতে পারে, এমন অবস্থায় পৌঁছায়নি। কারণ, সৈন্যবাহিনী এবং পুঁজিপতিরা একযোগে তা বর্বরোচিত উপায়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখানে আঁতকে ওঠার কিছু নেই। পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিকচক্র এবং পুঁজিপতি আবার একে অপরের অংশীদার; অধিকাংশ জেনারেল ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারিগণ বিশাল ভূসম্পত্তির মালিকানা ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের স্বত্বাধিকারী। প্রকাশ্যে অথবা অন্য পন্থায়। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হবিবুল্লা খান বিরাট সিমেন্ট কোম্পানীর মালিক। আইয়ুব খানের পুত্রগণ, পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের অন্যতম সায়গলদের গুপ্ত এবং যুক্ত অংশীদার। এমন আরো শত শত নজির বর্তমান।

পুঁজিপতি এবং সামরিকচক্রের এই সমন্বয় সাধন পাকিস্তানের শ্রেণীবিন্যাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভারতবর্ষে কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। চীন দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ এই বামপন্থীরা করেছে কি না, সন্দেহের ব্যাপার।

বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ত গণহত্যার শিকার। আরো লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটত, যদি ভারত শরণার্থীর জন্য সীমান্ত বন্ধ করে দিত। মৃত্যুসংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর মত জীব অন্ততঃ টিক্কা খান নয়। অন্যতম চীনাপন্থী নেতা সয়ীদুল হাসান এবং আরো অনেককে সৈন্যরা হত্যা করেছে, রাজনৈতিক মতামতের জন্য নয় তাদের জাতীয়তার জন্যে। বাঙালী তাছাড়া আর কোন অপরাধ লাগে না। এইভাবে বাঙালীদের প্রতিদিন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চীন দেশে তৈরী মেশিনগানগুলো বাছ-বিচার করতে পারে না; কে শত্রু, আর কে মিত্র। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং মজুরশ্রেণী। যদি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায়, সম্ভবতঃ চীন দেশ থেকে সমাজতন্ত্র আমদানি করা হবে। "আন্তর্জাতিক সর্বহারাবাদের" নীতি বহু আগে উসুরী নদীর জলে নিমজ্জিত। জের এখনও চলছে।

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর প্রতি মার্কিন সমর্থন— বোঝার পক্ষে খুব সহজ। পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের লগ্নী পুঁজির পরিমাণ অনেক। একটা চালু গুজব যে কালাত্ রাষ্ট্রে, মার্কিনদের তৈরী এক ক্ষেপণক অস্ত্র বা মিসাইলের ঘাঁটি আছে। সেখানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টেরও প্রবেশ-অধিকার নেই। কিন্তু সামরিকচক্রের প্রতি চীনের সমর্থন বোঝা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। জানি না, তাদের নেতাগণ কি ভাবছেন। কিন্তু একটা সামন্ত শিল্পপতি সামরিকচক্র সমন্বিত সমাজকাঠামো সমর্থন তুলে নিলেই ধসে পড়বে এমন আশা কি খুব সহজে করা যায়? জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দিকে তাকালেই ত বেশী চিন্তার দরকার হয় না।

বাংলাদেশে সর্বজনবিদিত গুপ্তকথা : জানুয়ারী মাস থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড মুজিবের সঙ্গে বেশ ফষ্টিনষ্টি শুরু করেন, বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত মনপুরা এবং নিকটস্থ ছোটখাট দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি তৈরীর অনুমতির আশায়। তার বিনিময়মূল্য পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা। এইভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারত মার্কিন আওতায়। কিন্তু মুজিবের অস্বীকারের ফলে, এখন অন্য প্রান্ত থেকে সুতো টানা শুরু করেছে মার্কিন শক্তি। তাদের স্বার্থেই বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ থাকা দরকার। নচেৎ তারা নিজেদের লগ্নী টাকা ও সুদ কীভাবে ফেরত পাবে? সাম্রাজ্যবাদের ছোট তরফ পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার ত আবার বাংলাদেশ। মার্কিনরা ভালমতই জানে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পশ্চিম পাকিস্তান ধসে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুনদের জলে তাদের লগ্নী-পুঁজির সলির সমাধি ঘটবে। দেউলে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে তখন কি আদায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে তারা?

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী আছে, তা মোটামুটি সমাজতান্ত্রিক। তবু যদি বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক অনুসারী নয় শেখ মুজিব, তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী অনুসারীও বলা চলে না, কিন্তু মুজিবের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইত্যাদি নিন্দাবাদ খামখা আরোপ করা হয়।

বিগত '৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে দুই দেশে ব্যবসার মত, ভাবের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। নানা ভুল বুঝাবুঝির সূত্র, আমার মনে হয়, সেইখানেই নিহিত।

ভোর ভয়ি

ভোর ভয়ি।

ভোর হলো।

সুবেহসাদেক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সন।

কিন্তু আমি তখন ঘুমে। গতরাতে ঘুমোতে বেশ দেরী হয়েছিল। ক'দিন আগে পাকিস্তানী হানাদারেরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মিত্রবাহিনী কর্তৃক চারদিকে মার খেয়ে পিছু হটছে সেনাপতি টাইগার নিয়াজীর গিধড়ের দল। কিন্তু এই পিছুহটা শুধু সামরিক বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

বেসামরিক বহুজন তাদের সঙ্গী। যশোরে অবাঙালী যারা দেশ বিভাগের পর এখানে এসে গত চব্বিশ বছর ধরে নতুন আবাস রচনা করেছিল, তারা পলাতক। বিগত ন'মাস তাদের জুলুমের মাত্রা কিছু কম ছিল না। আলবদর, রাজাকারের বেশীরভাগ সংখ্যা এই মোহাজেরদের ভেতর থেকে নিয়োগ করা হয়। যশোর শহরে দু'চারজন আলবদর রাজাকার সমর্থক কিছু স্থানীয় অধিবাসী ছিল। নচেৎ সবাই শহর ছেড়েছিল সৈন্য ও অবাঙালীদের ভয়ে। 'তারা পালাচ্ছে'। শব্দ দু'টি উচ্চারণে বা লেখায় বেশী সময় লাগে না। কিন্তু তার পেছনে কি হৃদয়বিদারক মানবিক নাটক অভিনীত হয়েছিল, তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। চব্বিশ বছরের গড়া ঘরদোর সব ফেলে স্ত্রী-পুত্র-শিশু-কন্যাসহ অনিশ্চয়তার মুখে আবার ঝাঁপ দেয়া কি শুধু মুখের কথা? ইসলামের ধ্বজাধারী মুসলমানদের উদ্ধারকর্তা জিন্না সাহেবের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির নমুনা দেখুন। মুসলমানদের গৃহভূমি হোমল্যান্ড তৈরীর কারিগর লোকটির মগজের পরিমাপ আজ খুব সহজ।

অবাঙালীদের পিছু ধাওয়া শুরু করে স্থানীয় বাঙালীদের দল। পাকিস্তান বাহিনীর নাভিশ্বাস উঠেছে। নিজেদের নিয়েই তারা অস্থির, অপরকে আর কি আশ্রয় দেবে? আর সিপাইদের কুচকাওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কি বেসামরিক

জনেরা পথ চলতে সক্ষম কোন দিন? ন'মাস পরে পাল্টা মারের সুযোগ পেয়ে বাঙালীরা একদম ক্ষমাপ্রদানে তৎপর মহাপুরুষ ব'নে যাবে, এমন আশা পোষণ অস্বাভাবিক। যে পাপ হিন্দু-মুসলমান বিরোধে আরম্ভ হয়েছিল, এখন মুসলমান বনাম মুসলমানে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

যশোর রণাঙ্গনে এই অবস্থা।

যুদ্ধ আর ক'দিন চলতে পারে? তা নিয়ে অনুমান কল্পনার অন্ত ছিল না।

জয়ের পথে উল্লসিত আমার মত আরো কিছু মানুষ একত্র হলেই কথাশেষে এক খাতে গিয়ে পড়ে : যুদ্ধ আর কতদিন চলবে?

বেতারে মিত্রশক্তি পাকিস্তানকে আত্মসমর্পণের জন্য বার বার ঘোষণা চালিয়ে যাচ্ছে সামান্য ফাঁক দিয়ে দিয়ে। এমন উত্তেজনার মধ্যে স্বভাবতঃই ঘুমোনোর রুটিন ঠিক থাকে না।

ষোলই ডিসেম্বর ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম।

সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে মুক্ত যশোরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেছে মিত্র বাহিনীর কাছ থেকে।

বাংলাদেশের মাটি আবার স্পর্শ করতে পারব ন'মাস পরে। এই সুযোগ গ্রহণ পরিত্যাগ ত পাপের সামিল।

অবিশ্যি তার পূর্বে খবর নিয়েছিলাম, রক্তপিপাসু, নিয়াজী, ওমর পীরজাদা বা হারামজাদা রাও ফরমান আলী প্রভৃতি পাকিস্তানী ঘাতকেরা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন) আশ্রয় নিয়েছে।

তাদের সঙ্গে আছে বাঙালী মীরজাফর গভর্নর মালেক। যৌবনে এই ভদ্রলোক শ্রমিক আন্দোলন দিয়ে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। ওর সততাহীন বেঈমান জীবনের ধাপে ধাপে পরিণাম দেখুন। একদা মানব-প্রেমিক শেষে নরঘাতক জল্লাদে পরিণত। রাজনীতি ছিল ওর রুজিরোজগার ইহজাগতিক পদবৃদ্ধির মুখোশ।

যশোর শহরে বাসে পৌঁছেছিলাম। পথে হানাদার সৈন্যদের কীর্তিকাহিনী কিছু চাক্ষুষই দেখা বা শোনা যায়। যশোর শহরে তখন কিছু কিছু লোক ফিরে আসতে শুরু করেছে। কয়েকশ' অবাঙালী মোহাজেরকে মিত্রবাহিনী জেলখানায় আশ্রয় দিয়েছে স্থানীয় জনরোষের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে। এককালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তারা ভিটেমাটি পরিত্যাগ করেছিল মুসলিম লীগ নেতাদের আদর্শের আহ্বানে ; বর্তমানে ওদের হোমল্যান্ড ওই গারদখানা। যশোর থেকে নাভারণ যাওয়ার পথে এক জায়গায় হাড়ের স্তূপ দেখে কল্পনা করা যায় জুলুমের কি নিদারুণ অগ্নিকুণ্ড না হানাদার শয়তানেরা এই দেশের বুকে জ্বালিয়েছিল। বাস থেকেই দেখা যায় বর্বরদের লুটপাট ধ্বংসজাত নানা আলামত। ঝিকরগাছার রেল সেতু ভাঙা। বাংকারগুলো এখনও 'হাঁ' করে রয়েছে লালাসিক্ত জিভসহ।

দুই সাংবাদিক সঙ্গে ট্র্যানজিস্টার নিয়েছিলেন। হঠাৎ শোনা গেল ঘোষণা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিত্রশক্তির কাছে পাকিস্তান বাহিনীর অধিনায়ক নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছে। রমনা মাঠে সকালেই সেই পর্ব অনুষ্ঠিত। প্রাণের দূর অভ্যন্তর থেকে স্বতঃই বেরিয়ে এসেছিল সেদিন অস্পষ্ট গুঞ্জন :

জয় নবজন্ম, জয় নব অভ্যুদয়,
আছে পিছনে অজস্র অশ্রু
বহু ক্ষতি বহু ক্ষয়।
তবু ধাও প্রাণ, আকাশ অভীপ্সায়
হিসেব নিকেশের কাল এই নয়।
জয় নবজন্ম, জয় নব অভ্যুদয়।

দুঃখ, এই সময় ঢাকায় থাকতে পারলাম না। গারদখানা থেকে বেরিয়ে আসছে ন'মাস পরে হাজার হাজার নর-নারী। সেই মিছিল থেকে আমি দূরে পড়ে রইলাম।

ভোর ভয়ি।

ভোর হলো।

প্রত্যুষের আবর্তন ত থেমে থাকে না। আরো সুবেহ সাদেক এসে চলে গেছে। বুকের বিষণ্নতা আবার ফিরে আসে। স্বাধীনতার শপথ নিয়েছিলাম : মানুষ হবে আপন আপন ভাগ্যের কারিগর। স্বাধীনতার শপথ নিয়েছিলাম : কারো অধিকার পায়ে মাড়িয়ে কাউকে ইহজাগতিক সুখ-সুবিধার সুযোগ দেয়া হবে না। স্বাধীনতার শপথ নিয়েছিলাম: নিজের সুখ-দুঃখ উচ্চারণের স্বাধীনতা থাকবে প্রত্যেকের।

AMARBOI.COM

ভোর ভয়ি।

তবু ভোর হয়।

নয় মাস অতিথি থাকার পর ষোলই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সনে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে হৃদয় যে ভাষণ দিয়েছিল বিদায়-মুহূর্তে, সেই উচ্চারণ আজও প্রতিধ্বনি তুলে যায়। মনে হয়, ভোর হয়নি। আরো অপেক্ষা বাকী আছে। অতীতের প্রতিধ্বনি আমি শুনতে পাই।

ভারতবর্ষ—বাংলাদেশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে

পঞ্চান্ন কোটি আঙুলের ছোঁয়াচে শিহরিত জয়ের তিলকে ঝলমল আমার ললাট। বিদায়ের পূর্বে করমর্দনসহ পঞ্চান্ন কোটি মুখ আমি দেখার প্রয়াসী।

দুই হাত নিঃসাড়। দুই চক্ষু এই ক্ষেত্রে অসহায়, অক্ষমতায় তা বিবাগী, দৃষ্টিশূন্য।

তাই প্রশ্ন : উপায় কোথায়? ওদের সঙ্গে হৃদয়গত বন্ধন আমার এক লহ্‌মার ব্যাপার নয়। সেখানে শত শত শতাব্দী ইতিহাসের পাতা অধ্যায়ের পর অধ্যায়

উল্টে-উল্টে এগিয়ে যায়। তার সমগ্র পাঠ অসম্ভব। কারণ, সেখানে দ্রুততা ছাড়াও হাজার হাজার ছায়াছবি স্রোতোধারা স্বপ্নের মত যত নিমেষে সচেতন করে, ততই অচেতনতার স্বাক্ষর আঁচড়ে আঁচড়ে এগোয়। তখন দিশেহারা সব উপলব্ধির মধ্যে থাকে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা। কিন্তু কোথাও অনাত্মীয় কিছু ঠেকে না। আমি আমার নিজের পরিচয় পাই। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আমি তখন একমাত্র অভিনেতা। আমার খোদাই শিলালিপি, ভাস্কর্য তার সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার চতুর্দিকে তখন বিরাজমান নানা-মাত্রিক আয়নার সারি। মনুষ্যত্বের আদল তার সমতলে ভেসে ওঠে। সেই অঙ্গরেখা আমারই প্রতিচ্ছায়।

অথচ বিগত চব্বিশ বছর কি তারও পূর্বে থেকে আত্মপরিচয় চিহ্নিত, স্বাজাত্যবোধহীন আমার আততায়ী প্রতিমূর্তি কে না দেখেছে? আদিম প্রবৃত্তির নফর আমি। প্রতিবেশী এবং ভাইয়ের উপর অকথ্য নির্যাতন মারফত হত্যা-উল্লসিত অট্টহাসে হেসে উঠেছি। সেই জখমের দাগ আজও কতো জনপদে-নগরে মানব-মানবীর দেহে ইতঃক্ষিপ্ত ছড়ানো হয়েছে। আমি কতো গৃহদাহ করেছি, তার সংখ্যা গণনা কঠিন। কতো মা-বোনের ইজ্জত লুটের শরিক, আমি তছনছ করেছি বহু শান্তি সুখের নীড়। আমার হিংস্র ড্রাগন-নিঃশ্বাসে মানবিক প্রেমপ্রীতি শ্রেয়বোধ পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। সরীসৃপের মত শুধু বর্তমানকে সম্বল করে বাঁচার চেষ্টা পেয়েছি তখন। আমি অন্ধ যেহেতু কবন্ধ। তাই ধর্মের নামে এবং পবিত্র ইসলামের নামে ধর্মান্ধতা ছিল আমার কাছে স্বাভাবিক।

কিন্তু তেইশ বছর পর যখন আমি হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে বিপন্ন এবং আমার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে তখন সেই একদাশত্রু তার সমস্ত অপমান, ক্ষোভ, নির্যাতনের স্মৃতি নিমেষে মুছে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এলো আমার ভস্মীভূত গৃহ-প্রাঙ্গণে, আমারই পরিজনের প্রাণ এবং ইজ্জত আবরু রক্ষায়। যে –কান থেকে একদা অকথ্য যন্ত্রণা ছিটিয়ে আমি সোনার অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, সেইখানে আমার ত্রাহি রব, বাঁচাও আর্তনাদ গিয়ে পৌঁছল। আমার পুরাতন খোলস খসে যেতে লাগল দুর্বিপাকের হেঁচকা টানে টানে। আমি দেখতে পেলাম আমার স্বরূপ। আমি আমার জননী বাংলাদেশকে আবিষ্কার করলাম। কাজী আব্দুল ওদুদের ভাষায় : শাশ্বত বঙ্গ।

আমি নিরস্ত্র, অসহায়। কিন্তু আমাকে শত্রুর মোকাবিলা অনুপ্রেরণা সজ্জায় সাজিয়ে দিতে বিলম্ব ঘটল না। হারানো ভাইকে আমি চিরতরে চিন্‌লাম। শিখসন্ত গুরু গোবিন্দ সিংহের ফার্সি কবিতার পঙক্তি আমার কণ্ঠে বজ্রনিনাদ হয়ে এলো :

চুঁ' কার হামা হিলাতে দর গুজাস্ত।
হালাল আস্ত বুরদান বা শাম্‌সীর দাস্ত্।
সর্ব পথ রুদ্ধ যখন
শ্রেয় হস্তে অস্ত্র গ্রহণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁ, আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম।

কারণ, আমার প্রতিবেশী ভাই ছিল। সে আমাকে শুধু আশ্রয় দিয়ে ক্ষ্যান্ত হয়নি, নিজের রক্ত পর্যন্ত ঢেলে দিলে আমাকে রক্ষার জন্যে। জঘন্য এক জঙ্গীশাহীর (নামে মুসলমান) দাবানল যখন আমাকে জন্তুর মত খেদিয়ে বেড়াচ্ছিল বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে, নগর-জনপদ ভস্মীভূত করে, আমার ঠাঁই মিলল আমার প্রতিবেশীর বুকে, যে–বুকে আমার ছোরার দাগ এখনও চোখে পড়বে।

আমি নিরন্ন উপবাসী। প্রতিবেশী তার ভাণ্ডার দ্বার খুলে দিলে।

আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছিল রক্তস্নান মারফত। আমি চিনতে পারলাম আমার প্রতিবেশীর স্বরূপ। কারণ, পাশাপাশি দাঁড়ালাম একই রণ প্রান্তরে, প্রতিবেশীর মুখ দেখলাম অবিকল আমার মত। অথচ, একদিন মধ্যযুগীয়তার কালো পাঁক আমার কাছে মনে হয়েছিল চন্দন সুবাস। আমি আমার ভাই-বোনদের চিনতে পারিনি।

এই সময় আরো এক প্রতিবেশীকে দেখলাম। সত্তর কোটি জনঅধ্যুষিত সমাজতন্ত্রী দেশ—মহাচীন। তার নেতারা তত্ত্বের গর্তে ঢুকলেন। মানুষ তাদের চোখে ঠেকল না। গণহত্যার মত চণ্ডাচার পাশবিকতা যেন মানুষের জন্যে স্বাভাবিক ব্যাপার। বন্দীশিবিরে পাছে আত্মহত্যা করে বসে, তাই কাপড় কেড়ে নেয়া উলঙ্গ ধর্ষিতা রমণীর ফরিয়াদ, আহাজারি চীনের নেতাদের কানে সেঁধোল না। এইভাবে আদর্শের অধঃপতন সূচিত হয়। মানুষ তখন আদর্শের কাছে ছোট হয়ে যায়। সামনে জড়ো হয়ে শাস্ত্র ও কেতাবের খসখসে বুলি এবং তা মার্কসবাদের বুলিও হতে পারে। শুধু তাই নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতি তারা প্রমাণ করল, মার্কসবাদের আবাকাবাধারী হলেও তারা বর্ণবিদ্বেষ বা রেশিয়াল হেটেরেডমুক্ত নয়। বাংলাদেশের মানুষ যেন গরু ভেড়া ছাগলের শামিল। তাছাড়া আর অমন সিদ্ধান্ত কী করে মাথায় গজায়?

এমন কি পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী যখন শুধু টিকে থাকার জন্যে চোর, গুণ্ডা, বদমাশদের হাতে অস্ত্র সঁপে দিয়ে রাজাকার এবং ধর্মান্ধ আলবদর বাহিনী গঠন-মারফত নিজেদের ঘৃণ্য বীভৎসরূপ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রাখলে না– তখনও সেই সমাজতন্ত্রী প্রতিবেশী চুপ করে রইল। অন্ধত্বের ভান দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সর্বদাই অক্ষম। যদিও নিকট প্রতিবেশী নয়, তবু আত্মার আত্মীয়রূপে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমার উদ্ধারকল্পে নৈতিক সমর্থনে এগিয়ে না এলে মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মুখ শুধু থুথু ভরে থাকত।

প্রতিবেশীর বুকে আশ্রিত ন'মাস ধরে। আমি ইতিহাসের বিস্তার কল্লোল স্পন্দন অনুভব করলাম, বারংবার দেখার সুযোগ পেলাম প্রতিবেশীর মুখ।

জন্তু হিসেবে মানুষের বাঁচার কতোগুলো শর্ত আছে। তা প্রতিপালিত না হলে মানবিক অন্যান্য শ্রেয় দিকও ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। এমন ক্ষেত্রেও দেখলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চান্ন কোটির প্রতিটি ব্যষ্টি আপন বুকের কপাট খুলে রেখেছেন। অহোরাত্র, অহর্নিশ। যোদ্ধারও প্রয়োজন হয় দু'দণ্ড বিশ্রাম, কিছু আহার, আলাপ। নিঃসঙ্গতা লড়াইয়ের প্রেরণায় নয়। নৈতিক বলের অভাব তেমনই মারাত্মক। এখানে দেখলাম সর্বস্তরের মানুষ হৃদ্যতার ডালা হাতে এগিয়ে আছে– যেখানে যা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত কারো নামোল্লেখ তাদের অপমান। কারণ, কোটি কোটি গণ-দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে যাদের আত্মপ্রকাশ, তাদের আন্তরিকতা কি পরিমাপ-সাধ্য, না কোন কৃতজ্ঞতার জালে বন্দি হতে পারে তাদের ব্যক্তিত্ব? তবু মানবিক দুর্বলতায় কতোজনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি বিদায় নিতে। অনেকের কাছে আবার যেতে পারিনি। এখানেও মানবিক দুর্বলতা বাধা। দেহের পরিশ্রম-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জানি সামাজিক ত্রুটি মনে রাখার মত তারা কেউ নন। নিছক মহানুভবতার তাগিদে যে ভূমিকার সূত্রপাত সেখানে লৌকিকতার স্থান অতি গৌণ।

ভারতবর্ষের সকল নাগরিককে তবু নমস্কার, বারম্বার নমস্কার।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জান-কবুল লড়াইয়ে আমার কুচকাওয়াজের রণবাদ্য এক মহান ভারতবাসীই যুগিয়েছেন। নচেৎ অনুপ্রেরণার সঞ্জীবনী সুধা আমি কোথায় পেতাম? আমার জাতীয় সঙ্গীতও আমার প্রতিবেশীর দান। আত্মার রাখী বন্ধনের সঙ্গে এই পরম উপহার কে আমাকে দিকে পারত?

মহামানবের সাগর সৈকতে আহ্বান কর্তা এবং সুরস্রষ্টা ঋষিকল্প কবি রবীন্দ্রনাথের বাণীই আজ আমার কণ্ঠে কুচকাওয়াজের সঙ্গীত :

মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশ বিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি, হাত জোড় করে–
হে চিরকালের মানুষ
হে সকল মানুষের মানুষ
পরিত্রাণ করো
ভেদ-চিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি
দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে।
আমি ব্রাত্য আমি জাতিহারা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

১. ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি এই যুগে জটিল ও কঠিন ব্যাপার। কারণ, বর্তমানের স্থিতাবস্থা থেকে ফায়দা ওঠানেওয়ালা বহু ক্লাস বা শ্রেণী থাকে। রূহ্ (আত্মা) গুণে ফেরেস্তা। এই শ্রেণীর নিজস্ব ভাষ্যকার, তফসীরকার আছে। রাহা (রাস্তা) দেখানোর চেয়ে গুমরাহী (বিপথগামী) করার কাজটা যাদের ভালভাবে রপ্ত।

সর্বযুগে এই কাণ্ড ঘটেছে।

অনেক সময় এই জ্ঞানপাপীদের ভণ্ডামি ধরতে বেশ দেরী হয়ে যায়। বিজ্ঞান মথিত যুগে আরো দেরী হয়, সমাজের বাস্তব ছবি সহজে চেতনায় ধরা দেয় না। বেতার, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সংবাদপত্র-পত্রিকা-পুস্তিকা, ওয়াজ-মাহফিল, হ্যান্ডবিল, প্রচার-পুস্তিকা ইত্যাদি ঘোলাটে পানি আরো কর্দম-পঙ্কিল নয় শুধু, মানুষের রক্তে রক্তাক্ত করে ছাড়ে।

সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া এযুগে সহজ। একটা জ্যান্ত উদাহরণ। পূর্ব পাকিস্তানের কোন নেতা পাকিস্তান আমলে এই ভূখণ্ডের কোন ন্যায্য অধিকার কি স্বার্থের কথা তুললে, তা তদানীন্তন পাকিস্তানী প্রভুদের নিকট হয়ে পড়তো– ১. প্রাদেশিকতা ২. ইসলামের বরখেলাফ ৩. হীন ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ৪. অন্য কিছু ছুতো না পেলে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো : হিন্দু সম্প্রদায় বা ভারতের উস্কানি, ফন্দি ফিকির ঐ জাতীয় আর কিছু। এমন সব প্রচারের পেছনে মদত দিতেন কারা? ইসলাম ধর্মের সাচ্চা পায়বন্দরূপে কথিত বহু আলেম-উলেমা, হাজার লাখ লাখ মুরীদশোভিত বুজুর্গ পীর কেবলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ডক্টর অগয়রহ। ১৯৪৭-১৯৭১। সুদীর্ঘ-কাল লেগে গেল সমাজের আসল বাস্তব রূপ খুঁজে পেতে।

বহু বছর পরে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গোক্ষুর ডক্টরগণ অধিকাংশ নির্বিষ ঢোড়া এবং মূলতঃ ডক্টর নয় ডিজিজ (রোগ)।

এইখানে লক্ষণীয়, ওই সব বিবেকহীন অথবা নির্বোধ আখের গুছানেওয়ালা পরহেজ্গার বা পণ্ডিতদের মূল্যবোধ যাচাইয়ের জন্যে ইহজগৎ বা সমাজের মানুষ দরকার হয় না। অর্থাৎ মানুষের কী ঘটছে দৈনন্দিন জীবনে, কী তার বেঁচে-থাকার সমস্যা, তার আত্মিক জীবনের বিকাশে বাধা (কোরান হাদিস পড়বে কী, অনেকেতো মক্তব মাদ্রাসায় যেতেই পারে না– উচ্চশিক্ষা দূরের কথা) কোথায়– এসব নিয়ে ওই পণ্ডিত এবং পরহেজ্গার আল্লাহর বান্দাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাদের একমাত্র কাজ ঈমানের চৌকিদারী করা। কিন্তু ঈমান প্রয়োজন হয় আদর্শকে কেন্দ্র করে। সেই আদর্শের বাস্তব রূপদান সমাজে ঘটছে কিনা বা অসুবিধা কোথায়– এসব দিকে এই ঈমানের আত্মনিয়োজিত প্রহরীদের চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদৌ যায় না বা ধায় না। বাস্তব জীবন ছেড়ে তারা আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলেন। মাথা নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। তারা মাথা ঘামান মাথাব্যথা নিয়ে। কিন্তু মাথা ছাড়া যে মাথাব্যথা হয় না, এই সরল সত্যটা শত শত বছরেও ওদের চোখে পড়ে না। ভুঁই ছাড়া ওরা বাজি পোড়ায়। এই খাস বান্দারা যে পাক্কা আতশগীর সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নচেৎ ওদের গুম্‌রাহী নসিহৎ এবং মুনাফেকির মুখোশ খসে পড়তে চব্বিশ বছর লেগে গেল কেন?

ওই উপলব্ধি বড় চড়া দামে কিনতে হয়েছে ভাগ্যহত বাংলাদেশের অধিবাসীদের। অগণন নর-নারীর বেইজ্জতি, প্রাণ-বিসর্জন, সম্পদ ধ্বংস এবং রক্ত-সমুদ্রে সাঁতারের বিনিময়ে।

ইতিহাসের আসল স্বরূপ ধরা তাই এযুগে বড় কঠিন। হুঁশিয়ার হওয়া অপরিহার্য। মানুষ ঠকতে পারে। কিন্তু নির্বোধ এবং মগা (হাবাগোবা) ছাড়া কেউ বারবার প্রতারিত হয় না। সতর্কতা তাই পদে পদে সকলের জন্যে ফরজ। ধর্মের খোলসধারীকে যেন আমরা ধার্মিক বলে সনাক্ত করে না বসি।

২. আর একটি হুঁশিয়ারি।

আমার মনে হয় ভাষার দৈন্য থেকে এই জাতীয় তালগোল-পাকানো আক্কেল-ধ্বংসী ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এখনও এদেশে ইতিহাসে পড়ানো হয় ছাত্রদের। তারা জানে, সাত'শ বছর মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষে। হিন্দুরা রাজত্ব করেছিল গুপ্ত আমলে চার'শ বছর। এই জাতীয় আরো কাহিনী। মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল। কারণ, সম্রাট ছিল মুসলমান। কিন্তু চাষী-মজুর-কারিগর প্রভৃতি মুসলমানও কি রাজত্ব পারত? দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নে কি এই সাধারণ মানুষরা শরিক হতে পারত? ইতিহাসের জের আজও আছে। খুলনায় ধীবর শ্রেণীর মুসলমান— যাদের 'নিকিরী" বলা হয়, আছে পাবনায় 'ধাওয়া" মুসলমান, আশরাফ, আতরাফ ইত্যাদি। তারা মুসলমান হয়েও অপাঙক্তেয় কেন? রাজত্ব তো দূরের কথা, নিজেদের শুধু প্রাণ-ধারণের সমস্যায় তারা কতখানি উচ্চবাচ্য করতে পারে? অন্যদিকে দেখা যায়, সম্রাট মুসলমান। কিন্তু তার সেনাপতি হিন্দু। আকবর কেন রাজপুত সেনা এবং সেনাপতি রাখতেন বাহিনীতে? মারাঠা হিন্দু শিবাজীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন নূর খান। পাকিস্তানের একদা বিমান বাহিনীর মার্শাল নূর খানের নামে নাম। বলা বাহুল্য, মুসলমান। ব্যাপারটা স্ববিরোধী।

কিন্তু এই স্ববিরোধ নিরসন হয়, যদি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়। শিবাজী ও নূর খান, আকবর ও যশোবন্ত সিং— আসলে একই অর্থনৈতিক কাঠামো উদ্ভূত। হয়ত হিস্যা বেশী কম থাকতে পারে। ইরানের ভূতপূর্ব মরহুম শাহ (দোজখ না জান্নাতবাসী আল্লাকে মালুম) এক সময় ক্যাবিনেটে ইহুদী অর্থমন্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছিল।

এসবই শ্রেণীস্বার্থের ফল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান ইত্যাদি শব্দ ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করেন, একটা কাল চিহ্নিত করতে। কিন্তু তা দিয়ে সমাজের আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।

সেই জন্যে জানা দরকার, একটা দেশের ধন-সম্পদ কিভাবে উৎপাদিত হয়; কী তার বণ্টন-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার আইন তৈরী করে কারা? সেক্ষেত্রে কাদের রায় কার্যকর। দেশের ক'জনইবা সেই সব আইন-প্রণয়নে শরিক হতে পারে। এক কথায়, দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছাড়া সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক পজিশন নির্ণয় কঠিন। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই আসল স্বরূপ ঢেকে রাখা হয়। কারণ, পিছনে থাকে ফায়দা ওঠানেওয়ালা কোন শ্রেণী—যারা সমাজের বাস্তব রূপ ঢেকে রাখে। এবং তারা জাহির করে, এই ব্যবস্থাই সমাজে সবচেয়ে উত্তম এবং যুগ যুগ তা চলে আসছে। এই ব্যবস্থা শাশ্বত, চিরন্তন। সমাজে তারা ধ্যানাদর্শ ছড়িয়ে রাখে যে পৃথিবীর সমাজের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সমাজের পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষই তা ঘটায়—একথা তারা অস্বীকার করে।

৩. একটা দেশ বা সমাজের স্বরূপ নির্ণয়ে—অন্য কথায়, ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৮০১ সাল থেকে হালফিল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস-পরিক্রমা সুদীর্ঘ পৌনে দু'শ' বছরের পাড়ি। তার বিবরণ মোটা মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায়।

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে) বাঙালীর স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষ কব্জা করে নেয়। এই সব কাণ্ড ঘটছিল কিন্তু বণিকতন্ত্রের সূত্র ধরে। তিন হাজার বছরে এদেশের সমাজ আর কখনও এমন নাড়া খায়নি। রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটত, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থনীতির বুনিয়াদে তার তেমন কোন আঘাত পৌঁছাত না। কিন্তু বণিকের অর্থনৈতিক সূত্র সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতীকের কায়দায় বলা যায় এইভাবে। পূর্বে অর্থনীতির সূত্র ছিল :

পণ্য-টাকা-পণ্য

অর্থাৎ মানুষ পণ্য উৎপাদন করত এবং তা বিক্রি করে টাকা পেত। তারপর ব্যবহার-উপযোগী অন্য পণ্য কিনত টাকা দিয়ে।

কিন্তু বণিক-অর্থনীতির সূত্র কালে কালে সব ওলট-পালট করে দিল। তখন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটল এইভাবে :

পুঁজি-পণ্য-পুঁজি

অর্থাৎ পুঁজি দিয়ে লোক পণ্য কেনে আর নিজের ব্যবহারের জন্য নয়, বরং তা আবার পুঁজিতে পরিণত করতে।

ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র পুঁজিবাদে পরিণত হয়। সেই অর্থনৈতিক কাঠামো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজায় রাখতে প্রয়োজন বাজার যা স্বদেশের সীমানায় আর কুলায় না। শুরু হলো দেশ দেশান্তরে বাজারের সন্ধান। যার ফল, শেষ পর্যন্ত উপনিবেশ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।' অর্থাৎ শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদ।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদও এক জায়গায় অনড় রইল না। বর্তমানে কোন উন্নত পুঁজিবাদী দেশের আর উপনিবেশ প্রয়োজন হয় না। সরাসরি দেশ-জয় এবং শাসনভার গ্রহণ আর ইউরোপীয় বা মার্কিন দস্যুবৃত্তির কেতাবে লেখা নেই। বর্তমানে মালটিন্যাশনাল কোম্পানী বা বহুজাতিক কোম্পানী বা বহুজাতিক কোম্পানীগুলো পুঁজি নিয়োগের সুযোগ পেলেই বর্তে যায় এবং সেইভাবে প্রত্যেক দেশে তারা পথ করে নেয়। যার ফলশ্রুতি, অনুন্নত দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই তাদের তাঁবে চলে যায়। সরাসরি কোন দেশের উপর রাজত্ব করার প্রয়োজন হয় না। উপনিবেশ আমল থেকে এইটুকু যা তফাৎ। কিন্তু মুনাফা-লুণ্ঠন এবং অন্যান্য প্রকারের শোষণের কিছু কমতি ঘটেনি। আরো পঙ্কিল এবং রক্তাক্ত হয়ে ওঠে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সড়কের নানা অলিগলি। উনিশ শতকের শেষ অঙ্ক থেকে ইউরোপীয় দস্যুদের পাশাপাশি মার্কিন বোম্বেটেদের আবির্ভাব। দুনিয়ায় তারাই এখন বড়া তরফ। ইউরোপ ছোটা তরফে পরিণত।

AMARBOI.COM

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি মনে রাখা দরকার। উপনিবেশ জয়ের কাল থেকে সাম্রাজ্যবাদ খুব সহজে এগোতে পারেনি। স্থানীয় প্রতিরোধ তখন থেকেই শুরু হয়। যার কালানুক্রমিক পরিণাম, উপনিবেশ-দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম। অন্য কথায়, জাতীয়তাবাদের বিকাশ, যদিও পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর সেই পথ।

আরো লক্ষণীয়, সাম্রাজ্যবাদ গোড়া থেকেই উপনিবেশে দেশী এজেন্ট সৃষ্টি করে এবং তাদের লুণ্ঠনের শরিক করে নেয় কিছু উচ্ছিষ্ট হাড়গোড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা যেখানে মূল প্রলোভন-ফাঁদ। এদেশে ভূমি-ব্যবস্থার উপর লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চরম আঘাত হানে জমিদারী প্রথা প্রবর্তন মারফত। জমিদারেরা হয়ে পড়ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদরক্ষী বিরাট স্তম্ভ। এজেন্ট তৈরীর একটা নমুনা দেওয়া হলো। অর্থাৎ, পন্থা একই, হয়ত ভেক নানা রকম হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে ইংরেজী 'কোলাবোরেটার' (সহযোগী) শব্দটি বেশ জোরে চালু হয়। কিন্তু ব্যাপারটা নতুন নয়। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সহযোগী হয়ে পড়ে ঢাকার এক চামড়া-ব্যবসায়ী। নাম : আবদুল গণী। সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ চরম নৃশংসতায় দমন করে। তখন "কোলাবোরেটার"দের পুরস্কার দিতে হয়। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চামড়া-ব্যবসায়ী রাতারাতি পেয়ে গেল "নবাব" টাইটেল। চামড়া ব্যবসায়ী তখন নবাব আবদুল গণী। এমন কোলাবোরেটারদের বংশধরগণ অতীত বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার জমিজিরাৎ-ধন-সম্পদ আজও ভোগ করে আসছে।

উনিশ শতকের সমাজ প্রবাহের জের বিংশ শতাব্দীতেও এসে লাগে। বণিকতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী স্তর এবং যখন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বখরা নিয়ে সংকট ঘনিয়ে এসেছে, যার পরিণাম, প্রথম মহাযুদ্ধ– তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। উপনিবেশের সন্তান। তাঁর মানসলোক থেকে জাতীয়তাবাদের শিকড় আর কোনদিন উৎপাটিত হয়ে যায়নি। মধ্যবিত্ত মুসলমান প্রায় সবই মুসলিম লীগের পতাকাতলে জমায়েত হয়েছিল তিনের দশকে। ১৯৪০ সন তো তুঙ্গ পর্যায়। বঙ্গবন্ধুও আর দশজন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের মত মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু তখনও দেখা যায়, প্রভু ইংরেজেদের সৃষ্টি এবং এদেশের কলঙ্ক "হল্‌ওয়েল মনুমেন্ট" উচ্ছেদে সুভাষ বসুর (পরে নেতাজী) আহ্বানে শরিক হন। তখন শেখ মুজিব মাত্র কলেজের ছাত্র। দেশ বিভাগের পর তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বের ফাঁপা চেহারা দেখতে পান। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম সোচ্চার প্রতিধ্বনি ভাষা আন্দোলনের শরিক বঙ্গবন্ধুই ন্যাশনাল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এখন স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কলাকৌশল অনুযায়ী তিনি 'মুসলিম' শব্দটি রাখেন। কিছুদিনের মধ্যে এই 'মুসলিম' শব্দ খসে গেল। জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এখানেই পরিষ্কার। ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখপাত্ররূপেই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল।

বিশ্ব-জীবনের প্রবাহ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা আত্মহত্যার সামিল। মুসলমান সম্প্রদায় শত শত বছর এই ভুল করে এসেছে, যার ফলে পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোন ঠাঁই নেই। তারা বৃটিশ আমলে থেকেও প্রথমে ইংরেজী শেখেনি, যেহেতু ইংরেজী নাসারার ভাষা। এমন অন্ধতার ফলেই বর্তমান পশ্চাৎপদ।

বঙ্গবন্ধু তা উপলব্ধি করেছিলেন বৈকি। নচেৎ 'সেক্যুলার' দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে উত্তরোত্তর তিনি ঝুঁকতেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর তিনি "বাঙলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ" প্রতিষ্ঠা করেন। নতুনভাবে রাজনৈতিক জীবনধারার একটা পরীক্ষা হত। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র জন্মভূমি ইউরোপেই অবজ্ঞেয় বর্তমানে। এদেশে তার দুর্দশা কারো কাছে অজ্ঞাত নয়। নতুন রাজনৈতিক কাঠামো পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আন্তর্জাতিক দস্যুদল, যারা মাল্‌টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর প্রতিভূ এবং তাদের দেশী সরীসৃপ এজেন্টদল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়া থেকেই ওৎ পেতে ছিল। যথাসময়ে তারা ছোবল দিতে আর দেরী করেনি।

রক্তস্নাত আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পৃথিবী থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকালে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর আরব্ধ কর্তব্য আজ সকল সাচ্চা দেশপ্রেমিকের উপর ন্যস্ত। সাত শতাব্দীর গোলাম এই ভূখণ্ডের বাঙালীদের স্বাধীনতা উপহার দিয়ে গেছেন শেখ মুজিব। মানুষের মত বাঁচার এই অনির্বাণ মন্ত্রঅগ্নি কার সাধ্য সহজে নিভিয়ে দিতে পারে?

জাতিপুঞ্জের জাঁতীকল

বাংলাদেশের অধিবাসীদের মনে একটা অসোয়াস্তি স্বাধীনতার পর থেকেই বেশ জেঁকে বসে আছে। বিশ্বে এখনও তারা রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে স্বীকৃতি পেলেও জাতি হিসেবে আমল পায়নি। সেজন্যে জাতিপুঞ্জের বা ইউনাইটেড নেশন্সের লেবেল লাগে। এমন অসোয়াস্তি আবার কতকটা হীনমন্যতা-জাত। উক্ত প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি না দিলে যেন জাতে ওঠা যায় না। চীন দেশ বাইশ বছর বাইরে পড়ে ছিল। কি আসে গেছে সে জন্যে? অবিশ্যি বান্দুং সম্মেলনে "পঞ্চশিলা"র অন্যতম প্রবক্তা চৌ-এন-লাই সাহেব আজ সেই শিলা থেকে নোড়া বানিয়েছেন এবং বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অজুহাতে বাঙালীর আঁতে ঘা দিচ্ছেন। আঁতে কেন, বলা হয় সর্বাঙ্গে। লঙ্কাগামীদের রাবণের খসলৎ কিছু কিছু পেয়ে বসে।

অনেকের অসোয়াস্তি স্রেফ "জাতিপুঞ্জ" নাম থেকে। সাধারণ ধারণা : জাতিপুঞ্জ দুনিয়ার সেরা-সেরা জাতি এবং তদীয় প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান। কাজেই ভেস্ত সুলভ বা স্বর্গীয় আবহাওয়া সেখানে। ন্যায়, নীতি কল্যাণ—যত্ত গালভরা মাপকাঠি আছে সভ্যতার– সব সেখানে গাদি লেগেছে। অতএব, এমন মহৎ আখড়া থেকে বাদ পড়ে গেলে জাত যাবে বৈকি।

ঠিক এই ধারণার বশবর্তী থাকার ফলে, আফ্রিকায় এক যুগ আগে ইতিহাসের করুণতম ট্রাজেডি ঘটে। সে কাহিনীর জের যথাস্থানে আলোচ্য। তৎপূর্বে জাতিপুঞ্জের জাঁতীকল বা যন্ত্রশালার কিছু পরিচয় দিলে, যে কেউ নিজ সিদ্ধান্তে সহজে পৌঁছুতে পারবে।

মনে রাখা দরকার, জাতিপুঞ্জ এখনও ডাগর, মাঝারি, ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদীদের আওতায় ধুকপুক করেছে। বছর আটেক আগেকার একটা হিসাব আমার ছিল। ইদানীং ঘেন্নায় আর কৌতূহল রাখিনি। তখন জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের ২৮ জন ডেপুটির মধ্যে ১৭ জন ছিল মার্কিন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের। মাত্র ২ জন সমাজতন্ত্রী দেশ থেকে। বাকি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের। ৩৪ জন পরিচালক বা ডিরেক্টরের মধ্যে ২৮ জন মার্কিন। সংখ্যাগুলো একদম গণিতশাস্ত্রের প্রতীক নয়। নিজের ভাতে ঝোল বা শুরুয়া মাখতে আঙ্গুলের ভূমিকা সকলেই বুঝে।

এক কথায়, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি দিয়ে জাতিপুঞ্জের জাঁতিকল ঠ্যাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলে এমন ধারালো হয়ে থাকে যে অনুন্নত দেশের সুপারি নয়, মাথা ঘচাং কাট্ খুব নিমিষেই ঢুকে যেতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ হয়ত কোন প্রস্তাব নিলে। খুব মহৎ প্রস্তাব। কিন্তু তার বাস্তবায়ন ত ঐ সব ডেপুটি এবং ডিরেক্টর চামুণ্ডাদের হাতে। তাঁরা টালবাহানা থেকে শুরু করে ছতরবতর, ধরি-মাছ-না-ছুই পানি—এমন নানা পাঁয়তারা লাগাতে পারে বা লাগায় যে, মামলা সমাপ্তির পূর্বেই আসামি হাজতে ফৌৎ হয়ে যায়। আর নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের উল্টো রূপায়ণের নমুনাও ভুরিভুরি।

একটা ঘটনা বাঙালীদের মগজে সেলাই করা আছে। কারণ, নিজেরা ভুক্তভোগী। দুনিয়ার জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্মরক্ষাকারী সৈন্যদল। জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে আর্তনাদসিক্ত আবেদন এপ্রিল মাসের পয়লা হপ্তায়ই পৌঁছায়। মজকুর জনাব বৌদ্ধ, যেখানে অহিংসা পরম ধর্ম। কিন্তু বৌদ্ধ সাহেব (মার্কিন ফ্যান-লেহী সাহেব বৈকি) আর ঠোঁট ফাঁকই করেন না। একটা ধাঁধা বানানো যায় এই ঘটনার উপর। কথা বলতে গিয়ে হয়ত এক সেকেন্ডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ ব্যয় হয় ঠোঁট ফাঁক করতে। কিন্তু একটা লোকের দুই ঠোঁট ফাঁক করতে যদি দুই, দুই মাস লেগে যায়, তাহলে তার মাথাটার পরিধি পরিমাপ কি? উ থান্ট সাহেবের দু'মাস লেগেছিল কি না। কারণ, কি ঘটছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পৃথিবীজোড়া মাথা। তৎসংলগ্ন ঠোঁট অত জলদি কি করে খোলে? জলদি জলদি তিনি কিছু তকলীফ করলে, ইঁদুর-বাঁদরের মত সুলভ কয়েক লাখ বাঙালীর প্রাণ হয়ত রক্ষা পেত।

জাতিপুঞ্জের আদর্শ সম্পর্কে যাদের মোহ আছে, তা কিছু মুছে ফেলবেন। জাতিপুঞ্জের লেবেল গায়ে লাগান কি না কিছু আসে যায় না। যারা আগে অনুন্নত বলত, তারাই এখন দয়াপরবশ করেছেন ডিভলপিং বা উন্নয়নশীল দেশ। এই উন্নয়নশীল এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনও জাতিপুঞ্জে ধনী ব্যক্তির দরিদ্র আত্মীয়। ফেলে দিতে অক্ষম, কিন্তু কাছেও টানে না। তবে জাতিপুঞ্জের লেবেল কিছু 'এড' বা দান খয়রাৎ পাওয়া সহজ হয়। সেই জন্যে অসোয়াস্তি থাকা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক নয়।

অনুন্নত দেশের মর্যাদার স্তরও অনুন্নত। তা কখনও উন্নয়নশীল হয় না। ভূতপূর্ব উপনিবেশের অধিবাসীদের হাড়ে হাড়ে এই অভিজ্ঞতা খোদাই করা আছে।

আফ্রিকায় বারো বছর আগে একটি ঘটনা-প্রবাহ পৃথিবীর বিকেককে আন্দোলিত করেছিল। প্যাট্রিস লুমুম্বা আজ প্রাতঃস্মরণীয় অমর নাম সকল দরিদ্র দেশে। তাঁর নির্মম হত্যার সঙ্গে জাতিপুঞ্জ শুধু জড়িত ছিল বললে কিছুই প্রকাশ করা হয় না। আফ্রিকার প্রতিটি অনুন্নত রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের উপর পূর্ণ অন্ধ আস্থা রাখার ফলে, হারিয়েছে বিশ্বের এক অমূল্য আত্মা। "আউয়ার মুভমেন্ট ডাজ নট রিবেল এগেন্স্ট দি হোয়াইট পিওপল। উই হ্যাভ ওনলী ওয়ান এনিমী-

কলোনিয়ালিজম-অ্যান্ড নট দি ইউরোপীয়ান পিওপল।" অর্থাৎ আমাদের আন্দোলন শ্বেতব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। আমাদের মাত্র একটি দুশমন তা হচ্ছে : ঔপনিবেশিকতা। তা ইউরোপের অধিবাসী নয়। (অনুবাদ আমার) লুমুম্বার এই উদাত্ত ঘোষণার জবাব সভ্যতা গর্বিত শ্বেতাঙ্গরা কিভাবে দিয়েছিল, কোন অস্ত্রর আকারে, আজ তার পনুরোক্তি নিস্প্রয়োজন।

অনুন্নত দেশের স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদী কোন দেশের মনঃপূত নয়। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বাঙালী তা টের পেয়েছে বৈকি। কঙ্গো স্বাধীনতার সময় সাম্রাজ্যবাদীদের এক মুখপাত্র রবার্ট রুয়ার্ক যে মন্তব্য করেছিল এক যুগ আগে তার উপর নীচে দাগ দিয়ে বার বার চোখ বুলানো প্রত্যেকের কর্তব্য: "দি গ্রেটেস্ট হোপ অফ দি মানীড ইন্টারেস্ট ওয়াজ দ্যাট ইন্ডিপেনডেন্স উড ব্রিং সাচ কেয়স দ্যাট এ নিউ কাইন্ড অফ ইকনমিক কলোনিয়ালিজম মাইট বী ইমপোজ্‌ড উইথ দি হোয়াইট ম্যান কন্‌টিনিউইং টু রান থিংস, বাট আন্ডার এ ব্ল্যাক ফিগারহেড, হুজ ম্যাটেরিয়াল ওয়ান্টস মাইট ইজিলী বী অ্যাপিজড ইন ওয়াইন, উইমেন অ্যান্ড ফ্ল্যাশি কারস্‌ প্লাস এ সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।" অর্থাৎ, পুঁজিপতিদের সবচেয়ে বড় আশা এই যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এমন বিশৃঙ্খলা আসবে যে নতুন অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তার 'কালা' সাক্ষীগোপাল থাকবে। কিন্তু সবকিছু চালাবে 'ধলা'। কালা সাক্ষীগোপালের সম্পদের তৃষ্ণা-লোড সহজে মেটানোর জন্যে দরকার কিছু মদ, মেয়ে-মানুষ, ঝক্‌মকে গাড়ি আর তার সঙ্গে একটা সুইচ ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট।"

(নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রাম অ্যান্ড সান পত্রিকা- ৩০শে জুন, ১৯৬০, অনুবাদ আমার)

এক যুগ আগেকার কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নবলব্ধ। অশ্বমুখ নিঃসৃত ঐ বাণী সকলের মনে রাখা উচিত, বিশেষতঃ অনুন্নত দেশের নেতাদের শিক্ষার বা তাদের চেনার জন্যে লুমুম্বা প্রাণ দিলেন। কারণ, পঞ্চম-কার দিয়ে তাঁকে কেনা যায়নি। ১৫ই জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব নর্দমার জলে ভাসিয়ে দিয়ে মার্কিন, ব্রিটিশ, বেলজিয়াম, ফরাসি প্রভৃতি রাষ্ট্র কঙ্গোর গলা টিপে ধরল। এখনও মনে আছে, ফরাসী সামরিক জেট বিমানগুলোর পরিবহনের ব্যবস্থা করল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী। কাতাঙ্গা প্রদেশ থেকে স্থানীয় দালালরূপে খাড়া হলো কাসাভূত মোবুতুমু প্রমুখ। তারা গৃহযুদ্ধ চালিয়ে গেল। অস্ত্র যোগাল ঐ সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। কঙ্গোর খনিজ সম্পদ ইউরেনিয়াম (যা পারমাণবিক বোমা তৈরীতে অপরিহার্য) তামা, টিন প্রভৃতি থেকে তারা কি করে হাত গুটিয়ে নেবে?

এই হচ্ছে সভ্য উন্নত জাতির সভ্যতার নমুনা।

কোন নিপট কালো রঙের ফুল নেই পৃথিবীতে। তাই হয়ত প্রকৃতি আফ্রিকার অধিবাসীদের নিজের ভাণ্ডারে সাজিয়েছে। তথাকথিত কৃষ্ণকায় 'অ-সভ্যেরা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতার পতাকা উঁচিয়ে রাখতে অমনই দাম দিচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠী এ্যাংগোলা মোজাম্বিকে আজও রক্ত ও নির্মমতার স্রোত বইয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন।

জাতিপুঞ্জ খুব চটকদার প্রস্তাব পাস করে মাত্র। সাম্রাজ্যবাদীদের কুক্ষিগত প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে তার বেশী আর কি আশা করা যায়?

তবু আস্থা রাখতে হয় ওই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উর। কারণ, পৃথিবী যে ভাবে অখণ্ডতায় পৌঁছেছে, তার প্রধান প্রধান সমস্যা আন্তর্জাতিকতা ছাড়া সমাধান অসম্ভব। বিশ্বের সমাজতন্ত্র দেশসমূহ এবং অনুন্নত রাষ্ট্রবর্গ একদিন না একদিন তাদের যথাযথ মর্যাদা পাবে বৈকি। সেই আশার মধ্যেই সকল সান্ত্বনা রক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ পূর্বের 'লীগ অফ নেশন' সম্পর্কে লিখেছিলেন যে তা দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের দস্যুদলের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে অবস্থা অত শোচনীয় নয়। চীনের নীতিহীনতায় কিছু খট্‌কা লাগলেও, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ তবু নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে জাতিপুঞ্জের মধ্যে। সেখানেই বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের সকল আশা, মুক্তির আশা নিহিত।

উলঙ্গরূপে সাম্রাজ্যবাদ

রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে বাংলাদেশের অধিবাসীদের পরিচয় নতুন নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও দগ্‌দগে ঘায়ের মত হঠাৎ হঠাৎ জ্বালা ধরায়। পঁচিশে মার্চের আগেকার দুই হপ্তা কারো পক্ষে সহজে ভুলে যাওয়া কঠিন। কারণ, তার পরবর্তী নয় মাস জ্বলন্ত নরকের মধ্যে বাংলাদেশবাসীকে দিন কাটাতে হয়েছে। আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট আওয়ামী লীগের সঙ্গে নিষ্পত্তি আলোচনার জাল উপরে উপরে বিছিয়ে রেখেই এহিয়া খান এবং তার জল্লাদগোষ্ঠী গণহত্যার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। ইতিহাসে এই বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় নজির ছিল না।

কিন্তু গত ছ'দিন থেকে এহিয়া খানের রেকর্ড ভেঙ্গে গেছে। মীর জাফরী শিরোপা আর তার একমাত্র পাওনা নয়। তার নতুন দোসর জুটেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন। এখন বলা যায়, সাগরেদরা শুরু করেছিল, গুরু তা শেষ করছে। সাম্রাজ্যবাদের দেশী চেলা থাকে, প্রত্যেক অনুন্নত দেশে। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই। এহিয়া খান এবং নিক্সনেরা আসলে সাম্রাজ্যবাদরূপী পিতার যমজ পুত্র।

ভিয়েতনামের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা চলছিল গত কয়েক মাস ধরে। বিশ্বের প্রত্যেক শান্তিকামী মানুষ ভেবেছিল, গত সাতাশ বছর ধরে ভিয়েতনামের মত একটি ছোট দেশ কী নিদারুণ সাহসিকতার সঙ্গে প্রচণ্ড

দুঃখের অগ্নিকুণ্ড বুকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে লড়ছে, এবার তার সমাপ্তি ঘটবে। মানুষের মৃত্যু, বিশেষতঃ অপমৃত্যু কোনদিনই সমর্থনযোগ্য নয়। ভিয়েতনামের অধিবাসীদের প্রাণের দিক থেকে যে দাম দিতে হচ্ছে, তা বীরত্বের পরাকাষ্ঠা— মনুষ্যত্ব-রক্ষার একমাত্র পথ। কিন্তু তবু বলতে হয়, এমন বিসর্জন কোনকালে কাম্য নয়। কারণ, মৃত্যুর যূগকাঠে প্রাণের বলি পৃথিবীকে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র করে রাখে।

গত আঠার বছর জেনেভা চুক্তির প্রতি কোন সমীহ না রেখে, বিশ্বের বিবেকের মুখে বুটের লাথি চালিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বর্বরতার এবং নৃশংসতার নজির স্থাপন করছে, তা কেবল নরাকার জন্তুদের পক্ষেই সম্ভব। সভ্যতার বড়াই অন্তত মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর মুখে শোভা পায় না। এতদসত্ত্বেও ভাবা গিয়েছিল এতদিনে তাদের চৈতন্য ফিরেছে। কিন্তু জীববিশেষের লেজ এখন দেখা যাচ্ছে অত সহজে সোজা হয় না। সার্জেন্ট কেলীরা আবার মাই লাই গ্রামে ফিরে গেছে আরো হিংস্র নখর ও দন্তে সজ্জিত। এবার সাম্রাজ্যবাদ একদম ন্যাংটা ময়দানে নেমেছে। প্রত্যেক দূতাবাসকে সেই দেশের অংশরূপে গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এই রেওয়াজ বহু শতাব্দী থেকে চালু আছে। কিন্তু পেন্টাগনের জানোয়ারেরা তা আর মানতে রাজী নয়। তাই বোমা পড়ে ফরাসী দূতাবাসে। কিউবার দূতাবাস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয় দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অথচ দেখা গেছে, ভিয়েতনামের নেতাগণ সবসময়ই শান্তিকামী। প্রতিবারই মার্কিন জল্লাদেরা তা ভেস্তে দিয়েছে। কারণ চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। এইসব ব্যাপারে সুসভ্য মার্কিনরা কী কমে মিথ্যের বেসাতি করে, তার জন্যে অতীতের একটা ঘটনা বুঝার জন্যে যথেষ্ট।

১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট মস্কো, প্যারিস ঘুরে ওয়াশিংটনে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জনসন এবং তার সহচর ডীন রাস্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভিয়েতনামের বিবাদ চুকিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা প্রথমে আধা-সরকারী এবং গোপন পর্যায়ে রাখা ভাল। উ থান্ট এই মত পোষণ করেন। সেক্রেটারী জোনারেল তখন মস্কোর মারফত হো চী মীনের কাছে সংবাদ পাঠান। ঋষিতুল্য ভিয়েতনামী প্রেসিডেন্ট সম্মতি দেন যে, মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তিনি রাজী আছেন। জাতিপুঞ্জে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তখন এ্যাডলাই স্টিভেনসন। তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে উ থান্ট রাষ্ট্রদূত এ্যাডলাই স্টিভেনসনকে জিজ্ঞেস করেন, ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া কি? মার্কিন রাষ্ট্রদূত জবাব দিয়েছিলেন, ক্যানাডাকে এ ব্যাপারে তাদের স্থানীয় প্রতিনিধির সাহায্যে হ্যানয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু হো চী মীনের আলাপ-আলোচনায় তেমন আগ্রহ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ থান্ট অবাক। তিনি জবাবে খুব নরমভাবেই বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট হো ব্যাপারটা অতি গোপন রাখতে বলেছিলেন। সুতরাং তৃতীয় পার্টি তা ক্যানাডা বা যে দেশেই হোক– আসার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া হ্যানয়ে অবস্থানকারী ক্যানাডার রাষ্ট্রদূতকে তিনি জিজ্ঞেস করে দেখেছেন। ক্যানাডার রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট হো চী মীনের সঙ্গে কোন কথাই বলেননি।

সভ্য জাতির নৈতিকতার নমুনা আশা করি, এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিথ্যের বেসাতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনই খেল হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা আরো গড়িয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভেনসন তখন নিজের উদ্যোগে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে জিজ্ঞেস করেন, কিভাবে কথাবার্তা আবার শুরু হতে পারে? উ থান্ট রেঙ্গুনে বরাদ্দ দেন এবং বলেন যে, বার্মা তার জন্যে রাজী আছে। ওয়াশিংটনে খবর গেল। তখন জনসন আর রাজী হননি। কারণ, এমন আলোচনায় গেলে, সায়গনের সরকার নাকি আর টিকবে না।

এইভাবে সভ্য মার্কিন শাসকগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক বহু কলঙ্কের জন্মদাতা। অবিশ্যি তা নিয়ে তাদের কোন লজ্জা বা মাথাব্যথা আছে মনে করা অনুচিত। গত এক হপ্তার ঘটনা থেকে তা আরো স্পষ্ট।

আসলে, যদিও বলা হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তার কলুষ জঘন্য-রূপ আর নেই বা উনবিংশ শতাব্দীর কায়দায় আর প্রকাশ্য বর্বরতা দেখাতে অসমর্থ– কথাটা নিতান্ত ভুল। এটা ঠিক, সাম্রাজ্যবাদ হাত-পা গুটিয়ে নিলেও তার নখ সুযোগমত বের করতে আদৌ পেছপা হবে না। আঁতে ঘা লাগলেই জানোয়ার আবার জীবধর্ম প্রকাশে কসুর করবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নাকি বৈষ্ণব হয়ে গেছে অনেকের ধারণা। বুড়ো বাঘ এখন মালা জপ করে। কিন্তু ফরাসী ব্রিটিশ জল্লাদেরা মিসর আক্রমণের সময় আদৌ বার্ধক্য দেখায়নি। তাদের আত্মার কুষ্ঠক্ষত তখন স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। সেই যুদ্ধের সময় বৈদেশিক সচিব অ্যান্টানী ইডেন হাউজ অফ কমন্সে প্রকাশ্যে জাহির করেন, "সুয়েজ বন্ধ হয়ে গেলে, ইংল্যান্ডে পুওর রিলিফ (দুস্থদের সাহায্য দিই) এবং অন্যান্য দাতব্য কাজ আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে।" কংগোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একত্রে তিন শকুনীর মত– বৃটিশ মার্কিন এবং বেলজিয়ামী সাম্রাজ্যবাদীরা। শহীদ লুমুম্বার কথা অনুন্নত দেশের বিবেক ভীরু মানুষেরা অত সহজে ভুলে যেতে পারে না। মোজাম্বিক, আংগোলায় দক্ষিণ আফ্রিকার 'নরপশুরা টিকে আছে আবার এই সব স্যাঙ্গাতদের নেপথ্য যোগসাজশে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও আড়ালে–সাম্রাজ্যবাদের দুই রকমের বর্বরতাই আজ বিশ্বময় বিদিত। ভিয়েতনাম তাদের নোংরা খাসলতের কোন নতুন রূপ নয়।

নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসীরা অনুন্নত এলাকায় এড বা খয়রাতদাতা

AMARBOI.COM

এই হিতাকাঙ্ক্ষীদের যত ভাল করে চিনে রাখে, তাদের ততই মঙ্গল। ভিয়েতনামের যুদ্ধ আমাদেরও যুদ্ধ। তাদের বিজয় আমাদেরও সাম্রাজ্যবাদ-লালিত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বাঁচার গ-ানি থেকে মুক্তি দেবে। স্বর্গীয় হো চী মীন তাঁর দেশবাসীকে বাঁচার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, যে-কোন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, তাই সকল অনুন্নত দেশের লড়াই। এই সংগ্রাম অবিভাজ্য। মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক মহান নেতা। তাই হাজার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দারুণ অবজ্ঞায় সাম্রাজ্যবাদীদের কর্ণপটে তারস্বরে ঘোষণা করে যেতে পারেন, "টু ডে ইট ইজ এ কেস অফ দি গ্র্যাসহোপার পিটেড এগেনস্ট দি এলিফ্যান্ট। বাট টুমরো দি এলিফ্যান্ট উইল হ্যাভ ইটস গাটস রীপড আউট....... । আজ ব্যাপারটা হয়ত হাতীর বিরুদ্ধে ঘাসফঁড়িঙ্গের মোকাবিলা। কিন্তু আগামীকাল হাতির নাড়িভুঁড়ি চড় চড় শব্দে ফেড়ে ফেলা হবে।" (হো চী মীন)।

বিশ্ব-বিবেকের সঙ্গে আমরাও সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকব।

কালের চেতনা

"স্টেশন মাস্টার সাহেব, সকাল দশটার গাড়ি ক'টায় ছাড়বে?"

রেলগাড়ী চলাচলের অনিয়ম থেকে এমন রসিকতার উৎপত্তি।

টাইম-টেবিল সময় দেওয়া থাকে। কিন্তু কোন গাড়ীই তদনুযায়ী গন্তব্যে পৌঁছায় না বা স্টেশন থেকে ছাড়ে না। আকসার দেখা যায়, লেট হয়। এই বিলম্বতা নিশ্চয় বিরক্তির। বহু প্যাসেঞ্জারে অসুবিধা ঘটে।

এই ক্ষেত্রে সময় সম্পর্ক চেতনার অভাব কারো নেই কোন দিকে। রেল কর্তৃপক্ষ অথবা প্যাসেঞ্জার কেউই কাল সম্পর্কে নির্বিকার নন। অসুবিধা ঘটে যান্ত্রিক কারণে। অথবা অন্য কারণও থাকতে পারে। কাল বা সময় সেখানে বড় উপাদান বা ফ্যাক্টর নয়। উভয়পক্ষই কাল-সচেতন।

কিন্তু সময়ের উপস্থিতি অনেকে বেমালুম ভুলে থাকে। তাদের দশা সেই বালকের মত যে তার অগ্রজের চেয়ে বয়সে বড় হতে চেয়েছিল। তার যুক্তি পুরাতন কাহিনী। অনেকে হয়ত জানেন।

"আমার বয়স এখন পাঁচ আর মিয়া ভায়ের বয়স আট। চার বছর পরে আমার বয়স হবে— ছয়-সাত-আট-নয়। তখন আমার বয়স হবে, ওর চেয়ে এক বছর বেশী।"

সরলমতি এই বালক হিসাবে ভুল করেনি নিজের দিক থেকে। কিন্তু সময় ত তার একার নয়। তা সে জানত না। সময়ের নিজস্ব প্রবহমানতা আছে কচি বালকের পক্ষে তা জানারও কথা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা আরো ব্যাপক বিস্তার ঘটে। অর্থাৎ, কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়, গোটা কওমকে-কওম, জাতিকে-জাতি, দেশকে-দেশ নিয়ে ওই একই কাণ্ড ঘটতে পারে। অর্থাৎ তাদের কাছে কালের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

অনেকে ভাবতে পারেন, তবে ত সে দেশ বা কওমের মধ্যে ঘড়ির চল নেই? না, ঘড়ি কেন, আধুনিক যান্ত্রিক যুগের আশ্চর্যতম আবিষ্কার কম্পিউটার পর্যন্ত তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে থাকতে পারে, তবু তারা কাল সম্পর্কে নির্বিকার। একদম অচেতন বলতে পারেন।

ঘড়ি আছে, কম্পিউটার আছে, অথচ এমন ধাঁধা লাগানো সন্দেহ? অনেকের কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে বৈকি। কিন্তু একটু গভীরে তলিয়ে দেখলে আর কোন দ্বন্দ্ব টিকবে না।

কালের পরিধি ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সহজভাবে বললে, এই তিন পর্যায়ে বিস্তৃত। কিন্তু পূর্বোক্ত কওম বা দেশে কেবল একটি কাল থাকে। তা নিকট বর্তমান। তাহলে কী দূর বর্তমান আছে নাকি?

এইখানে বেশ গোলমাল লাগার কথা। ইতিহাসে আধুনিককাল বুঝাতে একশ' দেড়শ' বছর কিছু নয়। তা নিকট-অতীতরূপে ধরা হয়।

কিন্তু যখন ব্যক্তি জবাবে বলে, "আমার মেজ ভায়ের কথা জিগান? তিনি বহুদিন মারা গেছেন। উঃ দেখতে-দেখতে পাঁচ বছর হয়ে গেল।" তখন এই লোকটির কাছে পাঁচ বছরই দূর অতীত। তাই সে যোগ করে 'বহুদিন'। কালের এমন নিকট-দূর ভেদাভেদ আছে অনেকে জানে না। বহু দেশ জাতি থাকতে পারে যেখানে নিকট-বর্তমান সম্পর্কে চৈতন্য হয়ত আছে, কিন্তু কালের প্রবাহ তাদের অবগতির বাইরে। সংক্ষেপে বলা যায়, এমন জাতি বা কওমের কাছে কাল কোন ধর্তব্যের ব্যাপার নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভূতাত্ত্বিকদের নিটক দু-চার হাজার বছর ত পান্তা ভাত। হিসাবের মধ্যে গণ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান-আসানসোল এলাকায় কুড়ি হাজার বছর পূর্বে বরফ পড়ত। ভূতাত্ত্বিকরা হিসাব মারফত বের করেছেন। সেই জন্যে ওই অঞ্চলে বর্তমানে কয়লার খনি এত ব্যাপক। কুড়ি হাজার বছর। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীদের কাছে তা যেন গতকাল কি গত পরশুর ব্যাপর। কারণ, লাখ লাখ বছর নিয়ে ওরা কারবার করেন। সুতরাং কুড়ি হাজার বছর পান্তা ভাত ছাড়া আর কি মনে হবে?

কোন কওম, জাতি দেশ কাল-সম্পর্কে কি স্বেচ্ছায় নির্বিকার থাকে?

আদৌ না।

কালের চৈতন্য মানে চলমানতার চৈতন্য। অর্থাৎ, পৃথিবীতে কোন জিনিসই স্থির অবিচল থাকে না, থাকতে পারে না। পরিবর্তন এই পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রধান শর্ত। এই চলমানতা সম্পর্কে নির্বিকার কেউ থাকতে অক্ষম। পৃথিবীতে বাস।

সকালে মানুষ সূর্যোদয় দেখে। সূর্যও কক্ষপথে এগোয়। সকাল চলে যায়, দুপুর আসে, বিকেল পরবর্তী পর্যায়ে। তারপর সন্ধ্যা। তখন সূর্যের আর অস্তিত্ব থাকে না। পরিবর্তন এমনই প্রতি পদক্ষেপে জানান দিয়ে যায়। নদীর স্রোত কার না চোখে পড়ে কোন না কোন সময়? প্রবহমান জলের অস্থিরতা স্বাভাবিক। পরিবর্তন বাঁচার একটি বড় শর্ত।

অথচ কোন কোন কওম তা অস্বীকার করে বসে। কেন এমন পরিস্থিতি? পরিবর্তনের বিপরীত পর্যায়ে স্থাণু অচল, চিরন্তন, শাশ্বত, স্থির প্রভৃতি বিশেষণ।

সমাজে দেখা যায়, যখন একদল পরিবর্তন কামনা করে, হয়ত তখন অন্য একদল বাধা দেয়। যারা পরিবর্তন-বিরোধী তারাই শাশ্বত, চিরন্তনের দোহাই মারে। বার বার তারস্বরে। শুধু চীৎকার নয় তারা হন্যে হয়ে হাতে হাতিয়ার তুলে নেয় অপর পক্ষের বিনাশ-সাধনে। ইতিহাসে রক্তারক্তি কাণ্ডগুলো এইভাবে ঘটে।

যারা পরিবর্তনবিরোধী তারাই সময় বা কালকে অস্বীকার করে। কারণ, সময়কে মেনে নিলে তার প্রবহমানতা মেনে নিতে হয়। প্রবহমানতা অর্থ পরিবর্তন সম্ভব। যেখানে প্রবহমানতা নেই সেখানে পরিবর্তন অসাধ্য ব্যাপার। নিজ স্বার্থেই পরিবর্তনবিরোধীরা এমন ঘাঁটির ঘাটিয়াল সেজে বসে।

এখানে প্রশ্ন, কারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। দেখা যায়, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই শিবিরে জমায়েত হয়। এবং দেখা যায়, এই স্বার্থ ইহজাগতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। একটা উদাহরণ তৎপূর্বে দেখা যায়, আরো বিশদ আলোচনার ভেতর প্রবেশের পূর্বে।

বসন্তকাল। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। বিকেল বেলা। এক ধনী ব্যক্তি রিকশায় চড়ে আছেন। গায়ে তার মধুর মধুর বাতাস লাগছে। ফুলের গন্ধও দূর থেকে সেই সঙ্গে ভেসে আসছে। রিকশার প্যাসেঞ্জার খোশ-মেজাজে ছিলেন। তার তো গান গাইতে ইচ্ছে করে। এবং স্বভাবতঃই তখন তার নিকট মনে হয়, পৃথিবীর মত বাসযোগ্য এমন জায়গা আর কোথাও নেই। এমনই চিরকাল থাকা উচিত।

সেই সময় রিকশা ড্রাইভারের কথা ভাবুন। ওই কাজ বেশ কেন, অতি পরিশ্রমসাপেক্ষ। জওয়ান বা প্রৌঢ় রিকশাচালক যা-ই হোক না কেন, তার দরদর ঘাম ছুটছে শরীর থেকে এবং হাঁফ যেটুকু ফেলছে তা খুব স্বোয়াস্তির-সঙ্গে নয়। মেহনতি মানুষটা তখন কি ভাবছে? তার মনে নানা রকম চিন্তা-ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু তখন তার কাছে প্রাণান্তকর পরিশ্রম থেকে রেহাই পাওয়া সবচেয়ে সুখবর, কামনা। প্যাসেঞ্জারকে যথা জায়গায় কোন রকমে নামিয়ে দিতে পারলেই তার সকল স্বোয়াস্তি। অর্থাৎ, সে তার বর্তমান অবস্থান থেকে মুক্ত হতে চায়। সে কল্পনা করে তেমনই পরিবেশের কথা যেখানে মেহনত এমন ক্লান্তিকর এবং দুঃখময় নয়। কারণ, এত পরিশ্রম সত্ত্বেও মহাজনের জমার টাকা শোধ করার পর তার নিজের এবং তার পরিবারের মুখে অন্ন ঠিকমত পৌছায় না। রিকশা ড্রাইভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিবেশের পরিবর্তন চাইবে বৈকি? সে নিশ্চয় কামনা করবে, এমন ব্যবস্থা থাক, দৈনন্দিনতার যেখানে মহাজনের প্রাপ্য মিটিয়েও তার খাওয়া-পরার অভাব থাকবে না। সে হয়ত অপরের কাছে শুনতেও পারে, গরু-ছাগল-ঘোড়া প্রভৃতির মত এদেশে মানুষকে মানুষ টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু যন্ত্রে উন্নত দেশে রিকশাই নেই। সে দেশের মানুষ আর যা-ই হোক, অন্ততঃ ভারবাহী পশুর পর্যায়ে পড়ে না। রিকশাওয়ালা নিজ দেশে তেমন পরিবেশের স্বপ্ন দেখবে বৈকি। অর্থাৎ, সে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন মনেপ্রাণে কামনা করবে।

কেবল বাঁচার স্বার্থেই রিকশাচালক এবং আরোহীর মনোভঙ্গী বিপরীত। একজন স্থিতাবস্থাকেই সবচেয়ে রমণীয় মনে করে। অন্যজনের কীর্তন সম্পূর্ণ বিপরীত। আরোহীর নিকট কালের চেতনা তাই দূরে থাকে।

একটি সামজে যারা কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীতে পরিণত তাদের কাছে যদ্দুর সম্ভব কালকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার ফন্দী-ফিকিরে কোন গাফিলতি দেখা যায় না। সময়কে মেনে নেওয়ার অর্থ পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া। এই জন্যেই সচেতন বা অচেতনভাবে তারা কালকে কোন পাত্তা দেয় না।

নিশি নামক প্রেতযোনি বা ভূতের কাহিনী এদেশে চালু আছে। রাত্রিকালে নিশির ডাকে আকৃষ্ট হয়ে ঘুমন্ত লোক বিছানা থেকে উঠে তার অনুসরণ করে। এখানে লক্ষণীয়, সে উঠে পড়ে ঠিক, কিন্তু তার ঘুম ভাঙেনি। ঘুমের ঘোরেই সে হেঁটে চলে। এমন অবস্থায় অনেকে প্রাণ হারায়।

যারা কাল সম্পর্কে অচেতন অর্থাৎ যারা কালহীন পৃথিবীতে বাস করে তাদের দশা ওই নিশিগ্রস্ত মানুষের মত। তারা নিজেদের কাজের কোন হিসাব-নিকাশ করে না। এক নিশিগ্রস্ত মানুষকে দেখা গেল, বিলে ডুবে মরেছে। গ্রামবাসী দেখলে তার লাশ ভাসছে। তা থেকে স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্তে আসা যায়, ঘুমের মধ্যে লোকটা নিশির ডাক অনুসরণে বিলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। আরো নানা রকম অপঘাতে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। আসল কথা, লোকটা ঘুমের মধ্যে হেঁটেছে। নিজের কাজের পরিণামের চেতনা তার ছিল না।

গোটা কওম-জাতি অমন নিশির শিকার হতে পারে। যখন কোন জাতি-কওম নিজের কার্যাবলীর হিসাব নেয়, না, ফলাফল সম্পর্কে নির্বিকার থাকে, তখন বুঝতে হবে ওদের নিশিতে পেয়েছে। তার দরুন, গোটা জাতি-দেশ-কওমকে প্রচণ্ড দাম দিতে হয়। তাকে ব্যক্তিগত নয়, কওমী আত্মহত্যা বলা চলে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বছরের পর বছর হয়ত চিরাচরিত উৎসব এক জনগোষ্ঠী পালন করে যাচ্ছে। উৎসবের মূলে উদ্দেশ্য ছিল মানুষের আত্মিক উন্নতি– সুষম সমাজ সৃষ্টি। দেখা যায়, বর্তমানে উৎসবের ঘটা বাড়ছে বছরের পর বছর, কিন্তু অন্যদিকে সমাজের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ধাপে ধাপে অবনতির দিকে। দেশে চুরি-চামারি, ডাকাতি, অর্থলোভ, গুপ্ত খুন, দাগাবাজি, অবিচার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলুম প্রভৃতি নানা সামাজিক অনাচার বিপুল পরিমাণে বেড়ে চলছে। যারা ঘুমের মধ্যে হাঁটে তারা যেমন হিসাব দূরে ঠেলে রাখে, নিশিগ্রস্ত কওমেরও সেই দশা। কাল-চেতনা তারা দূরে হটিয়ে রাখে। কারণ, কাল-চেতনা থাকা অর্থ পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া। কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ সেখানে অপরিহার্য শর্ত। কারণ, কী করছি তার ফলাফলের দিকে চোখ না রাখলে কাজ ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। তার পরিণাম চরম মানবিক দুর্দশা বা শ্রমের অপচয়।

কাল-চেতনাহীনতা তাই এক রকমের চরম সামাজিক অপরাধ। কিন্তু স্বার্থ এমনই জিনিস যে এক শ্রেণীর মানুষ অমন নিশিগ্রস্তির আপিম সরবরাহ করে যায় বহুকাল ধরে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন জাতির বিবরণ ইতিহাসে আদৌ অল্প নয়। যাদের কাল-চেতনা থাকে না, তাদের স্থান-চেতনাও থাকে না, আমাদের পূর্বোক্ত নিশিগ্রস্ত ব্যক্তি যে বিলে ডুবে মরেছিল, তার কারণ, তার ত স্থান-চেতনা ছিল না তখন। বিল কি খানা-খোন্দল কোথায় সে পা ফেলেছে তা তার অবগতির বাইরে। কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তার পদক্ষেপের ফলে— এসব হিসাব-নিকাশ বালাই তার মধ্যে ছিল না।

মোদ্দা কথা, যখন কোন কওম-জাতি-দেশ তার ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গলের হিসাব-নিকাশ করে না, তখন বুঝতে হবে তারা নিশিগ্রস্ত অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

AMARBOI.COM

আরো নিঃস্ব তৃতীয় বিশ্ব

১

পৃথিবীর বিগত দেড়শ' বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, দুটি সামাজিক ফোর্স (শক্তি) একে অপরের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথমটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। উন্নততর যান্ত্রিক সভ্যতার বলীয়ান এই ফোর্স কাঁচামালের সন্ধানে পত্তন-কালে হন্যে হয়ে ওঠে। তারই পরিণাম, কলোনিয়ালিজম বা ঔপনিবেশিক আধিপত্য। ধীরে ধীরে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ ওই আগ্রাসনের মুখে স্বাধীনতা হারায়। উলঙ্গ শোষণে জর্জর এই সব দেশে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কাঠামো এমনই যে, ঔপনিবেশিক প্রভুরা নিজের দেশের কৃষক, মজুর ও অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ না করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। সুতরাং খোদ ইউরোপের বুকেই শুরু হয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। তা-ই বর্তমানে সমাজতন্ত্র নামে বিশ্বময় খ্যাত। একই সময়ে উপনিবেশেও শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। বিগত একশ' বছরের পটভূমির দিকে তাকালেই আজ স্পষ্ট দেখা যায় দু'টি যুযুধমান সোশ্যাল ফোর্স। একটি শোষক-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার যোগফল। অন্যটি প্রতিদ্বন্দ্বী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোশালিজম বা সমাজতন্ত্র — সহযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই অর্থনৈতিক ভিত্তির দিকে চোখ না রাখলে বিগত শত বছরের ইতিহাসের তাৎপর্য আদৌ বোঝা সম্ভব নয়। দুই শিবিরের মধ্যে যুদ্ধের কোন বিশেষ স্থানীয় রূপ যা-ই হোক না কেন, দুই সমাজ-ব্যবস্থা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট।

অতীতের আলোচনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ক্ষুদ্র পরিসরে তার জের টানা অযৌক্তিক। গত চল্লিশ বছর ত সাম্প্রতিক ঘটনা। সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেই অতীত এবং বর্তমানের ছবি কারো কাছে ঝাপ্‌সা থাকবে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে ১৯৩৯-৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তার ফলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরাট রূপান্তর শুরু হয়। অন্যদিকে উপনিবেশগুলোয় স্বাধীনতার লড়াই আরো জোরদার হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চতুর্দিক সামাল সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির চোটে নাস্তানাবুদ। এমন বিপাকে পড়ার ফলে, সাম্রাজ্যবাদের ভোল পাল্টানো ছাড়া উপায় থাকেনি। তার রাজনৈতিক কৌশলই উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দান। উপনিবেশের সার্বভৌমত্ব আবার স্থানীয় দেশবাসীর কাছে ফেরত গেল। সোজাসুজি সাম্রাজ্যবাদী দায়িত্ব ওই সব মুলুকে আর রইল না। তার ফলে দেখা গেল, প্রাক্তন উপনিবেশ দেশেও পুঁজিবাদী উন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ বাজারেও কিছু বিস্তার। বিদেশী সাহায্যও ওই সব দেশে পুঁজিবাদী বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে। এই ভাবে পুঁজিবাদ নবজন্ম লাভ করল। আরো দেখা গেল, রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে আসার ফলে তার বিনিময়ে স্থানীয় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীও সাম্রাজ্যবাদীদের কিছু কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে রাজী। এক কথায়, প্রায় অধিকাংশ স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লেজুড় হয়ে পড়ল। রাজ্যশাসনে সেনাবাহিনী প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটল। পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অঙ্গনে তাঁদের সেনাবাহিনী উপনিবেশ শাসন করত। এখন এই জায়গায় অধিষ্ঠিত হ'ল দেশী সেনা। বাইরে থেকে আজও মনে হতে পারে, বিদেশী কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু আবহে সাম্রাজ্যবাদ রয়ে গেল। কারণ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ম্যানুফ্যাক্‌চারার (উৎপাদনকারী) তারাই। সুতরাং প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রভুদের সাহায্য ছাড়া উপায় থাকে না। অর্থাৎ, চাবিকাঠি তাদের হাতে। প্রয়োজন হলে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনী ছুটেও আসতে পারে। তবে অকুস্থলে রইল স্থানীয় দেশী বাহিনী। এক কথায় বলা যয়, সোজাসুজি নিয়ন্ত্রণ চলে গেলেও অপরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে রয়ে গেল। আধুনিক মারণাস্ত্রের ছোটখাটো পার্টস (যন্ত্রাংশ) তৈরী করার ক্ষমাতও অনেক অনুন্নত দেশের হাতে নেই। এটুকু থেকেই গোটা পরিস্থিতি আন্দাজ করা যায়। অনেক দেশ সাধারণ "কাঁদুনে গ্যাস" তৈরী করতে অক্ষম।

সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুর্বল হয়ে গেল। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতে অনেক ফাটল দেখা দিল। কিন্তু বুনিয়াদ ধসে পড়ল না। বরং প্রাক্তন উপনিবেশে নতুন অংশীদার জুটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী অস্তিত্ব বাজারে পথ আরো প্রশস্ত করল। বলা বাহুল্য, এই অংশীদার হলো, প্রাক্তন-উপনিবেশ কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন দেশের নয়া শাসকগোষ্ঠী। সাম্রাজ্যবাদের পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার এই রূপান্তরের পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত, যে-কোন অনুন্নত দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পদক্ষেপের জন্যে অপরিহার্য। সাবেক প্রভুগোষ্ঠী এখন প্রেতের মত অশরীরী। যেহেতু সোজাসুজি রাষ্ট্রদণ্ড পরিচালন করে না, সুতরাং অশরীরী প্রেতের মত আরো বিপজ্জনক।

২

অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রী শিবিরও ক্রমশঃ আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মহাচীন, পূর্ব ইউরোপের বহু দেশ সমাজতন্ত্রী ছাউনির তলায় এসে যায়। এই সব অনুপ্রেরণায় অনুন্নত দেশে গণতান্ত্রিক শক্তিও জোরদার হয় নতুন উদ্দীপনায়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শিবিরও আর এক সঞ্জীবনী শক্তি ফিরে পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজব্যবাদ ধনে-বলে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র জুজুর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর ধ্বংসোন্মুখ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আবার চাংগা করে তুলতে এগিয়ে আসে আমেরিকা।

AMARBOI.COM

তখন থেকে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতন্ত্রী শিবিরে "ঠাণ্ডা যুদ্ধ"। রাশিয়াকে চিত্রিত করার হলো আগ্রাসনকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে। আর তার ফলেই নাকি ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনকে উস্কানি দেয়া হচ্ছে। তখন আরো প্রচার করা হয় যে, প্রয়োজনমত লাল ফৌজ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জয় করে ফেলবে রুশ সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা মেটানোর জন্যে। এই 'মীথ' বৃথা যায়নি। মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যে পশ্চিম ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা সে-যাত্রা টিকে গেল। তখন আণবিক বোমার একচেটে মালিক ছিল আমেরিকা কিন্তু রাশিয়ার ওপর কলঙ্ক সম্পূর্ণ বানোয়াট ব্যাপার। পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশের জনগণই বিপ্লবী অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয় শোষণ-শাসনের প্রতিক্রিয়ায়। রাশিয়ার কুৎসা রটানো ইতিহাসের বিকৃতি। এক কথায় বলা যায়, মার্কিন সহায়তায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আরো আয়ু লাভ করে। কিন্তু জুনিয়ার অংশীদাররূপে।

এই পরিস্থিতিতেও অনুন্নত দেশের মানুষের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, সংকুচিত বিশ্বে—পূর্বেও যেমন ছিল, আজও তেমনই—সর্বপ্রকার উন্নতির বাধা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর ভেতর যে নয়া শাসকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তাদেরও সাম্রাজ্যবাদ প্রলোভন উৎকোচ ইত্যাদি সহযোগে এজেন্ট বানিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলে। তখন প্রত্যেক অনুন্নত দেশেই দেখা দেয় সামাজিক অস্থিতি। আভ্যন্তরীণ এত সব স্ববিরোধ জড়ো হয় যে দেশের উন্নতি প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খায়। আর ফলে, দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ শোষণের জগদ্দল থেকে আর মুক্তি পায় না।

৩

স্বাধীন হলেও অনুন্নত দেশের সম্মুখে অতীত পরাধীনতার জের হিসাবে হাজার সমস্যা খাড়া হয়। তার মোকাবিলা অত সহজ নয়। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সম্পদ ত অঢেল নয়। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় তারাও দরিদ্র। সুতরাং সৎ ইচ্ছা থাকলেও তারা তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে এগিয়ে আসতে অক্ষম। বহু সদ্যস্বাধীন দেশে সোজাসুজি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে বহু বাধা থাকে। তারাও আর দ্রুত এগোতে পারে না। দেশপ্রেমিক তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের নিকট ফলে কঠিন উভয় সংকট দেখা দেয়।

প্রগতির পথ তাই আদৌ মসৃণ বা সরল নয়। দেশপ্রেমিক নেতাদের নিকট এই এক দারুণ শিরঃপীড়া। সাম্রাজ্যবাদরে শ্যেনচক্ষু সর্বদা তাদের উপর থাকে যেন বিদেশী পুঁজির প্রতিকূল কোন নীতি নেতারা গ্রহণ করতে না পারে।

আবার প্রত্যেক অনুন্নত দেশে খাদ্যসমস্যা বিরাট। সেখানে একমাত্র ভাণ্ডারী আমেরিকা—যাদের খাদ্যের পরিমাণ প্রচুরভাবে উদ্বৃত্ত। খাদ্যও বর্তমান যুগে রাজনীতির একটা বড় কলকাঠি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তা বেশ জুৎমত এদিক-ওদিক ঘোরায়। বাংলাদেশের অধিবাসীদের তার নির্মম অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষ রাজনীতিরই খেল্। মার্কিন গম যথাসময়ে এসে পৌঁছাল না। কারণ, বাংলাদেশ সরকারের সমাজতন্ত্রমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে তখন বিসদৃশ ঠেকছিল।

সাম্রাজ্যবাদী খপ্পর থেকে মুক্তির জন্যে তাই প্রয়োজন তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলন যেখানে নেতা ও দেশের আপামর জনসাধারণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার উদ্দেশ্যে একাত্ম এবং তার জন্যে সকলে যে-কোন আত্মত্যাগে উন্মুখ।

এই পরিস্থিতির পর্যায়ে পৌঁছাতে তাই অপরিহার্য শর্ত : নেতৃমণ্ডলী— যাদের সততা এবং নিষ্ঠা নিরেট কংক্রীট। দেশের যে-কোন অগ্রগতির জন্যে দরকার জনসধারণের সক্রিয় প্রাণের যোগ—ইংরেজেতে যাকে বলে পার্টিসিপেশান। তাছাড়া, যে-কোন পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, তা যতই বৈজ্ঞানিকভাবে সুষ্ঠু হোক না কেন।

প্রাণের যোগ আসে মানুষের দুঃসহ বর্তমানের উত্তরণের স্বপ্ন থেকে। এবং তা তখনই ঘটে, যখন জনসাধারণ এমন কোন নেতা পায়— যিনি তাদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। তখনই তাঁর পতাকার তলায় সকলে ছুটে যায়। রাজনৈতিক সাফল্য এই পথেই আসে। পরবর্তী পদক্ষেপ অর্থনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের সড়কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও নেতার প্রয়োজন থেকেই যায়, যিনি সকলকে সংঘবদ্ধ করতে পারেন। সমাজের উন্নয়নও এক ধরনের লড়াই। এই লড়াইয়ে সংঘবদ্ধ (মবিলাইজ) করার দায়িত্ব কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বে—যেখানে নৈতিক মেরুদণ্ড সাম্রাজ্যবাদ যুগ যুগ শোষণের চাপে থেৎলে দিয়ে চলে যায়। তাই অসাধারণ মহিমার কোন নেতাও তৃতীয় বিশ্বের এক বিরাট ঐশ্বর্যশীল সম্পদ।

সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু কখনও ঘুমিয়ে থাকে না অনুন্নত দেশের ব্যাপারে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এমন ক্ষেত্রে সদা জাগ্রত। পৃথিবীময় তাদের নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা। কুখ্যাত সিআইএ-এর জাল বিভিন্নভাবে প্রসারিত থাকে। এমন সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অনুন্নত দেশে তারা এজেন্ট তৈরী করে রাখে। যদি তৃতীয় বিশ্বে অসাধারণ কোন নেতার উদয় ঘটে, তার বিনাশের সিদ্ধান্ত নিতে ওরা এতটুকু কার্পণ্য দেখায় না। এমন নাশকতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকে এবং দাঁও খোঁজে। পৃথিবীর সমস্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নারকীয় ভূমিকায় এখন পয়লা সারির চ্যাম্পিয়ন সদা শান্তি-ঘোষণাকারী, খ্রীস্টান ধর্মের অনুসারক, অতি সভ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। স্থানীয় দেশী এজেন্টরা ত নিমিত্ত মাত্র।

বর্তমানে স্পষ্ট দেখা গেছে যে, মহিমাময় কোন নেতার স্পর্শ ব্যতীত অনুন্নত দেশের যুগযুগান্তের-পর পদানত জনসাধারণের সুপ্ত মানবিক শক্তি জাগ্রত করার আর কোন আশু উপায় নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা জানে এবং সেইভাবে সক্রিয় থাকে।

৪

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। আজন্ম গোলাম বাঙালী মুসলমানকে যাঁর নেতৃত্ব দান করে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পার্থিব অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কতিপয় দেশী দালালদের সহযোগিতায়। এই করুণ মৃত্যু বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে অসংলগ্ন কোন ব্যাপার নয়।

সাম্রাজ্যবাদ শুধু ভাতে মারে না। জাতেও মারে। ভাতে মারার অন্যতম কৌশল পূর্বে জাতি মারা। তথাকথিত উন্নত সভ্যতার ঝিলিক চোখ ধাঁধিয়ে, অপসংস্কৃতির পঙ্কিল স্রোতের সাহায্যে সমাজে এক শ্রেণী ওরা তৈরী করে ফেলে- যাদের কাছে ব্লুজীন কোকোকোলা ট্র্যানজিস্টার জীবনের চরম সার্থকতা। সাংস্কৃতিকভাবে কাউকে দেশের মাটি থেকে উপড়ে এই শিকড় শূন্য করে তুলতে পারলে— ভাতে মারার কাজ তখন আরো সহজ হয়ে যায়।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু রাজনৈতিক কারণে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেয়নি। যুগপৎ ভাতে এবং জাতে মারার ফন্দী এঁটেই তারা নিজেদের রাজনৈতিক ঘুঁটি চালনা করেছিল। রঙ্গমঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর সহসা নিষ্ক্রমণ তৃতীয় বিশ্বকে আরো নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাত্মা গান্ধী : বর্তমান বিশ্বে

১

If you fire at the past with a pistol,
the future will shoot back from a cannon.

উজবেক কবি : রসূল গামৃজাতোভ

বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেকোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে ভীতির ব্যাপার। কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছে সমগ্র মানবগোষ্ঠী?

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে ক্রান্তিকাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনও কেউ হয়নি। বহু পূর্বে প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে অস্তিত্বের সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রাণী জগতে। ডোডো, ডাইনোসোর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লোপাট হয়ে গেছে। মানবেতিহাসেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যে-বিপর্যয় শুধু পরিবেশের সঙ্গে সংগতি-স্থাপনের সমস্যা। সেখানে মানুষ কখনও জয়ী, কখনও পরাজিত। সমাজের অগ্রগতির সেখানে বিলম্ব ঘটেছে মাত্র। তার শাস্তিও ভোগ করেছে মানুষ : সমাজের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব—কখনও স্ব-শ্রেণীর মধ্যে, কখনও অন্য জাতির সঙ্গে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা-যুদ্ধ যার পরিণাম। কিন্তু সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্ব-লোপের প্রশ্ন কখনও দেখা দেয়নি। মহামারী বা অন্য সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে জনপদের পর জনপদ ধ্বংস হযে গেছে, বহু জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু গোটা মানবজাতির বিলোপের আশঙ্কা কারো মনে দেখা দেয়নি।

বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাফল্য এবং মানুষের প্রকৃতি-বিজয়ের কাহিনীর কাছে রূপকথাও হার মেনে যায়। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি মৃত্যু-খাদের বিপজ্জনক কিনারায়। এবং এই মৃত্যু কোন বক্তির মৃত্যু নয় বা কোন জনগোষ্ঠীর বিলোপ নয়-- বরং গোটা মানব জাতির নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা।

আণবিক যুগের পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা বর্তমানে অবান্তর। কারণ, তা নিয়ে বিশ্বের বিবেকবান শান্তিকামী বহু মানুষ প্রতিদিন সরব। আণবিক দানবের জন্মদাতা বৈজ্ঞানিক মহল থেকেও প্রতিবাদ উঠেছে প্রচুর। আণবিক বোমার প্রস্তুতি-পর্ব সমস্ত পৃথিবীর "একোলজি" উল্টে দিচ্ছে, যার ফলে এমন সব ব্যাধির উদ্ভব ঘটবে যে, মৃত্যুর হাতে অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না। এমন কী বহু ব্যাধি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ভ্রূণকেও স্পর্শ করবে। এই সব সতর্কবাণী বিগত তিরিশ বছর থেকেই পৃথিবীর নানা কোণ থেকে উচ্চারিত। প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা সে-বিষয়ে বিশেষ অবহিত। কিন্তু অস্ত্র-প্রতিযোগিতার বাজিদৌড় অব্যাহত আছে। এই প্রবণতা উলঙ্গ শক্তি সঞ্চয় ছাড়া আর কিছু নয়। দুই পরাশক্তি শুধু এমন প্রতিযোগিতারত, এমন বলা চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের মুখ আণবিক দানবের বেদীর দিকে ফেরানো। দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে এমন দানব-সেবা পোষায় না। কিন্তু সুযোগ পেলেই এগোতে পারে। পাকিস্তান তার নজির। অথচ, পাকিস্তানের অর্থনীতি কি এমন উদ্বৃত্ত স্তরে যে আণবিক বিলাসের দিকে এগোতে পারে? আদৌ না। আবার দেখা যায়, বহু দেশ পরাশক্তির আণবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন দুই পরাশক্তির মূলে, তারা প্রায় বলে থাকেন। কিন্তু আণবিক বোমা প্রস্তুত থেকে এমন দেশও বিরত থাকে না। তার নজির চীন। ধনী লোকের দরিদ্র আত্মীয়রা বিত্তবানদের গালাগাল দেয়। তার মূল মতলব কিন্তু সম্পর্ক ছেদ নয়, বরং বিত্তবানের পর্যায়ে না পৌঁছাতে পারার গোপন ঈর্ষা। চীনের অর্থনীতি কি আণবিক-বিলসের অনুকূল? না। তবু প্রবণতা আণবিক দানবমুখী।

বিশ্বের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানব-গোষ্ঠীকে কোথায় নিয়ে চলেছে, অনেকে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। চতুর্দিকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। আদিমকালে তা-ও ছিল। কিন্তু সে সব অস্ত্র মানব জাতি ধ্বংস করে ফেলবে, এমন কোন সম্ভাবনা কেউ কল্পনা করতে পারত না। বর্তমানে পরিস্থিতি বিপরীত।

অনেকের ধারণা, সকল জাতি আণবিক অস্ত্রধারী হলে, কেউ আর তা প্রয়োগ করবে না। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক? গুহা-মানব থেকে বর্তমান যুগের যে সভ্য মানব পর্যায়ে মানুষ পৌঁছেছে, তার মূলে ছিল অস্তিত্বের সংগ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে আপোষহীনতা। পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই মানুষের বিবর্তনধারা বর্তমান পর্যায়ে উপনীত। কিন্তু বর্তমানে তারা আপোষ করে বসবে, তার গ্যারান্টি কে দিতে পারে? তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র-জাত দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলো কুম্ভীরাশ্রুপাত করে চলেছে প্রতিদিন। সামান্য মানবিকতাবোধ থাকলে, তার অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌড় থেকে কিছুটা উদ্যম হ্রাস করত। তৃতীয় বিশ্বের অভাব-অনটন লাঘব হতো কিছুটা। কিন্তু বাস্তবে অস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় গত তিরিশ বছরে আদৌ হ্রাস পায়নি। আর তৃতীয় বিশ্বে ক্ষুধা, অকাল মৃত্যু, মহামারী এবং সামাজিক অন্তঃর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সুতরাং আপোষ করবে মানুষ, যেহেতু প্রত্যেকে আণবিক অস্ত্রধারী— এই ধারণা ভুল। কারণ তাদের মানবিকতাবোধের অভাব ত স্পষ্ট। এই বিশেষ অনুভূতি গরহাজির থাকলে মানুষ আর জন্তুর মধ্যে কোন ফারাক থাকে না। শিল্পোন্নত তথাকথিত সভ্য জাতির শাসকদের মধ্যে মানবিকতাবোধ লুপ্ত। তাই ভিয়েতনামে তিরিশ বছর যুদ্ধ চলে, নিরপরাধ কম্বোডিয়ানরা অপমৃত্যুর শিখার হয় বোমাবর্ষণে, গৃহযুদ্ধে সর্বস্বান্ত। এসবই সভ্য জাতির কাণ্ড। সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনাপোষ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যে মানুষের বিবর্তন, সেই মানুষ (এবং মানবিকতা-বোধ যখন শাসকদের লুপ্ত) আপোষ করবে এবং আণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না—এমন কল্পনা করা অন্যায়। মিশরের মরুভূমিতে পিরামিডগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ফেরাউনরা নেই। আণবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধে আর মানুষ থাকবে না পৃথিবীতে। আর কিছু না, বাতাসে ঘুরে বেড়াবে শুধু তেজস্ক্রিয় ধূলির জঞ্জাল—মানুষের গড়া শেষ পিরামিড।

২

মহাত্মা গান্ধীর ভাবমূর্তি বর্তমান বিশ্বে তাই নতুন করে খাড়া করা দরকার। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের পটভূমিকায় তিনি কতগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। বুদ্ধের বাণী: মা গৃধঃ— লোভ করো না। মহাত্মা গান্ধী জোর দিয়েছিলেন অহিংসার উপর। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি স্থাপন করেছিলেন সবার উপর মান-প্রেমের বেদী—যেখানে মানুষের জীবন চরম সার্থকতা পায়।

আণবিক বোমার ছায়ায় যেমন বুদ্ধের পূর্বোক্ত বাণী স্মরণীয়, তেমনই মহাত্মার বাণী। এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদিও সবসময় তাঁর আদর্শ পন্থা অনুযায়ী চলেনি, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজে কখনও নিজ আদর্শচ্যুত হননি। রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজ-সংস্কারক— এই যুগপৎ প্রতিমূর্তিরূপে আজও তিনি স্মরণীয়।

তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের জন্যে তিনি বর্তমানে অপরিহার্য আদর্শ। রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কার— দুই ভূমিকা একত্রে পালনের দায়িত্ব ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের আর এক দিকে দৃষ্টিপাত অবশ্য কর্তব্য।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেখা যায় সব প্রাক্তন উপনিবেশে শিল্পায়ন বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশানের হিড়িক পড়ে যায়। অর্থাৎ, যথারীতি পশ্চিমের অনুকরণে সোজাসুজি পণ্যভোগী (কনজ্যুমার্স) সমাজ গড়ার হিড়িক। তার ফলে, প্রত্যেক অনুন্নত দেশে মুষ্টিমেয় লোক নতুন পরিবেশে ফায়দা লাভ করল, কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণ আজো দারিদ্র্যের কুক্ষিগত। শুধু তাই নয়, ফায়দাভোগী শ্রেণীই শিল্পোন্নত দেশের ছোট-তরফ হয়ে পড়ল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল এই দাঁড়াল যে, শিল্পোন্নয়নের পথে এখন একদা—স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের প্রাক্তন-প্রভুদের দোসর। অর্থাৎ, স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জনে ভেসে গেল।

মহাত্মা গান্ধী অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং তাদের আবাদভূমি গ্রামের উপর দৃষ্টি রেখে তবু তিনি যে সব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা তৃতীয় বিশ্বের সকল মানুষের ভেবে দেখা কর্তব্য। কারণ, পশ্চিমের পণ্যভোগী সমাজ যে-ভাবে লুটপাট-নরহত্যা, অন্য জাতিকে দাস বানানো মনুষ্যত্বহীনতার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে, তা আজ কারো কাম্য নয় এবং সম্ভবও নয় সেই পথে এগোনো। তাই গান্ধীজীর সতর্কবাণী চোখের সামনে রেখে অর্থনীতির নতুন বিন্যাস প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশের হুবহু অনুকরণ নয়, বরং নতুন সংগতি সংযোজন। অর্থনীতিবিদরা তা ভেবে দেখবেন নিশ্চয়।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের অভিঘাত হিংসায়-উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে সহজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশেষিত হওয়ার নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে যা-ই হোক, ব্যক্তিমানবের জন্যে তিনি চিরকাল অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবেন। আমরা কি ভুলতে পারি গান্ধীজীর এই সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি? "আমার শত্রু তিনজন। ব্রিটিশ, দেশবাসী এবং আমি নিজে।" যুগের পরিস্থিতি যা-ই হোক, সব ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্ব অর্জনের এই ত পথ। ম্যাক্সিম গোর্কি লিখেছিলেন, "পরিবেশের প্রতিরোধ পথেই মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে, মানুষ হয় মানুষ।" গান্ধীজী পরিবেশ থেকে নিজেকে বাদ দেননি।

এমন বিরল ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সর্বমানবের উত্তরাধিকার এবং ঐতিহ্য।

অক্‌টোবর বিপ্লব : তৃতীয় বিশ্বে

১

পঞ্চাশ বছর কি তারও কিছু পূর্বে আমি ফরাসী লেখক অঁরি বার্বুসের (Henry Barbusse) একটি গল্প পড়েছিলাম। কাহিনীর নামও ভুলে গেছি। কিন্তু বিষয়বস্তু এখনও মনে আছে। সংক্ষেপে গল্পের ঘটনাটি নিচে বিবৃত:

ফরাসী দেশে রুশ বিপ্লবের পর জেলে এক গাদা রাজবন্দীকে আটক করে রাখা হয়েছিল। অস্বাভাবিক এমন পরিবেশে বন্দীদের সবচেয়ে বড় শত্রু : নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা। তার বিরুদ্ধে লড়াই দিন গুজরানের একটি বড় শর্ত। আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন বিষাদের নানা আবেগ আটক লোকগুলোর মনের ভেতর সৃষ্ট হয়। তখন প্রত্যেকেই এসব জুলুম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আপন-আপন উপায় উদ্ভাবন করে। জেলের ভেতরে থাকলে উদ্বেগ কম উঁকিঝুঁকি মারে না। কি ঘটছে এখন বাইরের জগতে? এই প্রশ্ন তো প্রায়ই সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অহরহ। তার ধরনও অসংখ্য। পরিবার-পরিজন কেমন আছে? রাজনৈতিক আন্দোলনের কি অবস্থা? নানা ব্যক্তির মুখ সামনে ভেসে উঠতে পারে। তাদের এক একজনকে কেন্দ্র করে বহু জিজ্ঞাসা সোজা ধেয়ে আসে। সেই জন্যে রাজবন্দীরা বাইরের খবর পেতে ভয়ানহ আগ্রহী হয়ে থাকে। কিন্তু খরব আসার তো কোনো যো নেই। প্রতিদিন খবরের কাগজ পেলে উদ্বেগ অত থাকে না। কর্তৃপক্ষ সেদিকে নিষ্ঠুর। এমন অবস্থায় একটি মাত্র পথ খোলা থাকে বাইরের সংবাদ পাওয়ার : নতুন কোনো রাজবন্দীর আগমন। সদ্য তাজা খবর সে-ই দিতে পারে। রাজনৈতিক আন্দোলনের হাল হকিকত তার কাছ থেকে সঠিক পাওয়া যায়। তা কম সান্তনা নয় এইসব রাষ্ট্রদ্রোহীদের জন্যে।

সেই জেলখানায় প্রত্যেক রাজবন্দী তাই উন্মুখ হয়ে থাকত নতুন অতিথির জন্যে। কোনো নতুন রাজবন্দী এলে তাকে ঘিরেই এক মহোৎসব হতো। প্রশ্ন আর জবাবের সেই বর্ষণে স্নিগ্ধ হয়ে উঠত জেলের আবহাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের মধ্যে এক ভদ্রলোক ছিলেন যিনি নতুন কোনো রাজবন্দী এলে কোনো কিছু জিজ্ঞেসই করতেন না। ব্যাপারটা সহযাত্রীদের চোখে পড়েছিল বৈকি। কি ধারা মানুষ? নির্বিকার থাকে কি করে কেউ এমন অসহায় নিরানন্দ পরিবেশে?

একদিন দেখা গেল, এক নতুন রাজবন্দী আগমনের মওকায় সকলে যখন তাকে ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে, তখন মজকুর ভদ্রলোক খুব ব্যস্ততাসহ এগিয়ে আসছেন। মনে হলো, তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন। এমন তো সাধারণত হয় না। ওঁর তো কোনো প্রশ্নই থাকে না। তাই ওঁর আগ্রহান্বিত মুখাবয়ব দেখে সব রাজবন্দী চুপ করে গেল। ভদ্রলোক সোজা নতুন রাজবন্দীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রাশিয়ায় কৃষক-মজদুরের একটা রাষ্ট্র তৈরী হয়েছিল, সেটা কি টিকে আছে?"

"টিকে আছে এবং থাকবে।" নবাগত রাজবন্দী জবাব দিল।

ভদ্রলোকের আর কোনো প্রশ্ন ছিল না। তিনি অন্যদের আসর ছেড়ে পরিতৃপ্ত মুখে নিজের সীটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সঙ্গীরা অবাক। এমনিতে কখনও ভদ্রলোক নতুন কেউ এলে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। আজ যদিবা মুখ খুললেন, ব্যস, ওই একটা জবাবেই তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেল? সঙ্গীরা বিস্মিত, একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করে।

AMARBOI.COM

২

বার্বুসের কাহিনী-বর্ণিত সেই ভদ্রলোকের দৃষ্টি সেদিন স্বদেশের বা একটি দেশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। অনাগত ভবিষ্যৎ মুখাবয়বে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই তো আর দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রয়োজন থাকেনি তাঁর কাছে।

৩

অক্টোবর-বিপ্লব মানব-ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। মাত্র সত্তর বছর পূর্বে সূচিত এই অধ্যায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে খুব সুদীর্ঘ কাল নয়। এমনও হতে পারত যে, সমাজতন্ত্রের প্রসার খুব ঘটেনি। অথবা, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের থাবায় শৈশবেই সমাজতন্ত্র বিনষ্ট। পৃথিবীর পুঁজিবাদীদের সেরূপ চেষ্টা কম ছিল না। সুখের বিষয়, তেমন কিছু ঘটেনি। বরং সমাজতন্ত্রের স্পর্শে পৃথিবীর আরো বহু ভূখণ্ড ক্রমশ আলোকিত। অনুন্নত রাশিয়া মাত্র পনের বছরের মধ্যে অভূতপূর্ব যন্ত্র-শিল্পায়নের যে আদর্শ স্থাপন করে তা বিস্ময় বৈকি। আর্থিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে এই শিল্পায়নের প্রতিফলন ঘটেছিল। তাই ত নাৎসী ফ্যাসিস্ট চক্রের পাশব হামলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রতিহত এবং পরে পর্যুদস্ত, নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। ফ্যাসিজমের এই যূগকাঠ ধ্বংস করতে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টসহ আড়াই কোটি রুশ নাগরিককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এই ত্যাগ বিশ্বমানবতার জন্যে ত্যাগ। নচেৎ ফ্যাসিজমের

বুটের তলায় পৃথিবীতে আর এক কলঙ্ককর মানব-অধ্যায় শুরু হতো। পৃথিবীর তাবৎ নরনারী তাই রুশ অধিবাসীদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীগণ আরো বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ সোভিয়েত রাশিয়া এবং তদীয় নাগরিক সমীপে অন্য একটি কারণে। তা বিস্মৃত হওয়া অন্যায়।

অক্টোবর বিপ্লবের সময় মহামতি লেনিন সাম্রাজ্যবাদের উপর যে লাঞ্ছনা এবং ধিক্কার বর্ষণ করেছিলেন, তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। আর অন্যদিকে, উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক বিশেষ উদ্দীপনা-প্রেরণা লাভ করে। রুশ-বিপ্লবীগণের ঘোষণা সেদিন পৃথিবীর দিকে দিকে ধ্বনিত হয়। সেন্ট্রাল এশিয়া ছিল জারশাসিত রুশ সরকারের উপনিবেশ। অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল, "রাশিয়ার মুসলমানগণ...ভোলগা এবং ক্রিমিয়ার তাতারগণ, সাইবেরিয়া এবং তুর্কীস্থানের কিরঘিজগণ... ট্রান্স-ককেশিয়ার তুর্কী ও তাতারিগণ.... জেনে রাখুন, আপনাদের বিশ্বাস-ঈমান এবং সামাজিক রেওয়াজ, আপনাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি আজ থেকে স্বাধীন এবং পবিত্রতাস্পৃষ্ট। সে-সবের উপর আপনাদের পূর্ণ অধিকার। জেনে রাখুন, আপনাদের অধিকার—সমস্ত রাশিয়ার অধিবাসীদের অধিকার— এখন বিপ্লবের শক্তিশালী হেফাজতে আছে। আপনাদের অধিকারের হেফাজতকারী এখন মজুর, সৈনিক ও কৃষকের রাষ্ট্র। বিপ্লবকে এবং তার সরকারকে সমর্থন দিন। আসুন, এগিয়ে আসুন... ।" অক্টোবর বিপ্লবের পরই রাশিয়ার উপনিবেশ ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন লেনিন।

AMARBOI.COM

উপনিবেশের শোষণ-মারফত আরাম-আয়েসের মসনদে আসীন সাম্রাজ্যবাদের লুটেরাদের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল বৈকি সেদিন। ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবের সেই বছরেই বৃটিশ সরকার মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বৃটিশ প্রশাসনে কিছু কিছু ভারতীয়দের অধিকার প্রদান করে। এই দান দয়াপ্রসূত নয়, বরং রুশ-বিপ্লবের পরোক্ষ ফল। রুশ-বিপ্লবের ফলে তখন তুরস্ক ও জার্মানী ভারতের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল। সাম্রাজ্য-রক্ষায় স্থানীয় কোলাবোরেটার-সংগ্রহের ফন্দী ওই সব মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডীয় অনুদান।

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লব ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের জমিনে বহু ফাটল সৃষ্টি করে। ১৯১৮ সালে লয়েড জর্জ বলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি Principle of Self-detarmination উপনিবেশের উপর প্রযোজ্য। মোদ্দা কথা, শাসকদের জন্তুসুলভ কামড়ের ধার আল্‌গা হচ্ছিল ক্রমশ। কয়েক বছরের মধ্যে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো জোরদার হয়। চীনে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে "মে ফোর্থ" আন্দোলন চৈনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মোড় ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রগতি। তা শুরু হয় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে। মিশরে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে "ওয়াফ্‌দ" পার্টি প্রতিষ্ঠা কোনো ভুঁইফোঁড় ব্যাপার নয়। একই বছরে টিউনিসিয়ায় 'দস্তর' পার্টির জন্ম। ওই বছর (Pan-African Congress) নিখিল আফ্রিকান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে। স্মৃতি থেকে কয়েকটা নমুনা দেওয়া গেল। এইসব আলোড়ন রুশ বিপ্লবের পরোক্ষ ফলশ্রুতি। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে বান্‌ডুং কন্‌ফারেন্স সেই ধারারই আর এক পর্যায় যেখানে এশিয়া এবং আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মিলিত হন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায়। এশিয়া-আফ্রিকার জনগণের মধ্যে যে-বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিহিত তা রুশ-বিপ্লবীদের জানা ছিল অবিশ্যি। "কংগ্রেস অফ দি পিওপ্‌ল অফ দি ইস্ট"– প্রাচ্য অধিবাসীদের এক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার বাকু শহরে। বলা বাহুল্য, তা রুশ-বিপ্লবীদের অবদান। সাঁইত্রিশটি জাতির প্রতিনিধির এই সম্মেলনে যোগদান করেন বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়। সেই সম্মেলনে আরো ভারতীয় মুসলমান ছিলেন-যাঁরা মোহাজ্‌জের নামে খ্যাত। বাকু শহরে অস্ত্রশিক্ষার পর আবার বিপজ্জনক দুর্গম গিরিপথে আফগানিস্তান পেরিয়ে মোহাজ্‌জেরগণ ভারতে ফিরে আসেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করে তোলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের এইসব পরোক্ষ অভিঘাত তৃতীয় বিশ্বের কারো চোখে না পড়ে পারে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রথম মহাযুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তা এক মহতী দোসর হয়ে ওঠে। তাই একে একে উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা ফিরে পায়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা (যদিও পাকিস্তান এবং ভারতীয় ভেদ-রেখায়) যে সাম্রাজ্যবাদীদের খর্বিত শক্তির পরোক্ষ ফল, তা অস্বীকার কারো পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই মাত্র পনের বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চল্লিশটির বেশী উপনিবেশ স্বাধীন হয় এবং পরাধীনতার কলঙ্ক-মোচনের গৌরব লাভ করে আশি কোটি লোক। এত দ্রুত ঘটতে থাকে এইসব বৈপ্লবিক কাণ্ড, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তা অচিন্তনীয় ছিল। বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৪১-৪৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানের যে পদাঘাত লাভ করেছিল, তার জের নিশ্চয় আজো বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় বিদেশী উপনিবেশ কোথাও কোথাও টিকে রইল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে। কারণ, মার্কিন, সাম্রাজ্যবাদ কোনদিন চায়নি ওইসব অঞ্চলের মানুষ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ুক। সেই জন্যে এইসব দেশে স্বাধীনতা এলো পরিপূর্ণভাবে নয়। অর্থাৎ, নামে স্বাধীন, কিন্তু শৃঙ্খলতায় আবদ্ধ।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে কোথাও কোথাও ইন্ধন যোগাতে লাগল নিজেদের স্বার্থে। যেমন, জার্মানরা উস্কানি দিতে লাগল আফ্রিকার মগ্‌রেবের অধিবাসীদের ফরাসীদের বিরুদ্ধে। বৃটিশ আর ফরাসীরা আরব জাতীয়তাবাদের বেশ সফল ইন্ধন যুগিয়েছিল ওদের তুরস্কের বিরুদ্ধাচারী করে তুলতে। মুসলমান বনাম মুসলমান। জাতীয়তাবাদী স্বার্থ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের মুখে আগুন জ্বেলে দিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধে তার উদাহরণ সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, আরব উপদ্বীপের দেশ ও তুরস্কের সংঘাত। বর্তমানে ইরান এবং ইরাক বিগত সাড়ে সাত বছর ধরে ইতিহাসের আত্মঘাতী সেই উদাহরণ জিইয়ে রেখেছে মৌলবাদীদের মুখে প্রতিদিন ছাই সংযোগ মারফত।

ইতিহসের এইসব পদক্ষেপের ছায়া কিন্তু সমাজতন্ত্রের শক্তির প্রসারের ফলশ্রুতি। ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স এবং বৃটিশ উভয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল। সেই সময় ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং বুল্‌গানিন প্রেসিডেন্ট। তাঁদের প্রচ্ছন্ন ধমকের ইঙ্গিত-বিদ্ধ পত্রের কথা তৃতীয় বিশ্বে কেউ ভুলে যেতে পারে না। বরং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করতে হয়। সোভিয়েত রাশিয়া সেদিন এগিয়ে এসেছিল তৃতীয় বিশ্বের এক নিপীড়িত জাতির দোসররূপে। যার ফলে, শক্তিমদমত্ত দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পশুসুলভ নখর সমন্বিত লোমশ থাবা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

উদাহরণ এমন আরো দেওয়া চলে যেখানে তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত রাশিয়ার পরোক্ষ বা অপরোক্ষ সহযোগিতা সহজে অনুভব করা যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থানই যথেষ্ট ঝানু সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ জুলুমের অভ্যেসকে দমিয়ে রাখতে। আফ্রিকার অধিবাসীদের গায়ের চামড়া নিয়ে তাস তৈরি করে ইউরোপীয় সৈনিকরা নিজেদের অবসর বিনোদনের বাতিক বজায় রাখত। আজ আর তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দেশের শক্তি এক দিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত। কোনো রকম উলঙ্গ, নির্লজ্জ শোষণ আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবিশ্যি ফন্দী-ফিকিরের কথা আলাদা। বর্তমানে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদীদের বহুজাতিক কোম্পানীর শোষণ তেমনই ফন্দীপ্রসূত। প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব নয়া কৌশল পশ্চাদপসরণের ফলশ্রুতি। সেই পটভূমিকায় অক্টোবর বিপ্লবের বহুধা গতিধর প্রবাহ-ধারা মানবপ্রেমিকগণের চোখে এক বিস্ময়কর ঝিলিক-রূপেই প্রতিভাত হয়।

এতদসঙ্গে আরো কয়েকটি দিক বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের চোখে পড়া একান্ত আবশ্যক।

৪

পুঁজিবাদী আদর্শের মোকাবিলায় অক্টোবর বিপ্লব এক মহতী চ্যালেঞ্জ। সাম্রাজ্যবাদীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে তৃতীয় বিশ্বে দুই তিন শতকে স্থানীয় অধিবাসীদের মানবেতর পর্যায় থেকে সামান্য উর্ধ্বে তুলে আনতে পারেনি, সেখানে দুই শতকে তথাকথিত অনুন্নত জনগণকে কোথায় উন্নত করা যায়, তার উদাহরণ সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি। প্রাক্তন জারশাসিত উপনিবেশ কিরঘিজিস্তান, তাতার, উজবেকিস্তান প্রমুখ অধিবাসীদের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নীত জীবন-যাপনের মান কোনো কল্প-কাহিনী নয়। পরিসংখ্যান সেখানে বিরাট সাক্ষী। প্রতি দশকেই সেখানে সংখ্যাগুলো শুধু এগিয়ে যায়। অথচ শতকের পর শতক, দশকের পর দশক সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা ঘৃণ্য অমানবিকতার নিদর্শন-রূপে প্রতিভাত হয়। নিয়ন্ত্রিত, পরিকল্পিত অর্থনীতি একদম পশ্চাৎপদ এলাকায় কি অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের চোখে তা আঙুল ঢুকিযে দেখিয়ে দিয়েছে। ফলে, পুঁজিবাদী দেশও স্বীকার না করলেও পরিকল্পিত অর্থনীতি বা প্ল্যান্ড ইকনমির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তার মূলে অবস্থানরত অক্টোবর বিপ্লব। ইতিহাসে সমাজের মর্মমূলে প্রথম উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা আনয়নকারী সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা। সেই সাফল্যের গুণে পুঁজিবাদের জঘন্যতম অভিশাপগুলো ক্রমশ দূরীভূত। বেকার সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। গণতান্ত্রিক দেশসমূহ তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৃটিশ সমাজতাত্ত্বিক ই. এইচ. কার (E. H. Carr) তাঁর The Soviet Impact on the Western World গ্রন্থে (৪৪ পৃষ্ঠা) তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি লিখেছেন (বাংলা অনুবাদে) : "আজ যে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিদ, তা প্রধানত সচেতন অথবা অচেতনভাবে সোভিয়েতের কর্মপন্থা এবং তজ্জাত সিদ্ধির ফল।" রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্য ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষে আজ অস্বীকারের উপায় নেই। ১৯৪১-৪৫ খ্রীস্টাব্দে নাৎসী হামলায় মোকাবিলা করা তাই সম্ভব হয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লব আরো দেখিয়ে দিয়েছে, প্রাক-পুঁজিবাদী অবস্থা থেকে কিভাবে একটি দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৌঁছতে পারে। সেন্ট্রাল এশিয়ার জারশাসিত উপনিবেশ উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান প্রভৃতি দেশ বর্তমানে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করার জন্যেও এইসব অঞ্চলের মানচিত্র পুঁজিবাদীদের মুখে ছুঁড়ে মারা যায়।

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে, ঠিক কুড়ি বছর পূর্বে, এই লেখকের সেন্ট্রাল এশিয়ার সমরকন্দ বুখারা প্রভৃতি অঞ্চল সফরের সুযোগ ঘটেছিল। সেই সময়ের একটি পরিসংখ্যান আজও আমার মনে গাঁথা আছে। তখন শুধু সোভিয়েত দেশের অন্যতম উজবেকিস্তান রিপাবলিৎকে যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হতো তা ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের ব্যবহৃত বিদ্যুতের সমান। বলা বাহুল্য, কুড়ি বছর পূর্বে বাংলাদেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দু'শ' বছর এশিয়ার এই ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিল। তাদের শোষণের ভয়াবহ রূপও ওই একটি নমুনা থেকে স্পষ্ট বোঝা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়।

আরো একটি দিক অভিশপ্ত এই উপমহাদেশের অধিবাসীদের নিকট বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। ধর্ম, বর্ণ-বিদ্বেষ এবং তজ্জাত সাম্প্রদায়িকতার লাভাস্রোতে এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের অকাল-মৃত্যু অপমৃত্যু কি নিষ্ঠুর কলঙ্ক-চিহ্ন না রেখে যায় প্রতিদিন মানুষের ঘুম কেড়ে নিতে। অক্টোবর বিপ্লব বিভিন্ন জাতিবিদ্বেষের মূলোৎপাটন করেছে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। ভারতবর্ষ-পাকিস্তান-বাংলাদেশের অধিবাসীদের নিকট এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা থাকা উচিত। পুঁজিবাদের অভিশাপ এবং ঘৃণ্য মরাল-বেষ্টনী কত রকম ঝোপঝাপের ভেতর থেকে হঠাৎ হামলা চালাতে সক্ষম, তা আমাদের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অন্যায়।

এই বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়রূপে খামখা আখ্যায়িত নয়। তার অভিঘাত তৃতীয় বিশ্বে নানাভাবে অনুভূত। তার বিস্তৃত বিবরণের জন্যে কোনো সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ আদৌ উপযোগী নয়।

তবু আরো একটি কথা উল্লেখ না করে পারলাম না।

১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বানচাল-কল্পে বদ্ধপরিকর পাকিস্তান এবং তদীয় সাম্রাজ্যবাদী স্যাঙাত আমেরিকা যখন চক্রান্তের জাল নিক্ষেপ করছিল, তখন ৪ঠা-৫ই ডিসেম্বরের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে দুই বার "ভেটো" প্রদান করেছিল অক্টোবর বিপ্লবের গতিধারাবাহী এক মহান দেশ– যা ইউ. এস. এস. আর (U.S.S.R) নামে বিশ্বজনবিদিত।

বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে আমি কি করে ভুলে যেতে পারি দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্নকালীন সেই নাটকীয় মুহূর্তরাজির কাহিনী?

জিন্দাখানার বাইরে

১

বাতাস বদলে যায়।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে বুঝতে পারো : নতুন কোথা যেন এসে পড়েছ, যেখানে পচা-ভ্যাপসা গন্ধ আর নেই। পূর্বে চোখের সামনে প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। এখন সেখানে কে যেন কোন বেদীল প্রিয়ার মতো চোখের ইংগিত ঠেরে ঠেরে তোমাকে শুধু পিছু পিছু টেনে নিয়ে এসেছে বিশাল প্রান্তরের প্রাঙ্গণে, যার বিস্তার শেষে দূরদিগন্তে বিলীন। অনড় দৈনন্দিনতার জগদ্দল তোমার পাঁজরের উপর আর চেপে বসে নেই। শিরায় উপশিরায় তোমার রক্তের প্রবাহ এখন সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

বুঝতে দেরী হয় না, এই আর এক নতুন জায়গা সহজে তা জানান দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। শুধু বাতাস নয়, গাছপালা আকাশ চতুর্দিককার আবেষ্টনী সুদূরের হাঁক হেঁকে ডাক দিতে থাকে, "চরৈবেতি চরৈবেতি। চলো চলো এগিয়ে যাই।"

২

কিন্তু কোথায় যাবে?

তার দিক-নির্দেশ ছাড়া ত পা ফেলা মূর্খতা। তাই নিজেকেই আবার জিজ্ঞেস করো, "কোথায় যাবে?"

জবাব সহজে মিলবে না। থমকে দাঁড়িয়ে ভেবে নিতে হয় তলিয়ে দেখা দরকার আগাগোড়া ওই দুই শব্দ : কোথা যাবে?

সেই জন্যে পেছনে তাকানো অপরিহার্য।

কারণ, কালের ক্ষেত্রে অতীত যেমন বর্তমানের সূচনা করে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ বহন করে, সমাজের ক্ষেত্রে নকশাটা একই রকম দাঁড়ায়। সেখানে কাল ও সমাজ কোলাকুলি করে। তার বাইরে কোন জীবিত মানুষ ঠাঁই পেতে অক্ষম।

অতীত সমাজের দিকে তাকাও।

অতীতের কতখানি দূরে তুমি যাবে? সুদূরে অতীতে না গিয়ে অনেক সময় নিকট-অতীতে খোঁজ গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। কারণ, হিসাব মেলাতে বেশী বেগ পেতে হয় না। অবিশ্যি যারা চোখ বুজে দিন কাটায়, নিশিগ্রস্তজনের মত ঘুমের মধ্যে হাঁটে, অর্থাৎ যাদের কাছে নিদ্রিত-জাগ্রত অবস্থার মধ্যে ফারাক নিশ্চিহ্ন—তাদের দূরে সরিয়ে রাখো। তাই নিকট-অতীতে যেতেও কতোগুলো কথা স্মরণ করবে। নচেৎ তুমি কিছুই ঠিকমত হদিস করে উঠতে পারবে না।

সমাজ থাকেল তা চালিয়ে নিতে শৃংখলা প্রয়োজন। এই শৃংখলার প্রণালী ঠিক করা দরকার। তাই শৃংখলা রক্ষার পেছনে চালিকাশক্তি থাকে— যেন মোটরের ইঞ্জিন।

বিদেশী অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় নিজস্ব হয়ে গেছে। তা খারাপ কিছু নয়। বরং আবেগসহ স্পষ্ট ভাব প্রকাশের সহায়ক। "বিদেশী পাউয়ার" শব্দটি এমনই। আপামর জনসাধারণ সহজে বুঝে। শৃংখলার পেছনে, মনে রেখো, 'পাউয়ার' বা শক্তি থাকে। এই পাউয়ার সমাজে কাদের হাতে আছে? তা তোমাকে দেখে নিতে হবে। এই পাউয়ার হাতে তুলে দেয়ার আগে তোমাকে ভেবে নিতে হবে, কোন্ ধরনের মানুষের হাতে তুমি পাউয়ার তুলে দিচ্ছ।

এইখানে খুব মনোযোগের সঙ্গে তোমার দুই চক্ষু খুলে রাখতে হবে। পাউয়ার দুই রকমে পাওয়া যায় জনগণের কাছ থেকে। তার উপর নির্ভর করে পাউয়ার হালাল, না হারাম। বিধিসম্মত না বিধিবহির্ভূত। অর্থাৎ পাউয়ার দুই রকম। একটির উৎস জনগণের মতামত—ভোট বা ওই জাতীয় কোন পন্থায় তা নিরূপিত হয়। এ-ই হচ্ছে : হালালী পাউয়ার। তবে কি হারামী পাউয়ার আছে? নিশ্চয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। দুনিয়াটা দ্বৈত ফাঁসে জড়ানো। হালালী থাকলে হারামী থাকতেই হবে। নচেৎ হালালের কোন অর্থ মানুষ বুঝবে না। হালালী পাউয়ারের উৎস জনগণের সম্মতি। হারামী পাউয়ার ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ সেখানে জনগণের মতামতের কানাকড়ির দাম নেই।

সেখানে আসল কথা, গায়ের জোর এবং জবরদস্তি। গ্রাম এলাকায় বহু মাতব্বর এই কাণ্ড করে থাকেন। নিজ স্বার্থে কোন জমিজায়গা দরকার, সুতরাং দখল করো। তখন মাতব্বর নিজের গুণ্ডাপাণ্ডা, লাঠিয়ালের জোরে জায়গাটা দখল করে নেয়। স্থানীয় মানুষ চুপ করে যায় ভয়ে। মাতব্বরের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে? তার গুণ্ডা লেলিয়ে দিলে প্রাণে বাঁচা দায়।

ঠিক একই কাণ্ড ঘটে দেশের বৃহত্তর পরিসরে। সেখানে দু'চারজনের স্বার্থ নয়, কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ, বহু শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত। সেখানে দখল-লড়াইয়ে গুণ্ডাপান্ডা নয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত বাহিনী প্রয়োজনে জড়ো করা হয়। বেজন্মা কোন লোকের পক্ষে সমাজে মাথা তুলে বাস করা দায়। তাই সে চেষ্টা করে তার অতীত ঢাকা দিতে। বাপ না থাকলেও বাপ একটা ঠিক করে অথবা বাস অন্যত্র উঠিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে লোকে চেনে না। রাষ্ট্র বা দেশের বেলায় রকম সকম ঠিক একই রকম। হারামী পাউয়ার হালালী হওয়ার চেষ্টা পায়। অর্থাৎ সেখানেও ফন্দী খুঁজে বের করতে হয়। সব হারামী পাউয়ার জনসমক্ষে হালালী হওয়ার চেষ্টা পায়। তখন ফন্দী-ফিকিরের অভাব ঘটে না। সাফল্য মেলে বৈকি সেই পথে।

কিন্তু জারজ ব্যক্তি নিজের উৎস নিয়ে সর্বদা অস্বোয়াস্তি অনুভব করে। আপাততঃ সাফল্যের উপর নির্ভর করে বসে পাউয়ারের অধিকারিগণ নিজেদের নিরাপদ ঠাউরাতে অক্ষম। তারাও জানে জবরদস্তি মারফত পাউয়ার দখল করা যায়। কিন্তু তা বহুকাল টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। ন্যায়সঙ্গত শক্তির উৎস জনগণ। সেখানে ভিত গড়তে না পারলে শক্তির মসনদ ধসে পড়তে বাধ্য। জবরদস্তি পাউয়ার দখলকারিগণ তাই জনদরদী সাজার মতলব ভাঁজে। গোড়ায় অস্ত্রশস্ত্র ছিল ভিত। তার জোরেই শক্তি দখল। তখন জনগণ অপাঙক্তেয়, তাদের তোয়াক্কা রাখার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাহলে অনিশ্চিত হয়ে যায় মসনদের স্থায়িত্ব। তাই জনগণের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ভিত খুঁজতেই হয়। অমন জন-নায়কদের মাঝে মাঝে হঠাৎ যে সাধারণ মানুষের জন্যে দরদ উথলে ওঠে, তার হেতু এইখানে নিহিত। তাই কেউ কেউ জনহিতকর কাজ নিয়ে মেতে ওঠেন। কেউ খাল-কাটার হুজুগ পাকড়ান, কেউ করেন আর কিছু। তাছাড়া উপায় থাকে না শেষ পর্যন্ত। পলিমাটির উপর ইমরাত-রচনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা ভাল করেই বোঝেন।

আরো একটি ব্যাপারে তারা খুবই সদা-সচেতন। যে দেশে পাউয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধিসম্মত বা হালাল, সেখানে পাউয়ারের চালকগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে তেমন কোন আতঙ্ক বা ত্রাস নিউরোসিসে ভোগেন না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা। সেখানে পার্লামেন্ট বা ওই জাতীয় পরিষদ আছে। সেখানেই ঠিক হয়, কারা কতোদিন দেশের চালক হয়ে থাকবেন। যদি কোন এক দলের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা প্রকাশ পায় পার্লামেন্টের ভোটাভুটিতে-তাহলে অন্য দল এবার দেশের হাল ধরে। ঠিক ক্রিকেট খেলার অনুরূপ। একদল ব্যাট ধরে, অন্য দল বল ছোঁড়ে। আউট হয়ে গেলে অন্য দল ব্যাট আবার হাতে নেয়।

কিন্তু যেখানে পাউয়ার হালাল নয়, সেখানে অত সহজে শান্তির সঙ্গে চালক বদল হয় না। পট আলাদা; তাই নকশা আলাদা। সেখানে রক্তারক্তি সব ব্যাপার ঘটে যায়। প্রায় দেখা যায়, সেখানে যেভাবে একদা ক্ষমতা দখলের নাটক শুরু হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই তা শেষ হয়। এক বিভীষিকাময় এই পাপচক্র।

তাই অমন ক্ষেত্রে শক্তির অধিকারীদের মসনদ আঁকড়ে ধরতে হয় দুই হাতে প্রাণপণে। প্রবল বেগে। তখন ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন অবান্তর। মোট কথা উৎস যদি বিধিসম্মত না হয়, তার আখেরও অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। কারণ, নৈতিকতা মার খেয়ে যায়। মসনদ-পরিত্যাগ সহজ নয় এমন ক্ষেত্রে। ছোরার নীচে গলা এক মূর্খ ছাড়া কে-ই বা বাড়িয়ে দেবে? বাঘের পিঠে চড়লে নামা দায়।

নৈতিকতা-বিবর্জিত হওয়ার আরো হেতু আছে। যেখানে জবরদস্তি মারফত ক্ষমতা দখল হয়, সেখানে কিছু লোক চক্রী জোট বাঁধে। তাদের সামনে মহৎ কোন আদর্শ থাকে ব'লে মনে হয় না। যাদের কাছে দেশের জনগণ কোন মূল্য পায় না বা যাদের কাছে জনগণের কানাকড়িরও দাম নেই, তারাই শুধু অমন চক্রীসুলভ কাজে এগোয়। তারা মহৎ প্রজ্ঞাবলে জনকল্যাণের ব্রতধারী হবে এমন আশা, বলদের নিকট দুধ প্রার্থনার মত। অমন ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জগৎ আবর্তিত হয় জাগতিক কিছু জড়-সুখ যথা, আরাম আয়েম, সম্পত্তি, আশপাশের মানুষের কাছে স্বীকৃতি, যশ ইত্যাদি এমন কতগুলো ব্যাপারের কক্ষপথে। তারা রাতারাতি দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ফকির বনে যাবে—এই কল্পনা দিবাস্বপ্ন।

সুতরাং শক্তি-দখলের পর ওই সব ব্যক্তিদের খাই মেটাতে হয়। গোড়ায় দুর্নীতির অংকুর রোপিত। তার ফল অবশ্যম্ভাবী— না ফলেই পারে না। ক্রমশঃ এই রস সকল সংগঠনের ভেতর জারিয়ে যেতে বাধ্য। যতই লম্বা লম্বা আদর্শের কথা আওড়ানো যাক না কেন, সংগঠনের ভেতর দিয়েই তা রূপায়ণ করতে হবে। অন্যথায়, দেশ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সংস্কার কিছুটা সম্ভব নয়। কিন্তু গোড়াতেই তো দুর্নীতির চারা গজিয়ে আছে। প্রত্যেক সংগঠনেই তার প্রভাব পড়বে।

তাই মনে রাখা দরকার, দুর্নীতি উপর থেকে শুরু হয় এবং পানির মত তা নিচের দিকে গড়াতে থাকে। গোড়ার গলদ সহজে রেহাই দেয় না। তবে মাঝে মাঝে জনমতের চাপে দুর্নীতির লেজে হাত দিতে হয়। অর্থাৎ নিচের দিকে। এই

লেজ সাপের লেজ নয়। সুতরাং ছোবল খাওয়ার কোন ভয় নেই। কারণ, বিষ-দাঁত মুখে অর্থাৎ উপরে থাকে। সেই স্থান ত সচেতনভাবে নির্বিকার। প্রচার-যন্ত্র-মাহাত্ম্যে হিংসা-দ্বেষহীন সাপ নয়—সন্ত-সন্ন্যাসীরূপে তা প্রচারিত। তাই হাল জমানায় শত্রুমিত্র অনেক সময় বোঝা দায় হয়ে পড়ে।

৩

পদক্ষেপের পূর্বে তাই এই যুগে পেছনে তাকিয়ে দেখা লাজেমী বা অনূদিত বাংলায়ঃ বাধ্যতামূলক এবং তা বিশেষ কর্তব্যও বটে। অতীতে দুঃসময়ে কে তোমার শত্রু ছিল? কে ছিল তোমার সুহৃদ আপনজন?

পেছনে তাকাও।

জিজ্ঞাসার চিহ্নটি চোখের সামনে থেকে কোনদিন মুছে ফেলো না।

উনিশশ একাত্তুরের পাশব-ভয়াল নখর-বিদ্ধ, বুট-দলিত বিভীষিকাময় দিনরাত্রির কথা স্মরণ করো, যখন তাড়া-খাওয়া যাযাবর প্রাণী ও তোমার মধ্যে কোন ফারাক ছিল না পাকিস্তানী জালেমদের হিংস্র দাপটের মুখে, যখন তোমার মা-বোনের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল এক ধর্মীয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায়ে।

কাজেই ধর্মীয় জিগীর শুনলেই তুমি উন্মত্ত হয়ে উঠো না। মনে রেখো, যাজিকার লেবাসে মানুষকে প্রতারিত করতে পারে গণিকা এবং তা অহরহই করে থাকে, বিশেষত ডামাডোলের যুগে।

AMARBOI.COM

৪

আরো, মনে রেখো, বিস্মৃতির অপর নাম জিন্দান-খানা। দার্শনিকরা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞানার্জন, আশা-ভরসার সড়কে, যুক্তির বুনিয়াদ-গঠনে স্মৃতির প্রভাব কতো সুদূরপ্রসারী। জিন্দান-খানার বাইরেই মনুষ্যত্বের দিগন্তজয়ী যাত্রা শুরু হয়।

অতঃপর মাতৃভাষা বজ্রস্বর

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বজ্রনাদী কণ্ঠ থেকে একদিন এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

আজও হঠাৎ সেই শব্দগুচ্ছ কানে পড়লে চমকে উঠতে হয়। তা-ই ঘটল। গায়েবী আওয়াজের মত নিনাদপ্রবাহ চতুর্দিকে সচকিত করে।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

চোখে মেলে তাকাই। কোন মানুষ চোখে পড়ে না। শব্দের উৎস খোঁজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌতূহল এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। চোখ আদৌ থ' পায় না। কানের ভেতর দিয়ে মর্মে পৌঁছানো যায়। প্রাচীন প্রবাদবাক্য সত্যি বৈকি। কানই তখন চোখ হয়ে দাঁড়ায়।

৭ই মার্চ, ১৯৭১। রমনা রেসকোর্স থেকেই ত উচ্চারিত হয়েছিল বাঙালীর নবজন্মের মন্ত্র। বহুকাল দিশাহারা, দেশহারা বাঙালী মুসলমান। আপন জন্মপঞ্জী সেদিন খুঁজে পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীগণ। দৈনন্দিন শোষণে মানবেতর জীবে পরিণত হয় মানুষ। তখন সে বা তারা হয়ে পড়ে আত্ম-চেতনাহীন। এ সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমানব মনিবের হুকুম তামিল ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না। আর কিছু তামিল করাও তাদের পক্ষে কঠিন।

পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা চব্বিশ বছর ধরে এমনই অভিশপ্ত জীবনযাপন করত। হঠাৎ জীয়ন-কাঠির স্পর্শ পেল তারা। এখানে জীয়ন-কাঠি কতগুলো শব্দ মাত্র—যুগ যুগ ধরে যা বাঙলা ভাষার ভাণ্ডার মণিমাণিক্যরূপে সঞ্চিত। শব্দ যখন উৎস থেকে সোজাসুজি বেরিয়ে আসে তখন তা মন্ত্রে পরিণত হয়। আত্মার ভেতর তা আর ঘুমন্ত বা লুকিয়ে থাকতে অপরাগ।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সে ত সতর বছর আগেকার কাহিনী। তখনই অমন আহ্বান শুনেছিলাম। আবার কে অমন ডাক দিত রত?

নিঃসৃত বাণীর মালিক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঔদার্যের চড়া দাম তিনি দিয়ে গেছেন। আলবদর, রাজাকার ছাড়াও সমাজবিরোধী বহু রকমের শত্রুদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন। তারা ছোবলের অপেক্ষায় সাময়িকভাবে ফণা নামিয়ে নিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তা টের পাননি, এমন ধারণা ভুল। আজ স্পষ্ট, তিনি একত্রে ঝুঁকি নিয়েছিলেন ও বাজি ধরেছিলেন। হত্যা সবসময় মোক্ষম দাওয়াই নয়। নরনারী-হত্যা ত পাপ। অহিংসার মন্ত্রদাতা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব ও উপমহাদেশে নিভে গেছে, এমন ভাবনা অমূলক। এমনকি শত্রুদের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধু জানতেন, সাপ পোষ মানে না। কিন্তু মানুষ ত সাপ নয়। রবীন্দ্রপ্রেমিক শেখ মুজিব তাঁর বাণী 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ"—শোনেননি কোনদিন, এমন কল্পনা ত অর্বাচীনের কল্পনা। কোন শ্রেণী বা ক্লাস স্বেচ্ছায় আসন ত্যাগ করে না, কথাটা সত্য। তবু চেষ্টা করে দেখা উচিত। তাঁর অচেতন মনে নিশ্চয় এ জাতীয় চিন্তা ছিল। দেশবাসীর উপর অগাধ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহ্য এবং গোলামী থেকে মুক্ত করার অধিনায়ক হিসেবে তিনি ভাবতে পারেননি, কোন বাঙালী তাঁর উপর খড়গহস্ত হতে পারে

আততায়ীর বুলেটে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে চকিত ঝলকে তিনি কি গোলামদের নেমকহারামীর আদি অন্ত দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন?

যিনি দেশবাসীর সম্মুখে খোলাখুলি উন্মুক্ত হন এবং ব্যক্ত করেন, "ফাঁসির

মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালী, আমার দেশ বাঙলা, বাঙলা আমার ভাষা," তাঁর পক্ষে শত্রুদের সম্পর্কে বিরূপ কিছু ভাবা কঠিন।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, ইতিহাসের সেই মহানায়ক বিরাট বিরাট সভায় শ্রোতাদের সম্বোধন করতেন "প্রিয় দেশবাসী," অথবা "আমার ভা'য়রা আমার বোনেরা" ডাকে। এমন নৈকট্য যখন আবহ, সেখানে শত্রুদের শত্রু ভাবা কি খুব সহজ? কারণ, শত্রুরা তাঁর দেশের সন্তান। বঙ্গবন্ধুর আচরণ তর্কসাপেক্ষ। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সমন্বয় সাধন সবসময় খুব সহজ নয়। মহাত্মা গান্ধী যীশুর বাণী অনুসরণ করেছেন, অন্ততঃ থিয়োরী পর্যায়ে। প্রেমই ছিল শত্রুর মোকাবিলায় তাঁর হাতিয়ার। "মেরেছিস কলসির কানা/তাই ব'লে কি প্রেম দেব না।" নদীয়াবাসী চৈতন্যদেব ত বাঙলার ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার। উত্তরকালে বিংশ শতাব্দীতে যিনি স্বয়ং বাঙালীর উত্তরাধিকারের সামিল হয়েছেন এবং যিনি আবেগের জটিল প্রান্তরে জাতীয়তাবাদের শিকড় পুঁতে গেছেন, তাঁর উপর দোষারোপ না করেও আমরা বলতে পারি, তাঁর পদক্ষেপ খুব যুক্তিযুক্ত ছিল না। সাপ ত মানুষের গর্ভে বা ঔরসে জন্মায় না। বিশেষতঃ ধর্মের ভেকধারী যারা ব্যবসা করে নোংরা জাগতিক তরক্কীর লোভে তাদের ঢালাও ক্ষমার স্রোতে কেন ফেললেন তিনি? তাদের মাফ করলেও তাদের সম্পত্তি রাখতে দিলেন কেন? বঙ্গবন্ধু কোন কোলাবোরেটার বা দালালের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির নির্দেশ দেননি। ফলে, সাময়িক নত-ফণা সাপগুলো তাদের সম্পত্তির আড়ালে নিশ্চিন্ত শুয়ে রইল। অনেক দরিদ্র দেশপ্রেমিক, এমনকি, মুক্তিযোদ্ধাকে তারা বশীভূত করে ফেলল বিত্তের সাহায্যে। দেশবাসীর ঘৃণার তেজ ক্ষয় হতে লাগল ক্রমশঃ। তাছাড়া, জনগণ-স্মৃতি বেশী দিন থাকে না। "বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।" হরপ্রশদ শাস্ত্রীর সেই অমূল্য বাণী আজ বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোয় ঢের বেশী স্পষ্ট। এক কথায়, স্বাধীনতার শত্রুরা বিত্তবান হয়েই রইল। আঠার শতকের ইটালীয় দার্শনিক কাউনট কাম্পানেলা লিখেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে একটি শর্ত অপরিহার্য : সমাজবিরোধী পাজি নচ্ছারদের (তাঁর ভাষায় 'স্কাউড্রল') রাখতে হবে, হয় পাউয়ারহীন অথবা বিত্তহীন। বঙ্গবন্ধু এ উপদেশ পালন করেননি। স্কাউনড্রেলরা শুধু বহাল তবিয়তে রইল না, বরং বিত্তের সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজে জায়গা করে নিল, ঘাসের ঝোপে সাপের চলাফেরার মত।

পরবর্তীকালের ইতিকাহিনী এদেশে সকলের জানা।

আপন ভূমিকা অসমাপ্ত রেখে মঞ্চনায়ক দূরে ছিটকে পড়লেন। তাঁর গোটা পরিবার আততায়ীদের শিকার। ঈশপের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটল।

শীতক্লিষ্ট সাপের দুর্দশা দেখে এক দয়ালু চাষী সেটা ঘরে এনে আগুনের তাপ দিয়ে তাজা করে তুলল, দুধও খেতে দিল। এবার সাপের প্রবৃত্তি দেখা দিল চরমে। চাষীর সবক'টি সন্তান বিষে ঢলে পড়ল একে একে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন' বছরের শিশু রাসেলের আর্তনাদ নরাকার জন্তুদের বিবেকের কাছে পৌঁছাল না।

দেশপ্রেম-উচ্ছল নানা ব্যস্ততায় টলোমলো, যার অশান্ত চিত্তের কাছে পাইপ ও 'এরিনমুর' তামাক ছিল শান্ত হওয়ার একমাত্র অবলম্বন, তিনিও মীরজাফরের জারজদের হাতে প্রাণ হারালেন। সেদিনই টুংগিপাড়ায় ফিরে গিয়েছিলেন, টুংগিপাড়ার সন্তান, যদিও অনেক পূর্বে বাংলাদেশের অমর সন্তানদের মধ্যে তিনি গণ্য। সেদিন কোন শোকসভা হয়নি কোথাও, কোন শোকবাণী উচ্চারিত হয়নি কোথাও। জালেমদের আতঙ্কে নীরবে অশ্রুপাত করেছিল অনেকে। তখনই মুখোশ খুলে ফেলে সরীসৃপেরা দলে দলে বেরিয়ে এলো, এতদিন যারা ভানের ঘুম ঘুমিয়েছিল, তাদের অট্টহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত তখন বাংলাদেশ। আচমকা আঘাতে স্তব্ধ জাতির আচরণ ওইসব জন্তুদের নিকট ব্যঙ্গ তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়াল। স্বাধীন বাংলাদেশে তখন বহু প্রাক্তন ক্রীতদাস ছিল। কিছুকাল আগে এক ছাব্বিশে মার্চ রমনার মাঠে উচ্চারিত হয়েছিল আর এক বজ্রনাদ, "বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসছে বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারে না।"

এমন কথায় নিশ্চয় সরীসৃপ এবং জন্তুরা পুলকিত হয়নি সত্য কিন্তু তারা বুঝেছিল, তাদের জগৎ এবং জামানা আর হুবহু ফিরে আসবে না, যদিও বাংলাদেশ রচনার বা নির্মাণের প্রধান ও মহান স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে তারা হত্যা করেছে। তাই এই বিভীষণেরা বাইরে বাঙালী এবং ভেতরে ক্রীতাদসসুলভ খস্‌লতে পাকিস্তানী হয়ে রইল।

এ সবই অতীতের কাহিনী। বাংলাদেশে আপামর জনসাধারণের নিকট তা কিংবদন্তীরূপে প্রবাহিত বা প্রচলিত।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

তাহলে আবার সেই বজ্রস্বর শোনা যায় কেন?

বজ্রস্বরের উৎস ত বিদায় নিয়েছিলেন ১৫ আগস্ট। কি মাস ছিল তখন বাঙলা সালের হিসেবে? এখন ত ফাল্গুন মাস। মৌসুমী সম্পূর্ণ আলাদা। মাসও আগস্ট নয়। এ ত ফেব্রুয়ারি মাস, যখন কৃষ্ণচূড়া ফুল বনে বনে আগুন লাগায়।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" কানে এসে বারবার ঢেউ তোলে সেই বজ্রস্বর—তেমনই সমুদ্র-তরঙ্গ সদৃশ, তেজোব্যঞ্জক এক পলকে শরীরে শিহরণ-জাগানিয়া।

নিনাদ আছে। না, নিনাদ নয় বরং বজ্রনাদ আছে। কিন্তু কোন মানুষ চোখে পড়ে না, যার মুখ-নিঃসৃত এ শব্দ সমরোহ।

পথে মিছিল বেরিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে। প্রভাতফেরি সকলের কণ্ঠে। তারও আঘাত কম নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু কেন হঠাৎ-হঠাৎ ওই গায়েবী আওয়াজ বা আহ্বান কর্ণপটে এমনভাবে আছড়ে পড়ে?

রমনা রেসকোর্সের মাঠেই উচ্চারিত হয়েছিল ওই বজ্রবিদার ভাষা। ঘোড়দৌড়ের মাঠ এক দিক থেকে বেশ মানানসই জায়গা বৈকি। শেখ মুজিবুর সেদিন দেশবাসীর হয়ে বাজি ধরেছিলেন : মৃত্যু অথবা স্বাধীনতা। মহাত্মা গান্ধীর "করেংগা ইয়া মরেংগা" শ্লোগানের প্রতিধ্বনি সেদিন নতুন করে শোনা গিয়েছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৯৪২ সালে এমনই ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এ উপমহাদেশে। তা ইতিহসে 'আগস্ট আন্দোলন" নামে খ্যাত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কোথাও দেখি না কেন?

টুংগিপাড়ার ভূমিশয্যা তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল নয়। বাংলাদেশের স্রষ্টার মত বাংলাদেশের সর্বত্র তিনি আছেন, যদিও বিশেষ কোন পরিমিত জায়গায় তিনি অদৃশ্য। শেখ মুজিব কি আবার নতুন ডাক দিতে এসেছেন? এ ডাক অনেক আগেই শোনা। বাংলাদেশ এখন তার মূর্তিমান পৃথিবীর মানচিত্রে। আবার সেই পুরাতন আহ্বান ত অর্থহীন। আবার কি নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করবেন তিনি? উদ্ভট অমন প্রস্তাব। তাঁর নিজের গড়া ইতিহাসের অধ্যায় কি তিনি ভুলে গেছেন?

পথে পথে প্রচুর ভিড়। প্রভাতফেরির লীলায়িত মধুর সুর-লহরী নানা দিক থেকে ভেসে আসে।

সব ছাপিয়ে ওই বজ্রস্বর হাঁক দিয়ে যায়।

আমরা জানি, দেশ ও জাতির জন্যে যারা নিঃশেষে প্রাণদান করেন তারা কোনদিন ক্ষয়ের শিকার হন না। অতীত থেকে বর্তমানে—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে তাঁদের উপস্থিতি বজায় থাকে ঠিক মিছরীর সুতোর মত—যার সাহায্যে দেশের মানুষ বিভিন্ন জীবনধারায় এক আশ্চর্য সংহতি লাভ করে। অগ্রগতির দিক নির্দেশের দিশারী হয়ে পড়েন তেমন মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ। সকল মিছিলের পুরোভাগে তাঁরা পথ দেখিয়ে এগোন।

সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কোথাও দেখতে পেলাম না। কিন্তু তার চেনা কণ্ঠের বজ্রভাষণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেকে অতীতের স্বর শুনে বিহ্বল, সচকিত হওয়া নয় শুধু ভুলও তারা করে বসতে পারেন।

একদা ভাষা আন্দোলনের শরিক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আজও তাঁর বিদেহী উপস্থিতি অযৌক্তিক কিছু নয়।

কারণ, ঐতিহ্যের এমনই অভিঘাত—অতীতে বিকশিত হলেও তার ছায়া বর্তমানে এসে পড়ে।

আরো জানা উচিত যে, অনেক বাণীর তাৎপর্য সে-যুগেই শেষ হয়ে যায় না, বরং তা যুগ যুগ পেরিয়ে যেতে সক্ষম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রেসকোর্সের আহ্বানের পঙক্তি কয়েকটি কালজয়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী।

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।"

সকল সংগ্রামের পেছনেই মুক্তির আশ্বাস থাকে। মুক্তি এক ধরনের উত্তরণ। প্রাচীন ঋষিদের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়, "অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়-অসৎ থেকে আমাকে সত্যের দিকে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে যাও" এই প্রার্থনা ত উত্তরণের কামনা। উত্তরণ মুক্তি বৈকি।

বর্তমানে বাংলাদেশের শতকরা সাতাশিজন গ্রাসাচ্ছাদন পর্যায়ের নীচু পর্যায়ে মানবেতর জীবনযাপন করে, পান্তা আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্তা ফুরায়—প্রাচীন এই প্রবাদ জনসাধারণের জীবনে আজও মিথ্যা হয়ে যায় নি। নিম্নমধ্যবিত্তের দৈনন্দিনতায় একই দশা। তাদের মানস আবহে মুক্তির স্বপ্ন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের শেষ এই ক'টি কথা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। এখানেও উত্তরণের কামনা প্রচ্ছন্ন। যেখানে প্রতিবন্ধকতা আছে, সেখানে জীবন-বিকাশের প্রধান শর্ত : স্বাধীনতা। যে কাজ করণীয় তা সম্পাদনার জন্যে যেন বাধা না থাকে। অর্থাৎ স্বাধীনতা ছাড়া প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব নয়।

জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর "ফিলজফিক্যাল হিস্টি" গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনার কাহিনী। বঙ্গবন্ধুর বাণীটিও দেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। অবশ্য এখানে তিনি ঐতিহ্যের আহ্বানই নিজ কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন। স্বদেশের মাটির উপর ছিল তাঁর দুই চরণ, তাই বিশ্বের প্রাঙ্গণে পৌঁছে যায় তাঁর কণ্ঠস্বর। জাতিসংঘে বক্তৃতার অনুমোদিত ভাষা মাত্র পাঁচটি : ইংরেজি, ফরাসী, চীনা, রুশ, জার্মান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। কবি, লেখক ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশের কোন অধিবাসীর বুক এই ঘটনায় স্ফীত হয়ে উঠবে না? সত্যিকার দেশপ্রেমিকের কণ্ঠস্বর সদা দিগ্বিজয়ী।

বাঙলার ঐতিহ্যে কল্যাণ-কামনা এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। মানব জীবনের শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর আর এক মহান বাঙালী (অবশ্য মুসলমান, যদিও মা-কালীর প্রশস্তিসূচক শ্যামা সংগীত রচয়িতা) বঙ্গবন্ধুর অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন :

বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম
রণভূমে রণিবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই শপথেরই ধ্বনি-প্রবাহ।

দুর্ভাগ্য, দুরন্ত ব্যাধি অকালে নজরুলকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কল্যাণ-রচনার পথে শেখ মুজিবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশী এজেন্টদের ষড়যন্ত্র।

দুই বাঙালী প্রাণপুরুষ স্তব্ধ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের স্বর প্রতিধ্বনি স্তব্ধ করে দেওয়ার মত স্বৈরাচারী এদেশে এখনও জন্মায়নি। স্বৈরাচারীরা জানে না, দেশপ্রেমিকোর ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা বজ্রস্বর, তার প্রতিধ্বনি শুধু পৃথিবীর নয়, কালেরও দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। দেশপ্রেমিকের শারীরিক উপস্থিতি কোথাও প্রয়োজন হয় না। কারণ, জাতির জীবনে তাঁরা জলবায়ুর মত মিশে যান।

শেখ মুজিবের শারীরিক উপস্থিতি এতক্ষণ খুঁজছিলাম কেন?

কাঠামোর এক অংশ

বাংলাদেশের দুই দশকের রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে সহজে কতগুলো সিদ্ধান্তে আসা যায়।

বিগত বিশ বছর কেন, আরো আগে থেকে একটি ব্যাপারে মনে হয় কারো দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই; তা হচ্ছে, এই দেশের জনসাধারণ যথারীতি অনুপ্রেরণাদীপ্ত হলে ইতিহাসের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে খুব বেশি বিলম্ব করে না। তবুও গন্তব্য থাকে শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে। ফুটবলের রূপক নিয়ে বলা যায়, খেলোয়াড়েরা গোলের সামনে কেরদানি বা কারদানি দেখাতে শুরু করে এবং গোল দিতে ভুলেই যায় বা সক্ষম হয় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ছোট বড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো বিরাট জন-উত্থানের ঢেউ অনেকে দেখেছেন। কিন্তু তার পরিণাম, এক কথায় বলা যায় : লঘুক্রিয়া।

কেন এমন ঘটে? এই প্রশ্ন ত রাজনীতিবিদগণের সম্মুখে প্রতিদিন বিভীষিকার মতো জ্বলজ্বল করার কথা, কিন্তু তা হয়নি। তাহলে বারবার ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটত না। ফ্রেডরিক দি গ্রেটের দুটি ঘোড়া ছিল। চল্লিশটি যুদ্ধের শরিক। কিন্তু ঘোড়া দুটি ঘোড়া ছাড়া উন্নততর জীবে পরিণত হয়নি। এদেশে যেন তেমনই ব্যাপার ঘটছে কয়েক দশক থেকে।

শেখ পর্যন্ত ভুঁই ছাড়া বাজি হয় না। হিসাবে গলদ থাকলে ইপ্সিত ফল আর কোথা থেকে আসবে? সামাজিক কাঠামোর পরিচয় যেন কেউ এড়িয়ে না যান। কারণ, সকল প্রকার রাজনীতির উৎস সেই ভুঁই বা ভূমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাতন কথা। সকলেই জানেন, এদেশে শিল্পায়ন বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান ইউরোপের মতো স্বাভাবিকরূপে গড়ে ওঠেনি। উপনিবেশবাদীরা নিজেদের স্বার্থে সীমিত শিল্পায়ন শুরু করে। তারই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং বিবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টার ফলে এদেশে কিছু শিল্পায়নের প্রসার। কিন্তু এই প্রক্রিয়া প্রতিটি প্রাক্তন উপনিবেশে আবার স্থানীয় বা দেশী কায়েমী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে বসে। তারা দেশের মানুষের কাঁধে চেপে পার্থিব সুখ-সুবিধা ভোগের স্বপ্ন দেখে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির মধ্যে এই উপাদান এখন বিশেষভাবে প্রকট। ফলে এককালে জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের, যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শেকল ছেঁড়ার যন্ত্র, তার অন্তর্নিহিত জোরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইভাবে না-অশ্ব, না-গর্দভ, সামাজিক খচ্চর-জাতীয় জীবের অভ্যুদয়। অর্থাৎ, ইউরোপের মতো স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ধারায় শিল্পায়নের পত্তন না ঘটার ফলে নানা ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। রাজনীতির ভেতর তারই প্রতিফলন এখন স্পষ্ট।

এই দেশেও শহর গড়ে ওঠে। কিন্তু শহর গড়ে ওঠার মূল সূত্র কি ছিল ইওরোপে? ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে সস্তা বা স্বল্প মজুরি শ্রমিকের চাহিদা। কিন্তু বাংলাদেশ কেন, অন্যান্য অনুন্নত দেশেও দেখা গেছে, শ্রমিকরা শহরে আসে তেমন চাহিদা থেকে নয়। গ্রামে আর সংস্থান নেই। গ্রামে থাকা কষ্টকর। শহরের চাকচিক্যের হাতছানি থাকে। কারণ, আত্মীয়-স্বজন বা চেনাশোনা কারো আশ্বাস গোষ্ঠীভিত্তিক চেতনাই এই মোহ মরীচিকা সৃষ্টি করে। গ্রাম থেকে শহরের পানে ধায় বহু মানুষ নগরের বস্তি অঞ্চল প্রমাণ। এই ছিন্নমূল মানুষেরা কিন্তু শিল্প-শ্রমিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার নয়। তাঁদের পিছুটান থাকে গ্রামের দিকে। ফলে, শিল্প-শ্রমিক এবং গ্রাম-আগত শ্রমিকে পার্থক্য তেমন থাকে না।

বড় কারখানায় একজন শ্রমিক ধীরে ধীরে অস্তিত্বের সংগ্রামে নিজের ভবিষ্যৎ জগৎ দেখতে পায়—যা তৈরি করা সম্ভব। ইউরোপে বৃহদাকার শিল্প গড়ে ওঠার ফলে শ্রমিকদের বিরাট সংগঠন রচনার সুযোগ ঘটেছিল। বাংলাদেশ কেন, তৃতীয় বিশ্বে এমন পরিবেশ নেই বললেই চলে। এবং যা থাকে, তা নিতান্ত দুর্বল। কারখানাকেন্দ্রিক মানসিকতা তাই সহজে বিকশিত হয় না। ছোটখাটো কারখানা বা অল্পসংখ্যক শ্রমিক নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠানের কারবার সেখানে সমস্যা থাকে কিন্তু শ্রমিকগণ তার সমাধান খোঁজে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার পর্যায়ে। তাদের অভিজ্ঞতাও হয় সীমিত, তাদের মতোই একজন, দু'জন শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগের ফল। এই সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত, ছোটখাটো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ঠিক গ্রামের মতো সুবাদে : চাচা, খুড়ো, মামা, ভাতিজা ইত্যাদি। ফলে তাদের দাবি-দাওয়া ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই বিচ্ছিন্নতা সামাজিক প্রতিষ্ঠান-নির্মাণের অন্তরায়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তা ভুললে চলে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। ছোট-ছোট দোকানের কর্মচারী ভাবতে পারে একদিন সেও দোকান দিতে পারবে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ অন্য জায়গায় নিজস্ব দোকানের মালিক হয়ে পড়বে। বিরাট কারখানায় একজন শ্রমিক তা ভাবতে পারে না। ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা থেকে সে তখন বৃহত্তর জগৎ এবং তার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খোঁজে। অন্য শ্রমিক ভায়ের সান্নিধ্য সে খুঁজে পায়। জোরদার শ্রমিক সংগঠন ত এমন দৃঢ় বন্ধন থেকেই গড়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্তি পায় তখন শ্রমিক। আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন তখন তৈরি হয়।

অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশের মতো বাংলাদেশেও শহরের বিকাশ বা প্রসার অস্বাভাবিক পর্যায়ে ঘটছে। তাই শ্রমিক সংগঠন নানাভাবে দুর্বল।

তাছাড়া শহরে আর এক ধরনের সর্বহারা থাকে, তাদের সংখ্যা বিপুল। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের এক অর্থনীতিবিদ নাম দিয়েছেন সহ-সর্বহারা বা "সাব-প্রলেতারিয়েত"। এই জাতের শ্রমিকদের স্থানীয় কোন জীবিকা নেই। যখন যা মেলে দু'হাতে লুফে নেয়। এদের বেতনও খুব অল্প। উৎপাদনমূলক কোন পেশাও তা নয়। এরা কখনও দিনের পর দিন বেকার থাকে। সস্তা ছোটখাটো সমাগ্রীর ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, গৃহভৃত্য, খবরের কাগজ বিক্রেতা, কামলা, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি এমন পেশার শ্রমিকসংখ্যা বোধ হয় এদেশে কারখানার শ্রমিকদের চেয়ে বেশি।

এই "সব-সর্বহারা" নিপীড়িতদের রাজনৈতিক চেতনাদান অত সহজ নয়। কারণ তাদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন প্রচেষ্টা এযুগে চলে; কিন্তু তা শক্তিশালী এবং লাগাতার অবিচ্ছেদ্যভাবে চালিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর নিকট এই দুনিয়া বদলে দেওয়ার যে-চেতনা আশা করা যায় তা আর মেলে না। আপন শ্রেণীর চেতনা তাদের কাছ থেকে বহু দূরে পড়ে থাকে। বস্তির পর বস্তি তৈরি হয়, শহর তৈরির নামে। সমাজ শরীর থেকে এই কার্বাঙ্কাল (বিষফোঁড়া) উচ্ছেদ করতে পারে যারা, তারা এখনও সংগঠিত নয়। অন্যদিকে ভোগ-সামগ্রীর সিংহভাগ যারা পায় তারা ভুলেও স্মরণ করে না, ছিন্নমূল এইসব মানুষ এই বাংলাদেশেরই সন্তান। সহ-সর্বহারাদের মানসিকতাও লক্ষণীয়। তারা অর্ধেক গ্রামীণ, অর্ধেক শহুরে। গ্রামের দারিদ্র্য-দুর্দশা এবং শহুরের ভবিষ্যৎ প্রেরণার প্রতিফলন তাদের বস্তিগুলো।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুর্বলতা সামাজিক এই কাঠামোর মধ্যে অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায়। সংখ্যায় বিপুল এক শ্রেণী আজও নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন নয়। গ্রাম থেকে শহরে আসে তারা অস্তিত্বের তাড়নায়। সেখানে তার শ্রমিক-চেতনা সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠার নানা বাধা। আর দশজন নিম্ন মধ্যবিত্তের অনুরূপ তারা নিজেদের গড়ে তুলতে চায়। ঐ শ্রেণীর অনুসারী হয়ে যায় শ্রমিকশ্রেণীস্থিত-এ শাখা সহ-সর্বহারার দল। গ্রামে ক্ষেতমজুর ও অন্যান্য ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমিক আছে যারা নিজেদের এক জোটভুক্ত মনে করতে পারে। শহরে আসার পূর্বেই বরং এইসব ভবিষ্যৎ সহ- সর্বহারাদের সংগঠনের প্রয়াস গ্রহণ উচিত। কারণ, শহরে এলে বস্তি-জীবনে শ্রমিকরূপে সেই চরিত্র তারা হারিয়ে ফেলে। সর্বহারা শ্রেণীর অন্যতম এই শাখা সহ-সর্বহারার দল নিপীড়নের জুলুম ভোগ করে। তাই রাজনৈতিক আহ্বানে তারা সাড়া দেয় অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা শ্রমিক-শরিক কোন আদর্শের পথে এগোয় না। ফলে, জন-উত্থান বিপুল আকার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত পর্বত মূষিক প্রসব করে। এই সঙ্গে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকান্ড অবশ্য থাকে বৈকি।

কাঠামোর সংক্ষিপ্ত এই এক দিক। কিন্তু সমস্ত সমাজ ত শুধু মজুরের নয়। দেশে হুজুরও আছে। তাদের কাঠামো-কাহিনীও জানা দরকার।

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা

একটা প্রবণতা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, যে-সব রাজনৈতিক পার্টির মূলধন পারলৌকিক ছিল, তারাও ইহলৌকিক সমস্যা নিয়ে শুধু মাথা ঘামাচ্ছে না, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। যুগের থাপ্পড়ে বাঁকা মুখ এইভাবে সিধা হয়।

দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সমস্যার সমাধান না ঘটলে কোন সমাজেই স্থিতি আসা সম্ভব নয়। নচেৎ বাছা বাছা আদর্শ কেতাবেই সীমাবদ্ধ থাকতে অন্যথায় বাধ্য। এই ব্যাপার অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে শিখছে।

মোদ্দা কথা, সবাই বুঝতে পেরেছে ডাল ভাতের সমস্যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক, নৈতিক সমস্যা জড়িত। প্রসঙ্গটা পুরাতন। কিন্তু তা আগে দলমত নির্বিশেষে সকলকে এত বিচলিত করে তুলত না। একমাত্র তথাকথিত 'জড়বাদী'রা শুধু জীবনের ঐ আটপৌরে দিকের উপর জোর দিতেন। বর্তমানে কিন্তু আর সে পরিস্থিতি নেই। এলাকার আরো বিস্তার ঘটেছে।

আরো জাল গুটিয়ে বলা যায়, অর্থনৈতিক সমস্যাই সমাজের মুখ্য সমস্যা। ইতিহাসে এই দিকে চোখ বুজে থাকার নানা প্রমাণ আছে। কিন্তু বাঁচার তাগিদ এমনই যে, উটপাখী সেজে মরুভূমি ঝড় থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তাই মানুষকে ফিরে আসতে হয়েছে নেহায়েৎ জড়-জীবনের দিকে।

পৃথিবী আজ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। কিছু দেশ যন্ত্রশিল্পে উন্নত, আর কিছু দেশ এখনও অনুন্নত বা কৃষিপর্যায়ে থেকে গেছে। অবিশ্যি এমন বিভাগ আলোচনার সুবিধার জন্য গৃহীত। নচেৎ কিছু উন্নত কিছু অনুন্নত—এমন পর্যায়ের মিশ্রণ ত আছেই। কিন্তু যেহেতু শিল্পোন্নত দেশ এখানে আলোচনার পর্যায়ে পড়ে

AMARBOI.COM

না, অনুন্নত দেশ বলতে, আমরা বুঝব, বাংলাদেশের মত এলাকা—যেখানে যন্ত্রশিল্প একদম প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং কৃষিই প্রধান নির্ভর।

অতীতের কিছু জের টানতে হয়। কারণ, সংকুচিত পৃথিবীতে যেকোন দেশের সমস্যার সমাধানের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক জড়িত। একশ' বছর আগেও একটা দেশের যে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল আজ তার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। অনুন্নত দেশগুলো খামাখা স্বেচ্ছায় অনুন্নত থাকেনি। সেখানে আভ্যন্তরীণ কারণ যতই থাক, বাইরের চাপই মূলত কার্যকরী এবং স্পষ্ট ছিল। অনুন্নত দেশগুলো প্রধানত উন্নত দেশের উপনিবেশ বা আওতাভুক্ত আধা-উপনিবেশ। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর আগে পাক-ভারতের এই বিরাট ভূখণ্ড স্বাধীনতা পেয়েছে। কাজেই উপনিবেশের স্মৃতি এখনও এত টাট্‌কা যে, কাউকে কিছু মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। উপনিবেশ হয়ে থাকার ফলেই বর্তমান পশ্চাৎপদতা—এ কথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। একটা দেশের স্বাভাবিকভাবে যে-অর্থনৈতিক বিস্তার ঘটত, তা সম্ভব হয়নি। ফলে, যখন যে-দেশ স্বাধীন হচ্ছে, তাকে অতীতের জের শুধরে এগোতে হচ্ছে। এদিকে লক্ষ্য না রেখে উপায় নেই। কারণ, অর্থনৈতিক সমস্যার এই এক বিরাট দিক। এখানে সঠিক নিদান জানা না থাকলে পথের বিভ্রাট ঘটবে। সমস্ত অনুন্নত দেশের সামনেই এই প্রশ্ন বিরাট আকারে দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মূল লক্ষ্য, উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি। বণ্টন ইত্যাদির সমস্যা এখানে আছে; কিন্তু তা কিছুটা গৌণ বলা চলে। কিভাবে একটা দেশের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা যায়? তার পথ কি হবে? এই সমস্যা যতটা অর্থনৈতিক ততটা রাজনৈতিক বটে। কোন্ পথ যুক্তিযুক্ত, তার আলোচনা এখানে স্থগিত থাক। দেখা যাক, অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে কি কি বাধা এসে খাড়া হয়।

জাতিপুঞ্জ কয়েক বছর আগে অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নতির সমস্যার একটা জরিপ নিয়েছিল। সেখানে যে-সব সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল। অন্যতম সমস্যা অনুন্নত দেশের জীবন-যাপনের মান অত্যন্ত নিচু। ফলে আভ্যন্তরীণ কোন বাজারের প্রসারের সুযোগ কম। নানা জিনিসের চাহিদা থাকলে তবে নানা শিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু গরীব দেশের গরীব মানুষের চাহিদা কয়েকটি সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে বাজার বা শিল্পের প্রসারের মওকা আর থাকে না। যে-টুকু বাড়তি-পুঁজি জমে ওঠে, তা শিল্পে নিয়োগের দিকে আকৃষ্ট হবে কিভাবে? সেই জন্য বেসরকারী পুঁজি এগোয় ব্যবসায়, বাণিজ্যে, আরো জমি কেনার দিকে। আমদানী সীমাবদ্ধ হয় বিলাসদ্রব্যে অথবা ভাগ্যবানেরা বাড়ী তৈরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেশে বাজার থাকলে তা ঘটত না। আবার সরকারি সহযোগিতায় যে-শিল্পে গড়ে ওঠে, সেখানেও নানা ব্যবস্থা বা অনিশ্চয়তার জন্যে বেসরকারী পুঁজি সহজে আকৃষ্ট হয় না বা থম্‌কে থাকে। এই সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত, দেশী পুঁজিপতিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খায়েস-খসলৎ এখনও সামন্ততান্ত্রিক। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের যুগে তদানীন্তন শিল্পপতিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, শ্রম মর্যাদা প্রভৃতি যে সদগুণ ছিল, উপনিবেশ বা প্রাক-উপনিবেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। অন্যদিকে উন্নত শিল্পপ্রধান দেশের সংস্পর্শে এসে দেশী শিল্পপতিরা জীবন-যাপনের মান এমন বাড়িয়ে ফেলে, উদ্বৃত্ত পুঁজির সেই খাতেই অপচয় প্রচুর পরিমাণে ঘটে। কিছু আবাসিক এলাকার দিকে একটু নজর দিলে তা বুঝতে কারো বিলম্ব ঘটবে না। মাথাপিছু আয় অতি অল্প হলে দেশে শিল্পের বিস্তার কি দিয়ে ঘটবে? অর্থনীতি বিশারদেরা মনে করেন যে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে অসমতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মার্কিন অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় এশিয়ার অধিবাসীর কুড়ি গুণ। এই ফাঁক এক বিরাট গর্তবিশেষ। আরো লক্ষণীয়, অনুন্নত দেশে যে-টুকু আয় বাড়ে, তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তলিয়ে যায়

অনুন্নত দেশের পক্ষে শেষ পর্যন্ত তার রপ্তানীর উপরই জোর দিতে হয়। কিন্তু এখানেও বিপত্তি কম নয়। কারণ, রপ্তানীজাত দ্রব্য একটা দেশে খুব বেশী থাকে না। খুব জোর দুই কি তিনটি প্রধান। তখন এই দু'টি তিনটি দ্রব্যের উপর সব জোর দিতে হয়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি একপেশে হয়ে পড়ে আর তা এমন অনড় থাকে যে, সহজে সরে যায় না। এই একপেশে অর্থনীতি অনুন্নত দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তার কারণ আন্তর্জাতিক বাজারের কাছে মুখাপেক্ষিতা। যদি দাম পড়ে যায়, তখন দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদে নানা লণ্ডভণ্ড ভাব দেখা দিতে বাধ্য। রপ্তানীর সাহায্যে যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য শিল্প-উন্নয়নের সামগ্রী আমদানি করতে হয়। যদি রপ্তানীজাত দ্রব্য দামের ক্ষেত্রে বেসামাল হয়ে পড়ে, তার প্রতিক্রিয়া চারপাশে স্বাভাবিক। দেখা গেছে, অনেক সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সততা রক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটা উদাহরণ সহজে পাওয়া যায়। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে ফ্রান্স যখন চরম বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য পাশব নির্যাতন চালিয়ে, তখন পাকিস্তান সরকার কোন প্রতিবাদ জানাতে সাহস করেনি। মনে রাখা দরকার, আলজেরিয়া মুসলমানের দেশ এবং পাকিস্তান ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত—অন্তত তা-ই মনে করা হয়। পূর্বোক্ত নিঃস্তব্ধতার হেতু পাকিস্তানী পাট-ক্রেতা হিসেবে ফ্রান্সের স্থান দ্বিতীয়। যদি ফ্রান্স পাট না কেনে, তখন পাকিস্তানের অর্থনীতি বেশ বেসামাল হয়ে উঠবে। কাজেই চুপ করে যাও। আর্থিক স্বার্থের কাছে—এইভাবে ধর্ম নয় কেবল সাধারণ সততা পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হয়। তাই পূর্বে উল্লেখিত, একপেশে অর্থনীতি এক বিশেষ বিপত্তি। পাট বা চা, চামড়া—কয়েকটা রপ্তানী দ্রব্যের উপরেই ত আমাদের নির্ভর করতে হয়।

অনুন্নত দেশে আবাদযোগ্য জমির অনুপাতে জনসংখ্যা অনেক বেশী। ফলে গ্রামে বেকার, অর্ধবেকারের সংখ্যা বেশ চড়া পর্যায়ে আছে। অনেকে দারিদ্র্যের জুলুমে শহরে চলে আসে। কিন্তু সেখানেও কাজের কোন স্থায়িত্ব নেই। শহরেও

একই রকম চেহারা। বেকার-অর্ধবেকারের সংখ্যা কম নয়। যারা জমি আঁকড়ে পড়ে থাকে, তারা জমি থেকে বাঁচার মত রসদ পায় না। পর্যাপ্ত সেচ, সার ইত্যাদির অভাবে জমির উৎপাদন কম। একই ফসলের পুনরাবর্তন ও অন্যান্য কারণে জমির উর্বরতা ধ্বংস হয়। জমির উৎপাদন স্বল্পতার জন্য অনাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাত দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় চাষীর পক্ষে রাখা সম্ভব হয় না। ফলে পুষ্টিহীনতার অভাব এবং রোগ জরা মহামারীর শিকার গ্রামের অধিবাসী। ভগ্নস্বাস্থ্য কার্যদক্ষতা এবং কর্মোদ্যম দুই-ই ধ্বংস করে। এ যেন এক পাপচক্র—চলছেই এবং ঘুরে ঘুরে আসছে।

চা-বাগান বা এই জাতীয় দু-এক ক্ষেত্রে কেবল বড় বড় জোত বর্তমান। নচেৎ গ্রামে খণ্ডীকৃত জমি চাষ করে, কোন-রকমে-টিকে থাকা এক ধরনের অর্থনীতি বজায় আছে মাত্র। আর কোন রকমে যদি চাষের উৎপাদন বাড়েও তা কৃষিজাত পণ্যের বাজার বাড়িয়ে তুলবে—তা জোর দিয়ে বলা স্রেফ মূর্খতা। কারণ, গ্রামবাসী ভোগের (কনজাম্পশন) এমন পর্যায়ে থাকে যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন তখন পেটেই চলে যায়। আবার ফসলের উৎপাদন বাড়লে, গ্রামে বেকারের সংখ্যা আরো বাড়বে—সে-ভয় একদম অমূলক নয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, সুষ্ঠু সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্পোন্নতির ফলে শহরে কাজের সংখ্যা বাড়ল এবং গ্রাম থেকে বাড়তি শ্রমিক আসতে লাগল। কিন্তু তার ফলে, গ্রামের কৃষিপণ্য শহরে পৌঁছুবে, এমন স্থিরতা নেই। তখন শহরে শাকসবজি, চাল-ডালের দাম বাড়বে অথবা বিদেশ থেকে চাল-ডাল, আলু বা ঐ জাতীয় পণ্য আমদানি করতে হবে। গ্রাম এবং শহরের পারস্পরিক সংগতি বজায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একান্ত দরকার। এই দিকে যেকোন পরিকল্পনাকারীকে নজর দিতে হবে। সমস্যার সমাধান আপাতদৃষ্টে যত সহজ মনে হয়, কার্যত তা নয়। তার জন্যে গ্রামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের চেহারাই বদলে ফেলা দরকার। একথা এদেশেও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

শিল্পের প্রসার বা অর্থনৈতিক উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পুঁজি প্রয়োজন। পুঁজি সাধারণত সঞ্চয়ের ফল। অনুন্নত দেশে সঞ্চয় রীতিমত সমস্যা। কারণ, দারিদ্র্যের এমন স্তরে এসব দেশের অবস্থান যে, সেখানে সঞ্চয় বেদনাদায়ক। সহজ করে বলা যাক। আগামী বছর যদি বেশী ধান উৎপাদন করতে হয়, বীজ জমা রাখতে হবে। বীজ জমানো মানে ভোগ কমিয়ে ফেলা। কিন্তু এদেশের মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্যের এমনই স্তরে আছে যে, ভাতই যখন প্রধান খাদ্য, বীজ কিভাবে জমা রাখবে? এখানে জোর কতটুকু খাটানো যায়? তেমন জোর কোন সরকারের স্থায়িত্বের সূচনা নয়। আবার যদি পুঁজি যোগাড়ও করা যায়, তার জন্যে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তা বহু ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। ফলে পুঁজির সুষ্ঠু নিয়োগ সম্ভব হয় না। অনুন্নত দেশে দেখা যায়, রাজনৈতিক শক্তি যাদের হাতে থাকে তাদের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার বা গভর্নমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় নয়, বরং তাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ বাড়ানোর হাতিয়ার মাত্র।

এমন সমাজে বেসরকারী পুঁজি সহজে এগিয়ে আসে না। যেখানে সরকার কয়েকজনের ব্যক্তিগত আয়ের উপায়স্বরূপ, সেখানে শিল্পের প্রতি বেসরকারী উদ্দীপনা সহজে মিইয়ে আসে। অথচ অনুন্নত দেশেই পুঁজির যথাযথ সুষ্ঠু নিয়োগ হওয়া উচিত।

অনুন্নত দেশে পুঁজি কম। তার উপর নানা ধরনের অসুবিধা গজিয়ে আছে। জমির মালিকরা অধিকাংশ শহরবাসী বা খাজনাভোগী। ফলে তাদের কোন অর্থনৈতিক ভূমিকা নেই। তাছাড়া আছে সরকারী কর্মাচরী, সেনাবাহিনীর লোক, পেন্সনভোগী। এদের কোন অর্থনৈতিক ভূমিকা নেই। কারণ তাদের কাজের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ কম। তা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবসাদার এবং শিল্পপতিদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যাও তেমন বিশেষ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে না। যে-ব্যক্তি অর্থনৈতিক সেবা (সার্ভিস) বেশি দিচ্ছে, তারই আর্থিক পুরস্কার বেশি পাওয়া উচিত। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, যার রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে সে-ই অর্থনৈতিক মাখন সব খেয়ে যাচ্ছে। ফলে সত্যিকার লোক দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত।

অর্থনীতিবিদরা এই জাতের আয়ের নাম দিয়েছেন : "ভূমিকাহীন আয়", "গাছে না উঠেই দশ কাঁদি"। বাংলা প্রবাদের সেই দশা অনুন্নত দেশে হাজারো পর্যায়ে ছড়িয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক হালৎ আর কিভাবে এগোবে? অনুন্নত দেশে এই সমস্যা এত প্রকট যে, নতুন করে সব ঢেলে সাজাতে না পারলে, কিছুই গড়ে উঠবে না। এমন কি পুঁজির অভাব নেই তবুও শিল্পের উন্নতি হচ্ছে না-এমনও দেখা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বহু রাষ্ট্র তার নমুনা। কারণ, যেকোন পরিকল্পনা সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য যে প্রশাসনিক এবং প্রকৌশলী ব্যবস্থা থাকা দরকার, তা সেখানে অনুপস্থিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিকাহীন আয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা একই জায়গায় নিবদ্ধ। সতর শতকের ইটালীয় চিন্তাবিদ কাম্পানেলা রাজনৈতিক আদর্শের আলোচনায় বলেছিলেন যে, পাজি ছুঁচোদের নিজ নিজ মাপমত যথা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। হয় ক্ষমতা ছাড়া অথবা তাদের বদভ্যাস ছাড়া। কিন্তু অনুন্নত দেশে দেখা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বদভ্যাস একই জায়গায় জেঁকে বসে আছে। তখন অর্থনৈতিক উন্নতি দুরাশা। বরং গোটা মুষ্টিমেয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

এতসব পাপচক্র। কি দিয়ে তাদের অবসান ঘটবে? একচেটে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে চিরাচরিত উপায়ে অনুন্নত দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ, উন্নত দেশের পুঁজিবাদীরা অনুন্নত দেশে তেমন পুঁজি নিয়োগের বিরোধী, যা তাদের একচেটিয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বা একচেটিয়ার প্রতিযোগী হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি নিয়োগ এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়। উন্নত দেশের শিল্পের জন্য কাঁচামাল যোগাতে পারে, এমন প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ এবং খাদ্যদ্রব্য তৈরীর ক্ষেত্রে তারা পুঁজি সরবরাহ করে। শেষ পর্যন্ত উন্নত দেশের জনসমষ্টির আহার্য সামগ্রীর সরবরাহক হয়ে অনুন্নত দেশ। ফলে অনুন্নত দেশের অর্থনীতি একপেশে হয়ে পড়ে। উন্নত দেশগুলো এইসব এলাকায় যে মুনাফা লোটে তা তারা স্থানীয় প্রধান শিল্পে নিয়োগ করে না, বরং স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায়– যেখান থেকে পুঁজি এসেছিল। সুতরাং অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির পথ আর ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশের অনুসরণে বা অনুকরণে হতে পারে না।

সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য গত্যন্তর আছে কি?

ঈদের জামাত কেন জানাজার ভিড়

১

নিষ্কর্মা কওমের প্রতি সৃষ্টিসুখের উল্লাস-অভিমুখে আহ্বানকারী কবি নজরুলের কণ্ঠেই শোভা পায় উৎসবের অমন অভ্যর্থনা: "ও মন রমযানের ওই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।"

একই গানের মধ্যে আছে আত্মত্যাগের মহিমা-কীর্তন, যেখানে মনুষ্যত্বের পরকাষ্ঠা নিহিত। উৎসবে তা-ই আছে পরম আনন্দের উৎস।

কিন্তু সাধনা এবং কর্মপ্রেরণামুখর তেমন আনন্দের পশরারূপে এই শুভময় দিন কি আমাদের দুয়ারে হাজির হয়?

এই জিজ্ঞাসা অনেকের কাছে উত্থাপিত নাও হতে পারে। অনেকের কাছে তা আদৌ উত্থাপিত হয় না। তার বহু প্রমাণ দেয়া যায়। সমাজে মানুষের অবমাননা তার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী।

ঈদের দিকে কি শহরে কি গ্রামে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। দলাবাঁধা বস্তুর মোটা দাগ সহজে চোখে পড়ে। ভিক্ষুকের দংগল সহজে দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। শহরেই বেশী ভিড় করে ভিক্ষুকেরা। কারণ, ধনদৌলতের চাকচিক্য-মরীচিকা ওদের ঘর-ছাড়া করে। গ্রামের বেকারজনেরা এইভাবেই ত নগরপানে ছোটে। প্রত্যাশা : জীবন-সংগ্রামের সুরাহা।

অনেক সময় ঢাকা শহরে দেখা যায়, ঈদের ময়দানে মুসল্লী অপেক্ষা ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী।

পরিবেশ সম্পর্কে জড় পদার্থই সচেতন নয়। কিন্তু কোন মানুষ যদি সেই ক্ষেত্রে নির্বিকার থাকে অপর মানুষের দুর্দশার পাশে–তাহলে বুঝতে হবে, ওই সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিত্ব কোন সামাজিক নরনারীর মধ্যে গণ্য নয়।

চারদিকে দুস্থ নরনারীর ভিক্ষার জন্য কাতর আর্তনাদের মধ্যে যদি কেউ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখি দাঁড়ান, তিনি কি একাগ্রচিত্ত হতে পারেন? একাগ্রচিত্ততা ব্যতিরেকে প্রার্থনার কি কোন মানে আছে?

আশরাফুল মাখ্‌লুকাৎ .... আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আত্মমর্যাদা হারিয়ে ভিক্ষুকের পর্যায়ে নামে কেন? কোন মুসল্লী কোনদিন নিজ বিবেককে কি তা জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন? অন্য মানুষের প্রতি বা দেশবাসীর প্রতি তার কি কর্তব্য, তিনি কি ভেবে দেখেছেন? অতিশয় ধনীর "ফেৎরা" নিতে গিয়ে অসহায় চার পাঁচ বছর বয়সের বালক-বালিকা ভিড়ের চাপে থেৎলানো মাংসের দলায় পরিণত হয়। কেন? তিনি কি ভেবে দেখেছেন, কেন শিশুদের অমন ফেরেবের মধ্যে পড়তে হয়?

বর্তমান যুগে যখন ফসল ফলানো যায় বিপুল পরিমাণে, তখন "ফেৎরা" গ্রহণের কেউ থাকবে না পৃথিবীতে, এই চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করে না কেন? তাদের মানবচিত্তে এমন প্রশ্ন জাগে, তা মনে করা কঠিন।

ভাগ্যহত বাংলাদেশে উৎসব তাই প্রাণহীন আচার সর্বস্ব এক ক্রিয়াকলাপে পর্যবসিত। নচেৎ বছরের পর বছর দেশবাসীর দুর্দশা ঘোচে না কেন?

কতো রকমের জুলুম না মানুষের দৈনন্দিন দুর্ভোগ।

প্রকৃতির অহরহ ছোবল যেন এ দেশের প্রাত্যহিক নিয়তি। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, গর্কি, প্রলয়-সদৃশ প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা।

পাশাপাশি মানবিক দুর্যোগও ত কম নয়।

এদেশে সব নাগরিক কি অপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন? বহু মানুষ কি পার্থিব সুখ সুবিধাজাত ভোগের লোভে অপরকে স্বাধিকারচ্যুত করার পাঁয়তারা করছে না প্রতিদিন? এই দেশে পাঁচের দশকে জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের কথা স্মরণ করুন। এক শ্রেণীর মানুষ কি তখন আল্লাহর রসুলের দোহাই দেননি এবং বলেননি, সম্পদ সম্পত্তি জমিজিরাৎ আল্লাহর দান। এসব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কোন শাসকের নেই। তাদের জারিজুরি শেষ পর্যন্ত খাটেনি জনমতের চাপে। আজ জমিদারী-প্রথা নেই। মানুষের জমি আছে। যাদের জমি বেশী, তাদের জুলুম হয়ত আছে। কিন্তু তা পূর্বের জমিদারী-প্রথাজাত অত্যাচারের তুলনায় বর্তমানে মাছির কামড়ের বেশী কিছু না।

অপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকলে সমাজে অন্যায় অত্যাচারের পরিমাণ ঢের হ্রাস পায়। সমাজ-বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব বা তথ্য নতুন কিছু নয়। আরো সীমানা বাড়িয়ে বলা যায়, যেখানে গণতান্ত্রিক চেতনা প্রবাহিত সেখানে সামাজিক দুর্ভোগ ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

গণতন্ত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে স্বৈরাচার। সেখানে মানুষের অধিকার পদে পদে খর্বিত, আইন ও ন্যায়ের শাসন লংঘিত। কারণ, প্রবলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্রূকুটির নিচে যে মানুষেরা বাস করে তারা গোটা মানুষ নয়, কোথাও কোথাও পুতুল। পুতুল আর যাই হোক মানুষ নয়। সেখানে আত্মার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রকৃতির ছোবল মানুষের হাতের বাইরে, কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে জানা যায় না। একথাও পূর্ণ সত্য নয়। তা পরে আলোচিত হবে যথাস্থানে। মেনে নেওয়া যাক, প্রকৃতির ছোবল কিছুটা রহস্যময়। কিন্তু তা থেকে রেহাই পাওয়ার কথা ত যুগ যুগ মানুষের নিকট অজ্ঞাত থেকে যাওয়ার কথা নয়। বিশেষতঃ বর্তমানকালে, যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা এক মহিমাময় শিখর-আসীন। মানুষ যখন চাঁদ ত তুচ্ছ, আরো দূরতম গ্রহলোকে পৌঁছানোর জন্যে সচেষ্ট, তখনও বছরের পর বছর প্রকৃতির কাছে বাংলাদেশের অধিবাসীরা এমন নিদারুণ মার খায়।

কেন?

তার জবাবে, সামান্য পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, ব্যাপারটা আরো খোলাসা করার জন্যে।

যতদিন দুঃখ-কষ্ট দুর্ভোগ দুর্দশা সামাজিক সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায়, ততদিন মানবিক অপচয় রোধ করা অসম্ভব।

আসল হদিস, ব্যাপারটা সামাজিক পর্যায়ে পৌঁছানো দরকার।

তবে কি সব সমস্যা সামাজিক পর্যায়ে পৌঁছোয় না?

তার সোজা জবাব : না। এবং তা জবরদস্ত না। অবিশ্যি। সমস্যা সামাজিক পর্যায়ে উন্নীত হতে বহু সময় লাগে, বহু কালক্ষয় হয়।

বাংলাদেশের মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের শিকার বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। বন্যা তাদের সর্বস্বান্ত করে। ঘূর্ণিঝড় মৃত্যুসমুদ্রে নাকানি-চোবানি খাওয়ায়।

অনেকে বিস্মিত হতে পারেন। মানুষ এত ভুগছে, তবু সামাজিক সমস্যা নয়। এ কি ধারা ব্যাপার? তাহলে খেয়াল করে শুনুন, কি কি কাণ্ড ঘটলে তবে অমন পরিস্থিতি সামাজিক সমস্যায় প্রমোশন পায় বা উন্নীত হয়।

একটা ছোট উদাহরণ দেয়া যাক।

বর্তমানে আমরা জানি, টিটেনাস বা ধুনষ্টঙ্কার রোগের দাওয়াই।

বহুকাল পূর্ব থেকেই ওই রোগ ছিল পৃথিবীতে। পূর্বে মানুষ মনে করত, ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয় বাতাসের জন্যে। বাতাসে ভূত-প্রেত আছে। এ বাতাসের দরুন ওই রোগ হয়। পূর্বকালে মানুষ মনে করত রোগটার উৎস আধিদৈবিক। রোগ থেকে রেহাই পেতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সেকালেও। রোগের দাওয়াই হলো : ঝাড়-ফুঁক। ওঝা এসে তা করত। আজও পাড়াগাঁয়ে কোন কোন এলাকায় ওই ঝাড়-ফুঁক চালু আছে। রোগটি সেখানে সামাজিক সমস্যা নয়। রোগের উৎস ত বাতাস, ভূত-প্রেত।

বর্তমানে এ্যান্টিটিটেনাস ইন্‌জেকশান দেয়া হয় যেন রোগ পরে হামলা না করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাড়ফুঁক থেকে ইন্‌জেকশান। শত শত বছরের পাড়ি। লম্বা কাহিনী। তা বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই।

তবে সংক্ষেপে বলা যায়, কোন সমস্যা তখনই সামাজিক পর্যায়ে বা স্তরে পৌঁছায়, যখন বিকল্প প্রতিষেধের জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে এবং তার যথাযথ প্রযুক্তি-প্রয়োগ ঘটে রোগের মোকাবিলায়।

তার আগে সমস্যা হওয়া বাতাসের ব্যাপারই হয়ে থাকে। সমস্যা তখনও বায়বীয়, আদৌ তা সামাজিক নয়।

বন্যা ত এ দেশের বেশ পুরাতন মসিবত।

কেন বন্যা হয়? হিন্দু পুরাণে আছে, জলের দেবতা বরুণ। তিনিই নিয়ন্ত্রণ কর্তা। তার ইচ্ছায় জোয়ার-ভাটা হয়। আদিমকালে বন্যা ছিল আধিদৈবিক ব্যাপার। তা মোটেই সামাজিক সমস্যা নয়।

মানুষকে শত শত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সমস্যাকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নিত করতে—শত শত শতাব্দীর ভেতর কতো কাণ্ড না গড়িয়েছে বন্যার পানির মতো। ফলে, মানুষও বদলেছে। বদলেছে তার দৃষ্টিভঙ্গী। আজ আর কেউ মনে করে না, ভূমিকম্প হয় গরুর শিঙের উপর পৃথিবীর অবস্থানের ফলে। যখন গরু শিং নাড়ে, পৃথিবী নড়ে। তার ফলেই ভূমিকম্প। পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমান যুগে পৌঁছানোর কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত ও সরল নয়। কতো রকমের প্রতিবন্ধকতা না পেরোতে হয়েছে। যার ফলে সমস্যা সামাজিক হয়েছে। অথচ পূর্বে তা-ই ছিল আধিদৈবিক বা পারলৌকিক।

একটি সমস্যা কিভাবে সামাজিক হয়ে ওঠে? তার বিভিন্ন উপাদান বা ফ্যাক্টরের দিকে লক্ষ্য করা যাক।

প্রথম প্রয়োজন, বিকল্প সমাধানের জ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসা। অর্থাৎ কেন কিছু ঘটে তার হেতু জানা।

দ্বিতীয় শর্ত : পরিস্থিতির মোকাবেলায় কি কি প্রয়োজন সে-বিদ্যাও মানুষের আয়ত্তাধীন।

বন্যার কথায় ফিরে আসা যাক।

যদি বন্যার সত্যি সত্যি মোকাবেলা করতে হয়, তাহলে দরকার : হাইড্রোলজিস্ট (পানিবিজ্ঞানী), পূর্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং আরো আনুষঙ্গিক জ্ঞান। যদি তা না থাকে তাহলে বন্যার মোকাবিলায় হা-হুতাশই সার হবে। দুঃখের জগদ্দল পাথর আর বুক থেকে নামবে না। এখন ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান মানুষের মুঠির মধ্যে। তবু বাংলাদেশের অধিবাসীদের দুর্দশা ঘোচে না কেন? কারণ, বন্যা-শায়েস্তার জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ করা হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমস্যার সামাজিক পর্যায়ে পৌঁছতে আর একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে: মোকাবিলা করার সদিচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি পূর্ণ সদিচ্ছা না থাকে এবং ইচ্ছা হয় দায়সারাগোছের—জনসাধারণকে বোকা-বুঝান বুঝ দিতে—তাহলে সমস্যা আর সামাজিক পর্যায়ে পৌঁছবে না।

এখানে আরো মনে রাখা বাঞ্ছনীয়, স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মোকাবেলার সদিচ্ছা দুষ্প্রাপ্য। কারণ, সেখানে মানুষের অধিকার অস্বীকৃত এবং মুষ্টিমেয় লোকের উপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করে।

অনেক দেশে তাই বহু সমস্যা এ যুগে পারলৌকিক পর্যায়ে থাকে যায়। আর সেখানে ইহলৌকিক সমস্যার নানা রকম পরলৌকিক সমাধান অহরহ বিলি করা হয়। আজও।

২

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা না থাকলে স্বাধিকার-বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে থাকে প্রবলের ধমকের মুখে।

এমন পরিবেশে অন্যায়-জুলুম নানারূপে দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রাদুর্ভাব ঘটে ভণ্ডামি বা মুনাফেকির। তেমন যুগে আল্লাহ্‌র রসুলের বাণী সবচেয়ে বেশী অমার্যাদা লাভ করে। মানুষের ঘোষণা প্রতিশ্রুতি এবং কর্তব্য-পালনের মধ্যে কোন সংগতি থাকে না। বিশেষ করে চোখে পড়ে এমন-কি যেসব মানুষ নিজেদের নায়েবে-নবী বা রসুলের প্রতিনিধি ব'লে জাহির করে, তাদের অনেকের মধ্যে বিষয়-আশায় জাগতিক আরামের দিকে গৃধ্নু দুই চোখ এবং লেলিহান জিহ্বা মেলে দেয়ার খসলৎ। গায়েব-কওম ইহুদী-নাসেরাদের আবিষ্কৃত দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য (এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজিডেয়ার, জেট-বিমানের প্রথম শ্রেণীতে দেশ-বিদেশ বা তীর্থযাত্রা প্রভৃতি) গ্রহণে তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না। অমঙ্গলের থাবার নীচে যখন দেশের মানুষ পশু-সুলভ জীবনযাত্রায় বাধ্য হয়, তখনও তারা নির্বিকার থাকে শোষক-শ্রেণীর প্রতি যাদের দুষ্কর্ম অমন পরিস্থিতির জন্মদাতা।

সমাজে দুর্দিন থাকলে ঈদের জামাত কি সত্যিকার অর্থে কবি-কর্তৃক স্বাগত খুশীর জামাত হতে পারে?

প্রশ্ন উত্থাপন করুন আপন-আপন বিবেকের নিকট।

সামাজিক দুর্দিনে ঈদের জামাত পরিণত হয় জানাজার জনতায়। সম্মুখে নয় শুধু আশপাশে চতুর্দিকে আমাদের ভাই-বোনের লাশ ছাড়া কি থাকে? অকাল-মৃত্যু, অপমৃত্যু, মহামারীর তাড়না ত আমাদের নিত্যকার সঙ্গী। উড়ির চর কি নতুন ব্যাপার? আর্তের হাহাশ্বাস আর্তনাদ-মুখরিত সাটুরিয়া উপজেলার আকশে কি শুধু একটি এলাকার আকাশ?

সকল সমস্যাকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নীত করে এ যুগে সদিচ্ছাসমূহ জনগণের মঙ্গল-বিধানে এগিয়ে না এলে কোনদিনই আমরা সত্যিকার ঈদের জামাতে সামিল হতে পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলানা ভাসানীর নিকট খোলা চিঠি

পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব,

আমার শত কোটি সালাম আপনার কদম মুবারকে পৌছে।

আমি আপনার একজন নগণ্য ভক্ত। আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তার প্রয়োজনও নেই। কারণ, আপনার পিতৃমূর্তি বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আজ বিস্তৃত। এই ভূখণ্ডের সকলেই আপনার সন্তানতুল্য। তাই মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য আপনার মত স্নেহপ্রবণ উপদেষ্টা আর কোথায় মিলবে? বক্ষ্যমান পত্র কতগুলো দ্বিধাদ্বন্দ্ব-প্রসূত। তা আমার অজ্ঞতা থেকেও হোতে পারে। নিজের মুখে দুর্গন্ধ কেউই টের পায় না।

কিশোর কাল থেকে বিগত তিরিশ বছর আপনার সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার আমি একজন বিস্ময়ব্যাকুল দর্শক। সবসময় যে আপনাকে বুঝতে পেরেছি, তা নয়। নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন। যখন ১৯৬৫-৬৬ সালে আইয়ুব খানের ফ্যাসিস্ট জালেমশাহীকে আপনি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন, তখন বিচলিত না হয়ে পারিনি। আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উপর আমার আস্থা অপরিসীম। সেদিন ভেবেছিলাম আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান তা বোঝার জন্যে যথেষ্ট নয়, যদিও মনের সঙ্গে মেলাতে অক্ষম। কিন্তু বর্তমানে আপনার রাজনৈতিক ভূমিকা দেখে আমি এমন অতিমাত্রায় বিচলিত যে, আপনাকে পত্র না লিখে থাকতে পারলাম না।

ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী শাহীকে নাস্তানাবুদ করার অন্যতম কারিগররূপে আপনি জানেন, শাসক গোষ্ঠী টিকে থাকার জন্যে কি ছল এবং কৌশল গ্রহণ করে। পবিত্র ইসলাম ছিল তাদের কাছে ঝোপ-রূপে ব্যবহৃতব্য একটি বিশেষ অস্ত্র। তাই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতি তাদের অত মোহ এবং আসক্তি। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা পদে পদে স্থানে-অস্থানে ইসলামের জিগির তুলত। পঁচিশ বছর লেগে গেল জনসাধারণের দিক থেকে তাদের এই পাঁয়তারা ধরে ফেলতে। তখন আর কোন ভুল হয়নি। তাই বিভ্রান্ত না হয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যখন নিজেদের রাষ্ট্র পত্তন করে, তার অন্যতম স্তম্ভরূপে ঘোষিত হয় : ধর্মনিরপেক্ষতা। আজ সর্বজনবিদিত, যন্ত্র শিল্পের যুগে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের গাঁটছড়া বন্ধন কখনও কল্যাণকর নয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শাসকদের সেই অস্ত্র আজ নতুন করে আপনি হাতে তুলে নিয়েছেন। জামাতে ইসলামী ও ঐ জাতীয় জনবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো জনমতের চাপে কোথাও আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে অক্ষম। অথচ আপনি তাদেরই ভূমিকা অজানিতে পালন করে চলেছেন।

ইউরোপের চারশ' বছরের ইতিহসের নজির আমাদের সামনে রয়েছে। সেখানেও ধর্ম এবং রাষ্ট্র—চার্চ ও স্টেট—অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল। বহু ত্যাগ এবং রক্তক্ষয়ী সাধনার ফলে তা বিচ্ছিন্ন করা হয়। বর্তমান ইউরোপের জড় এবং মানসিক ঐশ্বর্য সেই সংগ্রামের ফল। অথচ আপনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করছেন না। আপনি স্বচক্ষে ইউরোপকে দেখে এসেছেন। সেখানে মানুষের মর্যাদা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার কাছাকাছিও মুসলমানেরা চৌদ্দশ' বছরের যেতে পারল না কেন? আপনি কি ভেবে দেখেছেন? মানুষ হিসেবে অবমাননা এই উপমহাদেশে কি, খোদ ইসলামের ভিত্তিভূমি আরব দেশে যা চালু আছে, তা নিতান্ত কলঙ্কের ব্যাপার। উদাহরণতঃ আজও গোলামের মত কিশোর বালকেরা চব্বিশ ঘণ্টা গেরস্থালির কাজে খাটে। মানুষ ভারবাহী পশুর মত রিকশা টানে। এই দৃশ্য জাতির সম্মানে খুব অনুকূল নয়। কেন এমন ঘটল? আপনি কি ভেবে দেখেছেন? সামাজিক কল্যাণের কথা দূরের ব্যাপার। এক ইউরোপ থেকে ওষুধ না এলে আমরা ত মাছির মত শতে শতে মরব। তাবিজ পানি-পড়া দিয়ে কি গড় আয়ুর হার বেড়েছে? নরওয়ে সুইডেনের মত দেশে গড়ে মানুষ ৮২ বছর বাঁচে। রাশিয়ায় ৭৯। ইংল্যান্ডে ৬৮। এই দেশে গড়ে ৪৮ বছর। কেন? কারণ, মধ্যযুগীয়তার পাঁক থেকে আর আমরা উঠতে পারিনি। রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশ ত আর এক ধাপ অগ্রসর। তারা ধর্মীয় সব কুসংস্কার উচ্ছেদের পক্ষপাতী। অথচ আপনি আবার নতুন করে পাকিস্তানী শাসকদের ধুঁয়া ধরেছেন। আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, খুনী ভুট্টো সকলেই ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলত। আপনার মুখেও তার প্রতিধ্বনি। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে? ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে কারো বিরোধ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা যত জলদি বর্জন করা যায়, ততই মানুষের মঙ্গল। শাসকদের নিজেদের উদরপূর্তি যথাযথ বজায় রাখতে, মৃত্যুর পর বেহেশ্‌ত দেখিয়ে দেয় জনসাধারণকে। তার জন্যে কোন পরিশ্রম নেই তাদের। তেমন অসুবিধাও নেই। খুব সহজে কিস্তিমাৎ করা যায়। আপনি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চিরকাল লড়েছেন। অথচ তাদেরই প্রতিধ্বনি তুলে চার মাস আগে, বলেছিলেন, কোরান-সুন্না মোতাবেক শাসনতন্ত্র গঠিত না হলে আপনি তা বর্জন করবেন। পাকিস্তানের দালাল-দার্শনিক এ. কে. ব্রোহী ত পাঁচ হাজার টাকা বাজি ধরেছিল, কেউ যদি ওইভাবে শাসনতন্ত্র রচনায় সক্ষম হয়। অবিশ্যি পরে এই "মন-মন-শা-ফরীদ-বগল-মে হট" আইয়ুবের ফৌজী তখতে আইনমন্ত্রী হতে এতটুকু সরম পাননি। পবিত্র ইসলাম এবং মানবতার বেইজ্জতির পথ, আশা করি, আপনি আর পিচ্ছল করবেন না। জনসাধারণ বহু দাম দিয়েছে। ইসলামের পতাকাবাহী জঙ্গীশাহীর কাছে লুণ্ঠিত সম্পদ, মা-বোন-কন্যার আব্রু বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর, না জনাব মওলানা সাহেব। দোহাই, আর না।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ধর্মের জিগীর তুলত। কারণ, তাদের জানা ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িকতার মারীবীজ জিইয়ে রাখার অমন তোফা সড়ক আর দ্বিতীয় নেই। ওই বিষাক্ত রাজনীতির পথ ধরে এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা গণ-আত্মহত্যার কোন অতল খাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত অন্ততঃ আপনার কাছে বলা বাহুল্য। আপনি মুসলিম লীগের কর্মী এবং নেতা হিসাবে একদা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। আপনার চুরানব্বই বছর বয়সের গত পঁচিশ বছর বাদ দিলে বাকী ঊনসত্তর বছরই কেটেছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য, অমন বয়সেও আপনার মধ্যে নিজকে অতিক্রম করার মহৎ শক্তি ছিল। তাই দেখা যায়, তাবৎ মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে আপনিই একমাত্র সেই মোহ-গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। কারণ, জনতার নিবিড়ে ছিল আপনার শিকড়। আর সকলে যথাস্থানে। চৌধুরী খালিকুজ্জামান আজও জীবিত। ৮২ বছর বয়সে পক্ষাঘাত পঙ্গু বিরাট টেক্সস্টাইল মিলের এই মালিক সেদিনও জঙ্গীশাহীর তলপী বয়ে বেড়িয়েছে বাংলাদেশের আন্দোলনের বিরুদ্ধে উদগার তুলে। এমন কানা, অন্ধ আরো কিছু মুসলিম লীগ নেতা জীবিত আছে। কারো মধ্যে বিন্দুমাত্র সততা থাকলে কোটি কোটি মানুষকে দুর্দশা-মৃত্যুর কবলে টেনে আনার প্রায়চিত্তস্বরূপে একজন অন্ততঃ আত্মহত্যা করত। বেঈমানদের ব্রত সবসময়ই কোন রকমে টিকে থাকা।

আপনার সাম্প্রদায়িক উচারণসমূহ গোটা দেশকে আবার বর্ণবিদ্বেষের পঙ্কিল পথেই ঠেলে দেবে। জাতীয়তাবাদের অর্জিত চেতনাটুকু ধ্বংস হয়ে গেলে তার পরবর্তী পর্যায় সামজতন্ত্র আর কোন পথ ধরে আসবে? মধ্যযুগীয় চেতনা বর্তমানে কোন সমাজবিপ্লবের সহায়কা নয়।

অতি দুঃখজনক আপনার বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িক আচ্ছন্নতার পরিপূরক আপনার ভারত-বিরোধী ভূমিকা। ঐতিহাসিক কারণেই, বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক জটিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত ভারত-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয় এবং ভারত-বিরোধিতা রূপ পায় জঘন্য সাম্প্রদায়িকতায়। পাকিস্তানী শাসকেরা নিজেদের জাগতিক স্বার্থে আধ্যাত্মিকতার আলখেল্লাসজ্জিত ওই মানসিকতা দু'দিক থেকেই জোরদার রেখেছিল দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আপনার নীতি অজানিতে তারই জের মাত্র। জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এই উপমহাদেশে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করা উচিত। তেমনই প্রয়োজন, দুই দেশে সৌহার্দ্য ও দুই সম্প্রদায়ে মৈত্রী। অর্থনৈতিক সহযোগিতা উভয় দেশের স্বার্থেই কাম্য। অথচ এমন সহযোগিতাকে আপনি সাম্রজ্যবাদীদের মত স্বাধীনতা বিলোপের আশঙ্কার সঙ্গে এক করে দেখছেন। আপনার ভারতভীতির আর কোন হেতু আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি জননেতা হলেও জনগণের উপর আপনার আস্থা এখানে অনুপস্থিত। সাড়ে সাত কোটি লোকের স্বাধীনতা কেউ হরণ করতে পারে না। ভিয়েতনাম আমাদের দেশে

এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়ে আধুনিকতম অস্ত্রধারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গত বিশ বছর ধরে প্রতিদিন কী সবক দিচ্ছে তা আপনার জানা। আমাদের মহান প্রতিবেশীর প্রতি আপনার আরোপিত অসাধুতা নিতান্ত অমূলক। অন্ততঃ বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই। বেয়াদবি হলে মাফ করবেন, আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত বাংলাদেশ আর প্রদেশ নয়। এখন সার্বভৌম দেশ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমুদ্রে আমাদের মত ছোট রাষ্ট্রকে ছোট ভেলার মত ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অতি সাবধানী দক্ষতা লাগে। তপ্ত বুলি সম্বল করে লগি-ঠেলা দায়। নিজেদের হাত-পায়ের তাগদের দিকেও কিছু কিছু লক্ষ্য রাখা দরকার বৈকি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, আমার মতে, ভারতের ঋণ-অস্বীকার অকৃতজ্ঞতার নামান্তর। আপনি জনসমাবেশে কয়েকবার বলেছেন, প্রয়োজন হলে আরো তিরিশ লাখ প্রাণ দেবে। কোন ধার্মিক ব্যক্তির কাছে মৃত্যু বিলাস নয়। চুরানব্বই বছর বয়সে আপনি কেন ভারতে চলে গেলেন? তার জবাব আমরা কোথায় খুঁজব? অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা আপনিই প্রথমে করেন। আপনার নিজস্ব স্টাইলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বলেন, "এবার আস-সালামো আলায়কুম।" সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আপনার। কিন্তু আপনি সকল দায়িত্ব এড়িয়ে প্রথমে নিজের প্রাণ রক্ষা করলেন বিদেশের মাটিতে। গণহত্যার সম্মুখে দাঁড়াতে আপনিও সাহস পাননি। আর সেই গণহত্যার নৈতিক নয় শুধু হাতিয়ারগত সমর্থক সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং সাম্যবাদী চীন। সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্যবাদ যেন দুই ইয়ার। কি ঘোলাটে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। তা থেকে উদ্ধাকারীদের উপকার এত সহজে বিস্মৃত হওয়া বোধহয় নৈতিকতা-সঙ্গত নয়, শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেব। অবিশ্যি যাঁরা নিজের প্রাণের অধিক মূল্য দেন, অথচ অপরের প্রাণের প্রতি উদাসীন—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বর্তমান ছাপ্পান্ন—এই বিয়াল্লিশ বছর সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছি এই জন্যে যে, এই ভাবধারা জীবনের সাধক। গত বছর বড় চোট খেলাম। চীনদেশ থেকে প্রথম জানা গেল, সমাজতন্ত্র মৃত্যুর উপাসক, দুর্জনের দোসর। এবং বাঙালীর মৃত্যু তো গরু-ছাগল, কীট-পতঙ্গের অক্কা-প্রাপ্তি। বর্ণবিদ্বেষে-দুষ্ট বললেও চীন নেতাদের কিছু কম বলা হয়। তাই দেখা যায় ষাট লাখ লোকের বলিদাতা জল্লাদ সুহার্তোর দেশ ইন্দোনেশিয়া এবং সমাজতন্ত্রের ঘাতক নিমেরীর সুদান চীনের স্বীকৃতি পায়, আর বাংলাদেশ বাইরে পড়ে থাকে। সাম্যবাদী চৌ-এন লাইয়ের মুখে শোনা যায়, "কোন মুসলমান দেশ বাংলাদেশকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি।" যে দেশে ধর্ম জনসাধারণের আফিমরূপে উপহাসিত, সেখানেও ধর্মের দোহাই স্বার্থ-মোতাবেক দেওয়া চলে, এখন চোখে পড়ছে। আর সম্ভবত ইতিহাসের চরম কৌতুকনাট্য অভিনীত হয়, যখন চৌ-এন লাই নরওয়েজীয়ান সাংবাদিকদের বলেন, "সত্যিকার স্বাধীনতার পথে এগোলে, আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন জাতিসংঘে চীনের প্রবেশাধিকার ঠেকিয়ে রাখতে একই যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, "যদি সত্যিকার রাষ্ট্র হয়।" ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি।

আসলে ব্যাপার কি জানেন, মওলানা সাহেব, রাজনীতিতে নৈতিকতার আর কোন দাম নেই। আপনার তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব-প্রদীপের পাশে যে সব মার্কসবাদী পতঙ্গ উড়ে বেড়ায় তারা মুখ খোলে না যখন সাম্প্রদায়িকতার গলিত-তপ্ত লাভা আপনি দেশময় বইয়ে দেন। বর্তমানে জাতীয়তাবাদের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে যত শিগগির আন্তজার্তিকতার প্রাঙ্গণে পৌঁছানো যায়, ততই বিশ্বের মঙ্গল। নচেৎ ভয়াবহ হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে গোটা মানবগোষ্ঠী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। রবিবার এদিক থেকে আন্তর্জাতিক বার। সব দেশেই সেদিন ছুটি থাকে। অথচ আপনার বিগত প্রেস কনফারেন্সে আপনি শুক্রবারে ছুটির দাবী জানালেন। এই মানসিকতাকে সাম্প্রদায়িক ছাড়া আর কি বলা যায়? বাংলাদেশে হিন্দু-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায় আছে তা আপনি ভুলে যেতে পারেন না। অথচ আপনার লেজুড় মার্কসবাদীরা চুপ করে আছেন। সাম্প্রদায়িকতার পথে সমাজতন্ত্র আসবে? একথা শুনলে স্বর্গে মার্কসের নিশ্চয় অনিদ্রা রোগ হবে। নৈতিকতার অভাবেই, মওলানা সাহেব, বামপন্থীরা একটা আঁচড় কাটা বিরোধী দল পর্যন্ত হতে পারছে না। রাজনৈতিক আশু সুবিধার জন্যে নীতিভ্রষ্ট হলে, তার পরিণতি এমনই ঘটে। গত দশ বছর ধরে তা দেখে দেখে হদ্দ।

অনেক যন্ত্রণায় আপনার কাছে এসব কথা লিখছি। বহু বামপন্থী দেশপ্রেমের মনোপলি নিয়ে বসে আছে। তারা নিজের দেশকে দেখে না—যেখান থেকে বা যে-ভিত থেকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছতে হবে। বাঙালী মুসলমানেরা ইরান-তুরান করত, নিজের মাতৃভূমিকে দেখত না। তাদের সেই ঐতিহ্য এবং খাসলৎ এখনও আপ্ত রয়েছে। মাঝে মাঝে শহর-ভিত্তিক উঁচু মধ্যবিত্ত ঘরের কিছু ছেলে আপনার কাছে হাজির হয়। তাদের বাচনিক আতশবাজি হয়ত আপনাকে মুগ্ধ করে, যেন বিপ্লব তাদের জন্য মুখাপেক্ষী। আসলে, দেশপ্রেমের চেয়ে ইগো-ফিডিং বা অহম-বিলাসই তাদের কাছে মুখ্য। তাই আপনার কাজের বিশ্লেষণে তারা ভয় পায়। আজ যে কথাগুলো আপনাকে লিখছি, তাদের কি বলা উচিত ছিল না, যদি তারা নিজেদের মার্কসবাদীরূপে দায়ী করে? এদের অনেককে ত নাগরিক বলা যায় না, যেহেতু কৃষক-মজদুরের এই প্রবক্তারা অনেকে জীবনে নিজের মেহনতে এক পয়সা রোজগার করেনি। দুর্নীতিপরায়ণ পিতা-ভ্রাতা বা আত্মীয়ের অসদুপায়ে অর্জন-পোক্ত পকেটের উপর বিচরণশীল এই শ্রেণীর তরুণেরা আসে নেহাৎ রোমান্টিসিজমের ধাক্কায়, নতুন কিছু করার তাগিদে। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তের দুঃখ তারা কল্পনায় অনুভব করে।

নিজকে অতিক্রম করার মহৎ শক্তির অধিকারী আপনি। আপনার কাছে

একান্ত অনুরোধ, বিবেকের উপদগাতা নৈতিকতার পতাকাবাহী হিসেবেই আপনি আমাদের মধ্যে বিরাজ করুন। সাংগঠনিক রাজনীতি আপনার ধাতের জিনিস নয়। গত ভুখ-মিছিলের পর গণভবনে আপনি স্বীকার করেছেন নিজের মহৎ সারল্যে,".... বেঁচে যদি থাকি নজরুল, তাহলে আমাকেও তোমাদের দরকার হবে। আমি ফাইলওয়ার্ক বুঝি না, সরকারী অ্যাডমিনেস্ট্রশান গদীতে বসে চালাতে জানি না। আমি চিরদিন মানুষের দাবী আদায়ের জন্য অপোজিশন করি..... ।"

(*দৈনিক বাংলা*, ৪, ৯, ৭২)।

কিন্তু অপোজিশন সবসময় নির্মাণ নয়। বিরোধিতার যথা-প্রয়োগ না ঘটলে তা বিপরীত ফল ফলায়। সমাজে নৈতিকতার নিশান-বরদার থাকলেই রাজীনতি সঠিক পথে এগোয়। আপনাকে তাই এই দেশে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। রাজনীতির দৈনন্দিনতার মধ্যে অনেক কাজ থাকে, যার ফলে আসল আদর্শ চোখের সামনে থেকে সরে যায়। আপনি ধার্মিক ব্যক্তি। আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই, আপনি আমার চেয়ে ভালমত বুঝেন : পুরোহিত এবং প্রফেটের পার্থক্য। প্রফেট অর্থাৎ মহাপুরুষ। যার প্রতিফলন শরীয়ত এবং মারফতে দেখা যায়। শরীয়তে দৈনন্দিনের হিসাব রাখতে হয়, যেহেতু সমাজ-সংহতি রক্ষা তা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওই পথে প্রায়ই আদর্শ খোওয়া যায় এবং কড়াকাড়ি শেষ পর্যন্ত ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে। ধর্মের লক্ষ্য বিচ্যুত হয়। দুর্নীতিপরায়ণ শোষক এবং জালেমেরা তাই ধর্মের লেফাফার উপর এত জোর দেয় নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে। জনগণ সহজে বিভ্রান্ত হয়। তাই দেখবেন, প্রতি বছর নবী-দিবস পালনের ঘটা গত পঁচিশ বছরে যত বেড়েছে দুর্নীতি জুলুমও তত বেড়েছে। শেষে ৩০ লাখকে প্রাণ দিতে হয়। মারফত সেখানে আদর্শের নির্বস্তুক বা অ্যাবস্ট্রাক্‌ট রূপ, শরীয়ত যেমন কংক্রীট। কিন্তু এ নির্বস্তুক রূপের প্রয়োজন আছে, নচেৎ ধর্মের আদর্শের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা। আপনি তাই পুরোহিতরূপে নয়, প্রফেটের মত আমাদের মধ্যে বিরাজ করুন। দৈনন্দিন রাজনীতি আপনার শুভ্র প্রতিমূর্তির উপযোগী নয়। গ্রাম গ্রামান্তরে শহরে বন্দরে আপনি বিবেকের চারণিক কণ্ঠস্বররূপে ধ্বনিত হন। কিন্তু কোন দলীয় সীমাবদ্ধতায় নিজকে আটক করবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ।

আর একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ। আমাকে কোন কায়েমী স্বার্থের ধারকবাহক মনে করবেন না। আমি বাংলা সাহিত্যের দীনমজুর মাত্র এবং স্বধর্মচ্যুত নই। আমার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আপনি আইয়ুবের জঙ্গীশাহীকে যখন সমর্থন দানরত তখন উপন্যাস-রচনা মারফত আমি তাদের মুখে থুথু দিয়েছি এবং সেই থুথু তারা পাঁচ হাজার টাকা খেসারতসহ হজম করতে বাধ্য হয়েছিল অবস্থার গতিকে। আপনার দীদার দর্শন লাভের লোভ আমার সবসময় আছে। সাক্ষাতে খোলসা বয়ানের ইচ্ছা রইল।

আপনি গোটা দেশের মুরুব্বী। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে নিজ গুণে মার্জনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন।

পুনরায় আদাব সালাম অন্তে
ইতি।*

* সতর বছর পূবে লেখা এই চিঠি। পাঠককে তদানীন্তন পটভূমি স্মরণ রাখতে অনুরোধ জানাই।

পূর্ণ স্বাধীনতা : চূর্ণ স্বাধীনতা

১

বর্তমানে যদিও বাংলাদেশ নামে খ্যাত এই ভূখণ্ড, তার স্বাধীনতা দুইবার অর্জিত হয় এবং তা চব্বিশ বছরের ব্যবধানে। ব্যাপারটা রসিকতার মত শোনায় নাকি? ইতিহাসে প্রহসন হিসাবে এই কাহিনী, বোধ হয় চিরকাল অনন্য হয়ে থাকবে।

পনরই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে প্রথমবার স্বাধীনতা পায় এই ভূখণ্ড। বঙ্গদেশ থেকে তার নামকরণ ঘটে : পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ বৃহত্তর পাকিস্তানের এক অংশ। অন্য অংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান।

পুরাতন কাসুন্দি। অনেকেই চেখেছেন। তবু আবার নতুন করে ঘাঁটতে হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের তরুণদের জন্যে তার প্রয়োজন আছে বৈকি।

দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা লাভ করে এই ভূখণ্ড ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে, যার ফলে পরিবর্তিত নামঃ বাংলাদেশ।

প্রহসনেরই ব্যাপার। পৃথিবীর কোথাও এমন কাণ্ড ঘটেনি। যেকোন সভ্য জাতির নিকট অমন কাহিনী মনে হবে অসম্ভব বা রূপকথা। কিন্তু আমাদের কাছে তা অসম্ভবও নয়, রূপকথাও নয়। কারণ, রক্ত, অশ্রুর দরিয়া পার হয়েই এই ভূখণ্ডের মানুষ তার হারানো ঠিকানা ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু কেন এমন কাণ্ড ঘটল?

একটা হিন্দুস্থানী প্রবাদের জের টানলে তার জবাব খুব সহজে দেয়া যায় : দাল মে কালা। অর্থাৎ, ডালের ভেতর কালো খোসা ছিল প্রচুর।

আপনার আমার পক্ষে পরবর্তী উপসংহার টানা আর কঠিন কিছু নয়। অর্থাৎ, স্বাধীনতা পূর্ণ ছিল না। দাল মে কালা থা। চূর্ণ স্বাধীনতা স্বস্তি দিতে অক্ষম। অস্থির অশান্তির ভেতর তার দৈনন্দিনতা রূপ পায়। তার পরিসমাপ্তি ঘটে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বিসর্জন মারফত।

আজ তাই অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখা উচিত। বর্তমান স্বাধীনতার 'দালে কালা' ঢুকে যায়নি ত? কারণ, চূর্ণ স্বাধীনতার দাম বড় চড়া। বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিবাসীরা তা আজও হাড়ে হাড়ে টের পায়।

কেন চব্বিশ বছরে পৃথিবীর মানুষের কাছে পাকিস্তান হাস্যাস্পদ নজির হয়ে রইল? তার দুই অংশ এক ধড়ের মত এক রাষ্ট্ররূপে কেন টিকে থাকল না?

ভবিষ্যতে পদক্ষেপের পূর্বে বর্তমানে তাই অতীত-খনন বাধ্যতামূলক।

কেন পাকিস্তানের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল?

ছোট প্রশ্ন। কিন্তু তার জবাবের পূর্ণ বিবরণ বিরাট গ্রন্থের দাবিদার। এখানে তেমন সুযোগ নেই। মোটা মোটা দাগে সংক্ষিপ্ত কিছু পরিণাহ বা কনট্যুর তুলে ধরাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানের বনিয়াদের মূলে সমাজ বিজ্ঞানের কোন সুষ্ঠু চিন্তা ছিল না। সংক্ষেপে দ্বিজাতিতত্ত্ব নামে খ্যাত— এই ব্যাপারটি এক কথায়, বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার আর এক উদ্‌গার বললেই চলে। তার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম লীগের নেতারা এক নতুন রাষ্ট্রের খোয়াব দেখেছিলেন।

ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, আবহকালের নানা ঐতিহ্য, জীবনযাপনের ধারা, ধর্ম ইত্যাদি অসংখ্য উপাদানে এক দেশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মুসলিম লীগের কর্ণধারাগণ ধর্মকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিলেন।

ধর্ম জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। অবিশ্যি। কিন্তু তা কখনও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। অর্থাৎ, ধর্ম নিয়ন্ত্রকের জায়গা পায় না কোনদিন।

পাকিস্তানের দুই অংশে ভৌগোলিক ব্যবধান ১২০০ মাইল। সাংস্কৃতিক ব্যবধান আরো দুস্তর। কিন্তু লীগের নেতাগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধার ধারতেন না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু উচ্চ মধ্যবিত্ত ও তাদের লেজুড় মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাশাপাশি হিন্দু বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত, তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রভুদের স্বার্থের ইন্ধনের শিকার হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘিষ্ঠের আত্মনিয়ন্ত্রণ—আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা। কিন্তু তার মোকাবিলায় নেতারা মধ্যযুগে ছুটে গেলেন। এ যেন দূরপাল্লা ক্ষেপণাস্ত্রের বা মিসাইলের মোকাবিলায় তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

তার ফল অবিশ্যি হাতে হাতে পাওয়া যায়নি। চব্বিশ বছর লেগেছিল ফোঁড়া পেকে উঠে মুখ নিতে।

ইতোমধ্যে অর্থাৎ এই চব্বিশ বছরে পাকিস্তানের শাসকরা আধুনিক রাষ্ট্র গড়তে আধুনিক চিন্তার দ্বারস্থ হলেন না একবারও। তাহলে হয়ত ভরাডুবি বন্ধ হোত। অবিশ্যি আধুনিক লেবাস খানাপিনায় ডুবে যেতে দেরী করেননি তারা।

পাকিস্তানের উভয়াংশে অর্থনৈতিক সমতা ছিল না। পূর্বাংশ ঢের পশ্চাৎপদ। রাষ্ট্রনায়কগণ পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমের উপনিবেশরূপে রচনায় মনোনিবেশ করলেন। কারণ, রাজনৈতিক শক্তি তাদেরই কব্জায় ছিল। অর্থাৎ তারা শোষণে মন দিলেন। এই শোষণের ক্ষত এবং পচন ঢাকা দিতে তাদের 'কোশেষ' কম ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তবে তার মধ্যে একমাত্র প্রধান হাতিয়ার ছিল পবিত্র ইসলামের জিগির এবং অতি সরলীকৃত আর একটি প্রতিষেধ : মুসলমান সব ভাই ভাই, পাকিস্তানের দুই অংশ যেন একই দেহে দুই চোখ ইত্যাদি শ্লোগান। পূর্বাংশ থেকে কোন দাবিদাওয়া উঠলে তা হোত প্রাদেশিকতা বা রিজিওন্যালিজম। যখন দুই অংশের অসমতা ওদের মাথায় পেরেক ঢুকিয়ে দেখিয়ে দেয়া হোত তখন তার জওয়াব মিলত : ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার আজও মনে আছে, ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের এক প্রধান হুজুর ব্যক্তি (তার নাম উচ্চারণে আমার আজও ঘেন্না হয়) বললেন যে, ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের দুই অংশ এক হয়ে যাবে। আইয়ুব খানের পদলেহী এই জনাব জানতেন না আর দুই বছরের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর হাতে তার অপমৃত্যু ঘটবে, কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে ইতিহাসের নায়ক নয়, ঘৃণ্য জীব হিসেবে, দেশবাসীর ধিক্কারসহ।

এইখানে চূর্ণ স্বাধীনতার কয়েকটা আলামর্ত (লক্ষণ) পাওয়া গেল।

রাষ্ট্রপরিচালনার পেছনে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক চিন্তা অবশ্য অবশ্য অপরিহার্য।

শোষণের ছিদ্র তা যত ছোটই হোক না কেন তা বন্ধ করার চেষ্টা শুধু বাঞ্ছনীয় নয় বরং তা-ও অপরিহার্য।

দ্বিজাতিতত্ত্ব, অন্য কথায়, সাম্প্রদায়িকতা অচল বর্তমান যুগে রাষ্ট্র-গঠনে।

মুসলমানের পক্ষে এই এক বিরাট বাধা জাতীয়তাবাদী হওয়ায়। অথচ বর্তমানে সব রাষ্ট্রই জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান হয়ত কোন এক রাষ্ট্রের নাগরিক, কিন্তু তার জান পড়ে আছে ইরানে তুরানে কি অন্য কোন দেশে। ফলে তার জাতীয়তাবাদের খুঁত থেকে যায়। তা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। ইরান-ইরাকের আট বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এখন পৃথিবীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন: এক আরবী ভাষা উভয় রাষ্ট্রে, একই ধর্ম ইসলাম। কিন্তু তা জাতীয়তাবাদের গায়ে আঁচড় বসাতে অক্ষম।

বর্তমানে জটিল বিশ্বের সমস্যার অতি সরলীকরণের মোল্লা-পুরুতগণ অবিশ্যি চোখে কিছু দেখে না বা কানে শোনে না। কোরানের ভাষায় যারা সুম্মুন বুক্‌মুন বধির ও বোবা।

আধুনিক রাষ্ট্রনির্মাণে কোন সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া অর্থ আখেরে আত্মহত্যা। সোজাসুজি ষাঁড়ের শিং পাকড়ানো তাই জরুরি কর্তব্য।

স্বাধীনতার কলেবর আছে, অনেকে তা জানে না। তার শ্রেণীভেদও আছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি আলামতের কথা বলব।

স্বাধীনতা দু'ভাবে দেখা দিতে পারে। তা চিনে নিতে না পারলে আখেরে ভোগান্তি প্রচুর।

একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করল বিদেশীদের তাড়িয়ে। কিন্তু দেখা গেল

তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পদে পদে খর্বিত। এই জাতের স্বাধীনতাই আসলে চূর্ণ স্বাধীনতা।

ঠিক এই ফন্দী মারফতই যন্ত্রশিল্পে উন্নত দেশগুলো তাদের উপনিবেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাও? হ্যাভ ইট, ইয়েস। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাও? নো, নো—নট।

এমন পষ্টাপষ্টি তারা বলে না। কিন্তু কলকাঠি এমন সাজিয়ে রাখে যে তার প্রধান ফল : অর্থনৈতিক পরাধীনতা।

যতদিন কোন দেশে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা একসঙ্গে যুগপৎ অনুভূত না হয়, ততদিন বুঝতে হবে সে দেশ আসলে পরাধীন, যদিও বাহ্যত স্বাধীন।

উপরোক্ত দু'ধরনের স্বাধীনতার অভিঘাত তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর হাড়েমাংসে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পেলে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুদূর-পরাহত।

তাই দেখা যায়, প্রাক্তন উপনিবেশ দেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের সঙ্গে যোগসাজশে আর্থিক সুবিধাভোগী এক ক্লাসের হাতে রাষ্ট্রভার অর্পণ করে চলে যায়। তারা নিজেদের স্বার্থেই দেশবাসীকে শোষণের যাঁতাকালে আবদ্ধ রাখে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জন-আন্দোলনের মুখে স্থানীয় শাসকেরা আর পেরে উঠছে না। তখন উপনিবেশের প্রাক্তন প্রভুরা স্থানীয় শাসকদের অস্ত্রশস্ত্র—এমন কি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। অনুন্নত দেশে সে স্বৈরাচারী শাসকের আবির্ভাব ঘটে, তার মূলে থাকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের মদদ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফলে টুটা-ফুটা-ঝুটা হয়ে যায়।

শুধু তা-ই নয়, আরো এক তাম্‌াশা ঘটে। প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা আবার গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসির ধ্বজাবাহক অথচ তারাই তৃতীয় বিশ্বে স্বৈরাচারী শাসকদের দোসর স্যাঙাত, সাহায্যকারী। তারা ওই সব দেশে যে খয়রাত দেয় যা 'এইড' নামে কথিত, তার মূলেও থাকে স্বৈরাচারী শাসন টিকিয়ে রাখার মতলব।

এই ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহকেরা প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন। ফলে, ওদের কিছু সরম লাগে। লজ্জার মাথা ত একেবারে খেয়ে বসে থাকা যায় না। তখন এই প্রাক্তন উপনিবেশবাদীরা তৃতীয় বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসকদের উপর চাপ দেয়। চাপের একটি রকম : গণভোটে নির্বাচিত সরকার কায়েম করো।

এখানে সেই প্রাবাদিক কাহিনীর খেলা শুরু হয়। চোরকে বলে চুরি করতে আর গেরস্থকে কয় সতর্ক হতে।

ইলেকশান দেয় শাসকেরা। কিন্তু এমনভাবে আঁটঘাট বাঁধে যেন গণতান্ত্রিক শক্তির জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে জিতে না আসে। গ্রীসে কয়েক বছর পূর্বে এক স্বৈরাচারশাসিত ইলেকশানের পর জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক রিপোর্টে লিখেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দি জেনারেল ইলেকশান অফ গ্রীস ওয়াজ ওন বাই দি জেনারেল্‌স। অর্থাৎ, গ্রীসের জেনারেল (সাধারণ) নির্বাচন জেনারেলরাই জয়লাভ করেছে।" এই শ্লেষমাখা রসিকতাটুকু মনে রাখার মত।

তাই পূর্বে কথিত, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কেউ যেন পূর্ণ স্বাধীনতা ব'লে ভুল না করে। তা প্রকৃতপক্ষে চূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রকৃত সাচ্চা রাজনৈতিক সংগঠন শুধু বর্তমান জটিল বিশ্বে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। মধ্যযুগে ধর্মের ভূমিকায় ছিল জনমানসকে জাগ্রত করার সেই শক্তি। বর্তমানে আর তা সম্ভব নয়। দেখা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভিত্তিক ধর্মীয় রাজনৈতিক পার্টি থাকে। কিন্তু কোথাও তারা দেশ শাসনের ক্ষমতা দখল করতে পারে না। বরং প্রতিক্রিয়া শক্তির লেজুড় হিসেবেই তাদের ভূমিকা উজ্জ্বল। জাতীয় সংকটকালে অবধারিতভাবে তাদের দেখা যায় দেশের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির দোসররূপে। সব দেশে ওই একই ছবি।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম উত্থান-পূর্বে বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণের অবলম্বনরূপে বিকশিত হয়েছিল, অপূর্ব মহিমায় জীবনের নানা শাখা-প্রশাখায়। বর্তমানে কোথাও তার সেই ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। বরং তারা প্রতিক্রিয়ার মদদকারী হিসাবে দেখা দেয়। তাদেরই "শকল" (চেহারা) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আমাদের দেখা। আল-বদর, রাজাকার নির্মাণে তারাই ছির আসল কারিগর।

কোথায় না?

ইসলামে রাজতন্ত্রের জায়গা আছে বা আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইংগিত দিয়েছিলেন—এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের আমিরশাহীগুলোর অভ্যুদয় কোথা থেকে ঘটল? স্রষ্টা ও জনগণের কল্যাণকামী সত্যিকার মানব-প্রেমিকাদের বিবেকের কাছে কী কোন প্রশ্ন ওঠে না এই প্রসঙ্গে? তাজ্জব ব্যাপার নিশ্চয়।

প্রসঙ্গ-বিস্তৃতির ভয়ে শুধু এইটুকু বলা যায়, বর্তমান যুগের সঙ্গে অতীতের মিলের চেয়ে গরমিল বেশী সমাজ কাঠামোর তারতম্যে। তাই ধর্ম জন মানসে তেমন কোন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে অক্ষম, যা মধ্যযুগে সম্ভব ছিল। আত্মস্বার্থের বাইরে মহৎ উদ্দেশ্যে জনকল্যাণপ্রণোদিত কোন আদর্শ ছাড়া এখন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন।

বাংলাদেশের আবির্ভাব-লগ্ন কল্পনা করুন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোটি কোটি প্রাণে সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জনের যে উন্মাদনা জাগিয়েছিলেন, তা কোন ধর্মের নামে নয়। বরং স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতিয়ার ছিল নানা ফন্দী মারফত ইসলামের দোহাই। পাকিস্তানের স্থপতি জিন্না সাহেব কোন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। তিনি নব্য মুসলমান, যাঁর হালচাল রুচি ছিল ইউরোপীয়। বিদেশী লেবাস ছাড়াও, বোম্বাইয়ে তাঁর "সেলার" (ভূগর্ভস্থ মদ্য ভাণ্ডার)-এর খ্যাতি ছিল সারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর জুড়ে। ষাট সত্তর বছরের পুরাতন মদ সেখানে মজুদ থাকত। সমঝদারেরা বলেন, ওই পানীয় যত পুরাতন হয়ে তত নাকি তার কদর ও আস্বাদ বাড়ে।

জিন্না সাহেব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন না। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তিনি ইসলামকে প্রয়োগ করেছিলেন। সদ্যলব্ধ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পরিষদে তার বক্তৃতা বহুজনের মনে গাঁথা আছে, যেখানে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কে ধর্মের ঊর্ধ্বে পাকিস্তানী হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

নিজের রাজনৈতিক সাফল্য মিঃ জিন্না দেখে যান। কিন্তু বিষবৃক্ষে কি ফল ফলবে তা ধারণা করতে পারেননি। মধ্যযুগীয় ধ্যানাদর্শ এবং বর্ণবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে তিনি রাজনৈতিক কিস্তিমাত করে বসেন। এখন তা বুমেরাং। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পরিণাম বাংলাদেশ ত বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানের অংশ। বর্ণবিদ্বেষ শুধু বাঙালী, পাঞ্জাবী, বিহারীতে নিবদ্ধ রইল না। বর্তমান বর্ণবিদ্বেষ হাম রোগের মত পাকিস্তানের গোটা গতরে ছড়িয়ে গেছে। বর্তমানে সিন্ধী বনাম ভারত আগত মোহাজেরদের সংঘাত ভয়াবহ। করাচী ও অন্যান্য শহরে কারফিউ লেগেই থাকে— বর্ণবিদ্বেষ-জাত দাংগার পরিণাম। বেলুচী, পাঠান, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি— সকলেই একে অপরের বৈরী। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাণ্ডার মহিমায় পাকিস্তান টিকে আছে। নচেৎ জিন্না সাহেবের পাকিস্তান তাদের ঘরের মত কবে ধসে যেত। আরো অসুবিধা কেউ বাঙালীদের মত ১২০০ মাইল দূরে অবস্থান করে না এবং বাঙালীদের মত তাদের সংখ্যা বেশী নয়। বেলুচীরা মাত্র শতকরা চারজন। পাকিস্তানের দুরবস্থার হেতুঃ দাল মে কালা থা।

AMARBOI.COM

মোদ্দা কথা, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য কোন দেশ গড়ে তোলার জন্য। এক কথায় সাচ্চা পলিটিক্যাল পার্টি ছাড়া সমাজ উন্নয়ন অসম্ভব। জনগণ দিয়েই পার্টি গড়ে ওঠে, দাবি-দাওয়া অনুযায়ী সেখানে আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। আদর্শ রূপায়ণের জন্যে যুদ্ধের চীফ-অফ-দি-স্টাফের মত প্রয়োজন সংগঠন-পরিচালনার দায়িত্বভারগ্রহণকারী পরিষদ বা জনমণ্ডলী।

এক কথায় নেতৃত্ব প্রয়োজন। তাছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আরো গোড়ার দিকে গেলে, বলা যায়, নেতা প্রয়োজন— নেতৃত্ব প্রয়োজন। নেতা এমনই হবেন যিনি বা যারা জানেন, সামাজিক কল-কব্জার খুঁটিনাটি এবং জানেন কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ পদক্ষেপ গ্রহণ বিধেয়।

এখন মনে রাখা দরকার, আন্তরিকতাই এমন ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা কিছু নয়। বরং তার দাম বড় গৌণ। আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজন সমাজ যন্ত্রের গতিবিধি এবং হদিস। জননী সন্তানের রোগ-নিরাময় প্রার্থনা করে। সেখানে তার আন্তরিকতায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তা দিয়ে ত ছেলে বা মেয়ে ব্যাধিমুক্ত হবে না। সেখানে প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জন্যে স্বতঃসিদ্ধ বাণীর মত বলা যায়, যিনি যুগপৎ জনক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক তিনিই প্রকৃত নেতা। রোগ থেকে রেহাই পাওয়ার বাসনা কোনই কাজে লাগে না, যদি চিকিৎসক না পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে সৎ মানুষের অভাব নেই। কিন্তু তারা সামাজিক সংকটে অসহায় নীরব দর্শক। যিনি সচেতন তিনি কোন দেশপ্রেমিক পার্টির কর্মীরূপে রণে ঝাঁপিয়ে পড়েন সংকট-নিরসনে।

নেতা বা নেতৃত্বের এমনই স্বরূপ হওয়া উচিত। সেখানে একজন বা বহুজনের মিলিত নেতৃত্ব থাকতে পারে। কিন্তু আসল কথা লক্ষ্য জানা নয় শুধু লক্ষ্যে পৌঁছানোর হাল-হকিকতও জানা অপরিহার্য।

আরো কয়েকটি বিশেষ শর্ত অবশ্য-অবশ্য পালনীয়।

প্রথমত, নেতা বা নেতৃমণ্ডলী পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অর্থাৎ, তারা জানেন সমস্যার স্বরূপ।

সেখানে যুক্তিযুক্ত বিকল্প কি, তাও তার বা তাদের জানা।

এই বিকল্প জনমানসে প্রতিফলন অবিশ্যি প্রয়োজন। কারণ, ব্যাপারটা কোন একক ব্যক্তির নয়। জনমানসে যদি বিকল্পের প্রতিফলন না ঘটে তাহলে কোন আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ তোকেভিল লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী দুঃখ-দারিদ্রের নিপীড়ন সহ্য করে এসেছে, কখনও মুখ খোলেনি। আর যদি মুখ খুলে থাকে তা অল্প গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পশুসুলভ দসহনের পেছনে থাকে বিকল্পের অনুপস্থিতি। কোন বিকল্প নেই যখন, সওয়া ছাড়া উপায় কী? কিন্তু যে মুহূর্তে বিকল্প তার সামনে খাড়া হয়, সে বা তারা আর শান্ত থাকতে অক্ষম।

তাই নেতা বা নেতৃমণ্ডলীর এই এক প্রধান দায়িত্ব : শুধু বিকল্প জানা নয়, বরং তা জনমানসে যেন বেশ প্রতিফলিত হয় এবং গভীর দাগ কাটে। এমন ঘটলে মানুষ যেকোন ত্যাগ স্বীকারে আর পেছপা হয় না।

নেতৃত্বের উপর প্রচারের দায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী। এখানে প্রচলিত সকল মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে কিভাবে প্রয়োগ বা নিয়োজিত, তা নির্ভর করে জ্ঞানের দক্ষতার উপর। এক কথায়, সমস্যা শুধু জানা নয়, সমাধানে কোন বিকল্পের পথ গ্রহণীয় বা বিকল্প কি আছে, সেই চেতনা নেতাদের থাকা উচিত। এই পথ ধরেই শুরু হয় শক্তি-দখলের লড়াই।

ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের মত, বিকল্পের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে মানুষ প্রস্তুত এবং ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত কিনা তা নেতাদের যাচাই করে দেখা উচিত। সামরিক ভাষায় তাকে বলা হয় "মোবিলাইজেশন"।

এই মোবিলাইজেশন করতে না পারলে কোন গন্তব্যেই পৌঁছানো যাবে না। শক্তি দখলের কালে এবং শক্তি দখলের পর সামাজিক পুনর্গঠনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মোবিলাইজেশন" অপরিহার্য শর্ত। দশ লাগে ভূত ভাগে– এই বাঙলা প্রবাদ ত অসার বাক্য নয়। সব রকমের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দশের দরকার। এই জনমষ্টিকে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অনুপ্রেরণাদানের অপর নাম "মোবিলাইজেশন"।

এখানে একটি বড় শর্ত নেতা বা নেতৃত্বের সততা। অর্থাৎ কথায় এবং কাজে নেতৃত্ব কখনও ভাণাশ্রয়ী নয় বা মুনাফেকী করে না। তার বা তাদের সততা প্রশ্নাতীত। নেতৃত্বের উপর জনগণের আস্থা স্থাপন অত সহজে হয় না। তা রাতারাতি অর্জন মূর্খের কল্পনা। নানা সামাজিক ঝড়ঝাপ্টার ভেতর দিয়ে দীর্ঘকালের সড়কপথে নেতা বা নেতৃবৃন্দ আর্পন-আপন আচরণ দ্বারা তা অর্জন করেন। সেখানে মৌসুমী ফুলের কারবার অচল। ভুঁইফোঁড় রাতারাতি নেতা গজানোর কোন "স্কোপ" নেই।

দেখা যায় অনেকে ক্ষমতা দখল করে পরে নের্তা হয়। সত্যিকার নেতৃত্বের বেলায় ব্যাপারটা উল্টোভাবে ঘটে। অর্থাৎ সেখানে নেতার পদ পাওয়ার পর একজন পাউয়ার বা ক্ষমতায় যায়। তা ঘটতে পারে, শুধু জনগণের আস্থা অর্জনে, যিনি নেতৃত্বের পরীক্ষা বহুকাল ধরে দিয়েছেন– কেবল এমন নেতার বেলায়। আস্থা অর্জন করতে হয় সততা দিয়ে। আর অন্য কোন রাস্তা সেখানে বন্ধ।

অনেকেরই মনে আছে, যদিও ঘটনাটি ঘটে ষোল-সতর বছর পূর্বে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের গারদখানা থেকে ফিরে আসার পর। '৭২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস থেকে আরো কয়েক মাস, বঙ্গবন্ধু বিরাট বিরাট জনসভায় প্রায় একই সুরে এবং ধাঁচে ভাষণ দিতেন। সব মিটিংয়ের দলিল আপাতত আমার হাতে নেই। তবে একটি দলিল থেকেই বাকিগুলো অনুমান খুব সহজ।

১৯৭২ সালের ৯ মে তারিখে রাজশাহী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "ভাইয়েরা আমার আমি কিছুই দিতে পারব না। ধোঁকা আমি দেই না। ধোঁকা আমি দিব না। মিথ্যা ওয়াদা আমি করি না। আমার হাতে কিছু নেই–।" তখন তাঁর হাতে সত্যিই বস্তুত কিছু থাকতে পারে না। সদ্য-যুদ্ধ-পর্যুদস্ত' বাংলাদেশ। পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা শুধু মা-বোনের ইজ্জত হুরমৎ (মর্যাদা) লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত হয়নি, তাদের পাশব নাশকতার মাত্রা ত এক নয় বহু রকমের নিষ্ঠুরতায় সজ্জিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্রিজ, সড়ক সবই ধ্বংস করে দিয়েছিল। হানাদার সৈন্যদের বন্দুকের ঘোড়া-টেপা নিসপিস থাবার নীচে কিছুই ত আস্ত ছিল না। তদানীন্তন মিলিটারী গভর্নর টিক্কা খানের জান্তব চীৎকার, 'হাম জমিন দেখ নে মাংতা, আদমী নেহি" ত বাস্তবায়িত হয়েছিল গোটা দেশ জুড়ে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বঙ্গবন্ধুর হাতে কিছু থাকার কথা নয়। সামনে বিরাট দায়িত্ব। সবই ঢেলে সাজার কথা আবার নতুন করে। পুনর্বাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পুনর্গঠন দায়িত্ব সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

তেমন ক্ষেত্রে দেশের মানুষের কাছে সুখের আশ্বাস দেয়াও ভণ্ডামি হোত। শেখ মুজিব নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জনগণের কাছে তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর পক্ষে কিছু দেয়া অসম্ভব।

তবু সেদিন কেউ তাঁর নেতৃত্বে আস্থা হারায়নি। তাঁর আসন টলে যাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। কারণ, সুদীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সততার পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন।

অন্য কোনো হেজিপেজি নেতা ত অমন সত্যভাষণের সাহসই পেত না। পরদিনই তার গদী ধসে যাওয়ার সূত্রপাত ঘটত। মিথ্যা দিয়েই তখন নিজের দূর্বলতা ঢাকত অন্য ধরনের নেতা।

সদ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত। এক শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে পাঁচ বছর লাগবে না। এক চা-পার্টিতে উক্ত মহোদয়ের সঙ্গে দেখা। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি দুই টুকরো পাকিস্তানের জনসংখ্যার অনুপাতে কতো স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দরকার, তার পরিসংখ্যান নিয়েছেন? সব স্কুলই আকাশের তলায় বসে। তবু উপরে ছাউনি লাগে, হোক তা তালপাতা, ছন— যদি টিন না মেলে। শিক্ষক কতো লাখ দরকার? পাঁচশ' জনের জন্য একজন শিক্ষক ধরলে কয়েক লাখেও কি কুলোবে? তারপর কাগজ বইপত্র পেনসিল? সবচেয়ে বড় সমস্যা, শিক্ষাদানের ইচ্ছা থাকলেও কি অভিভাবকেরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে পারবে? অনেক শিশু ত চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে মাঠে তার বাজানের জন্য নাস্তা নিয়ে যায়। আমি আরো পরিসংখ্যানের কথা উঠাতে যাব, মন্ত্রী সেদিকে না গিয়ে, আমি কি লিখছি, জিজ্ঞেস করে বসলেন। সংলাপ অন্যদিকে মোড় নিল। ভদ্রলোক যে ভেতরে ঘামছিলেন, তা আমি নিশ্চিত বলতে পারি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোক্ত ভাষণ শুধু তাঁর মত পরিমাপের জননেতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। সুদীর্ঘ তিন দশকের ঝড়ঝাপ্টার নবিশীর ভেতর দিয়ে ওই সততা অর্জিত।

সততা-মারফত অর্জিত আস্থা ছাড়া জনগণকে কোন মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব। অর্থাৎ, মোবিলাইজেশন অসম্ভব। তাছাড়া কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অসম্ভব।

সরকারী কমিশনের রিপোর্ট গুদামে পচে বা পোকায় খায়। কারণ, নীতি রূপায়ণের সদিচ্ছা পেছনে অনুপস্থিত। জনগণকে ধোঁকা দেয়ার নানা পন্থার তা অন্যতম।

৩

পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে, আলোচ্য শর্তগুলোর প্রশ্নে স্বর্গীয় বঙ্গবন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিবুর রহমানকে আবার নতুন আলোকে স্মরণ করতে হয়।

সদিচ্ছা ও সততাই যথেষ্ট নয় বর্তমান জটিল-কুটিল বিশ্বে, যদি সমাজবিরোধী সকল দেশী ও বিদেশী শক্তিগুলোর গতিবিধির দিকে সতর্কতার লক্ষ্য না থাকে। সেই অসতর্কতার জের হিসেবে বড় চড়া খেসারতের শিকার আমরা। পূর্ণ স্বাধীনতার মঞ্জিল এখনও দূরে অবস্থিত।

বাংলাদেশ বর্তমানে মাঝ-দরিয়ায় মাঝিহীন সাম্পান।

আমি সালাম বলছি, আমি বরকত বলছি

আজ ফাল্গুন মাসের কতো তারিখ?

কালের অনেক সড়ক পার হয়ে এসেছি, একবার দম নিতে থামতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ এক এলাকায় এসে পৌঁছলাম। সবই ত চেনা। সবই কতো পরিচিত, কতো নিকট সব কিছু। আমাদের হৃদয়ে ছিল এই ঠিকানা। বাংলাদেশ আমাদের অপরিচিত হবে কেন?

দেশবাসীর অন্ন, বস্ত্র একে একে যখন গায়েব হতে লাগল, সেদিনও অসহায়ের সহায় ছিল ভাষা, বেদনা-উচ্চারণের যন্ত্রণা প্রশমনের অন্যতম উপায়। ভাষা তাই জননী। এই জননীকে বুকে আঁকড়ে সেদিন দিন-গুজরান করত দেশের সাধারণ মানুষ।

একদিন পাকিস্তানের কর্ণধারগণ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের শেষ অবলম্বন, ধ্বনিটুকুও ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে উঠল। তারা বয়েৎ ছাড়লে: বাঙলা ভাষা বিধর্মীর ভাষা। দেব-দেবী লাঞ্ছিত ভাষা একেশ্বরবাদী মুসলমানের ভাষা হতে পারে না। অতএব ত্যাজ্য, ত্যাজ্য।

মূর্খেরা ইতিহাস পড়ে না। আরবী ভাষা একদা বিধর্মীদের ভাষা ছিল, যে-ভাষায় কোরান শরীফ অবতীর্ণ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অন্ততঃ ইতিহাস পড়েনি। ভাষা ইতিহসের প্রতিধ্বনিরূপে অতীত-বর্তমান একাকার করে দেয় এবং ভবিষ্যতের সূচনা সেই বুনিয়াদে তৈরী হয়। তাই ভাষার অপর নাম বিস্তার একস্‌টেনশান। ভবিষ্যতের প্রতিমূর্তি প্রথমে ভাষার মাধ্যমেই ফুটে ওঠে। কর্মপ্রেরণার চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় মানুষের মন্ত্র। পাকিস্তানের মসনদবাসিগণ তা জানত না। আবার পূর্ব পাকিস্তানে তাদের যে-সব পদলেহী, প্রভুর উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়ে সন্তুষ্ট ক্রীতদাস ছিল তারাও জানত না, শব্দের প্রতিবিম্ব অণু-কণারূপে কী প্রচণ্ড শক্তির উৎস।

তবু বয়েৎ অব্যাহত রইল।

শাসকদের চিরাচরিত রীতি শোষণ এবং শাসন কায়েম রাখতে প্রচুর ধোঁয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তূপ রচনা। একই মতলব হাসিলের নানা ফন্দী-ফিকির। কখনও ধর্মের জিগির, কখনও সাম্প্রদায়িকতার বারুদে অগ্নি-সংযোজন।

বয়েতের পর শুরু হয় বুলেট।

ভাষার ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন। আবেগ প্রকাশে উভয়ে একই ভাঁড়ার ঘরের দ্বারস্থ। শুধু ধর্মের ভাষায়ই কি তারা অভিন্ন— যখন সব মানুষ ঈশ্বর আল্লাহর সৃষ্টি?

কিন্তু পাকিস্তানের দণ্ডধরেরা বিভেদের খাঁড়া মওকামত ব্যবহার করত। মসনদ রক্ষাই তাদের একমাত্র ধর্ম—পবিত্র ইসলাম নয়।

১৯৭১ সালে তোমরা কি তাদের দ্যাখোনি?

অলক্ষিতে তোমাদের পাশে আমরাও এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন রিফিউজী ক্যাম্পে ভলান্টিয়ার, কৃষকও লড়াইয়ের ময়দানে অস্ত্রধারী মুক্তিবাহিনীর সৈনিক। আমাদের চোখ কোন ভুল করেনি।

২৫ মার্চ, ১৯৭১। যেদিন সভ্যতার সব মুখোশ খুলে ফেলে পাশব তাণ্ডবে মেতে উঠল পাকিস্তানী সৈন্যগণ, তাদের প্রচার মাধ্যমে যুগপৎ সরব রইল : পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ বিভ্রান্ত। ওরা প্রতিবেশী ভারতীয় হিন্দুদের প্ররোচনায় মতিভ্রষ্ট। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা প্রকাশ্যে না হোক গোপনে ইন্ধনদাতা।

প্রচার-অনুযায়ী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্মসূচী নিল। কাফের খতম করো। অর্থাৎ হিন্দু খতম করো।

অপরাধ কি ওদের?

ওরা হিন্দু—এই ত মস্ত অপরাধ। আর অন্য অপরাধের দরকার ত নেই। পাইকারি হিন্দু-হত্যাযজ্ঞে সৈন্যরা মেতে রইল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহের আগুন নিভল না। বরং আরো দাউদাউ জ্বলে উঠল।

বাঙালী মুসলমান সেদিন তার স্বজাত্য-আইডেন্টিটি-আত্মপরিচয় বহুকাল পরে খুঁজে পেয়েছিল। তাই আর কারো দাস থাকতে রাজি নয়, শোষণের শেষ চিহ্ন মুছে দিতে প্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ এবং কর্মতৎপর।

পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমান আদলেও এক রকম। কারণ, একই বর্ণগোষ্ঠী উদ্ভূত। চোখে দেখে হিন্দু-মুসলমান নির্ণয় করা কঠিন।

পাকিস্তানী সৈন্যরা তা সহজ করে নিল। অত বাছবিচারের প্রয়োজন কি?

শালারা দেখতে এক রকম। কৎলে-আ'ম (গণহত্যা) শুরু কর দো।

শুরু হলো গণহত্যা।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার জিগীরে স্বাধীনতা-সংগ্রামে থেকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়ে জল্লাদেরা শুরু করল 'কৎলে-আ'ম'।

এবার পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী মাত্রেই অপরাধী। অতএব হত্যা করো। ওদের ধ্বংস করো। ২৫ মার্চ থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী

AMARBOI.COM

সাম্প্রদায়িক চাল চেলে বাজিমাৎ করতে তৎপর ছিল। মতলবে বানচাল। তখন শাসকেরা জন্তুর সঙ্গে প্রবৃত্তি বদল করে নিলে পোশাক, লেবাস যথাযথ ঠিক রেখে।

আহ, হিন্দু-মুলমান দুই ভাই একত্রে মিলে কতো রক্ত না দিলাম।

কতো বেইজ্জতি, কতো অসহায় বেআবরু মা-বোনের আর্তনাদ না শুনলাম। বিতাড়িত জন্তুর বিশ্রামের মত আকাশের তলায় হিন্দু-মুসলমান গৃহহীনেরা সেদিন উপলব্ধি করেছিল, এই পৃথিবীই তাদের গৃহ। যে তাদের সুখে-দুঃখের শরিক হয়ে ওঠে সে-ই তাদের আত্মীয়স্বজন। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-এসব খোলস, শোষকের ভাঁওতামাত্র।

তা জানতেম না। তাই চব্বিশ বছর খেসারত দিলাম তথাকথিত স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকে।

বড় নিদারুণ মাসুল, বড় নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশের মানুষ তাদের ক্ষুধার অন্ন বিতরণকারী, তৃষ্ণার জলদাত্রী নদীর দিকে তাকায় না কেন?

জল বা পানি ত মিশ্রণের একটি বড় উপাদান। সেই জলও আলাদা জলের পাশাপাশি মিশে থেকে কী অদ্ভুত দৃশ্যপট না রচনা করে।

বাংলাদেশের অধিবাসী, তোমরা কি মেঘনা এবং পদ্মা নদীর মিলন রেখা দ্যাখেনি? যদি পূর্বে না দেখে থাকো, একবার গিয়ে দ্যাখে এসো। একটি বার সারা জীবনের তরে। মিনতি একটিবার। তুমি সারা জীবনের শিক্ষা সেইখানে পেয়ে যাবে।

পদ্মার জল ঘোলা অন্যদিকে মেঘনার পানি স্বচ্ছ। স্বাতন্ত্র্যের বেশী স্পষ্ট। অথচ কী পরিপূর্ণ মিলনে না তারা বয়ে চলেছে। বয়ে চলেছে এই বিস্তীর্ণ জল-প্রবাহ।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে সৃষ্টির এই প্রাকৃতিক বাহনের কাছে তোমরা সবক শিক্ষা তালিম নাও না কেন?

আরো প্রতারিত হবে কতো দিন?

মাতৃভাষার সংহার-পূর্বে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম।

আরো উনিশ বছর তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে গেলে। তবে সাফল্য এলো। এত দেরী হতো না, যদি শোষণের শিকড় উৎপাটনে তোমরা হাত দিতে। বহু কালের শিকড়। পুরাতন, মাটি চাপা পড়ে থাকে। শোষকেরা কিছু চাপা দিয়ে রাখে যেন সহজে কারো চোখে না পড়ে। ফলে, হাতও যায় না। হাত নাগাল পায় না। অনেক বিলম্ব হয়। উনিশ বছর খুব কম সময় নয়।

মাতৃভাষা হত্যা আসলে মানসিক বিকাশের সকল পথ-অবরোধের ফন্দীমাত্র। আজ বাংলাদেশের অধিবাসীদের নিকট তা স্পষ্ট। আগে আবছা ছিল। তাই ত এত রক্তের দরিয়া সাঁতার দিতে হোলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু দেহ-সমষ্টি নিয়ে মানুষ এক ধরনের জৈবিক আধারমাত্র। কিন্তু আবেগ, প্রজ্ঞা মানবিক অন্যান্য সম্ভাবনার বিকাশের জন্যে ওই আধার অপরিহার্য। অস্তিত্বের জন্য ত বটেই। তাছাড়া, প্রাণীর স্তর, কোনকালে অতিক্রম সম্ভব নয়। মাতৃভাষা তেমনই প্রথম গ্রহণীয় প্রাথমিক স্তরমাত্র। কিন্তু সেখানেই তার সীমা শেষ নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ ও জ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে তার আরো অগ্রগতি প্রয়োজন। বর্তমান আণবিক যুগে এত সংকুচিত পৃথিবী যে মাতৃভাষার মধ্যেই আবদ্ধ থাকা খুব মঙ্গলজনক নয়। স্বাদেশিকতা যেন কাউকে অন্ধ করে না তোলে।

আজ ফাল্গুন মাসের কতো তারিখ?

তোমরা উত্তর দিলে : একুশে ফেব্রুয়ারি। জবাব দিলে দেশী সংখ্যার সঙ্গে বিদেশী শব্দ জুড়ে।

আমাদের বাসনা কামনার মূলেও ছিল এই স্বপ্ন। স্বদেশ আমাদের দেহের মতো প্রাথমিক সোপানমাত্র। নচেৎ দেশের অধিবাসী হয়েও আমি আন্তর্জাতিকতার নিশানায় চিহ্নিত হতে চাই। আমি আমার নিজ দেশের অধিবাসী এবং যুগপৎ পৃথিবীর বাসিন্দা।

শুধু বাংলাদেশই আমাদের গন্তব্য ছিল না। পৃথিবীও আমাদের স্বদেশ।

AMARBOI.COM

শ্রান্ত দিগভ্রান্ত তবু প্রান্ত ব্রতচারী

আজ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

"জয় বাংলা, জয় বাংলা।"

"জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।"

"জয় বাংলাদেশ।"

আঠার বছর পূর্বে এমনই সকালে তারস্বরে ধ্বনিত হচ্ছিল এই নাদেশ্বর পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের দশদিগন্ত প্রকম্পিত করে। সেই কল্লোল শুধু অর্থময় শব্দের সম্মিলিত প্রবাহ নয়, বরং বন্দী আত্মার বাইরের আকাশ-বাতাসের সঙ্গে কোলাকুলির আকুলতা যেখানে সমুদ্রের গর্জন নিমেষে থমকে দাঁড়ায় অবনত-শির এবং গন্ধর্বলোকের কিন্নর-কিন্নরীগণ সঙ্গীতের নতুন তালিম নিতে নেমে আসে মৃত্তিকার মর্ত্যে।

"জয় বাংলা, জয় বাংলা।"

"জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।"

"জয় বাংলাদেশ।"

পৌষের কুয়াশা-লেপা অমন প্রত্যূষ নেয় বহু শতাব্দীর পর পৃথিবীতে ধরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল। প্রকাশ অস্থির আবেগ অসহায় শব্দ হয়ে বেজে ওঠে মানুষের কণ্ঠে। এই রীতি আবহমানকালের। নেপথ্যে বক্ষের বন্দরে হৃৎপিণ্ড বারবার আছাড় খায় এবং বহির্গমনের প্রত্যাশায় মাথা কোটে দেহের দেয়ালে। মুক্তি প্রার্থীর জন্যে থাকে এমন অসোয়াস্তিকর শর্ত। আনন্দ তাই যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা আনন্দ। এই দ্বৈতলীলা ত এক লহমার ব্যাপার নয়। পেছনে থাকে বহু দিনের প্রতীক্ষা– শত রকমের ত্যাগ—এমন কি তুচ্ছ হয়ে যায় বিশ্রাম, আহার নিদ্রা– ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়েও চড়া দাম লাগে। প্রাণের পরোয়া থাকে না কারো।

এই জটিল কর্মচাঞ্চল্যের ফলশ্রুতি শ্লোগান হয়ে বেরিয়ে আসে।

"জয় বাংলা, জয় বাংলা।"

"জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।"

"জয় বাংলাদেশ।"

একমাত্র মূর্খের কাছেই ওগুলো মনুষ্য-কণ্ঠ নিঃসৃত বাগাড়ম্বর। মূর্খ ছাড়া, দেশ-জননীর কিছু কুলাংগার সন্তান থাকে যারা মায়ের বেইজ্জতি উপভোগ করে আশ্বিন- কার্তিকে রমণ-রত একজোড়ার পাশে খাড়া অন্যান্য কামাতুর কুত্তার মত তাদের পালার অপেক্ষায়। দেশপ্রেমহীন এই নরাধমেরা দাঁও অন্বেষী।

কর্ণপটে এখনও পুরাতন প্রতিধ্বনি ফিরে-ফিরে আসে, বিশেষতঃ বিজয় দিবসে।

আঠারো বছর কেটে গেছে।

আঠারো বছর!

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জানতেন ওই বিশেষ সংখ্যাটির বৈভব, মহিমা-মাহাত্ম্য। তাই একক ব্যক্তিমানুষ থেকে জন-সমষ্টির জন্যে করেছিলেন বড় সরল ভাষায় সরল প্রার্থনা:

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়
এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

আঠারো ত বাংলাদেশের বুকে নেমে এসেছে। কিন্তু কবির প্রত্যাশা মিটেছে কি?

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে ভাঙতে চায় পাথর বাধা
এই বয়সে কেউে মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

কিন্তু আজ কান্না ত আমাদের প্রাত্যহিকতার সম্বল এবং তা মানুষের নয়, ইতর প্রাণীর কান্না। দু'বেলা আধা-পেটা ভাত না জুটলে ক্ষুধার্ত জীবের মত আমাদের চোখে পানি আসে। আমাদের অবোধ বাচ্চারা ত বিনা লজ্জায় প্রকাশ্যে কাঁদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিন্ধনের বসন থাকে না। মা-বোন সওয়াব-উপর্জনকারী ধনীর দুয়ারে জাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে ভিড়ের চাপে থ্যাত্‌লানো দলা কীমার মাংসে পরিণত হয়। আঠারো বছরের মাসে হতভাগিনীরদের সংখ্যাও ছিল আঠারো। চাঁদপুরের ঘটনা নিশ্চয় আপনারা ভুলে যাননি। আরো প্রত্যাশার মধ্যে থাকে কোন রকমে মাথা-গোঁজা ছাপড়া। টিন, ইট, সুড়কি ছাদ নয়, ছনের বা তাল-পাতার ছাপড়া। তাহলে আল্লাহর দরগায় হাজার শোকর। তাও মেলে না। তবে ছাদ মেলে শহরের ধনীদের গাড়ি বারান্দার নীচে। মোটা কংক্রিট পাইপের গহ্বর ওদের চিরন্তন ছাদ। আরো ছাদ আছে বৈকি। আল্লার আকাশ। তাও মাঝে মাঝে নাগালের বাইরে চলে যায়, যখন গগনচুম্বী ম্যানসনের আড়ালে নিচে কোথাও পড়ে থাকতে হয়।

পদাঘাতে পাথর ভাঙতে পারলাম কই? বুকের উপর পাথর বসানো আছে যেন জগদ্দল। তার সমতলে বুট সজ্জিত যুগল চরণ পায়চারীরত। জগদ্দল ভেদ করে আমাদের বুকের উপর বাড়ি মারে। গাঁজর শুধু অনাহারে জীর্ণ নয়, বুটের চলাফেরায় মড়মড় চূর্ণ হয় ওই অস্থি-সারি প্রত্যহ। স্বভাবতঃই মাথাও নুয়ে আসে। মাটির উপর খসে পড়তে বিলম্ব কোথায়?

সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রার্থনা অপূর্ণ থেকে গেছে এ দেশে। আঠারো এলো। কিন্তু তার সকল বৈভব, ঐশ্বর্য লুণ্ঠিত।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
দুঃসাহসেরা দেয় যে ঝুঁকি।

মাথা তুলতে অসমর্থ স্পর্ধাহীন আমরা এক সরীসৃপ। দুঃসাহসেরা উঁকি দেয় বৈকি। কিন্তু আমরা দুঃসাহসী হতে অক্ষম।

এ বয়স জানে রক্তদানের পূণ্য
বাস্পের বেগে স্টীমারের মত চলে
প্রাণ-দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহল

কবির প্রত্যাশা এখানে পূর্ণ হয় না। বহু জনই নিজের খোলসে ঢুকে বসে থাকে। অনেক প্রতিবন্ধকতা। কবি উজ্জীবনের গান গেয়ে যান :

তবু আঠারো শুনেছি পদধ্বনি
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স নতুন কিছু করে।

বড় দূরাগত পদধ্বনি। তার আঘাত ক্রমশঃ আমাদের নিকটতর।

তোমরা যারা অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান আমাদের অসহায়তাকে নিজেদের তাগদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাওরাও, তারা শুনে রাখো, তোমাদের কানেও একদিন প্রচণ্ড বেগে ভেঙ্গে পড়বে সেই পুরাতন জয়ধ্বনি :

"জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।"

"জয় বাংলাদেশ।"

তোমরা মনে করো, আমরা ঘোর ঘুম-ঘোরে আচ্ছন্ন। কেয়ামত তক্ ঘুমাব। কারণ, ঘুমের বড়ি তোমরা সরবরাহ করো প্রতিদিন। চব্বিশ বছর লেগেছিল আমাদের সেই খোঁয়ারি চূর্ণ হতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোঁয়ারি ভেঙ্গেছিল। এইটুকু মনে রেখো। ভুলে যেও না নিজেদের অপকৌশল অপকীর্তি। আজ জনগণকে ঘুম পাড়ানোর আর বেশি অস্ত্র নেই তোমাদের প্রচারণার জামিতল, আলখেল্লায়।

মনে রেখো, চেতনা সৃষ্টি করে জীবন-যাপনের ধারা। সেখানেই অংকুরিত হয় নিদ্রাভঙ্গের বীজ। প্রচার কেন অনেক কিছুই ত তোমাদের নিয়ন্ত্রণে। অন্তত তোমরা তাই মনে করো।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। পাকিস্তানী শাসকেরা বাংলাদেশের আবির্ভাব কী রোধ করতে পেরেছিল?

ঘুম পাড়ানোর একটা মোক্ষম বাণ তোমাদের তুণে এবং তা অহরহ নিক্ষেপে তোমরা কসুর করো না। ধর্মের বেসাতিতে তোমরা যে অত্যন্ত পটু, দক্ষ তীরন্দাজ, তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। ধর্মের নামে মানুষকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে কাইজ্যা বাধানোর ফন্দীতে তোমাদের কাছে নারদ মুনি দুগ্ধপোষ্য শিশু।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি কথা তোমাদের জানা নেই। চব্বিশ বছর লেগেছিল এদেশে তোমাদের জারিজুরি, মাদারীর খেলের গেরো ও তার হদিস ধরে ফেলতে। বাংলাদেশে সেই মাদারীর খেল আবার শুরু করেছো, ভাবছো নির্ঘাৎ মাৎচাল। মনে রোখো, ইতিহাস তোমাদের হুকুম-তামিল ক্রীতদাসী নয়। সেখানেও আর পূর্বের মত তোমরা শক্তিশালী নও। ইরানে ঘা খেয়েছে তোমাদের সাহায্য দেনেওয়ালা দোস্ত। খোমেনীকে ওরা প্রথম দিকে দুধ কলা দিয়ে পুষেছিল। তারপর তারা দেখলে, খোমেনী এক মহাবিষধর সর্প। তার মুখ দিয়েই উচ্চারিত হোলো, ~ America is the Satan আমেরিকাই আসল শয়তান।" তোমাদের জিগিরে তাই ওরা আর কাছা খুলে যোগ বা মদৎ দেবে না। সিদেক তোমরা কমজোর হয়ে গেছ। তোমাদের মদৎগার ইরানে আংগুল পুড়িয়ে এখন বহুৎ হুঁশিয়ার। তোমাদের বাণ তাই ক্রমশঃ বিকল হচ্ছে। পুরাতন স্যাঙাতদের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায়ের স্বার্থে তোমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বলি দিয়েছিলে। তারা তোমাদের মত মুদ্দফরাসদের ব্যবহার হয়ত আবার করতে পারে, কিন্তু তা হবে ভোল্ পাল্টানো অন্য কোন পাঁয়তারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীতের খেল খতম হচ্ছে।

আমাদের বিজয় দিবস তোমাদের নিকট ছিল পরাজয় দিবস। তাই ছোবল দিয়েছিল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে আন্তর্জাতিক লুটেরাদের উৎকোচে বশীভূত। যে যে-দেশে জন্মে তাই তার জননী—দেশ-জননী। দেশ জননীর ধর্ষক, অজাচারী তোমরা। তা ভুলে যেও না।

তোমাদের আচমকা বাড়ির চোটে সত্যি আমরা দিশাহারা বা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দিশা আর ফিরবে না একথা মনে জায়গা দিও না। আমরা ইতিহাসের পান্থ ব্রতচারী। কবির বাণী ইয়াদ রেখো—

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক্ দুর্বৃত্ত।

দুর্বৃত্তের দল তা বোঝে না। এই দেশের জনগণ সাময়িক দিশেহারা হয়, তার বেশি না। দশ বিশ চব্বিশ বছর দেশের ইতিহাসে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার টিক টিক শব্দের মত। আইয়ুব খান তার দশশালা উৎসব পালনের মুখে কুপোকাৎ হয়ে গেল। ইতিহাসে কেউ যেন নিজেকে চিরস্থায়ী না মনে করে।

আবার তোমাদের কানের পরদা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে আঠারো বছর আগেকার গ্রহভেদী জনরণ-কল্লোলের অভিঘাতে।

"জয় বাংলা, জয় বাংলা।"

"জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।"

"জয় বাংলাদেশ।"

মনে রেখো?

ইতিহাস মার্জনা করে না।

মনে রেখো,

আমরা প্রতীক্ষায় আছি।

ততদিন দেওয়ালের অদৃশ্য লিখন তোমরা পড়তে থাকো।

AMARBOI.COM

প রি শি ষ্ট

ফারুক ইকবাল

৩রা মার্চ, ১৯৭১। ফারুকের মা নূরমহল বেগম নিকটতম প্রতিবেশিনী মিসেস সেলিনা হাইয়ের কাছে গল্প করছিলেন : তিনি রাতে স্বপ্ন দেখেছেন যে মিসেস হাইয়ের আব্বা তাকে (ফারুকের মাকে) একটি লাল তুর্কি টুপি উপহার দিয়েছেন।

মিসেস হাই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে বললেন, স্বপ্নে টুপি পাওয়া সম্মানলাভের লক্ষণ।

২৯৪/১ গুলবাগে ফারুকদের নিজ বাড়িতে দুই প্রতিবেশিনীর যখন স্বপ্ন নিয়ে কথা হচ্ছিল তখন সময় সকল সাড়ে দশটা। কিছুক্ষণ আগেই ফারুক বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় মায়ের কাছে গোটা দুই-তিন টাকা চেয়েছিল। পায়নি; টাকাটা নিয়ে যায় মিসেস হাইয়ের কাছ থেকে। মিসেস হাই জানালেন, ফারুককে আমি নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতাম। আজ এতো বছর পরেও মনে পড়ছে, কেন জানিনে, ফারুককে টাকা দিয়ে আমিও ওর সাথেই দরজা পর্যন্ত এসে গলির মুখে অদৃশ্য হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম। মনে পড়ছে, ফারুক নিজের বাড়িটাকে একবার খুব ভালো করে দেখে নিলো, চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার আগে গলির মুখে দাঁড়িয়ে গোটা গলিটা দেখলো। ওর সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার চলে যাবার দৃশ্যটা চোখে ভেসে ওঠে। কথার মধ্যেই ফারুকের মা ও মিসেস হাই দু'জনেই শুনলেন, কয়েকটি ছেলে উত্তেজিত গলায় জানতে চাইছে, ফারুকদের বাসা কোন্‌টা?

বেরিয়ে গেলেন ফারুকের মা, পেছনে মিসেস হাই।

আমি ফারুকের মা। তোমরা কে বাবা?

ফারুকের মাকে দেখে ছেলেগুলো কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস হাই বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর দুঃসংবাদ, কিন্তু নূরমহল বেগম অকপট সরলতায় তখনো জিগগেস করছেন, কেন, তোমরা, ফারুককে খুঁজছো কেন?

দলের ভেতর থেকে একটি ছেলে এগিয়ে আসে মিসেস হাইয়ের কাছে।

আপনি একটু এদিকে আসুন।

মিসেস হাইও ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে গেছেন। তিনি ও ছেলেটি বেশি দূর যাননি। ছেলেটি জানায়, ফারুককে মিলিটারিরা গুলী করেছে।

সংবাদটি ফারুকের মা'র কানেও যায়। তখনো তিনি ঘটনার গুরুত্ব সম্ভবতঃ অনুধাবন করতে পারেননি। পয়লা মার্চে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ স্থগিত হয়ে যাওয়ার কারণে প্রদেশব্যাপী যে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে তার পরিণতি কি হতে পারে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তখন কি ভূমিকা পালন করতে পারে এই সহজ-সরল প্রবীণা গৃহবধূর ধারণার বাইরে বলেই তাঁর বোধগম্য হয় না ফারুককে যেন মিলিটারিরা গুলী করবে।

সশব্দে আঁতকে ওঠেন মিসেস হাই। সেই শব্দেই ফারুকের মা চেতনায় ফিরে আসেন—একটা চরম বিপর্যয়ের সংবাদ দেবার জন্যেই ছেলেগুলো ব্যাকুল হয়ে ফারুকদের বাসা, ফারুকদের বাসা কোন্‌টা বলে খোঁজাখুজি করছিলো। তিনি তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

ওই ছেলেগুলোও ছিল মিছিলে।

রামপুরা টেলিভিশন স্টেশন তখনো অসম্পূর্ণ, কিন্তু ভেতরে প্রচুর যন্ত্রপাতি আছে বলে কড়া মিলিটারি পাহারা ছিল সেখানে। তা ছাড়াও স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টের দিকে থেকে রামপুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামপুরার অসমাপ্ত ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে এক নজরে দেখা যায় মহাখালি, গুলশান, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, বাড্ডা, সাঁতারকুল, মেরাদিয়া ইত্যাদি জায়গা। ফারুক মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছিল টেলিভিশন ভবনের সামনে। সহজেই অনুমান করা যায়, তখন তাদের হাতে ছিল কালো পতাকা, সম্ভবতঃ বাংলাদেশের নতুন পতাকা; তবে মুখে যে "জয় বাংলা, তোমরা দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, তোমরা নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব" শ্লোগান ছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। ফারুকরা টিভি গেটের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলো। একজন মিলিটারি অফিসার ওদের ফিরে যেতে বলে এবং হুমকিও দেয়। কথা না শুনলে গুলী করা হবে। ফারুক কথা শুনেছিল। মিছিলের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাবার জন্যে যখনই সে ঘুরে পা বাড়িয়েছে তখনই পেছন থেকে গুলী। গুলীটা করেছিল এক সেপাই। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ফারুক। মুহূর্তে চীৎকার, দৌড়াদৌড়ি, ফারুক পড়ে থাকে রাস্তায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হাত-পা ছুড়ছে; পরে দেখা যায় তার পায়ের আঘাতে আইল্যান্ডের কয়েকটা ইট খুলে গিয়েছিল।

পিতা আফসার উদ্দিন ভূঁইয়ার পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা। ফারুক পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয়। মালিবাগ আবুজর গিফারী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ফারুক যে তখন থেকেই রাজনীতি সচেতন তার বড় প্রমাণ– সে ছিল কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। অত্যন্ত আমুদে, হৈচৈ-প্রিয় ফারুক কলেজে যেমন ছিল সবার প্রিয়; পাড়াতে ও আত্মীয়-স্বজনের কাছেও ছিল অতি-আদরের। সামান্য চাকরিজীবী আফসার উদ্দিন সাহেব অতগুলো ছেলেমেয়ের বহু সাধ আহ্লাদই পূরণ করতে পারেননি, তার জন্যে বড় কোনো ক্ষোভ সন্তানদের মধ্যে দেখা যায়নি। বড় সৎ মানুষ আফসার উদ্দিন সাহেব। শহীদ সন্তানের নাম ভাঙিয়ে বা ব্যবহার করে তো বটেই, বহু মিথ্যা তথ্যে বহু লোক আখের গুছিয়েছে, তাদের মধ্যে বহুজন যে

স্বাধীনতা-বিরোধী ছিল সে-কথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গুলবাগে ফারুকদের আঠারো বছর আগে যে টিনের বাড়ি ছিল, এখনো তাই আছে, কিন্তু চারপাশে তিন চার পাঁচ তলা ভবনের আড়ালে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম শহীদ ফারুক ইকবালের বাড়ি আড়াল হয়ে গেছে।

যেমন আড়াল হয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস। আবুজর গিফারী কলেজ ও মৌচাক মার্কেটের সামনে আইল্যান্ডে শুয়ে আছে ফারুক; আগে আইল্যান্ডটা বড় ছিল, এখন রাস্তার প্রয়োজনে অনেক ছোট হয়ে গেছে। কে জানে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারছে না বলে কার মনে ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম শহীদ ফারুক ইকবাল, এ কথা এখনই বলা সম্ভব নয়, সেটা নির্ধারণ করবে ইতিহাস। তবে ফারুকের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ঢাকায়, দেশে। এই নির্ভীক ছেলে গুলী হতে পারে জেনেও মিছিল নিয়ে মিলিটারিদের সামনে যেতে ভয় পায়নি, কারণ সে-সময় বাঙালী ভয় কাকে বলে জানতো না।

রশীদ হায়দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~